মপাসাঁ রচনাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদ

সুনীল কুমার ঘোষ

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত
॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : সুমঙ্গল রায় ॥ আদর্শ প্রেস ॥
৭, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলকাতা-১১
বাঁধাই : দত্ত এণ্ড পাল

প্রচ্ছদ : তরুণ দত্ত

সূচীপত্র

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

(A Duel)

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানরা ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে। পরাজিত মল্লযোদ্ধার মত বিজিত দেশটা বিজয়ীর হাঁটুর নিচে বসে কাঁপছে। ভীতি-বিহ্বল, অনাহার-ক্লিষ্ট, নৈরাশ্য-জর্জরিত প্যারিস থেকে ট্রেন চলা সুরু হল। গ্রাম এবং গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ধীর গতিতে সেগুলি নতুন সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলির দিকে এগোতে লাগল্। প্রথম অভিযাত্রী দল জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইল ধ্বংসপ্রায় দেশ আর পোড়া গ্রামগুলির দিকে। প্রতিটি ঘরের দরজায় তামার পেরেক দিয়ে আঁটা কালো-কালো শিরস্ত্রাণ পরে প্রাশিয়ান সৈন্যরা চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আরাম করে পইপ টানছে। কেউ বা গল্প করছে। কেউ বা অপরকে কাজে সাহায্য করছে। দেখলে মনে হবে তারা যেন সব একই সংসারের মানুষ। রেল লইনের পাশে প্রতিটি শহরে ফাঁকা জায়গার ওপরে আঞ্চলিক বাহিনীর সমস্ত সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে; মাঝে-মাঝে চাকার ঘড়ঘড়ানি ছাপিয়ে অধিনায়কদের মোটা গলার নির্দেশ শোনা যাচ্ছে।

যতদিন প্যারিস অবরুদ্ধ ছিল ততদিন মঁসিয়ে ডুবে জাতীয় রক্ষী-বাহিনীতে কাজ করছিলেন। জার্মান আক্রমণের আগে স্ত্রী এবং মেয়েকে বুদ্ধি করেই তিনি সুজারল্যাণ্ড-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তিনি সেইখানেই ফিরে যাচ্ছিলেন। অনাহার বা কষ্ট কোন কিছুই এই ধনী শান্তিপ্রিয় ব্যবসাদারটির দেহ কৃশ করতে পারেনি। নিরাশ সহনশীলতার সঙ্গে মানুষের বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি করে সেই ভয়াবহ দুঃখের দিনগুলি তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি গড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্তব্য করেছিলেন এবং অনেক জমাট-বাঁধা শীতের রাত্রিতে ঘোড়ায় চেপে পাহারা দিয়েছিলেন তবু এখনই, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যখন তিনি হাল্কা মনে সুইজারল্যাণ্ড-এর দিকে যাত্রা করছেন, প্রাশিয়ানদের দিকে প্রথম তাকিয়ে দেখলেন। ভয় আর বিতৃষ্ণার সঙ্গে তিনি এই সব সশস্ত্র দাড়িওয়ালা বিদেশীদের দেখলেন যারা ফ্রান্সের মাটিতে নিজেদের দেশের মত অবাধে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অসহায় দেশাত্মবোধের একটা জ্বালা দপ্-দপ্ করে উঠল। কিন্তু তিনি তা বাইরে প্রকাশ করলেন না। যে প্রবৃত্তিটাকে আমরা কোনদিনই পরিত্যাগ করতে পারিনি, তিনিও সেই নতুন পরিবেশে উচ্ছ্বাস দমন করে ব্যবহারিক বুদ্ধিরই পরিচয় দিলেন।

সেই কামরাতে তাঁরই মত গাট্টাগোট্টা দুজন ইংরাজ উঠেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন বেড়াতে; সব কিছুই বেশ শান্তভাবে আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন। নিজেদের ভাষাতেই তাঁরা কথা বলছিলেন; মাঝে-মাঝে 'গাইড-বই'-এর পাতা খুলে দেখছিলেন; কখনও-কখনও জোরে-জোরে পড়ে বিশেষ-বিশেষ জায়গার তথ্যগুলি মিলিয়ে নিচ্ছিলেন।

একটি ছোট শহরের স্টেশনে এসে গাড়ীটা থামলো। একজন প্রাশিয়ান অফিসার তরোয়ালের থাপ নাচাতে-নাচাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কামরার মধ্যে ঢুকলেন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ে তাঁর আঁটসাঁট মিলিটারি পোশাক, লাল ঝাঁকড়া দাড়ি সোজা চোখের পাশ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। অল্প ঘন রঙের গোঁফটি নাকের নিচ দিয়ে সোজা মুখটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে মুখের দুপাশে ঝুলছে। চরিতার্থ কৌতূহলের হাসি হেসে ইংরাজ দুজন তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে সুরু করে দিলেন; আর মঁসিয়ে দুবে মনযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার ভান করলেন। পুলিশের মুখোমুখী এসে পড়লে চোর যেমন করে নিজেকে গুটিয়ে নেয় মঁসিয়ে দুবেও তেমনি কামরার একটি কোণ বেছে নিলেন। ট্রেন চলতে সুরু করল। যুদ্ধের আসল স্থানটা কোথায় ছিল তাই জানার চেষ্টায় ইংরাজ দুটি আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা সুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দূরের একটি গ্রামের দিকে লক্ষ্য করে কিছু বলার চেষ্টা করলে, প্রাশিয়ান অফিসারটি তাঁর দুটি পা লম্বা করে বিছিয়ে এবং পেছনের দিকে শরীরটা হেলিয়ে দিয়ে টিউটনিক ফরাসী ভাষায় বললেন: ওই গ্রামে কুড়িটা ফরাসীকে আমি মেরেছি; আর বন্দী করে এনেছি একশ জনেরও বেশী।

অতি উৎসাহে একজন ইংরাজ বলে উঠলেন: ও, তাই বুঝি? তা গ্রামটার নাম কী?

প্রাশিয়ান অফিসার বললেন: পার্শবার্জ। ওই সব রাসকেল ফরাসীগুলোর কান ধরে যখন হিড়হিড় করে টেনে আনছিলাম তখন আমাকে দেখলে আপনারা খুশীই হতেন।

সেই শ্মশ্রু আচ্ছাদিত মুখের ওপরে উদ্ধত হাসি ফুটিয়ে অফিসারটি মঁসিয়ে দুবের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

শত্রু অধিকৃত গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ট্রেন গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। প্রতিটি রাস্তার ওপরে, প্রতিটি মাঠে, প্রতিটি স্টেশনে এবং কাফের বাইরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জার্মান সৈন্যদের গল্প-গুজব করতে করতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। আফ্রিকার পঙ্গপালের মত গোটা ফ্রান্সকেই তারা যেন ছেয়ে ফেলেছে।

প্রাশিয়ান অফিসারটি তাঁর একটি হাত প্রসারিত করে বললেন: যুদ্ধ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব যদি আমার ওপরে থাকত আমি তাহলে সমস্ত ফরাসী দেশটাকেই অধিকার করে ফেলতাম; দেশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে

দিতাম ; সেই সঙ্গে মেরে ফেলতাম নর-নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলকে। ফ্রান্স বলে কোন দেশ আর থাকত না।

নিস্পৃহ ভদ্রতার সঙ্গে ইংরাজ দুটি মন্তব্য করলেন : ও, তা বটে, তা বটে।

অফিসারটি বলে চললেন : আগামী ২০ বছরের মধ্যে সারা য়েরোপ আমাদের কবলস্থ হবে। য়েরোপের সমস্ত দেশের চেয়ে প্রাশিয়া অনেক বেশী শক্তিশালী।

ইংরাজ দুটি চনমন করে উঠলেন ; কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। তাঁদের মুখের ওপর থেকে সমস্ত প্রকাশভঙ্গিমা নষ্ট হয়ে গেল। সরু মুইমান গোঁফের মধ্যে তাঁদের মুখগুলিকে মোমের মুখোশ বলে মনে হল। প্রাশিয়ান অফিসারটি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। গদীর ওপরে হেলে দুলে তিনি নানা রকম বিদ্রূপবাণ ছাড়তে লাগলেন। হীনবীর্য ফ্রান্সকে লক্ষ্য করে তিনি টিটকিরি দিলেন, পরাজিত ভূলুণ্ঠিত শত্রুর প্রতি কটূক্তি করলেন। আগের যুদ্ধে পরাজিত অষ্ট্রীয়াকে লক্ষ্য করে নাক সিটকোলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ঘাঁটিগুলি মরণপণ করে যে সব ব্যর্থপ্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদের সৈন্যবহর আর অকেজো সামরিক বাহিনীকে ঠাট্টা করলেন। পরাজিত দেশের কামান সংগ্রহ করে বিসমার্ক যে লৌহ নগরী গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে কথা বলতেও ছাড়লেন না তিনি। তার পরেই মঁসিয়ে দুবের উরুতে সজোরে বুটের গুঁতো মারলেন। মঁসিয়ে দুবের চোখ-কান লাল হয়ে গেল ; তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মনে হল, কাছাকাছি কী ঘটছে ইংরাজ দুটির সেদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। মনে হল, বাইরের জগতের হট্টগোল থেকে অনেক দূরে নিজেদের দেশের মধ্যে আবার তাঁরা নিজেদের একান্তে সরিয়ে ফেলেছেন।

অফিসারটি পাইপ বার করে ফরাসী লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কাছে কোন তামাক রয়েছে ?

মঁসিয়ে দুবে বললেন : না, স্যার।

তোমাকে তাহলে একটু কষ্ট দেব। পরের স্টেশনে নেমে আমার জন্যে কিছু তামাক কিনে আনবে।

তারপরে অট্টহাসি হেসে তিনি আর একটু যোগ করলেন : আমি অবশ্য তোমাকে বকশিস দেব।

হুইশীল বাজিয়ে গতি দিল ট্রেনটা। স্টেশনের কিছু আধপোড়া বাড়ি ছাড়িয়ে গাড়ীটা থামলো। কামরার দরজা খুলে ফরাসী লোকটির হাত ধরে টেনে অফিসার বললেন : যা বলছি তাড়াতাড়ি কর।

এই স্টেশনটি অবরোধ করে ছিল একদল প্রাশিয়ান সৈন্য। আরও কিছু সেনানী কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অলসভাবে তাকিয়ে ছিল। ট্রেনটা ছাড়ার আগে এঞ্জিনটি হুইশীল বাজাল। মঁসিয়ে দুবে তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মের ওপরে

ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং স্টেশন মাস্টারের হাত নেড়ে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি পরের কামরাটিতে লাফিয়ে উঠে গেলেন। সেই কামরায় দ্বিতীয় কোন যাত্রী ছিল না। তাঁর বুক এত জোরে ধড়ফড় করছিল যে তিনি ওপরের কোটের বোতামগুলি খুলে দিতে বাধ্য হলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। একটু পরেই ট্রেনটি পরের স্টেশনে থামলো। সঙ্গে-সঙ্গে প্রাশিয়ান অফিসারটি কামরার দরজায় এসে হাজির হলেন, তারপর সোজা উঠে এলেন ভেতরে। কৌতুহলী হয়ে ইংরাজ দুটিও তাঁর পিছু পিছু কামরায় এসে ঢুকলেন। মঁসিয়ে দুবের মুখোমুখী বসলেন প্রাশিয়াস অফিসার। তখনও হাসছিলেন তিনি।

তাহলে, আমার নির্দেশমত কাজ করতে তুমি রাজী নও?

মঁসিয়ে দুবে উত্তর দিলেন: আপনার অনুমান সত্যি স্যার।

ট্রেন চলতে স্বরু করল।

বেশ, তাহলে আমার পাইপ ভর্তি করার জন্যে তোমার গোঁফ জোড়া কাটতে হবে আমাকে।

এই বলেই তিনি মঁসিয়ে দুবের মুখের দিকে তাঁর একটি হাত বাড়ালেন। চিরাচরিত উদাসীনতার সঙ্গে ইংরাজ দুটি উভয়ের ক্রিয়াকলাপ নিরুত্তাপ দৃষ্টি দিয়েই লক্ষ্য করতে লাগলেন। জার্মান অফিসারটি মঁসিয়ে দুবের গোঁফজোড়া মুঠো করে ধরে টানতে লাগলেন। মঁসিয়ে দুবে তার হাতের পেছন দিয়ে জার্মান অফিসারের হাতে সজোরে ঘা দিলেন; এবং তাঁর জামার কলার ধরে তাঁকে তাঁর বসার জায়গায় ঠেলে দিলেন। রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন মঁসিয়ে দুবে। কপালের শিরাগুলি তাঁর দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। লাল হয়ে উঠল তাঁর চোখদুটি, এক হাতে শত্রুর গলা টিপে ধরে আর এক হাত দিয়ে তাঁর মুখের ওপরে নির্মমভাবে ঘুষির পর ঘুষি মারতে লাগলেন। প্রাশিয়ান অফিসারও ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে ছাড়লেন না। শত্রুকে ঘায়েল করার জন্যে কোষ থেকে তরোয়ালটিও টেনে বার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না; কারণ মঁসিয়ে দুবে তখন তাঁর ঘাড়ের ওপরে বসে স্থুল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর উত্থানশক্তি রহিত করে দিয়েছেন। কোনরকম বিরতি না দিয়েই মঁসিয়ে দুবে মরীয়া হয়ে ঘুষির পর ঘুষি মারতে লাগলেন। সেই ঘুষিগুলি কোথায় গিয়ে পড়ছিল সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। স্রোতের মত রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হওয়ার ফলে জার্মান অফিসারটি যন্ত্রণায় গোঙাতে স্বরু করলেন, ভাঙা দাঁতের টুকরোগুলিকে মুখ থেকে বার করে দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি রাগে উন্মত্ত প্রহাররত মোটা লোকটিকে সরাতে পারছিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করার জন্যে ইংরেজরা তাঁদের স্থান পরিবর্তন করলেন। আনন্দ আর উত্তেজনায় তাঁরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখতে লাগলেন। দেখে মনে হল, ওই দুটি যুদ্ধমান

মানুষের মধ্যে কে হারে কে জেতে এই নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতে প্রস্তুত। কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মঁসিয়ে দুবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন; তার পর দ্বিতীয় কোন কথা না বলে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর নিজের জায়গায়।

প্রাশিয়ান অফিসারটি এতই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, যন্ত্রনা আর আক্রমণের তীব্রতায় এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে শত্রুকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার মত কোন ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পরে তিনি চীৎকার করে বললেন: আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। যুদ্ধ হবে পিস্তল নিয়ে। যদি তুমি যুদ্ধ করতে রাজি না হও তাহলে তোমাকে আমি সেই-খানেই হত্যা করব।

মঁসিয়ে উত্তর দিলেন: যখন তুমি লড়তে চাও তখনই আমি লড়ব।

জার্মান অফিসারটি বললেন: আমরা এখন স্ট্র্যাসবার্জে। আমার সহকারী হিসাবে দুজনে সমগোত্রীয় অফিসারকে আমি সংগ্রহ করব। ট্রেন ছাড়ার আগে যথেষ্ট সময় পাব আমরা।

চলন্ত গাড়ীর মত গরগর করতে করতে দুটি ইংরাজ সন্তানের দিকে তাকিয়ে মঁসিয়ে দুবে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা আমার সহকারী হবেন?

তাঁরা একসঙ্গে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, নিশ্চয়।

ট্রেন থামল। মুহূর্তের মধ্যে প্রাশিয়ানটি দুজন অফিসার ডেকে নিয়ে এলেন, তারা দুটি পিস্তল দিল; এবং দলটি রেলিংএর দিকে এগিয়ে গেল। পাছে ট্রেন ছেড়ে যায় এই ভয়ে ইংরাজ সন্তান দুটি বার বার তাঁদের ঘড়ি দেখতে লাগলেন। প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপে অযথা সময় নষ্ট না করে আসল কাজটা তাড়াতাড়ি সুরু করার জন্যে তাঁরা বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলেন। মঁসিয়ে দুবে এর আগে কোনদিন পিস্তল হাতে ধরেননি। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে কুড়ি পা-এর মত দূরে তাঁকে দাঁড় করানো হল।

একজন সহকারী জিজ্ঞাসা করলেন: প্রস্তুত?

তিনি যে প্রস্তুত সে কথা জানানোর সময় মঁসিয়ে দুবে লক্ষ্য করলেন রোদ থেকে বাঁচার জন্যে একটি ইংরাজ ছাতা খুলেছেন।

হঠাৎ চীৎকার হল: গুলি কর।

কোন রকম লক্ষ্য না করেই মঁসিয়ে দুবে পিস্তলের চাবিটি টিপে দিলেন। এবং অবাক হয়ে তিনি দেখলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তার পর ওপর দিকে হাত মেলে দিয়ে পাক খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন। একটি মাত্র গুলিতেই তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেছেন।

দুজনের ভেতরে একটি ইংরাজ সন্তান পরম উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—সাবাস! তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে; স্বরের মধ্যে একটা সহানুভূতির অধৈর্যভাব ফুটে বেরোল। তাঁর সঙ্গীটি তখনও হাতে ঘড়িটি নিয়ে

দাঁড়িয়ে ছিলেন। মঁসিয়ে ডুবের একটা হাত ধরে টানতে টানতে তিনি প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে গাড়ীটির দিকে ছুটতে লাগলেন। আর তাঁর বন্ধুটি দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁদের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে মিলিটারি কায়দায় আওড়াতে লাগলেন: এই দুই, এক দুই।

যৌথ অভিযানের কথা ভুলে গিয়ে ওই তিনজন যখন লাইন ধরে ঘোড়ার মত ছুটছিলেন তখন হাসির কাগজে আঁকা তিনটি ভাঁড়ের মত মনে হচ্ছিল তাঁদের। ট্রেনটি সবে মাত্র চলতে সুরু করেছে এমন সময় তাঁরা লাফ দিয়ে গাড়ীর ওপরে উঠে পড়লেন। ইংরাজ সন্তান দুটি মাথা থেকে তাঁদের বেড়ানোর টুপিগুলি খুলে ফেলে বাতাসে দোলাতে-দোলাতে প্রাণখোলা অভিনন্দন জানালেন। তারপর বেশ গম্ভীরভাবেই তাঁরা মঁসিয়ে ডুবের করমর্দন করে কামরার একটি কোণে আশ্রয় নিলেন।

ছাতা

(Umbrella)

মানুষ হিসাবে মাদাম ওরিলি মিতব্যয়ী। একটি পয়সার দাম কত তা তিনি জানতেন; এবং যে সমস্ত কষ্টকর নীতি মেনে চললে টাকা বাড়ানো যায় সেই নীতিগুলি সাংসারিক জীবনে মেনে চলতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। পাই-পয়সার হিসাব মেলানো তাঁর পরিচারিকার পক্ষে যেমন কষ্টকর ছিল, তেমনি স্ত্রীর কাছ থেকে দৈনন্দিন হাত-খরচা আদায় করাও মঁসিয়ে ওরিলির পক্ষে ছিল ছিল নিতান্ত কষ্টদায়ক। যদিও এই সন্তানহীন দম্পতির সাংসারিক অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছলই ছিল তবুও চকচকে রূপোর টাকা হাত ছাড়া করতে মাদামের মন যন্ত্রণা আর দুঃখে টনটন করে উঠত। টাকা খরচ করার সময় মনে হোত তাঁর যেন এক একটি বুকের পাঁজরা খসে যাচ্ছে; এবং যেদিনই তাঁকে বেশকিছু টাকা বাধ্য হয়ে খরচ করতে হোত সেদিন রাত্রিতে একটুও ঘুমোতে পারতেন না তিনি।

মঁসিয়ে ওরিলি বার বার অনুযোগ করতেন: মাঝে মাঝে বাইরে আমাদের লাঞ্চ খাওয়া উচিত। আমাদের যা রোজগার সেই মত আমাদের চালচলন নয়।

অতি প্রত্যাশিত জবাব আসে মাদামের: সাবধানে থাকা অনেক ভাল। ভবিষ্যতে কী ঘটবে কে বলতে পারে?

ছোটখাট ভদ্রমহিলা মাদাম। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরিচ্ছন্ন আঁটসাঁট চেহারা, কুঞ্চিত কপাল; হঠাৎ চটে ওঠেন। তাঁর স্বামীর ওপরে কৃচ্ছ্রসাধনার যে বোঝা তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন তার জন্যে ভদ্রলোক দিনরাত

গজগজ করেন ; বিশেষ করে কোন পার্টিতে যাওয়ার সময় তিনি নিতান্ত অপমানিত বোধ করতেন।

প্রতিরক্ষা দপ্তরে তিনি চাকরি করতেন হেড ক্লার্কের। স্ত্রীর ইচ্ছাবশতই তিনি এই চাকরি নিয়েছিলেন। এমনিতেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অর্থ তাঁদের ছিল। এই চাকরির ফলে আরও বেশী টাকা ঘরে আসতে লাগল। গত দুবছর তালি-মারা ছাতা নিয়ে তিনি অফিসে এসেছিলেন। অফিসের বন্ধুদের কাছে এই ছাতা একটি নিয়মিত ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই রসিকতা এত তীব্র হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি ; এবং একটি নতুন ছাতা কেনার জন্যে মাদামকে বার বার তিনি অনু-রোধ করেছিলেন। মাদাম ছাতা কেনার জন্যে শেষ পর্যন্ত সাড়ে আট ফ্রাঁ খরচ করেছিলেন। বড়-বড় দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্যে যেসব ছাতা সস্তা দরে বিক্রী হয় এটি সেই জিনিস। সারা প্যারিস শহর জুড়ে এই রকম হাজার-হাজার ছাতা ছড়ানো রয়েছে। ছাতাটিকে চিনতে পেরেই অন্যান্য কেরাণীরা এত জোরে হাসতে সুরু করল যে ওরিলির বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ছাতাটা কিনে মাদাম ঠকেছিলেন ; কারণ, অফিসের সকলের হাসির খোরাক যুগিয়ে তিন মাসের মধ্যেই সেটি ঝরঝরে হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি ছাতাটা নিয়ে একটা গানও লেখা হয়েছিল। একতলা থেকে চিলে কোঠা পর্যন্ত সারা অফিস জুড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই গান শোনা যেত। রাগে গরগর করতে-করতে সবচেয়ে দামী সিল্কের একটা ছাতা কেনার জন্যে ওরিলি তাঁর স্ত্রীকে কুড়ি ফ্রাঁ খরচ করার নির্দেশ দিলেন ; আর সত্যিই যে কুড়ি ফ্রাঁ খরচ করা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্যে ক্যাশ মেমোটা তাঁকে দেখাতে বললেন। অনেক দর-কষাকষির পরে মাদাম আঠারো ফ্রাঁ খরচ করতে রাজী করালেন স্বামীকে, এবং ক্ষোভ দুঃখে অভিভূত হয়ে টাকাটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

বেশ রাগত স্বরেই তিনি বললেন : ঠিক আছে ; কিন্তু ওই ছাতায় পাঁচটি বছর কাটাতে হবে—তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।

ছাতার সত্বাধিকারী বিজয়োল্লাসে ছাতাটি নিয়ে অফিসে হাজির হলেন ; সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুদের কাছ থেকে বিপুল অভিনন্দন লাভ করলেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অফিস থেকে যখন তিনি বাড়িতে ফিরলেন তাঁর স্ত্রী ছাতাটির দিকে অস্বস্তির ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

মাদাম বললেন : রবারের চাকতিটা ছাতার মুখে এঁটে দেওয়াটা উচিৎ হয়নি তোমার। ওতেই সিল্ক কেটে যায়। খুব সাবধান। হাঁই পাই করে আর কোন ছাতা আমি তোমাকে কিনে দিচ্ছি নে।

মাদাম স্বামীর কাছ থেকে ছাতাটি নিয়ে বোতামগুলি খুলে পাটগুলিকে ঝেড়ে নিলেন। তার পরে ভয়ে জমাট বেঁধে গিয়ে তিনি ছাতাটির দিকে

তাকিয়ে রইলেন। ছাতাটির ঠিক মাঝখানে গোল একটা ছেঁদা ; ফার্দিউ-এর মত। সম্ভবত পোড়া সিগারেটের টুকরো ওই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে মাদাম বললেন : দেখ, কী হয়েছে।

মুখ না তুলে খুব শান্তভাবেই স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন : কী হল আবার বলছ কী?

ঘৃণা আর বিরক্তিতে মাদামের স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

তিনি তোতলাতে-তোতলাতে বললেন : তুমি···তুমি···তুমি ছাতা নিয়ে গেলে···নতুন ছাতা···আর ফিরলে সেই ছাতা পুড়িয়ে। তুমি পাগল! আমাদের পথে বসাবে নাকি?

ওরিলির মনে হল তাঁর গণ্ডদেশ থেকে সব রক্ত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি : কী বললে?

আমি বলছি নতুন ছাতাটাকে তুমি পুড়িয়েছ। তাকিয়ে দেখ।

এই বলে যেন মারতে গিয়েছেন এইভাবে মাদাম তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বেশ জোর করেই সেই গোলাকার ছিদ্রটি ওরিলির নাকের সামনে তুলে ধরলেন। আতঙ্কে উঠে তিনি ছিদ্রটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

ওরিলি আমতা-আমতা করে বললেন : কী করে এ-জিনিস ঘটলো বলত! আমি তো এর কিছুই জানি নে। আর দিব্যি করে বলতে পারি এ কাজ আমার নয়। আমি বুঝতেই পারছি নে কী করে ছাতাটা পুড়লো।

মাদাম রেগে বললেন : আমি জানি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি অফিসে গিয়ে সকলের কাছে ছাতাটা খুলে বোকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলে তুমি।

অবশ্য ছাতাটা কেমন সুন্দর তা-ই দেখানোর জন্যে একবার মাত্র আমি খুলেছিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার—এ ছাড়া আর কিছু করিনি আমি।

রাগে পা ঠুকতে-ঠুকতে মাদাম তাঁর সঙ্গে এমন একটা ব্যবহার করলেন যে-ব্যবহার শান্তিপ্রিয় পুরুষ-মানুষের কাছে বিবাহিত জীবনটা বুলেটের আঘাতে জর্জরিত যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। পুরানো ছাতা থেকে কিছুটা সিল্কের সুতো ছিঁড়ে মাদাম নতুন ফুটোটাকে রিপু করলেন ; কিন্তু দুটো রঙের মিল খেল না। পরের দিন সকালে মার্জিত চেহারা নিয়ে ওরিলি তাপ্পিমারা ছাতাটি মাথায় দিয়ে অফিসে গেলেন ; তার পরে কাবার্ডের ওপরে সেটি রেখে দিয়ে দুঃখপূর্ণ স্মৃতির মত তাঁর আধাজাগ্রত মনের বিবরে সেটির চিন্তাকে নির্বাসিত করলেন।

সন্ধ্যার সময় ওরিলি অফিস থেকে ফিরে আসা মাত্র, মাদাম ছাতাটিকে তাঁর হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে নিলেন ; এবং ছাতাটির অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্যে তিনি সেটিকে খুলে ফেললেন। যে শোচনীয় দৃশ্যটি তাঁর চোখে পড়ল তাতে তিনি ভয়ে চমকে উঠলেন। ছাতার সমস্ত খোলটাই ছোট-

ছোট গর্তে বোঝাই হয়ে গিয়েছে; মনে হলো আগুনে পোড়ার দাগ। দেখলেই মনে হবে যেন কেউ বা কারা পাইপ থেকে জ্বলন্ত ছাইগুলিকে সিল্কের সমস্ত খোলটার উপরে ছিটিয়ে দিয়েছে। ছাতাটির একেবারে বারোটা বেজে গিয়েছে—রিপু করার মত সুযোগও নেই এতটুকু। রাগে বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে মাদাম ছাতাটির দিকে চেয়ে রইলেন; একটা ভয় আর আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে মঁসিয়ে ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে তাই সরজমীন করতে লাগলেন। দুজনের চোখাচোখী হল। তার পরে ওরিলি চোখ নিচু করলেন। ছাতার সেই ধ্বংসাবশেষটিকে তাঁর মুখের ওপরে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন মাদাম।

রাগের দাপটে বাক্‌শক্তি ফিরে এল মাদামের। তিনি আর্তনাদ করে বললেন: পালের গোদা তুমি নিজে। ইচ্ছে করেই তুমি এ কাজ করেছ। কিন্তু আমিও তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব। আর কখনও ছাতা পাবে না তুমি।

নতুন করে সুরু হল মল্লযুদ্ধ। ঘণ্টা খানেক ধরে তুলকালাম কাণ্ড চলল। তার পরে ওরিলি তাঁর বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলেন। তিনি দিব্যি করেই বললেন ব্যাপারটা কী করে ঘটল তার বিন্দুবিসর্গ তিনি জানেন না। কেউ হয়ত হিংসে করে অথবা প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় এ কাজ করেছে।

এমন সময় বাইরের দরজায় কলিঙ বেল বেজে উঠল। একটানা ঝগড়ার পরে যতি পড়ল, আগন্তুক একটি বন্ধু; এ-বাড়িতে ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর। মাদাম সমস্ত ঘটনাটা তাঁর কাছে খুলে বললেন। সেই সঙ্গে তিনি এটাও ঘোষণা করে দিলেন যে নতুন ছাতা কেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না; অর্থাৎ তাঁর স্বামীকে আর একটা নতুন ছাতা তিনি কিছুতেই কিনে দেবেন না।

অতিথি বেশ বিজ্ঞভাবেই আপত্তি জানিয়ে বললেন: মাদাম, তাহলে কিন্তু মঁসিয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ নষ্ট হয়ে যাবে; ফলে, ব্যাপারটা আপনার কাছে আরও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

তখনও রাগে টগবগ করে ফুটছিলেন মাঁদাম। অতিথির আপত্তি শুনে তিনি বললেন: ঠিক আছে, ছাতা ওকে একটা আমি আবার কিনে দেব; তবে চাকর-বাকররা যে সব ছাতা ব্যবহার করে সেই রকম একটা। সিল্কের ছাতা আর কখনও নয়।

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন মঁসিয়ে ওরিলি।

তাই যদি করতে চাও তাহলে প্রথমেই আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি চাকরিতে ইস্তফা দেব। একটা চাকরের ছাতা মাথায় দিয়ে কিছুতেই আমি অফিসে যেতে পারব না।

প্রস্তাব এল অতিথির কাছ থেকে: তার চেয়ে কাপড়টাকে পাল্টে নিন না; ওতে আপনার খরচ বেশী পড়বে না।

মাদাম ওরিলি তীক্ষ্ণভাবে বললেন: আরও আট ফ্রাঁ যাবে। আট আর আঠারো—দাঁড়াল ছাব্বিশ ফ্রাঁ। একটা ছাতার পিছনে ছাব্বিশ ফ্রাঁ খরচ। কী ভয়ানক কাণ্ড! এ নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

বন্ধুটি ছিলেন দরিদ্র; তাঁর মগজে একটি উর্বর পরিকল্পনা খেলে গেল।

বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে নিন। কোন জিনিসপত্র পুড়ে গেলে তারা সব সময় ক্ষতিপূরণ দেয়, অবশ্য দুর্ঘটনাটা আপনার নিজের ঘরে ঘটা চাই।

প্রস্তাবটি ম্যাজিকের মত কাজ করল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মাদাম স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন: কাল অফিসে যাওয়ার পথে মেটারনেল-এ এই ছাতাটি নিয়ে যাবে, ছাতাটির যা ক্ষতি হয়েছে তা দেখাবে; তার পরে ক্ষতিপূরণের দাবি করবে।

লাফ দিয়ে উঠলেন মঁসিয়ে ওরিলি।

ও-কাজ কক্ষণো আমি করতে পারব না। মাত্র আঠারোটা ফ্রাঁ-র ব্যাপার, ও গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে না।

কপাল ভাল। পরের দিনটা বেশ ভালই ছিল। মঁসিয়ে ওরিলি ছড়ি নিয়ে অফিসে গেলেন।

সারাটা দিন বাড়িতে একা-একা বসে মাদাম ওরিলি ভাবতে লাগলেন। আঠারোটা ফ্রাঁর দুঃখ কিছুতেই তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। খাবার ঘরের টেবিলের ওপরে ছাতাটি পড়ে ছিল, বার বার তিনি সেইখানে ঘুরতে লাগলেন। কী করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু আদায় করার চিন্তাটা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল; তবু অফিসের কেরাণীরা যে তাঁদের লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের হাসি হাসবে সে-ভয়টাও তাঁর কম ছিল না, সমাজে ভীরু প্রকৃতির মহিলা হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন; এবং অতি তুচ্ছ ঘটনাতেও তিনি কেমন যেন মিইয়ে যেতেন। অপরিচিতদের সঙ্গে তিনি বেশ খোলা মনে কথা বলতে পারতেন না। তবু আঠারোটা ফ্রাঁ হারানোর দুঃখটা কাটা ঘা-এর মত তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। চিন্তাটিকে মন থেকে মুছে ফেলার জন্যে বৃথাই তিনি চেষ্টা করলেন; ক্ষতিটা কাঁটার মত তাঁকে অনবরত বিঁধছিল। এর প্রতিকার কী? কী করবেন তিনি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, তবু মনস্থির করতে পারলেন না। একজন কাপুরুষ যেমন মরীয়া হয়ে সাহস করে, তেমনিভাবে হঠাৎ তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেললেন।

যাই; দেখি কী হয়।

প্রথমে অবশ্য ছাতাটিকে ঠিক করতে হবে; অর্থাৎ এমন এমন কাজ করতে হবে যাতে মনে হবে ক্ষতিটা অপূরণীয়! এবং সে বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত থাকবে না। সেলফ থেকে একটা দেশলাইএর বাক্স বার করলেন; তার পরে ছাতার দুটি শিকের মাঝখানে এক হাত পরিমাণ কাপড় তিনি পুড়িয়ে ফেল-

লেন। তার পরে বাকি যে সিল্কটুকু পড়েছিল সেটিকে বেশ দক্ষতার সঙ্গে জড়িয়ে রবারের জিনিসটি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। গায়ে শাল চাপিয়ে আর মাথার ওপরে টুপি চড়িয়ে তাড়াতাড়ি রু দ্য বিভোলীর দিকে চলে গেলেন। এইখানেই বীমা কোম্পানীর অফিস, যতই তিনি অফিসের কাছাকাছি আসতে লাগলেন ততই তাঁর গতি মন্থর হ'তে লাগল। কী তিনি বলবেন? কী উত্তরই বা তারা দেবে? বাড়ির দরজার ওপরে লটকানো নম্বরগুলির দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। এখনও আঠাশটি বাড়ি পেরোতে হবে তাঁকে। ভালই হল, আরও একটু চিন্তা করার সময় পাবেন তিনি। আরও ধীর গতিতে তিনি চলতে লাগলেন, হঠাৎ তিনি চমকে উঠে থেমে গেলেন। তাঁর সামনেই একটা দরজা; তার ওপরে সোনালী অক্ষরে লেখা: "লা মেতরনেল, ফায়ার ইনস্যুয়েরেন্স কোম্পানী।"

শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁচেছেন তাহলে।

মাথাটা কেমন যেন তাঁর গোলমাল হয়ে গেল। নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেললেন তিনি, একটু থামলেন। বার দুই তিনি এগিয়ে গেলেন; বার দুই এলেন পিছিয়ে। তার পরে হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন: না, কাজটা সেরেই ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভাল।

ফটক ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন মাদাম। ভেতরে ঢুকেই বুকটা তাঁর ঢিপঢিপ করতে লাগল। সেই বিরাট ঘরটির চারপাশে উঁচু কাঠের কাউণ্টার; মাঝে-মাঝে একটি-একটি ফোকর। সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে এক-একটি মাথা দেখা যাচ্ছে; তাদের দেহের বাকি অংশটুকু জাফরির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। একটি ভদ্রলোক কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাদাম তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।

আস্তে-আস্তে ভীরু কণ্ঠে মাদাম বললেন: ক্ষমা করবেন; আগুনে ঘরে সম্পত্তি নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে কার কাছে আবেদন করতে হবে বলতে পারেন?

ভদ্রলোক একটু উঁচু গলায় জবাব দিলেন:' দোতলায়, বাঁ দিকে। দুর্ঘটনা বিভাগ।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরণ দেখে মাদাম একটু হকচকিয়ে গেলেন। এক-বার মনে হল, চুলোয় যাক আঠারো ফ্রাঁ। এখান থেকে পালিয়ে যাই। তার পরেই তাঁর সাহস ফিরে এল। কোম্পানীর কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করা যায় তো মন্দ কী?

দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলেন মাদাম। ভেতর থেকে একটি স্বর তাঁকে ভেতরে ডাকলো। মাদাম ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। তিনটি ভদ্রলোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছিলেন; তাঁদের তিন জনেরই কোটের বোতাম ঘরে ফিতে জড়ানো।

তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আপনার জন্যে কী করতে পারি, মাদাম?

কী করতে যে তিনি সেখানে গিয়েছেন সে কথা বেশ স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না তিনি। একটু কোঁতিয়ে বললেন: আমি এসেছি···মানে····একটা দুর্ঘটনার সম্বন্ধে···

ভদ্রলোকটি একটি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বেশ ভদ্রভাবেই বললেন: আপনি অনুগ্রহ করে একটু বসুন। দু'এক মিনিটের মধ্যেই আমি আপনার কথা শুনছি।

যে আলোচনার সাময়িক ছেদ পড়েছিল সেটি আবার সুরু হল।

ম্যানেজার বললেন: ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের এই ব্যাপারে চারশ হাজার ফ্রাঁর বেশী দিতে কোম্পানী বাধ্য হবে না। বাড়তি এক লাখ ফ্রাঁর যে ক্ষতিপূরণ আপনারা দাবি করেছেন তা আমরা মেনে নিতে পারছি নে। তা ছাড়া, সম্পত্তির দাম কত····

অপর দুজনের মধ্যে একজন ম্যানেজারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মাঝ-খানেই বলে উঠলেন: ঠিক আছে, স্যার। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হওয়া উচিৎ তা আদালতই ঠিক করুন, আর আলোচনা করে লাভ নেই আমাদের।

ঘাড় নামিয়ে বিদায় অভ্যর্থনা জানিয়ে পাওনাদার দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সাহস থাকলে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মাদামও তাঁদের পিছু পিছু খুশী মনেই চলে আসতে পারতেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। ম্যানেজার তাঁর সামনে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা নুইয়ে বললেন: এবার আপনার কথা বলুন মাদাম।

বেশ কষ্ট করেই হাঁ করলেন মাদাম: আমি এসেছি...এটার সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি।

এই বলে যে বস্তুটি মাদাম ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন তা দেখেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। মাদামের স্খলিত আঙুলগুলি স্থিতিস্থাপক বন্ধনীটি খোলার কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে বন্ধনীটি খুলে গেল। তার পরে নাড়া দিয়ে যে ছাতার ধ্বংসাবশেষটুকু তালগোল পাকানো ছিল সেইটুকু সামনে ধরলেন তিনি।

ম্যানেজার বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন: অবস্থাটা খারাপই মনে হচ্ছে।

ছোট করে বললেন মাদাম: এটা কিনতে আমার কুড়িটা ফ্রাঁ লেগেছে।

ম্যানেজার আশ্চর্য হলেন।

বলেন কী! এত!

তাই লেগেছে। জিনিসটা ভালই ছিল। এর অবস্থাটা কী হয়েছে তা-ই আপনাকে দেখাতে এসেছি।

ম্যানেজার বললেন: সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কী করণীয় আছে তাইত আমি বুঝতে পারছি নে।

ম্যানেজারের কথা বলার ধরণ দেখে মাদাম আবার ঘাবড়িয়ে গেলেন। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে কোম্পানী কোন ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হবে কি না সেটাই অবাক হয়ে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু-কিন্তু করে মাদাম বললেন: দেখুন, ছাতাটা পুড়ে গেছে।

তার বিবৃতিটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা না করে ম্যানেজার বললেন: দেখতেই পাচ্ছি।

এর পরে মাদামের মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। হাঁ করে আর কিছু শোনার জন্যে তিনি ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পরেই তাঁর হঠাৎ মনে হল এখনও তিনি তাঁর পরিচয়টাই দেননি।

তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: আমি হচ্ছি মাদাম ওরিলি। মেটারনেল কোম্পানীতে আমাদের বীমা রয়েছে। এই বিশেষ ব্যাপারে আমি কিছু ক্ষতি-পূরণ পাওয়ার আশায় এসেছি।

পাছে ম্যানেজার তাঁর দাবি সরাসরি নাকচ করে দেন এটা আগেই অনুমান করে তিনি যোগ করলেন: এই ছাতাটাকে সারিয়ে দেওয়ার জন্যেই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

হতভম্ব হয়ে ম্যানেজার প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে বললেন: কিন্তু মাদাম, ছাতা নিয়ে তো আমাদের ব্যবসা নয়। এইজাতীয় জিনিস সারানোর কোন দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি নে।

বেঁটেখাটো মহিলাটির স্বাভাবিক যুযুৎসা ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে তখন। যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে; এবং তার জন্যে তিনি প্রস্তুত। আর তাঁর ভয় নেই।

এটা সারাতে যা খরচ লাগবে তাই আমি চাইছি। নিজেই আমি সারা-নোর ব্যবস্থা করতে পারব।

কথা শুনে ম্যানেজার ঘাবড়িয়ে গেলেন; বললেন: আসলে জিনিসটা সামান্য। এই রকম অকিঞ্চিৎকর দুর্ঘটনার জন্যে কেউ আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে আসেননি। আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে রুমাল, দস্তানা, ঝাঁটা, পরানো জুতো—এবং ওইজাতীয় ছোট-ছোট জিনিস যেগুলি বাড়িতে যে কোন মুহূর্তে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—সেগুলি নতুন করে কিনে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা নিতে পারি নে।

মনে হল, রাগে মাদামের কপোল দুটি গরম হয়ে উঠেছে।

শুনুন স্যার, গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের ঘরের চিমনিটা পড়ে গেল। সেটা সারাতে আমাদের খরচ পড়েছিল পাঁচশ ফ্রাঁ। তার জন্যে মঁসিয়ে ওরিলি কোম্পানীর কাছে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করেন নি। সেই জন্যেও এই ছাতাটার জন্যে আপনাদের কিছু দেওয়া উচিৎ।

এই পরিষ্কার আজগুবি কাহিনী শুনে ম্যানেজার মুচকি হাসি হেসে বললেন : আমি যদি বলি এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে মঁসিয়ে ওরিলি পাঁচশ ফ্রাঁর ক্ষতিপূরণের দাবি না করে এই ছাতার জন্যে পাঁচ-ছ ফ্রাঁ দাবি করছেন তাহলে আপনি কি তা অস্বীকার করতে পারবেন?

মাদাম একটু চটেই বললেন : ক্ষমা করবেন। পাঁচশ ফ্রাঁ মঁসিয়ে ওরিলি নিজের পকেট থেকে খরচ করেছেন। তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু এই আঠারোটি ফ্রাঁ গিয়েছে মাদাম ওরিলির তহবিল থেকে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ম্যানেজার বুঝতে পারলেন সারাটা দিন নষ্ট করে এই ভদ্রমহিলাকে তিনি কিছুতেই এড়াতে পারবেন না; তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটলো দয়া করে বলুন দেখি।

এতক্ষণ পরে জয়লাভের আশায় নিশ্চিত হয়ে মাদাম তাঁর গল্প সুরু করলেন : ঘটনাটা বলি শুনুন। আমাদের হল-ঘরে ব্রোঞ্জের একটা সেলফ রয়েছে। সেখানে আমরা ছড়ি আর ছাতা রাখি। সেদিন বাড়িতে ফিরে ছাতাটিকে আমি ওখানে ঝুলিয়ে রাখলাম। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি; ঠিক তারই ওপরে একটা ছোট সেলফ রয়েছে। সেখানে আমরা দেশলাই আর বাতি রেখে দিই। আমি হাত বাড়িয়ে চারটে দেশলাই কাঠি বার করলাম। প্রথমটা জলল না। দ্বিতীয়টা দপ্ করে জলে নিবে গেল। তৃতীয় কাঠিটির অবস্থাও ওই একই রকম।

রসিকতার সুরে ম্যানেজার মন্তব্য করলেন : সরকারী দেশলাই বুঝি?

ম্যানেজার যে ঠাট্টা করলেন সেটা লক্ষ্য না করেই মাদাম বললেন : সম্ভবত। যেটা আপনাকে আমি বোঝাতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে চতুর্থ কাঠি দিয়ে আমি বাতিটা জ্বালালাম। তারপরে ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। প্রায় মিনিট পনের পরে নাকে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ এসে ঢুকল। আগুনকে চিরকালই আমার বড় ভয় করে। একবার ঘরে অবশ্য আমাদের আগুন লেগেছিল; কিন্তু সেজন্য আমি দায়ী নই। যে চিমনি-দুর্ঘটনার কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি, সেই থেকে আমি সব সময় ভীষণ ভয়ে-ভয়ে থাকি। সেই ভয়ে আমি উঠে পড়লাম, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম; শিকারী কুকুর যেমনভাবে শিকারের চেষ্টায় চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায় আমিও সেদিন কী হয়েছে দেখার জন্যে ওপরে নিচে চারপাশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়ালাম। শেষ কালে আমি দেখতে পেলাম আমার ছাতাটা পুড়ছে। নিশ্চয় একটা জলন্ত দেশলাই কাঠি ছাতার ভাঁজের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। দেখতেই পাচ্ছেন এর অবস্থাটা·····

সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্যে ম্যানেজার মাথা নিচু করে স্বীকৃতি জানালেন।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে কত চান আপনি ?

টাকার অঙ্কটা মুখ ফুটে বলতে সাহস করলেন না মাদাম; চুপ করে রইলেন।

অবশেষে উদার হওয়ার চেষ্টায় তিনি বললেন: সেটা আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। আপনি এটা সারিয়ে দিন।

আমরা তা করতে পারি নে। কত হলে আপনার চলবে তা-ই আমাকে বলুন।

মানে···আমার ধারণা···থাক স্যার; আমার কথাটা শুনুন। আপনাদের ওপর দিয়ে কোন লাভ করতে চাই নে আমি। আমি যা করতে চাই সেটাই মনে হয় সব চেয়ে ভাল হবে। ছাতাটা নিয়ে আমি একটা দোকানে যাব; বেশ শক্ত সিল্কের সুতো দিয়ে সারিয়ে নেব। যা খরচ হবে দোকান থেকে সেই বিল নিয়ে আপনার কাছে পেশ করব। এ-ব্যবস্থায় আপনি রাজি ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—রাজি। তাহলে, ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। ক্যাশিয়ারের কাছে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। বিলটি তাঁকে দেখালেই তিনি আপনাকে টাকা দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার তাঁর হাতে ছোট একটি কার্ড দিলেন। কার্ডটি তিনি প্রায় ছোঁ দিয়ে টেনে নিলেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে বিড়-বিড় করে ধন্যবাদ দিতে-দিতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে ম্যানেজার তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেলেন।

এই বিজয়ের পরে মাদাম রাস্তার ওপর দিয়ে আনন্দে ছুটতে সুরু করলেন; বাইরে চাকচিক্য রয়েছে এমন একটা ছাতার দোকান খুঁজতে-খুঁজতে চললেন তিনি। শেষ পর্যন্ত একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দোকানটা বেশ দামী বলে মনে হল তাঁর। বেশ ভরসা করেই তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন, তারপরে মেজাজী স্বরে বললেন: সব চেয়ে সুন্দর সিল্ক দিয়ে এই ছাতাটা সারিয়ে দিন। আপনার দোকানের সব চেয়ে সেরা জিনিস দিয়ে কাজ করবেন। দাম যা লাগে লাগবে।

সমুদ্রে যে হারিয়ে গিয়েছে

(Lost at Sea)

মাদাম পেতাঁর কাহিনী ফিক্যাম্পের সবাই জানত। স্বামীভাগ্য যে তার ভাল ছিল না সে বিষয়ে দ্বিমত ছিল না কারও। গোলাবাড়িতে গম যেমন মড়াই হয় স্বামীটি জীবদ্দশায় তার স্ত্রীকে ঠিক তেমনিভাবে ধোলাই দিত।

মাদাম পেতাঁ কপর্দকহীনা হওয়া সত্ত্বেও, কেবল সে দেখতে ফুটফুটে ছিল

বলেই, লোকটি অনেকদিন আগে তাকে বিয়ে করেছিল। সেই সময়ে পেতাঁর নিজস্ব একটি মাছ ধরার বোট ছিল; নিজেও সে ছিল একজন উঁচুদরের নাবিক; কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে সে ছিল একটি পশু। সে প্রায়ই তখন বৃদ্ধ অবাঁর মদের দোকানে যেত; তার বরাদ্দ ছিল পাঁচ থেকে ছ গ্লাস মদ, তবে যেদিন তার জালে বেশী মাছ পড়ত, সেদিন মেজাজ শরীফ থাকলে, সেই রকমই সে বলত, মদের মাত্রা আট, দশ, কখনও-কখনও বা এগার গ্লাসে গিয়ে উঠতো। অবাঁর কৃষ্ণ-নয়না আর দেখতে সুন্দরী মেয়ের ওপরেই খদ্দেরদের দেখাশোনা করার ভার থাকত। মেয়েটির লালিত্যই খদ্দেরদের দোকানে টেনে আনতো। তার বেশী কিছু নয়; কারণ তাকে নিয়ে মুখরোচক কোন কানাঘুষা কখনও শোনা যায় নি।

প্রথম প্রথম পেতাঁ যখন এই মদের দোকানে এসে ঢুকতো, তখন এই মেয়েটিকে দেখেই সে সন্তুষ্ট থাকত। হয়ত মেয়েটির সঙ্গে ভদ্রতার সঙ্গে সামান্য একটু আলাপও করত; কিন্তু কোন সময়েই শালীনতার বাইরে সে যায় নি। প্রথম গ্লাস ব্র্যানডি পেটে পড়ার পরেই মেয়েটি তার চোখে আকর্ষণীয় হয়ে ধরা পড়তো; দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে মেয়েটির দিকে মিটমিট করে তাকাতো; তৃতীয় গ্লাস পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে বলতে চেষ্টা করত—মাদময়জেল ডেসিরী, তুমি যদি পারতে···কী পারতে সে কথা সে স্পষ্ট করে বলতে পারতো না। চতুর্থ গ্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির স্কার্ট ধরে সে টান দিত; চেষ্টা করত চুমু খেতে। দশটি গ্লাস শেষ হওয়ার পরেই অবাঁ তার মেয়েকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই তার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করত।

অবাঁর এই মদের দোকান অনেক দিনের। এবং সরকারের অনুমোদিত। তা ছাড়া ব্যবসা চালানোর ফন্দি-ফিকির সব কিছুই তার জানা ছিল। খদ্দেররা বেশী করে মদ খাক এই আশায় সে তার মেয়েকে টেবিলের চারপাশে ঘোরাত; আর ডেসিরীও এই বৃদ্ধ লোকটির কাছ থেকে কিছু ব্যবসাদারী বুদ্ধি শিখে নিয়েছিল। সব সময়েই ঠোঁট আর চোখের পাতায় একটু দুষ্টু মিষ্টি হাসি সে বুলিয়ে রাখত। মাতালের সঙ্গে রসিকতা করার সময় যৌবনের ছলা-কলা দিয়ে তাঁদের আঁকর্ষণ করতে ভুলতো না।

অবাঁর দোকানে পেতাঁ এত ঘন-ঘন যাতায়াত করত যে ডেসিরীকে সে বেশ ভাল করেই চিনে ফেলেছিল। ফলে, ঝড়োই হোক অথবা শান্তই হোক, চাঁদনি রাতই হোক, বা অন্ধকার রাতই হোক, যখন সে সমুদ্রের ওপর ভাসতে-ভাসতে জাল ফেলতো তখনও সে তারই কথা চিন্তা করত। এমন কি যখন সে হালের ওপরে হাত রেখে বোটের পেছনে চুপচাপ বসে থাকতো আর তার সঙ্গীরা হাতের ওপরে মাথা রেখে বিশ্রাম করার ভঙ্গিতে ঢুলতো তখনও সে তার কথা ভুলতে পারতো না। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে দেখত কী? সে দেখত ডেসিরী তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসছে, আর তার

কাঁধ তুলে তার গ্লাসে হলদে রঙ-এর ব্র্যানডি ঢেলে দিচ্ছে। চলে যাওয়ার সময় সে যেন বলছে, এইত তুমি চেয়েছিলে?

মনে-মনে মেয়েটির কথা সে এত চিন্তা করেছিল, আর চর্মচোক্ষে সে তাকে এতবার দেখেছিল যে তাকে বিয়ে করার জন্যে তার মনে একটা উদগ্র কামনা জেগেছিল। শেষ পর্যন্ত সে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারল না; তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে বসল।

পেতাঁর অবস্থা ভাল। নিজের একটি মাছ ধরার বোট আর জাল রয়েছে। রেটিনিউ-এর ঢালুর নিচে তার নিজস্ব একটা বাড়িও রয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ অবাঁর কিছু নেই। সুতরাং তার প্রস্তাবটি সহজেই গৃহীত হ'ল; আর একরকম বিন্দু-মাত্র দেরী না করেই বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এই জন্যে উভয় পক্ষই কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল—যদিও তার পেছনে তাদের কারণ ছিল ভিন্ন।

যাই হোক, বিয়ের তিনদিন যেতে-না-যেতেই পেতাঁর সব রোমাঞ্চ উবে গেল। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কেমন করে সে ভাবতে পেরেছিল যে ডেসিরী পৃথিবীর অন্য নারীদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র। সত্যি কথা বলতে কি সে এ-ও ভাবতে লাগল যে ওই কপর্দকহীনা মেয়েটা ব্র্যানডির জলুসে ভুলিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। নিশ্চয় ব্র্যানডি। সে বাজি রেখে বলতে পারে যে মেয়েটা তারই সুবিধের জন্যে ওই ব্র্যানডির সঙ্গে কোন ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। পনেরটা দিন ধরে সে অনবরত নিজেকে খিস্তি করেছিল। সে তার পাইপের নলটা দাঁত দিয়ে চিবিয়েছিল; সহকারী নাবিকদের গালাগালি দিয়েছিল, সাধারণভাবে যা কিছু তার সামনে পড়ত তাকেই অভিশম্পাৎ দিয়েছিল; শেষকালে জাল থেকে একটার পর একটা মাছ ছাড়ানোর সময় তাদের গায়ে থুথু ছিটিয়েছিল। তার পরে তাদের খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলার সময় জোরে জোরে খিস্তি করেছিল।

বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর ওপর সে মনের ঝাল মেটাতে লাগল। খারাপ কথা তো বললই, অকারণে কিল-ঘুষিও লাগালো, মেয়েটিকে একটি ঘৃণ্য প্রাণী হিসাবে দেখতে বিলম্ব হয় নি তার। অত্যাচারে অভ্যস্ত ছিল ডেসিরী। বাবার কাছেও মারধোর খেত সে; স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া লাঞ্ছনাকে সে বিনা-প্রতিবাদেই গ্রহণ করল। এতে আরও ক্ষেপে উঠত পেতাঁ। তার পরে একদিন রাত্রিতে পেতাঁ তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিল; এবং তার পরে তার কাছে ডেসিরীর অস্তিত্ব সত্যিকার অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ালো।

তার পরের দশটি বছর। পেতাঁর ধোলাই আর প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সে তার স্ত্রীকে যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত সেইগুলি রেটিনিউতে সাধারণ মানুষের কাছে বেশ মুখরোচক আলোচনায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

নোংরা কথা বলার একটা অদ্ভুত প্রতিভা ছিল পেতাঁর। নোংরা কথার

অভাব কোনদিনই তার হয় নি; আর সেগুলি সে বেশ চেঁচিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে বলত। এসব ব্যাপারে তার জোড়া তামাম ফিক্যাম্পে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তার নৌকোটি বন্দরের এলাকায় ঢুকছে দেখতে পেলেই, সবাই তৈরী হয়ে থাকত; জেটি থেকে নেমেই তার স্ত্রীর সাদা পোশাক দেখামাত্র সে যে নোংরা কথার তুবড়ি ছোটাবে তা সবাই জানত। নৌকোর পেছনে হালের ওপরে হাত রেখে সে পাল আর নৌকোর মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতো। হয়ত সেদিন সমুদ্রের জল উপচে পড়েছে; সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে হয়ত তার নৌকোটিকে নিরাপদে নোঙর করার অসুবিধে দেখা দিয়েছে, হয়ত এখনই জল ফুলে-ফেঁপে বন্দরের কাঁধের ওপরে তার উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে; সে-ও সেই ধাক্কায় পিছিয়ে যাবে। সেই জলের ঝাপটায় ভিজে জেটীর কাছে যেসব মহিলারা তাদের স্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতো; এবং তাদের মধ্যে থেকে অবাঁর মেয়ে এবং তার দীনতমা স্ত্রীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করত সে। এবং তাকে দেখামাত্র, উন্মত্ত বাতাস আর সেই সঙ্গে ঢেউ-এর গর্জন সত্বেও, এত জোরে সে অনর্গল গালাগালি দিতে সুরু করতো যে, মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্বেও, উপস্থিত সবাই হো-হো করে না হেসে উঠে পারত না। তীরে নৌকো ভেড়ার সময়ে ডাঙায় মাছ তুলতে-তুলতে স্থানীয় কিছু বেকার ছোকরাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের ভদ্র ব্যবহারের বোঝা [তার নিজের কথা।] খালাস করার বিশেষ একটা রীতি ছিল তার। কখনও-কখনও অপমানটা কামানের গোলার মত ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্দান্ত আকার ধারণ করত। কখনও-কখনও তা দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ব্যাপী বজ্র গর্জনের মত হোত। অসভ্য ভাষার ঘূর্ণিঝড় এতই তীব্র ছিল যে মনে হোত, ভগবান ঝড়ের সমস্ত উন্মাদনা তার ফুসফুসের মধ্যে জমিয়ে রেখেছেন। ডাঙায় নেমে যখন সে তার মুখোমুখী দাঁড়াত, তখনও সে সমান তেজে গালাগালি দিয়ে চলত। চারপাশে মেছুনী আর কৌতূহলী জনতা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তার পরে তারা বাড়ির পথ ধরতো। মেয়েটি চলত আগে আগে, পেছনে পেতাঁ—এক নাগাড়ে গালাগালি দিতে-দিতে চলেছে—মেয়েটি চলেছে কাঁদতে-কাঁদতে—চেঁচিয়ে নয় নিঃশব্দে, বাড়িতে আসার পরে একলা পেয়ে পেতাঁ বিনা কারণে তার স্ত্রীর হাতে জোর করে মোচড় দিত। ঘুষি মারার যে কোন ছুতোই তার কাছে যথেষ্ট। আর মজা হচ্ছে, একবার মার সুরু করলে—তা কারণেই হোক, বা অকারণেই হোক—সে তাড়াতাড়ি থামতে পারত না। আর সেই মারার সময় তার মুখে থু থু ছিটোতে-ছিটোতে সে যে তাকে কতটা ঘৃণা করে সেই কথাটাই বার-বার তাকে বুঝিয়ে দিত। ডেসিরীর কানে, দাবনায় একটির পর একটি ঘুষি মেরে সে চীৎকার করে বলত: তুই ভিক্ষুক, তুই কপর্দকহীনা, তুই অনাহারী, তোর জোচ্চোর বাপের নোংরা মদ আমার দাঁতে ঠেকিয়ে আমি কী ভুলই না করেছি।

হতভাগ্য ডেসিরী। একটা চিরন্তন ভীতির আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে হোত তাকে। সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকত সে—কখন কী বিপদ ঘটে—কখন যে তার ওপরে চড়-কিল-গাঁট্টার বন্যা নেমে আসবে তা সে ভাবতেই পারত না।

এইভাবে দশটি বছর কাটলো। সে এতটা নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেও সে কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যেত। তার অন্য কোন চিন্তা ছিল না—একমাত্র নিষ্ঠুর প্রহার ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারত না; তার চেহারা খারাপ হতে লাগল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল সে, শুকনো মাছের মত শুকিয়ে গেল।

(২)

পেতাঁ যথারীতি সমুদ্রে বেরিয়ে গিয়েছে। এমন সময় একদিন রাত্রিতে সমুদ্রে ঝড় উঠল, বাঁধন ছিঁড়ে কুকুর যেমন করে গর্জন করে বাতাস সেইভাবে গর্জন করতে সুরু করল। ভয়ে সে বিছানার ওপরে উঠে বসল, শব্দ কমে গেলে সে আবার বিছানার ওপরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়তে না পড়তেই আবার গর্জন সুরু হল। মনে হল যে-ঘরে রাত্রিতে আগুন জ্বালিয়ে রাখার চিমনি রয়েছে সেই ঘর থেকে গর্জনটা আসছে। সারা বাড়িটা কেঁপে উঠলো। অনতিবিলম্বে সারা আকাশটাই গর্জনে-গর্জনে ভরে গেল। মনে হল যেন একদল বন্য জানোয়ার হাঁপাতে-হাঁপাতে আর চেঁচাতে-চেঁচাতে মহাশূন্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে বন্দরের দিকে ছুটলো। অন্য মহিলারাও লণ্ঠন হাতে করে বন্দরের দিকে ছুটে আসছে; চারপাশ থেকে ছুটে আসছে মানুষ। সবাই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল; দেখল, বিরাট-বিরাট ঢেউ-এর মাথায় সাদা ফেনাগুলি অন্ধকারের ভেতরে চকচক করছে।

পনের ঘণ্টা ধরে এই ঝড় চলল, এগার জন জেলে সেদিন সমুদ্র থেকে ফিরে আসে নি। সেই নিরুদ্দিষ্ট জেলেদের মধ্যে পেতাঁ একজন। পেতাঁর নৌকোর টুকরোগুলো দিয়েপীর কাছ বরাবর আছড়ে পড়েছিল; আর তার সহকর্মীদের মৃতদেহগুলি সেণ্ট ভ্যালিরীর কাছাকাছি ভেসে এসেছিল। কিন্তু পেতাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি। মনে হয় পেতাঁর নৌকোটা দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত, কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল নৌকোটা। তাই যদি হয়, তাহলে নাবিকদের বাদ দিয়ে তাকেই অন্য কোন নৌকো হয়ত তুলে নিয়ে গিয়েছে।

নিজেকে বিধবা বলে মনে করতে মাদাম পেতাঁ ধীরে-ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাহলেও তার মনে শান্তি ছিল না। কোন প্রতিবেশী, কোন ভিখিরী অথবা কোন ফেরিওয়ালা তার ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়লে সে কেমন যেন চমকে উঠতো।

স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রায় চার বছর পরে একদিন সে রু অ জুইফস-এর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে সম্প্রতি মারা গিয়েছে এমন একজন জাহাজের কাপ্তেনের বাড়ির সামনে থামলো। মৃত কাপ্তেনের জিনিসপত্রগুলি নিলাম হচ্ছিল। সে যেতে-যেতে দেখল নীল মাথা একটি সবুজ টিয়াপাখি নিলাম হচ্ছে। পাখিটা উপস্থিত দর্শকদের বেশ সন্দেহ আর বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

নিলামওয়ালা হাঁক দিল : তিন ফ্রাঁ। পাখিটা উকিলের মত কথা বলল : তিন ফ্রাঁ!

একটি বন্ধু কনুই-এর গুঁতো দিল তাকে।

তোমার পাখিটা কেনা উচিৎ। কেনার মত পয়সা আছে তোমার। এ তোমার সঙ্গী হবে। এর দাম তিরিশ ফ্রাঁর চেয়েও বেশী। তুমি এটাকে কুড়ি অথবা পঁচিশ ফ্রাতে আবার বাজারে বিক্রি করে দিতে পারবে।

নিলামওয়ালা আবার চেঁচাতে সুরু করল : ভদ্রমহোদয়গণ, চার ফ্রাঁ... চার ফ্রাঁ...এ পাখি সন্ধ্যাবেলায় স্তব পাঠ করতে পারে, যে কোন গির্জার পাদরীর মত বক্তৃতা দিতে পারে। এ একখানা চিজ বটে, একটি আশ্চর্য জীব।

ডেসিরী দাম দিল চার ফ্রাঁ পঞ্চাশ সেনটাইম। সেই দামেই নিলামওয়ালা তাকে ছোট খাঁচা সমেত পাখিটা দিয়ে দিল। পাখিটাকে জল খাওয়ানোর জন্যে খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে, পাখিটা তার ছুঁচোল ঠোঁট দিয়ে তার আঙুলে ঠোক্কর দিয়ে রক্ত বার করে দিল।

সে বলল : পাখিটা তো বড় বদ দেখছি।

যাই হোক, খাঁচার মধ্যে কিছু পাটের দানা আর ছোলার বীজ দিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, পাখিটা একা বসে-বসে ঠোঁট দিয়ে চিরে-চিরে তার পালকগুলো গুছোতে গুছোতে নতুন বাড়ি আর নতুন মনিবকে বেশ চাতুর্যের সঙ্গে মেপে-মেপে দেখতে লাগল।

পরের দিন সবেমাত্র সকাল হয়েছে এমন সময় মাদাম পেতাঁ পরিষ্কার একটি মানুষের স্বরে শুনতে পেল—বেশ জোরালো, স্পষ্ট, আর পাক-খাওয়ানো সেই স্বর। এই স্বর আর কারও নয়—পেতার।

"মাগী, এখনও ওঠার সময় হয় নি!"

সকালে ঘুম ভেঙে ওঠা মাত্র তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এই ধরনের ইতর কথা বলার অভ্যাস তার ভূতপূর্ব স্বামীর ছিল। এর প্রতিটি কথা সে জানে। সেই সব কথা আবার শুনতে পেয়ে সে এত ভয় পেয়ে গেল যে সে কম্বলের তলায় তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিল। গুঁড়ি দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মার খাওয়ার জন্যে পিঠটা উঁচিয়ে দিয়ে সে বালিশের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিল। প্রতিটি মুহূর্তেই সে মারের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

গজ-গজ করতে লাগল মাদাম পেতাঁ : হায় ভগবান, সে ফিরে এসেছে।

স্বর্গে ভগবান, আর সে এখানে। হায় ভগবান, হায় ভগবান!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। আর কোন শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না। কাঁপতে-কাঁপতে বিছানার ভেতর থেকে মাথা তুলল সে। তার স্থির বিশ্বাস পেতাঁ ওই ঘরেই রয়েছে; তাকে লক্ষ্য করছে, তাকে পেটানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে কিছুই দেখতে পেল না। জানালার শার্সীর ভেতর দিয়ে এক ঝলক সূর্যকিরণ ঘরের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে। ওটি ছাড়া আর কিছুই নেই।

সে ভাবল: সে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সে; তারপরে একটু সাহস পেয়ে সে ভাবল: না; সে আসে নি। আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলাম।

সবেমাত্র চোখ দুটি সে বুজিয়েছে এমন সময় বজ্রের মত পেতাঁর স্বর আবার আছাড় খেয়ে পড়ল, এবারে আরও কাছ থেকে: বলি, উঠবি, না, ..

নির্মমভাবে প্রহৃতা নারীর ক্লিব বশ্যতার ধাক্কায় সে বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল। চার বছর পরে সে সেই স্বরটিকে এখনও মনে করে রেখেছে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার মনে থাকবে। আর সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলিকে মেনে নিতে কোনদিনই সে দ্বিধা করবে না।

সে উত্তর দিল: আমি এখানে পেতাঁ, কী চাই তোমার?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

হতভম্ব হয়ে সে চারপাশে তাকিয়ে রইল। তারপর সে ওয়ার্ডরোব, চিমনি, এমন কি বিছানার তলাটা পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় তন্ন-তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

শুধু যন্ত্রণাই পেল না, রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে পেতাঁর দেহহীন আত্মাটা তার আশেপাশেই রয়েছে; এবং তার ওপরে অত্যাচার করার জন্যে ফিরে এসেছে; এই ভেবে ভয়ে সে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়ল। হঠাৎ তার খড়ের গাদাটার কথা মনে পড়ে গেল। ওই খড়ের গাদার ওপরে ওঠার জন্যে বাইরে একটা মই ছিল। নিশ্চয় পেতাঁ ওই খড়ের গাদার ওপরে লুকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ অতর্কিতে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে একদল বুনো অসভ্য মানুষ তাকে অনেক দূরে কোন দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিল; এবং সেখান থেকে এর আগে সে পালিয়ে আসতে পারে নি। কিন্তু এখন সে ফিরে এসেছে; সে তার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছে, আরও বদমাইশ হয়েই সে ফিরেছে।

ওপর দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: পেতাঁ, তুমি কি ওখানে?

কেউ কোন জবাব দিল না।

তার পরে সে বাইরে বেরিয়ে এল। ভয়ে তার বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছিল। তবু সে মই বেয়ে ওপরে উঠল; গোলার জানালা খুলে দিল; কিন্তু কিছুই তার

চোখে পড়ল না, সে চিলে-কোঠার মধ্যে ঢুকল, এপাশ-ওপাশ খুঁজলো; তার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না সে। সে সেইখানে ধপাস্ করে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু সেই কান্নার মধ্যেও একটা তিক্ত অতিপ্রাকৃতিক ভীতি কাঁটার মত ক্রমাগত বিঁধতে লাগল তাকে। নিচের ঘর থেকে সে পেতাঁর স্বর শুনতে পেল। পেতাঁ কদর্য ভাষায় তাকে গালাগালি দিচ্ছে।

মনে হল পেতাঁর মেজাজ নরম হয়ে এসেছে; উত্তেজনা কিছুটা কমেছে তার। সে মন্তব্য করল: কি বিশ্রী আবহাওয়া। ঝড়ো বাতাস। বিশ্রী আবহাহাওয়া। আমার এখনও ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত হয় নি। জাহান্নামে যাক।

ওপর থেকে মাদাম পেতাঁ চেঁচিয়ে বলল: পেতাঁ আমি এখানে। আমি যাচ্ছি; তোমার স্যুপ তৈরী করে দেব। রাগ করো না। আমি আসছি।

মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল সে। ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কেউ সেখানে নেই। মনে হল, ক্লান্তিতে সে এবারে মারা যাবে। আবার তার কানের কাছে সেই স্বরটি শোনা গেল: এখনও আমার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয় নি। জাহান্নামে যাও।

ভয়ে হিম হয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্য নেওয়ার জন্যে সে প্রায় ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাবে এমন সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ওঃ, তুই।

টিয়াপাখিটা আবার মুখ খুলল; মাথাটাকে সে একবার ওপরে একবার নিচে নামিয়ে বলল: থাম…থাম…থাম। কুঁড়েমির জন্যে তোকে আমি উচিৎ শিক্ষা দেব।

একটা নতুন উত্তেজনা তাকে আচ্ছন্ন করে বসল। তার মনে হল, সে বিশ্বাস করল যে মৃত মানুষটিই আবার ফিরে এসেছে। সে নিশ্চয় ওই পাখির পালকের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আগের মত সে আবার তার ওপরে অত্যাচার করতে সুরু করবে। সারাদিন ধরে তাকে কদর্য কথা বলবে, তাকে মারবে, তাকে কামড়াবে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অপমানজনক কথা বলবে; তার সেই চেঁচানি শুনে আশপাশ থেকে লোকজন সেখানে জমায়েৎ হবে, আর তাকে দেখে উপহাসের হাসি হাসবে।

সে দৌড়ে খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল, খাঁচার দরজা খুলল; তার পরে পাখিটাকে মুঠোর মধ্যে জাপটে ধরল। আত্মরক্ষা করার জন্যে টিয়াপাখিটা তার ঠোঁট আর নখ দিয়ে তার হাতের চামড়া ছিঁড়ে দিল। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে মাদাম পেতাঁ দুটো হাতের মুঠি দিয়ে পাখিটাকে শক্ত করে ধরে রইল। সে মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়ে পাখিটাকে তার শরীরের ভার দিয়ে পিটতে লাগল। মরীয়া হয়ে পাখিটাকে সে চটকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পাখিটা একটা তালে পরিণত হল—একটি ছোট সবুজ পালকের তাল। সে

আর নড়লোও না, কথাও বলল না ; তার হাতের ওপরে ঝুলতে লাগল। তার পরে সেই মরা পাখিটাকে একটা ঝাড়নে মুড়ে শেমিজের তলায় লুকিয়ে খালি পায়ে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তীরে গিয়ে হাজির হল। এক মুঠো ঘাসের মত সেই ছোট মৃত জীবটাকে ঝাড়ন থেকে ঝেড়ে সে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করল। তার পরে সে ঘরে ফিরে এল ; সেই শূন্য খাঁচার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। যা করেছে তার জন্যে সে তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। একটা জঘন্য পাপ সে করেছে এই ভেবে কাঁদতে-কাঁদতে সে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইল।

একটি প্রতিকৃতি

(A Portrait)

আমারই সামনে একজন বন্ধুকে ডাকলো : মিলিয়েল যে!

মিলিয়েল নামধারী মানুষটিকে দেখার জন্যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আমি জানতাম মানুষটি ডন জুয়ানের মত নামজাদা। এঁর সঙ্গে পরিচয় করার আকাঙ্খা আমার অনেকদিনের।

মিলিয়েলকে তখন আর যুবক বলা চলত না। তার মাথার দীপ্তিহীন ধূসর চুলগুলি এত ঘন যে মনে হোত সুদূর উত্তরাঞ্চলের মানুষেরা যেরকম টুপী ব্যবহার করে সেইজাতীয় একটা পশমের টুপী তিনি পরে রয়েছেন। তাঁর দাড়িটি ছিল সুন্দর ঠাস বুনোনি দেওয়া। সেটি একেবারে বুকের কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছিল। দেখলে মনে হোত পশমের। তিনি তখন মৃদুস্বরে একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা বলতে-বলতে তিনি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ছিলেন ; তাঁর চাহনির ভেতর দিয়ে একটি নম্র প্রশংসার দীপ্তি আসছিল বেরিয়ে।

তাঁর জীবন ধারণের রীতিটা আমি জানতাম ; অথবা, যেটুকু সবাই জানতো সেটুকু অন্তত আমার অজানা ছিল না। অনেক মহিলা পাগলের মত তাঁর প্রেমে পড়েছেন ; তাঁকে ঘিরে এমন সব নাটক অভিনীত হয়েছে যেগুলিতে তিনিই ছিলেন নায়ক। সবাই জানতো অপরকে প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা তাঁর এত বেশী ছিল যে মানুষে তাকে প্রতিহত করতে পারত না। এই অস্বাভাবিক মোহের উৎসটা কী তার অনুসন্ধান করার চেষ্টায় তাঁর প্রশংসায় মুখরা এমন কয়েকজন মহিলার দ্বারস্থ হয়েছিলাম আমি। লক্ষ্য করলাম, স্পষ্ট কিছু বলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁরা সকলেই আমাকে ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়েছেন : তা আমি জানি নে। ওটা তাঁর মোহিনী শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে যে বিশেষ কোন সৌন্দর্য রয়েছে তেমন কথা কেউ বলে না। মহিলাদের হৃদয় জয় করতে সাধারণভাবে যে সকল মার্জিত গুণের প্রয়োজন হয় তাঁর সে-সব কিছুই ছিল না। ব্যাপারটা জানার জন্যে আমার একটা কৌতূহল জেগেছিল ; আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম কোথায় তাঁর সেই বিশেষ আকর্ষণী শক্তিটি লুকিয়ে রয়েছে। কথায়-বার্তায়, শিক্ষা-দীক্ষায় ভদ্রলোকটি কি প্রথম শ্রেণীর ? না ; তিনি যে চটকদার কথা বলতে পারেন এমন কথা তো কেউ বলে না, তাঁর বুদ্ধি যে সাধারণের বাইরে সেকথা বলতেও আমি কাউকে শুনি নি। তাঁর চোখ দুটি ? সম্ভবত। কিম্বা তাঁর স্বর ? এমন কিছু স্বর আমরা শুনেছি মানুষের ওপরে যাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। সেগুলি যেন সুন্দর মুখরোচক খাবারের গন্ধ আর নির্যাসের মত। সেই জন্যেই সেই সব কথা শোনার জন্যে মানুষে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে ; তাদের শব্দ শুনে মানুষে সব ভুলে যায়, সুস্বাদু খাবারের মত সেগুলি গিলতে থাকে।

আমার একটি বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : মঁসিয়ে মিলিয়েলকে তুমি চেন ?

চিনি।

আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ?

পরিচিত হলাম। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আলাপ করলাম। তাঁর কথা শুনতে ভালই লাগে ; পরিষ্কার। কিন্তু তিনি যে উঁচুদরের চিন্তাশীল তেমন কিছু মনে হল না। কথাটা সত্যি যে তাঁর স্বরটি বেশ মিষ্টি, নরম, দরদী আর সুরময়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী মনোমুগ্ধকর কথা আমি শুনেছি ; তাঁর কথা শুনতে ভালই লাগে—যেমন ভাল লাগে একটি মিষ্টি স্রোতের কলধ্বনি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে মানসিক শক্তিকে শক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। শ্রোতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করার মত কোন সূক্ষ্ম চাতুর্য সেখানে নেই। উল্লেখযোগ্য কোন প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে না কেউ। তাঁর কথা শুনলে বরং মন শান্ত হয়। তাঁর কথা শুনলে যেমন তীব্র বিরোধীতা বা প্রতিবাদ করার বাসনা যায় না, তেমনি মনের মধ্যে চমৎকারি কোন ভাবেরও উদ্রেক করে না। তাঁর কথা শোনাও যেমন সহজ ; সেই কথার উত্তর দেওয়াও তেমনি সহজ। তাঁর যে-কোন মন্তব্যের প্রতি মন্তব্য সহজেই করা যায় ; আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোনরকম বাধ্যবাধকতা থাকে না—তা স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে চলে।

তাঁর সঙ্গে আলাপ করে একটি জিনিসই হঠাৎ আমার মনে হল। মাত্র পনেরটি মিনিট তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে ; কিন্তু তার মধ্যেই মনে হল আমরা যেন অতিপুরাতন বন্ধু। মাত্র কয়েকটি মিনিটের সাহচর্য আমাদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছিল। তাঁর মুখ, তাঁর কথা বলার ধরণ, তাঁর স্বর, তাঁর হাবভাব যেন আমার কাছে কত পরিচিত। যদি

তিনি আমার কোন গোপন কথা শুনতে চাইতেন, যে সব গোপন কথা মানুষে তার অতি প্রিয় পুরনো বন্ধু ছাড়া আর কারও কাছেই সাধারণত বলতে চায় না, সেকথাও তাঁকে আমি বলতে পারতাম। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রহস্যজনক। প্রাণ খুলে মেশার পথে মানুষের মধ্যে কিছু-কিছু বাধা-নিষেধের প্রাচীর সব সময় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সমান রুচি, বুদ্ধিগত সাংস্কৃতিক মিলন, কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন মেলামেশার মাধ্যমেই সেই বাধাগুলি ধীরে-ধীরে অপসারিত হয়। সে রকম কোন বাধা আমাদের মধ্যে বা যে-সব নারী অথবা পুরুষ হঠাৎ তাঁর সান্নিধ্যে এসে পড়েন তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় নি। আধ ঘণ্টা পরে যখন বিদায় নেওয়ার সময় এল তখন অদূর ভবিষ্যতে আবার দুজনের মধ্যে দেখাশোনার কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা সেই কথাই আমরা ভাবছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর ঠিকানা দিলেন, এবং দুদিন পরে তাঁর সঙ্গে দুপুরের ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন।

ঠিক ক'টার সময় নিমন্ত্রণ ছিল স্মরণ না থাকায় আমি তাঁর বাসাতে একটু আগেই হাজির হলাম। তিনি তখনও ফেরেন নি। একটি অল্পভাষী কেতাবী চাকর আমাকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে এল। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং ঘরোয়া রুচি দিয়ে সাজানো। ঘরে ঢুকেই বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম। মনে হল, ওটা যেন আমার নিজেরই ঘর। আমি লক্ষ্য করেছি যে মানুষের চরিত্রে তার মানসিকতার প্রতিফলন পড়ে তার ঘরের বিশেষ-বিশেষ আসবাবপত্রে আর সেগুলি বিশেষভাবে সাজিয়ে রাখার ওপরে। কোন ঘরে বেশ আলো থাকতে পারে, এবং সেটি সোনালী আর সাদা রঙে সাজানো থাকতে পারে; তবু সে ঘরে ঢুকলেই আপনার মন-মেজাজ অবসন্ন হয়ে যাবে। আবার অন্য ঘরে অত্যন্ত সাদাসিদেভাবে সাজানো থাকলেও আপনাকে আনন্দ দেবে। এমন সব ঘর রয়েছে যেখানে ঢুকলে নিজেকে আপনার নিঃসন্দেহে বোকা-বোকা মনে হবে; আবার এমন ঘরও রয়েছে যেগুলি আপনাকে উজ্জীবিত করে তুলবে। আত্মার মত, আমাদের চোখেও কিছু ভাল লাগে, আবার কিছু খারাপ লাগে। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে তা আমরা জানি নে। সহজভাবে, অত্যন্ত গোপন এই সব প্রভাবগুলি আমাদের চিন্তা আর রুচিকে প্রভাবান্বিত করে। ঠিক যেমনভাবে অরণ্য, সমুদ্র, অথবা পাহাড়ের আব-হাওয়া আমাদের শরীর আর মনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে ঠিক তেমনিভাবেই ঘরের দেওয়াল আর আসবাবপত্রের সামঞ্জস্য, এবং অলঙ্করণের ধারা আমাদের আত্মিক চেতনাকেও প্রভাবিত করে।

সিল্কের গদীতে মোড়া একটা ডিভানের ওপরে বসলাম আমি; বসতে এত আরাম আমার লাগল যে মনে হল ওই সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া ছোট পালঙ্কের গদীটি যেন আমার দেহের মাপেই তৈরী করা হয়েছে।

তার পরেই চারপাশে আমি তাকিয়ে দেখলাম। ঘরের মধ্যে চটকদার

বলতে কোন জিনিস নেই। প্রতিটি জিনিসই সুন্দর। দাম্ভিকতার ভড়ং সেখানে নেই। আসবাবপত্র খুব সাদাসিদে, কিন্তু সুনির্বাচিত। জানালা-দরজার পর্দাগুলি দেখে মনে হল, সেগুলি কোন হারেমের ভেতর থেকে সংগৃহীত হয়েছে, লোভার থেকে নয়।

আমার মুখোমুখী একটি যুবতীর প্রতিকৃতি। ছবিটি মাঝারি ধরনের। তার মধ্যে মাথা, দেহের উপর অংশ, আর হাত দুটিই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। হাতে ধরা ছিল একখানা বই। মাথায় কোন টুপী ছিল না। সাধারণ ফিতে দিয়ে তার চুলগুলি ছিল বাঁধা। ঠোঁট দুটির ওপর একটু নরম হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল; সেই হাসির সঙ্গে মেশানো ছিল দুঃখের চিহ্ন। তার মাথাটি অনাবৃত ছিল না বলে আমি তার স্বাভাবিক দেহ-ভঙ্গিমায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম বলে ঠিক জানি নে, একথা সত্যি যে সেই বিশেষ ঘরে ছবিটি যেমন মানানসই হয়েছিল সেরকম মানানসই প্রতিকৃতি এর আগে আর আমার চোখে পড়ে নি। আজ পর্যন্ত যত মহিলার প্রতিকৃতি আমি দেখেছি তাদের সবক'টি স্পষ্টতই বিশেষ ভঙ্গিমার নিদর্শনস্বরূপ, হয় মহিলাটির পোশাক অত্যন্ত জমকালো; সেই সঙ্গে বিশেষভাবে কবরীবিন্যাস; কিংবা তিনি যে প্রথমত চিত্রকরের জন্যে এবং দ্বিতীয়ত, যারা তাঁর ছবি দেখবেন তাদের জন্য ছবি তুলছেন এরকম একটি সজাগ মনোবৃত্তি সেই প্রতিকৃতির মধ্যে বেশ ভাল-ভাবেই ফুটে ওঠে। অথবা তিনি একটি অসাবধানী স্বাচ্ছন্দ্যের মেজাজ ফুটিয়ে তোলেন, এবং পোশাকও পরেন সেই মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

কোন কোন মহিলা রয়েছেন যাঁরা মহিমময়ী ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়ান; তাঁদের সৌন্দর্যকে দম্ভসহকারে আড়ম্বরের সঙ্গে দেখিয়ে বেড়ান। জীবনের সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় জরুরী প্রয়োজনে সেই সৌন্দর্যকে বেশীক্ষণ ধরে রাখা তাঁদের পক্ষে যে কষ্টকর তা তারা জানেন। আবার কিছু মহিলা আছেন যাঁরা ইচ্ছে করেই বোকার মত ফিক-ফিক করে হাসেন, যদিও ছবির পর্দায় তাঁদের দেহরেখাগুলি নির্জীব দেখায়। এমন একটি মহিলার ছবি আমি দেখি নি যার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে আর্টিস্ট তাঁর হাতে একটি ফুল, অথবা একটি হীরা, এক টুকরো পোশাক অথবা ঠোঁটের কোণে একটু বঙ্কিম ভঙ্গিমা প্রভৃতির সাহায্যে তুচ্ছ অলঙ্করণের চেষ্টা না করেছেন। তাঁরা টুপীই পরুন, অথবা ঝাঁটার মত শক্ত ফিতে দিয়ে কবরীবিন্যাসই করুন, কিম্বা তাঁদের কবরী সুবিন্যস্ত নাই হোক, সেই সব প্রতিকৃতির মধ্যে মানুষে যা লক্ষ্য করে তা একান্তভাবে স্বাভাবিক নয়। সেটি কী? আসল জিনিসটিকে না দেখে এটি কী তা নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব। কিন্তু কৃত্রিমতাটি চেনা যায়। দেখলে মনে হবে প্রতিকৃতির মহিলাটি যেন অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; তারা তাঁকে দেখে ভাল বলবে এটাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। যেন নিজেকে তিনি সবচেয়ে সুন্দর

করে প্রকাশ করতে চান। অতি সাধারণ বা উঁচু দরের তাঁর মনোবৃত্তি এবং ভঙ্গিমা যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্টত কৃত্রিম।

কিন্তু সে প্রতিকৃতিটি যখন আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা কী? বেশ বোঝা যায় এই বিশেষ মহিলাটি তাঁর নিজের ঘরে আছেন, এবং একাকী। হ্যাঁ, একেবারে একাকী। তাঁর হাসিটি এমন এক জনের যিনি একান্ত নিরালায় বসে যুগপৎ মধুর স্বপ্ন দেখেন। এ হাসি এমন কোন মহিলার হাসি নয় যিনি সজাগ যে তিনি কোন প্রশংসামুখর দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি নিজের বাড়িতে এমন একান্তভাবে একাকিনী যে সেই বিরাট ঘরটিকে তিনি একটি নিঃসঙ্গতায় পরিণত করেছেন। তিনি একাই যেন সেই ঘরে বাস করেন, এবং একাই ঘরটিকে জনাকীর্ণ করে তুলেছেন; উদ্দীপিত করেছেন ঘরটিকে। সেই ঘরে যত ইচ্ছা পুরুষ অথবা মহিলারা ঢুকতে পারেন; তাঁরা কথা বলতে পারেন, হাসতে পারেন, এমন কি গানও করতে পারেন; কিন্তু তাঁরা কোন মতেই তাঁর নিজস্ব উপাসনাগারে প্রবেশ করতে সক্ষম নন। তবু তিনি নিঃসঙ্গতার হাসি হাসবেন; তবু প্রতিকৃতির মুখে যে হাসিটি ফুটে বেরিয়েছে সেই হাসি থেকেই সমস্ত ঘরটি তার প্রাণচাঞ্চল্য আহরণ করবে।

তাঁর ভাবদ্যোতনার মধ্যে এই রকম একটি অনির্বচনীয়তা ছিল। তাঁর চোখ দুটি স্থির এবং কমনীয় দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল; অথচ তারা আমাকে দেখছিল না। অন্য সমস্ত প্রতিকৃতি যেন বুঝতে পারে কখন মানুষে তাকে পরীক্ষা করে দেখছে; তারা চিন্তা করে, আমাদের পিছু পিছু যায়, এবং আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোন সময়েই তারা আমাদের পরিত্যাগ করে না। কিন্তু এই প্রতিকৃতির চোখ দুটি আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না; কিম্বা অন্য কাউকেই আমল দেয় না যদিও সে দুটি আমার দিকেই সোজাসুজি তাকিয়ে রয়েছে।

কথাটা সত্যি যে এই বিচিত্র চোখ দুটি—যে দুটি চোখ একদিন বেঁচে ছিল, হয়ত বা এখনও বেঁচে রয়েছে, আমাকে এমনভাবে আকর্ষণ করল যে আমি তা প্রতিরোধ করতে পারলাম না; তারা আমার মনের মধ্যে এমন একটা ভাবের উদ্রেক করল যেটা আমার কাছে নতুন, অদ্ভুত, এবং শক্তি-শালী। সেই অদ্ভুত চোখ দুটি ও গম্ভীর প্রতিকৃতির ভেতর থেকে চকচক করে চারপাশে একটি অনন্ত-মধুর আবেশের সৃষ্টি করেছে। এটি যেন একটি প্রবহমান বাতাসের নরম খসখস ধ্বনি, গোলাপী এবং নীল আকাশের নিচে শেষ গোধূলির মত এটি মনোহরণকারী; এই রকম সূর্যাস্তের পরে আসন্ন রাত্রির মত একটি কোমল দুঃখে পূর্ণ। এই চোখ দুটি—বুরুশের কয়েকটি আঁচড়েই যার সৃষ্টি হয়েছে—তাদের গভীরতার মধ্যে কোন একটি রহস্যকে লুকিয়ে রেখেছে; মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা রয়েছে, অথচ যার কোন

অস্তিত্ব নেই—এমন একটি জিনিস যে কেবল নারীর কটাক্ষেই প্রতিভাত হয়—এমন একটি জিনিস যা আমাদের সমস্ত প্রেমের উৎস।

দরজা খুলে গেল। মিলিয়েল ভেতরে ঢুকে এলেন। বিলম্ব হওয়ার জন্যে তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন; তাড়াতাড়ি আসার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম আমি। সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম: প্রতিকৃতিটি কার সেকথা জিজ্ঞাসা করাটা কী অভদ্রতা হবে?

তিনি বললেন: ওটি আমার মা-র। খুব অল্প বয়সেই তিনি মারা গিয়েছেন।

আমার বন্ধুটির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের রহস্যটা কোথায় তখনই আমি তা বুঝতে পারলাম।

বয়তেল

(Boitelle)

আশেপাশে নোংরা কাজ বলতে যা বোঝায় বৃদ্ধ আনতোয়েন বয়তেলের সে সব করার একচ্ছত্র অধিকার ছিল। হয়ত কোথাও কোন গর্ত রয়েছে, আর সেই গর্তে মলমূত্র জমেছে কিম্বা রাজ্যের ময়লা এসে কোন নর্দমা ভর্তি করে ফেলেছে—সেই সব পরিষ্কার করার জন্যে সব সময় ডাক পড়বে তার। সেই সমস্ত নোংরা গর্ত বা নালা পরিষ্কার করার জন্যে সে ঝাড়ুদারের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে; আর নিজের পেশার মুণ্ডপাত করতে-করতে কাজ করে যাবে। এরকম একটা নোংরা পেশা সে বেছে নিয়েছে কেন একথা জিজ্ঞাসা করলে সে কোন রকম উত্তেজনা না দেখিয়েই বলত: হায় ভগবান, আমার ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে হবে না? অনেক কাজের চেয়ে এই কাজে বেশী পয়সা আছে।

তার ছেলে ছিল সত্যিকারের চৌদ্দটি। তাদের খবর কী জিজ্ঞাসা করলে সে বেশ উদাসীনভাবেই বলত: আটজন বাড়িতে থাকে; একজন চাকরি করে। আর পাঁচজন বিয়ে করেছে।

তাদের বে-থা' ভাল হয়েছে কি না সে প্রশ্ন কেউ করলে সে উত্তেজিত ভাবেই বলত: আমি তাদের পথে দাঁড়াই নি। তাদের কোন কাজেই আমি কোনদিন কোনরকম বাধার সৃষ্টি করি নি। নিজেদের খুশি করার জন্যেই তারা বিয়ে করেছে। তাদের মাথার মধ্যে কোন খেয়াল চাপলে কারও উপর রাগ করা উচিত নয়। ফল তার ভাল হয় না। আমার বাবা-মা যদি আমার পথে বাধার সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমি আজ গ্রামের ঝাড়ুদার হতাম না। অন্য যে কোন মানুষের মতই ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পারতাম।

তার বাবা-মা যে তার জীবনে কী ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছিলেন তা জানতে হলে নিচের কাহিনীটি পড়তে হবে।

যে সময়ের কাহিনী আমি বলছি সেই সময় আনতোয়েন বয়তেল ছাব্রির সৈনিকশিবিরে কাজ করত। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে আর পাঁচজনের মতই তার বুদ্ধিবৃত্তি ছিল; তবে তার মনটা ছিল কিছুটা সরল। যখন তার কোন কাজকর্ম থাকত না তখন সে সমুদ্রের ধারে পাখির খাঁচার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। কখনও-কখনও সে একাই ঘুরত, কখনও-কখনও সঙ্গে থাকত তার সহরের কোন বন্ধু। ছোট-বড় খাঁচায় নানান জাতের পাখির মেলা বসত। কোন-কোন খাঁচায় আমাজন থেকে ধরে আনা টিয়াপাখি থাকত; তাদের শিরদাঁড়ায় সবুজের প্রলেপ, পাগুলি হলুদ রঙের। সেনেগাল থেকে আনা টিয়াগুলির পিঠ সব ধুসর রঙের, পাগুলি লাল; বড়-বড় ম্যাকক্ পাখি; তাদের পালক আর ঠোঁটগুলি ফুলের মত লাল টকটকে। দেখলেই মনে হবে যে বেশ গরম আবহাওয়াতে সে মানুষ হয়েছে। নানান জাতের আর চেহারার লম্বা লেজওয়ালা টিয়া; এমন সুন্দর তাদের দেখতে যে মনে হবে ভগবান অনন্ত যত্ন নিয়ে এইগুলিকে সৃষ্টি করে তাঁর অপূর্ব নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তা ছাড়া রয়েছে একেবারে ক্ষুদে পাখির ঝাঁক। লাল, বেগুনে, নীল—কত তাদের রঙের বাহার; কারও গায়ে আবার রামধনুর বর্ণচ্ছটা। কিচির-মিচির শব্দে সমুদ্রের ঘাটটাকে তারা একেবারে সরগরম করে রেখেছে। তাদের সেই শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়েছে জাহাজঘাটের শব্দ, জাহাজ থেকে মাল খালাস করার শব্দ, জনতার চীৎকার, গাড়ি চলার শব্দ, কর্ণবধিরকারী নানা-জাতীয় শব্দ—তালগোল পাকানো শব্দের তরঙ্গ উত্তাল ভঙ্গিতে চারপাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন দূরের কোন রহস্যময় বনানীর অন্তরাল থেকে এই সব বিচিত্র ধ্বনি অর্থহীন ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে।

অভিভূতের মত চোখ দুটো বড়-বড় করে হাঁ করে সে বন্দী কাকাতুয়া-গুলির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত। তার লাল রঙের ট্রাউজার আর বেল্ট-এর ওপরে পেতলের বন্ধনী দেখে কাকাতুয়াগুলি তাদের সাদা আর হলুদ রঙের মাথার ঝুঁটি ফোলাত। কখনও-কখনও সে একটা টিয়ার কাছে এসে দাঁড়াত; তার কথা শুনত; তাকে কিছু প্রশ্নও সে করত। আর পাখিটা যদি কথা বলে তাকে অনুগৃহীত করত তাহলে সে সেদিনের মত খুশি হয়ে আনন্দ করতে-করতে ফিরে যেত। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বানরদের খেলা দেখাটা তার কাছে আর একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। সে ভাবত সাধারণ মানুষে যেমন আদর করে বিড়াল বা কুকুর পোষে তেমনি বানর পোষাও বড়লোকদের কাছে বেশ একটা আনন্দের ব্যাপার, অন্য লোকের কাছে শিকার করা, রোগ সারানো, আর ধর্মোপদেশ দেওয়া যেমন প্রীতিকর, বিদেশী জানোয়ার পোষার রুচিও এইসব বড়লোকদের কাছে তেমনি অদ্ভুত। ব্যারাকের দরজা খুলে

দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে অস্থির হয়ে উঠত; এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে সমুদ্রের ধারে টেনে নিয়ে যেত।

একদিন সে প্রায় অভিভূত হয়ে বিরাট একটি অ্যামেরিকান কাকাতুয়াকে দেখছিল। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নানান অঙ্গভঙ্গী করে পারিষদবর্গ যেমন ভাবে তাঁকে সম্মান দেখায়, ওই কাকাতুয়াটিও কখনও তার পালক ফুলিয়ে, কখনও বা মাথা নীচু করে, আবার কখনও বা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তেমনিভাবে একটি কাকাতুয়া রাজার প্রতি সম্মান দেখাচ্ছিল। এমন সময় পাখির দোকানের পাশাপাশি একটি ছোট কাফের দরজা খুলে গেল। সে দেখল লাল শালু জড়িয়ে একটি নিগ্রো যুবতী সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁট দিয়ে কতকগুলি পুরানো ছিপি রাস্তার ওপরে ফেলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে বয়তেলের লক্ষ্য দুভাগে ভাগ হয়ে গেল; একটি ভাগ গেল মেয়েটির দিকে—আর একটি ভাগ রইল পাখিটির দিকে। জঞ্জাল পরিষ্কার করে নিগ্রো যুবতীটি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সৈনিকের পোশাক দেখে তার চোখদুটিও ধাঁধিয়ে গেল। হাতের দিকে অস্ত্র এগিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে মেয়েটি ঝাঁটা হাতে তার দিকে তাকিয়ে রইল; ওদিকে কাকাতুয়াটিও আগের মতই নানান অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে সৈনিকটি নিজের মধ্যেই একটা অস্বস্তি বোধ করে সেখান থেকে সরে গেল; অবশ্য সে যে পালিয়ে যাচ্ছে তেমন কোন হাবভাব দেখাল না।

কিন্তু সে আবার এল। প্রায় প্রতিটি দিনই সে কাফে দ্য কোলোন-এর সামনে দিয়ে যেত। যাওয়া-আসার সময় জানালার ভেতর দিয়ে প্রায়ই সে ওই কালো পরিচারিকাটিকে দেখতে পেত—বন্দরের নাবিকদের সে তখন হয়ত মদ্য পরিবেশন করছে। তার সঙ্গে চোখাচোখী হওয়া মাত্র মেয়েটি একটু সরে আসত। যদিও কোনদিন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় নি, তবু চোখাচোখী হওয়া মাত্র দু'জনেই দু'জনকে দেখে একটু মিষ্টি ক'রে হাসত, মনে হোত তাদের পরিচয়টা যেন অনেক দিনের। মেয়েটির কালো ঠোঁটের মধ্যে চকচকে দাঁতের সারি দেখে বয়তেলের মন আনন্দে নেচে উঠত। একদিন সে কাফের মধ্যে ঢুকে গেল। আশ্চর্য হয়ে দেখল যে মেয়েটি আর সকলের মতই সুন্দর ফরাসী বলতে পারে। এক বোতল লেমোনেড থেকে এক গ্লাস মেয়েটিকে সে দিল। মেয়েটি তা গ্রহণ করল। এতেই তার মন আনন্দে বেশ ভরে উঠেছিল। তারপর থেকে সময় পেলেই সে বন্দরের ওই ছোট কাফেটিতে প্রায়ই এসে ঢুকত। আর পকেটে তার যে পয়সা থাকত সব উজাড় করে লেমোনেড কিনত। সেই ক্ষুদে চেহারার কালো মেয়েটি কালো হাত দিয়ে গ্লাসের মধ্যে লেমোনেড ঢেলে দিত। চোখ দিয়ে সে হাসত না। চকচকে দাঁতের পংক্তি বার করে হাসত। এই স্মৃতিটি তার মধ্যে একটি আমেজের সৃষ্টি করত। দিনে-রাতে সারাক্ষণই সেই আমেজটি তাকে ঘিরে থাকত।

মাস দুই এইভাবে দেখাশোনার পরে, তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। বাড়ির মেয়েদের মত এই নিগ্রো পরিচারিকাটিরও মিতব্যয়ীতা, পরিশ্রম, ধর্ম আর নীতির বিষয়ে যে সঠিক এবং পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল এটা আবিষ্কার করে প্রথম প্রথম তার বেশ অবাক লাগত। এই পরিচ্ছন্ন স্বভাবের জন্যেই মেয়েটিকে তার বিশেষভাবে ভাল লাগত; শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে সে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। তার মনের কথা জানাতেই, মেয়েটিও আনন্দে নেচে উঠল। মেয়েটির নিজস্ব কিছু টাকা ছিল। ছ' বছর বয়সে একটি অ্যামেরিকান ক্যাপটেন তাকে যখন হাব্রের জাহাজ ঘাটায় নামিয়ে দিয়েছিলেন তখন একটি ঝিনুক কুড়ানী তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। নিউ ইয়র্ক ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পরে জাহাজের খোলের ভেতরে পাটের গাঁটের ওপরে ক্যাপটেন এই মেয়েটিকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। হাব্রেতে নেমে ক্যাপটেন এই ঝিনুক কুড়ানীর হাতে মেয়েটিকে তুলে দেন। কোন অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত এই কালো মেয়েটিকে দেখে ঝিনুক কুড়ানীর দয়া হয়। তিনি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মেয়েটি কাফে দ্য কোলোনে পরিচারিকার কাজ নেয়। মৃত্যুর সময় তিনি মেয়েটিকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

আনতোয়েন বলল: আমরা বিয়ে করব। অর্থাৎ, বাবা-মার যদি এ বিয়েতে কোন আপত্তি না থাকে। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না; বুঝেছ। না, তা কখনই করতে পারব না। পরের বার বাড়ি গিয়ে আমি তাঁদের বলব।

পরের সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সে বাড়ি গেল। ইভেতোত-এ তুতেভিলিতে তার বাবা থাকতেন। ছোট একটি খামার ছিল তাঁর। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছিল; ভূরি ভোজনের পরে যখন তাঁর বাবা-মা আরাম করে বসেছিলেন তখনই কথাটা পাড়ল বয়তেল। একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। মেয়েটিকে তার সব দিক থেকে এত পছন্দ হয়েছে যে পৃথিবীতে আর কোন মেয়ে নেই যাকে তার ভাল লাগতে পারে।

ছেলের এই জোরাল উক্তি শুনে, বৃদ্ধ দম্পতি সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন; তার বক্তব্যটিকে ভাল করে বোঝার জন্যে ব্যাপারটিকে আরও বিশদ-ভাবে খুলে বলতে বললেন তাকে। এক মুখের রঙ ছাড়া কোন কথাই গোপন করল না বয়তেল। সে বলল, মেয়েটি একটি পরিচারিকা: বেশী টাকাকড়ি তার নেই; তবে সে কর্মঠ, মিতব্যয়ী, পরিচ্ছন্ন, সুরুচি-সম্পন্না আর বুদ্ধিমতী। টাকার থেকে এইসব গুণের দাম অনেক বেশী; কারণ, স্ত্রী যদি নির্বোধ হয়, অমিতব্যয়ী হয় তাহলে টাকা তারা নয়-ছয় করে খরচ করে। তাছাড়া, ওই মেয়েটি একেবারে কপর্দকহীনা নয়। যে ভদ্রমহিলা তাকে প্রতিপালন

করেছিলেন তিনিই তাকে সামান্য কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, টাকাটা সামান্য—এক হাজার পাঁচশ ফ্রাঁ-র মত। টাকাটা সে একটি ব্যাঙ্কে রেখেছে। বিয়ের যৌতুক হিসাবে ওই টাকাই যথেষ্ট।

তার এই আনুষ্ঠানিক এবং সাংসারিক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হলেন তাঁরা; ছেলের বিচার বুদ্ধির ওপরে কিছুটা আস্থা থাকার ফলে বৃদ্ধ দম্পতি প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু কি জানি কেন, মত দেওয়ার আগে মেয়েটির গায়ের রঙ কিরকম সে বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করে বসলেন।

অপ্রতিভের মত একটু হেসে বয়তেল বলল, মাত্র একটি বিষয়েই তোমাদের আপত্তি থাকতে পারে; সেটি হল গায়ের রঙ। মেয়েটি শ্বেতাঙ্গিনী নয়৷

বয়তেল ঠিক কী বলতে চাইছিল তাঁরা তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। ফলে তাকে আরও খুলে বলতে হল; কেবল বলা নয়, পাছে বর্ণ বিদ্বেষের গোঁড়ামিটা তাঁদের পেয়ে বসে এই ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোতে হল তাকে—অবশ্য যতটা সতর্ক হওয়া সম্ভব ততটাই।

সে বলল: মেয়েটির রঙ কালো—অর্থাৎ কালো রঙের যে সব 'প্রিন্ট' তোমরা দেখতে পাও অনেকটা সেই রকম।

কথাটা শুনেই তাঁরা অস্থির হয়ে উঠলেন; কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন; ভয় পেলেন, মনে হল সে বোধ হয় কোন শয়তানের বাচ্চাকে বিয়ে করতে চাইছে।

অবাক হয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কালো! কত কালো? মানে, সারা অঙ্গ তার কালো রঙে ছোপানো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমার সারা দেহটি যেমন সাদা, সেই রকম সারা দেহেই সে কালো।

বাবা মন্তব্য করলেন: কালো? রান্নার হাড়ির মত কালো?

ছেলে বলল: অবশ্য তেমন কিছু নয়। রঙটা তার কালো; তবে তোমাদের হতাশ করার মত কালো নয়। আমাদের ধর্মযাজকের আলখাল্লাও তো কালো; তাই বলে তাঁরা যে সাদা পোশাক পড়েন তার চেয়েও সেটা নিচুস্তরের?

তার দেশের লোকেরা কি তার চেয়েও কালো?

সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল: হ্যাঁ নিশ্চয়।

তোমার যেমন ছাপ পড়ে সেই রকম। তুমি কি বুঝতে পারছ এইটাই তার গায়ের আসল রঙ?

তাঁরা তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা করার আগে তাঁরা একবার স্বচক্ষে দেখে আসবেন।

বয়তেলের চাকরি পরের মাসে শেষ হয়ে যাবে। কথা হল, সেই সময়েই বয়তেল মেয়েটিকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে আসবে। বয়তেল-সংসারে তাকে আনা যায় কিনা তার দেহের রঙ দেখে তাঁরা তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

ঠিক হল, বাইশে যে রবিবার যেদিন সে চাকরি থেকে ছাড়ান পাবে, আনতোয়েন তার প্রিয়তমাকে তুতেভেল্লীতে নিয়ে আসবে। তার প্রেমিকের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সম্মানে, মেয়েটি তার সব চেয়ে ভাল চক-চকে পোশাক পরল; হলদে, লাল আর নীল রঙেরই প্রাধান্য ছিল সেই পোশাকে। তার রঙচঙে সাজ দেখে মনে হল কোন জাতীয় উৎসবে যেতে হবে তাকে। হাব্রের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনেকেই উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারিণীর হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বয়তেলের বুক গর্বে ফুলে উঠেছিল। তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় বয়তেলের পাশে বসে মেয়েটি চাষীদের মধ্যে এমন একটি উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল যে পাশের কামরা থেকে কাঠের পার্টিশানের ওপরে ঝুঁকে অনেকেই তাকে দেখতে লাগল। তাকে দেখে একটা বাচ্চা তো ভয়ে কেঁদেই উঠল; আর একটা বাচ্চা তার মায়ের ঢিলে জামার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিল।

ইভেতোত-এ পৌঁছানো পর্যন্ত সব কিছু ভালয়-ভালয় কেটে গেল। গতি মন্থর করে ট্রেনটি স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে আনতোয়েন হঠাৎ একটা অস্থিরতা বোধ করল। এই রকম অস্থিরতা সে বোধ করত যখন ব্যারাকে তাদের পরীক্ষা হোত—যে পরীক্ষার আগে সে ড্রিল বই পড়তে ভুলে যেত।

জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে দেখল তার বাবা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর পাশে গাড়ি, আর কাঁধের ওপরে লাগাম আর তার মা এগিয়ে এসেছেন স্টেশনের রেলিঙ পর্যন্ত; অনধিকার প্রবেশের হাত থেকে স্টেশনটিকে বাঁচানোর জন্যে স্টেশন মাস্টার এই রেলিঙ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

সে-ই প্রথম ট্রেন থেকে নামল; হাত ধরে নামাল তার প্রেমিকাকে। তারপরে কোন সেনাপতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সৈনিকরা যেমন সোজা হয়ে হাঁটে তেমনি সোজা, খাড়া হয়ে সে তার বাবা আর মায়ের দিকে এগিয়ে গেল।

এই রকম কালো এবং চটকদার পোশাকে ঢাকা একটি নারীকে ছেলের সঙ্গে তাঁর দিকে আসতে দেখে মা ভাবাবেগে এতই মুহ্যমান হয়ে গেলেন যে

তাঁর মুখ থেকে অভ্যর্থনার একটি স্বরও বেরিয়ে এল না, আর তার বাবা কষ্ট করেও তাঁর টাট্টুটিকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। রেলগাড়ি দেখে, না, ওই নিগ্রো মহিলাটিকে দেখে জানি নে, বেচারা ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। আনতোয়েন অবশ্য ভয়-চকিত টাট্টুটিকে অগ্রাহ্য করেই তার বাবা আর মাকে দেখে নির্ভেজাল আনন্দে দু হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল। প্রথমে সে তার মাকে, তারপরে বাবাকে চুমু খেয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাল। তারপরে যাকে দেখার জন্যে পথচারীরা অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেই সঙ্গিনীর দিকে ঘুরে তাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

এ-ই সে। তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম প্রথম একবার দেখেই তাকে তোমাদের ভাল লাগবে না। কিন্তু সত্যি কথাই বলছি একবার এর সঙ্গে পরিচয় হলে তোমরা বুঝতে পারবে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তামাম দুনিয়ায় তেমন আর কোন মেয়ে নেই। এর সঙ্গে কথা বল ; নাহলে সে আহত বোধ করবে।

আনতোয়েনের মা-র হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটে নি ; তবু তিনি তার দিকে তাকিয়ে সৌজন্য দেখালেন ; আর তার বাবা মাথা থেকে টুপীটা খুলে বিড়-বিড় করে বললেন : এস, এস।

আর বিলম্ব না করে সবাই মিলে সেই গাড়ীতে উঠল, পুরুষ দুজন সামনে ; আর দুটি মহিলা পেছনের দুটি চেয়ারে। রাস্তার প্রতিটি ঝাঁকানিতে তাঁরা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। কেউ কোন কথা বললেন না। ভয় পেয়ে আনতোয়েন ব্যারাকের ঘরে বসে যে গান গাইত তারই একটা কলির সুর তুলে গাইতে লাগল। তার বাবা টাট্টুটাকে চাবুক কষাতে লাগলেন ; তার মা নিগ্রো মেয়েটির দিকে আড়চোখে চাইতে লাগলেন মাঝে মাঝে। আর নিগ্রো মেয়েটির কপাল আর গণ্ড দুটি সূর্যের আলোতে ঝকঝকে পালিশ করা জুতোর মত দেখাতে লাগল।

এই অশুভ নীরবতা ভেঙে ফেলার চেষ্টায় আনতোয়েন ঘুরে জিজ্ঞাসা করল : তোমরা কথা বলবে না বলে ঠিক করেছ নাকি ?

মা বললেন : কথা বলার অনেক সময় রয়েছে।

আনতোয়েন বলল : তুমি তোমার সেই মুরগী আর আটটা ডিমের কথা ওকে বলছ না কেন ?

ওদের সংসারে এটা একটা সকলেরই প্রিয় ঠাট্টা। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভাবাবেগে তার মায়ের বাক্ রুদ্ধ থাকার ফলে সেই কথা বলতে সুরু করল ; এবং হো হো করে হেসে সেই অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করল। তার বাবা এই কাহিনীটি ভাল করেই জানতেন। ছেলের কথাগুলি শুনে, তিনিও বেশ তাজা হয়ে উঠলেন ; তাঁর স্ত্রীটিও স্বামীর দৃষ্টান্ত দেখে সোজা হয়ে বসলেন। আনতোয়েন যখন কাহিনীর শীর্ষে উঠেছে এমন সময় নিগ্রো মেয়েটি হঠাৎ উঁচু গলায় এমন

ভাবে হাসতে সুরু করল যে টাট্টুঘোড়াটিও উত্তেজনায় সাময়িকভাবে লাফাতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে এতক্ষণ যে বাধার একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল তা সরে গেল। সবাই এখন খোলা মনে কথা বলতে লাগল।

বাড়িতে হাজির হওয়ার পরে গাড়ী থেকে নেমে এল সকলে। গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে আনতোয়েন তার প্রেমিকাকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে সে পোশাক পরিবর্তন করল। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ দম্পতির মন জয় করার জন্যে রসাল সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে যাতে তার পোশাক-গুলি নষ্ট না হয় সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল।

এরই মাঝখানে আনতোয়েন তার বাবা-মাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ ভয়ে-ভয়েই জিজ্ঞাসা করল : কী রকম দেখলে?

তার বাবা কোন মন্তব্য করলেন না; করলেন মা : ওর রঙটা বড্ড কালো। না, না; এত কালো সহ্য করা যায় না। ওর চেহারা দেখে তো আমি আঁৎকে উঠেছি।

আনতোয়েন বলল : সব অভ্যাস হয়ে যাবে তোমার।

তা হবে। কিন্তু প্রথম-প্রথম নয়।

তাঁরা ভেতরে গেলেন। দেখলেন নিগ্রো মেয়েটি রান্নাঘরে কাজ করছে। ভালই লাগল তাঁর। এই বয়সেও তিনি এখনও কর্মঠ। তিনিও জামার আস্তিন গুটিয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে-রসিয়ে সুস্বাদু খাবার খেলেন তাঁরা। সবাই বেশ খুশি। তারপরে সকলে মিলে বাইরে একটু বেড়াতে গেলেন। এই সুযোগে বাবাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : তোমার কী মনে হচ্ছে বাবা?

কিন্তু ওই বৃদ্ধ চাষীটি কোন কিছু কবুল করার পাত্র ছিলেন না। তিনি বললেন : আমি তো এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর।

আনতোয়েন মায়ের কাছে গেল; কায়দা করে তাঁকে একটু সরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করল : মা, তোমার মত কী?

মা বললেন : বেচারা! সত্যিই মেয়েটি বড় কালো। ওর গায়ের রঙ যদি আর একটু কম কালো হোত তাহলে আমার আপত্তি করার কিছু থাকত না। কিন্তু রঙটা বড্ড কালো—দেখতে শয়তানের মত।

মাকে আর সে চাপ দেয় নি। সে জানত এই বৃদ্ধা মহিলাটিকে কিছুতেই নামানো যাবে না। কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারল তার মনের মধ্যে একটা দুঃখের ঝড় উঠেছে। কী করলে—কোন্ পথে গেলে যে তার বাবা-মাকে নিজের পথে টানা যাবে তা সে বুঝতে পারল না; কিন্তু এটুকু বুঝতে তার অসুবিধে হয় নি যে নিগ্রো মেয়েটি যেমন তার হৃদয়টিকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল

তেমন তাঁদের মুগ্ধ করতে পারে নি। কেন পারল না সেটা ভেবেই সে অবাক হয়েছিল।

শস্যক্ষেতের ভেতর দিয়ে চারজনেই ধীরে-ধীরে ঘুরে বেড়াতে লাগল; ধীরে-ধীরে সবাই এক সময় চুপ করে গেল; কেউ কোন কথা বলল না। যখনই তারা বেড়ার ধারে গিয়ে পড়েছে, বৃদ্ধ বয়তেল দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন; আশপাশ থেকে ছোকরাদের দল ছুটে এসেছে, যুবক বয়তেল যে কৃষ্ণ অপ্সরীটি বাড়িতে এনেছে তাঁকে দেখার জন্যে। দূর থেকে দেখা গেল মাঠ ঝাঁপিয়ে পথ-ঘাট ঝাঁপিয়ে দলে-দলে লোক ছুটে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। মনে হল একটা কিস্তূতকিমাকার জন্তু দেখানো হবে এই সংবাদটা কেউ যেন ঢ্যারা পিটিয়ে চারপাশে জানিয়ে দিয়েছে।

তাদের উপস্থিতি পাড়ায় একটা সোরগোল তুলেছে এটা বুঝতে পেরে বৃদ্ধ দম্পতি রীতিমত অস্থির হয়ে উঠলেন। সেই অসহনীয় পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে তাঁরা তাদের পুত্র আর তার সঙ্গিনীটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গিনীটি আনতোয়েনকে জিজ্ঞাসা করল, তাকে তার বাবা-মায়ের কেমন লাগল।

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে আনতোয়েন জানাল যে তাঁরা এখনও মনস্থির করতে পারেন নি।

তারা যখন গ্রামের একটি ছোট ফাঁকা জায়গায় হাজির হল তখনই ব্যাপারটা চরমে উঠল। প্রতিটি ঘর থেকে লোকজন বিপুল কৌতুকে রাস্তার ওপরে বেরিয়ে এল এই অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্যে। ক্রমাগত লোক জমায়েত হচ্ছে দেখে বৃদ্ধ দম্পতি আর অপেক্ষা না করে দ্রুত তাঁদের বাড়িতে ফিরে গেলেন, আর আনতোয়েন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাগে ফুলতে-ফুলতে দর্শকদের বিস্ফারিত চোখের ওপর দিয়েই ঘাড় উঁচু করে তার প্রেমিকার হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল কোন আশা নেই; তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিগ্রো মেয়েটিকে বিয়ে করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। মেয়েটিও তা বুঝতে পারল।

বাড়িতে যখন ফিরে এল তখন তাদের দুজনের চোখই জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তারা ভেতরে গেল। আগের মতই নিগ্রো মেয়েটি পোশাক ছেড়ে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করল। গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, মুরগীর ঘর সর্বত্রই সে বৃদ্ধটির পিছু পিছু ঘুরল; অনেক কাজ সে নিজের হাতেই করে দিল।

সে বারবার বলতে লাগল: মাদাম বয়তেল, আমাকে করতে দিন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একই রকম চলল। বৃদ্ধার মন গলে গেল; যদিও তাঁর মতের পরিবর্তন হল না।

তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন: যাই হোক, মেয়েটি ভালই। কিন্তু দুঃখের

বিষয় ওর রঙ কালো, সত্যিই বড় কালো। ওর সঙ্গে বাস করতে আমি পারব না। ওকে চলেই যেতে হবে। বড্ড কালো দেখতে মেয়েটি।

প্রেমিকাকে আনতোয়েন কথাটা বলতে বাধ্য হল: না, মা রাজি নয়। মা মনে করেন তুমি বড্ড কালো। তোমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি চল। কিছু মনে করো না; দুঃখও কোরো না। তুমি চলে গেলে আমি আবার ওঁদের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলব।

সে মেয়েটিকে স্টেশনে নিয়ে গেল। তাকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টাও করল যথেষ্ট। তারপর একটা চুমু খেয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দিল; আর চোখের জলে ফোলা, দুটি চোখ দিয়ে ট্রেনটি দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পরেও বাবা-মাকে রাজি করাতে পারে নি সে।

গ্রামের অনেকেই তার এই কাহিনী জানত; সে যখন কাউকে এই কাহিনীটি বলত তখনই তার সঙ্গে আর একটু কথা যোগ করে দিত:

সেই থেকে কোন কাজেই আমি মন বসাতে পারি নে। কোন কাজ করতেও আমার আর ভাল লাগে না; সেই জন্যেই আমি আজ ঝাড়ুদার হয়েছি।

কেউ-কেউ হয়ত মন্তব্য করত: তবুও তুমি বিয়ে করলে…?

সে বলত: হ্যাঁ, কিন্তু স্ত্রীর বিষয়ে আমি বিশেষ সচেতন নই। দেখতেই পাচ্ছ, ছেলেমেয়ে আমার চৌদ্দটা। কিন্তু আমার স্ত্রী সেই আগের মেয়েটির মত নয়—না, কিছুতেই না। সেই নিগ্রো মেয়েটির একটা বিশেষত্ব ছিল। সে আমার দিকে একবার চাইলেই আমার মন ভরে যেত।

সিদ্ধপুরুষ অ্যানটনী

(ST. Anthony']

লোকে তাকে সিদ্ধপুরুষ আনতোয়েন বা অ্যানটনী বলে ডাকত—তার একটা কারণ হচ্ছে তার নাম ছিল আনতোয়েন; আর একটা কারণ, সঙ্গী হিসাবে লোকটি ছিল খুব আমুদে প্রকৃতির—ভাল খাইয়ে; প্রাণ ভ'রে সে মদ খেত; যাকে আমরা গাড়োয়ানি ইয়ার্কি বলি সেই ধরনের ইয়ার্কি করার দিকে ঝোঁকটা ছিল তার বেশী; ছিল মেয়েদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রবণতা। আর এই সব গুণগুলি কখন তাকে সমৃদ্ধ করেছিল? যখন তার বয়স ষাটের সীমারেখা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই সময়ে।

পেশায় সে ছিল কক্স জেলার চাষী। লম্বা, চকচকে চেহারার মানুষ; পুরুষ্টু ছাতি আর উদর; একেজোড়া লম্বা সরু পায়ের ওপরে তার বিরাট দেহটি বেমানান হয়ে চাপানো ছিল।

মানুষটি ছিল মৃতদার; একটি পরিচারিকা আর দুটি কাজ করার লোক ছাড়া সে তার ক্ষেতে একাই বাস করত। বেশ বুদ্ধি করেই সে তার জমি-জায়গাগুলির তদারক করত। নিজের লাভ কোথায় হতে পারে, সেদিকে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ব্যবসাবুদ্ধি তার ছিল প্রথম শ্রেণীর; বিশেষ করে পশুপালন আর চাষ-আবাদের ব্যাপারে তো বটেই। তার দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে ছিল। তাদের সকলের বিয়ে ভালই হয়েছিল। তারা সবাই পাশাপাশি গ্রামে থাকত। মাসে একবার ডিনার খাওয়ার জন্যে তারা সবাই তাদের বাবার বাড়িতে আসত। সারা অঞ্চলে শক্তিমান মানুষ হিসাবে তার নাম ছিল। 'সিদ্ধপুরুষ অ্যানটনীর মত শক্তিশালী' এই কথাটা এ অঞ্চলের ঘরে-ঘরে লোকের মুখে-মুখে ঘুরত।

প্রাশিয়ান আক্রমণের সময় গ্রাম্য শুঁড়িখানায় বসে অ্যানটনী জোর গলায় প্রচার করত যে একটা গোটা সৈন্যবাহিনীকে সে খেয়ে ফেলতে পারে। সমস্ত জাত-নরম্যানের মত সে ছিল সত্যিকারের দাম্ভিক আর হামবড়িয়া; আর সমস্ত দাম্ভিকদের মতই তার মধ্যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছিল। যতক্ষণ না টেবিল নড়ে উঠে গ্লাস আর কাপগুলি নাচানাচি না করত ততক্ষণ পর্যন্ত সে টেবিলের ওপরে ঘুষির পর ঘুষি মেরে যেত। চোখ-মুখ লাল করে, চোখের ভেতর ধূর্ত হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে সে ভূয়ো-বীরত্ব দেখানোর জন্যে চেঁচামেচি করত: আমি তাদের খেয়েই ফেলব; ভগবানের দিব্যি, আমি তাদের খাবই খাব।

সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে প্রাশিয়ানরা ট্যানোভিল পর্যন্ত ঢুকে আসবে। শত্রুরা রউতোত পৌঁছে গিয়েছে এই সংবাদ পাওয়ার পর সে আর ঘর থেকে বাইরে বেরোয় নি। সে সব সময় তার রান্নাঘরের জানালার ওপরে বসে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত; প্রতি মুহূর্তে তার মনে হোত এই বুঝি ব্যায়োনেটধারী সৈন্যদের সে দেখতে পাবে।

একদিন সকালে যখন সে বাড়ির লোকজনদের নিয়ে খেতে বসেছে এমন সময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এলেন মেয়র মঁসিয়ে চিকট; তাঁর পেছনে-পেছনে ঢুকল তামার পেরেক সাঁটা কালো শিরস্ত্রাণ পরা একটি সৈনিক। সিদ্ধ-পুরুষ অ্যানটনী সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল; তার চাকররা হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা যেন প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল তাদের মনিব এবারে প্রাশিয়ান সেনানীটিকে লোপাট করে দেবে। কিন্তু অ্যানটনী সে সব দিকে না গিয়ে মেয়রের সঙ্গে করমর্দন করল। মেয়র তাকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বললেন।

সেন্ট অ্যানটনী, তোমার জন্যে একজনকে নিয়ে এলাম। এরা কাল

রাত্রিতে এসে পৌঁচেছে। খুব সাবধান। বোকার মত কাজ করো না। সামান্য একটু দুর্ঘটনা ঘটলেই ওরা আমাদের সবাইকে গুলি করবে বলে শাসায়, সেই সঙ্গে সারা গ্রাম পুড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। একে কিছু খেতে দাও। ছেলেটি খুব ভদ্র। আমি এখন চললাম। আর সকলের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে এখনও।

মেয়র বিদায় নিলেন।

বিকৃত মুখে সে প্রাশিয়ানটির দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ শক্ত-সমর্থ যুবক; মসৃণ, সাদা চামড়া, নীল চোখ, সুন্দর চুল; থুতনী পর্যন্ত একগাল দাড়ি। দেখে মনে হল ছেলেটা বোকা-বোকা ধরনের লাজুক, আর সৎ।

মুহূর্তের মধ্যেই ধূর্ত নরম্যান মেপে-মেপে দেখে নিল ছেলেটিকে; একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকে বসার জন্যে ইঙ্গিত করল।

সে জিজ্ঞাসা করল: একটু সুপ খাবে?

বিদেশীটি তার ভাষা বুঝতে পারল না। অ্যানটনী হঠাৎ সাহস করে তার নাকের নিচে এক গামলা কানায় কানায় ভর্তি 'সুপ' ঠেলে দিল।

ওরে মোটা শুয়োরের বাচ্চা—খা, খা, জিব দিয়ে চাট এটা,—অ্যানটনী তাকে উৎসাহ দিল।

সৈনিকটি উত্তর দিল: না। তার পরেই সে বেশ লোভাতুরের মতই খেতে লাগল।

নিজের দম্ভ বজায় রেখেছে এই রকম একটা মেজাজ দেখিয়ে অ্যানটনী আড়চোখে তার চাকরদের দিকে তাকাল। চাকররাও তখন মনিবের কাণ্ড দেখে ভয় আর চাপা হাসিতে নানারকম মুখভঙ্গী করতে লাগল।

প্রাশিয়ানটি প্রথম প্লেট শেষ করার পরে অ্যানটনী আর একটি প্লেট সুপ তার সামনে ধরে দিল। সেটিও সে আগের মতই শেষ করে ফেলল। কিন্তু তৃতীয় প্লেটটি খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও সে আর খেতে রাজি হল না।

খাবার জন্যে অনুরোধ করে অ্যানটনী বলল: খাও, খাও; গেল-গেল, পেটের মধ্যে সব ঢুকিয়ে দাও। ওরে শুয়োরের বাচ্চা, আমি তোমাকে মোটা জরদগব বানিয়ে ছেড়ে দেব। অন্যথায় আমি জানতে চাইব কারণটা কী?

এই সব কথার অর্থ কী তা সৈনিকটি বুঝতে পারল না। তার মনে হল অ্যানটনী তাকে প্রাণভরে মোটা করতে চায়। সে একটু মিষ্টি হাসি হেসে হাবে-ভাবে জানিয়ে দিল যে আর সুপ খাওয়ার মত পাকস্থলীতে তার জায়গা নেই।

অ্যানটনী মন্তব্য করল: আমার শুয়োরছানাটা ঢাকের মত নিরেট।

তারপরেই সে হঠাৎ নির্বাক আনন্দে ফুলতে লাগল; ফুলতে-ফুলতে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল; দম বন্ধ হয়ে মৃগী রোগীর মত সে হাত-পা ছুঁড়তে

সুরু করল। তার মনে কৌতুককর এমন একটা ভাবের উদয় হল যে হাসির দাপটে তার মুখ দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল: পেয়েছি পেয়েছি। সেন্ট অ্যানটনী আর তার শুয়োরছানা, এই যে এই যে সেই শুয়োরের বাচ্চা।

তিনটি চাকরই তার সেই অট্টহাসিতে যোগ দিল। বৃদ্ধ লোকটির প্রাণে তখন সুড়সুড়ির আমেজ জেগেছে। সে এক বোতল সেরা ব্র্যানডি বার করে সবাইকে খেতে দিল। প্রাশিয়ানটির স্বাস্থ্য কামনা করে তারা সবাই ব্র্যানডি খেল; আর প্রাশিয়ান সেনানীটিও জিব দিয়ে চাটতে-চাটতে বিনীতভাবে ব্র্যানডির তারিফ করল।

সেন্ট অ্যানটনী চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল: খুব ভাল জিনিস, তাই না? ওরে শুয়োরের বাচ্চা, এরকম সাচ্চা মদ কি তোদের দেশে পাওয়া যায়?

সেদিন থেকে প্রাশিয়ান সৈনিকটিকে সঙ্গে না নিয়ে অ্যানটনী কোথাও বেরোত না। নিজস্ব একটি পদ্ধতি সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওইটিই ছিল তার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার রীতি। তার মত স্বভাব-রসিকের কাছে ওই ধরনের রসিকতাই উপযুক্ত। যদিও আঞ্চলিক অধিবাসীরা মৃত্যুভয়ে জর্জরিত হয়ে ছিল তবুও বিজয়ীদের চোখের বাইরে সিদ্ধপুরুষ অ্যানটনীর এই রসিকতায় তারা সকলেই হো-হো করে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ত। ব্যবহারিক রসিকতায় কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। ওই রকম রসিকতা করার ধারণা অন্য কারও মগজে গজায় নি। মানুষটি সত্যিকারের একটি বিদূষক। প্রতিদিন বিকালে সে ওই জার্মানটির হাত ধরে তার প্রতিবেশীদের বাড়িতে যেত; এবং নিত্য নতুন কৌতুককর মন্তব্য করে তাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত।

তার কাঁধে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিয়ে অ্যানটনী বলত: একে তোমরা চেন? এটি আমার শুয়োর-ছানা। দেখ, দেখ; বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ, বেশ মোটা হচ্ছে না কেন?

সবাই আনন্দে মুচকি হাসি হাসত: তুমি ওকে হত্যা করছ না?

তিনটি পিসতোল দিলে তোমাদের কাছে আমি ওকে বিক্রী করে দেব।

ঠিক আছে আনতোয়েন; তুমি মাংসের খাবার খেতে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

না; ওর একটা ঠ্যাঙ আমাকে দিয়ো। ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখ। সারা অঙ্গে চর্বি গিজগিজ করছে।

দেহাতিরা আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল: পাছে প্রাশিয়ানটি বুঝতে পারে যে তারা তাকে নিয়ে মস্করা করছে এই ভয়ে কেউ হো-হো করে হাসল না। আনতোয়েন দিন-দিন বড় দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল।

লোকটির দাবনাতে চিমটি কেটে আর তার পিঠে কয়েকটা থাপ্পড় কষিয়ে সে বলত: সারা শরীরটা মোটা পুরু চর্বিতে একেবারে জমাট হয়ে রয়েছে।

এই বলে অ্যানটনী তার বিরাট বাহু দিয়ে প্রাশিয়ানটিকে জাপটে শূন্যে তুলে ধরত। বলত, হ্যাঁ, ওজন পাকা ছ'শ'; বাদ যাবে না একটুও।

যেখানেই সে যেত সেখানেই তার এই শূকরছানাটাকে ভাল-ভাল খাবার দেওয়ার জন্যে সে তার প্রতিবেশীদের বাধ্য করত। সারাটা দিনের মধ্যে এইটাই ছিল তার সেরা আমোদের বিষয়।

সে বলত: কী খাবার দেবে সে-সম্বন্ধে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। ও সব খায়।

তারা তার সামনে ধরে দিত রুটি, মাখন, সেদ্ধ আলু, ঠাণ্ডা স্ট্যু, আর শুয়োরের মাংস—এই সব থেকে তারা যেন বোঝাতে চাইত, অবশ্য বুদ্ধি করে—এ তোমার নিজেরই মাংস—তোমার প্রিয় খাদ্য।

এই সমস্ত আদর আপ্যায়নে খুশি হয়ে নির্বোধ ভালমানুষ জার্মান যা তাকে দেওয়া হোত তার সবটুকুই সে হাসি মুখেই খেত। খেয়ে সে বরং অসুস্থ হবে তবু কাউকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। সত্যিই তার চেহারা ফিরছিল। তার পোশাক তার গায়ে বেশ আঁট হয়ে বসে যাচ্ছে দেখে সেণ্ট অ্যানটনীর বেশ আনন্দই হচ্ছিল।

অ্যানটনী তাকে বলল, শুনছ শুয়োর, তোমার জন্যে এরা শীগগীরই একটা নতুন খোঁয়াড় তৈরী করে দেবে।

সত্যি কথা বলতে কি দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বটা বেশ জমাট বেঁধে উঠেছিল। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যখনই ওই বৃদ্ধ লোকটি কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যেত তখনই নিছক সঙ্গলাভের আনন্দেই প্রাশিয়ানটি জোর করে তার সঙ্গে যেত।

সেদিন আবহাওয়াটা খুব খারাপ ছিল—কনকনে ঠাণ্ডায় চারপাশ জমাট বেঁধে উঠছিল। ১৮৭০ সালের সেই ভয়ঙ্কর শীত চারদিক থেকে জনসাধারণকে বিপন্ন করার জন্যেই যেন সেবার ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল। বৃদ্ধ আনতোয়েনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিটা বড় তীক্ষ্ণ ছিল; সুযোগ পেলে কোন সময়েই সে তা ছেড়ে দিত না। সে দেখল বসন্তকালে জমিতে হাল দেওয়ার সময় তার গোবরের সার কিছু কম পড়বে। তার একজন প্রতিবেশীর গোবরের গাদা ছিল; কিন্তু টাকারও দরকার ছিল তার। তাই অ্যানটনী টাকা দিয়ে সেই গোবরের গাদা কিনে নিল। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা প্রতিবেশীর খামারে গিয়ে এক গাড়ী করে সার সে তুলে আনতে লাগল। প্রতিদিন অন্ধকার হয়ে এলে সে মাইল-খানেক দূরে হল-এর খামারে যেত। তার বিশস্ত শূকরছানাটি সঙ্গে যেত তার। রবিবার দিনের পরবে আশপাশ থেকে সবাই যেমন ঝেঁটিয়ে আসত,

তেমনি এই পশুটিকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করার আনন্দে চারপাশ থেকে লোক আসত ছুটে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সৈনিকটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে এবং কখনও-কখনও অট্টহাসির মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তার চোখ দুটো ঘুরে-ঘুরে এদিকে-ওদিকে তাকাত; মাঝে-মাঝে চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত তীব্র কটাক্ষ; সে যে বেশ চটেছে তা বেশ বোঝা যেত। একদিন যতক্ষণ তার পক্ষে সম্ভব হলো ততক্ষণ সে খেল; তারপরে বাকি সব খাবার রেখে চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সেন্ট অ্যানটনী তার কব্জি ধরে তার কাঁধের ওপরে শক্ত হাতে চাপ দিয়ে এত জোরে টেনে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল যে সেই ধাক্কায় চেয়ারটা গেল ভেঙে। সবাই হো-হো করে হেসে এই দুর্ঘটনাটিকে অভ্যর্থনা জানাল।

নিজের কৃতিত্বে উৎফুল্ল হয়ে অ্যানটনী তার শুয়োরটিকে হাতে ধরে তুলল; তার পরে তার ক্ষতগুলিকে শুশ্রূষা করার ভান করল। তার পরে সে চেঁচিয়ে বলল: আমার দিব্যি, যদি তুমি আর খাবার খেতে না চাও, তো খেয়ো না। কিন্তু তাই বলে মদ খাব না বললে চলবে না।

সরাইখানা থেকে ব্র্যানডি আনার জন্যে সে লোক পাঠালো। রাগে চোখ পাকালো সৈনিকটি, কিন্তু মদ খেতে অস্বীকার করল না। বরং যেটুকু মদ তাকে দেওয়া হয়েছিল তার সবটুকুই সে নিঃশেষ করে ফেলল। আশপাশের লোকেরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে অ্যানটনীও প্রায় সৈনিকটির সমান পরিমাণ মদ টানলো।

টম্যাটোর মত লাল হয়ে গেল অ্যানটনী। চোখ দুটো তার জ্বলতে লাগল। সে গ্লাসের পর গ্লাস ভর্তি করে সৈনিকটির দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে ঝোঁকের মাথায় চীৎকার করতে লাগল—খা, খা; এই নে।

কোন কথা না বলে প্রাশিয়ান সৈনিকটি গ্লাসের পর গ্লাস উদরস্থ করল। মনে হল দু-জনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, চলেছে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ—একটা লড়াই। ওই দুটির মধ্যে কে শেষ পর্যন্ত জিতবে সেটাই হল দেখার বিষয়। এক লিটার ব্র্যানডি নিঃশেষিত হওয়ার পরে তাদের আরও খাওয়ার ক্ষমতাও নিঃশেষিত হল। তবুও কারও পক্ষে অথবা বিপক্ষে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হল না, কেউ হারল না; জিতলো না কেউ। পরের দিনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুলতুবী রাখার আর কারও করণীয় ছিল না কিছু।

মদের ঝোঁকে টলতে-টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দুজনেই বাড়ি যাওয়ার পথ ধরল। গাড়ী-ভর্তি গোবর সার নিয়ে ঘোড়া দুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে; তারাও সে গাড়ীর পাশাপাশি চলতে সুরু করল।

বরফ-পড়া সুরু হয়েছে। আকাশে কোন চাঁদ নেই। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন; আকাশে কোন চাঁদ ছিল না, সমতলভূমির মৃত শুভ্রতার ভেতর থেকে এগ্রা

করুণ আভা বেরিয়ে আসছিল কেবল। ওইটুকুই যা ব্যতিক্রম। কনকনে শীত দুজনকেই গ্রাস করে ফেলেছিল ; আগের চেয়ে অনেক বেশী মত্ততায় ডুবে গেল তারা। বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে না পেরে প্রাশিয়ানটিকে জোরে ঠেলা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেই সে তার মনটাকে খোলোসা করছিল। সৈনিকটি ওই সব ধাক্কাগুলিকে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং প্রতিবার এড়িয়ে যাওয়ার সময় জার্মান সেনানীটি রাগত স্বরে বিড়-বিড় করতে লাগল। তার হাবভাব দেখে অ্যানটনী হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

অবশেষে সেনানীটি তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। অ্যানটনী যখন তাকে আর একবার ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করল সেই সময় সৈনিকটি এমন একটা রাম-ঘুষি বসিয়ে দিল যে ওই দশাসই নরম্যান ভদ্রলোকটি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোন মতে নিজেকে সামলে নিল।

ব্র্যানডি খাওয়ার ফলে বৃদ্ধ মানুষটির মাথা এমনিতেই তেতে ছিল ; এই ঘটনার পরে সে আরও গেল তেতে। একটা শিশুকে যেমনভাবে মানুষে তুলে ধরে তেমনিভাবে সৈনিকটিকে শক্ত করে সে ধরল ; তার পরে কয়েকটি মিনিট ধ'রে তাকে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিল। ঝাঁকানি দেওয়া শেষ হলে রাস্তার ওপরে তাকে দিল ছুঁড়ে, নিজের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সে হাত দুটো মুড়ে দাঁড়াল ; তার পরে আবার হো-হো করে অট্টহাসিতে ভরিয়ে দিল চারপাশ।

সৈনিকের মাথা থেকে শিরস্ত্রাণটি ছিটকে বেরিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করল। খোলা মাথায় সে লাফিয়ে উঠল ; তার পরে খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে সে অ্যানটনীর ওপরে পড়ল ঝাঁপিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যানটনী সাবধান হয়ে দাঁড়াল। তার হাতে একটা শক্ত, বড়, মসৃণ কাঠের লাঠি ছিল। সেই লাঠি-টাকে সে বাগিয়ে ধরল।

আততায়ীকে হত্যা করার স্থির সংকল্প নিয়ে প্রাশিয়ান সৈন্যটি মাথা নিচু করে তরোয়ালটা সোজা ক'রে দৌড়ে এল। তরোয়ালের মুখটা সোজা তার পেটের দিকে নামানো ছিল। অ্যানটনী তরোয়ালের মুখটা ধরে ফেলল ; আততায়ীকে লক্ষ্যচ্যুত করে, অ্যানটনী তার শত্রুর মাথার ওপরে তার লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল।

প্রাশিয়ান সৈন্যটি তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। ভয়ে হতভম্ব আর দিশেহারা হয়ে বৃদ্ধ অ্যানটনী সেই দেহটির দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ থুবড়ে দেহটি মাটির ওপরে পড়ে ছিল ; বার কয়েকমাত্র একটু ছটফট করে দেহটি চুপ করে গেল। অ্যানটনী নিচু হয়ে দেহটিকে উলটিয়ে সোজা করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। জার্মানটির দুটি চোখই বোজানো ; তার মাথার চাঁদি থেকে একটু রক্ত ঝুর ঝুর করে বেরিয়ে আসছে।

রাত্রি অন্ধকার ঠিকই ; তবু বরফের ওপরে লাল রক্তের দাগ বৃদ্ধ অ্যানটনীর চোখে পড়ল। একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেইখানেইসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে

রইল; ঘোড়াগুলি গাড়ী ভর্তি সারের বোঝা নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। এখন সে করবে কী? জানাজানি হলে তো তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। তার ক্ষেতখামার পুড়িয়ে দেবে তারা; গাঁকে গাঁ দেবে ধ্বংস করে। এখন কী করা উচিৎ তার? মৃতদেহটিকে সে লুকোবে কোথায়, এই হত্যার ব্যাপারটা সে কেমন ক'রে গোপন করবে, প্রাশিয়ানদের নির্বোধ বানানোর উপায়টা কী?

সেই বরফে সমাচ্ছন্ন জনপদের ওপরে একটা গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে দূর থেকে ভেসে-আসা অনেকগুলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। হঠাৎ ভয় পেয়ে সে শিরস্ত্রাণটা কুড়িয়ে নিল; সেটিকে মৃত সৈনিকের মাথায় দিল বসিয়ে। কোমর ধরে তাকে বসালো; তাকে তুলে নিয়ে গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটলো; তারপরে গোবর-গাদার ওপরে তাকে শুইয়ে দিল। একবার বাড়ি পৌছানোর পরে তার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সে ঠিক করে নেবে। কী করবে, কী তার করা উচিত এই সব ভাবতে-ভাবতে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল; কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারল না। সে যে কত বড় বিপদে পড়েছে তা সে ভালভাবেই বুঝতে পারল। নিজেকে বাঁচানোর সমস্ত আশা ভরসা সে জলাঞ্জলি দিল।

বাড়ির সামনে পৌছে সে দেখল চিলে-ঘরে আলো জ্বলছে। পরিচারিকা তখন জেগে রয়েছে। বেশ শক্ত হাতে গাড়ীটাকে পেছনের দিকে ঠেলে সার জমানোর গর্তের মুখে সেটাকে দাঁড় করালো। এখন যে মৃতদেহটা সারের মাথার ওপরে রয়েছে সেটা গর্তের নীচে চাপা পড়বে এই ভেবে সে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিল। সে যে রকম ভেবেছিল তাই দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত। দেহটি সারের গাদার নীচে চাপা পড়ে গেল।

খড়-বিচালি তোলার জন্যে লম্বা হাতলযুক্ত যন্ত্রটা দিয়ে অ্যানটনী সারের গাদাটা চেপেচুপে পরিষ্কার করে দিল; তার পরে সেটাকে গাদার পাশে মাটির ওপরে পুঁতে রাখলো। একটি চাকরকে ডেকে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। তারপরে সে সটান নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। এরপরে তার করণীয় কী রয়েছে তখনও সে সেই কথাই ভাবছিল। কিন্তু বাঁচবার একটা পথও তার চোখে পড়ল না। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থেকে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। নিশ্চয় তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে ওরা। ভয়ে সে ঘেমে উঠল, তার দাঁতে দাঁত বসে গেল। শেষ পর্যন্ত আর সে সহ্য করতে পারল না। কাঁপতে-কাঁপতে সে বিছানা থেকে উঠে এসে রান্নাঘরে গেল। কাবার্ড থেকে ব্র্যানডির বোতলটা নিয়ে সে ঘরে ফিরে এল, পর-পর দুটো গ্লাস ব্র্যানডি সে ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেলল। নতুন নেশার উন্মাদনায় সে আচ্ছন্ন হল বটে কিন্তু মনের কষ্ট তার দূর হল না। নিজেকে সে এই রকম একটা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে। কী হতভাগা সে।

কী কৌশল, কী কৈফিয়ৎ, বা সমস্ত দোষ এড়িয়ে যাওয়ার কোন্ পথটা সে গ্রহণ করবে এই কথা ভাবতে-ভাবতে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সাহস সংগ্রহ করার জন্যে মাঝে-মাঝে নিয়মিতভাবে সে ব্র্যানডি খেতে লাগল। কিন্তু কোন পথই, কোন পথের চিহ্নই সে দেখতে পেল না।

মাঝরাতের দিকে নেকড়ের মত হিংস্র তার পাহারাদার কুকুর ভেভোয় চীৎকার করতে লাগল। তার চীৎকার শুনে মনে হল সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। বৃদ্ধ অ্যানটনী ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। যতবারই তার কুকুর টেনে-টেনে সুর করে কেঁদে ওঠে, ততবারই ভয়ে-আতঙ্কে তার গরম রক্ত হিম হয়ে যায়। চিন্তায়-চিন্তায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল, হল বিভ্রান্ত। প্রতিটি অঙ্গ তার বেদনায় টনটন করে উঠল। সে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়ল। কুকুরের ডাক শোনার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে বসে রইল। দুর্বল স্নায়ুরা যেমন যে-কোন একটা শব্দ হলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সেও তেমনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

নিচের ঘরের ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ হল। কুকুরটা একবারও তার চীৎকার থামাল না; আর ভয়ে আধমরা হয়ে বসে রইল বৃদ্ধটি। কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে হয়ত সে চেঁচামেচি বন্ধ করবে এই ভেবে সে দাঁড়ালো; নিচে নেমে গেল সে, দরজা খুলল; তারপরে অন্ধকারে মিশে গেল।

তখনও তুষারপাত হচ্ছে। সেই নিশ্ছিদ্র সাদার গায়ে তার বাড়িটাকে দেখাচ্ছিল কতকগুলো বিরাট আকারের কালির আঁচড়ের মত। কুকুরের ঘরের দিকে সে এগিয়ে চলল। চেন ছেঁড়ার জন্যে কুকুরটা তখন বেশ টানাটানি করছে। ছাড়া পাওয়া মাত্র সে একটা লাফ দিল। তার পরে তার গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল, পায়ের পেশীগুলি হল শক্ত, দাঁতগুলি পড়ল বেরিয়ে; তারপরে মাথাটা সারের গাদার দিকে ঘুরিয়ে সে মরে পড়ে গেল।

হাঁপাতে-হাঁপাতে অ্যানটনী জিজ্ঞাসা করল: তোর হল কী রে জানোয়ার।

কথাগুলি বলার সময় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারাটা অঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল।

আরও কয়েকটি পা এগিয়ে গেল সে; অন্ধকারাচ্ছন্ন উঠোনের আবছা অন্ধকারের দিকে সে উঁকি দিল; দেখল, গোবরের গাদার ওপরে একটা মানুষ বসে রয়েছে। ভয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে সে সেই ভূতুড়ে মূর্তিটির দিকে চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে তাকিয়ে রইল। তার পরে মাটিতে যে লম্বা কাঁটার যন্ত্রটা সে গেঁথে রেখেছিল সেটার ওপরে তার চোখ পড়ল। সেটাকে সে ছিনিয়ে নেওয়ার ভঙ্গীতে তুলে নিল; এবং মাঝে-মাঝে যে ভাবে অভিভূত মানুষ হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে সেইভাবে সে ব্যাপারটা কী জানার জন্যে সেই দিকে দৌড়ে গেল।

এ সে-ই; সেই প্রাশিয়ান। এতক্ষণ গোবরের গাদার নিচে সে চুপচুপ পড়েছিল; শরীরে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার বেঁচে ওঠে। তার পরে

গোটা গায়ে কাদা মেখে সে হামাগুঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কোন কিছু বুঝতে না পেরে নেহাৎ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে গাদার ওপরে উঠে বসেছে। রক্ত আর নোংরাতে তার দেহটা ভরে উঠেছে। মদের নেশায় তখনও সে বিভ্রান্ত। আঘাতে সে মুহ্যমান; ক্ষততে সে ক্লান্ত। বরফের কুঁচিতে সারা অঙ্গ ঢেকে সে ওইখানে বসে রয়েছে। অ্যানটনী দেখল সে; কী ঘটেছে তা বুঝতে না পেরে সে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু সৈনিকটিকে চিনতে পেরেই পাগলা জানোয়ারের মত বৃদ্ধের মুখ থেকে ফেনা বেরোতে লাগল।

তুই—তুই—শুয়োর তুই—অস্পষ্টভাবে বকবক করতে লাগল অ্যানটনী—তুই মরিস নি? তুই আমাকে ধরিয়ে দিবি—দাঁড়া রে শুয়োরের বাচ্চা, তোকে আমি দেখাচ্ছি।

এই রকম বকতে-বকতে সে জার্মানটির দিকে দৌড়ে গেল। সেই যন্ত্রটাকে বর্শার মত করে ধরে বৃদ্ধটি দুহাতে তার যত জোর রয়েছে তত জোরে সৈনিক-টির বুকে বসিয়ে দিল। একটা দীর্ঘ ক্ষীণ আর্তনাদ করে সৈনিকটি লুটিয়ে পড়ল। বৃদ্ধটি সেই অস্ত্রটা বুক থেকে টেনে নিয়ে বার বার তার বুকের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল; কেবল বুক নয়; তার পেটে, পাকস্থলীতে, গলায়, পাগলের মত যেখানে পারল সেইখানে জোরে-জোরে খুঁচতে লাগল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সারা দেহটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলল। ফোয়ারার মত রক্তের স্রোত বেরোতে লাগল তার দেহ থেকে। অবশেষে এই অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আর হত্যার আতঙ্কে কিছুটা শান্ত হয়ে সে থামলো; বার কয়েক জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দম নিল কিছুক্ষণ।

তারপরে মোরগের খোঁয়াড় থেকে মোরগরা ডেকে উঠল। সকাল হ'তে আর দেরী নেই দেখে মৃত লোকটিকে কবর দেওয়ার জন্যে সে প্রস্তুত হল। গোবরের গাদার ভেতরে সে একটা গর্ত খুঁড়ল; খুঁড়তে খুঁড়তে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সে। মরীয়া হয়ে পাগলের মত তাড়াতাড়ি সে গভীর গর্ত খুঁড়ল। গর্ত যখন যথেষ্ট গভীর হল, সেই কাঁটার যন্ত্রটা দিয়ে মৃতদেহটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে, তার পরে মাটি দিয়ে অতি সন্তর্পণে গর্তটা বুজিয়ে দিল; তার ওপরে স্তূপাকার করে রাখল গোবরের গাদা, দ্রুত তুষারপাত তার কাজটিকে সহজ করে দিল; যেখানে যত লাল রক্ত পড়েছিল সাদা কুঁচি বরফ দিয়ে সেই সব ঢেকে দিল, একটু হাসল অ্যানটনী। শেষকালে সেই কাঁটার যন্ত্রটাকে গোবরের মধ্যে পুঁতে দিয়ে সে তার ঘরে ফিরে এল। আধখানা ব্র্যানডির বোতল তখনও টেবিলের ওপরে রাখা ছিল। চোঁ-চোঁ করে সেই সমস্ত ব্র্যানডি এক নিঃশ্বাসে সে খেয়ে ফেলল; তারপরে বিছানার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানা একটা ঘুম দিল।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন তার মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তার মন শান্ত এবং সতর্ক। কী ঘটতে পারে এবং তেমন কোন ঘটনা ঘটলে

কী ভাবে সে মোকাবিলা করবে সে সব বিষয়ে সে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সে তার সৈনিকটির সংবাদ আহরণ করার জন্যে চারপাশ চষে ফেলল। সে জার্মান অফিসারদের খুঁজে বার করে তাদের বার-বার জিজ্ঞাসা করল কেন তারা তার প্রিয় বন্ধুকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এত নিবিড় ছিল যে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারল না। জার্মান অফিসাররা যখন তার অনুসন্ধানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল তখন অ্যানটনী তাদের সাহায্য তো করলই, এমন কি কোন্ পথে এগোলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধেও একটা ইঙ্গিত সে তাদের দিল। সে তাদের জানাল যে সেই ছোকরাটি প্রতিদিন রাত্রিতে মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াত।

একটি বৃদ্ধের পাশের গাঁয়ে একটা ছোট সরাইখানা ছিল, তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, শেষ পর্যন্ত জার্মানরা তাকে গ্রেপ্তার করে গুলি করে মেরে ফেলল।

চুক্তি

(A Deal)

সিয়েয়ার ইসিডোর ক্রমাঁ আর প্রসপার নেপলিয়ন কর্ণু অভিযুক্ত হয়ে সিনউনফিরিউর-এর আদালতে বিচারের জন্যে হাজির হয়েছে। অভিযোগ, এক মহিলাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তারা। মহিলাটি আর কেউ নয়; অভিযুক্ত ক্রমাঁর আইনসঙ্গত পত্নী।

দুটি কয়েদী তাদের জন্যে নির্দিষ্ট বেঞ্চের ওপরে পাশাপাশি বসেছিল। তাদের দুজনেই চাষী। চেহারার দিক থেকে ক্রমাঁ ছোট-খাটো, মোটা, ছোট হাত, ছোট পা, ব্রণতে ভর্তি মুখ—লাল। গোল মাথাটা তার ছোট গোল দেহের ওপরে বসানো। ঘাড় বলে কোন পদার্থ তার নেই, ক্রিকোয়েতোল অঞ্চলের ব্যাকেভিল-লা-গুপিল এ সে থাকত। পেশা শুয়োরের ব্যবসা। কর্ণু রোগাটে, উচ্চতায় মাঝারি গোছের—শরীরের তুলনায় হাত দুটো একটু বেশী লম্বা। তার মুখটা একটু বিকৃত, চোয়াল বাঁকা, চোখ টেরা। একটা ঢিলে পোশাক তার গায়ে, লম্বা সাল—একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো। তার বিরল কেশগুচ্ছ মাথার চাঁদির ওপরে লেপটে বসেছিল। ফলে মুখের আদলটা দাঁড়িয়েছিল কৃশ, রুগ্ন। তাকে দেখলেই মনে হবে চেহারাটাকে সে একেবারে ঝরঝরে করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষে তাকে সব সময় এড়িয়ে চলত। লোকে তাকে পাদরী বলে ডাকত। কারণ, গির্জাতে যে গান হোত সেই

গানেরই সে যে অনুকরণ করতে পারত তা-ই নয়; সাপের হিস-হিস শব্দেরও সে বেশ ভাল করেই অনুকরণ করত। ক্রিকিতোত-এ তার একটা মদের দোকান ছিল। এই গুণের জন্যেই তার দোকানে খদ্দের আসত বেশী। গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীতের চেয়ে তারা কর্ণু'র ভজন গান বেশী পছন্দ করত।

সাক্ষীদের জন্যে নির্ধারিত বেঞ্চে বসেছিল মাদাম ক্রমাঁ। চাষীর ঘরের মেয়ে; রোগা ডিগডিগে, দেখলেই মনে হবে সব সময়ই সে ঘুমোচ্ছে। কোলের ভেতরে হাত দুটি মুড়ে সে চুপচাপ বসেছিল। তার চোখের দৃষ্টি শূন্য; মুখ ভাবলেশহীন।

জজ সাহেব তাঁর কাজ সুরু করলেন; মাদামকে সম্বোধন করে বললেন: ভদ্রমহিলা, আমি শুনেছি যে ওরা আপনার ঘরে ঢুকে আপনাকে একটা জলে বোঝাই ব্যারেলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। কী ঘটেছিল তা আপনি বিস্তারিতভাবে বলুন। অনুগ্রহ করে দাঁড়ান।

মাদাম দাঁড়ালো। শক্ত করে পরা সাদা টুপিতে তাকে লম্বা একটা বাঁশের ডগা বলে মনে হচ্ছিল।

একটা ঘুমন্ত টানা ভটভটে স্বরে মাদাম তার কাহিনী সুরু করল।

"আমি তখন হ্যারিকট বিন-এর খোসা ছাড়াচ্ছিলাম। ওরা দুজনে হাজির হল। আমি নিজের মনে বিড়বিড় করে বললাম, ওরা মোটেই প্রকৃতিস্থ নয়। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কোন খারাপ মতলবে ওরা এখানে এসেছে। ওরা, বিশেষ করে কর্ণু', ট্যারা চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কর্ণু'র চোখ তো ট্যারাই। ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে কোন-দিনই আমি খুশি হই নে; কারণ, গর্ব করার মত ওদের কার-ও কিছু নেই।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম: এখন আবার কী করতে আগমন হল তোমাদের?

কোন উত্তর দিল না তারা; আমার সন্দেহ হল........

অভিযুক্ত ক্রমাঁ মাঝ পথেই বাধা দিল: আমি তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না।

এই কথা শুনে কর্ণু' তার সহযোগীর দিকে ঘুরে মিষ্টি করে জলদ স্বরে বলল: তুমি যদি বল যে তখন দুজনেই আমরা অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম তাহলে তোমার মিথ্যা ভাষণ হবে না।

জজ সাহেব বেশ কড়া স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন: অর্থাৎ বলতে চাও যে তোমরা তখন দুজনেই নেশাগ্রস্ত ছিলে?

ক্রমাঁ বলল: নেশা করায় কোন অপরাধ নেই।

কর্ণু' বলল: যে কোন নেশাখোরেরই এরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

জজ সাহেব তখন সাক্ষীকে বললেন: ভদ্রমহিলা, আপনার বক্তব্য বলে যান।

মাদাম বলল: তখন ক্রমাঁ আমাকে জিজ্ঞাসা করল: পাঁচ ফ্রাঁ রোজগার করতে চাও?

আমি বললাম: হ্যাঁ; নিশ্চয়।

পাঁচটা ফ্রাঁ মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে না। এই কথা শুনে সে বলল: তাহলে প্রস্তুত হও। কী করতে হবে তোমাকে আমি বলছি। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্যে আমাদের যে মস্ত একটা পিপে ছিল সেটার ঢাকনিটা খুলে সে সেটা নিয়ে এল। রান্নাঘরের ভেতরে বসিয়ে বলল: "যাও; জল তুলে এটাকে কানায় কানায় ভর্তি করে ফেল।" আমি দুটো বালতি নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জল আনার জন্যে পুকুর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করলাম। যদি অপরাধ না নেন হুজুর তাহলে আমি বলব যে পিপেটা বিরাট বড়, ভাটিখানায় চোলাই মদের জন্যে যে রকম বিরাট গামলা থাকে সেই রকম। আর সারা সময়টা দুজনে বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ পেটের মধ্যে ঢালতে লাগল। সেই দেখে আমি বললাম: তোমরা তো দেখছি মদে একেবারে টইটম্বুর হয়ে পড়েছ; এই পিপেটার চেয়েও বেশী টইটম্বুর।

ক্রমাঁ বলল: আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। নিজের চরকায় তেল দাও তুমি। তোমার সময় হয়ে আসছে; সাবধান।

তার কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলাম না; কারণ সে তখন মদে চুর হয়ে ছিল। পিপেটা কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে গেলে আমি বললাম: আমার কাজ শেষ হয়েছে।

তখন কর্ণু আমাকে পাঁচটা ফ্রাঁ দিল; মনে রাখবেন ক্রমাঁ নয়, কর্ণু। কর্ণুই আমাকে পাঁচ ফ্রাঁ দিয়েছিল। ক্রমাঁ তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আরও পাঁচ ফ্রাঁ রোজগার করবে?

আমি বললাম: হ্যাঁ করব। পাঁচ-পাঁচটা ফ্রাঁ হঠাৎ আকাশ থেকে মাটিতে ঝরে পড়ে না।

এই কথা শুনে সে আমাকে বলল: জামা-কাপড় খোল।

জামা-কাপড় খুলব?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

যদি তাতে তোমার অসুবিধে হয় তাহলে গায়ে তুমি শেমিজটা রাখতে পার। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

দেখুন হুজুর, পাঁচ ফ্রাঁ দাম কম নয়। সুতরাং আমি জামা-কাপড় খুলে ফেললাম; যদিও আমার ভাল লাগছিল না; কারণ ওই দুটো হতচ্ছাড়া আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি টুপী খুললাম, জ্যাকেট খুললাম, স্কার্ট খুললাম। ক্রমাঁ বলল: মোজা দুটো তুমি রাখতে পার। আমরা ভদ্রলোক। কর্ণু বলল: ঠিক। আমরা ভদ্রলোক।

সুতরাং সেই অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—একেবারে আদি মা ইভের মত। তারপরে তারা উঠে দাঁড়ালো, যদিও তারা এত মদ খেয়েছিল যে

এক হুজুরের সামনে ছাড়া উঠে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা তাদের ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এর পরে কী করতে হবে আমাকে ?

ক্রমাঁ জিজ্ঞাসা করল তুমি তৈরী ?

কর্ণু বলল : তৈরী।

তারপরে ঠিক যেমন করে লোকে কাচা বিছানার চাদর দুপাশে ধরে শুকোতে দেয় তেমনিভাবে, ক্রমাঁ ধরল আমার ঘাড়, কর্ণু ধরল পা। তাদের রকম দেখে আমি চীৎকার করে উঠলাম। ক্রমাঁ ধমক দিয়ে বলল : চুপ কর মাগী।

তারপরে আমাকে উঁচুতে তুলে তারা আমাকে জলে বোঝাই পিপের মধ্যে গুঁজে দিলে। এমন একটা ধাক্কা খেলাম যে আমার শরীরের রক্ত সব জল হয়ে গেল ; আমার নাড়িভুঁড়িগুলো গেল সব জমাট হয়ে।

ক্রমাঁ জিজ্ঞাসা করল : ঠিক আছে ?

কর্ণু বলল : ঠিক আছে।

ক্রমাঁ বলল : ওর মাথাটা এখনও ডোবানো হয় নি। সেটাও আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।'

কর্ণু বলল : তাহলে ওর মাথাটা ডুবিয়ে দাও।

এই কথা শুনে ক্রমাঁ আমার মাথাটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। মনে হল, ও আমাকে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়। আমার নাক ছাপিয়ে জল উঠলো। মনে হল, আমি সোজাসুজি স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছি। ও আমাকে জলের তলায় ঠেলতে লাগল। আমি ডুবে গেলাম। তখন ও ভয় পেয়ে আমাকে টেনে তুলল, বলল : নাও ঝাঁটাকাঠি ওঠ। তাড়াতাড়ি গা মুছে ফেল।

আমি পিপে থেকে উঠেই ছুট দিলাম ; থামলাম পাদরীর বাড়িতে। তিনি তাঁর পরিচারিকার একটা স্কার্ট আমাকে ধার দিলেন পরতে ; কারণ তখন আমি উলঙ্গ ছিলাম। তিনি বেরিয়ে গিয়ে চৌকিদারকে ডেকে আনলেন, চৌকিদার পুলিশ আনলো ডেকে ; সেই পুলিশের সঙ্গে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। দেখলাম ক্রমাঁ আর কর্ণু দুটো ভেড়ার মত মারামারি করছে।

গর্জন করে উঠলো ক্রমাঁ : মিথ্যে কথা। আমি আপনাকে বলছি ওটার ওজন অন্তত এক কিউবিক মিটার হবে। মাপার প্রণালীতে ভুল ছিল।

কর্ণু গর্জন করে উঠলো : চার বালতির ওজন অর্দ্ধেক কিউবিক মিটারও নয়। এটা সত্যি কথা ; তুমি একে অস্বীকার করতে পার না।

মাদাম বলল : পুলিশ এসেই ওদের মারামারি থামায়। আমি কিছুই করতে পারি নি।

এই পর্যন্ত বলে সে বসে পড়ল।

আদালতে দর্শক আর শ্রোতাদের অনেকেই হো-হো করে হেসে উঠলো। জুরীরা পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে রইল তাকিয়ে।

জজ সাহেব আসামী কর্ণুকে সম্বোধন করে বললেন: আমার ধারণা, তুমিই হচ্ছ এই লজ্জাকর নাটকের মূল নায়ক। সেদিক থেকে তোমার কিছু বলার রয়েছে?

কর্ণু উঠে দাঁড়িয়ে বলল: ধর্মাবতার, আমরা তখন নেশায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জজ সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন: তা আমি বুঝতে পারছি। এখন কী বলবে বল।

সেই কথাই বলছি। ক্রমাঁ ন'টা নাগাদ আমার বাসায় এসে দু'বোতল ব্রানডি চাইল: দু'বোতল নিয়ে বলল: কর্ণু, তুমি এক বোতল নাও। আমি তার মুখোমুখী বসে এক বোতল খেলাম। তারপর ভদ্রতার খাতিরে ওকে আর এক বোতল দিলাম। পরিবর্তে আমাকেও এক বোতল দিল— এইভাবে পর পর দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে অনেকগুলি বোতল আমরা উড়িয়ে দিলাম। বারটা নাগাদ আমাদের মাথার স্ক্রুগুলি সব ঢিলে হয়ে গেল।

তার পরেই ক্রমাঁ ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে সুরু করল। আমার খুব দুঃখ হল। জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার হল কী হে?

সে বলল: বৃহস্পতিবারের মধ্যে এক হাজার ফ্রাঁ আমাকে যোগাড় করতেই হবে।

শুনেই আমি পিছিয়ে গেলাম।

তার পরে বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই সে বলল: তোমার কাছে আমার স্ত্রীকে বেচে দেব।

বুঝতে পারছেন হুজুর; আমিও তখন মাতাল আর আমার স্ত্রীও মারা গিয়েছে। ওর প্রস্তাব চট করে আমার মনে ধরে গেল। আমি ওর স্ত্রীকে কোনদিন দেখি নি; তার বিষয়ে কোনদিন শুনিও নি কিছু। কিন্তু স্ত্রী সব সময়েই স্ত্রী। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম: কত দামে বেচবে হে?

ও চিন্তা করল, অথবা চিন্তা করার ভান করল। মানুষ যখন মাতাল হয়ে যায় তখন কোন জিনিসই সে স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারে না। সে বলল: এক কিউবিক মিটার পেলে আমি তাকে বিক্রী করে দেব।

কথা শুনে আমি মোটেই আশ্চর্য হলাম না; কারণ তারই মত আমিও তখন মাতাল। তাছাড়া, কিউবিক মিটার নিশ্চয়ই আমার ব্যবসা। এক হাজার লিটার-এ এক কিউবিক মিটার হয়। আমি রাজি হয়ে গেলাম, তখন আমার কাছে একটিমাত্র জিনিসই ভাবার ছিল। সেটি হল এক কিউবিক মিটারের দাম কত ধার্য হবে। দাম সব সময়েই পদার্থের গুণের ওপরে নির্ভর করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এক কিউবিক মিটারের দাম কত তুমি ধরছ?

সে বলল: দু'হাজার ফ্রাঁ।

দামটা শুনেই আমি খড়গোসের মত লাফিয়ে উঠলাম। তারপর নিজের মনেই আমি ভাবলাম যে একটা মেয়েমানুষের দাম তিনশ লিটারের বেশী হ'তে পারে না। তবু আমি বললাম : দামটা একটু বেশী হাঁকছো হে।

সে বলল : ওর কমে রাজি হব না। তাহলে আমার ক্ষতি হবে।

ধর্মাবতার, আপনি বুঝতেই পারছেন লোকটা বৃথাই শুয়োরের ব্যবসা করে না; সে তার ব্যবসাটা ভাল করেই বোঝে। কিন্তু যদিও ওই শুয়োরের মাংস বিক্রেতা সমস্ত রকম বাক্‌চাতুরীতে বিজ্ঞ, আমার নিজেরও একটা মত রয়েছে, কারণ আমিও মদ বিক্রী করি। হা-হা-হা।

আমি তাকে বললাম : তোমার বউ নতুন হলে আমার অবশ্য কিছু বলার থাকতো না; কিন্তু তুমি কিছুদিন তাকে ভোগ করেছ; সুতরাং সে এখন পুরনো মাল। সেই জন্যে এক কিউবিক মিটারের দাম হিসাবে তোমাকে আমি দেড় হাজার ফ্রাঁ দেব; তার বেশী একটি কপর্দকও না। এতে তুমি রাজি?

সে বলল : রাজি। এস, আমরা করমর্দন করি।

আমি তার করমর্দন করলাম; তার পরে দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়লাম। এই জীবনে আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত।

হঠাৎ একটা দুশ্চিন্তা আমার মাথায় এল। তরল জিনিস মাপার যন্ত্র দিয়ে তুমি তাকে মাপবে কেমন করে? অবশ্য তোমার বউ যদি তরল পদার্থ হয় তাহলে অন্য কথা।

তখন সে তার পরিকল্পনার কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। এতটা মাল সে পেটের মধ্যে ঢুকিয়েছিল যে তার পরিকল্পনা ঠিকভাবে বুঝতে পারা বড় সহজ কর্ম ছিল না।

সে বলল : আমি একটা পিপে নেব। সেই পিপেতে জল ভর্তি করে তার মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দেব। তাকে ভেতরে চুবিয়ে দেওয়ার ফলে যে জল পড়ে যাবে সেই সব জলটা আমরা ওজন করে নেব।

আমি বললাম : চমৎকার! কিন্তু পিপে থেকে উপচে প'ড়ে জল তো গড়িয়ে যাবে, তাদের তুমি পাকড়াবে কেমন করে?

এই কথা শুনে সে আমাকে মোটা-মাথা মূর্খ বলে গালাগালি দিয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলল তার স্ত্রী বেরিয়ে আসার পর পিপেতে যে জলটুকু কমে যাবে সেটুকু আবার ভর্তি করে নিলেই চলবে। যে জলটুকু নতুন করে ঢেলে দেওয়া হবে সেইটুকু পিপের জলের সঙ্গে মেপে নিলেই কাজ মিটে যাবে। ধর, দশ বালতি। ওরই ওজন এক কিউবিক মিটার হবে।

হতচ্ছাড়াটা মাতাল হয়েও নির্বোধ হয় নি, হুজুর।

আর বিস্তারিতভাবে না বলে ছোট করছি ধর্মাবতার। তাদের বাড়ি গিয়ে মেয়েমানুষটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। তাকে আপনি সুন্দরী

বলতে পারবেন না। ওই তো ওখানে বসে রয়েছে। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি কি না। আমি নিজের মনে-মনেই বললাম: ওই-ই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু সুন্দরীই হোক, বা কুৎসিতই হোক, কী আসে যায় তাতে? সুন্দরী হলেও যে কাজ করবে, কুৎসিত হলেও সেই কাজই করবে। তাই না, ধর্মাবতার? তাছাড়া আমি দেখলাম মেয়েটি রোগা-প্যাটকা। আমি মনে-মনে বললাম—মেয়েটার দাম চারশ লিটারের বেশী হবে না। মদের ব্যবসা করার জন্যে আমি এসব বুঝি।

কী ঘটেছে মেয়েটা আগেই তা বলেছে। যদিও ওকে কিনতে গিয়ে আমার ক্ষতিই হয়েছিল, তবু শেমিজ আর মোজা পরে থাকতে আমরা আপত্তি করি নি, সব কিছু শেষ হওয়ার পরে ও ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি বললাম: ওই দেখ ক্রমঁা, তোমার বউ ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

সে বলল: ভাববার কিছু নেই। আমরা ওকে সহজেই ধরে ফেলতে পারি। ডিমে তা দেওয়ার জন্যে আবার ও বাড়িতে ফিরে আসবে। কতটা কম পড়লো সেটা আমরা মেপে নিই এস।

আমরা মাপ করতে বসলাম। এমন কি চার বালতির বেশী হল না। হা-হা-হা।

কয়েদীটি এত জোরে হেসে উঠলো যে একজন পুলিশ এসে তার পিঠ চাপড়ে দিল।

হাসি থামার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে সে আবার সুরু করল: ছোট করে বলছি। ক্রমঁা বলল: মোটেই তা নয়। এতে আমার হবে না।

এই শুনে আমি চীৎকার করে উঠলাম; সে চীৎকার করল; তার পরে আমি চীৎকার করে তার গলাকে ডুবিয়ে দিলাম। আমি তাকে ঘুষি মারলাম; সে আমাকে এলোপাথাড়ি লাথি মারল। এই মারামারি ঝাঁপাঝাঁপি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত চলত; কারণ আমরা দুজনেই মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। তার পরে পুলিশ এসে হাজির হল। তারা আমাদের গালাগালি দিল, খিস্তি করল, লাঠির বাঁট দিয়ে পেটালো, তার পরে জেলে ধরে নিয়ে এল। এর সঙ্গে আমি ক্ষতিপূরণ দাবি করি।

এই বলেই সে বসে পড়ল। সে যা বলল ক্রমঁা তার সবটুকুই সমর্থন করল। জুরীরা হতচকিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্যে অন্য ঘরে চলে গেলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা ফিরে এসে কয়েদীদের খালাস করে দিলেন; সেই সঙ্গে বিবাহের পবিত্রতার ওপরে কড়া কিছু উপদেশ দিয়ে ব্যবসায়িক চুক্তি কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে সে বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন।

ক্রমঁা স্ত্রীকে নিয়ে তার বাড়ি ফিরে গেল; কর্নু ফিরে গেল তার সরাইখানায়।

প্রতিশোধ

(Vendetta)

বনিফ্যাকোর গড়ের ওপরে একটি ছোট কুঁড়েতে প্যাওলো সাভেরিনির বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করত। পাহাড়ের যে অংশটি ছুঁচোল হয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তারই ঢালুতে সহরটি গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে পাথর ছড়ানো প্রণালীর ওপর দিয়ে সার্ডিনিয়ার নিচু সমুদ্রোপকূল দেখা যায়। অন্যদিকে এটিকে ঘিরে ছিল বিরাট একটি পাহাড়ী ফাটল; দেখলে মনে হোত ওটি একটি বিরাট পথ। এইটি কাজ করত বন্দরের। এই খাড়িটি ধরে প্রথম যেখানে বসতি গড়ে উঠেছিল সেখান পর্যন্ত ছোট-ছোট ইতালিয় আর সার্ডিনিয়ার জেলে ডিঙি আসা-যাওয়া করত; আর পনের দিনে একবার আসত অ্যাজ্যাকয়ো থেকে ঝড়-বিধ্বস্ত পুরনো স্টীমার। এই সাদা পাহাড়ী চত্বরে জোট-বাঁধা বাড়িগুলিকে আরও চকচকে সাদা দেখাতো। যে খাড়িগুলির ভেতরে কোন দিন কোন জাহাজ ঢুকতে ভরসা পেত না সেইগুলির ওপরে পাহাড়ের গায়ে লাগোয়া বাড়িগুলিকে দেখলে শিকারী পাখি বলে মনে হোত। সমুদ্র আর তার অনুর্বর উপকূলভাগের ওপর সামান্য কয়েক গাছা ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই অঞ্চল চির-কালই বাত্যাবিক্ষুব্ধ। সরু অগভীর খাড়ির ওপর দিয়ে নির্মমভাবে প্রবাহিত হয়ে এই ঝড় সমুদ্রের দুটি উপকূলকেই বিধ্বস্ত করে ফেলত। চারপাশে জলের ওপরে অসংখ্য কালো পাথরের মাথা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; ছেঁড়া-কাপড়ের টুকরোর মত অসংখ্য সাদা ঢেউ-এর ফেনা ওই সব ছুঁচোল পাহাড়ের মাথার চারপাশে ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে পড়ত।

বিধবা সাভেরিনির ঘরটি ওই পাহাড়ের একেবারে প্রান্তদেশে। সেই ঘরের তিনটি জানালাই ছিল সমুদ্রের ওই নিরানন্দ প্রণালীর দিকে খোলা। সেখানে সে তার ছেলে 'আনতোয়াঁ আর তাদের কুকুর সেমিলান্তিকে নিয়ে থাকতো। বিরাট চেহারা এই কুকুরটির, দীর্ঘ, খসখসে চামড়া। শিকার করতে যাওয়ার সময় ছেলেটি একে সঙ্গে নিয়ে বেরোত।

একদিন সন্ধ্যায় নিকোলা রাভোলাতির সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। তারই ফলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আনতোয়ার বুকে ছুরি মেরে সেই রাত্রিতেই সার্ডিনিয়াতে পালিয়ে যায়।

কতকগুলি পথচারী ছেলেটির মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌছিয়ে দেয়। বৃদ্ধ মা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলে নি; চুপ করে তার ছেলের মৃতদেহটির দিকে নিষ্পলক চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে বসেছিল। তারপর তার সেই দুর্বল

একটি হাত মৃতদেহের ওপরে রেখে সে প্রতিজ্ঞা করে যে এই হত্যার প্রতিশোধ সে নেবে। কাউকেই সে তার কাছে থাকতে দিল না। ছেলের মৃতদেহটি নিয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কুকুর সেমিলান্তি তার সঙ্গে রইল কেবল। প্রভুর বিছানার দিকে মাথাটা বাড়িয়ে পেছনের দুটি পায়ের ভেতর লেজ ঢুকিয়ে সে চীৎকার করতে লাগল। মা কিংবা কুকুর কেউ সেখান থেকে নড়লো না। ছেলের মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে মা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল; বড়-বড় জলের ফোঁটা নিঃশব্দে চোখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। একটা থস্‌থসে জ্যাকেট পরে ছেলেটি ওপর দিকে মুখ করে শুয়েছিল; মনে হচ্ছিল সে যেন ঘুমোচ্ছে। বুকের কাছে তার জ্যাকেটের কিছুটা অংশ ছেঁড়া, গর্ত করা। আততায়ীর ছোরা তার বুকের মধ্যে ঢোকার সময় ওই ভাবে ওটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার সার্ট, ওয়েস্ট কোট, ট্রাউজার—সর্বত্র রক্ত বোঝাই। সার্টটা ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে তার বুকের ক্ষতটা বেরিয়ে পড়েছিল। তার দাড়ি আর চুল জমাট-বাঁধা রক্তে ভরে উঠেছিল।

বুড়ী মা তার সেই মরা ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার স্বর শুনে কুকুরটা তার আর্তনাদ থামালো।

মা বলল: হায় পুত্র, আমার হতভাগ্য পুত্র; কোন ভয় নেই তোমার। এ-হত্যার প্রতিশোধ আমি নেব, তুমি শান্তিতে ঘুমোও। আমি তোমাকে বলছি, এ-হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই। তোমার মা প্রতিজ্ঞা করছে; তুমি জান, নিজের প্রতিজ্ঞা সে আজ পর্যন্ত কোনদিনই ভাঙে নি।

ধীরে-ধীরে খুব আস্তে-আস্তে সে মাথা নিচু করে তার ঠাণ্ডা দুটি ঠোঁট মরা ছেলেটির মুখের উপর চেপে ধরল।

সেমিলান্তি আবার চীৎকার করতে সুরু করল—সেই চীৎকার দীর্ঘ, হৃদয়-বিদারক, ভয়ানক। এই ভাবে ওই বৃদ্ধা এবং তার কুকুর সারারাত ওই ঘরের মধ্যে বসে রইল, সেই সকাল পর্যন্ত।

পরের দিন আনতোইন সাভেরিনিকে কবর দেওয়া হল; এবং বনিফ্যাকোর জনগণের কাছ থেকে তার নাম চিরদিনের জন্যে মুছে গেল।

ছেলেটির কোন ভাই ছিল না; ছিল না কোন পুরুষ আত্মীয়। তাদের সংসারে এমন কোন পুরুষও ছিল না যে হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। সংসার বলতে ওই বুড়ী মা। কী করবে, কেমন করে সে প্রতিশোধ নেবে—বসে-বসে এই কথাই সে দিনরাত ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই প্রণালী ছাড়িয়ে সমুদ্রের উপকূলে একটি ছোট্ট সাদা ভূখণ্ড সে দেখতে পেত। লংগোসার্ডোর ছোট সার্ডিনিয়া গ্রামটি ওইখানে। খুব বেশী রকম তাড়া খেলে কর্সিকার ডাকাতেরা ওইখানে আত্ম-গোপন করে থাকত। সত্যিকথা বলতে কি ওরাই ক্ষুদে গ্রামটির মূল অধিবাসী। তাদের দেশের ভূখণ্ডটিকে চোখের সামনে রেখে তারা অকাজ কুকাজ করত;

তারপরে, সুযোগ পেলেই সেখানে পালিয়ে যেত। সে জানত নিকোলা ওই গ্রামেই আস্তানা নিয়েছে।

সারা দিনই সে জানালার ধারে বসে সামনের ওই ভূখণ্ডটির দিকে তাকিয়ে থাকত। ভাবত, কেমন করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই; সে দুর্বল, বৃদ্ধা; তার দিন শেষ হয়ে আসছে। এ-অবস্থায় কেমন করে সে প্রতিশোধ নেবে? কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা সে করেছে, তার মৃত পুত্রের দেহের কাছে বসে সে প্রতিজ্ঞা করেছে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে। সেকথা সে ভুলতে পারে নি; আর সে দেরী করতে সাহস করছে না।

কী সে করবে? রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারে না; এক মুহূর্ত তার বিশ্রাম নেই; মনে তার শান্তি নেই এক মুহূর্তের জন্যে। কী করবে তারই পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার পায়ের কাছে সেমিলান্তি পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। অথবা তারও চোখে ঘুম নেই। মাঝে-মাঝে সে মাথা তুলে এদিকে-ওদিকে তাকায়; তারপরে তীক্ষ্ণ মর্মভেদী চীৎকারে ঘরটাকে কাঁপিয়ে তোলে। তার প্রভু অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে এই ভাবে চীৎকার করাটা তার একটা অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। এই রকম চীৎকার করে কুকুরটা যেন তার অদৃশ্য মনিবটিকে ডাকতে থাকে। তাকেও যেন সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না আর; তার সেই কুকুরীর হৃদয় থেকে সে-ও যেন তার মনিবের স্মৃতিটা মুছে ফেলতে পারছে না।

একদিন রাত্রিতে অন্য দিনের মত কুকুরটা সেদিনও ঘ্যান-ঘ্যান করছিল, হঠাৎ বৃদ্ধা মহিলাটি জেগে উঠল। একটা বর্বর প্রতিহিংসার নৃশংস পরিকল্পনা তার মাথায় জেগে উঠেছে। এই পরিকল্পনা নিয়ে সকাল পর্যন্ত সে ভাবলো। সকাল হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গির্জায় হাজির হল। সেই পাথরের মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল; তারপরে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তার মত দুর্বল বৃদ্ধাকে সাহায্য করার প্রার্থনা জানালো।

প্রার্থনা সেরে বাড়িতে ফিরে এল সে। উঠোনে তাদের মুখখোলা একটা পুরানো পিপে ছিল। সেই পিপের মধ্যে জল ধরে রাখা হোত। উপুড় করে পিপেটা খালি করে ফেলল সে। তারপরে কিছু কাঠ আর পাথর দিয়ে সেটাকে শক্ত করে দুয়ারে বাঁধলো। তারপরে কুকুরটাকে তার ঘরে বেঁধে রেখে নিজের ঘরে ফিরে এল।

সার্ডিনিয়ার উপকূলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো। হত্যাকারী ওইখানে রয়েছে।

সারা দিন সারা রাত কুকুরটা চেঁচালো। পরের দিন সকালে বৃদ্ধাটি তাকে খানিকটা শুধু জল দিল এবং সুপ বা রুটি কোন খাবারই দিল না। আরও

একটা দিন কাটলো। কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিন সকালে তার দুটো চোখ জলজল করে জলে উঠলো, তার রোঁয়াগুলি ফুলে-ফুলে উঠলো; সে মরীয়া হয়ে তার গলায় দড়িটা ছেঁড়ার চেষ্টা করল। তবু বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে কিছু খেতে দিল না। খিধেতে পাগল হয়ে কুকুরটা প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো। রাত্রিটাও ওইভাবে কেটে গেল।

সকাল হলে বৃদ্ধাটি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে দুটি খড়ের আঁটি চেয়ে নিয়ে এল। তার স্বামী যে পোশাক ব্যবহার করত সেই সব কিছু পুরনো পোশাক জড় করল; সেগুলির মধ্যে খড় ঢুকিয়ে দিয়ে একটি মানুষের প্রতিকৃতি তৈরী করল; মাথা তৈরী করলো পুরনো কিছু ন্যাকড়া দিয়ে। তারপরে কুকুরের ঘরের কাছে সেই প্রতিকৃতিটিকে খুঁটো পুঁতে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখলো।

এই অদ্ভুত মূর্তিটির দিকে কুকুরটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল; খিধেতে মর-মর হওয়া সত্ত্বেও সে চীৎকার করা থামিয়ে দিল।

বৃদ্ধাটি একটি কসাই-এর কাছ থেকে খানিকটা কালো শুয়োরের মাংস কিনে নিয়ে এল। বাড়ি ফিরে উঠোনে কুকুরের ঘরের কাছে আগুন জেলে সেই কালো থলথলে মাংসটাকে ভাজলো। মাংসের গন্ধে কুকুরটা ঘরের মধ্যে লাফাতে সুরু করল। ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে সে সেই দিকে তাকাতে লাগলো; তার মুখ দিয়ে ঝরতে লাগলো লালা।

মহিলাটি সেই গরম মাংসের তালটা নিয়ে খড়ের প্রতিমূর্তির গলায় গলবন্ধের মত জড়িয়ে দিল। জোর ক'রে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন সেটাকে সে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। তারপরে খুলে দিল কুকুরটাকে।

প্রচণ্ড রাগে গরগর করতে করতে কুকুরটা প্রতিকৃতির গলার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল; তারপর দুটো থাবা কাঁধের ওপরে তুলে দাঁত দিয়ে সেটাকে ছিঁড়তে সুরু করল। প্রতিকৃতির চোয়ালের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে দিয়ে সে নেমে এল; আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বিগুণ বেগে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল, মাংসের কিছুটা অংশ মুখে করে টেনে নিল, এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়াল, তারপর আবার প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলতে-ফুলতে নতুন করে আক্রমণ করল। একটা আরণ্যক উন্মাদনায় সে প্রতিকৃতির মুখটা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে একেবারে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

ধীর স্থিরভাবে নিঃশব্দে বৃদ্ধা মহিলাটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখল। তার চোখ দুটো জলজল করতে লাগল। তারপরে সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটাকে সে বেঁধে দিল। পর পর দুদিন ধরে তাকে অনাহারে রেখে তৃতীয় দিন সেই একইভাবে সেই অদ্ভুত পরীক্ষাটি চালালো। পরের তিনটি মাস ধরে এই ধরনের আক্রমণ করতে আর তার খাবারটা ছিনিয়ে আনতে অভ্যস্ত করলো কুকুরটাকে; আর তাকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন হল না; মনিবের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সে ওই প্রতিকৃতিটির গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্রতিকৃতির গলার মধ্যে যখন কোন মাংসও থাকত না তখন সে অমনি করে ঝাঁপাতো। তারই পুরস্কার স্বরূপ ভদ্রমহিলা প্রতিবারই তাকে কালো মাংসের দলা খাওয়াতো।

প্রতিকৃতিটাকে দেখা মাত্র কুকুরটা উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে তার মনিবের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করত। মনিব তার আঙুল উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলত : ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফ্যাল।

সেদিনটা ছিল রবিবারের সকাল। আসল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এল তার। ভদ্রমহিলা ভক্তি গদগদ চিত্তে নিজের মনের বাসনা ব্যক্ত করে দোষ স্খালনের চেষ্টায় গির্জায় গেল। তারপরে একটি অনাহারে জর্জরিত বৃদ্ধ পুরুষ ভিক্ষুকের পোশাকে আত্মগোপন ক'রে সার্ডিনিয়ার একটি জেলে মাঝির সঙ্গে রফা করল; তাকে আর তার কুকুরটিকে সার্ডিনিয়ার উপকূলে পৌছিয়ে দিতে সে রাজি হল।

কাপড়ের থলেতে সে একটা বড় টুকরো কালো থলথলে মাংস নিয়েছিল। কুকুরটাকে পর-পর দুদিন অনাহারে রাখা হল। তার মনিব মাংসের গন্ধ শুঁকিয়ে সারা পথটা তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করে রেখেছিল।

দু'জনে লংগোসার্ডো গ্রামে প্রবেশ করল। বৃদ্ধাটি একটি রুটিওয়ালার কাছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে নিকোলা র‍্যাভোলাতির বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞাসা করল। নিকোলা তার আগের কাজে ফিরে গিয়েছে। বৃদ্ধাটি জানতে পারল যে সেই সময় নিকোলা ওই দোকানেরই পেছনে একটা ঘরে একলা কাজ করছে।

বৃদ্ধাটি দরজা ঠেলে ডাকলো : নিকোলা, নিকোলা।

নিকোলা ঘুরে দাঁড়ালো।

কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধাটি বলল : ছেঁড়, ছেঁড়, ছিঁড়ে ফ্যাল ওটাকে।

উন্মত্ত জানোয়ার লোকটার গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। লোকটি তার দুটী হাত বিস্তারিত করে জানোয়ারটার সঙ্গে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করল; দুজনে জড়াজড়ি করে মেঝের ওপরে গড়াগড়ি দিতে লাগল। মেঝের ওপরে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোকটি বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিলো কিছুটা; তারপরে সে চুপচাপ পড়ে রইল। কুকুরটি তার গলাটা কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

নিজেদের ঘরের দরজায় বসে জনদুই প্রতিবেশীর মনে হল তারা যেন নিকোলার বাড়ি থেকে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুককে বেরিয়ে আসতে দেখেছে; তার পেছনে একটি রোগা কালো কুকুর। তার মনিব তাকে কটা রঙের কিছু একটা খেতে দিল। সেই খাবারটা চিবোতে চিবোতে কুকুরটা তার মনিবের পিছু-পিছু আসছিল।

সন্ধ্যের দিকে বৃদ্ধাটি আবার তার বাড়িতে ফিরে এল।

সেই রাত্রিতে ঘুমটা তার ভালই হয়েছিল।

গ্রামে

(In the Country)

একটা পাহাড়ের নীচে দুটো খড়ের ঘর পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। সেই দুটি বাড়িতে দুটি চাষী বাস করত। বাচ্চাকাচ্চাদের মানুষ করার জন্যে অনুর্বর জমি থেকে ফসল ফলাতে কী পরিশ্রমই না করতে হোত তাদের। ছ'বছর থেকে পনের মাস বয়সের বাচ্চা ছিল প্রতিটি সংসারে চারটি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই সব বাচ্চারা ঘরের সামনে হুল্লোড় করে বেড়াতো। দুটি দম্পতিই বিবাহ করেছিল; আর তাদের ছেলেমেয়েরাও জন্মেছে প্রায় একই সময়ে।

বাচ্চাগুলো মিশে একাকার হয়ে গেলে তাদের বাবা অথবা মা তাদের আসল বাচ্চাকে খুঁজে বার করতে প্রায়ই পারতো না। আটটা নামই তাদের মগজের মধ্যে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে বসেছিল; এবং কাউকে নাম ধরে ডাকার সময় পুরুষরা প্রায় একসঙ্গে চার পাঁচটা নাম উচ্চারণ না ক'রে আসল নামটা খুঁজে বার করতে পারত না।

ছোট জলাশয় থেকে সামান্য কিছু দূরে, দুটি বাড়ির প্রথমটিতে বাস করত তুভাচী। তার ছিল তিনটি ছেলে আর একটা মেয়ে। অন্য কুঁড়ে ঘরে থাকত ভ্যালিঁরা। তাদের ছিল তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে। সুপ, কিছু আলু আর বিশুদ্ধ বাতাসের ওপরে নির্ভর ক'রে দুটি সংসারই বেশ হিসাব করে দিন চালাতো। মেয়েরা যেমন করে পাঁতিহাসের বাচ্চাগুলিকে জড় করে, এরাও তেমনি সকাল সাতটায়, দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলায় সেই রকম বাচ্চাগুলিকে নিজেদের ঘরে জড় ক'রে খেতে দিত। বয়সের অনুপাতে এই বাচ্চাগুলি পর-পর একটা কাঠের টেবিলের ধারে বসতো। পঞ্চাশ বছরের ব্যবহারে টেবিলটা বেশ মসৃণ চকচকে হয়ে উঠেছিল। আলু, আধখানা কপি আর দু'তিনটে পেঁয়াজ একসঙ্গে সিদ্ধ ক'রে একটা গামলায় কানায়-কানায় ভর্তি করা হোত। তার ওপরে কয়েকখানা রুটি দিয়ে খানা তৈরী হোত তাদের। সেই খাবার বাচ্চারা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে শেষ করত। সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটাকে মা নিজেই খাওয়াতো। কেবল রবিবার একটু সেদ্ধ মাংস তাদের দেওয়া হোত। সেদিন বাবারা ধীরে ধীরে খেতো, বলতো: রোজই যদি এই রকম খানার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

আগস্ট মাসের এক অপরাহ্নে সেই কুঁড়ে দুটির সামনে একটা হালকা ধরনের গাড়ী এসে থামলো।

গাড়ী চালাচ্ছিল একটি যুবতী। সে তার পাশের পুরুষটিকে বলল: দেখ, দেখ; বাচ্চাগুলোকে দেখ। ধুলোর ওপরে ডিগবাজি খাচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের।

যুবতীটির সঙ্গী কোন উত্তর দিল না। সে যুবতীটির এই ধরনের আবেগের

সঙ্গে পরিচিত ছিল। এগুলির ভেতরে একটা ছুল ছিল, তিরস্কার-তিরস্কার মনে হোত তার।

যুবতীটি বলতে লাগল: আমি ওদের চুমু খাব। ওদের একটাকে পেলে কি আনন্দ হোত আমার—বিশেষ করে ওই সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা।

এই বলেই সে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে বাচ্চাদের দিকে ছুটে গেল; তুভাচী সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে তার সেই ময়লা মুখ, কাদা মাখানো সুন্দর কুঁচকানো চুল, আর ছোট-ছোট গাল দুটোকে চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিল। আর ছেলেটা এই বিরক্তিকর আদরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় কিলবিল করতে লাগল। তারপর সে তার গাড়ীতে ফিরে গেল। পরক্ষণেই বেশ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ীটা। পরের সপ্তাহে সে আবার এল; মাটিতে বসে সেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল, অনেকগুলি কেক খাওয়ালো; অন্যান্যদের মিষ্টি খাওয়ালো; রাস্তার মেয়েদের মত তাদের সঙ্গে খেলা করল। আর তার স্বামী গাড়ীতে চুপচাপ বসে রইল তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে।

এই ভাবে বারবার আসতে লাগল সে। সঙ্গে আনতো নানা রকমের মুখরোচক খাবার আর পয়সা; ওদের বাপ-মায়েদের সঙ্গে ও আলাপ করল। তার নাম মাদাম হেনরী দ্য লুবেরী।

একদিন সকালে তার স্বামী তাদের হালকা গাড়ী থেকে নেমে তাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেল। ছেলেদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তার বেশ পরিচয় গড়ে উঠেছিল। তবু সে আজ তাদের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করল না; সেই কুঁড়ে ঘর দুটির মধ্যে একটিতে সোজাসুজি ঢুকে গেল। তুভাচী দম্পতি তখন ঘরেই ছিল। রান্নার জন্যে তখন তারা কাঠ চেরাই-এর কাজে ব্যস্ত। এই ভদ্রমহিলা আর তার সঙ্গে ভদ্রলোকটিকে দেখে তারা দুজনেই চমকে উঠলো; আগন্তুকদের বসতে চেয়ার এগিয়ে দিল; তারা কেন এসেছে সেটা জানার জন্যে তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'বন্ধুগণ, আমি তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছি, কারণ আমার ইচ্ছে,···আমি তোমাদের ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে যাই।'

উত্তর দেবে কী, ওই চাষী আর তার স্ত্রী দুজনেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগন্তুক যে ঠিক কী বলতে চায় তার বিন্দুবিসর্গও তারা বুঝতে পারল না।

বুঝিয়ে বলল মহিলাটি: আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। আমরা একা, আমি এবং আমার স্বামী। আমি ওটিকে রাখতে চাই আমার কাছে—তোমরা রাজি আছ?

চাষী মেয়েটি এবারে যেন বুঝতে পারলো কথাটা; বলল: আপনি আমাদের সার্লটকে নিয়ে যেতে চান? নিশ্চয় না।

আগন্তুক মহিলার স্বামী বলল: আমার স্ত্রী ব্যাপারটা তোমাদের মোটেই

ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারে নি। তোমার বাচ্চাটিকে আমার দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চাই; কিন্তু সে তোমাদের দেখতে আসবে। যদি ও শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত হয়, না হওয়ার কোন কারণ আমরা দেখছি না, তাহলে ও-ই আমাদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আমাদের যদি কোন সন্তান হয়, তাহলেও তার সঙ্গে আমাদের সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে। যদি ও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ না করে, অর্থাৎ আমাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন না করতে পারে, তাহলেও সাবালক হলে ওকে আমরা কুড়ি হাজার ফ্রাঁ দেব। ওই টাকাটা এখনই আমরা ওর নামে আলাদা করে জমা দিতে রাজি। তোমাদের কথাও আমরা ভেবে দেখেছি। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন তোমাদের আমরা একশ ফ্রাঁ ক'রে মাসোহারা দেব। এখন আমাদের বক্তব্যটা বুঝতে পারলে তোমরা?

চাষী মেয়েটি রাগে গরগর করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠলো: আপনারা কি চান আমাদের সার্লটকে বিক্রী করে দেব। কোন মায়ের কাছে তার ছেলেকে বিক্রী করার বেশ সুন্দর প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, তাই না? না, না; এ অসম্ভব, ভয়ানক।

তার স্বামীটিকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত এবং গম্ভীর মনে হল। মুখে কিছুই বলল না সে; কিন্তু তার মাথা নাড়ার ধরণ দেখে বোঝা গেল এদিক থেকে স্ত্রীর সঙ্গে সে-ও একমত।

এদের কথা শুনে আগন্তুক যুবকটি হতাশ হয়ে কাঁদতে সুরু করল। চরিত্রের দিক থেকে যুবতীটি সেইজাতীয় যারা জীবনে কোন দিন কোন কিছু চেয়ে বিফল হয় নি; যে-কোন উপায়ে তা সংগ্রহ করেছে। সে কাঁদতে-কাঁদতে তার স্বামীর দিকে চেয়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল: হেনরী, ওরা দেবে না, ওরা দেবে না।

শেষ চেষ্টা করল তারা: বন্ধুগণ, তোমাদের ছেলের ভবিষ্যতের কথা, তার সুখের কথাটা ভেবে দেখ...

রাগে গর-গর করতে করতে চাষী মেয়েটি তাঁদের থামিয়ে দিল: আমি সব জানি, সব রকম ভেবেছি আমরা। আপনাদের মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। আপনারা এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান। ছেলেটাকে এইভাবে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব—বুঝিনে আমরা।

আগন্তুকরা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় যুবতীটির মনে হল দুটি বাচ্চাকে সে দেখেছে। একটি বয়ে-যাওয়া, গোঁয়ার, এবং অতিরিক্ত ব্যস্তবাগীশ মেয়ের মত কাঁদতে-কাঁদতে সে জিজ্ঞাসা করল: আমি একটি যে বাচ্চা দেখলাম সেটি কার, তোমার?

তুভাচী বলল: না; ওই পাশের বাড়ির, ইচ্ছে হলে ওদের বাড়িতে দেখতে পারেন।

এই কথা বলেই সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। তার স্ত্রীর তর্জন-গর্জনে তখনও ঘরটা কাঁপছিল।

একটি মাত্র প্লেটে সামান্য মাখন মাখিয়ে কয়েক টুকরো রুটি চিবোচ্ছিল ভ্যালী দম্পতি। যুবতীটির স্বামী তার সেই আগের প্রস্তাবটি তাদের কাছে দিল, কিন্তু এবারে একটু সতর্কতার সঙ্গে। এবারে সে অনুরোধটা একটু বেশী করেই করল, যুক্তিটা রাখলো একটু বেশী আঁটঘাঁট বেঁধে; প্রথমে কৃষক দম্পতি অসম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লো; কিন্তু যখন তারা জানতে পারলো যে মাসোহারা হিসাবে তারা একশ ফ্রাঁ পাবে তখনই তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল; প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য কি না তাই বোঝার জন্যে পরস্পরের দিকে প্রশ্নাত্মক ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখলো; মনে হল, তাদের দৃঢ়তার দেওয়ালে যেন একটা চিড় খেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে তারা চুপ করে বসে রইল। কী করবে, কী তাদের করা উচিত কিছুই বুঝতে পারল না তারা—একটা অস্বস্তি তাদের অস্থির করে তুলল।

শেষকালে কৃষক পত্নীটি তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি বল?

নীতিবাক্য বলার ভঙ্গীতে কৃষকটি উত্তর দিল: প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

এতক্ষণ আগন্তুক যুবতীটি, অর্থাৎ মাদাম দ্য হুবেয়ার্স, একটা অনিশ্চিত দুর্ভাবনায় কাঁপছিল। এইবার সে ছেলেটার ভবিষ্যতের কথা বলল, তার সুখের কথা বলল, ভবিষ্যতে তাদের যে অর্থ দেওয়া হবে সে কথাও বিস্তারিতভাবে তাদের জানিয়ে দিল।

কৃষকটি জিজ্ঞাসা করল: আমাদের যে আপনারা বছরে বারশ ফ্রাঁ দেবেন বলছেন, সে কথাটা একজন আইনজ্ঞের কাছে আপনারা প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারবেন?

মঁসিয়ে দ্য হুবেয়ারস বললেন: নিশ্চয়। কাল সকালেই আমরা এর ব্যবস্থা করব।

কৃষকপত্নী ব্যাপারটা আর একটু চিন্তা করে দেখছিল; এবারে সে বলল: আমাদের ছেলের বদলে একশটা ফ্রাঁ যথেষ্ট নয়। আর কয়েক বছরের মধ্যে সে কাজ করতে পারবে। মাসোহারা একশ কুড়ি ফ্রাঁ ধার্য করুন।

মাদাম এতক্ষণ অধীর হয়ে পা ঠুকছিল। এই প্রস্তাব সে তখনই সরাসরি মেনে নিল। বাচ্চাটাকে সে তখনই তুলে নিয়ে যেতে চায়। তাই সে কৃষক দম্পতিকে দু'শ ফ্রাঁ উপঢৌকন দিল। আর তার স্বামী মঁসিয়ে হুবেয়ারস চুক্তিটা কাগজে লিখে ফেলল। স্থানীয় মেয়র আর একজন প্রতিবেশীকে ডেকে আনা হল। সাক্ষী হিসাবে তাঁরাও চুক্তিপত্রে সই করলেন।

যুবতীটি বিজয়িনীর মত ক্রন্দনরত শিশুটিকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে চলে

গেল ; মনে হল, খুব পছন্দ হয়েছে এই রকম একটা সুন্দর খেলনা সে দোকান থেকে কিনে নিয়ে চলেছে। শিশুটির বাবা এবং মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে চুপ করে সব দেখলো।

শিশু জাঁ ভালিঁর বিষয়ে আর কিছু শোনা যায় নি। প্রতি মাসে একশ কুড়ি ফ্রাঁ আনার জন্যে তার বাবা-মা উকিলের বাড়ি যেত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হল ; তুভাচী মহিলাটি টিটকিরি দিয়ে-দিয়ে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। নিজের ছেলেকে বিক্রী করে দেওয়া যে কতটা অস্বাভাবিক, ভয়ানক, ঘৃণ্যকর সেই কথাটা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সকলকে সে বলে বেড়াতে লাগলো। এবং মাঝে-মাঝে তার বাচ্চা সার্লটকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলত [সব কথা বোঝার মত ক্ষমতা বাচ্চাটার যেন হয়েছে !] : সার্লট মণি, আমি তোমাকে বিক্রি করি নি ; আমি তোমাকে বিক্রী করি নি। নিজের সন্তানদের বিক্রী করিনে আমি। আমি বড়লোক নই ; তবু আমি নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রী করিনে।

দিনের পর দিন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত অপমানজনক কথা আর অপবাদ সে ছুঁড়তে লাগলো ; সেগুলি প্রতিবেশীদের গায়ে এসে লাগতে ভুল করল না। অবশেষে তুভাচী জননী সারা গ্রামের মধ্যে সেরা জননী বলে নিজেকে ভাবতে লাগলো। কারণ ? কারণ সে নিজের ছেলেকে বিক্রী করে নি। সবাই বলতে লাগলো : ঘটনাটা খুব লোভনীয় ছিল সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও, সে সৎ মা-এর মতই কাজ করেছে।

অনেকেই তাকে আদর্শ জননী বলে অভিহিত করল। সার্লটের বয়স হল আঠারো। তাকে যে তার মা পয়সার অভাবে বিক্রী করে দেয় নি এই কথা শুনে-শুনে তার মনেও একটা ধারণা জন্মালো যে সঙ্গীদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু মানের।

মাসোহারার দৌলতে ভ্যালিঁরা মোটামুটি ভালভাবেই দিন কাটাতে লাগলো ; তুভাচীদের অবস্থার পরিবর্তন হল না কিছু। আগের মতই দরিদ্র রয়ে গেল তারা। প্রতিবেশীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তুভাচীদের অমন চরম শত্রুতার আসল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বড় ছেলে যুদ্ধে চাকরি নিয়ে গেল। দ্বিতীয় ছেলেটি গেল মারা। বৃদ্ধ বাবা-মা আর দুটি ছোট বোনকে ভরণ পোষণ করার জন্যে যুবক সার্লটকে কঠোর পরিশ্রম করতে হোত। তার বয়স যখন একুশ বছর তখন একদিন সকালে একটি পরিচ্ছন্ন সুবেশ যুবক কুঁড়ে দুটির সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার সোনার ঘড়ির চেন বাঁধা। সে গাড়ী থেকে নেমে একটি বৃদ্ধাকে করমর্দন করল। বৃদ্ধাটি বললেন, হাঁ, ওইটা—ওই দ্বিতীয় বাড়ি।

ভ্যালিঁদের বাড়িতে যুবকটি ঢুকে গেল। গতি তার সহজ ; এটা যেন তার নিজেরই বাড়ি। বুড়ী মা তখন জামা পরিষ্কার করছিল ; দুর্বল বুড়ো বাবা

উনুনের পাশে বসে ঢুলছিল তখন। তাদের দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। যুবকটি বলল: বাবা, কেমন আছ—মা, কেমন আছ?

বিস্ময়ের সঙ্গে তারা চমকে উঠলো। মানসিক উত্তেজনায় মা-র হাত থেকে সাবানটা পড়ে গেল গামলার ভিতরে। আমতা-আমতা করে সে বলল: এই কি আমাদের ছেলে—আমার নিজের ছেলে?

ছেলেটি মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল; তারপর চুমু খেয়ে বলল: মা।

বাবা-ও মনের উত্তেজনায় কাঁপছিল। তবু সে তার স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলল: হ্যাঁ, আবার তুমি ফিরে এসেছ।

এমনভাবে কথাগুলি সে বলল যেন মনে হল একমাস মাত্র ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাওয়ার পরে, তারা প্রতিবেশীদের কাছে তাকে দেখানোর জেদ ধরলো। তারা মেয়র, ডেপুটি মেয়র, গির্জার পুরোহিত, স্কুলের শিক্ষক—সকলের কাছে তাকে নিয়ে গেল।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সার্লট সব দেখলো। সেদিন রাত্রিতে খাবার সময় সে তার বুড়ো বাবা-মাকে বলল: কী মূর্খ তোমরা। ভ্যালি'র বাদুড়বাচ্চাটাকে তোমরাই তাদের নিয়ে যেতে দিয়েছিলে।

বিষণ্ণ অথচ রুষ্ট স্বরে মা বলল: আমরা আমাদের ছেলেকে বিক্রী করতে চাই নি।

তার বাবা একটি কথাও বলল না।

ছেলে বলল: এইভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়াটাকে আমি খুব দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি।

বুড়ো বাবা রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল: তোমাকে আমরা ধরে রেখেছিলাম বলে কি আমাদের দোষ দিচ্ছ তুমি?

তার বাবা খেতে-খেতেই কাঁদতে লাগলো। স্যুপ খেতে গিয়ে অর্দ্ধেকটা তার গায়েই পড়ে গেল। সে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল: নিজের সন্তানের জন্যে চিরজীবন খেটে-খেটে মারা যাওয়ার পুরস্কার এই।

ছেলেটি বেশ চটেই বলল: এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার না জন্মানোই ভাল ছিল। যখন আমি ওই ছেলেটাকে দেখি তখন আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আমি তখন ভাবি—আমার যদি তখন কোন শক্তি থাকতো তাহলে আজ আমি ওরই মত হতাম।

এই বলেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। ওঠার সময় বলল: শোন, আমার মনে হয় এখান থেকে চলে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের দোষ না দিয়ে পারব না। তোমাদের ওপরে আমি বোঝা হয়ে দাঁড়াব। আসল কথাটা হচ্ছে আমি তোমাদের কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবো না।

দুটি বুড়ো মানুষ নিজের মনেই ঘ্যান-ঘ্যান করে চুপ করে রইল; ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়লো তারা।

ছেলেটি বলল: এই বিষয়ে আর কিছু ভাবার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি বরং এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও রুজি-রোজগারের চেষ্টা করি।

সে দরজা খুললো। পাশের বাড়ি থেকে অনেকের গলার স্বর শোনা গেল। যে ছেলেটি তাদের ফিরে এসেছে তাকে নিয়ে ভ্যালিঁরা উৎসব করছে। সার্লট মাটির ওপরে পা ঠুকে তার বাবা-মার দিকে ঘুরে চীৎকার করে বলল: দুটি বৃদ্ধ মুর্খ কোথাকার।

এই বলেই অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখোমুখী

(An Encounter)

ব্যাপারটা আকস্মিক; আকস্মিক ছাড়া আর কিছু নয়। সেদিন সন্ধ্যায় প্রিন্সেসকে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই জন্যে বিরাট বাড়ির প্রতিটি ঘরের দরজাই খুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যারণ দ্য এণ্ডেল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একটা শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরটিতে কেউ ছিল না; একটা ফিকে ম্যাজমেজে আলোতে আচ্ছন্ন ছিল ঘরটি। তারই লাগোয়া বসার ঘরগুলি আলোর রোশনাই-এ ঝলমল করছিল। সকাল হওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী এখান থেকে যেতে পারবেন না জেনে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তিনি একটি ইজিচেয়ার খুঁজছিলেন। দরজা খোলামাত্র সেই প্রশস্ত ঘরের মাঝখানে একটি বড় বিছানা তাঁর নজরে পড়ল, বিছানায় নীল আর সোনালী রঙের ঝালর দেওয়া। ওই বিছানাতে প্রেম কবরস্থ হয়েছে। কারণ প্রিন্সেস বর্তমানে আর যুবতী নেই। বিছানার মাথার দিকে দেওয়ালের ওপরে একটা বড় সাদা চকচকে জ্যোতি তাঁর চোখে পড়ল। একটি খাড়াই জানালার ভেতর থেকে লেকের জল যেমন দেখতে লাগে এটিও অনেকটা সেই রকম। ওটি হচ্ছে প্রিন্সেস-এর আয়না—বড় বিশ্বাসী বন্ধু। কালো ঝালর তার এক-পাশে গুটিয়ে বাঁধা রয়েছে। প্রয়োজনমত ওটিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন ওটিকে নামানো হয় নি। পুরনো দুর্গের চারপাশে যেমন প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায় তেমনি মনে হল ওটির চারপাশে অনেক স্মৃতি এবং অনুশোচনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যারণ আশাই করেন নি যে সেই মসৃণ কাঁচের বুকে গোলাপী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন অপরূপ সুন্দর প্রতিফলন পড়বে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে।

একটু হাসলেন ব্যারণ; বিচলিতও হলেন কিঞ্চিৎ। সেই প্রেম নিকুঞ্জের আঙিনায় একটু চুপ করে দাঁড়ালেন তিনি। হঠাৎ সেই আয়নাটির গভীরে কী যেন নড়ে উঠলো। মনে হল যে প্রেতাত্মাকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেই প্রেতাত্মাই যেন মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে লুকানো নিচু একটি ডিভানের ওপর থেকে একটি পুরুষ আর একটি নারীকে তিনি উঠতে দেখলেন, তারা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ালো, বিদায় চুম্বনে পরস্পরের ঠোঁট একসঙ্গে মিলিত হল। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ ধরা পড়ে গেল ওই স্ফটিকস্বচ্ছ কাঁচের বুকে। ব্যারণ চিনতে পারলেন দু'জনকেই। একজন তাঁর স্ত্রী, আর একজন মার্কুইস দ্য সারভিগনি। একটি শক্ত মানুষের পক্ষে যতটা সংযত হওয়া সম্ভব ততটা সংযত নিজেকে করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন; এবং তার পরে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু ঘুমানোর সমস্ত ইচ্ছা তাঁর নষ্ট হয়ে গেল।

স্ত্রীকে একলা পাওয়া মাত্র তিনি বললেন: প্রিন্সেস দ্য রেনীর শোওয়ার ঘরে একটু আগেই তোমাকে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম। পরস্পরের ওপর অভিযোগ করা আর প্রতি-অভিযোগ শোনা, অথবা হইচই করার রুচি আমার নেই। কিন্তু অপরের কাছে নিজেকে আমি হাসির পাত্র ক'রে তুলতে চাই নে। এই জাতীয় অপ্রিয় ঘটনা এড়ানোর জন্যে আমরা নিঃশব্দে বিবাহ-বিচ্ছেদ করব। আমার নির্দেশমত আমার উকিল তোমার সম্বন্ধে যেটুকু করণীয় তা-ই করবেন। যখন তুমি আর আমার বাড়িতে থাকবে না তখন তোমার যা ইচ্ছা যায় করো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নামের পেছনে আমার পদবী জোড়া থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে কেলেঙ্কারী রটতে পারে এমন কোন কাজ যদি তুমি কর তাহলে আমি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

তাঁর স্ত্রী কিছু বলার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে থামিয়ে দিলেন; তারপরে মাথাটা কিঞ্চিৎ নিচু ক'রে অভিবাদনের ভঙ্গিতে আলোচনার সমাপ্তি টেনে তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন সে কথা না বলে বরং বলা যায় তিনি আহত হয়েছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলেন কিছুটা। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে স্ত্রীকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তারপরে ধীরে-ধীরে অবশ্য তাঁর আতিশয্য কিছুটা কমে এসেছিল; এবং যদিও ব্যারণেসের প্রতি সব সময়েই কিছুটা টান তাঁর ছিল, তবু একথা মিথ্যা নয় যে সমাজে বা নাট্যজগতে তিনি তাঁর মনের যাযাবর প্রবৃত্তিটাকেই অনুসরণ করতেন। ব্যারণেসের ভরা যৌবন, টেনে-টুনে চব্বিশ বছর বয়স তাঁর, ছোট-খাট দেখতে, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, এত ফর্সা সাধারণত চোখে পড়ে না। আর রোগা—মানে, বেশ রোগা। ছোট্ট প্যারিসের পুতুলের মত চেহারা—হাবভাব; তেমনি নরম তুলতুলে, আদুরে, অত্যন্ত সুন্দরী, রজময়ী, অত্যন্ত

বুদ্ধিমতী, সৌন্দর্যের চেয়ে লাবণ্যের অংশটাই ছিল তাঁর বেশী।

ব্যারণ তাঁর ভাইকে গোপনে বলেছিলেন—আমার স্ত্রী খুব মিষ্টি... পুরুষেরা সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওই দুটি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নেই। আমার স্ত্রী এক গ্লাস শ্যাম্পেনের মত, সবটাই ফেনায় টইটম্বুর, খেতে মিষ্টি লাগে; কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়।

যন্ত্রণাদায়ক নানা চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর মনের ওপর দিয়ে উন্মত্ত ক্রোধের ঝড় বয়ে গেল। মার্কুইসের ঘাড় মটকে দেওয়ার একটা বর্বর ইচ্ছাও তাঁর মনে জাগলো। ইচ্ছে হল তখনই তিনি ক্লাবে ছুটে গিয়ে মার্কুইসের মাথায় কয়েকটা গাঁট্টা বসিয়ে দেন। তার পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে শালীনতার দিক থেকে ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে নয়, তাঁকে দেখেই লোকে হাসবে; আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আহত আত্মাভিমানের জন্যে যতটা রাগ তার হয়েছে ভগ্ন হৃদয়ের জন্যে ততটা হয় নি।

তিনি শুয়ে পড়লেন; কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে প্যারিসের সবাই জানতে পারলো যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে ব্যারণ আর ব্যারণেস বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন। এই বিচ্ছেদে উভয়েরই সম্মতি রয়েছে। এই বিচ্ছেদ কোথাও কোন রকম গুজব, গালগল্প অথবা আজগুবি কাহিনীর সৃষ্টি করল না।

বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত মহলে দেখা হলে পাছে উভয়েরই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এই ভয়ে ব্যারণ এক বছর ধরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন; পরের গ্রীষ্ম কাটালেন সমুদ্রের তীরে, শরৎকালে বেরোলেন শিকার করতে; শীতের আগে প্যারিসে ফিরলেন না। এর মধ্যে একবারও তিনি ব্যারণেসের সঙ্গে দেখা করেন নি। ব্যারণেসের সম্বন্ধে যে কোন রকম অপ্রিয় গুজব ছড়ায় নি তা অবশ্য তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। সম্ভবত তিনি সাধারণ রীতি নীতি খুব সন্তর্পণে মেনে চলছিলেন; ব্যারণ নিজেও ব্যারণেসের কাছে ওইটুকুই চেয়েছিলেন। প্যারিসে জীবনযাত্রা একঘেয়ে লাগায় আবার তিনি বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। পরের দুটি বছর তিনি তাঁর গ্রামের নির্বাচন কেন্দ্রটিকে ঢেলে সাজালেন। তারপরে তিনি নানা রকম ভোজন উৎসবের আয়োজন করলেন। এতেও প্রায় পনেরটা মাস কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত অসংখ্য খানাপিনার উৎসবে ক্লান্ত, তিতিবিরক্ত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার ঠিক ছ'টি বছর পরে, রিউ দ্য লিলিতে তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলেন তিনি।

এখন বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশে এসে ঠেকেছে; একটু শক্ত হয়েছেন; মাথায় বেশ কয়েকগাছি পাকা চুলও দেখা দিয়েছে। ঠিক এমনি একটা সময়ে তাঁর

মনে একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হল। যারা এক সময়ে সুন্দর ছিল, যৌবনে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে সবাই আকুলিবিকুলি করত, যাদের দিকে এক সময় মানুষ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তারা যখন চোখের ওপরে দেখতে পায় দিন দিন তাদের প্রতি মানুষের সেই চমকপ্রদ অনুভূতিটা কমে যাচ্ছে, তাদের বয়স বেড়েছে, তখন তাদের মনে এই ধরনের একটি বিষাদের সুর জেগে ওঠে।

প্যারিসে ফিরে আসার মাস খানেক পরে ক্লাব থেকে ফিরে আসার পথে একদিন তাঁর ঠাণ্ডা লাগলো; পরে সেটা কাশিতে দাঁড়ালো। শীতের বাকি ক'টা দিন নাইস-এ কাটাতে ডাক্তার তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সেইমত একদিন সোমবার সন্ধ্যায় তিনি রিভিয়েরা এক্সপ্রেস ধরলেন। যখন তিনি স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন তখন গাড়ীটা সবে চলতে সুরু করেছে। তিনি কোন-মতে প্রথম কামরাটিতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন; দেখলেন, তাঁর সামনেই একটা খালি জায়গা পড়ে আছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন দূরে কোণের জায়গাটা আগেই অধিকৃত হয়েছে। যে অধিকার করেছে সে নারী না পুরুষ ঠিক বোঝা গেল না। নানা রকম পোশাক-পরিচ্ছদে তার সারা অঙ্গ একেবারে বোঝাই; দেখলেই মনে হবে, একটা পোশাকের পুঁটলি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সহযাত্রীটিকে আবিষ্কার করার সমস্যাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাত্রির জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি। টুপী খুললেন, গরম পুরু কম্বল দিয়ে দেহটাকে বেশ ভাল করে জড়িয়ে নিলেন, তারপরে ঘুমোতে গেলেন। ঘুম যখন তাঁর ভাঙলো তখন সকাল হয়েছে। আবার তিনি তাঁর সহযাত্রীটির দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন। মনে হল তিনি সারারাত্রি একটুও নড়াচড়া করেন নি; মনে হল তিনি তখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

এই সুযোগে মঁসিয়ে দ্য ইভ্রেল তাড়াতাড়ি প্রসাধনপর্ব শেষ করার চেষ্টা করলেন। চুল আর দাড়ি আঁচড়ালেন; এবং প্রতিটি মধ্যবয়সী মানুষের মুখের ওপরে রাত্রি যে অত্যাচার করে, তার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে তিনি সব রকম ব্যবস্থা নিলেন।

ব্যারণ তার সুটকেশ খুলে বুরুশ বার করলেন এবং নিজেকে কিছুটা ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করলেন। তারপরে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হুইশীল বাজিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। ব্যারণের সহযাত্রীটির ঘুম ভাঙলো; তিনি একটু নড়লেন। তারপরেই আবার ট্রেন চলতে সুরু করল। কামরার মধ্যে তেরচাভাবে কিছুটা রোদ এসে পড়লো; ঘুমন্ত মানুষটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তিনি আবার একটু নড়লেন। ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মুরগীর বাচ্চা যেমন করে মাথা নাড়ে, তেমনিভাবে বার কয়েক ছোট-ছোট নড়াচড়া করে, ধীরে-ধীরে তিনি ঘোমটা খুলে উঠে বসলেন। বোঝা গেল সেই রহস্যময় অভিযাত্রীটি মহিলা, চুলগুলি সুন্দর, ফোলানো,

চোখে লাগার মত আর একটু সুলাঙ্গিনী।

ব্যারণ তাঁর দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাস্তবিক তিনি দিব্যি গেলে বলতে পারেন·· উনি তাঁর স্ত্রী; কিন্তু ভদ্রমহিলার পরিবর্তন কি অদ্ভুত।····এবং ভালর দিকেই। একটু মোটা হয়েছে····প্রায় তাঁরই মত মেদবৃদ্ধি হয়েছে···· কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিই করেছে।

ভদ্রমহিলাটিও তাঁর দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন; মনে; হল না, ব্যারণকে তিনি চিনতে পারেন নি। ধীরে-ধীরে তিনি বাণ্ডিল গোছাতে লাগলেন। চালচলন দেখে মনে হল, নিজের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন একটা উদ্ধত আত্মসচেতনতা তাঁর সারা অঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সারা রাত্রি ঘুমের পর তিনি নিজেকে বেশ পরিচ্ছন্ন ক'রে বসেছেন।

ব্যারণের মাথাটা একদম গুলিয়ে গেল।

উনি কি তাঁর স্ত্রী? না, স্ত্রীর কোন বোন, দেখতে অবিকল তাঁর মত। ছ'বছর আগে তিনি তাঁকে শেষ দেখেছিলেন; তাঁর ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভদ্রমহিলা হাই তুললেন। তিনি চিনতে পারলেন; তাঁর স্ত্রী-ও ঠিক অমনিভাবেই হাসতেন। আবার ভদ্রমহিলাটি তাঁর দিকে তাকালেন। একটা শান্ত ঔদাসীন্যের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করলেন; কিন্তু চিনতে পেরেছেন ব'লে মনে হল না এতটুকু। তারপরে তিনি জানালার বাইরে চোখ ছড়িয়ে দিলেন। হতভম্ব হয়ে ভীষণভাবে নাজেহাল হয়ে, তিনি লুকিয়ে-লুকিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে দেখতে লাগলেন, পরবর্তী ঘটনা কি ভাবে ঘটে সেই অপেক্ষাতেই তিনি গোঁয়ারের মত বসে রইলেন।

গোল্লায় যাও। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নয়। কেমন করে তিনি অবিশ্বাস করবেন? দুটি মহিলার একই রকমের নাক থাকতে পারে না।

হাজার-হাজার স্মৃতি, অতীত দিনের কাহিনী, তাঁর শরীরের ছোট-খাট অসংখ্য চিহ্ন তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর স্ত্রীর দাবনায় একটা ছোট কালো তিল ছিল—আর একটা ছিল পিঠে; কতবার ওই দুটি জায়গায় তিনি চুমু খেয়েছেন। পুরনো দিনের মাদকতা তাঁকে আচ্ছন্ন করলো; তাঁর দেহের সুবাস, দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরার সময় যে ভাবে তিনি হাসতেন, তাঁর কথা বলবার মিষ্টি ধরণ, এবং যতভাবে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আদর করতেন—সব তাঁর মনে পড়ে গেল। কী পরিবর্তন, কী অদ্ভুত পরিবর্তন। ইনিই তাঁর স্ত্রী। অথচ তাঁর স্ত্রী নয়। তিনি অভিজ্ঞ হয়েছেন, অনেক বেশী পূর্তি হয়েছে তাঁর। এখন তিনি অনেক বেশী নারীসুলভ, আরও বেশী মাদকতাময়ী, আরও বেশী আকাঙ্খিতা। আগের চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়।

তারপরে এই অজ্ঞাত মহিলা, এই অদ্ভুত রহস্যময়ী মহিলার সঙ্গে নেহাৎ

আকস্মিকভাবে রেলের কামরায় দেখা হয়ে গেল; ইনিই ছিলেন তাঁর আইন-সম্মত স্ত্রী। শুধু একবার বলা: এস। একসময় তিনি তাঁর বাহুর বেষ্টনীর ভেতরে ঘুমোতেন, তাঁর প্রেম তাঁর জীবন পূর্ণ করে রেখেছিল। এখন আবার তাঁকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, যদিও তাঁর এত পরিবর্তন হয়েছে যে তাঁকে প্রায় চেনা যাচ্ছে না। ইনি তিনিই; তবু মনে হচ্ছে তিনি নন। এমন একজন যে কুঁড়ি থেকে কোরক হয়েছে, তারপরে ফুটে উঠেছে—এবং এ সমস্তই ঘটেছে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করার পরে। যাই ঘটে থাকুক, এখন সেই পুরনো ভালবাসা তেমনিভাবেই অটুট রয়েছে।

মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা ইচ্ছে করেই তাঁর চালচলনটিকে বজায় রেখেছেন; তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আরও বিশেষভাবে চিহ্নিত, হাসিটি আরও গম্ভীর, কম রঙ্গময়ী; তা সত্ত্বেও, তাঁর প্রতিটি চালচলন পরিচিত। দুটি মহিলাই একসঙ্গে মিশে গিয়েছে, নতুন অদ্ভুত মহিলাটির সঙ্গে তাঁর পরিচিত পুরনো মহিলাটি। এ একটি কৌতুককর অনুভূতি; উত্তেজনাপূর্ণ, মাদকতাপূর্ণ, রহস্যময় ভালবাসার সঙ্গে একটি মিষ্টি রুচিকর বিভ্রান্তি মেশানো। মহিলাটি তাঁরই স্ত্রী; নতুন ভঙ্গি, নতুন দেহ তাঁর, নবরূপে রূপায়িতা; এই মহিলাটিকে কোন দিনই তিনি চুম্বন করেন নি।

যাই হোক, তিনি ভাবতে লাগলেন, ছ'টি বছরে মানুষের চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে; কেবল বজায় থাকে স্থূল কাঠামোটা; সেটাও পরিবর্তনশীল। আমাদের ধমনীর রক্ত, মাথার চুল, আমাদের চামড়া সবই নতুন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে সকলেরই।

অনেকদিন অদর্শনের পরে দুটি বন্ধুর যখন আবার দেখা হয়, তখন দু'জনের কাছেই দু'জনে নতুন,—যদিও তাদের নাম এক, তারা সেই একই মানুষ। হৃদয়ের পরিবর্তন হতে পারে, চিন্তাধারা, নীতির পরিবর্তন হতে পারে। এমনিভাবে চল্লিশ বছরের মধ্যে ধীরে-ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে আমরা পরিবর্তিত হতে পারি—একবার নয়, চারবার অথবা পাঁচবার।

এইভাবে ব্যারণ চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হতে লাগলো। যেদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে নেহাৎ আকস্মিকভাবে প্রিন্সেসের শোওয়ার ঘরে আবিষ্কার করেছিলেন সেদিনের কথা আকস্মিকভাবেই তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর কোন রাগ হল না। যাকে তিনি বর্তমানে দেখছেন তিনি আর সেই মহিলা নয়, অন্য কেউ।

এখন তিনি কী করবেন? কী ভাবে তাঁকে ডাকবেন? সত্যিই কি ভদ্রমহিলা তাঁকে চিনতে পারেন নি?

ট্রেনটি যখন আবার থামলো তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু নুইয়ে ভদ্রমহিলাটিকে বললেন: বার্থা, তোমার কিছু চাই? কিছু এনে দেব তোমাকে?

কোন রকম বিস্ময়, অস্বস্তি অথবা রাগের ভাব না দেখিয়ে ভদ্রমহিলা তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন : না, ধন্যবাদ। কিছুই চাই না।

একটা শান্ত উদাসীনতার সঙ্গে কথাগুলি তিনি বললেন।

কামরা থেকে নেমে এলেন ব্যারণ; প্লাটফর্মের ওপরে পায়চারি করতে লাগলেন, মনে হল তিনি কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছেন। হাত-পা-গুলিকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে, নিজেকে ধাতস্থ করার জন্যে কিছুটা ঘুরে বেড়ানো তার দরকার। কী করবেন তা-ই তিনি ভাবতে লাগলেন। অন্য কামরায় চলে যাবেন? না; মনে হবে তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন, মিষ্টি কথা বলবেন? না; তাতে মনে হতে পারে তিনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন। প্রভুত্ব দেখাবেন? না; মনে হবে তিনি একটি পশু। আর তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, জোর করার অধিকারও তাঁর নেই। কোন সমস্যার সমাধান করতে না পেরে, তিনি শেষ পর্যন্ত কামরাতেই ফিরে গেলেন।

তাঁর অনুপস্থিতিতে ভদ্রমহিলাও তাড়াতাড়ি প্রসাধনপর্ব শেষ করে ফেলেছেন। এখন বেশ পরিচ্ছন্ন চকচকে হয়ে তিনি তাঁর চেয়ারে ঝুঁকে বসে-ছেন।

ব্যারণ তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন : প্রিয় বার্থা, আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে-ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে। ছ'টি বছর বিচ্ছেদের পরে ভাগ্য যখন আবার আমাদের এই অদ্ভুত উপায়ে একসঙ্গে এনে উপস্থিত করেছেন তখন চরম শত্রুর মত পরস্পরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পেছনে কোন যুক্তি রয়েছে কি? ভালই হোক আর খারাপই হোক, আমরা আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কামরা ছেড়ে অন্য কামরায় যেতে চাইনে। বাকি পথটুকু বন্ধুর মত গল্প করাটা কি ভাল দেখাবে না?

ভদ্রমহিলা শান্তভাবে বললেন : আপনার যা অভিরুচি।

এরপরে কী বলা উচিত ব্যারণ তা বুঝতে পারলেন না; কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে তিনি তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন।

অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন : বুঝতে পারছি, আমাকেই নামতে হবে। ভাল কথা, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নামতে, খোশামুদে কথা বলতে আমার ভালই লাগবে। গত ছ'বছরে তোমার কি রকম অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নেই। তুমি তোমার ফার-দেওয়া কোটটা খুলে ফেলার পরে তোমাকে দেখে আমার মধ্যে এমন শিহরণ জেগে উঠেছিল যে আর কোন মহিলাকে দেখে তেমন কোনদিন আমার হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি তোমার এরকম পরিবর্তন যে হ'তে পারে তা আমি কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে না তাকিয়ে বললেন : আপনার সম্বন্ধে সেকথা আমি বলতে পারিনে? আপনি একটুও রোগা হন নি।

রাগের ভান করে একটু হাসলেন ব্যারণ, চোখ মুখের ওপরেও একটা লাল আভা পড়লো। বললেন: তুমি বড় নিষ্ঠুর।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন: কেমন করে? আমি সত্যি কথাই বলছি, নিশ্চয় আপনি আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করার কথা চিন্তা করছেন না। সুতরাং আমি আপনাকে প্রশংসা করলাম কি করলাম না তাতে আপনার কী আসে যায়? কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা সত্যিই বড় কষ্টকর, অন্য আলোচনা করি আসুন। এই ক' বছর আপনি করছিলেন কী?

একটু ঘাবড়িয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন: কেন? এই ক'বছর আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, শিকার করেছি। ওই করতে-করতেই বুড়িয়ে গিয়েছি; সে তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তুমি কী করেছ?

আপনার নির্দেশ মত কাজ করেছি, শরীরটাকে ভাল করার চেষ্টা করেছি।

একটা জোরাল প্রতিবাদ ব্যারণের মুখে এসে পড়েছিল। তিনি তা গলার মধ্যে আটকে রেখে তাঁর স্ত্রীর একটি হাত তুলে চুমু খেলেন।

বললেন: তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যারণের কথা শুনে ভদ্রমহিলা একটু ঘাবড়িয়ে গেলেন। ব্যারণের ব্যবহার সত্যিই প্রশংসা করার মত। আত্মসংযমবোধটা কোনদিনই তাঁকে বঞ্চনা করে নি।

ব্যারণ বললেন: আমার ইচ্ছাকে সম্মান দেখানোর মত সহৃদয়তা যখন তোমার রয়েছে তখন কোনরকম তিক্ততা না দেখিয়েই আমরা আলাপ করি এস।

একটু অবজ্ঞার সুরেই ভদ্রমহিলা বললেন: তিক্তটা? আমার মধ্যে কোন তিক্ততা নেই। আমার কাছে আপনি নিছক অপরিচিত একজন পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ নন। কঠিন নিরস আলোচনার মধ্যে আমি একটু রসসৃষ্টির চেষ্টা করছিলাম মাত্র।

তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন ব্যারণ। তাঁর সেই নেতিবাচক ব্যবহার সত্ত্বেও, হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে কুক্ষিগত করার একটা বর্বর, অদম্য স্পৃহা জাগলো তাঁর মনে। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ব্যারণকে আঘাত করেছেন বুঝতে পেরে তিনি নির্মমভাবে বলে চললেন: আপনার এখন বয়স কত? আমার সব সময় মনে হয়েছে বাইরে থেকে যতটা দেখায় তার চেয়ে আপনার বয়স কম।

কথা শুনে ব্যারণের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তিনি বললেন: আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ।

তারপর তিনি বললেন: প্রিন্সেস দ্য রেনিস-এর সংবাদ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি নে। তুমি কি এখনও তাকে দেখতে পাও?

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

হ্যাঁ। প্রায়ই। ভালই আছেন, ধন্যবাদ।

দু'জনেই ক্ষুব্ধ হয়ে রইলেন পাশাপাশি। দুজনের মনই তখন উদ্বেলিত।

ব্যারণ হঠাৎ প্রায় চীৎকার করে উঠলেন: প্রিয় বার্থা, আমার মন আমি পরিবর্তন করেছি। তুমিই আমার স্ত্রী; আমি চাই এই মুহূর্তে তুমি আমার ঘরে ফিরে এস। দেখতে পাচ্ছি সৌন্দর্য আর চরিত্র দু'দিকেই তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। আমি তোমার স্বামী, আমি আমার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে চাই।

বজ্রাহতা হয়ে ভদ্রমহিলা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তাঁর মনের ভাবটা কী তাই বুঝতে লাগলেন। কিন্তু ব্যারণের মুখ ভাবলেশহীন, অবোধ্য, এবং দৃঢ়।

ভদ্রমহিলা বললেন: আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু আমার অন্য কাজ রয়েছে।

ব্যারণ হাসলেন।

খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। আইনে আমাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছে সেইটুকুই আমি ব্যবহার করব।

তাঁরা মার্সেলিস-এর দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন। হুইশীল বাজিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। ব্যারণেস উঠে তাঁর জিনিসপত্রগুলিকে প্যাক করতে লাগলেন।

তারপরে ঘুরে তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন: প্রিয় রেমণ্ড, আমাদের এই আলাপের সুযোগ নিয়ো না। তোমারই ইচ্ছামত তোমার এবং সাধারণ ভাবে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে আমি কিছু সাবধানতা নিয়েছিলাম। হয়ত যদি… তুমি নাইস-এ যাচ্ছ…তাই না?

তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব।

আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না। আমার কথা শুনলে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিতে তুমি রাজি হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রিন্স, প্রিন্সেস দ্য রেনিস, কাউণ্ট আর কাউণ্টেস হেনরিয়েটকে তুমি দেখতে পাবে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁরা স্টেশনে আসছেন। আমি চাই তাঁরা তোমাকে দেখুন। আমরা একটি পুরো রাত্রি দু'জনে একলা যে একটি কামরায় কাটিয়েছি সেই কথাটা তাঁরা তাহলে বিশ্বাস করবেন। ভয় পেয়ো না। এই রোমাঞ্চকর সংবাদটি চারপাশে ছড়িয়ে দিতে ভদ্রমহিলা দুটি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করবেন না। আমি তোমাকে এই মাত্র বললাম যে তোমার নির্দেশ আর প্রথামত আমি কাজ করেছি। এ ছাড়া আর কিছুই নেই; আছে কি? শালীনতা বজায় রাখার জন্যে আমি এই খোশ-গল্পের আয়োজন করেছিলাম।

কুৎসা রটে এমন কোন কাজ না করার জন্যেই তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলে। প্রিয় রেমণ্ড, আমি এমন কাজ করেছি···আমার সন্দেহ হচ্ছে···সন্দেহ হচ্ছে···

তিনি চুপ করে গেলেন। ট্রেনটা স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাঁর একদল বন্ধু তাঁর কামরার সামনে দৌড়ে এল; দরজা খুলে দিল। তারই ফাঁকে অসমাপ্ত বাক্যটি তিনি শেষ করলেন: সন্দেহ হচ্ছে···আমার বাচ্চা হবে।

প্রিন্সেস তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন; কিন্তু ব্যারণেস তাঁর স্বামীর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্বামীটি তখন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছেন; এবং ব্যারণেস এইমাত্র যা বললেন তার মধ্যে কতটা সত্য রয়েছে তাই যাচাই করার ব্যর্থ চেষ্টায় নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

ব্যারণেস তাঁর বন্ধুদের বললেন: তোমরা রেমণ্ড-কে চিনতে পারছ না? ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ও আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে রাজি হয়েছিল; তাই আমাকে একলা আসতে হল না। মাঝে-মাঝে আমরা এই ধরনের ছোট-খাট প্রমোদ বিহারে বেরিয়ে পড়ি। কারণ, যদিও আমরা এক-সঙ্গে ঘর-সংসার করতে পারি নে, তবু আমরা পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু এই-খানেই আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যেই আমার কাছ থেকে ও অনেক কিছু পেয়েছে।

ব্যারণেস তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। ব্যারণ নেহাৎ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই হাত ধরলেন। তারপর তিনি প্লাটফর্মের ওপরে বন্ধুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ব্যারণ এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে একটা কথাও তিনি বলতে পারলেন না; কী করবেন বুঝতে পারলেন না কিছুই; দরজাটা জোরে বন্ধ করে দিলেন। তখন-ও তাঁর স্ত্রীর কথাগুলি তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন, তাঁর হাসির টুকরোগুলি ভেসে-ভেসে আসছিল। শেষ পর্যন্ত সেই হাসির রেশটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে।

আর তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন না।

তিনি কি মিথ্যে কথা বললেন? তিনি কি সত্যি কথা বলছিলেন? কোন-দিনই ব্যারণ তা বুঝতে পারবেন না।

মাদাম হুশোঁর গোলাপ-রাজ

(Madame Hussor's Rose-King)

গিসোরস স্টেশনটি সবে মাত্র আমরা পেরিয়ে এসেছি। স্টেশনের নামটা শুনেই আমি মাথা তুলে দেখলাম। তারপরে আবার আমি ঘুমানোর ব্যবস্থা

করলাম। হঠাৎ ভীষণ একটা ধাক্কা খেলাম। কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখলাম আমার বিপরীত দিকে বসেছিলেন যে একটি শক্ত সামর্থ ভদ্রমহিলা তার কোলের ভেতরে ছিটকে পড়েছি আমি। একটা চাকা ভেঙে যাওয়ার ফলে এনজিনটা লাইনচ্যুত হয়েছে; তার পাশে যে লাগেজ-ভ্যানটা ছিল সেটাও কিছুটা সরে গিয়েছে তার লাইন থেকে। প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে মাটিতে পড়ে গেলে ঘোড়ার যেমন নাক দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে, পাশ দুটো ফুলতে থাকে, খুব কষ্টে বুকটা ওঠা-নামা করে, অথচ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর এতটুকু শক্তি তার থাকে না, তেমনি অবস্থা দাঁড়ালো এনজিনের; সে-ও মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাতে-গোঙাতে, ছটফট করতে-করতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে ফুস-ফুস করে শব্দ করতে লাগল।

সামান্য কিছু আঁচড় ছাড়া কেউ গুরুতরভাবে আহত হয় নি। কারণ ট্রেনটা তখন জোরে চলার মত সময় পায় নি; সেই আহত যন্ত্র-দানবটির দিকে আমরা কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গেই তাকিয়ে রইলাম এই কথা ভেবে যে আমাদের আর ও টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। প্যারিস থেকে সাহায্যের জন্যে ট্রেন না আসা পর্যন্ত আমাদের কোন উপায় হবে না।

দুর্ঘটনা যখন ঘটলো সকাল তখন প্রায় দশটা। আমি তখনই ঠিক করে ফেললাম গিসোরস-এ ফিরে যাই; দুপুরের খানা সেরে আবার ফিরে আসব। লাইন ধরে হাঁটতে লাগলাম আমি। হাঁটতে-হাঁটতে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম গিসোরস নামটা যেন শোনা-শোনা লাগছে। নিশ্চয় এখানকার কাউকে আমি চিনি। কিন্তু সে মানুষটি কে? দাঁড়ান, দাঁড়ান; ভাবতে দিন একটু। নিশ্চয়-নিশ্চয়; আমার একটি বন্ধু এখানে থাকে।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার—আলবার্ট ম্যারাবোঁত। আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু; প্রায় বছর বারো তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। এখন সে ডাক্তার; এইখানে প্র্যাকটিস করে। তার এখানে আসার জন্যে অনেকবারই সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অনেকবার কথা দেওয়া সত্ত্বেও আমি এখানে আসতে পারি নি। এই সুযোগে তার বাড়িতে ঘুরে আসার মনস্থ করলাম।

প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হল তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম: ডঃ ম্যারাবোঁত কোথায় থাকে জানেন?

টেনে-টেনে নর্মান ভাষায় লোকটি বললেন: বায়ে ডফিন-এ।

সত্যি কথা বলতে কি যে ঘরটির কথা ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দেখি কপাটের ওপরে তামার চাকতির ওপরে আমার সেই বন্ধুর নাম লেখা রয়েছে। আমি বেল টিপলাম। ভেতর থেকে একটি পরিচারিকার স্বর শোনা গেল: তিনি নেই, তিনি বাড়িতে নেই।

রান্নার বাসন আর গ্লাস-নাড়ার শব্দ আমার কানে এল।

চীৎকার করে ডাকলাম আমি—ম্যারাবোঁত, ম্যারাবোঁত।

দরজা খুলে গেল। একজন মোটা-সোটা, গোঁফওয়ালা, খিটখিটে চোখে তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে এল; তার হাতে একখানা তোয়ালে। তাকে আমার কোন মতেই চেনা উচিৎ ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মানুষটির বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম দেহাতি সহরের প্রভাব কত সহজে মানুষকে বুড়িয়ে দেয়, তার দেহের ওপরে বুলিয়ে দেয় রুক্ষতার প্রলেপ—প্রাণহীন করে তোলে মানুষকে। আমার প্রসারিত হস্তমর্দনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আমার মনের মধ্যে যে দ্যুতি খেলে গেল তারই আলোতে মানুষটির জীবন-ধারা, তার মানসিক অবস্থা, বিশ্বের সম্বন্ধে তার মতবাদ, এক কথায় তার সারা সত্বাটা আমার কাছে প্রতিভাত হোল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ভোজনের পরিমাণটা। বুঝতে পারলাম, প্রচুর খেয়ে-খেয়ে সে ভুঁড়ি বাগিয়েছে, ভুঁরিভোজনের পরে ব্র্যানডির নেশায় সে ঝিমোয়; রান্নাঘরে আগুনে চাপানো মুরগীর কথা ভাবতে-ভাবতে লোকটি নিশ্চয় অলসভাবে রোগীর নাড়ি টেপে। তার গণ্ডদেশের লালিমা আর মেদ, মোটা পুরু ঠোঁটের আদল আর চোখের ম্লান জ্যোতি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে মানুষটি কেবল ভোজন-রসিকই নয়, বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরী করার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন মহতী চিন্তা করার সময় তার বড় কম।

বললাম: আমাকে তুমি চিনতে পারছ না। আমি রাওল অর্বাটিন।

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সে প্রায় পিষে ফেলার উপক্রম করল আমাকে; তার পরেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: নিশ্চয় এখনও তোমার লাঞ্চ সারা হয়নি?

না।

খুব বেঁচে গিয়েছ। আমি এখনই খেতে যাচ্ছিলাম। চল, আজকে চমৎকার ট্রাউট রেঁধেছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখোমুখী আমরা খেতে বসে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি এখনও বিয়ে কর নি?

না।

এবং বেশ আনন্দেই রয়েছ?

আমার কোন সময়েই একঘেয়ে লাগে না। হাতে আমার অনেক কাজ। আমার রোগী রয়েছে, আর রয়েছে বন্ধুবান্ধব। খাওয়া-দাওয়া আমি ভালই করি; স্বাস্থ্যবান মানুষ আমি। মন খুলে হাসতে পারি আমি; শিকার করতে ভালবাসি। আর কী চাই তোমার?

এই রকম ছোট একটি সহরে জীবন কি একঘেয়ে হয়ে ওঠে না?

প্রিয় বন্ধু, না, তা হয় না; যদি অবশ্য জীবনটাকে কী ভাবে তুমি চালাবে

সেটা তোমার জানা থাকে। মূলত, বড় আর ছোট সহরের মধ্যে তফাতটা বড় কম। এখানে রোজ একই রকমের ঘটনা ঘটে না; এখানকার আমোদ-প্রমোদও রোজ একই রকমের নয়। কিন্তু মানুষই তাদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখে। তোমার বন্ধুবান্ধব এখানে সংখ্যায় কম; কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় তোমার। এখানকার একটি রাস্তার সঙ্গে যদি তোমার ভালরকম পরিচয় থাকে তাহলে প্যারিসের সমস্ত রাস্তায় যত কৌতূহল রয়েছে তাদের অনেক বেশী রসদ তুমি এখানকার প্রতিটি জানালায় দেখতে পাবে। ছোট সহর সব সময়েই তোমাকে আনন্দের খোরাক যোগাবে। সেই সুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই ছোট সহরে যা-যা ঘটেছে সে-সব কাহিনী আমার নখদর্পণে। এর ইতিহাস যে কত সুন্দর অথচ কত অদ্ভুত সে-ধারণা তোমার নেই।

তুমি কি এখানকারই মানুষ?

না। আমি আসছি গুরনে থেকে। গুরনে এর প্রতিবেশী আর প্রতিদ্বন্দ্বী, সিসেরোর কাছে লুকুলাস যা, গিসোরস-এর কাছে গুরনে-ও তাই। এখানে গৌরব অর্জন করার জন্যে সকলেই ব্যস্ত; এখানকার মানুষেরা গিসোরস-এর অধিবাসীদের বলে দাম্ভিক। গুরনের অধিবাসীদের দেবতা হল তাদের পেট, লোকে তাদের আখ্যা দিয়েছে গুরনের রাক্ষস। গিসোরস গুরনেকে ঘৃণা করে, গুরনে করে এদের উপহাস। পৃথিবীর এ এক অদ্ভুত ভাঁড়ামির দেশ।

খেতে-খেতে বুঝতে পারলাম বেশ সুস্বাদু খাবারই খাচ্ছি। মাংসের জেলির ওপরে অল্প সিদ্ধ ডিম ঢেলে দিয়ে তাকে শাকসব্জী দিয়ে ভেজে বেশ ঠাণ্ডা করা হয়েছে। ম্যারাবোঁতকে খুশি করার জন্যে আমি জিব বার করে ঠোঁট চুষতে লাগলাম।

বন্ধুটি হেসে বলল: এই খাবারটির দুটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হচ্ছে ভাল জেলি, যা সহজে সংগ্রহ করা যায় না, আর ভাল ডিম। লালচে কুসুম আর সত্যিকার গন্ধ রয়েছে এমন ভাল ডিম আজকাল একরকম দুষ্প্রাপ্য বললেই হয়। আমার পোলট্রি রয়েছে দুটো; একটা ডিম তৈরী করার জন্যে; আর একটা খাবার মুরগী তৈরী করার জন্যে। যে-মুরগীরা ডিম দেয় তাদের ভাল ক'রে খাওয়ানোর বিশেষ একটি প্রক্রিয়া রয়েছে আমার, এ-বিষয়ে আমার নিজস্ব একটা ধারণা রয়েছে। বাচ্চা মুরগী, গরুর মাংস, ভেড়ার মাংসের মত ডিমেও তুমি ধাড়ীদের যা খাওয়াবে তার সারটুকু থাকে। মানুষে যদি এই কথাটা স্মরণ রাখতো তাহলে তাদের খাবার অনেক উঁচু শ্রেণীর হোত।

আমি হাসলাম: তোমাকে বেশ ভোজনবিলাসী মনে হচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়; এবং এক মূর্খ ছাড়া সকলেই আমার মত। মানুষ যেমন কলা-বিলাসী, পুস্তক এবং কাব্য-বিলাসী, তেমনি সে ভোজন-বিলাসীও। চোখ কিংবা কানের মত স্বাদটাকেও সুন্দর করে তুলতে হয়। সুন্দর করার জন্যে শিক্ষাও দিতে হয় তাকে। যে-মানুষ ভোজনরসিক তাকে

আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি নে। যার রুচি নেই তার মধ্যে চমৎকার একটি গুণের অভাব রয়েছে। যে উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তুর কদর জানে না, সে ভাল বই বা একটি সুন্দর কলার কদর বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব। এই সব মানুষের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের অভাব রয়েছে—যে ইন্দ্রিয়টি মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর ওপরে প্রাধান্য দিয়েছে। রুচিহীনতা মানুষকে অসংখ্য অঙ্গহীন মানুষদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, অধঃপতিত করে তাকে, মূর্খ করে তোলে। মানুষের সমাজে এদের সংখ্যাই অনেক বেশী। এক কথায়, মস্তিষ্কবিকৃতির মত রসনায় যার স্বাদ নেই সে-ও বিকৃত। যে মানুষ লবস্টার বা সমুদ্রের স্বাদ আর গন্ধে ভরা হেরিং মাছ আর সাধারণ জলের চিংড়ি মাছের মধ্যে পার্থক্য কী জানে না, ম্যাকারেল এবং হুইটিঙ যার কাছে সমান, কিংবা ডাচেস থেকে উইলিয়ম পিয়রের তফাতটা কোথায় যে ধরতে পারে না সেই মানুষ ইউজিন সু থেকে বালজাকের পার্থক্য জানে না, বা একটি রেজিমেন্টের ব্যাণ্ড মাস্টার সৈন্যদের কুচকাওয়াজের সময় যে সঙ্গীতের সৃষ্টি করে তার সঙ্গে বিটোফেনের সুরের কোন পার্থক্য ধরতে পারবে না; তার কাছে অ্যাপোলো বেলভেডিয়রও যা আর জেনারেল দ্য ব্র্যামোণ্ট-এর প্রতিকৃতিও তাই—একই বস্তু।

জিজ্ঞাসা করলাম: তোমাদের এই জেনারেল দ্য ব্র্যামোণ্ট-টি কে হে?

তুমি তাকে চেন না। চেনা সম্ভব-ও নয়; কারণ, এখানকার অধিবাসী নও। তোমাকে আমি আগেই বলেছি বন্ধু যে এই সহরের অধিবাসীরা গিসোরস-এর দাম্ভিক নাগরিক বলে পরিচিত; ওর চেয়ে, আমার মতে, ভাল বিশেষণ ওদের নেই। যাই হোক, আগে আমাদের খাওয়া শেষ হোক, তারপরে তোমাকে নিয়ে যখন একটু ঘুরতে বেরোবো তখনই তোমাকে এখানকার কিছু কাহিনী শোনাব।

মাঝে-মাঝে সে থামছিল। আধ গ্লাস মদ তার টেবিলের ওপরে বসানো ছিল; সেই মদে চুমুক দিচ্ছিল; খালি হয়ে গেলে আবার সেটি সেই পর্যায়ে ভর্তি করে রাখছিল। গলায় রুমাল জড়িয়ে চোখমুখ লাল করে সে যখন খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করছিল তখন তাকে দেখলে একটি ভাঁড় ছাড়া অন্য কিছু মনে হোত না। সে আমাকে জোর করে খাওয়াতে লাগলো; শেষ পর্যন্ত দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল আমার। তারপরেই আমি স্টেশনে ফিরতে চাইলাম; তখন সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোল।

দেহাতি সহরের মত এরও নিজস্ব একটি সৌন্দর্য রয়েছে। ছোট-ছোট দুর্গগুলি হেথায়-হোথায় ছড়ানো; সারা ফ্রান্সের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর সামরিক চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন এইখানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এখানে রয়েছে সবুজ পাহাড়ী উপত্যকা। এইখানে হৃষ্টপুষ্ট নর্মান গাভীরা ঘাস খায় আর শুয়ে শুয়ে রোমন্থন করে।

ডাক্তার বললেন: সহরটির জনসংখ্যা হচ্ছে চার হাজার; এবং ইউরের

সীমান্তে এটি অবস্থিত। প্রাচীন সিজার-ভাষ্যেও এর নাম রয়েছে। রোমানরা কোথায় এসে তাদের তাঁবু পেতেছিল সে সব জায়গায় আমি তোমাকে নিয়ে যাব না, যদিও সে সব জায়গায় গেলে এখনও কিছু চিহ্ন বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা যাবে।

আমি হেসে বললাম, বন্ধু, তুমি অসুখে ভুগছো। ডাক্তার হিসাবে তোমাকে তা অনুধাবন করতে হবে। তুমি সেই চার্চের বুলিগুলিই আউড়ে যাচ্ছ।

ডাক্তার বলল: বন্ধু, এই বুলিগুলিই যে আমাদের মজ্জাগত দেশাত্মবোধ। আমার বাড়িতে এমন একটা কৃত্রিমতা রয়েছে যেটা আমার সহর এবং সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ এর মধ্যে আমি আমার গ্রামের রীতি-নীতিগুলিকে খুঁজে পাই। কিন্তু যদি সীমান্তের দিকে আমার দৃষ্টি থাকে, যদি সীমান্তকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে তৈরী থাকতে হয় তার কারণ এই যে আমার নিজস্ব ঘরে আমারই অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। জাতে আমি নর্মান। জার্মানদের ওপরে আমার তিক্ততা থাকা সত্বেও, এবং তাদের ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করার বাসনা থাকা সত্বেও, আমি তাদের ঘৃণা করি নে, মন থেকে আমি তাদের ঘৃণা করি নে, যতটা আমি ঘৃণা করি, ইংরাজদের— যারা সত্যিকার, বংশানুক্রমিকভাবে নর্মানদের স্বাভাবিক শত্রু। আমার পূর্ব-পুরুষদের বাসভূমি এই দেশের ওপরে ইংরাজরা বারবার আক্রমণ চালিয়েছে, এর সম্পদ লুঠ করেছে, ধ্বংস করেছে একে। পূর্বপুরুষদের এই ঘৃণা জীবনের ভেতর দিয়ে আমার মধ্যে এসে দেখা দিয়েছে। দেখ, ওই সেই জেনারেলের মর্মর প্রতিমূর্তি।

কোন্ জেনারেল?

জেনারেল ত্য ব্ল্যামোণ্ট। এই প্রতিমূর্তি তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা ছিল আমাদের কাছে। বৃথাই ওরা আমাদের গিসোরস-এর দাম্ভিক নাগরিক বলে না। সেই জন্যেই আমরা জেনারেলকে আবিষ্কার করলাম। এখন ওই বই-এর দোকানে জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

সে আমাকে একটা বই-এর দোকানের সামনে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে হলদে, লাল, আর নীল রঙে বাঁধানো পনেরটি বই সাজানো রয়েছে। শিরোনামাগুলি পড়তে গিয়ে আমার ভীষণ হাসি পেয়েছিল, "গিসোরস-এর উৎপত্তি এবং ভবিষ্যৎ"—লেখক, মঁসিয়ে একস্, তিনি আবার অনেক বিদগ্ধ সমিতির সভ্য। "গিসোরস-এর ইতিহাস"—লেখক, আব্বি এ, "গিসোরস" —সিজারের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত—লেখক, মঁসিয়ে বি জমিদার ...গিসোরস-এর প্রধান সন্তানের—লেখক, একটি ছাত্র।

বন্ধুটি বলল: এমন একটি বছর যায় না যে বছর গিসোরস-এর ওপরে একটা না একটা বই ছাপা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা একুশখানি গ্রন্থ পেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম: গিসোরস-এর প্রধান সন্তান বলতে কাদের বোঝাচ্ছে?

তাদের সকলের নাম আমি করব না, কেবল যাঁরা প্রসিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের ছাড়া। প্রথমেই হচ্ছেন জেনারেল দ্য ব্লামোণ্ট; তারপরে ব্যারণ দ্য ভিনিয়র বিখ্যাত মৃৎ শিল্পী, যিনি স্পেন এবং ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন, শিক্ষাবিদের ভেতরে নাম করব দক্ষ সাংবাদিক, অধুনা মৃত, চার্লস ব্রেইনীর, জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন চার্লস ল্যাপিয়ারি।

একটি লম্বা রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম; একটু ঢালু; এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জুন মাসের সূর্যের আলোতে দগ্ধ। সেই গরম সহ্য করতে না পেরে আশেপাশের বাসিন্দারা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সেই সময় রাস্তাটির অপর প্রান্তে একটি মাতাল আমাদের চোখে পড়ল; লোকটা মদের ঝোঁকে টালমাটাল খাচ্ছে। মাথাটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, হাত দুটোকে ল্যাকপ্যাক করে, দুটো পা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে লোকটা তিন, ছ, দশ পা একসঙ্গে টলতে-টলতে দৌড়ে আসছে, তারপরে থামছে। একটু দম নিয়ে সে রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি এসে কম্পমান পা দুটির ওপরে কোন রকমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল; এগোবে কিনা ভাবলো: তারপরে হঠাৎ মত পালটিয়ে অন্য পথে দ্রুত দৌড়ে গেল। একটা বাড়ির দেওয়াল ধরে তার ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে আঁচড় দিতে লাগলো। তারপরে চমকে উঠে সে ঘুরে দাঁড়ালো; হাঁ করে সামনের দিকে তাকালো; সূর্যের আলো পড়ায় চোখ মিটমিট করল। দাবনার ওপরে ঝাঁকানি দিয়ে সে দেওয়াল থেকে চলতে সুরু করল। একটা অর্দ্ধভুক্ত হলদে মংগ্রেল কুকুর চীৎকার করতে-করতে তার পিছু-পিছু ছুটলো।

বন্ধুটি বলল: দেখ। ও হচ্ছে মাদাম হুশোঁর একটি গোলাপ-রাজ।

তার কথা শুনে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে উঠলাম: কী বললে? মাদাম হুশোঁর গোলাপ-রাজ?

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলো: ওটা হচ্ছে মাতালদের একটা আঞ্চলিক নাম। নামটি একটি প্রাচীন কাহিনী থেকে নেওয়া। যদিও ওটা একটা উপকাহিনীর আকার ধারণ করেছে—তবু ওর প্রতিটি কথা সত্যি।

খুব হাসির গল্প বুঝি?

নিশ্চয়। খুব হাসির।

গল্পটা বল—শুনি।

খুব খুশি হলাম। একদা এই সহরে একজন বৃদ্ধা বাস করতেন। তাঁর নাম মাদাম হুশোঁ। তিনি নিজে তো ধর্মপরায়ণা ছিলেনই, এমন কি অন্য লোকের সৎপ্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দিতেন। আমি তোমাকে আগেই বলে রাখি যাদের নাম আমি এখানে করব সত্য-সত্যই তারা একদিন বেচে ছিল; তাদের মধ্যে

কাল্পনিক নাম একটাও নেই। মাদাম হুশোঁ ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। দরিদ্রের সেবা করতেন, যারা সত্যিকারের ধার্মিক তাদের উৎসাহ দিতেন। বেঁটে খাটো মানুষ ছিলেন তিনি; তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতেন; একটি কালো রঙের সিল্কের পরচুলা পরতেন। তাঁর চালচলন ধার্মিকের মত নম্র; এবং অ্যাব্বি মালো যে ভগবানের প্রতিনিধি সেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল চমৎকার। পাপের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ভীতি ছিল; বিশেষ করে, গির্জার মতে যে সমস্ত পাপের উৎস দেহজ তাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করতেন। বিয়ের আগে কোন রকম লটঘটে ব্যাপার ঘটেছে শুনলে তিনি চটে কাঁই হয়ে যেতেন। ঠিক এই সময়ে প্যারিসে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল; সেই প্রথা অনুযায়ী যে সমস্ত নারী চরিত্রের জন্যে প্রসিদ্ধ হতেন তাঁদের একটি করে গোলাপ ফুলের মালা উপহার দেওয়া হোত। মাদাম হুশোঁ ঠিক করলেন গিসোরস-এতেও তিনি সেই রকম একটি গোলাপ-রাণী প্রতিযোগিতা করবেন।

অ্যাব্বি মালোর কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। মালো তৎক্ষণাৎ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করে ফেললেন। কিন্তু মাদামের একটা পরিচারিকা ছিল। তার নাম ফ্র্যাঙ্কোয়। পরিচারিকাটি তার মনিবের মতই এসব বিষয়ে একেবারে কট্টরপন্থী। পাদরী তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাদাম তাঁর পরিচারিকাটিকে ডেকে পাঠালেন; বললেন: এই দেখ, সদ্‌গুণের জন্যে কোন্ কোন্ মহিলাদের পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে সে-সম্বন্ধে পাদরী সাহেব এই তালিকা দিয়েছেন। এরা ঠিক কী প্রকৃতির মহিলা, আর এদের সম্বন্ধে প্রতিবেশীরাই বা কী বলে, তুমি তা খুঁজে বার করার চেষ্টা কর।

'ফ্র্যাঙ্কোয় কাজে নেমে পড়ল। ওদের ঘিরে যত গাল-গল্প প্রচলিত রয়েছে, ওদের ঘিরে সহরের যত কাহিনী উপকাহিনী গড়ে উঠেছে, ছোট কথা, বড় কথা, কুৎসা ঘটনা-রটনা—সব সে সংগ্রহ করে ফেলল। ছোট-খাটো উপকাহিনীগুলি পাছে সে ভুলে যায় এই ভয়ে সে তার বাজারের হিসাব রাখা খাতায় টুকে রাখতো, আর প্রতিদিন সকালে হিসাব দাখিল করার সময় সেগুলি সে মাদামকে দেখাত। তাঁর রোগা নাকের ওপরে চশমাটা বসাতে-বসাতে মাদাম পড়তেন।

রুটি····চার স্যু

দুধ····দুই স্যু

মাখন ··আট স্যু

গত বছর মালভিনা লেভেস্কম্যাথুরি পয়লুর সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেছিল।

ভেড়ার রাঙ····পঁচিশ স্যু

লবণ····এক স্যু

লনড্রীওয়ালিনী মাদাম ওনেসিম বিশে জুলাই তারিখে সন্ধ্যের সময় সিজে-য়ার পিনোরের সঙ্গে একটি ঝোপের মধ্যে রোজালী ভ্যাতিনেলকে দেখেছে।

মূল্যে····এক সু
ভিনিগার ··দুই সু
সোরেল সল্ট ··দুই সু

যতদূর মনে হয় যোশ্লোপিন ডুর্ভেন্ট পালিয়ে যায় নি; কিন্তু সে ওই সময় যুবক ওপোটুর সঙ্গে প্রেমপত্র লেখালেখি করত। রাওয়েন-এ চাকরি করে ওপোচু। সে খেটেখুটে যা রোজগার করত সেই থেকে যোশেফকে একটা বোনেট কিনে উপহার দিয়েছে।

'এই কাঠোর ধর্ম-তদন্ত থেকে পুরোপুরি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে কেউ বেরিয়ে আসতে পারল না। প্রতিবেশী, ব্যবসাদার, স্কুল শিক্ষক, স্কুল শিক্ষয়িত্রী সবাইকে ফ্রাঙ্কোয় জিজ্ঞাসা করল, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ গুজব যা তার কানে এল সে-সবগুলিকে সে খাতায় টুকে নিল। এ-দুনিয়ায় এমন কোন নারী নেই যার সম্বন্ধে কিছু কলঙ্ক লোকের মুখে-মুখে ঘুরে না বেড়ায়। আশে পাশে কোথাও এমন কোন মহিলাকে পাওয়া গেল না যাকে কিছু-না-কিছু কলঙ্ক স্পর্শ করেছে। কিন্তু মাদাম স্থির সংকল্প করে বসেছেন যে সিজার পত্নীর মত যাকে তিনি গোলাপ-রাণী করবেন তাকে সমস্ত সন্দেহ আর কলঙ্কের ওপরে থাকতে হবে। পরিচারিকার বাজারের খাতা দেখে ভদ্রমহিলা গভীরভাবে মর্মাহত হলেন।

'তারপরে সুরু হল পাশের গ্রামে খোঁজার পালা। কিন্তু ফল দাঁড়ালো একই রকম। মেয়েদের সঙ্গে যুক্তি করা হল; তাঁর নির্ধারিত পাত্রীরাও পরীক্ষায় পাশ করতে পারলো না। ডাক্তার বারবেসল তাঁর পেশাগত সততার ওপরে নির্ভর ক'রে যাদের মনোনীত করলেন এবং জোরালো ভাষায় প্রার্থী-পদের জন্যে সমর্থন করলেন তারাও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলো না।

'তারপর একদিন সকালে তথ্য সংগ্রাহিকা ফ্র্যাঙ্কোয় তথ্য সংগ্রহ করে যথারীতি বাড়িতে ফিরে এসে তার মনিবকে বলল: মাদাম, সত্যি কথা বলতে কি এ-অঞ্চলের একমাত্র যোগ্য প্রার্থী হচ্ছে ইসিডোর—যদি অবশ্য আপনি কাউকে পুরস্কার দিতে মনস্থই করে থাকেন।

'মাদাম গভীরভাবে চিন্তা করলেন। ইসিডোরের সম্বন্ধে তিনি ভাল করেই জানেন। সে ভার্জিনির ছেলে। তাদের কাঁচা শাকসব্জী বিক্রী করার একটা দোকান রয়েছে। ছেলেটির চরিত্র একটুকরো খাঁটি সোনার মত; কয়েক বছর ধ'রেই গিসোরস-এর জনসাধারণ তার চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

তাকে নিয়ে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত; বিশেষ করে মেয়েদের কাছে সে ছিল একটি অফুরন্ত হাসির কাহিনী; তাকে খুঁচিয়ে মেয়েরা বেশ আনন্দ পেত। বয়স তার কুড়ির চেয়ে বেশী, লম্বা, কেতাদুরস্ত নয়, শ্লথ আর ভীরু প্রকৃতির। দোকানের কাজে সে তার মাকে সাহায্য করত; আর দরজার

সামনে সারাদিন চেয়ারে বসে সে হয় ফল কিংবা শাকসব্জী বাছাই করত। মেয়েছেলে দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে বিকল হয়ে যেত। কোন মেয়ে-খদ্দের তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেই সঙ্গে-সঙ্গে সে মাথা নিচু করে ফেলত। এবং এই কুখ্যাত লজ্জা সহরের প্রতিটি তরলমতি যুবতীর কটাক্ষপূর্ণ রসিকতার ক্ষেত্র করে তুলেছিল তাকে। অশ্লীল কথা, নীচুস্তরের রসিকতা এবং অশোভন উদাহরণ কানে শোনামাত্র সে এমন লজ্জা পেত যে ডাক্তার বারবেসল তার নাম দিয়েছিলেন বিনয়ের ব্যারোমিটার। সত্যিই কি সে ভাজা মাছ উলটে খেতে জানত না? না, জানত? তার কিছু চতুর প্রতিবেশী অবাক হয়ে ভাবত। কাঁচা শাকসব্জীর দোকানদারের বিধবা ভার্জিনীর ছেলেটা যে বিশেষ অনুভূতির প্রাবল্যে এতটা কাহিল হয়ে উঠতো তার আসল কারণটা কী? লজ্জাকর এবং অজ্ঞাত কোন রহস্যের সম্বন্ধে তার যে একটা অনুমান জন্মেছে সেইটাই কি তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, অথবা, প্রেমের নির্দেশে প্রেমিক-প্রেমিকারা যে আলিঙ্গনে অধঃপাতে যায় সেই আলিঙ্গনে তার গভীর একটা অনীহা রয়েছে? রাস্তার ছেলেরা তার দোকানের পাশ দিয়ে দৌড়ে যায় এবং যাতে সে চোখ নীচু ক'রে লজ্জায় মরে যায় সেই জন্যে ইচ্ছে ক'রে তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে অশ্লীল কথা বলে। যুবতীরা আনন্দ করার জন্যে তার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবে, ইচ্ছে করে করবে কিছু অশ্লীল রসিকতা, ইসিডোর শোনা মাত্র ছুট দেবে অন্দর মহলের দিকে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দুঃসাহসিনী তারা মাঝে-মাঝে খোলাখুলিভাবে ঠাট্টা করে তার সঙ্গে নিভৃত মিলনের সময় আর স্থান ঠিক করত, আবার কখনও-কখনও বা প্রকাশ্যে কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও ছাড়তো না।

'মাদাম যে গভীর চিন্তায় ডুবে যাবেন তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে? খাঁটি চরিত্র বলে যদি কোন শব্দ থাকে ইসিডোর নিঃসন্দেহে তার একমাত্র ধারক এবং বাহক, অদ্বিতীয়, হৃদয়দুর্গ তার এত সুরক্ষিত যে বাইরের কোন আবিলতাই সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। কেউ, সে যত বড় নাস্তিক অথবা অবিশ্বাসীই হোক, ক্ষুদ্রতম নৈতিক আদর্শ থেকে যে ইসিডোর কোনদিন বিচ্যুত হয়েছে এমন সন্দেহ করতে সাহসী হবে না। কোনদিন তাকে কেউ কাফেতে বা সন্ধ্যার সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে নি। সে প্রাতদিন শুতে যেত রাত্রি আটটায়, উঠতো ভোর চারটেতে। একেবারে নিখাদ সোনা বলতে যা বোঝায় সে তাই, সুচীতার হীরক।

'এবং তবুও মাদাম দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তিনি চেয়েছিলেন কোন মহিলাকে গোলাপ-রাণী সম্মানে ভূষিতা করতে; তার পরিবর্তে কোন পুরুষকে গোলাপ-রাজ করার প্রস্তাবটি তাঁকে বিভ্রান্ত করল, তাঁর মনের মধ্যে অস্বস্তিও জাগালো বেশ কিছুটা। অ্যাব্বি মালোর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে মনোস্থির করলেন তিনি।

"মাদাম হুসোঁ, আপনি কিসের জন্যে পুরস্কার দেবেন? আমার মনে হয় চারিত্রিক গুণ, অর্থাৎ সোজা কথায় চরিত্রের দিক থেকে যে খাঁটি। তাই যদি হয় তাহলে সেই রকম চরিত্রের অধিকারী পুরুষ কি মহিলা তাতে আপনার যায় আসে কী? আমরা যাকে নৈতিক উৎকর্ষ বলি সেটা হল শাশ্বত; দেশ-কাল অথবা পুরুষ নারীর ভেদজ্ঞান তার কাছে নেই। ধর্ম, ধর্মছাড়া অন্য কিছু নয়।"

'এইভাবে উৎসাহ পেয়ে মাদাম মেয়রের সঙ্গে দেখা করলেন; তিনিও এ বিষয়ে পাদরীর সঙ্গে একমত।'

'তিনি বললেন: মাদাম দেখুন, উৎসবটা আমাদের কিন্তু বেশ জাঁক-জমকপূর্ণ করতে হবে। অন্য কোন বছর ইসিডোরের মত যদি কোন যোগ্য মহিলা পাওয়া যায় তাঁকেই গোলাপ ফুলের মালা দেব। এ-বিষয়ে আমাদের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত রাখতে হবে। আমাদের কাউকেই বাদ দিলে চলবে না, গুণের সন্ধান পেলেই আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবো।

'এই সংবাদ পেয়ে ইসিডোর লজ্জায় লাল হয়ে গেল; খুশিও হল অবশ্য।

'অভিষেকের দিন ঠিক হল পনেরই আগস্ট, ভার্জিন মেরী আর সম্রাট নেপোলিয়নের উৎসবের দিন। এই অনুষ্ঠানটিকে পৌর প্রতিষ্ঠান বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। লে করোনেক্স-এর ওপরে একটি মঞ্চ তৈরী করা হল। পুরনো কেল্লার গড়টি বিস্তৃত করে যে নয়নাভিরাম ক্ষেত্রটি তৈরী করা হয়েছে সেইটির নামই ছিল লে কারোনেক্স। সেখানেই তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। জনসাধারণের মনে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইসিডোরের যে গুণটিকে এতদিন সবাই উপহাসের চোখে দেখতো সেই গুণটা হঠাৎ সম্মানিত এবং সকলের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো; কারণ এরই জন্যে তাকে পাঁচশ ফ্রাঁ দেওয়া হবে সেই সঙ্গে দেওয়া হবে সেভিংস ব্যাঙ্কের বই, এবং অজস্র প্রশংসা—এত প্রশংসা যে সে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। মেয়েরা তাদের চাপল্য, অট্টহাসি, আর তাদের রুচিহীন ব্যবহারের জন্যে অনুতাপ করতে লাগলো, ইসিডোর যদিও সে আগের মতই ভীরু আর নম্র হয়েই রইল, একটা বেশ খুশ মেজাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

'চোদ্দই আগস্ট সন্ধ্যের ভেতরেই গোটা রু ডফিন পতাকায় পতাকায় একেবারে ঢেকে গেল। "করপাস ক্রিষ্টি" উৎসবের দিনের মত যে পথ দিয়ে শোভাযাত্রাটি যাবে সেই পথটি ফুলে-ফুলে আকীর্ণ হয়ে গেল। কমানডিং অফিসারের নেতৃত্বে জাতীয় রক্ষীবাহিনী কুচকাওয়াজ করল। যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে সম্রাট এই অধিনায়ককে সামরিক সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তিনি যে কত বড় বীর তাই প্রমাণ করার জন্যে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই একটি কসাকের দাড়ি সকলকে দেখাতেন। পদবীতে তিনি ছিলেন মেজর।

রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসার সময় ইনি তরোয়ালের একটি আঘাতে ওই কসাকের গাল থেকে তার দাড়িটি কেটে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। যে-বাহিনীটি তিনি পরিচালনা করতেন সেটি হচ্ছে ঝটিকাবাহিনী ; সারা অঞ্চলে বিখ্যাত। পনের থেকে কুড়ি মাইল ব্যাসার্দ্ধ জুড়ে বিরাট ভূখণ্ডে যে কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানকে সফল আর সম্মানিত করার জন্যে এই পদাতিক বাহিনীটিকে সব সময় স্মরণ করা হোত। শোনা যায়, লুই ফিলিপ যখন ইউর-এর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেছিলেন এমন সময় এই গিসোরস-এর বাহিনীটিকে দেখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলেছিলেন :

এই সুন্দর পদাতিক বাহিনীতে কারা রয়েছে ?

জেনারেল উত্তর দিয়েছিলেন : এই বাহিনী গিসোরস-এর সম্রাট-এর।

সম্রাট বলেছিলেন : আমার আগেই তা ভাবা উচিৎ ছিল।

'সুতরাং মেজর দেবার এবং তাঁর বাহিনী মাথার ওপরে ব্যাণ্ড চাপিয়ে ইসিডোরকে আনার জন্যে ভার্জিনির দোকানে কদম-কদম এগিয়ে গেল। জানালার ধারে হরেক রকম বাজনা বাজছে শুনে গোলাপ-রাজ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্বেতশুভ্র মরাল পোশাকে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মোড়া, মাথায় শোলার টুপি, ফুটন্ত গোলাপের গুচ্ছ দিয়ে বোতামের ঘরগুলি শোভিত। তার এই পোশাক নিয়ে মাদামকে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছিল। যিশু খৃস্টের শেষ ভোজনের উৎসবে প্রথম যোগ দেওয়ার সময় ছেলেরা যে কালো কোট পরে সেই কালো কোট, না, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে সাদা ধপধপে সুট—এদের মধ্যে কোনটা ইসিডোরের পরা উচিৎ তাই নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তা। তাঁর সচিব ফ্র্যাঙ্কয় অবশ্য সাদা সুটের পক্ষেই তার রায় দিয়েছিল ; কারণ, তার মতে গোলাপ-রাজকে মরালের মতই দেখতে হওয়া উচিৎ। এই অনুষ্ঠানের প্রবক্তা এবং প্রযোজক হিসাবে মাদাম তাঁর পিছনে চললেন। শোভাযাত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে মাদাম ইসিডোরের একটি হাত ধরলেন ; মেয়র বসলেন গোলাপ-রাজের বাঁ পাশে। সামরিক বাজনা বেজে উঠলো। মেজর ডেবার চীৎকার করে উঠলেন : অস্ত্র উঁচিয়ে ধর। আশে পাশের সহর এবং সহরতলী থেকে যে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল, সেই জনতার ভেতর দিয়ে শোভাযাত্রাটি গির্জার দিকে এগোতে লাগল। সেখানে ছোট একটি প্রার্থনা সভাতে অ্যাব্বি মালো হৃদয়স্পর্শকারী বক্তৃতা দিলেন। তারপরে শোভাযাত্রাটি লে করোনক্স-এর দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে একটি তাঁবুতে নিমন্ত্রিতদের ভোজ দেওয়া হল।

'অতিথিরা আসন গ্রহণ করার আগেই মেয়র একটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতার প্রতিটি কথা আমি তোমাকে বলতে পারি। বক্তৃতাটি এত মনোজ্ঞ হয়েছিল যে আমি তার সবটুকুই কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি।

"হে যুবক, খাঁটি মহিলা বলতে যা বোঝায় মাদাম হুসোঁ সেই জাতীয় মানুষ। দরিদ্ররা তাঁকে ভালবাসেন, ধনীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। এই সহর আর সহরতলীর জনগণের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর জনদরদী মনের প্রতিফলন হয়েছিল একটি সুখ-চিন্তায়। সেটি হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের জন্যে মানুষটিকে তিনি একটি পুরস্কার দেবেন। এই পুরস্কার আমাদের এই সুন্দর সহরের গণমানসের কাছে একটি অমূল্য উৎসাহের সঞ্চার করবে। হে যুবক, চারিত্রিক ধর্ম আর সততার বংশে তুমিই প্রথম পুরুষ যে এই গৌরবময় যশোমুকুট মস্তকে ধারণ করতে সমর্থ হলে। ভবিষ্যতে যারাই এই মুকুট ধারণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তুমি তাদের মধ্যে প্রথম। আমি এই কথাটা তোমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই যে আজকের এই শুভ সূচনায় যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছ সেই প্রতিজ্ঞার নীতি অনুসারেই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তোমার বাকী জীবনটুকু যেন কাটে। আজকে তোমার সু-চরিত্রের জন্যে যে মহিলাটি তোমাকে পুরস্কৃত করেছেন তাঁর সামনে, তোমার সম্মানের জন্যে যে-সমস্ত নগরবাসী সেনানীরা তাঁদের অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের সামনে তোমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন সেই গভীরভাবে মুগ্ধ বিরাট জনতার সামনে তুমি এই সহরের সঙ্গে একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, শুধু সহর নয়, আমাদের সঙ্গেও। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার প্রাণচঞ্চল সততার চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে তুমি বেঁচে থাকবে। হে যুবক, ভুলে যেয়োনা যে আমাদের সমস্ত আশার মধ্যে তুমিই প্রথম বীজ বপন করলে। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করে তুমি ফসল ফলাও, যে ফসল তোমার কাছ থেকে আশা করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে আমাদের।"

'মেয়র তিনটি পা এগিয়ে গিয়ে ভাবাবেগে আকুল ইসিডোরকে দুহাতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। গোলাপ-রাজ কাঁদলো; কেন কাঁদলো তা সে জানে না। একটা বিভ্রান্তিকর অনুভূতির উচ্ছ্বাসে সে কেবলই ফুলে-ফুলে কাঁদছে। সেই কান্নার মধ্যে আনন্দ আর গর্ব—দুই-ই রয়েছে মেশানো।

'তারপরে মেয়র ইসিডোরের একটি হাতে সিল্কের থলি দিলেন। এই থলিতে ছিল সোনার মোহর—ঠুন ঠুন করে শব্দ হচ্ছিল সেগুলির—পাঁচশটি ফ্রাঁর মূল্যের সোনা। তার অন্য একটি হাতে দিলেন একটি সেভিংস ব্যাঙ্কের বই। তারপরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন:

"চারিত্রিক সততার জয় হোক।"

'মেয়র দেবার গর্জন করলেন: "ব্র্যাভো।" পদাতিক বাহিনী চীৎকার করে উঠলো; জনতা হাততালি দিল। মাদাম হুসোঁ এতক্ষণে তাঁর চোখের জল শুকোলেন।

'তারপরে অতিথিরা খাবার টেবিলের পাশে গিয়ে বসলেন।

'সত্যিকারের অপূর্ব উৎসব, যেমন দীর্ঘ তেমনি একঘেয়ে। খাবারের ডিস আসছে তো আসছেই। অতিথি অভ্যাগতদের পেটে মিলেমিশে থাকার জন্যে হলদে সিরাপের গ্লাস এবং লাল মদের গ্লাস ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে টেবিলের ওপরে পাশাপাশি বসানো ছিল। প্লেটে-প্লেটে ঠোকাঠুকির শব্দ, কথাবার্তার আওয়াজ। ব্যাণ্ড-এর সু-নির্বাচিত সুরের গমক, সব মিশিয়ে সৃষ্টি করেছিল একটি গভীর অনন্ত শব্দ ঝংকার। মাঝে-মাঝে অ্যাব্বি মালোর সঙ্গে গল্প করতে-করতে মাদাম তাঁর একটি কানের ওপর থেকে খসে-পড়া কালো পরচুলাটাকে যথাস্থানে তুলে বসিয়ে দিচ্ছিলেন। মেজর দেবারের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন মেয়র। আর ইসিডোর? সে কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে। এত ভাল-ভাল খানা আর মদ জীবনে সে আর কোনদিন খায় নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি লোক তাকে সাহায্য করছিল। জীবনে সে-ই প্রথম কতকগুলি উৎকৃষ্ট খাবারের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় হল তার। খাবারগুলি যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সে তার কোমরের বেল্টটা খুলে দিল; কারণ, অতিরিক্ত খাবারের চাপে তার পেটটা বেশ ফুলে উঠেছিল। মদের গ্লাস ঠোঁটে তোলার সময়েই সে কেবল মুখ নাড়া বন্ধ করছিল। মদের গ্লাসটা ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরে অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে-তারিয়ে সে মদে চুমুক দিচ্ছিল। চুমুক দিতে-দিতে চুপ করে বসে রইল সে; এক ফোঁটা মদ তার সাদা কোটের ওপরে পড়ায় নিজেকে তার বেশ অপরাধী মনে হয়েছিল।

'পরে, পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনায় অনেকেই খাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালালো; সেগুলি চারপাশ থেকে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে গৃহীত আর অভিনন্দিত হল। সন্ধ্যা এগিয়ে এল। সেই দুপুর থেকে ভোজ চলছিল। উপত্যকার আকাশ সাদা দুধোল কুয়াসায় ছেয়ে গিয়েছিল, নেমে এসেছিল পাতলা ফিনফিনে একটি মসৃণ আবরণ, যে আবরণ দিয়ে নদী আর মাঠগুলিকে সন্ধ্যা ঢেকে দেয়। দিকচক্রবালে নেমে এল সূর্য। কুয়াসায় ঘেরা গোচারণ ক্ষেত্র থেকে গাভীদের দূরাগত মৃদু ডাক শোনা গেল।

'সব শেষ হল। দলটি গিসোরস-এর দিকে. যাত্রা করল। শোভাযাত্রা ভেঙে যাওয়ায় যে যার খেয়াল-খুশি মত চলতে সুরু করল। ইসিডোরের একটি হাত ধরে মাদাম তাঁর বশংবদের কানে-কানে বিশ্বের যত উৎকৃষ্ট উপদেশ আর বাণী রয়েছে তাদের প্রায় সব ক'টিই মুখস্ত বলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই কাঁচা আনাজের দোকানের কাছে এসে থামলেন; এবং তার মায়ের বাড়িতে গোলাপ-রাজকে পৌছে দিয়ে তাঁরা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু তার মা তখনও ফেরে নি। ছেলের সম্মানের জন্যে তার বাড়ির লোকেরা আর একটি উৎসবের আয়োজন করেছিল; সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল তার। যে তাঁবুতে প্রধান ভোজসভা বসেছিল শোভাযাত্রার সঙ্গে সেই পর্যন্ত

গিয়ে সে তার বোনের সঙ্গে দ্বিতীয় ভোজসভায় যোগ দিতে গিয়েছিল। সেই ঘনায়মান সন্ধ্যায় ইসিডোর তাদের দোকানে একা-একা বসে রইল। বিজয়ের উচ্ছ্বাস আর মদের প্রকোপে তার মাথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। একটা চেয়ার নিয়ে বসে নিজের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখল সে। গাজর, মূলো, কপি, পেঁয়াজ-এর উগ্র গন্ধের সঙ্গে স্ট্রবেরির মিষ্টি অথচ তীব্র গন্ধ এবং একঝুড়ি পিচ ফলের মিহি সুবাস—সব তালগোল পাকিয়ে ঘরের বন্ধ বাতাসটাকে ভারি করে তুলেছিল। গোলাপ-রাজ একটা কাঁচা ড্রামের মত শক্ত পিচ ফল তুলে নিয়ে বিরাট কামড় দিল। তারপর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে সে হঠাৎ ধিনতা-ধিনা করে নাচতে সুরু করল। এমন সময় সে বুঝতে পারল তার পকেটে ঝুন ঝুন করে শব্দ হচ্ছে।

'অবাক হয়ে পকেটে সে হাত ঢুকিয়ে দিল; উচ্ছ্বাসের আবেগে সে সব ভুলে গিয়েছিল। পকেটের ভেতর থেকে সে পাঁচশ ফ্রাঁ বার করল। পাঁ-চ-শ ফ্রাঁ। আরে এ যে অনেক টাকা! সেগুলি সে কাঠের তক্তার উপরে উজাড় করে ঢেলে দিল। তারপর আদর করার ভঙ্গিতে সবগুলিকে একসঙ্গে দেখার জন্যে সে তার হাতের চওড়া চেটোর ওপরে বিছিয়ে দিল। পঁচিশ—পঁচিশটা সোনার মোহর—সব ক'টা সোনার, সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন কাঠের কাউন্টারের উপরে সেগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। সেগুলোকে সে বারবার গুণতে লাগলো—প্রতিটি মোহরের গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে বলতে লাগলো:

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—একশ; ছয়, সাত, আট, নয়, দশ—দুশ।"

'তারপর সেগুলিকে থলির মধ্যে পুরে আবার সে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

'কে জানে, কে বলতে পারে সৎ আর অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে গোলাপ-রাজের মনের বিবরে তখন কি কঠোর সংগ্রাম চলছিল; কী দুর্ধর্ষ আক্রমণ, কৌশল, আর লোভ দেখিয়ে শয়তান সেই ভীরু নিষ্পাপ হৃদয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল কে জানে? সেই সুন্দর পবিত্র আত্মাটিকে পাপের পথে টেনে ধ্বংস করার জন্যে শয়তান তার চোখের সামনে কী মায়াময় ছক্করবাজি খেলে তাকে একেবারে অভিভূত করে তুলেছিল তা একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন। মাদাম হুশোঁর নয়নের মণি তার টুপীটি তুলে নিল; সেই টুপীর ওপরে কমলা রঙের ছোট ডালটি তখনও লেগে ছিল। পেছনের ছোট গলি দিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল। তারপরে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল অন্ধকার পথের অন্তরালে।

'ছেলে ফিরে এসেছে শুনে ভার্জিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এল; দেখলো ঘর শূন্য। কোন কিছু আশঙ্কা না করেই সে অপেক্ষা করল; কিন্তু মিনিট পনের পরেই সে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে সুরু করল।

'রিউ ডফিনের প্রতিবেশীরা ইসিডোরকে ঘরে ঢুকতে দেখেছে; কিন্তু কেউ তাকে বেরোতে দেখে নি, চারপাশে খোঁজাখুঁজি সুরু হল; কোথাও খুঁজে

পাওয়া গেল না তাকে। মনের দুঃখে ভার্জিনি টাউন হলে দৌড়ে গেল। গোলাপ-রাজকে তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এ ছাড়া মেয়র অন্য কোন সংবাদ দিতে পারলেন না। মাদাম হুশোঁর কাছে যখন তাঁর বশংবদের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ গেল তখন তিনি শুয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, তিনি কালো পরচুলোটা পরে নিলেন, তারপরে ভার্জিনির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। অশিক্ষিতদের বলগাহীন উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভার্জিনি তখন তার গাজর, কপি, আর পেঁয়াজের ঝুড়ির কাছে বসে-বসে চেঁচাচ্ছে।

'নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কী ঘটতে পারে? সহরের চারপাশ খুঁজে বেড়ানোর জন্যে মেজর দেবার তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। পনটয়ের পথে গোলাপ ফুলের গুচ্ছটিকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। সেই গুচ্ছটি কুড়িয়ে এনে টেবিলের ওপরে রাখা হল। কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে বসলেন। গোলাপ-রাজ নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র অথবা হিংসুটে পরিকল্পনার শিকার হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্যে, কোন্ পথ দিয়ে আর কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে একটি নিষ্পাপ ছেলেকে এইভাবে তারা নিয়ে পালিয়ে গেল।

'খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত হয়ে কর্তাব্যক্তিরা ঘুমোতে গেলেন। ভার্জিনি কেবল খুঁজতে-খুঁজতে কাঁদতে-কাঁদতে রাত কাটালো।

'পরের দিন সকালে অবশ্য প্যারিস থেকে স্টেজ কোচ ফিরে আসার পরেই গিসোরস-এর অধিবাসীরা অবাক হয়ে জানতে পারল যে গোলাপ-রাজ সহর থেকে দু'শ গজ দূরে স্টেজ কোচ থামিয়ে তাতে উঠে পড়ে; গাড়ী ভাড়া দেয়, খুচরো ফেরত নেয়, তারপরে শান্তভাবে সেই বিরাট সহরের কেন্দ্রভূমিতে নেমে যায়।

সংবাদটা পেয়ে সবাই চমকে উঠলো। গিসোরস-এর মেয়র এবং প্যারিসের পুলিশ প্রধানের মধ্যে অনেক লেখালেখি হল; কিন্তু ইসিডোরকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

'একদিন দু'দিন করে সারা সপ্তাহটাই কেটে গেল। তারপরে একদিন প্রত্যুষে ডাক্তার বারবেসল দেখল একটি লোক ধূসর রঙের স্যুট পরে দরজার সামনে বসে-বসে ঘুমোচ্ছে; তার মাথাটা দেওয়ালের গায়ে ঝুঁকে পড়েছে। তিনি তার কাছে এগিয়ে গেলেন। চিনতে পারলেন ইসিডোরকে। তিনি তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। ভূতপূর্ব গোলাপ-রাজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—মাঝে-মাঝে সে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ভয় পেয়ে ডাক্তার লোকজন ডেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলেন। তাকে মাটি থেকে তোলার সময় তার পাশ থেকে একটা খালি বোতল পাওয়া গেল। ডাক্তার গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারলেন সেটি ব্র্যানডির। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুবিধেই হয়েছিল। কারণ কোন্ দিক থেকে চিকিৎসা সুরু করা হবে তা বুঝতে দেরী হয় নি তাঁদের।

ওষুধে কাজ হয়েছিল। ইসিডোর মদে চুর হয়ে পড়েছিল; এবং একটি সপ্তাহ ধরে সে ব্যভিচারে ডুবে ছিল। রাস্তা থেকে যারা ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়ায় তাদের কাছেও সে অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছিল। তার সেই শ্বেত পোশাকের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না, হলদে, সবুজ রঙে, মাটিতে কাদায়, চর্বিতে বোঝাই হয়ে ছিঁড়ে ঝুলঝুলি হয়ে গিয়েছিল। তার গা দিয়ে নোংরা বস্তার গন্ধ ভুর ভুর করে বেরোচ্ছিল। অধঃপাত যাওয়ার চিহ্ন তার দেহ আর মনের সর্বত্র।

'তাকে পরিষ্কার করানো হল, উপদেশ দেওয়া হল, তারপরে ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। চারদিন সে ঘর থেকে বেরোতে পারে নি। মনে হল সে অনুতপ্ত, লজ্জিত হয়েছে। তার সেই পাঁচশ ফ্রাঁ অথবা সেভিংস পাশ বই-এর চিহ্নমাত্র নেই; বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিসাবে যে রূপোর হাতঘড়িটা পেয়েছিল তাও নিরুদ্দেশ।

'পঞ্চম দিনে রিউ ডফিনের রাস্তায় বেরোনোর সাহস হল তার। অনিসন্ধিৎসু মানুষের দৃষ্টি থেকে সরে থাকার জন্যে মাথা নিচু করে, চোরা চাহনি দিয়ে সে ঘরের পাশ ঘেঁষে হাঁটতে লাগলো—উপত্যকার দিকে সহরের বাইরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘণ্টা দুই পরে টলতে-টলতে সে ফিরে এল। সে তখন মদে চুর।

তাকে আর সারানো গেল না। মা তাকে ঘর থেকে বার করে দিল। একটা দোকানে সে মুটের কাজ নিলে; কয়লার মোট ঘাড়ে করে সে ঘুরতো।

মদ খাওয়ার জন্যে সে এতই দুর্নাম কিনলো যে দূরের মানুষরাও তাকে মাদাম হুসোঁর গোলাপ-রাজ বলে ঠাট্টা করতে লাগলো; কেবল তাই নয়, আশপাশের সমস্ত মাতালদেরই ওই নামে ডাকা হয়। ভাল কাজ কোনদিনই নষ্ট হয় না।

* * *

কাহিনীটি শেষ করে ডাক্তার ম্যারাবোঁত দুটি হাত একসঙ্গে ঘষে নিল।

জিজ্ঞাসা করলাম: গোলাপ-রাজকে ব্যক্তিগতভাবে তুমি চেন?

হ্যাঁ। তার চোখ দুটি বোজানোর সম্মান আমারই।

কিসে সে মারা গেল?

পাগল হয়ে।

আমরা তখন পুরনো কেল্লার কাছাকাছি এসে পৌছেছি। কেল্লাটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; তবে ক্যানটারবারীর সেন্ট টমাসের বিরাট গম্বুজগুলি এখনও রয়েছে; আর রয়েছে কয়েদখানা।

ম্যারাবোঁত আমাকে একটি কয়েদীর গল্প বলল। কয়েদখানার ফোকর দিয়ে সূর্যের যে সামান্য আলো ঘরে এসে ঢুকতো 'তারই আলোতে সেল-এর দেওয়ালে পেরেক দিয়ে সে সুন্দর ছবি এঁকেছিল।

তারপরে আমি জানতে পারলাম দ্বিতীয় ক্লতেয়ার গিসোরস-এ পৈতৃক সম্পত্তি তাই সম্পর্কে ভাই রাওন-এর বিশপ সেন্ট রেঁমাকে দান করেছিলেন। তারপর সেন্ট ক্লেয়ার-স্থ-এপটির সন্ধির পরে গিসোরস আর সারা ভেক্‌সিন-এর রাজধানী থাকে নি। ফ্রান্সের এই অঞ্চলটির প্রবেশপথ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায়, সহরটিকে শত্রুরা বারবার অধিকার করেছে, একজনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর একজন। উইলিয়ম রিফিউস-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিখ্যাত এনজিনিয়র রবার্ট দ্য বেলসমি এখানে একটি শক্তিশালী কেল্লা নির্মাণ করেন। এই কেল্লাটিকে পরে লুই দি ফ্যাট আক্রমণ করেন, তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন নর্মাণ ব্যারণরা। রবার্ট দ্য ক্যানডো এটিকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচান; জিয়োফ্রি প্ল্যানটাজেনেট এটিকে লুই দি ফ্যাট-এর কাছে সমর্পণ করেন। নাইটস্ টেম্প্‌লারদের বিশ্বাসঘাতকতায় এটিকে আবার জয় করে ইংরেজরা; ফিলিপ অগাস্টাস আর রিচার্ড কুর-ডি-লয়ন এই সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি করেন। কেল্লাটিকে অধিকার করতে না পেরে ইংলণ্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ড এটিকে পুড়িয়ে দেন। ১৪১৯ সালে ইংরেজরা আবার এটিকে অধিকার করে। রিচার্ড অফ মারবারি এটি আবার সপ্তম চার্লস-এর কাছে সমর্পণ করেন; আবার এটি চলে যায় ক্যালাব্রিয়ার ডিউক-এর হাতে। চতুর্থ হেনরী এখানে বসবাস করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যারাবোঁত হুড়-হুড় করে বলে যেতে লাগলো সব। তারপরে বেশ জোরের সঙ্গেই সে মন্তব্য করল: কী বদমাইশ এই ইংরেজ জাতটা। তাদের মধ্যে প্রতিটি লোকই ওই গোলাপ-রাজের মত—মাতাল। সব ব্যাটাই কপট।

মাটির ওপর দিয়ে ছোট একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। একটু থেমে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি জান এপ নদীর তীরে হেনরী মনিয়ার হচ্ছে সবচেয়ে দক্ষ জেলে?

না তো।

এবং বুফি, বন্ধু, বুফি যে এখানে রঙিন কাঁচ তৈরী করে তা কি তুমি জান?

তাই বুঝি?

হায়রে, তোমার মত হস্তিমূর্খ আমি জীবনে দেখি নি।

শালি

(Shali)

একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে-শুয়ে ঝিমোচ্ছিলেন বৃদ্ধ অ্যাডমিরাল দ্য লা ভ্যালি। হঠাৎ তাঁর স্বরটা কেঁপে-কেঁপে উঠলো। তিনি বললেন: একবার আমার জীবনে ছোট একটি রোমান্স দেখা দিয়েছিল। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় সে-কাহিনীটা আমি তোমাদের বলতে পারি।

ঠোঁটে তাঁর সেই চিরন্তন হাসিটি ফুটে উঠলো; ভলতেয়ারের বাঁকানো হাসির সঙ্গে সেটি তুলনীয়; যে-হাসিটি তাঁকে চরম বিশ্বনিন্দুকের আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

(১)

আমার বয়স তখন তিরিশ, নৌ-বিভাগের লেফটন্যাণ্ট আমি। সেই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি অভিযানে আমাকে একবার মধ্যভারতে যেতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার আমাকে সব রকম সাহায্য দিয়েছিল। নির্দেশ আসার পরে দেরী না করে একটি ছোট পথপ্রদর্শক দল সঙ্গে নিয়ে সেই চমক-প্রদ এবং প্রাচুর্যের দেশটির গভীরে ঢুকে পড়লাম।

এই ভ্রমণের বিষয়ে যথাযথ বর্ণনা করতে গেলে, কয়েকটি গ্রন্থ আমার লেখা উচিত। আমি এমন সব অঞ্চল দিয়ে ঘোরাফেরা করেছিলাম যেগুলি রূপকথার প্রাচুর্যে আকীর্ণ ছিল, যেখানে অপূর্ব সুন্দর রাজকুমারেরা তাঁদের অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। দুটি মাস মনে হল আমি কাব্য জগতে বাস করছি; ভৌতিক হাতির পিঠে চড়ে আমি কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াতাম, মন্ত্রমুগ্ধ অরণ্যের মধ্যে অবিশ্বাস্য ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতাম। সহর তো নয়, স্বপ্নের রাজ্য। সেই সব সহরে সুন্দর-সুন্দর বিরাট-বিরাট বাড়ি আমি দেখেছি—কেবল সুন্দর নয়, অতুলনীয়—অপরূপ খোদাই করা যেন এক একটি হীরের চাঁই, পাহাড়ের মত বিরাট, অথচ ফিতের মত পাতলা; এত স্বর্গীয়, এত সুন্দর, এত মনোমুগ্ধকর যে নারীর মত তাদের আমরা ভাল না বেসে পারি নে, এবং তাদের কথা ধ্যান করে আমরা একটি আনন্দ লাভ করি।

অবশেষে আমি আমার লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হলাম—জায়গাটার নাম গণহরা, মধ্যভারতের একটি উন্নত সহর; কিন্তু বর্তমানে এটির ঐতিহ্য অব-নতির দিকে। এর শাসনকর্তা বেশ ধনী রাজা, রাজা মদন খাঁটি প্রাচ্য দেশীয় রাজা—যথেচ্ছাচারী, দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর, কিন্তু একই সময় আবার দরাজ হৃদয়; রুচিবান অথচ জংলী, দয়ালু অথচ রক্তলোলুপ; তাঁর মধ্যে যেমন নারীর লাবণ্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে নিষ্ঠুর ক্রূরতা।

একটি উপত্যকার গভীরে এই সহর, ছোট একটি হ্রদের ধারে; তার চারপাশে অসংখ্য প্যাগোডা; তাদের চারপাশের দেওয়ালগুলি এই লেকের জলে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। দূর থেকে দেখলে প্রথমেই আপনার চোখে পড়বে এক ঝলক সাদা রঙ। যতই আপনি এগিয়ে যাবেন ধীরে-ধীরে সহরটি আপনার কাছে খুলে যাবে: বড়-বড় গম্বুজ, মিনার, ছুঁচলো চূড়ো, সরু লম্বা উঁচু শৃঙ্গ আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্য যে কত সুন্দর এগুলি না দেখলে বোঝা যায় না।

সহরের প্রধান ফটক থেকে আধঘণ্টা চলার পরে রাজা আমাকে সম্মান দেখানোর জন্যে একটি রক্ষীবাহিনী পাঠালেন, সেই সঙ্গে পাঠালেন একটি সুসজ্জিত হাতি। বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে তারা আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল।

রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উপযুক্ত পোশাক পরার সময় চাইলাম একটু; কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে রাজা অধীর হয়ে উঠেছেন। অতএব বিলম্ব করা চলবে না। তিনি আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে এবং আমাকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা যায় কি না তাই আবিষ্কার করার জন্যে অধীর। বাকি সব কিছু অপেক্ষা করতে পারে। ঝকমকে সামরিক পোশাকে সজ্জিত অসংখ্য যোদ্ধার ব্রোঞ্জে গড়া প্রতিমূর্তির ভেতর দিয়ে তারা আমাকে বিরাট হলঘরে নিয়ে এল। সেই ঘরের দেওয়ালের গায়ে গ্যালারি আঁটা। সেইগুলির ওপরে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক আর চকমকে হীরা ঝুলিয়ে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি জায়গায় সাধারণ একটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে; এর কোন ঠেস দেওয়ার জায়গা ছিল না; কিন্তু মাথাটা ঢাকা; তার ওপরে বেশ একটি সুন্দর কার্পেট পাতা। তারই ওপরে দেখলাম একতাল চকচকে আলো, অনেকটা ওত পেতে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকা সূর্যের মত জলজ্বলে। ইনিই হচ্ছেন রাজা; ঝকমকে টিয়ারঙের পোশাক পরে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে স্থির হয়ে বসে আছেন। তাঁর গায়ে যে হীরের গয়না রয়েছে তার দাম দশ থেকে পনের মিলিয়ন ফ্রাঁ; তাঁর কপালে চকচক করছিল দিল্লীর বিখ্যাত তারকা। মুন্দোরের প্রতিহার বংশের কুলগত সম্পত্তি ছিল ওটি। রাজা নিজেকে সেই বংশের বংশধর বলে মনে করতেন। পঁচিশ বছরের যুবক তিনি। যদিও নির্ভেজাল হিন্দুবংশোদ্ভুত, তবু তাঁর ধমনীতে কিছু নিগ্রো রক্ত প্রবাহিত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর চোখ দুটি বড়-বড়, কপালের নিচে শক্ত করে বসানো, কিন্তু চাহনিশূন্য। গালের হাড়গুলি উঁচু, মোটা ঠোঁট, কোঁকড়ানো দাড়ি, নিচু কপাল কিন্তু তীক্ষ্ণ, চকচকে সাদা দাঁত; যান্ত্রিক হাসিতে যেগুলি মাঝে-মাঝে বাইরে প্রকাশ পায়। আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ইংরেজী কায়দায় হস্তমর্দন করলেন আমার। তারপর, বেঞ্চের ওপরে তাঁর পাশে আমাকে বসালেন। বেঞ্চটা এত উঁচু যে মাটিতে আমার পা ঝুলিয়ে বসে থাকাটা সত্যিই বড় কষ্টকর।

বসার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বললেন, আগামী কাল আমরা বাঘ-শিকারে যাব। শিকার আর মল্লযুদ্ধের ওপর তাঁর ঝোঁকটা বড় প্রবল; মানুষের যে অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকে এটা তাঁর ধারণার অতীত। আমার মনে হয় তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে কেবল মাত্র তাঁকে আনন্দ দেওয়ার আর তাঁর আমোদের সঙ্গে সহযোগিতা করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। আমার কাজের সাফল্য তাঁর শুভেচ্ছার

ওপরে নির্ভর করছে বলে তাঁকে খুশি করার জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করতাম। আমার ব্যবহারে তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে আমাকে তক্ষুণি তাঁর দুটি মল্ল যোদ্ধার যুদ্ধ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ; এবং প্রাসাদের মধ্যে যে ছোট মাঠ রয়েছে সেখানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর আদেশে দুটি তামাটে রঙ-এর যোদ্ধা হাজির হল। তারা একেবারে উলঙ্গ, হাতের সঙ্গে দুটো বড়-বড় ইস্পাতের নখ লাগানো। তারা মাঠে নেমেই তাদের নৃশংস অস্ত্র নিয়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেখতে-দেখতে তাদের শরীর ফুটো হয়ে গল-গল করে রক্ত ঝরতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল। তাদের দেহগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, তারা যুদ্ধ করে চলল। একজনের কান ফুটো হয়ে ঝুলতে লাগলো ; আর একজনের কান তিন টুকরো হয়ে গেল। বর্বর আগ্রহ নিয়ে রাজা এই যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। আনন্দে কাঁপতে লাগলেন তিনি, নিচু স্বরে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, যোদ্ধাদের সমস্ত পদক্ষেপ আর ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করলেন, অবশ্য নিজের অজ্ঞাতসারেই।

চীৎকার করে উঠলেন তিনি : ওকে আঘাত কর। কর, কর।

অবশেষে একটি যোদ্ধা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ; রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। রাজার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি প্রচণ্ড নিরাশার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন এই ভেবে যে রগুদার খেলাটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে আমার মন্তব্য জানতে চাইলেন তিনি। আমার বিরক্তি লুকিয়ে রেখে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম।

এর পরে আমাকে খুশ মহলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকটি সুন্দর-সুন্দর পরীদের বাগান পেরিয়ে আমার বাসায় হাজির হলাম। এই হীরের টুকরো প্রাসাদের পুরো একটা ধার ঘেঁষে রয়াল পার্ক। তারই পাশ দিয়ে বিহারের পূত হ্রদ। আমার প্রাসাদটি ছিল চারকোণা। প্রতিটি কোণ ছোট-বড় উঁচু-নিচু, কোথাও একা, কোথাও জোড়া-জোড়া গম্বুজ উঠেছে। দেখতে সেগুলি গোলাপ ফুলের মত। প্রাচ্য ভাস্কর্যের এক অপরূপ নিদর্শন। পুরো বাড়িটাই ভিত থেকে ছাদ পর্যন্ত অসংখ্য কারু আর চারুকলায় সমৃদ্ধ।

ঘরগুলিতে খিলানের মত জানালা। জানালার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। সেগুলির মধ্য দিয়ে আলো এসে সেগুলিকে আলোকিত করত। জানালাগুলি সব বাগানের দিকে। মার্বেল মেঝেগুলিও নানারকম ফুলের কারুকার্য খচিত।

বাসায় গিয়ে সবেমাত্র পোশাক পরিবর্তন করেছি এমন সময় প্রাসাদের একজন পদস্থ অফিসার এসে জানালেন রাজাবাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অফিসারটির নাম হারিবাদাদা ; রাজকুমার আর আমার

মধ্যে তিনি ছিলেন যোগাযোগ-অফিসার। রাজার গায়ে জাফরান রঙের পোশাক। আবার আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন; অনর্গল কথা বলতে লাগলেন; এবং বারবার তাঁর বিশেষ অভিমতের ওপরে আমার মন্তব্য শুনতে চাইলেন। সেই সব মন্তব্য প্রকাশ্যে করতে আমার রীতিমত কষ্ট হয়েছিল। তারপরেই বাগানের একেবারে অন্য প্রান্তে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আমাকে দেখানোর জন্যে প্রস্তাব করলেন।

বিস্তৃত পতিত জমি; পাথর আর বড়-বড় বাঁদরের পালে বোঝাই। আমরা সামনে যেতেই পুরুষ বাঁদরগুলো আমাদের ভেংচি কাটতে-কাটতে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করল। আর মেয়ে বাঁদরগুলো বগলে তাদের বাচ্চা সামলে নিয়ে কিচির-মিচির করতে লাগলো। হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন রাজা, তাঁর আনন্দ বোঝানোর জন্যে আমার ঘাড়ে চিমটি কাটলেন, এবং ভগ্নস্তূপের ওপরে বসে পড়লেন। আর চারপাশ ঘিরে বসে সাদা গোঁফওয়ালা বাঁদরগুলো আমাদের লক্ষ্য করে দাঁত খিঁচোতে আর ঘুষি পাকাতে লাগলো। এইভাবে ক্লান্ত হওয়ার পরে মহারাজা উঠলেন, এবং আমার পাশে-পাশে গম্ভীরভাবে হাঁটতে লাগলেন। আমার আবির্ভাবের প্রথম দিনেই তিনি যে আমাকে এতগুলি আশ্চর্য ঘটনা দেখাতে পেরেছেন এতেই তিনি খুশি; এবং পরের দিন যে বাঘ-শিকারের আয়োজন হয়েছে সেই কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং তারপরে অনেকগুলি যে শিকারের আয়োজন হয়েছিল আমি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। শিকার কেবল বাঘই হয় নি; ও-অঞ্চলে যত রকম জানোয়ার ছিল সবগুলিই সেই শিকারের মধ্যে পড়েছিল—যথা: প্যানথার, ভালুক, হাতি, হরিণ, গণ্ডার, কুমীর—ভগবান জানেন আরও কী কী—এককথায় পশু জগতের অন্তত অর্দ্ধেক জানোয়ারই এই শিকারের মধ্যে পড়েছিল। এই রকম শিকার করতে-করতে আর হাসতে-হাসতে শেষ পর্যন্ত আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম—ক্লান্ত হয়ে উঠলাম খেলার একঘেয়েমিতে।

রাজার জন্যে যে সব খানা তৈরী হোত সেগুলিরই কিছু-কিছু অংশ ঢাকা প্লেটের মধ্যে নিয়ে প্রতিদিন একদল চাকর আমার বাসায় এসে হাজির হোত। প্রতিদিন আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে যে নতুন-নতুন আমোদ প্রমোদের আয়োজন হোত সেগুলিকে উৎসাহিত করে আনন্দ বর্দ্ধন করার জন্যে প্রাণপাত করতে হোত আমাকে। নর্তকীদের নাচ, ভাঁড়েদের ভাঁড়ামি, সৈন্য পরিদর্শন—অথবা এমন কোন ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা মহারাজার মাথায় যখন যেটি চাপতো এবং আমাকে খুশি করতে পারবে বলে তাঁর মনে হোত সেইটিরই আয়োজন হোত মহা আড়ম্বরে। যখনই আমি ছাড়া পেতাম তখনই হয় আমি নিজের কাজ করতাম, অথবা বাঁদরগুলোকে দেখতে যেতাম। রাজার সঙ্গের চেয়ে

বাঁদরদের সঙ্গ আমার ভাল লাগতো অনেক বেশী।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় বেড়িয়ে ফিরছি এমন সময় দরজার সামনে হারিবাদাদার সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোককে একটু যেন গম্ভীর-গম্ভীর মনে হল। ভাবাটিকে রেখে ঢেকে তিনি আমাকে জানালেন যে মহারাজার কাছ থেকে একটি উপহার তিনি নিয়ে এসেছেন। সেটি আমার ঘরে অপেক্ষা করছে। তিনি তাঁর প্রভুর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন আমার একটি বিশেষ অভাব পূরণ করা তাঁর আগেই উচিৎ ছিল। রহস্যজনক এই উক্তিটি করে তিনি মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই দেখি ছ'টি বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে উচ্চতা অনুসারে আমার ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ভরত পাখির মত—এখনই যেন তাদের শিকে বিঁধে কাবাব তৈরী করা হবে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে তার বয়স আট; সব চেয়ে ছোটর বয়স ছয়। আমার ঘরে এই রকম একটি শিশু বিদ্যালয় খোলার অর্থটা কী তা আমি তখন বুঝতে পারি নি। তারপরেই হঠাৎ বুঝলাম আমার প্রতি রাজার যে একটি সূক্ষ্ম সুন্দর অনুভূতি রয়েছে এটি তারই প্রমাণ।

হতভম্ব আর লজ্জিত হয়ে তাদের দিকে চেয়ে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারাও বড়-বড় চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; তাদের কাছে কী চাওয়া হবে তারা যেন তা জানে। আমি যে তাদের নিয়ে কী করব আমার মাথায় ঢুকলো না। একবার মনে হল তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিই; কিন্তু রাজার উপহার ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ নৈতিক অপমান করা। অবস্থাটিকে মেনে নেওয়া আর মেয়েদের আমার প্রাসাদে স্থান দেওয়া ছাড়া আপাততঃ অন্য কিছু করার ছিল না আমার। আমার দিকে তাকিয়ে, আমার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করে, এবং আমার চোখের ভাষা পড়তে পড়তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হতচ্ছাড়া উপহারের নিকুচি করেছে! কী জঘন্যভাবে যে আমি বিব্রত হয়েছিলাম কী বলব? নিজেকে আমার এত মূর্খের মত মনে হয়েছিল যে অবশেষে বড়টিকে বললাম আমি: তোমার নাম কি বলত?

মেয়েটি বলল; শালি।

একটি অদ্ভুত মেয়ে—এই পুচকে শালি। তার গলার স্বরটি যেমন মিষ্টি গায়ের চামড়াও তেমনি মসৃণ। মুখটাও বড় সুন্দর। যেন পাথরের ওপরে কুঁদা।

কী বলে তাই জানার জন্যে এবং সম্ভবত তাকে একটু বিভ্রান্ত করার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা এখানে এসেছ কেন?

মিষ্টি স্বর করে বলল: প্রভুর আজ্ঞা মত কাজ করতে।

এই বাচ্চাগুলির ওপরে সেই রকম নির্দেশ ছিল।

সবচেয়ে বাচ্চা মেয়েটাকেও আমি প্রশ্ন করলাম; সেও ওই একই উত্তর দিল।

এই মেয়েটি সত্যিই বড় মিষ্টি—বাচ্চা ইঁদুরের মত। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলাম, তারপর আমি খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে মেঝেতে বসলাম; তাদেরও বসালাম আমার চারপাশে। তাদের ভাষাটা আমি ভালই বলতে পারতাম। সেই ভাষাতেই তাদের আমি পরীদের গল্প বললাম, গল্প বললাম দৈত্য-দানবের। তারা সব চোখ বড়-বড় ক'রে অবাক হয়ে সব শুনল, কখনও আনন্দে খিল-খিল করে হাসলো, কখনও ভয়ে জমাট বেঁধে গেল। যে-সব অবাস্তব কাহিনী তাদের আমি বললাম সে-সব শুনে তারা মনের আনন্দে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো।

গল্প শেষ হওয়ার পরে আমার ব্যক্তিগত পরিচারক লক্ষ্মণকে ডাকলাম, ওদের জন্যে নানারকম মিষ্টি আনতে বললাম। সেই সব মিষ্টি খেয়ে-খেয়ে বেচারীরা প্রায় অসুস্থ হওয়ার উপক্রম করল।

সেই যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে আমি পড়লাম তার রস আর আনন্দ পুরোপুরি ভোগ করার চেষ্টা আমি করলাম। আমার এই সব ক্ষুদে সুলতানাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে নানা রকম খেলার আয়োজন করলাম। সেইগুলির মধ্যে একটি খেলা খুবই আনন্দ দিয়েছিল সকলকে। সেটি হল ঘোড়া-ঘোড়া খেলা। আমি দুটো পা ফাঁক করে দাঁড়াতাম; আর ছ'টা বাচ্চা সেই ফাঁক দিয়ে গলে যেত। সবাই সেই ফাঁক দিয়ে অনায়াসে গলে যেত; কিন্তু বড়টা পারত না; গলে যাওয়ার সময় সে আমার পা ছুঁয়ে ফেলত। এই দেখে সবাই খিল-খিল করে হেসে উঠতো, সেই হাসির শব্দে আমার সেই বিরাট প্রাসাদের গম্বুজটি পর্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠতো; সেই নিস্তব্ধতা জীবনের কলরোলে টুকরো-টুকরো হয়ে যেত।

ছ'টা নিষ্পাপ বাচ্চার শোওয়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সেদিকে আমি অত্যন্ত সজাগ ছিলাম। চারটি মেয়েকে মহারাজা ওদের পরিচারিকা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। রাত্রিতে তাদের জিম্মায় ওদের রেখে আমি বেরিয়ে আসতাম।

গোটা সপ্তাহ ওই ক'টা পুতুলের সংসারে পিতৃত্বের অভিনয় করলাম আমি। নানারকম খেলার আয়োজন করে নিত্য নতুন আনন্দে আমি তাদের মশগুল করে রাখতাম।

আমার বাড়িটা যেন একটা মেয়েদের স্কুলে পরিণত হল। সিল্ক, সোনা, আর রূপোলি পোশাক পরে আমার সেই শিশু বন্ধুরা নিস্তব্ধ লম্বা গ্যালারির ভেতরে অফুরন্ত প্রাণের আনন্দে ছোটাছুটি করত; আর জাফরির ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে ঘরগুলিকে পাতলা নরম আলোতে ভরিয়ে তুলতো।

ওদের মধ্যে যেটি সব চেয়ে বড়, শালি যার নাম, প্রাচীন হাতির দাঁতে গড়া ভাস্কর্যের মত ভারি সুন্দর চেহারা তার। দলের মধ্যে সে-ই ছিল আমার প্রিয় পাত্রী। মেয়েটিকে দেখলে সকলেরই ভাল লাগবে, নম্র, ভদ্র, অথচ হাসি-

খুশি ভাব। সে আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিল; আমিও ভালবেসে-ছিলাম তাকে। অন্যগুলো বিড়াল বাচ্চার মত যখন চারপাশে ছুটে বেড়াতো তখন সে আমার কাছে বসে থাকত; এবং রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়ে আমার সঙ্গছাড়া হোত না।

আমরা বানর অধ্যুষিত প্রাচীন ভগ্নস্তূপের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেশ আনন্দেই ঘুরে বেড়াতাম; বানরগুলির সঙ্গে আমাদের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে চুপচাপ আমার কোলের ওপরে বসে থাকতো; তার সেই ছোট ফিনিক্স-এর মাথায় অজস্র কল্পনার বান ডেকে উঠতো, কিংবা, হয়ত সে কিছুই চিন্তা করতো না, কিন্তু প্রাচীন ধর্মযাজকদের পবিত্র প্রতিমূর্তির মধ্যে যে শান্ত সমাহিত একটা ভাব দেখা যায় সে ভাবে সে বিভোর হয়ে থাকতো। সব সময় আমি বিরাট একটা তামার পাত্রে বোঝাই করে নানারকম ফল নিয়ে আসতাম; আর মেয়ে বাঁদরগুলি তাদের পিছু-পিছু আর একটু ভীরু বাচ্চা-গুলিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতো; সেই সুস্বাদু ফলগুলি বিলিয়ে দেওয়ার আশায় তারা আমাদের ঘিরে গোল হয়ে বসে অপেক্ষা করতো। ওদের মধ্যে একটা পুরুষ বাঁদর আমার দিকে ভীরু পায়ে এগিয়ে আসতো; ভিক্ষুকের মত আমার সামনে এসে হাত তুলে দিত, তার হাতে আমি কিছু ফল তুলে দিতাম, সেইগুলি নিয়ে সে তার প্রেয়সীর হাতে দিত। সেই দেখে অন্য সবাই হিংসায় জ্বলে উঠতো, কিচিরমিচির করতো; রাগারাগি করতো; এবং যতক্ষণ না প্রত্যেককে একটা করে ফল আমি দিতাম ততক্ষণ পর্যন্ত সে-গোলমাল থামতো না।

এই ধ্বংসস্তূপটিকে আমার এত ভাল লেগেছিল যে এইখানেই যন্ত্রপাতি বসিয়ে কাজ সুরু করতে মনস্থ করলাম আমি; কিন্তু আমার পেতলের যন্ত্রপাতি-গুলিকে দেখলেই ওরা মনে করতো আমি ওদের মারার জন্যে অস্ত্র নিয়ে এসেছি; এই দেখেই তারা চেঁচিয়ে হট্টগোল বাঁধিয়ে চারপাশে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিত।।

মাঝে-মাঝে বিহার হ্রদের ধারে গ্যালারির ওপরে শার্সির পাশে বসে সন্ধ্যা কাটাতাম আমি। চুপচাপ বসে আমরা চাঁদের শোভা দেখতাম; ধীরে ধীরে আকাশের ওপরে উঠে যাচ্ছে চাঁদ, লেকের ওপরে তারই আলো পড়ত; মনে হোত, ও জল নয়; তরল রূপোর স্রোত। উলটো দিকে ছোট-ছোট প্যাগোডা দেখে মনে হোত সেগুলি যেন পরীদের কুঞ্জ, ছোট-ছোট ঢেউ-এর ওপরে তাদের ডাঁটাগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি আমার কচি প্রিয়তমার গম্ভীর মুখটিকে দুটো হাতে ধরে দীর্ঘ চুম্বন দিতাম, তার সেই হাতির দাঁতের কারুকার্যের মত কপালে, প্রাচীন কাহিনীর রহস্যমাখা বড়-বড় চোখ দুটির ওপরে আদর বুলিয়ে দিতাম, চুমু খাওয়ার সময় তার ঠোঁটদুটি ধীরে-ধীরে খুলে যেত। আমার মনে তখন একটি আবেগময় অনুভূতি জাগতো; সে আবেগ

অস্পষ্ট, কিন্তু অনিবার্য, অদ্ভুত, চাঞ্চল্যকর; মনে হোত, সেই কচি শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে আমি একটি সুন্দর এবং রহস্যময় গোটা জাতিকে জড়িয়ে ধরেছি, যে জাতি থেকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি জন্ম নিয়েছে।

এদিকে রাজা আমাকে উপহারের পর উপহার পাঠাতে লাগলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহার পাঠালেন। সেটি দেখে শালি মুগ্ধ হয়ে গেল। সামান্য ছোট একটা বাক্স, পিচবোর্ডের তৈরী, ছোট-ছোট চকচকে খোসায় বাইরের ঢাকা। ফ্রান্সে তার দাম দু' ফ্রাঁর বেশী নয়। কিন্তু সে দেশে তখন এর মূল্য অনেক। নিঃসন্দেহে এই জাতীয় জিনিস সেইমাত্র ও-অঞ্চলে দেখা দিয়েছে।

বাজার থেকে আনা সেই তুচ্ছ অমূল্য খেলনাটির দিকে তাকিয়ে একবার হেসে সেটিকে আমি টেবিলের ওপরে রেখে দিলাম। শালি কিন্তু এর দিকে অক্লান্তভাবে প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকতো।

মাঝে-মাঝে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো: ছোঁব?

অনুমতি পেয়ে সে বাক্সটিকে অতি সন্তর্পণে হাতে তুলে নিত; তার নরম আঙুলগুলি দিয়ে খেলনাটাকে ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করতো; মনে হোত, এই স্পর্শেই তার মন আনন্দে ভরে উঠেছে।

আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কচি বন্ধুটিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে আমার এত খারাপ লাগছিল যে ফিরে যাওয়ার মনোস্থির করতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। কিন্তু অবশেষে এই বাঁধন ছিঁড়তে বাধ্য হয়েছিলাম আমি। রাজা হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে আবার সেই মল্লযুদ্ধ, শিকার ইত্যাদির আয়োজন করলেন; দুটি সপ্তাহ এইভাবে কাটার পর আমি যখন জানিয়ে দিলাম যে যাত্রা আর স্থগিত রাখা যায় না, তখনই রাজার অনুমতি পেলাম।

শালির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েই মনটা ভেঙে গেল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমার বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপালো তারপরে অনেকক্ষণ ধরে আকুল হয়ে কাঁদলো। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা অনেক করলাম; কিন্তু আমার অসংখ্য চুম্বনেও কোন কাজ হল না। হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেলাম যেন। সেই ছোট বাক্সটা নিয়ে তার হাতে দিলাম।

নাও; এটা তোমার।

ধীরে-ধীরে সে এবারে হাসলো। কোন অসম্ভব স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তবে রূপায়িত হলে মানুষ যেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই রকম একটা নিবিড় আবেশ তার চোখ মুখের ওপরে ফুটে বেরোল। সে আমায় পাগলের মত চুমু খেতে লাগলো। কিন্তু তবু শেষ বিদায়ের সময় যখন এগিয়ে এল তখন কিন্তু তার কান্না থামে নি।

আমার অন্য প্রেয়সীদের প্রত্যেককে কেক খাইয়ে আর চুমু খেয়ে আমি চলে এলাম সেখান থেকে।

দু'বছর পরে নাবিকের জীবনের উত্থানপতনের ভেতর দিয়ে আবার আমাকে বোম্বাই-এ আসতে হল। সেখানে কয়েকটি বিশেষ কাজে আমাকে আটকে যেতে হল। এর জন্যে আমি আগে থাকতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই দেশের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং সেখানকার ভাষা জানার জন্যে আমাকে আর একটি বিশেষ কাজে পাঠানো হল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটি শেষ করে আমার হাতে আরও মাস তিনেক সময় ছিল। ভাবলাম এই সময়টা আমার বন্ধু গণহারার রাজার বাড়িতে কাটিয়ে আসি; সেই সঙ্গে আমার সেই প্রিয় কচি বন্ধু শালির সঙ্গেও দেখা হবে। দু'বছরে তারও নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যে রাজা আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার সামনে তিনটি মল্লযোদ্ধা যুদ্ধ করতে-করতে মারা গেল। যেদিন ওখানে আমি প্রথম হাজির হলাম সেদিন একমুহূর্তও তিনি আমার সঙ্গ ছাড়েন নি। রাত্রিতে অবশ্য একাই ছিলাম আমি। হারিবাদাদাকে ডেকে পাঠালাম। যাতে তিনি বুঝতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে নানান বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। শেষ কালে জিজ্ঞাসা করলাম: সেই ছোট্ট শালির খবর কি জানেন? যাকে মহারাজা উপহার হিসাবে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন?

মন্ত্রীর মুখ কালো হয়ে গেল; ভীষণ অস্থিরতার সঙ্গে তিনি বললেন: তার নাম না করাই ভাল।

কেন বলুন তো? মেয়েটি বড় সুন্দর—স্বভাব চরিত্রে চমৎকার।

সে খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কে? শালী? কী হয়েছিল তার? সে এখন কোথায়?

আমি বলতে চাইছি তার শেষ পরিণতি খুব খারাপ হয়েছিল।

শেষ পরিণতি খারাপ? সে কি মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ। সে একটি জঘন্য কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল।

পুনরাবৃত্তি করলাম কথাটা: জঘন্য? কী করেছিল সে? কী হল তার?

চাপে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠলেন তিনি; আমতা-আমতা করে বললেন: জিজ্ঞাসা না করাই ভাল স্যার।

কিন্তু আমি জানতে চাই।

সে চুরি করেছিল।

শালি? কার কি চুরি করেছিল?

আপনার, মি লর্ড।

আমার? কী বলছেন আপনি?

যেদিন আপনি চলে গেলেন সে আপনার একটা বাক্স চুরি করেছিল,

বাক্সটা রাজা আপনাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

কোন্ বাক্স?

খোসায় মোড়া বাক্স।

আরে, সেটা যে আমি তাকেই দিয়েছিলাম।

হতভম্ব হয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন; বললেন; সত্যি কথা বলতে কি, সেও দিব্যি করে ওই কথাই বলেছিল। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে যে উপহার রাজকুমার আপনাকে দিয়েছেন আপনি সেটি একটা ক্রীতদাসীকে দিয়ে যাবেন? সেই জন্যেই রাজা তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

শাস্তি? কী শাস্তি? তাকে আপনারা কী শাস্তি দিলেন?

তারা তাকে থলের মধ্যে পুরে ওই জানালার ওপর থেকে লেকের জলে ছুঁড়ে দিয়েছে—এই ঘরের ওই জানালা যে ঘরে আমরা এখন বসে রয়েছি, এবং যে ঘর থেকে সে চুরি করেছিল।

আমার হৃদয়টা মুচড়ে উঠলো। এমন যন্ত্রণা জীবনে আর কোন দিনই আমি ভোগ করি নি। ইঙ্গিত করে আমি তাঁকে চলে যেতে বললাম—পাছে আমার চোখের জল তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায়।

সেই লেকের ধারে গ্যালারির ওপরে সারা রাত আমি বসে রইলাম—সেই গ্যালারি যেখানে আমি সেই হতভাগ্য মেয়েটিকে কোলে বসিয়ে প্রায়ই বসে থাকতাম। তার সেই ছোট সুন্দর দেহটির কথা মনে পড়ে গেল আমার—এখন সে কংকাল, ক্যানভাসের থলের মধ্যে বাঁধা—লেকের ওই কালো জলের অনেক নীচে—যে জলের দিকে একদিন আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

রাজার অনুরোধ, উপরোধ, এবং ভয়ানক দুঃখকে উপেক্ষা করেই পরের দিনই আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

এখন আমি সত্যিই বিশ্বাস করি জীবনে যদি কোন নারীকে ভালবেসে থাকি সে ওই শালি—আর কেউ না।

পান্থশালা

(The Hostelry)

জমাট-বাঁধা তুষার স্তূপের পাদদেশে নগ্ন পাথরে ঘেরা খাড়াই খাদ।—এখান থেকে আলপস্ পাহাড়ের উঁচু বরফে-ঢাকা উপত্যকা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে এখানে-ওখানে ছড়ানো কিছু পান্থনিবাস আপনাদের চোখে পড়বে। এই পান্থনিবাসগুলি কাঠ দিয়ে তৈরী; আর সবগুলি প্রায় একই ধাঁচের। আমাদের এই কাহিনীর পান্থনিবাসটি ওই রকমই একটি।

জেমিনি যাওয়ার পথে ভ্রমণকারীরা এইখানে এসে আশ্রয় নেন। গ্রীষ্মকালের ছ'টি মাস এই পান্থনিবাসটি খোলা ছিল। জাঁ হসার তাঁর সংসার নিয়ে ঐ সময়টা এখানে ছিলেন। কিন্তু প্রথম বরফ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন উপত্যকা-গুলিতে বরফ জমতে সুরু করল এবং তারই ফলে লিউক-এ নামার পথ প্রায় অসম্ভব হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, জাঁ হসার তখনই ওই বাড়ি ছেড়ে নেমে আসার উদ্‌যোগ করলেন। সঙ্গে তাঁর তিনটি ছেলে, স্ত্রী আর মেয়ে। বাড়িটি রেখে এলেন পুরনো পথপ্রদর্শক গ্যাসপার্ড হারি আর তার সঙ্গীর জিম্মায়। তাদের কাছে রইল বিরাট পাহাড়ী কুকুর শাম। ওই দুজন বসন্তকাল সুরু হওয়া পর্যন্ত কুকুরটি নিয়ে বরফের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকত। বামহর্ন পর্বতাংশের সাদা উৎরাই ছাড়া অন্য কিছুই দেখার মত থাকত না তাদের। অস্পষ্ট চকচকে পাহাড়ের চূড়া তাদের চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। বরফে তাদের বেরিয়ে আসার পথ বন্ধ হয়ে যেত। একটা পাতলা বরফের আস্তরণ ধীরে-ধীরে তাদের ওপরে চেপে বসতো, যতই দিন যেত ততই বরফ-পড়া বাড়তে থাকতো; তারপরে গোটা বাড়িটাই বরফে ঢাকা পড়ে যেত; শেষ পর্যন্ত বাড়ির চিহ্নটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যেত বরফ স্তূপের নীচে। ছাতের ওপরে বরফ জমতো; জানালা-দরজাগুলিকে দিত বন্ধ করে।

হসার যেদিন তাঁর সংসার নিয়ে লিউক-এর পথে বেরিয়ে এলেন সেদিন শীত প্রায় হাতের কাছে এসে পড়েছে, নামার পথটা বিপদসঙ্কুল হতে সুরু হয়েছে। জিনিসপত্র সব খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে ছেলেরা তাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে চলল। তাদের পেছনে একটি খচ্চরের পিঠে চলল মা আর তার মেয়ে লাউসি। শেষকালে চললেন বাবা; তাঁর সঙ্গে দুজন গৃহরক্ষক। যেখান থেকে পাহাড়ী পথটা লিউক-এর দিকে নেমে গিয়েছে সেই পর্যন্ত ওই দুজনের যাওয়ার কথা।

পান্থনিবাসের পাশে একটি ছোট পাহাড়ী হ্রদ। সেটি ইতিমধ্যেই জমাট বেঁধে গিয়েছে। সেই হ্রদের পাশ দিয়ে দলটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। তারপরে তারা সামনের উপত্যকা দিয়ে চলতে সুরু করল। বরফে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে পথটি; বরফে ঢাকা শৃঙ্গগুলি চারপাশে উঁচু হয়ে রয়েছে। সেই সাদা জমাট-বাঁধা নির্জন উপত্যকার ওপরে একঝলক সূর্যকিরণ পড়ে ঠাণ্ডা কনকনে চকচকে আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেই অসংখ্য পর্বতমালার কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই; সেই অনন্ত নির্জনতার মধ্যে কোথাও একটিও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না; শোনা যাচ্ছে না একটিও শব্দ।

অল্পবয়স্ক পথপ্রদর্শকের নাম উলরিচ কুনসি; চেহারায় লম্বা-চওড়া চেহারা; জাতে সুইচ। সে বয়স্ক লোক দুটির আগে এগিয়ে গিয়ে যে খচ্চরে চেপে দুটি মহিলা যাচ্ছিল সেইখানে এগিয়ে গেল। সে এগিয়ে আসতেই মেয়েটির সঙ্গে

তার চোখাচোখী হল। যে দৃষ্টি দিয়ে সে তাকে কাছাকাছি আসতে ইঙ্গিত জানালো সেই দৃষ্টি তার বিষণ্ণ।

কৃষক ঘরের এই মেয়েটির মুখের রঙ দুধের মত সাদা। তার চুলগুলি বিবর্ণ। তাকে দেখলেই মনে হবে যে মেয়েটি অনেকদিন ধরেই বরফ আর তুষারের মধ্যে বাস করেছে।

যে খচ্চরের ওপরে লাউসি আর তার মা যাচ্ছিল উলরিচ তার কাছাকাছি গিয়ে খচ্চরের লাগামটিকে ধরল। খচ্চরের গতিবেগ শিথিল হল। মা তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। শীতকালে কী কী করতে হবে সে-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ তিনি দিলেন। এই প্রথম উলরিচ পান্থনিবাসে থেকে গেল। বৃদ্ধ হারি অবশ্য বিগত চোদ্দটি বছর ধরে বরফে ঢাকা এই পান্থনিবাসে কাটিয়েছে।

মা কী বলছেন উলরিচ তা শুনল; কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারল না। মেয়েটির ওপর থেকে একবারও সে চোখ সরিয়ে নেয় নি। মাঝে-মাঝে কোন কথা না শুনেই সে উত্তর দিল: হ্যাঁ, মাদাম তাই হবে। কিন্তু তার চিন্তা তখন অনেক দূরে; তার মুখ শান্ত এবং ভাবলেশহীন।

উপত্যকার নীচে দেবেনসিতে পৌঁছলো দলটি। বিরাট মোটা বরফের আস্তরণ তখন এর বুকের ওপরে চেপে বসেছে। ডান দিকে অন্ধকার এবং খাড়াই দেবেনসির লেমার্নি-এর খাদের অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে।

এইবার তারা একটা রাস্তার মাথায় এসে হাজির হল। এখান থেকে পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে বিপজ্জনক অবস্থায় নীচে নেমে গিয়েছে—পাহাড়ের তলায় প্রায় অদৃশ্য গ্রামের কাছ পর্যন্ত। খচ্চরগুলি থামলো; এবং মহিলা দুটি খচ্চর থেকে নেমে বরফের ওপরে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে দুটি বয়স্ক লোক দলটির কাছে এসে হাজির হয়েছে।

বৃদ্ধ হসার বললেন: বন্ধুগণ, আবার আগামী বছর পর্যন্ত বিদায়। সাবধানে থেকো।

'আগামী বছর পর্যন্ত': উত্তর দিল হারি।

লোক দুটি পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। মাদাম হসার চুমু খাওয়ার জন্যে তাঁর গালটি বাড়িয়ে দিলেন: সেই দেখাদেখি মেয়েটিও বাড়িয়ে দিল তার গাল। লাউসির গালে চুমু খাওয়ার সময় উলরিচ তার কানে-কানে বলল: আমাদের কথা ভুলে যেয়ো না।

না, ভুলব না।

কথাটা সে এত আস্তে বলল যে উলরিচ যতটা শুনলো তার চেয়ে বেশী অনুমান করে নিল।

বৃদ্ধ হসার আবার বললেন: তাহলে চললাম। তোমরা সাবধানে থেকো।

মহিলাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। নীচের দিকে সবাইকে পথ দেখিয়ে চললেন তিনি। রাস্তার প্রথম বাঁকেই তিনজন দৃষ্টির বাইরে চলে

গেল। পান্থনিবাসের দিকে ফিরে চলল গ্যাসপার্ড আর উলরিচ। পাশাপাশি তারা হাঁটতে সুরু করল—ধীরে-ধীরে, নিস্তব্ধভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে তাদের শেষ দেখা হল। এবার চার থেকে পাঁচটি মাস তাদের নির্বান্ধব পুরীতে একা-একা বাস করতে হবে।

আগের শীতে কী ঘটেছিল সেই সব কথা গ্যাসপার্ড হারি উলরিচকে বলতে সুরু করল। গত বছর ওই সময়টা তার সঙ্গী ছিল মাইকেল ক্যারল। কিন্তু এই নির্জন শৈত্যাবাসে বেশীদিন থাকলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে; আর মাইকেলের বয়স এত বেশী হয়েছিল যে এসব কাজ মোটেই সে করতে পারতো না। তবু সময়টা তারা মোটামুটি ভালভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিল। আসল কথাটা হচ্ছে এই সময়টা যে তোমাকে কাটাতেই হবে সেটা গোড়াতেই তোমার জানা উচিৎ; কেবল জানা নয়, সেই সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতিও একটা থাকা চাই। তাহলেই আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সময়টা কাটানোর জন্যে মানুষে তার ইচ্ছেমত নানা উপায় খুঁজে বার করতে পারে।

চোখ নিচু করে তার সঙ্গীটি যা বলল সব উলরিচ শুনলো। কিন্তু তার চিন্তাটা তখন জেমিনি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকা বাঁকা পথের উপর দিয়ে যে দুটি মহিলা নীচে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে তাদেরই কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অনতিবিলম্বে দূরের পান্থনিবাসটি তাদের চোখে পড়ল। বরফের বিরাট পাহাড়ের নীচে সেটিকে একটা কালো ফুটকির মত মনে হল। তারা এসে ঘরের দরজা খুলতেই একরাশ কোঁকড়ানো লোমে ভরা বিরাট কুকুর শাম ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে মনের আনন্দে তাদের চারপাশে ঘুর-ঘুর করতে লাগল।

বৃদ্ধ গ্যাসপার্ড বলল: উলরিচ, এখন আমাদের এখানে কোন মহিলা নেই। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। এবার আলুর খোসা ছাড়াও।

কাঠের চৌকিতে বসে তারা সচ তৈরী করতে লাগল। পরের দিন সকাল বেলাটা উলরিচের কাছে বড় দীর্ঘ বলে মনে হল। বৃদ্ধ হারি পাইপ টানতে-টানতে উনুনের ওপরে থুথু ফেলল। তাদের বাড়ির সামনে যে অদ্ভুত সুন্দর পাহাড়টি দাঁড়িয়ে রয়েছে জানালার ভেতর থেকে সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল উলরিচ। বিকালের দিকে সে বেরিয়ে গেল; খচ্চরের পিঠে চড়ে যে-পথ দিয়ে মহিলাদুটি এগিয়ে গিয়েছিল সেই পথ ধরে সে-ও এগোতে লাগল। অবশেষে সে জেমিনির চড়াই-এ হাজির হল। সেখান থেকে নীচু হয়ে সে অনেক নীচে লিউক-এর দিকে তাকিয়ে রইল। সেই নীচের পাহাড়ী অববাহিকার মধ্যে যে গ্রামটি মিশিয়ে রয়েছে সেটি তখনও বরফে ঢাকা পড়ে যায় নি। কিন্তু বরফ বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছে; গ্রামটির চারপাশে যে বিরাট-বিরাট পাইন গাছের সারি রয়েছে সেইখানেই ধাক্কা খেয়ে বরফের

অগ্রগতি সাময়িকভাবে কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। অত উঁচু থেকে অনেক নীচুতে গ্রামের বাড়িগুলিকে দেখে মনে হল মাঠের মধ্যে যেন কতকগুলি পাথরকুঁচি ছড়ানো রয়েছে।

উলরিচের মনে হল যে ওই সব বাড়িগুলিরই একটিতে বর্তমানে লাউসি রয়েছে, কিন্তু সেটি কোন্ বাড়ি; একটু অবাক হয়েই ভাবতে লাগল সে। বাড়িগুলি এত দূরে যে তাদের পৃথক করে চেনা যায় না। রাস্তা খোলা থাকা অবস্থায় সেখানে একবার যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। বিরাট পাহাড়ী চূড়ার পেছন দিকে সূর্য অস্ত গেল। ঘরে ফিরে এল উলরিচ। হারি তখন বসে-বসে তামাক খাচ্ছে। উলরিচ ফিরে এলে হারি তাস খেলার প্রস্তাব দিলে; তারপরে টেবিলের দুপাশে বসে দুজনে তাস খেলা সুরু করল। তারপরে খাওয়া-দাওয়া করে তারা শুয়ে পড়ল।

পরের দিনগুলি একই রকমের ঠাণ্ডা, পরিষ্কার। নতুন কোন তুষারপাত হয় নি। ঈগল বা অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পাখিদের দল যারা সেই বরফে জমে-যাওয়া উঁচু পাহাড়ের ওপরে উড়ে আসতো তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেই গ্যাসপার্ড-এর দিন কাটছিল। আর সেই সময়টা উলরিচ নিয়মিতভাবে জেমিনি গিরিবর্ত্মে হাজির হয়ে দূরের গ্রামটির দিকে তাকিয়ে থাকতো। সন্ধ্যের দিকে তারা কখনও খেলতো তাস, কখনও দাবা; খেলাটাকে জমিয়ে তোলার জন্যে ছোট-ছোট জিনিস কিছু পণও রাখতো।

একদিন সকালে প্রথম ঘুম থেকে উঠে হারি উলরিচকে ডাকলো। ফেনার মত সাদা ঘন অথচ বায়বীয় মেঘ তাদের ওপরে, আশেপাশে সমস্ত জিনিসের ওপরে নেমে আসছিল ধীরে-ধীরে, নিঃশব্দে—যত নামছিল ততই হচ্ছিল ভারি। চারদিন চার রাত ধরে এইভাবে তুষারপাত হল। দরজা জানালা-গুলিকে পরিষ্কার করতে হল, রাস্তা খুঁজতে হল, সিঁড়ি বাঁধতে হল বরফ কুঁচির ওপর দিয়ে; অন্যথায় তাদের বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না। বারো ঘণ্টার কুয়াসা সেই সব বরফ কুঁচিগুলিকে গ্র্যানাইট পাথরের চেয়েও শক্ত করে ফেলেছিল।

তারপরে তারা সেই বাড়ির মধ্যেই বন্দী হয়ে রইল; বাইরে বেরোতে এতটুকু সাহস হল না তাদের। ঘরের কাজ দুজনের মধ্যে ভাগ করা ছিল; যে যার কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে করত। উলরিচের কাজ ছিল ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা, বাসন ধোওয়া; জ্বালানি কাঠও কাটতে হোত তাকে। হারির কাজ ছিল রান্না করা আর উনোনে সব সময় আগুন রাখা। দাবা আর তাসের দীর্ঘ প্রতিযোগিতা এই প্রয়োজনীয় অথচ একঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ থেকে তাদের উদ্ধার করত। বেশ শান্ত স্বভাবের জন্যেই দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হোত না। শীতের দিনগুলি পাহাড়ের ওপরে বেশ ভালভাবে কাটাবে, প্রথম থেকে এইরকম একটা দৃঢ় মনোভাব থাকার ফলেই ঝগড়া তো দূরের

কথা কেউ জোরে কথাও বলত না, অথবা কোন কারণেই অধৈর্য দেখাতো না-কেউ। বন্দুক নিয়ে গ্যাসপার্ড মাঝে-মাঝে শ্যামর শিকার করতে বেরোত; সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন যদি একটা মিলে যেত তাহলে ওই পান্থনিবাসে উৎসব পড়ে যেত; টাটকা মাংসে আয়োজন হোত বড় ভোজের।

একদিন সকালে এই রকম একটি অভিযানে বেরিয়ে পড়ল হারি। পান্থনিবাসের বাইরে তখন শীত নেমে এসেছে তিরিশ ডিগ্রীতে। ওয়াইল্ডস্ট্রু-বেল পাহাড়ের ধাপে শ্যামরগুলিকে হঠাৎ আক্রমণ করার জন্যে হারি সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়ল।

একা উলরিচ; বেলা দশটা পর্যন্ত সে বিছানাতেই পড়ে রইল। চরিত্রের দিক থেকে সে ঘুমোতে ভালই বাসতো; কিন্তু বৃদ্ধ হারির সামনে সে দেরী করে উঠতে ভরসা পেত না; তার কারণ, হারি নিজে খুব সকালে উঠতো; কাজকর্মও করত একটু বেশী মাত্রায়। ব্রেকফাস্ট সে একটু ধীরে-ধীরেই শেষ করল; ভাগ দিল শামকে। শাম ওই উনুনের আগুনের সামনে পড়ে-পড়ে দিনরাত ঘুমোত। ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়ার পর থেকে, তার মেজাজটা কেমন খারাপ হয়ে গেল; বোধহয়, একা-একা থাকার জন্যেই ওই রকম একটা মানসিক অবস্থা তার হয়েছিল; এবং অভ্যাস হওয়ার ফলে তাস খেলতে না পেরে সে বেশ অস্থিরই হয়ে উঠছিল। তার সঙ্গীর ফেরার কথা ছিল বিকেল চারটের সময়; তার পরে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সারা উপত্যকাটি মোটা পুরু বরফের আস্তরণে সমানভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। হিমবাহের ফাটলগুলি বরফে টইটম্বুর। হ্রদ দুটিকে আর চেনা যাচ্ছে না। বরফের লেপের মধ্যে ঢাকা পড়েছে পাথরের চাঁইগুলো। বিরাট-বিরাট পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে সমস্ত উপত্যকাটা বিরাট জমাট বাঁধা বরফের খাদে পরিণত হয়েছে; তার ওপরে রোদের প্রতিফলনে চারপাশটা সাদা চকচক করছে; তার দিকে তাকালে চোখদুটো ধাঁধিয়ে যায়।

তিন সপ্তাহ আগে উলরিচ ওই খাড়াই পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে অনেক নীচে গ্রামটির দিকে তাকিয়েছিল। যে ঢালু পথটি ওয়াইল্ডস্ট্রুবেল পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেদিকে যাওয়ার আগে আর একবার সেই খাড়াই পাহাড়ের ধারে যাওয়ার কথা ভেবেছিল সে। লিউক পর্যন্ত বরফ এগিয়ে গিয়েছে; এবং সেই বাড়িগুলিও বরফের শ্বেত আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। চেনার উপায় নেই আর।

ডানদিকে ঘুরে সে ল্যামার্ণ হিমপ্রবাহের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। পাহাড়ীয়াদের লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পাথরের মত শক্ত বরফ খুঁড়ে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগলো। সেই বিরাট বরফের আস্তরণের ওপরে একটি কালো ভ্রাম্যমান বিন্দুকে দেখার আশায় সে তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকে চার-

পাশে ছড়িয়ে দিল। হিমপ্রবাহের ধারে গিয়ে সে থামলো। হারি সেদিকে সত্যিই এসেছে কিনা সেই কথাটাই সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো। তার পরে ক্রমবর্দ্ধমান উৎকণ্ঠা নিয়ে সে হিমপ্রবাহ চালিত পাথরের চারপাশে বেশ জোরে-জোরে ঘুরতে লাগলো।

সূর্য অস্তমিতপ্রায়। বরফের উপরে লাল রঙ ফ্যাকাসে হয়ে এল। এবং সেই শক্ত বরফের উপরে ঠাণ্ডা শুকনো ঝড়ো বাতাস বইতে সুরু করল। উলরিচ জোরে-জোরে চেঁচিয়ে তার বন্ধুকে খুঁজে বার করার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করল। যে মৃত্যুহীন স্তব্ধতায় পাহাড়গুলি ঘুমোচ্ছিল, তার গলার স্বর সেইখানে মিলিয়ে গেল। সমুদ্র-তরঙ্গের উপরে পাখির ডাক যেমনভাবে দোল খায়, সেই গভীর নিস্তব্ধ জমাট-বাঁধা ফেনার তরঙ্গে তার গলার স্বরও তেমনিভাবে প্রতিধ্বনিত হল। তারপর তা মিলিয়ে গেল অনেক দূরে। কারও কোন উত্তর ভেসে এল না।

সে ক্রমাগত হাঁটতে লাগলো। শৃঙ্গগুলির পেছনে ডুবে গেল সূর্য। সূর্যাস্তের বেগুনে আভা তখনও চারপাশে চিকচিক্ করছিল। কিন্তু উপত্যকার বুকে তখন নেমে এসেছে ধূসর রঙের ছায়া। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল উলরিচ। তার কেমন যেন ধারণা হল যে এই স্তব্ধতা, শৈত্য, আর নির্জনতা তাকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে। বন্ধ করে দিচ্ছে তার রক্তপ্রবাহের গতি, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শক্ত করে দিচ্ছে, তাকে একটি গতিহীন জমাট মূর্তিতে চেষ্টা করছে পরিণত করতে। পান্থনিবাসের দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো সে। সে ভেবেছিল হারি নিশ্চয় অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে আগেই। মৃত শ্যাময়টি পায়ের কাছে রেখে সে নিশ্চয় হারিকে আগুনের পাশে বসে থাকতে দেখবে। শীঘ্রই সে পান্থনিবাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো; কই চিমনী দিয়ে তো কোন ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। উলরিচ আরও জোরে ছুটলো। ঘরের দরজা খোলার পরে শাম তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে তার দিকে লাফিয়ে এল। কিন্তু গ্যাসপার্ড হারির কোন চিহ্ন নেই।

অস্থির আর বিব্রত হয়ে উলরিচ এপাশে-ওপাশে খুঁজতে লাগলো। মনে হল, তার বন্ধুটি কোন একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। এখনই সে তাকে ধরে ফেলবে। তারপর সে আবার উনোন ধরালো, সুপ তৈরী করল; তখনও সে ভাবছিল আর একটু খুঁজলেই সে বৃদ্ধটিকে ফিরে আসতে দেখবে। মাঝে-মাঝে সে বাইরে বেরিয়ে গেল—যদি তাকে দেখতে পাওয়া যায়, অথবা তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় এই আশায়। রাত্রি এগিয়ে এল, পাহাড়ের সেই নির্জীব ম্রিয়মান রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ হলদে চাঁদের ফ্যাকাসে আলোতে ছায়ারঙা পাহাড়ী রাত্রি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ চাঁদ আকাশের বুকে ডুবে যাবে, অন্তর্হিত হবে পাহাড়ী অরণ্যের পেছনে।

ঘরে ফিরে এল উলরিচ। আগুনের ধারে গিয়ে বসলো। আগুনে হাত-

পা সেঁকতে-সেঁকতে সে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা ভাবতে লাগলো। গ্যাসপার্ড হয়ত তার একটা পা ভেঙেছে, কিম্বা কোন গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, অথবা বিপথে হাঁটতে গিয়ে তার গোড়ালি মচকেছে। সে হয়ত কোন বরফের ওপরে পড়ে রয়েছে। হাত-পা-অবশ-করা ঠাণ্ডায় বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় মনের যন্ত্রণায় ছটফট করছে; মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে সে। সাহায্যের জন্যে চীৎকার করে ডাকছে, সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সাহায্যের জন্যে প্রাণপণে ডাকছে সে।

সে ঠিক কোন্ জায়গায় পড়ে রয়েছে কেমন করে তা জানা যায়? এত বিরাট, এত উঁচু-নিচু এই পাহাড়, বিশেষ করে শীতের সময় এই পাহাড়ী-পথগুলি এতটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে সেই বিরাট পরিবেশের মধ্যে কোন মানুষকে খুঁজে বার করতে দশ থেকে কুড়িটি লোকের কম করে একটি সপ্তাহ সময় লাগবে। তবু সে ঠিক করল রাত্রি একটার মধ্যে গ্যাসপার্ড যদি না ফিরে আসে তাহলে শামকে নিয়ে সে খুঁজতে বেরিয়ে যাবে।

বেরোনোর জন্যে সে সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিক করে রাখলো। একটা ব্যাগের মধ্যে দু'দিনের খাবার নিল, বরফে হাঁটার জন্য লোহার জুতো নিল, কোমরে বাঁধলো একটা লম্বা শক্ত দড়ি, পাহাড়ে ওঠার লম্বা লাঠিটিকে ভাল করে পরীক্ষা করল; আর ভাল করে দেখে নিল বরফ-কাটার যন্ত্রটিকে। তারপরে সে অপেক্ষা করে রইলো। গনগন করে আগুন জ্বলতে লাগলো; বিরাট কুকুরটা সেই গরমে নাক ডাকিয়ে ঘুমোল; কাঠের বাক্স-এর ভেতরে ঘড়ির নিয়মিত টিকটিক শব্দ বুকের মধ্যে রক্ত চলাচলের শব্দ বলে মনে হল; কান উঁচু ক'রে দূরের কোন শব্দ শোনার জন্যে তখনও পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে রইলো। হালকা বাতাস যখন ঘরের দেওয়াল আর ছাদের গায়ে আলতোভাবে এসে লাগছিল তখন সে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

ঘড়িতে বারোটা বাজলো। ঠাণ্ডায় সে প্রায় জমে যাচ্ছিল; সেই সঙ্গে সে কেমন দুর্বলও হয়ে পড়ছিল। বেরোনোর সময় বেশ খানিকটা গরম কফি খাওয়ার জন্য সে গরম করার জন্যে খানিকটা জল উনুনে চড়ালো। ঘড়িতে একটা বাজলে শামকে, তুলে সে দরজা খুললো; তারপরে ওয়াইল্ডস্ট্রুবেলের দিকে এগিয়ে গেল। একবারও না থেমে সে পাঁচ ঘণ্টা ধরে হাঁটলো। লোহার ডাণ্ডার ওপরে ভর দিয়ে সে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করল, কুড়োল দিয়ে বরফ কেটে-কেটে সিঁড়ি বানালো; সব সময় দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল; মাঝে-মাঝে খাড়াই পথে ওঠার সময় কুকুরটাকে টেনে তুললো। প্রায় ছটা নাগাদ সে একটা শৃঙ্গে এসে হাজির হল। শ্যাময়-এর সন্ধানে এখানে গ্যাসপার্ড প্রায়ই আসতো। সকাল হওয়ার অপেক্ষায় সেইখানে সে অপেক্ষা করল।

ধীরে-ধীরে আকাশ বিবর্ণ হয়ে এল। তারপরে হঠাৎ সেই অদ্ভুত দ্যুতি,

এর উৎস কোথায় সে সম্বন্ধে কারও ধারণা নেই, তার চারপাশে শত শত মাইল জুড়ে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গগুলির বিরাট সমুদ্রকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিল। মনে হল সে সেই অস্পষ্ট আলোর জ্যোতি যেন বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে অনন্ত আকাশে বিচ্ছুরিত হল। একটির পর একটি সব চেয়ে উঁচু আর দূরের শৃঙ্গগুলির মাথার ওপরে হালকা গোলাপী রঙের আভা ছড়িয়ে পড়লো; তার-পরে আলপস্ পর্বতমালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লাল সূর্য। উলরিচ আবার হাঁটতে শুরু করল। শিকারীর মত সে প্রতিটি রাস্তা ঝুঁকে ঝুঁকে দেখলো—কুকুরটিকে বলল: দেখ বৃদ্ধটিকে ভাল করে খুঁজে দেখ।

এবারে সে পাহাড়ের গায়ে নামতে লাগলো। প্রতিটি গহ্বর খুঁজতে খুঁজতে সে চললো; মাঝে-মাঝে অনেকক্ষণ ধরে একটানা চেঁচিয়ে ডাকলো; তার স্বর সেই বিরাট বধিরতার মধ্যে নিমেষে ডুবে গেল। কখনও-কখনও সে কিছু শোনার জন্যে বরফের গায়ে কান পেতে রাখলো; একবার মনে হল কার স্বর যেন তার কানে এসে ঢুকলো; স্বরটিকে অনুসরণ করে সে ছুটলো: ছুটতে-ছুটতে সে চীৎকার করল। কিন্তু আর সে কিছুই শুনতে পেল না; ক্লান্ত হয়ে আর সব আশা ছেড়ে দিয়ে সে বসে পড়লো। দুপুরের দিকে শামের সঙ্গে ভাগাভাগি করে সে কিছু খেল। শাম-ও তারই মত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আবার সে খুঁজতে বেরোল। সন্ধ্যে যখন এল তখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে পাহাড়তলীর ভেতরে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ ঘোরা তার শেষ হয়েছে। বাড়ি থেকে তখন সে এতটা দূরে, আর শরীর তার এত ক্লান্ত যে আর বাড়ি ফেরার কথা ভাবতে পারলো না সে; বরফের মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়লো সে। তারপরে বাড়ি থেকে যে মোটা কম্বল এনেছিল সেটা দিয়ে নিজেকে আর কুকুরটাকে আগাগোড়া ঢেকে গুঁড়ি দিয়ে পড়ে রইল; মানুষ আর পশু পরস্পরের গায়ের গরম ভাগ করে নিয়ে শুয়ে রইলো; কিন্তু শীত থেকে অব্যাহতি পেল না কেউ; বরং এক সময় মনে হল, তারা দুজনেই জমে বরফ হয়ে যাবে। উলরিচের মনের মধ্যে নানা দৃশ্য তখন ভেসে উঠছে; এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রচণ্ড শৈত্যে কাঁপছে। সে মোটেই ঘুমোতে পারলো না। যখন সে উঠলো তখন রজনী প্রভাত সম্ভবা। তার পা দুটো লোহার ডাণ্ডার মত জমাট বেঁধে গিয়েছে। তার দৃঢ়তা এমনই দুর্বল হয়ে পড়লো যে সে দুঃখে কষ্টে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার বুকটা এত জোরে ধড়ফড় করতে লাগলো যে যখনই কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে বলে তার মনে হল তখনই সে প্রায় অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

হঠাৎ তার সন্দেহ হল সেই নির্জন প্রদেশে প্রচণ্ড শৈত্যে সে-ও হয়ত মারা যাবে। এই মৃত্যু চিন্তা তার ঝিমিয়েপড়া শিরা উপশিরাদের চাবুক মেরে শক্ত করে তুললো; এবং তার মনে শক্তি সঞ্চার করল। তখন সে বাড়ি ফেরার জন্য পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল; চলতে-চলতে মাঝে-মাঝে সে পড়ে যেতে

লাগলো; আবার সে নিজেকে জোর করে তুলে ধরলো। কুকুর শামের একটা থাবা অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সে-ও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তার মনিবের পিছু-পিছু চললো। বিকাল চারটের কিছু আগে তারা পান্থনিবাসে ফিরে এল। হারি সেখানে নেই। উলরিচ আগুন জ্বাললো, কিছু খেল; তারপরে ঘুমিয়ে পড়লো। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে আর কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না তার। অনেকক্ষণ ধরে সে ঘুমোল। মনে হল কেউ তার গভীর প্রশান্তি নষ্ট করতে পারবে না; এমন সময় সে একটা চীৎকার শুনলো—উলরিচ। হঠাৎ তার গভীর নিদ্রা ভেঙে গেল; সে ধড়ফড় করে উঠে পড়লো। এটা কি স্বপ্ন? এটা কি সেই সব অদ্ভুত ডাকের একটি—যারা অস্থির আত্মাকে ডেকে-ডেকে যায়? না। সে এখনও সেই ডাক শুনতে পাচ্ছে। সেই চীৎকার এখনও কানের ভেতর দিয়ে তার মর্মস্থলে আঘাত করছে, তার অস্থি মজ্জাপরিবৃত সত্বাকে নাড়া দিচ্ছে। কেউ যে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকছে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কেউ তাকে তার নাম ধরে ডেকেছে। তাহলে নিশ্চয় কেউ তার ঘরের আশে পাশে অপেক্ষা করছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দরজা খুলে চীৎকার করে ডাকলো: গ্যাসপার্ড, গ্যাসপার্ড, গ্যাসপার্ড, তুমি ডাকছো?

কেউ কোন উত্তর দিল না। কোন শব্দ, গোঙানি, অথবা মৃদু আলাপ সে-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না। তখনও-ও ভরা রাত; সাদা ধবধবে মৃতদেহের মত বীভৎস বরফ চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

বাতাস উঠলো। এটি সেইজাতীয় হিমপ্রবাহ যার কবলে পড়ে পাথর যায় গুঁড়িয়ে; ওই জন-পরিত্যক্ত উচ্চতায় যে একটি জিনিসও জীবন্ত অবস্থায় রেখে দেয় না। পুরনো দমকা বাতাস বইতে লাগলো। বেশ তীক্ষ্ণ; মরুভূমির আগুনে হলকার চেয়ে নিশ্চিৎভাবে ধ্বংস করার শক্তি তার অনেক বেশী। আবার ডাকলো উলরিচ: গ্যাসপার্ড, গ্যাসপার্ড।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে; কিন্তু তখনও পাহাড়তলীতে স্তব্ধতা থমথম করছিল। হঠাৎ সে ভয় পেল; একটা প্রচণ্ড ভয় তার হাড়-মজ্জা কাঁপিয়ে দিল। সে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। বন্ধ করে দিল দরজা; খিল এঁটে দিল; তারপরে দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে সে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়লো। সে বেশ বুঝতে পারলো যে সাহায্যের আবেদন তার বন্ধুর কাছ থেকেই এসেছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে তার বন্ধুটি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। এদিক থেকে সে নিশ্চিত বেঁচে থাকা আর রুটি খাওয়াটা যেমন বাস্তব—এটাও তেমনি বাস্তব তার কাছে। কোন অনাবিষ্কৃত গর্তের মধ্যে পড়ে বৃদ্ধ হারি আজ দু'দিন আর তিন রাত হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে—সেখানকার শ্বেতবর্ণ পৃথিবীর অভ্যন্তরের কৃষ্ণবর্ণের চেয়েও অনেক বেশী বিপজ্জনক। দু'দিন আর তিন রাত ধরে সে মরছে; আর ঠিক সেই মরার মুহূর্তে হঠাৎ তার

আত্মা দেহ থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেখানে উলরিচ ঘুমোচ্ছে সেই পান্থনিবাসে এসে হাজির হয়েছে। জীবিতদের পিছু ধাওয়া করার জন্যে মৃত আত্মাদের যে অদ্ভুত ভয়ানক শক্তি থাকে সেই শক্তিই ব্যবহার করেছিল গ্যাসপার্ড। ঘুমন্ত মানুষের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আত্মাকে সেই নির্বাক অশরীরী চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিল, জানিয়েছিল তার শেষ বিদায়; তাকে খুঁজে বার করার জন্যে যতটা পরিশ্রম করা উচিৎ ছিল ততটা পরিশ্রম উলরিচ করেনি এই অনুযোগ করেই হয়ত বা সেই অশরীরীটি তাকে তিরস্কার করতে এসেছিল অথবা এসেছিল অভিশাপ দিতে।

ঘরের দেওয়ালের পেছনে, যে-দরজাটা সে এইমাত্র বন্ধ করে এল তার পেছনে হারির আত্মাটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তার মনে হল। সে যেন তার অস্তিত্বের স্পর্শ পেয়েছে। আত্মাটা যেন শিকারের উদ্দেশ্যে ঘরের চারপাশে ঘুরছে। মনে হল যেন একটা নিশাচর পাখি আলোকোজ্জ্বল জানালার ধারে পাখার ঝাপটা দিচ্ছে। ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল উলরিচ; কান্না পেল তার। সে সেখান থেকে পালিয়ে যেত; কিন্তু সে দরজা খুলতে সাহস করে নি। এবং পরেও কোনদিন সে দরজা খুলতে সাহস করবে না; কারণ তার ধারণা হয়েছিল যে যতদিন পর্যন্ত হারির মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে গির্জায় আনুষ্ঠানিকভাবে কবরস্থ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তার আত্মা দিন রাত্রি তার চার পাশে ঘুরে বেড়াবে।

সকালবেলা সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে সে একটু আত্মবিশ্বাস ফিরে পেত। সে নিজের খাবার তৈরী করত; কুকুরের জন্যেও তৈরী করত 'সুপ' কিন্তু তারপরে চুপচাপ চেয়ারের ওপরে বসে থাকতো। তার হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠতো; বরফের ওপরে যে পড়ে রয়েছে সেই বৃদ্ধটির চিন্তা কিছুতেই সে মন থেকে সরাতে পারতো না। পাহাড়ের ওপরে যখন রাত্রি নেমে আসতো, তখন ভয়ে আবার সে কাঁপতে সুরু করত। একটি মাত্র বাতির সামান্য আলোতে ধোঁয়ায় কালো রান্নাঘরের মধ্যে সে পায়চারি করত। সারাক্ষণ সে পায়চারি করত; আগের দিন রাত্রিতে যে কান্নার ডাক সে শুনেছিল সেই ডাক শোনার জন্যে সে কান পেতে রাখতো। বাইরের বিশ্বের শোকার্ত স্তব্ধতার ভেতর থেকে সেই শব্দ কি আবার ভেসে আসবে না? নিজেকে হতভাগ্য, নিঃসহায় বলে মনে হল তার। পৃথিবীর জনসমাজ, তাদের হাসি-কান্না উত্তেজনা থেকে অনেক দূরে, প্রায় সাত হাজার ফুট পাহাড়ের ওপরে, জমাট-বাঁধা আকাশের নীচে নিজেকে তার নিতান্ত হতভাগা নিঃসহায় বলে মনে হল। যে-কোন দিকে যে-কোন উপায়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা উন্মত্ত বাসনা তাকে গ্রাস করে ফেললো, ইচ্ছে হল সে লিউক-এ নেমে যাবে, তার জন্যে যদি খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে সোজা নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় সে-ও ভি আচ্ছা। কিন্তু পালানো দূরের কথা, দরজা খোলার মত সাহসও তার হল না। সে নিশ্চিৎ

হয়েছিল যে বৃদ্ধটির মৃত আত্মা তার পথ আগলিয়ে দাঁড়াবে; সেই উঁচু জায়গায় বন্ধুকে একা ফেলে রেখে কিছুতেই সে তাকে যেতে দেবে না।

মাঝরাতে তার দেহটি ক্লান্ত হয়ে উঠলো; ভীতি আর দুর্দশা তাকে গ্রাস করে বসলো। বিছানায় শুতে তার ভয় লাগলো; মনে হল সেটা অভিশপ্ত; কিন্তু অতিরিক্ত অবসন্ন হয়ে সে চেয়ারের ওপরেই ঢলে পড়লো।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার তার কানে এসে ঢুকলো; এই একই চীৎকার আগের রাত্রিতেও সে শুনেছিল। শব্দটা এত কর্কশ আর জোরাল যে প্রেতাত্মাটিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে উলরিচ তার দুটি হাতকে সামনের দিকে প্রসারিত করল; আর শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে মেঝের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। পতনের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে কুকুরটাও ভয়ে চীৎকার করতে লাগলো; বিপদটা কোন্ দিক থেকে আসছে জানার জন্যে সে চারপাশে ছুটতে সুরু করল। দরজার সামনে এসে সে শুঁকতে লাগলো; তারপর সে নানা রকম চীৎকার করতে সুরু করল—তার লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠলো, ল্যাজটা উঠে গেল উপরের দিকে; ভয়ে আত্মহারা হয়ে উলরিচ একটা পা ধরে একটা চৌকি শূন্যে তুলে চীৎকার করে উঠলো: ভেতরে এস না; কখনো না। ভেতরে এস না। এলেই তোমাকে আমি খুন করব।

তার এই মারমুখী চীৎকার শুনে কুকুরটাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যে অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে তার মনিব চৌকি ঘুরিয়ে আস্ফালন জানালো তাকে লক্ষ্য করে সেও প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করতে লাগলো। ধীরে-ধীরে শান্ত হল শাম; শান্ত হয়ে উনোনের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু তখনও তার অস্বস্তি যায় নি; তখনও তার চোখদুটো চকচক করছিল; দাঁতগুলো খিঁচোচ্ছিল, আর গর-গর করে শব্দ করছিল।

উলরিচেরও মাথাটা ঠাণ্ডা হল; কিন্তু তখনও ভয় তার একেবারে যায় নি, সেই ভয় দূর করার জন্যে পাশের সেল্‌ফ থেকে এক বোতল ব্রানডি নিয়ে পর-পর কয়েক গ্লাস খেয়ে ফেললো। চিন্তাশক্তিটা ভোঁতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাহস ফিরে এল এবং তার শিরা-উপশিরা ও ধমনীর মধ্যে রক্ত-প্রবাহ সঞ্চারিত হল। পরের দিন খাওয়া-দাওয়া প্রায় সে কিছুই করল না। কেবল ব্রানডি খেয়েই কাটিয়ে দিল। তার পরের কয়েকটি দিনও সে একইভাবে নেশায় ডুবে রইলো। গ্যাসপার্ড হারির চিন্তা তার মনের মধ্যে একবার ঢুকলেই সে মদ খেতে সুরু করবে; মদ খেতে-খেতে সে মাতাল হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়বে, গোঁ-গোঁ করবে। মদের জ্বালা আর উত্তেজনা কমার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই কর্কশ চীৎকার তার কানে এসে ঢুকবে—"উলরিচ"। তার মনে হবে কেউ যেন একটা বুলেট ছুঁড়ে তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে। সে টলতে-টলতে দাঁড়িয়ে উঠবে; তার পরে পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে হাত দুটোকে নানাভাবে সঙ্কুচিত আর

প্রসারিত করবে; কুকুরটাকে ডাকবে তাকে সাহায্য করার জন্যে। প্রভুর পাগলামি শামকেও আক্রান্ত করেছিল। সে দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নখ দিয়ে আঁচড় দেবে দরজার গায়ে, দাঁত দিয়ে কাঠের গা চিরবে; আর উলরিচ মাথা উঁচু করে মদের গ্লাস শূন্য করবে মুখের ভেতরে; মনে হবে, পাহাড়ে ওঠার পরে সে যেন ঢক-ঢক করে ঠাণ্ডা জল খাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার চিন্তা, তার স্মৃতি, তার ভয় সব উন্মত্ত মাদকতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে ওখানে যতগুলি মদের বোতল ছিল সবগুলি সে শেষ করে ফেললো। এতদিন মদ খেয়েই সে ভুলেছিল; মদ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভয়টা তাকে প্রবল বেগে চেপে ধরল। সেই একান্ত নির্জনতায় দীর্ঘদিন নেশা করার ফলে তার বদ্ধ ধারণাটা ক্রমাগত শক্তিসঞ্চয় করতে-করতে তুরপুনের মত বিঁধে-বিঁধে তার আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। খাঁচায় পোরা বন্য পশুর মত সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। মাঝে-মাঝে ছুটে গিয়ে দরজার ওপরে কান রেখে গ্যাসপার্ড-এর প্রেতাত্মার স্বর শোনার চেষ্টা করল, এবং দেওয়ালের এপাশ থেকে সেই স্বরের উদ্দেশ্যে যা-তা বলতে লাগলো। গভীর ক্লান্তিতে সে যখন শুয়ে পড়তো ঠিক সেই সময় আবার সে সেই স্বরটা শুনতে পেত। স্বর শুনেই সে চমকে লাফিয়ে উঠতো।

কোণঠাসা হয়ে গেলে মাঝে-মাঝে কাপুরুষেরা যেমন হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে, তেমনি সাহস সংগ্রহ করে অবশেষে একদিন রাত্রিতে উলরিচ দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাট করে খুলে দিল। কে তাকে ডাকছে দেখার জন্যে, আর তাকে চুপ করতে বাধ্য করার জন্যে সে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হিম-প্রবাহ সোজাসুজি তার মুখের ওপরে আছড়ে পড়ে তার হাড় মাংস মজ্জা-গুলিকে পর্যন্ত জমিয়ে দিল। সে ধাক্কা দিয়ে কপাট দুটো বন্ধ করে খিল্ লাগিয়ে দিল; কুকুরটাও যে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে সে-খেয়ালও তার রইলো না। কাঁপতে-কাঁপতে সে আগুনের মধ্যে আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দিয়ে হাত-পা সেঁকতে বসলো। হঠাৎ সে চমকে উঠলো; কে যেন দেওয়ালের গায়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে বেড়াচ্ছে আর কাঁদছে।

ভয় পেয়ে উলরিচ চীৎকার করে উঠলো: দূর হ'।

উত্তরে কেবল একটি কাতর গোঙানি শোনা গেল।

ভয়ে তার সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাটি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল।

সে আবার চীৎকার করে উঠলো: দূর হ', দূর হ'।

নিজেকে লুকিয়ে ফেলার মত অলিগলি খুঁজে বার করার জন্যে সে সারা বাড়ি ঘুরতে লাগলো, কিন্তু বাইরের জন্তুটি ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগলো, দরজায় গা ঘষতে লাগলো—ঘুরতে লাগলো ঘরের সামনে দিয়ে। উলরিচ রান্নার বাসনে বোঝাই ওক কাঠের সেলফ-এর সামনে দৌড়ে গেল; অমানুষিক শক্তি দিয়ে সেটাকে টেনে এনে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে

দাঁড় করালো। তারপর বাড়িতে যত বালিশ, বিছানা, তোষক, মাতুর ছিল সবগুলিকে জড় করে সে জানালার ফোকরগুলো বন্ধ করে দিল। কিন্তু বাইরের প্রাণীটি অনবরত গোঙাতে লাগলো; ভেতরে উলরিচও মনের জ্বালায় কম গোঙালো না। দিন কাটলো; রাত্রিও অনেক কেটে গেল। তবু ঘরের মধ্যেকার আর বাইরের তুটি জন্তুর গোঙানির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে লাগলো।

উলরিচের মনে হল, ভূতটা ক্রমাগত ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেওয়াল সে ভাঙবেই এই রকম একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে কেবলই দরজার গায়ে আঁচড় কাটতে লাগলো। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের ধারে গুঁড়ি দিয়ে বসে উলরিচ প্রতি-মুহূর্তে বাইরের জন্তুটির প্রতিটি পদক্ষেপ কান পেতে শুনছিল, তার প্রতিটি অনুরোধের উত্তরে সে চীৎকার করে চেঁচাচ্ছিল। তারপরে একদিন রাত্রিতে উলরিচ আর কোন শব্দ শুনতে পেল না। ক্লান্ত হয়ে সে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়লো; আর ঘুমিয়ে পড়লো সঙ্গে-সঙ্গে। ঘুম যখন ভাঙল তখন তার চিন্তা করার শক্তি তার স্মৃতি সব লোপ পেয়েছে। মনে হল, সেই ঘুম সব ধুয়ে মুছে তার মাথাটিকে একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে করে দিয়েছে। তার ক্ষিদে পেল; কিছু খাবার খেল সে……

শীত শেষ হয়ে গেল। জেমিনির রাস্তা এবার লোক চলাচলের উপযুক্ত হয়ে উঠলো। হসাররা পান্থনিবাসের দিকে যাত্রা করলো। প্রথম যে দীর্ঘ চড়াইটি পড়লো তার মাথায় তুটি মহিলা তাদের খচ্চরের পিঠে চড়ে কোন রকমে উঠে এল। যে তুটি লোককে তারা আশা করছিল তাদের সম্বন্ধে মহিলারা আলোচনা করছিল। লিউক-এর পথটি পরিষ্কার হয়ে এলেই তারা নেমে আসতো; তাদের মধ্যে একজনও যে কয়েক দিন আগে নেমে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানালো না এবং দীর্ঘ শীতের দিনগুলি কিভাবে তারা কাটিয়ে এল সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই দিল না এটা দেখে তারা বেশ আশ্চর্য হল। দূর থেকে পান্থনিবাসটি তাদের চোখে পড়লো। তখনও বাড়িটি পুরু বরফের আস্তরণে ঢাকা রয়েছে। তারা দেখতে পেল পান্থনিবাসের জানালা দরজাগুলি সব বন্ধ; কিন্তু ঘরের চিমনীর ভেতর দিয়ে সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ হসার কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তিনি দেখতে পেলেন চৌকাঠের কাছে বিরাট একটি জানোয়ারের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে; তার দেহের মাংসগুলি ঈগল পাখিরা খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলেছে।

তিনজন মিলে কঙ্কালটিকে পরীক্ষা করলেন।

মাদাম হসার বললেন: এটা নিশ্চয় শামের কঙ্কাল।

তারপরে তিনি গ্যাসপার্ড-এর নাম ধরে ডাকলেন। ঘরের ভেতর থেকে কর্কশ কণ্ঠের একটি চীৎকার ভেসে এল; মনে হল যেন কোন জন্তু চীৎকার

করছে। বৃদ্ধ হুসারও গ্যাসপার্ড-এর নাম ধরে ডাকলেন। দ্বিতীয় একটি চীৎকার ভেসে এল। বাবা আর তুটি ছেলে তখন দরজাটাকে খোলার চেষ্টা করলেন; কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন দরজাটাকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে হল। ফাঁকা আস্তাবল থেকে একটা লম্বা কাঠের কড়ি নিয়ে খুব জোরে তাঁরা দরজার উপরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। দরজাটা খুলে গেল; সেই সঙ্গে বাসন পড়ার শব্দ হল। ভেতরের বাসন রাখার সেলফটা হুমড়ি খেয়ে বিকট শব্দ করে মেঝের ওপরে পড়লো; ঘরটা কাঁপতে লাগলো; দেখা গেল তারই পেছনে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মাথার চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, পরিধেয় ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়ে গিয়েছে।

একমাত্র লাউসিই তাকে চিনতে পারলো।

সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল: মা উলরিচ।

মা চিনতে পারলেন। হ্যাঁ, উলরিচই বটে। যদিও অবশ্য তার মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছে।

দলটিকে কাছে আসতে এবং স্পর্শ করতে বাধা দেয় নি উলরিচ, কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করা হল তখন সে কোন উত্তর দিল না। তাকে লিউক-এ নিয়ে যেতে হল। পরীক্ষা করে ডাক্তারেরা বলেছেন—সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ গ্যাসপার্ডের কী হল তা কোন দিনই কেউ জানতে পারলো না।

পরের গ্রীষ্মে পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে লাউসি হাসার কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিল; এর কারণ দেখতে গিয়ে অনেকে বলেছিল—ওটা আর কিছু নয়; পাহাড়ী জলবায়ুতে হেঁটে চলে বেড়াতে যে পরিশ্রম হয় তারই ফলে এই পদস্খলন।

অলিভ কুঞ্জ

(The Olive Grove)

মার্সেলিস আর তোলন-এর মাঝামাঝি পিসকা উপসাগরের ধারে ছোট্ট বেহাতি বন্দর গারঁদু।

ধর্মযাজক ভিলবয়-এর নৌকো মাছ ধরা শেষ করে ফিরে আসতে দেখতে পেয়ে সেটিকে তীরে বাঁধার জন্যে সাহায্য করতে গ্রামের লোকেরা তীরের ওপরে এসে দাঁড়াল। নৌকোর ওপর ধর্মযাজক একাই ছিলেন। একজন সুদক্ষ নাবিকের মত তিনি নিজেই হাল ধরে ছিলেন; এবং এই কাজে যে দক্ষতা আর সাহস তিনি দেখাচ্ছিলেন ষাট বছর বয়সের মানুষের পক্ষে তা বিস্ময়কর।

তাঁর শক্ত পেশীবহুল ওপর হাত দুটির ওপরে আস্তিন গোটানো ছিল। পরিধানে ছিল খৃষ্টীয় যাজকের পোশাক; সেই পোশাকের ওপরে বোতামগুলি খোলা, পরিধেয়টি হাঁটু পর্যন্ত মোড়া। তিন-কোণা টুপিটা তাঁর পাশে, দাঁড়িরা যেখানে বসে সেইখানে পড়েছিল। সাদা ঢাকনি দেওয়া শোলার টুপি পরে রোদ থেকে তিনি তাঁর মাথাটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। উষ্ণ অঞ্চলের শক্ত-সমর্থ ধর্মযাজকদের একজন বলেই মনে হয়েছিল তাঁকে—খামখেয়ালী—তাঁকে দেখলে মনে হোত ধর্মযাজকের কাজকর্ম করার চেয়ে দুঃসাহসিক ভ্রমণের ক্ষমতা তাঁর অনেক বেশী।

নৌকোটাকে ভাল করে বাঁধার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত জায়গা খোঁজার জন্য মাঝে-মাঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে তিনি চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলেন। তারপরে আবার তিনি দাঁড় ফেলতে সুরু করলেন; এবং উত্তরাঞ্চলের মানুষরা যে কত সুন্দরভাবে বইঠা মারতে পারে এই সব দক্ষিণাঞ্চলের আনাড়ীর কাছে তা-ই আর একবার প্রমাণ করার জন্যেই যেন তিনি আবার তাল মিলিয়ে-মিলিয়ে দাঁড় বাইতে লাগলেন।

তাঁর সেই জোরালো দাঁড়ের ধাক্কায় নৌকোটা তীরে এসে ভিড়লো; এবং ঢালু বালির ওপরে তার দেহটা মসৃণ গতিতে তুলে নিল; মনে হল সে যেন ওই ভাবে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে চরের ওপরে উঠে আসবে। নৌকোটি থেমে গেলে পাঁচজন লোক যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল নেমে এল; দেখে মনে হল, বেশ আনন্দের সঙ্গেই তারা ধর্মযাজককে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল।

তাদের মধ্যে একজন আঞ্চলিক স্বরে জিজ্ঞাসা করল: কিছু পেলেন?

কথা বলার মধ্যে ধর্মযাজকের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ পেল তার।

ধর্মযাজক ভিসবয় দাঁড়গুলিকে নৌকোর ওপরে তুললেন, শোলার টুপিটা মাথা থেকে খুললেন, তিনকোণা টুপিটা মাথায় চড়ালেন, আস্তিনগুলিকে খুলে দিলেন, এবং জামার বোতাম আঁটলেন। ভদ্র হওয়ার কিছুটা চেষ্টা ক'রে তিনি তাঁর যাজকীয় গাম্ভীর্যে ফিরে গেলেন।

'খুব খারাপ নয়'। তিনটে 'বাস', দুটো 'মুরিন' আর কিছু 'জিরেল'।

মোটা 'বাস', চ্যাপটা দেখতে বিশ্রী সাপের মত লিকলিকে 'মুরিন' বেগনে আর লালচে রঙের ডোরা কাটা 'জিরেল' মাছগুলি নৌকোর পাটার ওপরে পড়েছিল। পাঁচটি জেলে কাছে এগিয়ে বেশ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে নৌকোর ধার থেকে উঁকি দিয়ে সেগুলোকে ভাল করে দেখলো।

তাদের মধ্যে একজন নিজের ইচ্ছেতেই বলল: আপনার বাড়িতে এগুলি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ধন্যবাদ।

এই কথা বলে যাজক সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন; তারপর বাড়ির

দিকে এগিয়ে গেলেন। একজন জেলে তাঁর পেছনে-পেছনে গেল। বাকি সবাই সেখানে থেকে গেল; ব্যস্ত হয়ে রইল নৌকোর কাজে।

ধীরে-ধীরে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন তিনি। তাঁর চাল-চলনের ভেতরে কর্মদক্ষতা আর আভিজাত্যবোধের সমন্বয় ঘটেছিল। নৌকোতে পরিশ্রম করার ফলে তখনও তার শরীর বেশ গরম হয়ে ছিল; এবং যখনই তিনি অলিভ গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন; মাথা থেকে টুপি খুলে খোলা সমুদ্র থেকে বয়ে-আসা সন্ধ্যার বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন বুক ভ'রে। সেই মৃদু বাতাস তাঁর শক্ত, কদম-ছাঁটা সাদা চুলগুলির ভেতর দিয়ে আস্তে-আস্তে বয়ে গেল, স্পর্শ করে গেল তাঁর চৌকো মুখটিকে। যাজক না হয়ে সেনানী হলেই বোধ হয় এই মুখ তাঁকে ভাল মানাতো। অনতিবিলম্বেই তিনি একটি গ্রামে উপস্থিত হলেন। একটি বিস্তৃত চ্যাপটা উপত্যকার ওপরে এই গ্রামটি; এই উপত্যকাটি সমুদ্রের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছিল।

জুলাই মাসের সন্ধ্যা। অস্তগামী সূর্য দূরে পাহাড়ের খাঁজ-কাটা চূড়াগুলির প্রায় কাছে গিয়ে পড়েছে। ধুলোতে বোঝাই সাদা রাস্তার ওপরে আলো পড়ে চকচক করছে। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে-আসা বাঁকানো আলোতে তাঁর ছায়াটি দীর্ঘায়িত হয়ে তির্যকভাবে রাস্তার ওপরে পড়েছে। তাঁর তিন-কোণা টুপিটার ছায়া বেথাপ্পা রকমের বড় দেখাচ্ছে; বিরাট একটা কালো বিন্দুর মত সেই ছায়া কখনও গাছের গুঁড়ির গায়ে, কখনও বা অলিভ গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আবার কখনও বা ফাঁকা জমির ওপরে নাচতে-নাচতে এগিয়ে চলেছে।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাঞ্চলের এই রাস্তাগুলির ওপরে ময়দার মত পাতলা ধুলোর আস্তরণ জমে যায়। যাজকের পায়ে ধাক্কা খেয়ে সেই ধুলোর মত উপরে উঠতে লাগলো; তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের ওপরে ধূসর আস্তরণের মত চেপে বসলো। তিনি যত এগোতে লাগলেন ততই সেই ধুলোর পরিমাণ বাড়তে লাগলো। এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হলেন তিনি; তারপরে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পর্বতারোহণকারীরা যেমন সোজা হয়ে চড়াই-এর দিকে এগিয়ে যায় তিনিও সেই রকম শক্ত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। শান্ত চোখ নিয়ে গ্রামটিকে দেখতে লাগলেন, তাঁর নিজের গ্রাম; এখানকার গির্জাতেই কুড়িটি বছর ধরে তিনি পাদরী ছিলেন। এই পদটি তিনি নিজেই চেয়েছিলেন; এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই পদটি দিয়ে তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজই তিনি করে যাবেন বলে মনোস্থির করেছিলেন। পাহাড়ের ওপরে ঢালু জমিতে এখানকার কুটিরগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটি বিরাট পিরামিড। এর চূড়ায় এখানকার গির্জা। তার মাথার ওপরে তামাটে রঙ-এর যে গম্বুজগুলি

রয়েছে গির্জার সঙ্গে তা মোটেই খাপ খায় না। দেখলে মনে হবে না ও গির্জার পবিত্র ভূমির জন্যে নির্মিত হয় নি, হয়েছিল দুর্গের জন্যে।

মাছ ধরে খুশি হয়েছিলেন ধর্মযাজক। গির্জার লোকেরা এটিকে তাঁর আর একটি কৃতিত্ব বলে মনে করল। বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে ওই অঞ্চলের যে-কোন সুস্থ ও সবল মানুষের সমান, তাঁর হাতের পেশীগুলি যে যে-কোন বলিষ্ঠ মানুষের সমকক্ষ—এতেই তাঁর ওপরে তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। এই ব্যাপারে তাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। পিস্তল ছুঁড়ে একটি ফুলের ডাঁটাকে তিনি গুলিবিদ্ধ করতে পারতেন; অনেকদিনের দক্ষ অস্ত্র-বিশারদ প্রতিবেশী তামাকের দোকানের মালিকের সঙ্গে তিনি তরোয়াল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন; এবং ওই অঞ্চলের তিনি সবচেয়ে দক্ষ সাঁতারু। এই সব নির্দোষ বস্তুগুলিই তাঁর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ছিল।

একদিন ছিল যখন সামাজিক জগতেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ব্যারণ দ্য ভিলবয় পাদরী বনে গেলেন। এর পেছনে ছিল ব্যর্থ প্রেমের একটি কাহিনী।

পিকাডীর প্রাচীন বংশটি ছিল রাজভক্ত এবং ক্যাথলিক। এই বংশেই তাঁর জন্ম। যুগ-যুগ ধরে এই বংশটি তার সন্তানদের যুদ্ধে পাঠিয়েছে, সরকারী বা পাদরীর চাকরি নেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করেছে। মায়ের কাছে শুনে-শুনে ছেলেবেলা থেকেই পাদরী হওয়ার আগ্রহ জন্মেছিল তাঁর। কিন্তু বাবার উপদেশে তিনি কর্মসূচীর পরিবর্তন করেন। তিনি ঠিক করেন প্যারিসে গিয়ে আইন পড়বেন; তারপরে আদালতের কোন অর্থকরী প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি যখন লেখাপড়া করছেন সেই সময় জলাভূমিতে শিকার করতে গিয়ে তাঁর বাবা নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হন; এবং সেই অসুখেই তিনি মারা যান। আর তাঁর মা স্বামীর মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন। হঠাৎ বিরাট সম্পত্তির মালিক হওয়ায় ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত পরিকল্পনা বর্জন করে তিনি বিত্তশালী মানুষের অলস জীবন যাপনের মোহে ডুবে গেলেন।

চেহারা আর বুদ্ধি—কোনটারই অভাব ছিল না তাঁর; কিন্তু চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। কয়েকটি বাঁধা-ধরা বিশ্বাস, নীতি, আর চালচলনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। বাহুর পেশীর মত ওইগুলিও পিকাডীবংশের উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পাওয়া। বাইরের লোক তাঁকে ভালই বলতো, সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁর প্রবেশ ছিল অবারিত। সুস্থ এবং ভদ্রনীতির পরিপোশক এবং অবস্থাপন্ন জনপ্রিয় যুবক হিসাবে তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গেই জীবন কাটাচ্ছিলেন।

তারপরে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। একটি বন্ধুর বাড়িতে যুবতী অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা হোত। অভিনেত্রীটি তখনও বলতে গেলে শিক্ষানবীশ-ই ছিল; কিন্তু সেই সময়েই ওদেয়নে প্রথম অভিনয়েই সে অদ্ভুত

সাফল্য অর্জন করল। ব্যারণ গু ভিলবয় ভীষণভাবে তার প্রেমে পড়ে গেলেন, আদর্শের যুপকাষ্ঠে যারা নিজেদের বলি দিয়েছে, তারা যেমন কোন কিছু বাছ-বিচার না করেই কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই প্রেমের ব্যাপারে তেমনি তিনিও কোন রকম দ্বিধা করলেন না। সেই বিজয়-অভিযানের রাত্রিতে মেয়েটি রোমান্সের যে আতিশয্যে টইটম্বুর হয়ে পড়েছিল তাই দেখেই তাঁর এই দুর্দমনীয় প্রেম জেগেছিল।

মেয়েটি দেখতে সুন্দরীই ছিল; কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে তার বিকৃতি ছিল তার স্বভাবের অন্তর্গত। তার মুখ দেখলে তাকে নিরপরাধ আর ছেলে-মানুষ বলে মনে হোত। এই জন্যেই তার কাছে স্বর্গীয় লাগতো। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটি তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছিল। তার চোখের চাউনি আর পোশাকের হিল্লোল তাঁর মনের মধ্যে একটি অনির্বচনীয় উত্তাল আলোড়ন জাগাতো। মেয়েটিকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। পরের চারটি বছর মেয়েটির প্রেমে বিভোর হয়ে রইলেন তিনি। সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি হয়ত শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে বিয়ে করতেন যদি না তিনি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেলতেন যে যে-বন্ধুটির মারফৎ তার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল সেই বন্ধুটির সঙ্গে মেয়েটি অনেক দিন ধরেই গোপন আসঙ্গে লিপ্ত রয়েছে।

আবিষ্কারটি তাঁর কাছে আরও দুঃখজনক এই জন্য যে মেয়েটি তখন অন্তঃ-সত্ত্বা; এই সন্তানের জন্মের জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক করে রেখেছিলেন যে এর পরেই মেয়েটিকে তিনি সামাজিক রীতি অনুসারে বিয়ে করবেন, ড্রয়ারের মধ্যে লুকানো কয়েকটি চিঠি একদিন তাঁর হাতে পড়ল; সেগুলি নিয়ে তিনি তার সামনে এসে দাঁড়ালেন; তাঁর অর্দ্ধ-বর্বর চরিত্রের সমস্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে মেয়েটিকে তার বিশ্বাসঘাতকতা, নির্লজ্জতা, আর চরিত্র-হীনতার জন্যে তিরস্কার করলেন।

প্যারিসে রাস্তায়-ঘোরা বলতে যা বোঝা যায়, মেয়েটিও ছিল পুরোপুরি সেইজাতীয়; যেমন লজ্জাহীনা তেমনি নীতিজ্ঞানহীনা। সে বেশ ভালভাবেই জানতো যে ব্যারণ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপরে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিশেষ ক'রে দৈন্য আর দারিদ্র্যে জর্জরিত নিচু শ্রেণীর মেয়েরা হঠাৎ স্বাচ্ছল্য আর ক্ষমতার অধিকারিণী হলে যেমন নির্লজ্জভাবে বেপরোয়া হয়ে যায়, মেয়েটিও ঠিক সেইভাবে ব্যারণকেও মুখের ওপরে সোজাসুজি অপমান করল। যখন মেয়েটিকে আঘাত করার জন্যে ব্যারণ হাত তুললেন, মেয়েটিও তখন তাকে প্রত্যাঘাত করার জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুতি নিল।

নিজেকে সংযত করে নিলেন ব্যারণ। এই দূষিত, কলঙ্কিত দেহের মধ্যে তাঁর সন্তান রয়েছে এই চিন্তাটা তাঁকে বিবর্ণ করে তুললো। এই দুটিকে ধ্বংস করে ফেলার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র আঘাতে দুটি লজ্জাকে সমূলে বিনষ্ট করার

জন্যে তিনি মেয়েটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভয় আর আতঙ্কে অভিভূত হয়ে মেয়েটি তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করল। তাঁর একটি ঘুষির আঘাতে মেয়েটি মাটিতে পড়ে গেল। সে দেখল তাকে আর তার গর্ভে যে কোরকটি রয়েছে তাকে একসঙ্গে মাড়িয়ে ফেলার জন্যে পায়ের গোড়ালিটা এগিয়ে আসছে। তাঁর সেই প্রচণ্ড ক্রোধকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে সে তার হাতদুটো সামনের দিকে প্রসারিত করল; তারপর চীৎকার করে উঠলো: আমাকে মেরে ফেল না। এ সন্তান তোমার নয়; তার।

তিনি পিছু হটলেন। হতভম্ব আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি তাঁর গোড়ালিটা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে রইলেন; সেই সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো তাঁর ক্রোধ।

স্পষ্ট ক'রে কথা বেরোল না তাঁর মুখ থেকে; তিনি তোতলাতে তোতলাতে বললেন: তুমি····তুমি ··কী বললে?

কেবল তাঁর চোখেই নয়; তাঁর হাবভাবের মধ্যে মেয়েটি একটা হত্যার নেশা দেখতে পেল। ভীষণ ভয়ে, সে আবার চীৎকার করে বলল: এ সন্তান তোমার নয়; তার।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন ব্যারণ; দাঁত কিড়মিড় করে তিনি বললেন: ওই ছেলে?

হ্যাঁ।

মিথ্যেবাদী।

মেয়েটিকে মাড়িয়ে দলা পাকানোর জন্যে আবার তিনি সবুট লাথি তুললেন। মেয়েটি সেই অবসরে হাঁটুতে ভর দিয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু বারবার সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল: আমি বলছি এ সন্তান তার। তোমার হলে অনেক আগেই কি এ সন্তান জন্মাত না?

সত্যের মত জোরালো হয়ে এই যুক্তিটা তাঁকে আঘাত করল। মাঝে-মাঝে মানুষের চিন্তাধারাটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই সময় সে অনেক দুরূহ সমস্যা অতি দ্রুত এবং পরিচ্ছন্নভাবে সমাধান করে ফেলে। সেই সমাধান করার সময় নিজেকেই নিজে যে সব যুক্তি দেখায় সেগুলি খাঁটি; কেবল খাঁটিই নয়, সত্যকে বোঝার পক্ষে এতবড় পরিচ্ছন্ন এবং অনিবার্য যুক্তি আর নেই। তাকে বাধা দেওয়াও যেমন অসম্ভব, তার বিরুদ্ধে অন্য কোন যুক্তি খাড়া করাও তেমনি কষ্টকর। ঠিক এই রকম একটি মানসিক অবস্থায় তিনিও বুঝতে পারলেন ওই গর্ভস্থ ভ্রূণটির জনক তিনি নন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সেই প্রচণ্ড আক্রোশ কমে গেল। তিনি শান্ত হলেন, উত্তেজনা কমে গেল তাঁর। সন্তুষ্ট হলেন তিনি। ভ্রূণটিকে হত্যা করার বাসনা পরিত্যাগ করলেন।

শান্ত স্বরে তিনি বললেন: ওঠ। এখান থেকে চলে যাও। তোমার মুখ আর যেন আমাকে দেখতে না হয়।

সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়ে, কোন রকম গোলমাল না করেই মেয়েটি চলে গেল। আর কোন দিন তিনি তার মুখ দেখেন নি। তিনিও দেশ ছাড়লেন। দক্ষিণ দিকের রোদের দেশের দিকে যাত্রা করলেন; শেষকালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটি বিস্তৃত উপত্যকার ওপরে অবস্থিত একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সমুদ্রের দিকে মুখ-করা একটা পান্থনিবাস তাঁর চোখে পড়ল। ভাল লাগলো তাঁর। আর এগোলেন না তিনি। সেইখানেই একখানা ঘর নিয়ে থেকে গেলেন। লোকসমাজ থেকে দূরে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এইখানেই তিনি আঠারো বছর কাটালেন। গভীর দুঃখ আর হতাশায় মুহ্যমান হয়ে যে নারীটি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারই বিধ্বংসী স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে রইলেন। তার সৌন্দর্য, তার উন্মত্ত মোহ, তার রহস্যময় ডাইনীবিদ্যার কথা বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগলো; এবং তারই উপস্থিতি আর সোহাগের জন্যে তিনি লালায়িত হয়ে পড়লেন।

ধূসর সবুজ অলিভ গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে যেখানে সূর্যের আলো ঝরে পড়ে ফ্রান্সের সেই সব দেহাতী উপত্যকায় বাতিকগ্রস্ত মন নিয়ে উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘুরতে লাগলেন। যৌবনে তিনি যে সৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন বলে ভেবেছিলেন এই বিষণ্ণ নির্জনতা অবশ্য সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল। ধীরে-ধীরে অতি ধীরে সেই সব স্তিমিত চিন্তাগুলি তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে বসল। জীবনের অনেক অজানা বিপদ থেকে ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে বলেই তখন ধর্মকে তাঁর ভাল লাগতো; এখন তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের যন্ত্রণা আর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথই হল ধর্মের পথ। প্রার্থনা করার অভ্যাস কোনদিনই তিনি ভোলেন নি; তাঁর এই নির্জনতা তাকে তিনি আরও গভীরভাবে আঁকড়িয়ে ধরলেন। যেখানে দেবতার প্রতীক পূত স্থানের অভিভাবক নিঃসঙ্গ বাতিদান থেকে একটিমাত্র আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যার আবছায়ায়। গির্জায় তিনি প্রায়ই যেতেন, হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতেন। ভগবানের কাছে গোপনে তিনি তাঁর দুঃখের কথা জানাতেন, তাঁর দয়া ভিক্ষা করতেন, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাতেন। যে ক্রমবর্দ্ধমান উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন তা থেকেই বোঝা যেত তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভগবৎভক্তি অনুপ্রবেশ করেছে। নারীর সান্নিধ্য লাভের মোহে ক্ষতবিক্ষত ক্ষয়িষ্ণু তাঁর হৃদয় তখনও নরম, ভাববিহ্বল; ভালবাসার কাঙাল। প্রার্থনায় স্থিতচিত্ত হয়ে তিনি সাধুর জীবন যাপন করতেন; ধর্মের অনুশীলনে কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। এইভাবে ধীরে-ধীরে তিনি ভক্তি মার্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। ভগবানের অতীন্দ্রিয় ভাব তাঁর হৃদয়ে প্রতিভাত হল; তিরোহিত হল তাঁর নিচু স্তরের বাসনা-কামনা। পবিত্র শৈশবে গির্জার কাজে আত্মোৎসর্গ করার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। গার্হস্থ্য জীবন ভেঙে যাওয়ার পরে সেই কাজেই

আত্মনিয়োগ করার সংকল্প নিলেন তিনি। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি গির্জায় ঢুকলেন।

যে দেহাতী গ্রামটিতে তিনি হঠাৎ এসে পড়েছিলেন সেইখানে গির্জাতেই পাদরীর চাকরি পেতেন তিনি। তাঁর সম্পত্তির বেশী অংশই তিনি পরোপকারের কাজে নিয়োগ করলেন; জীবনের বাকি ক'টা দিন দরিদ্রদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করার জন্যে যা প্রয়োজন হ'তে পারে কেবল সেই পরিমাণ সম্পত্তি তিনি নিজের হেফাজতে রাখলেন। এইভাবে তিনি সৎ প্রতিষ্ঠানের আর তাঁর চারপাশের দুস্থ, অসহায় মানুষের সেবার মধ্যে নিজেকে আশ্রয় দিলেন।

মতবাদের দিক থেকে তিনি সঙ্কীর্ণ ছিলেন; কিন্তু পাদরী হিসাবে তিনি ছিলেন সৎ, যদিও মানুষ পরিচালনা আর ধর্মীয় অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে তিনি বড় কড়া নিয়ামক ছিলেন; আর সেই জন্যেই তাঁকে সৈনিক হিসাবে যতটা মানাতো, পাদরী হিসাবে ততটা না। জীবন-অরণ্য অসংখ্য সঙ্কীর্ণ পথে বিকীর্ণ; সেখানে প্রবেশ করলে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্রবৃত্তি, ভাললাগা, আর কামনার বিবরে ভ্রান্ত মানুষের দল উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব ভ্রান্ত মানুষের দলকে তিনি পরিচালনা করতেন না, ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এই নতুন কর্মক্ষেত্রেও ফেলে-আসা জীবনের অনেক প্রবৃত্তিই তিনি বিসর্জন দিতে পারেন নি। আগের মতই উগ্র শারীরিক পরিশ্রম করতে তিনি ভালবাসতেন। মানুষকে উন্নত করে এমন সব খেলাধূলা তাঁকে আনন্দ দিত; এবং বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করতে তিনি আনন্দ পেতেন যথেষ্ট; এবং পরিচয় নেই এমন বিপদের মুখে পড়লে একটি শিশু যেমন তার স্বভাবজাত ভয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে সেই রকম তিনিও কোন নারীর সংস্পর্শে এলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন; কেন হতেন অনেক সময় তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারতেন না।

(২)

দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের মত যে জেলেটি তাঁর পেছনে-পেছনে আসছিল কথা বলার আগ্রহ তারও ছিল অদম্য। কিন্তু সে গল্পটা শুরু করতে ভয় পাচ্ছিল কারণ অনুচরদের মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। অবশেষে লোকটি ভয়ে-ভয়ে মন্তব্য করল: ধর্মাবতার, আশা করি ছোট ঘরে আপনি আরামেই আছেন।

যে ঘরটিতে পাদরী থাকতেন সেটি অত্যন্ত ছোট। গ্রীষ্মকালে হাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পাশাপাশি সহর বা গ্রাম থেকে যাঁরা এ-অঞ্চলে আসতেন তাঁরা এই জাতীয় কুঠরিতেই বাসা বাঁধতেন। পাদরীর অফিস ঘরের একটি দেওয়াল ছিল গির্জার দেওয়ালের মত খুব ছোট; এত ছোট যে কাজ করার অসুবিধে হোত যথেষ্ট। এই কারণেই মাঠের মধ্যে তিনি এই ঘরটি ভাড়া

নিয়েছিলেন। হাঁটা পথে গির্জা থেকে এর দূরত্ব ছিল পাঁচ মিনিটের। গ্রীষ্ম-কালেও তিনি এখানে নিয়মিতভাবে থাকতেন না। এই অঞ্চলের শান্ত পরি-বেশের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে আর পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করতে মাঝে-মাঝে তিনি এখানে আসতেন, দিনকতক কাটিয়ে যেতেন-ও।

তিনি জেলেটিকে বললেন: হ্যাঁ বন্ধু। আমি এখানে বেশ আরামেই রয়েছি।

ফ্যাকাসে লাল রঙের ছোট কুটিরটি তাঁর চোখে পড়ল। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এই ঘরটি। অলিভ গাছে ভর্তি জায়গাটা। প্রথম দৃষ্টিতেই এটিকে একটি দেহাতী অঞ্চলের ব্যাঙের ছাতা বলে মনে হবে। অলিভ গাছের ডাল আর পাতাগুলি ঘরের দেওয়ালের ওপরে এলোমেলোভাবে লুটিয়ে পড়েছে, ছায়া-চ্ছন্ন করে রেখেছে চারপাশ। ঘরের বাইরে তাঁর গোলগাল পরিচারিকা বেশ ধীরে সুস্থে একটি ছোট টেবিল সাজাচ্ছিল; টেবিল ঢাকা চাদর, প্লেট, তোয়ালে, জলের বড় গেলাস, আর বড়-বড় রুটির টুকরো—প্রতিটি জিনিস আনার জন্যে সে একবার করে ঘরে ঢুকছিল, আর জিনিসটি নিয়ে ধীরে-ধীরে সাজিয়ে রাখছিল। কোন বিষয়েই তার কোন রকম ত্বরা ছিল না। মাথার ওপরে ছিল তার ছোট একটি আরলেসিয়েন টুপী, কালো সিল্ক অথবা সাদা ব্যাঙের ছাতির মত দেখতে গয়না ছিল তার হাতে। কাছাকাছি এসে পাদরী তাকে ডাকলেন। তাকিয়ে দেখে সে তার মনিবকে চিনতে পারল।

ও, আপনি? ধর্মাবতার, আপনি?

হ্যাঁ আমি। ভালই শিকার হয়েছে আজ। এখনই লেগে পড়। একটা 'বাস' মাছ আমার জন্যে ভেজো। মাখন দিয়ে ভেজো, একটু নামমাত্র মাখন। বুঝেছ?

পরিচারিকাটি কাছে এগিয়ে এসে নৌকোর মাঝি যে মাছ এনেছিল সেই মাছটিকে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে বলল: মুরগীর মাংস আর ভাত আপনার জন্যে তৈরী করে রেখেছি।

তা হোক। মাছ এমন একটা বেশী কিছু নয়। আজকের জন্যে মাত্রাটা আমি একটু চড়িয়ে দেব। এরকম আমি অবশ্য বেশী করি নে। তা ছাড়া এটা ভয়ানক রকমের পাপও কিছু নয়।

'বাস' মাছটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পরিচারিকাটি; চলে যাওয়ার আগে বলল: একটি লোক আপনার খোঁজ করছিল। সে তিনবার এসেছিল।

উদাসীনভাবেই পাদরী জিজ্ঞাসা করলেন: লোক? কেমন দেখতে?

চোখ দেখে মানুষটিকে ভাল মনে হচ্ছে না।

ভিক্ষুক?

হ্যাঁ; সেই রকমই। মনে হয় ভবঘুরে।

পাদরী ভিলবয় তার কথা শুনে হাসলেন। মার্গিরাইট যে ভীরু স্বভাবের-

তা তিনি জানতেন। তার সব সময়েই মনে হোত, বিশেষ করে রাত্রিতে, সবাই তাদের খুন করতে আসছে।

কিছু বকশিস দিয়ে মাঝিকে বিদায় দিলেন পাদরী। তারপরে তিনি হাত মুখ ধুতে গেলেন।

মার্গিরাইট রান্নাঘরে বসে ছুরি দিয়ে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত মাছটার ছাল ছাড়াচ্ছিল; এমন সময় সে চেঁচিয়ে বলল: সেই লোকটা আবার আসছে।

পাদরী রাস্তার দিকে ঘুরে দেখলেন। হ্যাঁ, একটি লোক তাঁরই বাড়ির দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে বটে। দূর থেকেও বোঝা গেল সেই মানুষটির পরিধেয় একেবারে শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

মনে-মনে ভাবলেন পাদরী: মার্গিরাইট তো ঠিকই বলেছে। লোকটার হাব-ভাব ভাল মনে হচ্ছে না।

অপরিচিত মানুষটির জন্যে অপেক্ষা করতে পরিচারিকার ভয়ের কথা ভেবে তিনি নিজের মনেই হাসতে লাগলেন।

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেই অপরিচিত লোকটি হাজির হল। সে ধীরে ধীরে বেড়ানোর মত করে এগিয়ে এল এবং পাদরীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আগন্তুকটি যুবক, সুন্দর আর কোঁকড়ানো দাড়ি; মাথার ওপরে একটি নরম শোলার টুপী। টুপীটি এত ময়লা আর ভাঙা-চোরা যে ওটার আসল চেহারা আর রঙ যে কী ছিল তা এখন ধরা যায় না। একটা লম্বা কটা রঙের ওভারকোট তার গায়ে; তার ট্রাউজারের বোতাম ছেঁড়া, পায়ে দড়ির স্থকতালা দেওয়া একজোড়া ক্যানভাসের জুতো; দেখলেই মনে হবে লোকটা যেন চুরি করার মতলবে ওৎ পেতে বেড়াচ্ছে। পাদরীর কাছ থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে সে মাথার টুপীটা খুললো। টুপী খুলতেই তার মুখটা পরিষ্কারভাবে দেখা গেল। যদিও সেই মুখের ওপরে অতিরিক্ত অমিতাচারের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে, তবু সেটি একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার মত নয়। তার মাথায় বিরাট টাক, বয়স তার পঁচিশের বেশী হবে না। এই থেকেই বোঝা যায় হয় ছেলেটির স্বাস্থ্য খুব দুর্বল, অথবা পঙ্কিল আবর্তে সে ডুবে রয়েছে।

পাদরীও তাঁর টুপীটা খুললেন। তাঁর কেমন যেন মনে হল ছেলেটি ভবঘুরেও নয়, বেকারও নয়, অথবা, জাত-অপরাধীও নয়। যারা এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় ঘুরে বেড়ায়, যারা জেলের বনেদী কয়েদীদের মত রহস্যময় অর্থহীন কথার ফোয়ারা ছোটায়, এ যেন সেইজাতীয় নয়।

আগন্তুকটি বলল: নমস্কার মঁসিয়ে।

সেই সন্দেহজনক চেহারার আগন্তুককে "মঁসিয়ে" সম্বোধন না করে পাদরী সাধারণভাবেই বললেন: নমস্কার। পাদরী এবং যুবক—পরস্পরের দিকে চারটি চোখ পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করতে লাগলো। সেই ভবঘুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির

সামনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগলো পাদরীর। তাঁর মনে হল একটি রহস্যময় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে যেন তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মানুষটির ভেতরে কী যেন একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে যা অনুমান করে তাঁর দেহের মধ্যে শিরাগুলি সঙ্কুচিত হতে লাগলো।

অবশেষে ভবঘুরে যুবকটি কথা বলল।

আচ্ছা, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে পাদরী বললেন: আপনাকে চিনতে পারছি? না, নিশ্চয় না, আপনাকে আমি আদৌ চিনি না।

হ্যাঁ; আমাকে আপনি আদৌ চেনেন না। আর একবার আমার দিকে তাকান।

আপনার দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই। আজকের আগে কোনদিনই আপনাকে আমি দেখি নি।

ব্যঙ্গের সুরে যুবকটি স্বীকার করল: কথাটা সত্যি। কিন্তু আমি আপনাকে এমন একজনকে দেখাব যাকে চিনতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

এই বলে সে টুপীটি পরে তার ওভারকোটের বোতামগুলি খুলে দিল। ট্রাউজারটিকে যথাস্থানে আটকে রাখার জন্যে তার সরু কোমরে একটি লাল বন্ধনী বাঁধা ছিল। পকেটের ভেতর থেকে সে একটা খাম বার করল। যত রকমের নোংরা দাগ রয়েছে সবগুলি পড়েছে সেই খামের ওপরে। এটি হচ্ছে সেইজাতীয় নোংরা খাম যেগুলিকে সমাজ পরিত্যক্ত ভবঘুরেরা তাদের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের ভেতরে চুরি করা অথবা সৎভাবে সংগ্রহ করা কিছু খাঁটি অথবা জাল দলিল থাকে। ভ্রাম্যমাণ টহলদারী পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এগুলি তাদের বেশ কাজে লাগে। এই খামের ভেতর থেকে আগন্তুক পোস্টকার্ড মাপের পুরনো একটি ফটো বার করল। ছবির রঙ ফ্যাকাসে, অনেকদিন গরম দেহের সান্নিধ্যে থাকার ফলে এর রঙ চটে গিয়েছে। পাদরীর মুখের সামনে ফটোটিকে তুলে ধরে সে জিজ্ঞাসা করল: একে চেনেন?

পাদরী দু'পা এগিয়ে এলেন। উদ্বেগ এবং বিহ্বলতায় তাঁর মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এ ছবি তাঁর নিজের। যে নারীটিকে অনেকদিন তিনি ভালবাসতেন এটি তার কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে। কী উত্তর দেবেন কিছুই ভেবে পেলেন না তিনি।

ভবঘুরে উত্তরের জন্যে চাপ দিল: এই ছবিটিকে আপনি চেনেন?

আমতা-আমতা করে বললেন পাদরী: চিনি।

এটি কার ছবি?

আমার।

সত্যিই?

নিঃসন্দেহে।

বেশ, তাহলে আমার দিকে তাকান; আপনারই প্রতিচ্ছবি আমি। আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখুন।

উদ্‌ভ্রান্ত পাদরী আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই দুটি মুখ, ফটোগ্রাফার আর তার পাশে দাঁড়িয়ে যে মুখটি ঠাট্টা করছে, সে দুটি যেন দুই ভাই। তবুও ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হল না।

একটু কোঁতিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পাদরী: আমার কাছ থেকে তুমি কী চাও?

বিষাক্ত স্বরে আগন্তুকটি উত্তর দিল: আমি আপনার কাছ থেকে কী চাই? আমি চাই সবার আগে আপনি আমাকে স্বীকার করবেন।

তোমাকে স্বীকার করব? কিন্তু তুমি কে?

আমি কে? যে-কোন রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করুন, এখানকার মেয়রকে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁদের এই ফটোগ্রাফটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন আমি কে? আমি বলছি, প্রশ্ন শুনে তাঁরা হাসবেন। আপনি স্বীকার করেন না যে আমি আপনার ছেলে, ধর্মযাজক বাবা আমার।

হতাশায় ভেঙে পড়ে বাইবেলের সিদ্ধপুরুষের মত ওই বয়স্ক মানুষটি স্বর্গের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তারপরে তিনি শোনালেন: না, এ সত্যি নয়।

যুবকটি তাঁর আরও কাছে সরে এল। মুখোমুখী দাঁড়ালো দুজনে।

ওঃ, তাই নাকি? আমার কথা সত্যি নয়, কেমন? বন্ধু, তোমার কোন মিথ্যাই ধোপে টিকবে না, বুঝেছ?

যুবকটির মুখের চেহারা তখন তার রঙ বদলিয়েছে। মারমুখী হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো, হাত তার মুষ্টিবদ্ধ। তার স্বরের মধ্যে, কথা বলার ধরনের মধ্যে এমন একটা প্রত্যয়ের সুর ফুটে বেরোচ্ছে যে পাদরী তার সামনে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন কে ভুল করেছে—তিনি, না, ওই আগন্তুক। কিন্তু তবু তিনি বেশ জোর দিয়েই বললেন: কোন দিনই আমার কোন ছেলে ছিল না।

যুবকটি ধমকের স্বরেই বলল: কিম্বা কোন রক্ষিতা; আশা করি তাও ছিল না।

সাহস আর পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদা নিয়ে পাদরী তিনটি শব্দে উত্তর দিলেন: একটি রক্ষিতা, হ্যাঁ।

তুমি যখন তাকে বার করে দিয়েছিলে তখন সে কি গর্ভবতী ছিল না?

এই সব কথা শুনে তাঁর সেই পঁচিশ বছরের পুরনো ক্রোধ, যা তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন, আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। সেই রাগ তার একেবারে

জল হয়ে যায় নি। বহু বছর ধরে প্রেমিকের হৃদয়কন্দরে তা চাপা হয়ে পড়েছিল। তিনি তাকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, রুদ্ধ করেছিলেন তার বাইরে আসার পথ, তার ওপরে তৈরী করেছিলেন বিশ্বাসের, হতাশার সমাধিস্তম্ভ। কিন্তু এক মুহূর্তে সেই চাপা দেওয়া আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। আত্মহারা হয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন: আমি তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলাম, সে ছিল অবিশ্বাসিনী; বিশ্বাসঘাতিনী। তার গর্ভে যে সন্তান ছিল তার জনক আর একজন, তা যদি না হোত তাহলে তাকে আর তোমাকে—দুজনকেই সেদিন আমি হত্যা করতাম।

পাদরীর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে যুবকটি ঘাবড়িয়ে গেল; এবার সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল; এবার একটু নিচু গলায় সে প্রশ্ন করল, কে আপনাকে বলল যে সেই সন্তানের বাবা আপনি নন?

সে—সে নিজে বলেছে।

ভবঘুরে এই কথার কোন প্রতিবাদ করল না। কোন একটা মামলার রায় এইভাবে দুষ্টলোকের মত উদাসীনভাবেই সে বলল: সেটা মায়ের ভুল হয়েছে। মা তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছিল—এই যা।

ক্রোধের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরে পাদরী তাঁর আতপ্রত্যয়ে নেমে এলেন; তিনি স্থিরভাবে প্রশ্ন করলেন: কে বলল তুমি আমার ছেলে?

মা মারা যাওয়ার সময় মা আমাকে এই কথা বলে গিয়েছে। আরও যদি প্রমাণ চাও তাহলে দেখ।

আবার সে ফটোগ্রাফটি সামনে তুলে ধরল। পাদরী সেটিকে হাতে তুলে নিলেন, ধীরে-ধীরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন, অপরিচিত ভবঘুরে ছোকরাটির মুখ নিজের সেই পুরনো ছবির মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। একটা তীব্র যাতনায় তাঁর হৃদয় মুচড়ে-মুচড়ে উঠলো। কিন্তু আর তিনি সন্দেহ করতে পারলেন না। যে লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যে তাঁর ছেলে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন।

মনস্তাপে জর্জরিত হয়ে উঠলেন তিনি। অনেকদিন আগে কৃত পাপ কাজের জন্যে অনুশোচনার মত, একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে তুললো। বিচ্ছেদের সেই পাশবিক দৃশ্যটির কথা এখনও তাঁর মনে রয়েছে, এ-দৃশ্যের নায়ক ছিলেন তিনি নিজেই। যে-মানুষটির সম্ভ্রম সে ধুলোয় লুণ্ঠিত করেছে সেই মানুষটির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সেই বিশ্বাসঘাতক কলঙ্কিনী নারী তাঁকে সেদিন মিথ্যা কথা বলেছিল। সেই মিথ্যাতেই কাজ হয়েছে। তার একটি ছেলে জন্মেছে; সেই ছেলে তাঁরই। সে আজ বড় হয়েছে, পরিণত হয়েছে একটা দীন-দরিদ্র ভিখিরিতে, মদ্দা ছাগলের মত সারা অঙ্গে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

পাদরী জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার

জন্যে আমার সঙ্গে একটু বেরোবে ?

ছেলেটি একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলল : নিশ্চয়, ঠিক ওই জন্যেই তো আমি এসেছি।

অলিভ গাছের সারির ভেতর দিয়ে পাশাপাশি তারা হাঁটতে লাগলো। সূর্য ডুবে গিয়েছে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ কনকনে শীত এসে যেমন ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চলগুলিকে গ্রাস ক'রে ফেলে তেমনি কনকনে একটি শীতের আস্তরণ অদৃশ্যভাবে সেইখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাঁপতে লাগলেন পাদরী। চার্চে যাজকের কাজ করার সময় যেমন মাঝে-মাঝে হঠাৎ তিনি চোখ দুটো ওপরে তুলে দিতেন ঠিক সেইভাবে হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুললেন তিনি, চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, ওপরে, নীচে চারদিকে; পবিত্র গাছের ধূসর-সবুজ পাতাগুলি বাতাসে কাঁপছে, একপাশে তিনি আর একপাশে স্বর্গ; এদের মাঝখানে অলিভ গাছের ছায়া। এই ছায়া অনেক দুঃখ থেকে, অনেক যন্ত্রণা থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে, সেই সব দুঃখের সেবা হচ্ছে খৃস্টের।

একটি ছোট হতাশার প্রার্থনা তাঁর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মুখ দিয়ে কিছুই উচ্চারণ করলেন না; এ হচ্ছে মানুষের সেই অন্তর্লোকের বেদনার রঙে রঙিয়ে তোলা ভাষা; মুখ দিয়ে যা বেরোয় না; অথচ নির্বাক সেই ভাষা দিয়ে বিশ্বাসী উদ্ধারের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়।

ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তাহলে তোমার মা মারা গিয়েছে ?

এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় তাঁর দেহটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল, এই যন্ত্রণা সেই মানুষের যে পুরনো দিনকে ভুলে যেতে পারে নি; একদিন তার ওপরে যত অত্যাচার করা হয়েছে সে-সব কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারে নি, হঠাৎ মনে পড়ে যায়। অথবা মেয়েটি মারা যাওয়ার ফলে একমাত্র অতীত যৌবনের উচ্ছ্বাসময় কয়েকটি দিনের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আনন্দ আজ নির্বাসিত; পড়ে রয়েছে কেবল আঘাত খাওয়ার চিহ্নটুকু।

যুবকটি বলল : হ্যাঁ মারা গিয়েছে।

কতদিন আগে ?

বছর তিনেক হল।

পাদরীর মনে নতুন সন্দেহ জাগলো।

আগেই তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আস নি কেন ?

উত্তর দেওয়ার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল যুবকটি; তারপরে বলল : আসার সুযোগ পাই নি। মানে, আসার পথে অসুবিধে ছিল। কিন্তু সব কথা খুলে বলতে পারছি নে বলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। যতটা সম্ভব খোলা-

খুলি ভাবেই আমি বলব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলছি। কাল সকাল থেকে আমার কিছু খাওয়া হয় নি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন পাদরী। কে যেন চাবুক কষিয়ে দিল তাঁকে। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন: আহা রে!—যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

যুবকটি তার সরু-সরু কম্পমান আঙুলগুলি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। তিনি তাঁর শক্ত হাতের ভেতরে সেগুলিকে চেপে ধরলেন। পৃথিবীর সমস্ত সৎ প্রচেষ্টার ওপরে সে আস্থা হারিয়েছে একরকম একটা মনোভাব নিয়ে ঠাট্টার স্বরে যুবকটি বলল: ভাল কথা, আমার মনে হয় যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে বলে মনে হচ্ছে সে সব বাদ দিয়ে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারব না।

পাদরী বাড়ির দিকে ফিরলেন।

তিনি বললেন: চল, আমরা খেতে বসি।

যে সুন্দর-সুন্দর মাছগুলি তিনি ধরেছেন, এবং মার্গিরাইট আজ যে মুরগীর মাংস আর ভাত রান্না করেছে এই কথা মনে হতেই তাঁর মনে হঠাৎ একটা তালগোল পাকানো অভূতপূর্ব চমক খেলে গেল। ওই দুটি ডিস অভুক্ত হতভাগ্য যুবকটির কাছে নিঃসন্দেহে উপাদেয় বলে বিবেচিত হবে।

এরই মধ্যে মার্গিরাইট বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে; কিছু খিটখিটেও হয়ে উঠেছে। সামনে দাঁড়িয়ে পাদরীর জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

পাদরী চেঁচিয়ে বললেন: মার্গিরাইট, টেবিলটা খাবার ঘরে নিয়ে যাও; দুজনের মত খাবার সাজাও। একটু তাড়াতাড়ি কর।

আগন্তুক যে দুষ্ট প্রকৃতির লোক সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না তার। সেই দুষ্ট লোকটার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসার প্রস্তাব শুনে সে ভয়ে বিভ্রান্তিতে চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পাদরী খাবার টেবিল সাজানোর কাজে নিজেই লেগে পড়লেন; টেবিল সরালেন, ছুরি-কাঁটা বয়ে নিয়ে গেলেন। গোটা ঘর জুড়ে টেবিল পাতা হল। পাঁচ মিনিট পরে তিনি আর সেই ভবঘুরে যুবকটি মুখোমুখী টেবিলে বসলেন খেতে; দুজনের মাঝখানে এক গামলা কপির সুপ।

(৩)

খাবার সাজিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক যুবকটি খেতে সুরু করল। চামচেটা গামলার মধ্যে ডুবিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সে সুপ খেতে লাগলো। কিন্তু পাদরীর ক্ষিদে ছিল না। তিনি মসলা দিয়ে রান্নাকরা সুস্বাদু সুপ ধীরে-ধীরে চাখলেন; কিন্তু একটি রুটির টুকরোতেও হাত দিলেন না।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নামটা কী?

প্রশ্নটা শুনে যুবকটি হাসলো; খিদে মেটার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনটাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বোঝা গেল।

সে বলল: পিতৃ-পরিচয় অজানা। সেই জন্যে মাতৃবংশের পদবীতেই আমি পরিচিত। সেই পদবীটা কী, আশা করি তুমি নিজেই তা জান। আমার অবশ্য দুটি খ্রীশ্চান নাম রয়েছে। সে দুটি আমি তোমাকে বলতে পারি: ফিলিপি-আগষ্টি। নাম দুটো মোটেই আমাকে মানায় না।

পাদরীর মনে হল তাঁর গলার নলিটা বুজে আসছে। বিবর্ণ মুখটা তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ওই দুটো নাম তারা তোমায় দিয়েছিল কেন?

ভবঘুরে যুবকটি উদাসীনভাবে তার কাঁধ কুঁচকালো, বলল: সেটা তোমারই অনুমান করা উচিৎ। আমার মা যখন তোমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তখন সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে-ই আমার বাবা। আমার বয়স যখন পনের বা তার কাছাকাছি তখনও পর্যন্ত সে তা-ই বিশ্বাস করেছিল। ওই সময়ে তার কেমন যেন সন্দেহ হল, আমার চেহারার ওপরে তোমার চেহারার ছাপ রয়েছে। সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই নোংরা কুকুরটা তার পিতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার করে বসলো, সেই থেকেই আমার নাম হল দুটো। তোমাদের যে-কোন একজনের চেহারার সঙ্গে যদি আমার চেহারার কোন সাদৃশ্য না থাকতো, অথবা আমি যদি নাম-না-জানা তৃতীয় কোন কুকুরের ছেলে হতাম তাহলে আমি আজ ভাইকোঁ ফিলিপি-আগষ্টি দ্য প্রাভালেঁা নামে পরিচিত হতাম। তারপরে আমি অবশ্য নিজেই নতুন নাম নিয়েছি। সে নামটা হচ্ছে "দুর্ভাগা।"

তুমি এসব ঘটনা জানলে কেমন করে?

কারণ আমার সামনেই তারা বিষয়টা নিয়ে ঝগড়া করেছিল। আমি তোমাকে বলছি—একেই মানুষে সোজা ভাষায়, পরিচ্ছন্ন ভাষায় কথা বলা বলে। জীবন আসলে কী বস্তু এই সব থেকেই মানুষে তা বুঝতে পারে।

বিগত আধ ঘণ্টা ধরে পাদরী অনেক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এখন সেই যন্ত্রণা আরও বাড়লো, আরও নির্মমভাবে আঘাত করল তাঁকে। মনে হল তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। ভেতরের উত্তেজনাটা তাঁর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো; তাঁকে শেষ না করে সেই উত্তেজনা যেন থামবে না। ঘনটার নিছক বিবরণ শুনে এই উত্তেজনা ততটা বাড়ে নি, যতটা বেড়েছে বলার ধরণে; বিবরণটি বর্ণনা করার ভঙ্গিতে হতচ্ছাড়া লম্পটটা এমন একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যা অত্যন্ত ঘৃণা আর বিরক্তিকর। এবং তাঁর পুত্র বলে পরিচিত এই প্রাণীটির মধ্যে যে থাড়ি রয়েছে সেটি আবর্জনা স্তূপে ভরাট হয়ে রয়েছে, সুস্থ মনের পক্ষে সেই আবর্জনা প্রাণঘাতী বিষের মত বিপজ্জনক। আর এই তাঁর পুত্র। এখনও কেমন যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। তাকে পুত্র বলে স্বীকার করে নেওয়ার আগে আরও প্রমাণ চাই তাঁর—হ্যাঁ, আরও, যত

রকমের সম্ভাব্য প্রমাণ রয়েছে সব তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে সব জানতে হবে। সব শুনতে হবে, প্রতিটি যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাঁর ছোট ঘরটির চারপাশে যে অলিভ গাছের বন রয়েছে সেই গাছগুলির কথা আবার তাঁর মনে পড়ে গেল; আবার প্রার্থনা করার বাসনা জাগলো তাঁর। নিজের মনে-মনেই তিনি বললেন: ভগবান, এই বিপদ থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার কর।

ফিলিপ-আগষ্টি তার স্যুপ-এর পাত্রটি শেষ করে বলল; আর কিছু নেই?

ঘরের লাগোয়া একটি পাশে রান্নাঘর। পাদরীর হাঁক মার্গিরাইট শুনতে পেল না। তাঁর চেয়ারের পেছনে একটা চীনে পেটা-ঘড়ি ঝোলানো থাকতো। সেটা ঠুকে-ঠুকে মার্গিরাইটকে সাধারণতঃ তিনি ডাকতেন। চামড়ায় মোড়া ঘড়ি পেটানোর ছড়িটা নিয়ে মার্গিরাইটকে ডাকার জন্যে দু'তিনবার তিনি গোলাকার ধাতব পাত্রটির গায়ে আঘাত করলেন। ক্ষীণভাবে বেজে শব্দটি ক্রমশ জোরালো হ'তে হ'তে বিকট আকার ধারণ করল।

সাড়া দিল মার্গিরাইট। পাদরীর কাজটা যে তার ভাল লাগছে না তা তার মুখের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা গেল। আগন্তুকটির দিকে সে আড়চোখে তাকালো। বিশ্বাসী কুকুরের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির মতই সে কেমন যেন বুঝতে পেরেছিল তার মনিবের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। গলানো মাখন মেশানো মাছের ডিশ নিয়ে টেবিলের ওপরে বসিয়ে দিল সে।

মাছটাকে চমচে দিয়ে লম্বালম্বি দুভাগ করে পেছনের অংশ ছেলের প্লেটে ঢেলে দিলেন পাদরী।

সেই দুঃখের মধ্যেও গর্বের একটা স্বর বেরিয়ে এল পাদরীর কণ্ঠ থেকে; তিনি বললেন: এইমাত্র মাছটা আমি নিজে ধরে নিয়ে এলাম।

মার্গিরাইট সেই ঘরের ভেতরেই দাঁড়িয়েছিল।

পাদরী আদেশ দিলেন: ভাল মদ নিয়ে এস; সবচেয়ে ভাল সরেস মদ—ক্যাপ কোর্স-এর সাদা মদ।

মার্গিরাইট এমন একখানা ভাব দেখালো যেন সে পাদরীর নির্দেশ অমান্য করতে বদ্ধপরিকর। ফলে, বেশ কড়া স্বরেই তাঁকে আবার সেই নির্দেশ দিতে হল: যাও, যাও। মদ নিয়ে এস—দুটো বোতল।

কালেভদ্রে কোন অতিথিকে আপ্যায়ন করার সুযোগ এলে তিনি নিজেও একটা বোতল পান করতেন। ভাল মদের নাম শুনেই ছোকরার চোখ-মুখ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো: ওঃ, এ-মদ একেবারে পয়লা নম্বরের। এ-রকমের খাওয়া আমি অনেকদিন খাই নি।

মিনিট দুইয়েকের মধ্যেই দুটি বোতল নিয়ে মার্গিরাইট ফিরে এল, কিন্তু নরকের আগুনে দগ্ধ, ভস্মীভূত পাদরী আসল সত্যটা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে ওই দু'মিনিট দুটি শতাব্দীর মত দীর্ঘ মনে হয়েছিল।

বোতলের ছিপিগুলি খোলা হল। তখনও অজ্ঞাত আগন্তুকটির দিকে লক্ষ্য

রাথার উদ্দেশ্যে মার্গিরাইট সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল

পাদরী বললেন : এবার তুমি যেতে পার।

মনে হল সে যেন পাদরীর নির্দেশ শুনতে পায় নি।

পাদরী এবারে বেশ চটার ভান করেই চড়াগলায় বললেন : আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে বলেছি।

ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার্গিরাইট।

ছোকরাটি গোগ্রাসে মাছের ডিশ উজাড় করে ফেলল।

তার বাবা ক্রমবর্দ্ধমান বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁরই নিজের মুখের সাদৃশ্যে যে মুখটি তাঁরই সামনে সমস্ত খাবার গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে সেই মুখটিকে তিনি লক্ষ্য করছিলেন গভীর বিরক্তি আর অনুতাপের সঙ্গে। অবনতির ক্ষতগুলি কী গভীরভাবেই না সেই মুখের ওপরে কেটে-কেটে বসে রয়েছে। মাছের টুকরোগুলি মুখের মধ্যে পুরেও তিনি খেতে পারলেন না; ধীরে-ধীরে চিবোতে লাগলেন মাত্র। তাঁর গলা বুজে আসতে লাগলো। হাজার-হাজার প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ালো, তাদের মধ্যে আসল প্রশ্নটিকে তিনি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, যে প্রশ্নটির উত্তর তিনি পেতে চান। অবশেষে আস্তে-আস্তে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সে মারা গেল কিসে?

যক্ষ্মায়।

কতদিন ধরে সে ভুগেছিল?

প্রায় আঠারো মাস।

যক্ষ্মা হল কেন?

কেউ জানে না।

এর পরে কেউ কোন কথা বলল না। পাদরী আবার ভাবতে সুরু করলেন। তাঁর অজ্ঞতা তাঁর মনের ওপরে ভারি হয়ে বসলো। অনেক কিছু শোনার জন্যে বর্তমানে তিনি আগ্রহী। যেদিন তিনি তাকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা না করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিনের পর থেকে যেদিন সে মারা গেল সেইদিন পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত কাহিনী তিনি শুনতে চান। সত্যিকথা যে অনেক বছর ধরেই এসব কাহিনী শোনার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি ইচ্ছে করে আর সংকল্প নিয়েই তাঁকে এবং তাঁর অতীত জীবনের আনন্দময় দিনগুলিকে বিস্মৃতির অতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু এখন তার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর সবকিছু শোনার আকাঙ্খা হয়েছে তাঁর; এই আকাঙ্খার মধ্যে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল। প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমিকের কাছেই প্রতিহিংসার এই প্রবৃত্তি উজ্জ্বল।

মরার সময় নিশ্চয় সে একা ছিল না?

না, তখনও মা সেই লোকটার সঙ্গেই ছিল।

তার সঙ্গে? প্রাভালেঁার সঙ্গে?—একটু চমকেই প্রশ্নটি করলেন পাদরী।

এ-প্রশ্ন করছ কেন? হ্যাঁ, তারই সঙ্গে।

এখন বোঝা যাচ্ছে সেই মেয়েটি যে তাঁর সঙ্গে বঞ্চনা করেছে, প্রতারণা করেছে তাঁকে, সেই মেয়েটি তিরিশটি বছর তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বাস করেছে। তাঁর কম্পমান ঠোঁটের ওপরে পরবর্তী প্রশ্নটি তাঁর ইচ্ছাকে গ্রাহ্য না করেই ফুটে বেরোল: তারা কি সুখী হয়েছিল?

একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে ছোকরাটি উত্তর দিল: তা হয়েছিল বইকি। ঝগড়া-ঝাঁটি যে হোতনা সেকথা সত্যি নয়। মাঝখানে আমি না থাকলে তারা বেশ মিলেমিশেই থাকতে পারতো। মাঝখানে আমি পড়েই তাদের অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলাম।

একথা বলছ কেন?

সেকথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। আমার বয়স পনের বছর হওয়ার আগে পর্যন্ত সে জানতো আমি তারই ছেলে। কিন্তু লোকটা মূর্খ নয়। কারও সাহায্য না নিয়েই নিজে-নিজেই সে আমার চেহারার সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করে। তার পরেই এই ঝঞ্ঝাট। দেওয়ালের ফোকর দিয়ে আমি তাদের কথাবার্তা শুনতাম। তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার জন্যে সে মাকে দোষ দিত। মা বলত: এর জন্যে কি আমি দায়ী? তুমি বেশ ভালভাবেই জান যে তুমি যখন আমার সঙ্গে মেলামেশা সুরু করলে তখন আমি আর একজনের রক্ষিতা।

সেই আর একজন হচ্ছ তুমি—কথা শেষ করল ছোকরাটি।

ওঃ! তাহলে মাঝে-মাঝে তারা আমার সম্বন্ধে আলোচনা করতো?

করতো; কিন্তু একেবারে শেষে ছাড়া কোনদিনই আমার কাছে তারা তোমার নাম উচ্চারণ করে নি। মা তখন মৃত্যুশয্যায়। মা জানতে পেরেছিল ক'টা দিনের মধ্যে শেষ বিদায় নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে তাকে এবং তখনও পর্যন্ত তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করে নি।

আর তুমি···তুমি বেশ আগে থাকতেই জানতে পেরেছিলে যে তোমার মায়ের সামাজিক অবস্থাটা ঠিক রীতিসঙ্গত নয়?

তোমার কী মনে হয়? বোকা মর্কট আমি নই। আর ও-সব বিষয়ে তো নই-ই। এই পৃথিবীর সম্বন্ধে মানুষের যখন সামান্য মাত্র জ্ঞানও জন্মায় তখনই সে এই রকম একটা অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারে।

বেশ সহজভাবেই ছোকরাটি মদের সদ্ব্যবহার করতে লাগলো। তার চোখদুটি জ্বল-জ্বল করে উঠলো; এবং একটি অর্দ্ধভুক্ত মানুষ যেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে-ও সেইদিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। সব লক্ষ্য করলেন পাদরী; কিন্তু বাধা দিলেন না। তিনি ভাবলেন মাতাল হলে মানুষ তার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে; আর একবার আত্মসংযম হারালে তাকে দিয়ে সহজভাবে অনেক কথা বলানো যায়। বিশেষ করে সেইজন্যেই তিনি ছোকরাটির শূন্য গ্লাসটি

নিজের হাতে পূর্ণ করে দিলেন।

মার্গিরাইট মুরগী আর ভাত নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে সাজিয়ে দিল। তারপর তার মনিবের নোংরা অতিথির দিকে আবার তাকিয়ে দেখলো।

বেশ ঘৃণার সঙ্গেই সে বলল : ধর্মাবতার, লোকটা মাতাল হয়ে গিয়েছে। একবার দেখুন...

পাদরী বললেন : দয়া করে আমাদের একলা থাকতে দাও। তুমি এখান থেকে যাও।

দরজাটা বেশ জোরে বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার্গিরাইট।

পাদরী তাঁর অতিথির দিকে ফিরে তাকালেন : তোমার মা আমার সম্বন্ধে কী বলত বল দেখি?

যাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে চাই তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা যা বলি মা-ও তোমার সম্বন্ধে সেইজাতীয় সাধারণ কথাই বলতো; তোমার সঙ্গে ঘর করা সহজ নয়, তোমাকে সহ্য করা অনেক সময়েই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়; তুমি নানা রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্ন করে তার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলে এই রকম আর কি।

ওই রকম কথা কি প্রায়ই সে বলতো?

হ্যাঁ। মাঝে-মাঝে, আমি যাতে বুঝতে না পারি সেইভাবে সে রেখে-ঢেকে বলতো; কিন্তু আমি তা অনুমান করে নিতাম।

ওরা দুজনে তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতো?

প্রথম দিকে ভালই। তারপর থেকে খুব খারাপ। আমি আড়ি পাতছি বুঝতে পারলেই মা আমাকে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বার করে দিত।

কেমন করে সে সব দিক বজায় রাখতো?

কেমন করে? খুব সহজেই, বছর ষোল বা ওই রকমেরই একটা বয়সে আমি কিছুটা বিপথগামী হয়ে পড়েছিলাম। ওই দুটো নোংরা লোক তাই দেখে আমাকে একটা 'রিফরমেটরীতে' চালান করে দিল। তারপরে দুজনেই নির্ঝঞ্ঝাট।

এই বলে ছোকরাটি টেবিলের ওপরে তার কনুইদুটো রাখলো, গালদুটো টিপলো দুটো হাত দিয়ে। কিন্তু তার লক্ষ্যটা তখন কিন্তু মদের বোতলের দিকে। যে অদম্য প্রবৃত্তির তাড়ণা একটি মাতালকে রাশি-রাশি ফাঁকা বুলি আওড়াতে সাহায্য করে সেই রকম একটি প্রবৃত্তি তার মধ্যেও হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সে হাসলো, সেই হাসির মধ্যে একটা আকর্ষণ রয়েছে, একটা নারীসুলভ লাবণ্য রয়েছে; আর সেই সঙ্গে রয়েছে মানসিক বিকৃতির একটা ছাপ। সব দেখলেন, বুঝতে পারলেন পাদরী। তিনি যে কেবল বুঝতেই পারলেন তা নয়, তিনি এর লাবণ্যটুকুও অনুভব করলেন; ঘৃণ্য অথচ কপট; যেটা আগেই তাকে গ্রাস করেছে, ধ্বংস করে ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে

তাকে তার মায়ের মতনই মনে হল ; চেহারার দিক থেকে নয় ; কিন্তু ভাবের দিক থেকে, এত আকর্ষণীয়, এত অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক হাসির মধ্যে আকর্ষণ করার ক্ষমতা, মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করার ক্ষমতা যার এতটা জোরালো—যা দেখে তিনি তাঁর ঠোঁটদুটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আর নিজের সমস্ত কদর্যতা সে সেই ঠোঁটের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল ;—সেই মায়ের ভাবমূর্তি ছেলেটির মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল—ঠিক সেই সময়।

ছেলেটি তার কাহিনী সুরু করল ; 'রিফরমেটরী' ছাড়ার পর কি অদ্ভুত জীবনই না আমি যাপন করেছি। সেই কাহিনী শোনার জন্যে যে-কোন নামজাদা বড় ঔপন্যাসিকই আমাকে মোটা টাকা দিতে রাজি হবে। আমি তোমাকে জোর গলায় বলতে পারি আমার জীবনে যা ঘটেছে 'মনটিক্রিসটো' লিখতে গিয়ে ডুমা তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

একটু চুপ করে গেল সে। চিন্তাশীল মাতালের গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো তার মুখের ওপরে। তারপরে চিন্তা করে আবার সে বলতে সুরু করল : যাই করুক, ছেলেকে যদি তুমি কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাও তাহলে তাকে কোনদিন রিফরমেটরীতে পাঠিয়ো না। সেখানে সে অনেক খারাপ জিনিস শেখে। আমিও দু'একটা শিখেছিলাম ; কিন্তু তাতে লাভ হয় নি। একদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুর সঙ্গে আমরা ছিনতাই করার পরিকল্পনা নিলাম। আমরা সবাই একটু মাল টেনেছিলাম। ফোল্যাক ফেরিঘাটের কাছে বড় রাস্তায় আমরা অপেক্ষা করছিলাম। রাত তখন ন'টার কাছাকাছি। এমন সময় দেখলাম একখানা গাড়ী আসছে। গাড়ীর ভেতরকার সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। গাড়ীর মধ্যে ছিল ড্রাইভার, আর তার পরিজনবর্গ। মার্টিনোর লোক তারা ; সহরে গিয়েছিল ডিনার খেতে। আমি লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিলাম ; ফেরিঘাটের কাছে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গেলাম ; তার পরে ফেরিঘাটের নৌকোটাকে জলের দিকে দিলাম ঠেলে। গোলমালে ড্রাইভারের ঘুম ভেঙে গেল ; কোনরকম সন্দেহ না করেই সে তার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ী চলে গেল নদীর ভেতরে। গাড়ীর ভেতরে যতগুলি লোক ছিল ডুবে সব মারা গেল। আমার বন্ধুরা কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দিল। যতক্ষণ ধরে আমি মস্করা করছিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত হি-হি করে তারা হাসতে রাজি ছিল। অবশ্য আমরা কেউ ভাবতে পারি নি এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিছক আমোদ করার জন্যে লোকগুলির সঙ্গে আমরা একটু মস্করা করতে চেয়েছিলাম। আমার দিব্যি, এর জন্যে শাস্তি পাওয়া আমার উচিৎ হয়নি। যাই হোক, ওর চেয়েও অন্যায় কাজ পরে আমি করেছিলাম ; এবং পূর্বের ঘটনায় আমার ওপরে যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব কাহিনী বর্ণনা করে তোমার সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। আমি তোমাকে কেবল আমার একটি কৃতিত্বের কথা

বলব—সেইটি আমার শেষ কৃতিত্ব—এইজন্যে বলব যে সেটা শুনে তুমি খুশি হবে। প্রিয় বাবা, সেই কাজটি করে আমি তোমার ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছি।

আর খেতে পারলেন না পাদরী। ভীতিবিহ্বল চোখে তিনি তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন মাত্র।

ছেলেটি তার কাহিনী সুরু করতে যাবে এমন সময় তার বাবা বাধা দিলেন; এক মুহূর্ত তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি ঘুরে সেই চিনে ঘণ্টা বাজালেন; সঙ্গে-সঙ্গে মার্গিরাইট হাজির হল। এত কড়া ভাষায় তিনি নির্দেশ জারি করলেন যে বেচারি ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

বাতিটা আন; সেই সঙ্গে বাকি খাবারটুকুও নিয়ে এস। তারপরে আমি না ডাকলে আর এদিকে এস না।

সে বেরিয়ে গেল; সময় নষ্ট না করেই নিয়ে এল সবুজ ঢাকনি দেওয়া সাদা পোরসিলিনের বড় বাতিদান; সঙ্গে নিয়ে এল একটা বড় টুকরো পনীর, কিছু ফল; সেগুলি টেবিলের ওপরে রেখে সে বিদায় নিল।

পাদরী দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে বললেন: এখন আমি তৈরী। চালিয়ে যাও।

ছেলেটি কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে ফল-মিষ্টি খেল; তারপরে এক গ্লাস মদ ঢেলে নিল। পাদরী মদের গ্লাস প্রায় ছোঁন নি বললেই হয়; তবুও মদের দ্বিতীয় বোতলটিও প্রায় শেষ হয়ে এল। ভরপুর খাবার আর প্রচুর মদ খাওয়ার পরে ছেলেটির কথায় জড়তা নেমে এল। গল্প বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে তার কথা জড়িয়ে যেতে লাগলো।

যা বললাম—এটি আমার শেষ···উত্তেজনায় ভরপুর···আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি; এবং বাড়িতেই রয়েছি, কারণ দুজনেই আমাকে বেশ ভয় পেয়েছিল ····হ্যাঁ··· ভয়ই তারা পেয়েছিল আমাকে দেখে। আমাকে চটানো কারও উচিৎ নয়; যে চটায় সে মহামূর্খ···চটে গেলে আমি কী করে ফেলি তার ফলাফল আমি গ্রাহ্যই করি নে। তুমি জান, তারা একসঙ্গে বাস করত, তবু তাদের মধ্যে মিল ছিল না। লোকটির বাড়ি ছিল দুটো—একটা সিনেটরের, একটা তার রক্ষিতার। কিন্তু আমার মাকে ছেড়ে সে থাকতে পারত না বলেই বেশীর ভাগ সময়ই সে মায়ের সঙ্গে কাটাতো। আমার মা-ও ছিল খুব ধূর্ত। যে সব মহিলারা পুরুষকে কব্জা করে রাখে মা ছিল সেই জাতের। সেই লোক-টাকে—তার দেহ আর আত্মা দুটোকেই—মা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিল; এবং তার শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই মুঠো সে আলগা করে নি। পুরুষ মানুষরা কী মূর্খ! যাই হোক, আমি তখন বাড়িতে; আমাকে যাতে তারা ভয় করে চলে সেই উদ্দেশ্যে আমি ভীমবেগে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি তোমাকে—আমি সেইজাতীয় মানুষ প্রয়োজন হলে যে যে-কোন পথ নিতে পারে, এবং জোর করে মানুষকে দিয়ে করাতে পারে যে কোন কাজ।

আমি কাউকে ভয় করি নে; মা অসুখে পড়লো। সে মিলাঁর কাছে একটা সুন্দর বাড়িতে তাকে রাখলো। বনের মত বিরাট একটি পার্কের মাঝখানে এই বাড়িটি। সেখানে মা আঠারো মাস ছিল। তার পরে আমরা বুঝতে পারলাম তার দিন ঘনিয়ে আসছে। প্রাভালেঁা প্যারিস থেকে রোজ তাকে দেখতে আসতো। মায়ের অবস্থা দেখে সত্যিই সে বড় দুঃখ পেয়েছিল। সেই দুঃখের মধ্যে কোন খাদ ছিল না। একদিন সকালে তারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা বলছিল। এত দীর্ঘ সময় ধরে কী ব্যাড়ব্যাড় করে তারা বকছে বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম; এমন সময় তারা আমাকে ডাকলো। মা আমাকে বলল:

আমি শীগগীরই মারা যাব। একটা গোপন কথা তোমাকে আমি বলতে চাই; যদিও কাউন্ট চান না সেকথা আমি তোমাকে বলি। তোমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর নাম আমি তোমাকে বলছি।

আমার বাবার নাম বলার জন্য অনেকবার তাকে আমি অনুরোধ করেছি... এবং মা কোনদিনই তা বলতে চায় নি। মনে হয় এই নামটা বলার জন্যে একদিন তার কানে আমি একটা ঘুষি মেরেছিলাম; কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। আমাকে এড়ানোর জন্যে মা আমাকে বলেছিল যে তুমি কপর্দকহীন অবস্থায় মারা গিয়েছ, তুমি নাম করার মত কেউ নও; কৈশোরে ভুল করে তোমার সঙ্গে মা মিশেছিল, সেই মেশার মধ্যে গভীরতা কিছু ছিল না। ব্যাপারটা মা এতই স্বচ্ছন্দভাবে বলে যেত যে আমি তার কথা বিশ্বাস না করে পারি নি। তুমি যে মৃত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

মা বলল: তোমার বাবার নাম—

প্রাভালেঁা আরাম কেদারায় বসে ছিল; সে তিনবার এইভাবে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে উঠলো, রোসেটি, তুমি ভুল করছ; তুমি ভুল করছ; তুমি ভুল করছ।

মা বিছানার ওপরে উঠে বসলো। আমি এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি; তার চোখ দুটো জলজল করে উঠলো। আমি যাই কিছু করে থাকি না কেন মা আমাকে বড় ভালবাসত। সেই কথা শুনে মা বলল: তাহলে ফিলিপি, ওর জন্যে কিছু কর।

এই কথা শুনে কাউন্ট পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো: ওই হতচ্ছাড়াটার জন্যে? ওই হতভাগা জেল-ফেরত আসামীর জন্যে...ওই...

আমাকে উদ্দেশ্য করে এত নাম সে খুঁজে বার করল যে আমার মনে হল সারা জীবন ধরেই এই সব নামগুলো সে সংগ্রহ করে রেখেছে সময়মত কাজে লাগানোর জন্যে।

আমি একটু বিরক্তই হচ্ছিলাম; কিন্তু আমার মা আমাকে শান্ত থাকতে বলল। তারপরে কাউন্টকে লক্ষ্য করে বলল: তুমি ওকে অনাহারে মেরে ফেলতে চাও? তুমি জান ওকে দিয়ে যাওয়ার মত কিছুই আমার নেই।

কাউণ্ট কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়েই বলল: রোসেটি, তিরিশ বছর ধরে তোমাকে বছরে আমি পঁয়ত্রিশ ফ্রাঁ করে দিয়েছি। সব শুদ্ধ মিলিয়ে প্রায় এক মিলিয়ন ফ্রাঁর মত। তুমি যে ধনী মহিলার মত জীবন কাটাতে পেরেছ, যা চেয়েছ তাই যে জীবনে তুমি পেয়েছ এর জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দাও। যে হতভাগাটা আমাদের শেষের ক'টা বছর জীবন বিষময় করে তুলেছে তার আমার কাছে কোন দাম নেই; তাকে আমি একটি ফার্দিঙ-ও দেব না। এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। ইচ্ছে হলে ওকে ওর বাবার নাম বলতে পার। যদিও আমি তা চাইনে; কিন্তু এবিষয়ে আমার করণীয় আর কিছু নেই।

তখন মা আমার দিকে মুখ ঘোরালো। আমিও মনে-মনে ভাবছিলাম: ঠিক আছে। আমার আসল বাবা কে তাই এখন আমি জানতে পারব। যদি তার টাকা থাকে তাহলে আমি বেঁচে যাব।

মা বলল: তোমার বাবার নাম ব্যারণ দ্য ভিলবয়; টৌলনের কাছে প্যারানডুর-এর পাদরী—এখন তাঁর নাম পাদরী ভিলবয়। তিনি আমাকে ভালবাসতেন। তাঁকে ছেড়ে আমি কাউণ্টের আশ্রয়ে এসেছি।

তার পরে মা আমাকে সমস্ত ঘটনা বলে। মা অবশ্য একটা কথা আমাকে বলে নি, সেটা হচ্ছে ছেলের পিতৃত্ব নিয়ে তোমাকে বোকা বানানোর কাহিনী। মেয়েরা মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু নয়, তুমি জান, তারা কোনদিন পুরো সত্যি কথা বলতে পারে না।

সে একটু উপহাসের হাসি হাসলো; তার উক্তি কতটা কদর্য সেটা সে বুঝতেও পারলো না। তারপর, মুখের ওপরে আমোদের ছটা ফুটিয়ে সে আবার বলতে সুরু করল: তারই দুদিন পরে মা মারা গেল—দুদিন পরে, কাউণ্ট আর আমি দুজনে কফিনের পিছু-পিছু কবরখানায় গেলাম। খুব মজার, তাই না? কাউণ্ট আর আমি? এবং সঙ্গে তিনটি চাকর। এই সব। কাউণ্ট গরুর মত কাঁদতে লাগলো। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। যে কোন লোক দেখলেই ভাবতো আমরা বাবা আর ছেলে। তারপরে আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। আমরা দুজনে, একা। নিজের মনে-মনেই ভাবছিলাম এবার আমাকে চলে যেতে হবে। আমার পকেটে ছিল মাত্র পঞ্চাশটি ফ্রাঁ, আর একটি ফার্দিঙ-ও নয়। কাউণ্টের ওপরে কেমন করে প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই কথাই ভাবছিলাম, কাউণ্ট আমার হাতের ওপরে চাপ দিয়ে বলল: তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

আমি তার সঙ্গে অফিসঘর পর্যন্ত গেলাম। একটি চেয়ারের ওপরে বসে চোখের জল মুছে সে বলল: তোমার মাকে যা বলেছি ততটা নিষ্ঠুর তোমার ওপরে আমি নই। সে আমাকে অনুরোধ করল আমি আর যেন তাকে জ্বালাতন না করি। সে আমাকে এক হাজার ফ্রাঁ ব্যাঙ্ক নোট দিল। আমার

মত মানুষের কাছে হাজার ফ্রাঁ কতটুকু? আমি লক্ষ্য করলাম তার ড্রয়ারে ওরকম হাজার হাজার ফ্রাঁর নোট স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। সেই সব নোটের তাড়া দেখে আমার একবার মনে হয়েছিল একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিই। যে নোট সে আমায় দিতে চাইল সেই নোট নেওয়ার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম। কিন্তু ভিক্ষে নেওয়ার পরিবর্তে আমি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেঝেতে ফেলে দিলাম; তার গলা টিপে ধরলাম; তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। যতক্ষণ না সে মৃতপ্রায় হয়ে গেল ততক্ষণ আমি তাকে ছাড়ি নি। তারপর আমি তার মুখ বন্ধ করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম, তার পোশাক খুলে নিয়ে মুখটা মাটির দিক করে উলটিয়ে দিলাম। হা-হা-হা। তোমার ওপরে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছি, কেমন।

ফিলিপি-আগষ্টির গলা হাসির দাপটে বন্ধ হওয়ার উপক্রম করল। সে সুরু করল কাশতে। একটা নিষ্ঠুর আনন্দে তার নিচের ঠোঁটটা বেঁকে গেল। আবার পাদরী ভিলবয়ের অতি পুরনো যুগের একটি নারীর বাঁকা হাসির কথা মনে পড়ে গেল। সেই হাসি দিয়ে নারীটি তার সর্বনাশ করেছিল। ছেলেটির হাসিটি কোন্ জাতীয় তা বুঝতে তাই তাঁর কোন অসুবিধে হল না।

এবং তারপর?

তারপর—হা-হা-হা! চিমনীতে বিরাট একটা আগুনের চুল্লী ছিল। মাসটা হল ডিসেম্বর—কনকনে ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডাতেই মা মারা গেছলো। আমি আগুন খোঁচানোর একটা লোহার ডাণ্ডা আচ্ছা করে সেই আগুনে পুড়িয়ে লাল করে ফেললাম। তারপর সেই ডাণ্ডাটা নিয়ে তার বুকে পিঠে আট নয়-দশ....অনেকগুলো ক্রশ চিহ্ন এঁকে দিলাম। বেশ একটা ভাল ঠাট্টা, তাই না বাবা? প্রাচীনকালে কয়েদীদের এইভাবেই তারা চিহ্নিত করতো। ইল মাছের মত সে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো; কিন্তু চেঁচাতে পারলো না। তার মুখটা আচ্ছা করে আমি বেঁধে রেখেছিলাম। তারপর আমি বারোটা হাজার ফ্রাঁর ব্যাঙ্ক নোট তুলে নিলাম। নিজেরটা নিয়ে হল মোট তেরটা; আমার পক্ষে সংখ্যা অশুভ। তারপরেই আমি বেরিয়ে গেলাম—যাওয়ার সময় চাকরদের বলে গেলাম সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন; ডিনারের আগে কেউ যেন তাঁকে ডেকে বিরক্ত না করে। ভেবেছিলাম সিনেটার হওয়ার ফলে কেলেঙ্কারীর ভয়ে সে মুখ খুলবে না। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। চার দিন পরে প্যারিসের একটা রেস্তোঁরায় পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল; তিন বছরের জন্য জেলে ঢুকলাম আমি। সেই জন্য তোমাকে খুঁজে বার করতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল আমার।

আর একপাত্র সে গলায় ঢাললো। জিবের জড়তা তার এতটা বেড়ে উঠলো যে পুরো কথা সে চেষ্টা করেও বলতে পারল না; ভাঙা-ভাঙা কথায় বলল: তাহলে পিতা—আমার সম্মানিত পিতা....গির্জার পাদরীকে বাবা

হিসাবে পাওয়া কী হাসির ব্যাপার! হা-হা! আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহারটা ভাল করতে হবে—আমার মত ক্ষুদে মানুষটির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে; কারণ আমি সাধারণের কিছু বাইরে। এবং তাকে আমি শাস্তি দিয়ে এসেছি···উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এসেছি···বেচারা বুড্ডা···

যে নারীটি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল তার মুখোমুখী হয়ে যেমন একদিন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়েছিলেন এই ঘৃণ্য জন্তুটিও আচার আর ব্যবহারে পাদরী ভিলবয়কে তেমনি ক্রোধোন্মত্ত করে তুলল। স্বীকারোক্তির রহস্যের মাধ্যমে তাঁর কানের কাছে যারা ফিস-ফিস করে নিজেদের পাপের কাহিনী বলেছে, অথবা নিজেদের বীভৎস গোপন কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছে, ভগবানের নাম করে তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে নিজের ক্ষেত্রে তিনি নির্মম; ক্ষমা করার কথা তিনি চিন্তাও করেন না। দয়ার, নিরাশ্রয়ের, অথবা সহানুভূতির দেবতার কৃপা আর তিনি চাইলেন না; কারণ, তিনি জানতেন যে যারা এই রকম ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের শিকার তাদের এই পৃথিবীতে ভগবান অথবা মানুষ কেউ বাঁচাতে পারে না। তাঁর সহজে উত্তেজক হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাস, তাঁর অগ্নিগর্ভ প্রবৃত্তির ক্রোধ পাদরীর পদ গ্রহণ করার পরে যেগুলিকে তিনি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সেইগুলিই অদম্য শক্তিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করল তাঁর পুত্র বলে পরিচিত সেই হতচ্ছাড়াটার বিরুদ্ধে, যে কেবল তার বাবার সাদৃশ্য নিয়েই জন্মায় নি, মায়ের সাদৃশ্য নিয়েও জন্মেছে—সেই অনুপযুক্ত মা যে তার নিজের চরিত্রটি তার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে তার বিরুদ্ধে, সেই দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে যে দুর্ভাগ্য তার মত বদমাইসকে তার বাবার সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে যেমন করে কামানের গোলাকে ক্রীতদাসের পায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সেই অসহনীয় দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার চাপা ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। পঁচিশ বছর ধরে যে স্বপ্নময় বদান্যতা আর শান্তির মধ্যে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে এই ধাক্কা তাঁকে জাগিয়ে দিল; তিনি বাস্তবের মুখোমুখী এসে বীরের মত দাঁড়ালেন, এবং ভবিষ্যৎটাও বেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এই গুণ্ডাটার সঙ্গে বেশ শক্ত হাতে বোঝাপড়া করতে হবে; এবং গোড়াতেই তাকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে। প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর চোয়ালগুলি সঙ্কুচিত হল। লোকটা যে মাতাল সেকথা ভুলে গিয়ে তিনি বললেন: তুমি তোমার সব কথা বলেছ। এবারে আমার কথা শোন। কাল সকালেই এ গ্রাম ছেড়ে তুমি চলে যাবে। কোথায় তুমি যাবে তা আমি ঠিক করে দেবো, আর আমার হুকুম না পেলে সেখান থেকে তুমি কোথাও যাবে না। যাতে তুমি ভালভাবে থাকতে পার তার জন্যে তোমাকে আমি উপযুক্ত মাসোহারা দেব। মাসোহারার পরিমাণ সামান্যই। আমি নিজেই দরিদ্র। যদি কখনও কোন বিষয়ে তুমি অবাধ্য হও, আমি তোমার মাসোহারা বন্ধ করে দেব; এবং তোমার সঙ্গে তখনই আমার

ব্যক্তিগত বোঝাপড়া হবে।

মদ খেয়ে সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সত্যি কথা ; তবু বিপদটা সে বুঝতে পারলো। তার ভেতরে যে পাপীটা এতক্ষণ লুকিয়ে বসেছিল সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল। রাগে গর-গর করে কাশতে-কাশতে সে কথাগুলি থুথুর মত ছিটিয়ে দিল ; না বাবা, তা তুমি করতে পার না। তুমি হচ্ছ গির্জার পাদরী ; আমি তোমাকে পেয়েছি ; আমার মুঠোর মধ্যে তুমি—আর সবাইকার মত তুমিও ছোট হয়ে যাবে।

কাজ সুরু করলেন পাদরী। তাঁর বৃদ্ধ অথচ প্রচণ্ড শক্তিশালী পেশীতে একটি অপরাজেয় শক্তি অনুভব করলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে হল সেই দানবটিকে ধরে ডালের মত বাঁকিয়ে দেন ; এবং তাকে বুঝিয়ে দেন যে বশ্যতা তাকে স্বীকার করতেই হবে। টেবিলটা ধরে তিনি নাড়া দিলেন, এবং সেই ভবঘুরের মুখের ওপরে সোজাসুজি তাঁর কথাগুলি ছুঁড়ে মারলেন : সাবধান, খুব সাবধান ; আমি আবার বলছি...কোন মানুষ...

মাতালটি তার শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে চেয়ারের এপাশ থেকে আর একপাশে দুলতে লাগলো। সে বেশ বুঝতে পারলো এবারে সে পড়ে যাবে ; সে আরও বুঝতে পারলো সে পাদরীর হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। বিপদ বুঝতে পেরে টেবিলের ওপরে যে ছুরিটা পড়ে ছিল সেটা তুলে নেওয়ার জন্যে সে হাত বাড়ালো। পাদরী স্পষ্ট দেখতে পেলেন তার চোখ দুটো হত্যার নেশায় জ্বলজ্বল করছে। তিনি তাকে হাত বাড়াতে দেখেই টেবিলটা ধরে এত জোরে ঝাঁকানি দিলেন যে তাঁর ছেলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাতিটা গেল উলটে ; গোটা ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। মদের গ্লাসের ঠুনঠুন শব্দ শোনা গেল ; সেই শব্দ কয়েক মিনিট ধরে ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। তারপরে একটা খসখস শব্দ উঠলো ; মনে হল যেন একটা নরম দেহ শান বাঁধানো মেঝের ওপরে গুঁড়ি দিয়ে হাঁটছে। এবং তার পরে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বাতিটা নিবে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি অপ্রত্যাশিতভাবে এত নিটোল অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে দুজনেই ভয়ে নীল হয়ে গেল ; যেন সত্যিই কোন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাতালটা দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি দিয়ে পড়ে রইল ; নড়াচড়া করল না আদৌ। পাদরী তাঁর চেয়ারের ওপরে বসে রইলেন। গভীর রাত্রির মধ্যে তিনি ডুবে গেলেন ; তারই ফলে তাঁর রাগ প্রশমিত হল। অন্ধকারের যে কালো যবনিকাটি তাঁর উপরে পড়ল তাতে তাঁর মারমুখী প্রবৃত্তিগুলি শান্ত হল। ধীরে-ধীরে অন্য চিন্তাগুলি তাঁকে গ্রাস করে ফেলল—বোঝা যায় না, চেনা যায় না এই রকমের অন্ধকারাচ্ছন্ন আর বিষণ্ণ চিন্তার দল।

নিস্তব্ধতা। দেওয়াল-ঘেরা বদ্ধ কবরের মত সেই নিস্তব্ধতা—যাকে ভেদ করা

যায় না : মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা, বাইরে থেকে কোন শব্দ এল না। দূর থেকে গাড়ীর চলন্ত চাকার শব্দও না, কুকুরের ডাক, এমন কি অলিভ গাছের পাতার ভেতর দিয়ে অথবা দেওয়ালের পাশ ঘেঁসে যে বাতাস বয় তারও কোন শব্দ না।

এই নিস্তব্ধতা অনেকক্ষণ ধরে একটানা রয়ে গেল—বোধ হয় এক ঘণ্টার মত। তারপর হঠাৎ চীনে ঘণ্টাটা বেজে উঠলো। একবার মাত্রই বাজলো, মনে হল ঘণ্টার গায়ে যেন একটা শক্ত, ধারালো জোরালো আঘাতের ফলে শব্দটা হয়েছে। সেই সঙ্গে একটা কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হল ; মনে হল, চেয়ার উলটে কেউ যেন পড়ে গিয়েছে।

মার্গিরাইট সব সময়ে সতর্ক হয়ে বসেছিল। ঘণ্টার শব্দ শুনেই রান্না ঘর থেকে সে দৌড়ে এল। কিন্তু খাবারের ঘরের সামনে আসতেই চারপাশে বিকট অন্ধকার দেখে সে ভয়ে পিছিয়ে গেল। ভীষণ ভয় পাওয়ায় তার বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল ; ভয়ে কেঁপে উঠলো তার স্বর ; কোন রকমে হাঁপাতে-হাঁপাতে সে ডাকলো : ধর্মাবতার, আপনি এখানে রয়েছেন ? কথা বলুন।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ঘরের মধ্যে কেউ নড়াচড়াও করল না।

সে ভাবলো : হায় ভগবান! ওরা এই অন্ধকারে করছে কী ? কী হল ওদের।

এগোনোর বা আলো আনার জন্যে রান্না ঘরের দিকে যাওয়ার সাহস হল না তার। তার শরীর কাঁপতে লাগলো। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সে সব কিছু তখন দিতে পারতো। সেখান থেকে চীৎকার করতে-করতে দৌড়ে পালাতে পারলে সে যেন বেঁচে যেত। সে কেবল বারবার আওড়াতে লাগলো : ধর্মাবতার, আপনি ওখানে ? কথা বলুন। আমি মার্গিরাইট।

তারপর ভয় সত্ত্বেও মনিবকে সাহায্য করার জন্যে একটি হঠাৎ আর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার হল। এই সব ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে মহিলাদের মনে ভয়ের মধ্যে যে হঠাৎ সাহস জেগে উঠে তাদের বীরত্বজনক কাজ করার জন্যে উৎসাহিত করে, তার মনেও সেই রকম একটি সাহস দেখা দিল। রান্নাঘরে দৌড়ে গিয়ে সে একটি 'আলো নিয়ে ফিরে এল। খাবার ঘরের দরজার সামনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। প্রথম যে জিনিসটি তার চোখে পড়লো সেটি আর কেউ নয়—সেই অপরিচিত লোকটি। দেওয়ালের কোল ঘেঁসে লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে। হয় সে ঘুমোচ্ছে, অথবা ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে। তারপরেই তার নজর পড়ল ওলটানো বাতিদানটির ওপরে। এবং শেষ কালে টেবিলের নিচে সে পাদরীর হাত আর পা দুটি দেখতে পেল। পায়ে কালো জুতো আর মোজা পরা। মনে হল ঘণ্টার গায়ে খুব জোরে তাঁর মাথা ঠুকে যাওয়ার ফলে জ্ঞান হারিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েছেন।

সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো মার্গিরাইট-এর।

সে বারবার বলতে লাগল : হায় ভগবান, হায় ভগবান! একী হল, একী হল?

ভয় পেয়ে ধীরে-ধীরে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা হড়হড়ে জিনিসের সংস্পর্শে আসতেই তার পা হড়কিয়ে গেল। প্রায় পড়তে-পড়তে সামলে গেল সে। নীচু হয়ে সে লালচে দাগটিকে পরীক্ষা করল। তার পায়ের চারপাশে তরল লালচে রঙ-এর ক্ষীণ স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে। ওটা রক্ত।

সে বাতিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল; যেন আর কিছু তার চোখে না পড়ে। ভয়ে সম্বিৎ হারিয়ে সে ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল একেবারে মাঠের মধ্যে। সেখান থেকে সে গাঁয়ের দিকে ছুটলো। অন্ধ আবেগে ছুটতে গিয়ে সে অলিভ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেল। থামলো না; চীৎকার করতে-করতে সে গাঁয়ের দিকে ছুটলো। তার সেই চীৎকার অন্ধকারের বুক চিরে দূর-দূরান্তে মিশে গেল : ডাকাত ডাকাত।

এইভাবে চীৎকার করতে-করতে সে যখন গ্রামের সীমানায় হাজির হল তখন ভীত চকিত হয়ে গাঁয়ের লোকেরা তাদের ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তার চার পাশে জড় হল। কিন্তু তখন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে; এবং তারই ফলে তাদের কোন প্রশ্নেরই কোন উত্তর দিতে পারল না। একটা ভয়ঙ্কর ভয়ে তখনও সে কাঁপছে। তার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা থেকে তারা বুঝতে পারল যে অলিভ বনে পাদরীর যে ঘর রয়েছে সেখানে কোন অঘটন ঘটেছে। এইটুকু বুঝতে পেরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা ছুটলো পাদরীর বাড়ির দিকে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে।

পাদরীর কটা রঙের কুটির ছিল অলিভ গাছের বাগানে; কিন্তু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আর নিস্তব্ধ রাত্রিতে বাড়িটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটি চোখ বুজে যাওয়ার মত, জানালার একটি মাত্র নিঃসঙ্গ প্রদীপ নিবে যাওয়ার ফলে ঘরটি ছায়ায় ভরে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল নিটোল অন্ধকারে। ওই অঞ্চলের একটি মানুষ ছাড়া সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ঘরটিকে খুঁজে বার করা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। একটু পরেই দেখা গেল অলিভ গাছের বনের ভেতর দিয়ে কতকগুলি লণ্ঠন বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা হলদে আলোর রশ্মিগুলি শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে। সেই বিকৃত ছড়ানো আলোর মধ্যে অলিভ গাছের গ্রন্থিযুক্ত গুড়িগুলিকে দৈত্যের মত বলে মনে হল, তাদের জড়ানো ডালপালাগুলোকে দেখে মনে হল নারকীয় সাপের মত। আলোর রশ্মিগুলি যতদূর পর্যন্ত এগোতে পারলো তাদের প্রান্তসীমায় অন্ধকারের বুক থেকে ভূতুড়ে একটি মূর্তি জেগে উঠলো; তারপরেই লণ্ঠনের আলোতে নিচু দেওয়াল-ঘেরা কটা রঙের বাড়িটি চোখে পড়লো। এই লণ্ঠন-

গুলি নিয়ে আসছিল গ্রামের চাষীরা, সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল রিভলভারধারী দুটি পুলিশ আর আঞ্চলিক মেয়রকে। মার্গিরাইট তাদের সঙ্গে ছিল; দুপাশে ধরে তাকে তারা বয়ে নিয়ে আসছিল; যে-কোন মুহূর্তে সে মাটিতে পড়ে যেতে পারতো। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। উঁকি দিয়ে দেখল সেই ভয়াবহ অন্ধকার যেন হাঁ করে সবাইকে গিলতে আসছে। শেষ পর্যন্ত সার্জেণ্ট একটা লণ্ঠন নিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকলো; অন্য সবাই তার পিছু নিল।

মার্গিরাইট-এর কাহিনী সত্যি। জমাট বাঁধা রক্ত কার্পেটের মত মেঝের ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। রক্তটা ফিলিপ-আগষ্টির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তার একটা হাত আর একটা পা সেই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে।

বাপ আর ছেলে দুজনেই ঘুমোচ্ছে।

পাদরীর গলাটা কাটা। ছোকরাটি মত্ত অবস্থায় ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বাবা অনন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

দুজন পুলিশ ছেলেটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত দুটোতে বেড়ী পরিয়ে দিল। ছোকরাটা জেগে ওঠারও সময় পেল না। ঘুম থেকে জেগে উঠে সে চোখ ঘষতে লাগল। তখনও সে মদের নেশায় আচ্ছন্ন। পাদরীর মৃতদেহ দেখে সে ভয় পেয়ে গেল, হতভম্ব হয়ে বসে রইল চুপচাপ।

মেয়র জিজ্ঞাসা করলেন: লোকটা পালিয়ে গেল না কেন?

সার্জেণ্ট বলল: মদে চুর হয়ে আছে। পালাবে কেমন করে?

সবাই তার সঙ্গে একমত। একবারও কারও সন্দেহ হল না যে পাদরী হয়ত আত্মহত্যা করেছেন।

মাদাম তেলিয়ার-এর বাড়ি

[The House of Madame Tellier]

প্রতিদিন সন্ধ্যা প্রায় এগারটা নাগাদ মাদাম তেলিয়ারের বাড়ি যাওয়া কেমন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। মনে হোত বাড়িটা যেন একটা কাফে। অনেকেই সেখানে আসা-যাওয়া করত বটে; তবে নিয়মিতভাবে আসত সাত থেকে আটজন খদ্দের। চরিত্রের দিক থেকে তারা মোটেই মাতাল বা উচ্ছৃঙ্খল নয়; বরং তারা সবাই সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার; কেউ-কেউ আবার সহর থেকে আগত কিছু যুবক। তারা আসত; ধীরে-ধীরে মদের গ্লাসে চুমুক দিত, মেয়েদের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করত, কিম্বা গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে বসে-বসে শান্তভাবে গল্প করত। গৃহকর্ত্রীকে সব সময়েই তারা বেশ সম্মানের চোখেই দেখত। যুবকদের বাদ দিয়ে বাকি সবাই মধ্য রাত্রির

আগেই বাড়ি ফিরে যেত; যুবকরা মাঝে-মাঝে আরও কিছুক্ষণ থাকত। বাড়িটির ভেতরে একটা বেশ ঘরোয়া ভাব ছিল। অবয়বের দিক থেকে বাড়িটিকে ক্ষুদ্রায়তনই বলা যায়—রঙ ছিল এর হলদে—সেন্ট এতিয়েন-এর গির্জার পেছনে রাস্তার একটি কোণে এই বাড়িটি। এর কয়েকটি জানালা খোলা থাকত জাহাজ-ঘাটার দিকে; মাল খালাস করানোর জন্যে জাহাজগুলি লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকত এখানে; আর কয়েকটি জানালার মুখ ছিল লবণ হ্রদটির দিকে; হ্রদের একপাশে লা ভার্জের পাহাড় আর পাহাড়ী গির্জা। এই বাড়িটির স্বত্বাধিকারিণী ইয়োর বংশের সম্ভ্রান্ত চাষীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। সে যে এই বিশেষ ব্যবসাতে নেমেছিল তার পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল না; মেয়েদের জন্যে টুপি লেস-ফিতের দোকান-ও সে করতো। অথবা বস্ত্র-ব্যবসাতে নামতেও কোন রকম আপত্তি ছিল না তার। ব্যবসা একটা করা নিয়ে কথা। সহরে পতিতাবৃত্তিকে সবাই ঘৃণা করত; এই পেশার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্বেষ ছিল অনেক গভীর; কিন্তু নর্মাণ্ডির সহর থেকে দূরে এই সব গ্রামাঞ্চলে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের তেমন কোন বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যেত না।

এখানে যে-সব মেয়েরা থাকত তাদের বাবারা সব দরিদ্র চাষী। তারা বলত—এ-ব্যবসাতে পয়সা আছে। এই বলেই বাপেরা যেমন তাদের যুবতী মেয়েদের বোর্ডিং-হাউসে পাঠায় তারাও সেই রকম তাদের যুবতী মেয়েদের এই পতিতালয়ে পাঠাতো।

এই বাড়িটি মাদাম তার একটি বৃদ্ধ কাকার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। জবেত্যেভ-এর কাছে মাদাম আর তার স্বামী এর আগে সরাইখানা চালাতো। ফিক্যাম্প-এর ব্যবসা থেকে অনেক লাভ হবে এই আশা করে তারা তাদের সরাইখানাটা বেচে দিল। তারপরে একদিন সকালে তারা ফিক্যাম্পে এসে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব গ্রহণ করল। স্বত্বাধিকারীর অভাবে ব্যবসাটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। তেলিয়ার দম্পতির যোগ্যতা ছিল অনস্বীকার্য। অনতিবিলম্বেই তারা তাদের কর্মচারী আর প্রতিবেশীদের প্রীতি আর শুভেচ্ছা অর্জন করল। দু'বছর পরে মৃগীরোগে স্বামীটি মারা গেল। নতুন ব্যবসাটিতে শরীর না নাড়িয়েই সে তোফা আরামে দিন কাটিয়েছে। ফলে, অস্বাভাবিক-ভাবে তার মেদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের শিকার হল সে।

বিধবা হওয়ার পর থেকে মাদাম তেলিয়ারের জন্যে তার খদ্দেররা বৃথাই শোক করেছিল। দুর্ভেদ্য চরিত্রের মানুষ বলে মাদামের সুনাম ছিল যথেষ্ট এমন কি তার বাড়ির যুবতীরাও কোনদিন বাইরে কারও সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে তাকে দেখে নি। মাদামের শরীরটি ছিল দীর্ঘ, মোটা, গোলগাল এবং আকর্ষণীয়। তার ঘরটিতে আলো আর হাওয়া দুটিরই অভাব ছিল বেশ। মুখের রঙ তার স্বাভাবিক সতেজ ভাবটা হারিয়ে ফেলে একটু বেশী মাত্রায়

চকচক করত ; মনে হোত, তেল দিয়ে পালিশ করার ফলে তার মুখের রঙটা চকচকে হয়েছে। সিঁথির কাছে সামান্য কয়েক গোছা পরচুল সে পরতো ; ফলে, পরিণত বয়সের তুলনায় এই চুলের বিন্যাস বেশ বেখাপ্পা লাগতো সকলের চোখে। সব সময়েই সে বেশ প্রফুল্ল থাকতো ; তার মুখের ওপরে আনন্দের যে ছাপ পড়তো তার ভেতরে কোনরকম কারসাজি ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে বেশ একটা সংযত ভাব ছিল ; এমন কি, এই ব্যবসাতে আসার পরেও তার স্বভাবজাত সংযম এতটুকু ব্যাহত হয় নি। লোকে ঠাট্টা করলে সে তা উপভোগ নিশ্চয় করত ; কিন্তু তার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিত না। কারও কাছ থেকে কোন রূঢ় কথা শুনলে সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হোত ; এবং যখন একটা অসভ্য ছোকরা তার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিকে যথার্থ নামে চিহ্নিত করত তখন সে কেবল আহত-ই হোত না, রীতিমত বিরক্ত-ও হতো।

এক কথায় তার একটা মিষ্টি রুচি ছিল ; এবং যদিও সে তার প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করত, তবু সে যে তাদের সমগোত্রীয়া নয় এই সংবাদটা পরিবেশন করতে সে বেশ খুশি-ই হতো। কোন-কোন সপ্তাহে একদিন সে গাড়ী ভাড়া করে তার মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোত ; মেয়েরা ছোট একটা নদীর ধারে ঘাসের ওপরে ছাগলছানার মত ছোটাছুটি করত। তাদের তখন দেখলে মনে হোত স্কুল ফাঁকি দিয়ে তারা এখানে এসে হই-হুল্লোড় করছে ; অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে গির্জার সেবিকাদের মত ফাঁকা হাওয়ায় প্রাণভরে ছেলেমানুষী করে বেড়াচ্ছে। ঘাসের ওপরে গোল হয়ে বসে তারা মসলাদার সুস্বাদু শুয়োরের মাংস চিবোত ; সেই সঙ্গে খেত আপেল থেকে তৈরী করা মদ। সন্ধ্যার পর খুশি মনে মিষ্টি স্মৃতি আর নরম মেজাজ নিয়ে তারা সব ঘরে ফিরে আসত। গাড়িতে আসতে-আসতে তারা মাদাম তেলিয়ারকে জড়িয়ে ধরে সবাই আদর করত। মাদামের মাতৃসুলভ ভালবাসা আর সদিচ্ছার বাড়াবাড়িতে তারা প্রায় অভিভূত হয়ে পড়তো।

বাড়িতে দরজা ছিল দুটো। এক কোণে এক ফালি অন্ধকার ঘর। নাবিক আর সাধারণ শ্রমিকদের জন্যে সন্ধ্যের সময় ওখানকার দরজাটা খুলে দেওয়া হোত। এখানকার খদ্দেরদের যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয় সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্যে দুটি যুবতী মতায়েন থাকতো। তাদের সাহায্য করত সুন্দর চেহারার ছোট-খাটো, শ্মশ্রু বিহীন ছোকরা খানসামা ফ্রেডারিক। ছোকরার গায়ে ষাঁড়ের মত শক্তি ছিল। যুবতী দুটি আধ পিন্ট মদ আর বিয়ারের পাত্র নিয়ে পাতলা মার্বেল পাথরে ঢাকা টেবিলগুলির চার পাশে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো ; খদ্দেরদের গায়ে পড়ে, হাঁটুর ওপরে বসে গলা জড়িয়ে ধরে তাদের মদ খাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করত।

আর তিনটি যুবতী [ওখানে যুবতীদের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে পাঁচ] কিন্তু

সম্ভ্রান্ত অতিথিদের জন্যে দোতলায় প্রতীক্ষা করে বসে থাকতো। সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সেবায় যাতে কোন ত্রুটি না দেখা দেয় বা যাতে তাদের রুচি বিঘ্নিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য ছিল এদের। কোন দিন দোতলায় অতিথিদের প্রাদুর্ভাব ঘটলে, অথবা একতলায় কর্মব্যস্ততা বেড়ে উঠলে তাদের অবশ্য নিচে নামতে হোত।

বসার ঘরটা বরাদ্দ ছিল সহরের ভদ্রলোকদের জন্যে। এইটির নাম দেওয়া হয়েছিল "জুপিটার হল।" এই ঘরের দেওয়ালগুলি ছিল নীল কাগজে মোড়া। তার গায়ে ঝোলানো ছিল "লিডা আর সোয়ান"-এর বেশ বড় একখানা ছবি। এই অঞ্চল থেকে কিছুটা ভেতরে ঢুকলে একটা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দেখা যাবে। সেই সিঁড়ির ধারে একটা ছোট দরজা। অনভ্যস্ত লোকের চোখে এ দরজা দেখতে পাওয়ার কথা নয়। এই দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়া যায়। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ভার্জিনের মূর্তির পায়ের তলায় যে ধরনের আলো জলতে প্রায়ই দেখা যায় এই বাড়িতেও লিনটেনের ওপরে লোহার জাফরির পেছনে সেই রকম একটা লণ্ঠন সারা রাত্রি ধরে জ্বলে।

বাড়িটা পুরনো, স্যাঁতসেঁতে। ভেতরে সব সময় একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ছাড়ছে। মাঝে-মাঝে এখানকার সঙ্কীর্ণ গলিতে ওডিকোলনের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। কখনও-কখনও, একতলার দরজা খোলা থাকলে মাতালদের হট্টগোল বজ্রধ্বনির মত ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়; এবং দোতলায় যে সব ভদ্রমহোদয়গণ আনন্দে মশগুল হয়ে থাকেন এই উৎকট শব্দে তাঁরা বিরক্ত হন; সেই বিরক্তির চিহ্ন তাঁদের মুখের ওপরে ফুটে বেরোয়।

সমস্ত খদ্দেরদের সঙ্গেই মাদামের বেশ সদ্ভাব ছিল। ড্রয়িংরুমের সমাবেশে সভানেত্রীর আসন ছিল তার। এখানে সহরের নানান বিষয়ে যে-সব মুখরোচক আলোচনা চলতো তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত মাদাম। তিনটি যুবতীর একঘেয়ে কচকচানির ফাঁকে-ফাঁকে মাদামের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা সকলের বেশ ভালই লাগতো। এইসব স্থূলকায় আপাত-সম্ভ্রান্ত সহরবাসীদের সংকোচময় তামাসার পর তার সরস কথাবার্তা উপভোগ্য হোত সকলের।

দোতলায় যে তিনটি যুবতী অতিথিদের মনোরঞ্জন করত তাদের নাম ফার্নান্দি, র‍্যাফেল আর রোসা। প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল বলে প্রতিটি যুবতীকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হোত। শারীরিক গঠন আর সুষমার দিক থেকে তারা যাতে একই রকমের না হয় সেদিকে লক্ষ্য ছিল মাদামের। যাতে বিভিন্ন শ্রেণীর আর রুচির খদ্দেররা মনোমত পাত্রী নির্বাচন করতে পারে সেই জন্যে এই সতর্কতা। এক একটি মেয়ে ছিল এক একটি ধাঁচের।

সুন্দরী, শক্ত মেয়ে ফার্নান্দি; দীর্ঘাঙ্গিনী। কিছু তামাটে আর কিছু সাদা রঙের গ্রাম্য যুবতীর মত। স্বাস্থ্যবতী, মোটার কাছাকাছি। রোদে ঘোরার

জন্যেই চামড়ার রঙ সম্ভবত স্থায়ী তামাটে। মাথার ওপরে চুল ছোট-ছোট, ঘন নয়, তামাটে—দেখতে অনেকটা আঁচড়ানো শনের নুড়ির মত।

র‍্যাফেলের দেশ মার্সেলির কাছে। নানা জাহাজ ঘাটার পথে-পথে সে ঘুরেছে। রোগাটে, গালের হাড় উঁচু, রুজ দিয়ে পালিশ করা। কালো তেল তেলে চুলের গোছগুলি আংটির মত গোল হয়ে কপালের ওপরে ঝুলছে। সুন্দরী জু-রমণীর শূন্য স্থানটি সে অনিবার্যভাবেই পূর্ণ করেছে। চোখ দুটি তার ভালই দেখতে হোত কিন্তু একটা পাতলা চামড়া তার ডান চোখটাকে বিকৃত করেছে। ভারি চোয়ালের ওপরে ছুঁচোলো নাকটা পড়েছে ঝাঁপিয়ে। ওপর পাটির দুটো নতুন দাঁতের সঙ্গে নীচের পাটির দাঁতের মিশ খায় নি। দেখলেই মনে হবে বয়স হয়েছে মেয়েটির।

রোসা দেখতে ছোটখাট, গোল পিঠের মত। তার শরীর সবটাই পাকস্থলীতে বোঝাই। ছোট-ছোট দুটি পা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বেশ চড়া গলায় গান গাইছে তো গাইছেই। মাঝে-মাঝে সেই গান আবেগমুখর; কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা অশ্লীল। সে অনর্গল অবাস্তর গল্প বলে যেতে ওস্তাদ। একমাত্র মদ খাওয়ার সময় ছাড়া সে গল্প বলা বন্ধ করে না; আর কথা বলার সময় ছাড়া সে খাওয়া বন্ধ করে না। একমুহূর্ত সে চুপ করে থাকতে পারে না। ওই রকম মোটা শরীর আর ঝাঁটাকাঠির মত পা নিয়ে সে সব সময় কাঠবিড়ালীর মত ছুটে বেড়াচ্ছে। এত জোরে সে চেঁচায় যে ঘর-দোর জানালা-দরজাগুলো পর্যন্ত অর্থহীন চীৎকারের দাপটে ফেটে পড়ে; মনে হয় কাছাকাছি কোথাও প্রচণ্ড গর্জনে জলের প্রপাত ঝরে পড়ছে।

যে দুটি যুবতী একতলায় কাজ করত তাদের একজন হচ্ছে লাউসী; ডাকনাম কোকোতী; আর একজনের নাম ফ্লোরা; সে একটু পা টেনে-টেনে চলতো বলে সবাই তার নাম দিয়েছিল ঢেঁকী। একটা তিনরঙা ফিতে দিয়ে তার কোমর বাঁধা থাকতো; মাথার ওপরে খোঁপাটি রাখতো তামার কাঁটা দিয়ে এলোমেলোভাবে জড়িয়ে। অনেকেই তাকে স্প্যানিশ বলে মনে করত। রান্নাঘরের পরিচারিকা বলে মনে হোত তাদের। আচার-ব্যবহার, চেহারায় সাধারণ খেটে-খাওয়া মেয়েদের মতই তারা ছিল শুঁড়িখানার মেয়ে-খানসামার মত।

মাদামের কৃতিত্বই বলতে হবে, পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও, ওই পাঁচ পাঁচটি যুবতী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ক'রে কোনদিন বাড়ির শান্তি ভঙ্গ করে নি। ওই ক্ষুদে সহরটিতে ওইজাতীয় প্রতিষ্ঠান একটিমাত্র থাকার ফলেই মাদামের ব্যবসাটি বেশ ভালই চলছিল। সত্ত্বাধিকারিণী প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখার জন্যে সব সময়ে চেষ্টা করত। মিষ্টি কথা বলে আর উদারতা দেখিয়ে খদ্দেরদের খুশি রাখার চেষ্টা করত সে। মায়া-দয়ার জন্যেও তার ও-অঞ্চলে বেশ নাম ছিল। ফলে অনেকের কাছেই সে ছিল সম্মানিতা।

যারা তার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করত তারা তাকে খুশি করার জন্যে অনেক সময় সাধ্যের বাইরে চলে যেত; এবং মাদাম তাদের কাউকে একটু বেশী তোয়াজ করলে সেই কথাটা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করত। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে এই রকম দুজনের দেখা হলে, একজন বলত, 'যথাস্থানে আজ সন্ধ্যার সময় আবার দেখা হবে।' আর একজন একই রকম প্রত্যয় নিয়ে বলত, 'ডিনারের পর আশা করি কাফেতে তুমি থাকছো।'

এক কথায় মাদাম তেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল; এবং সান্ধ্য মজলিস থেকে তার নিয়মিত একটি খরিদ্দারও অনুপস্থিত থাকে নি।

সেদিনটা ছিল মে মাসের শেষাশেষি—যথারীতি সন্ধ্যা। প্রথমেই হাজির হলেন ফিক্যাম্পের ভূতপূর্ব মেয়র, বর্তমানে কাঠের ব্যবসায়ী মঁসিয়ে পলঁ। তিনি এসে দেখলেন দরজা বন্ধ। জাফরির পেছনে যে ছোট লণ্ঠনটা জ্বলতো তা-ও নেবানো। ভেতর থেকে কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না; কবরখানার মত চুপচাপ বাড়িটি। দরজায় ধাক্কা দিলেন তিনি, প্রথমে একটু আধটু ঠুক-ঠুক করে, তারপরে বেশ জোরে-জোরে। কোন সাড়া পেলেন না। ধীরে-ধীরে তিনি ফিরে এলেন। বাজারের কাছাকাছি এসেছেন এমন সময় দেখা হল জাহাজের মালিক মঁসিয়ে দুবাইত-এর সঙ্গে। দুবাইত-ও তখন মাদামের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলেন। তারা দুজনে আবার মাদামের বাড়িতে হাজির হলেন; কিন্তু কোন ইতর-বিশেষ ঘটল না। পাশেই হঠাৎ ভীষণ একটা হট্টগোল সুরু হতেই তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন; ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে এদিকে-ওদিকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁরা। দেখলেন বাড়ির এক কোণে ইংরেজ আর ফরাসী নাবিকেরা বন্ধ কাফের দরজার ওপরে ঘুষির পর ঘুষি মেরে চলেছে; ধরা পড়ার ভয়ে তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে যাবেন এমন সময় কানের কাছে চাপা "হিস্ট" শব্দ শুনে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন মাছের ব্যবসায়ী মঁসিয়ে তুর্নেভো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তুর্নেভো তাঁদের চিনতে পেরেছেন। তাঁরা ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। খবরটা শুনে তুর্নেভোর ভীষণ কষ্ট হল; ভদ্রলোক বিবাহিত এবং সংসারী; তা ছাড়া স্ত্রীর কড়া নজর তাঁর ওপরে। তাঁর পক্ষে তাই শনিবার ছাড়া অন্য কোন দিন এখানে আসা সম্ভব নয়। এবং যেহেতু এই রকম একটা উৎপাত সেই একটা শনিবার দেখেই ঘটলো সেই হেতু আরও একটি সপ্তাহ মনোকষ্টে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় তাঁর নেই।

তিনটি ভদ্রলোকই মনোক্ষুণ্ণ হয়ে জাহাজ ঘাটার দিকে চলতে সুরু করলেন। পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হল ব্যাঙ্ক মালিকের ছেলে যুবক মঁসিয়ে ফিলিপ, ট্যাক্সকালেকটার মঁসিয়ে পিমপেশীর। তাঁরাও ওই ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য। রু-অ-জিফস এক ধারে-ধারে তাঁরা পদচারণা করতে লাগলেন। তাঁরা ঠিক করলেন আর একবার শেষবারের মত চেষ্টা করতে হবে। কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন

ক্রোধোন্মত্ত নাবিকরা বাড়িটিকে অবরোধ করে বসে রয়েছে; তারা চীৎকার করছে, আর ইঁট-পাথর ছুঁড়ছে বাড়িটিকে লক্ষ্য করে। এই দেখেই দ্বিতীয় তলার খরিদ্দাররা তাড়াতাড়ি পশ্চাদপসরণ করলেন; তারপরে তাঁরা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে লাগলেন। অনতিবিলম্বেই ইনসিওরেন্স এজেন্ট মঁসিয়ে দুপী আর আরবিট্রেটর মঁসিয়ে ভ্যাসীর সঙ্গে তাঁদের দেখা। সবাই মিলে মনের দুঃখে তাঁরা ঘুরতে সুরু করলেন। প্রথমে তাঁরা হাজির হলেন জেটির কাছে। সেখানে জলের ধারে পাথরের বেঞ্চির ওপরে সবাই বসলেন; বসে-বসে ঢেউ ভাঙা দেখতে লাগলেন। সমুদ্রের ঢেউগুলি একইভাবে গর্জন করতে-করতে তীরের পাহাড়ের গায়ে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়ে চারপাশে টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সেই শব্দ রাত্রির মধ্যে পাহাড়ের শৃঙ্গে-শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলেছে। হতাশ প্রেমিকরা কিছুক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসে রইলেন। অবশেষে মঁসিয়ে তুর্নেভো মন্তব্য করলেন: ভাল লাগছে না।

মঁসিয়ে পিমপেশী বললেন: আমরও না।

তারপরেই তাঁরা উঠে আবার ধীরে-ধীরে হাঁটতে সুরু করলেন।

পাহাড়ের ধার দিয়ে-দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা হাঁটলেন; লবণ-হ্রদের ওপরে যে কাঠের পোল রয়েছে তার ওপর দিয়ে ফিরে এলেন; রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে আবার তাঁরা বাজারের কাছে এলেন ফিরে। এমন সময় হঠাৎ ট্যাক্স-কালেকটার মঁসিয়ে পিমপেশী আর মাছের ব্যবসায়ী মঁসিয়ে তুর্নভোর মধ্যে একটা মতবিরোধ দেখা দিল। বিরোধটা দেখা দিল এক-জাতীয় "ব্যাঙের ছাতা" নিয়ে। জিনিসটা মানুষের খাদ্যজাতীয়। ওঁদের দুজনের মধ্যে একজন জোর গলায় বললেন যে ওইজাতীয় "ব্যাঙের ছাতা" তিনি ওই অঞ্চলে দেখেছেন। সান্ধ্য মজলিসে হতাশ হওয়ার পরে তাঁদের মেজাজ এমনই বিগড়ে গিয়েছিল যে এই 'ব্যাঙের ছাতা' নিয়েই দুজনের মধ্যে একটা ঘুষোঘুষি সুরু হয়ে যেত; কিন্তু আর সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় তা আর হল না। মঁসিয়ে পিমপেশী রেগে স্থানত্যাগ করলেন; কিন্তু ঠিক তারই পরমুহূর্তে আবার, একটা ঝগড়া বাঁধলো, একদিকে ভূতপূর্ব মেয়র মঁসিয়ে পলাঁ, আর একদিকে ইনসিওরেন্স এজেন্ট মঁসিয়ে দুনী। মতবিরোধটা হয়েছিল ট্যাক্স কালেকটারের মাইনে কত হওয়া উচিত এবং কী কী গুণ থাকলে একজন মানুষকে ট্যাক্স-কালেকটার করা যেতে পারে তাই নিয়ে। কেউ কারও মতে বিশ্বাসী না হওয়ার ফলে দুজনেই দুজনকে সমানভাবে গালাগালি দিতে সুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াতো বলা যায় না, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড গোলমাল কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করে তাঁদের দিকে কদম-কদম এগিয়ে এল। লক্ষ্য করতেই দেখা গেল এরা সেই নাবিকের দল যারা এতক্ষণ ধরে মাদামের বাড়ি অবরোধ করে বসেছিল। মাদামের বাড়ির দরজা খুলতে না পেরে হতাশ হয়ে চীৎকার করে হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে তারা দীর্ঘ একটি প্রশেসন করে বাজারের

দিকে এগিয়ে আসছে। দুজন-দুজন করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরস্পরের হাত ধরে পাকা সামরিক রীতিতে তারা আসছে। সহরে ভদ্রলোকেরা এক ছোট দলটি দেখে একটা বাড়ির দরজার কাছে সরে এসে দাঁড়ালো। উত্তেজিত জনতা প্রচণ্ড বিক্রমে চীৎকার করতে-করতে গির্জার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা অদৃশ্য হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে তাদের গর্জনের শব্দ শোনা গেল। তারপরে এক সময় সেই শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার শান্তি নেমে এল চারপাশে।

মঁসিয়ে পলঁ আর মঁসিয়ে দুপীর রাগ তখনও যায় নি। কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই তাঁরা যে যার পথ ধরলেন। বাকী চারজন আবার ঘুরতে সুরু করলেন; ঘুরতে-ঘুরতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা আবার মাদামের বাড়ির কাছে হাজির হলেন। বাড়ি আগের মতই বন্ধ, নিস্তব্ধ; দুর্ভেদ্য। একটিমাত্র মাতাল নিঃশব্দে অধ্যবসায়ের সঙ্গে তখনও সেইখানে বসে রয়েছে, আর মাঝে-মাঝে কাফের দরজার ওপরে মৃদু টোকা দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে টোকা দেওয়া বন্ধ করে খানসামা ফ্রেডারিকের নাম ধরে সন্তর্পণে ডাকছে। কারও কোন শব্দ না পেয়ে, এর পরে কী ঘটে তাই দেখার জন্যে সে দরজার সামনেই বসে পড়ল। চারটি বন্ধু ফিরে যাবেন-যাবেন করছেন এমন সময় সেই উচ্ছৃঙ্খল নাবিকের দলটিকে রাস্তার মোড়ে দেখা গেল। ফরাসী নাবিক আর ইংরাজ নাবিক দু'দলই তখন তাদের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে। একদল চেঁচাচ্ছে—"মারসিলে" আর একদল চেঁচাচ্ছে—"রুল ব্রিট্যানিয়া।" এই শান্তি-প্রিয় নাগরিকরা দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে কোন রকমে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন; আর ওই উচ্ছৃঙ্খল নাবিকের দল জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে গেল। জাহাজঘাটায় দু'টি জাতের নাবিকদের মধ্যে সুরু হল বচসা, তারপরে হাতাহাতি, তারই ফলে একটি ইংরাজ নাবিক তার হাত ভাঙলো, নাকের হাড় ভাঙলো একটি ফরাসী নাবিক।

এরই ভেতরে দরজার সামনে যে মাতালটি বসেছিল সে ঘ্যানঘ্যানে স্বভাবের ছেলের মত কাঁদতে সুরু করেছে।' অবশেষে সহরের দলটি ওখান থেকে বিদায় নিল; এবং ধীরে-ধীরে আতুর সহরটির ওপরে শান্তি নেমে এল। মাঝে-মাঝে নতুন করে কিছু শব্দ আবার জেগে উঠলো; কিন্তু আবার সেগুলি যথারীতি দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু একটি মানুষ তখনও নিঃসঙ্গভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি হচ্ছেন মাছের ব্যবসায়ী মঁসিয়ে তুর্নেভো। আরও একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করার বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। মাদামের কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। কিন্তু তবু তাঁর মনে একটা আশা জেগে রইল। একমাত্র নিজের দায়িত্ব আর পরিচালনায় যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি চলছিল সেটিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে তিনি পুলিশের ওপরে ক্ষেপে উঠলেন। তিনি

শেষ পর্যন্ত আবার মাদামের বাড়ি ফিরে এলেন; দেওয়ালগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন; ব্যাপারটা কি তা জানার জন্যেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। হঠাৎ জানালার খড়খড়ির ওপরে লটকানো একটি ছোট প্ল্যাকার্ডের ওপরে তাঁর নজর পড়ল। তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তিনি দেখলেন—হ্যাঁ আঁকাবাঁকা অপটু হাতে লেখা একটা প্ল্যাকার্ড-ই বটে; সেখানে লেখা রয়েছে:

প্রভুর ভোজে নিমন্ত্রণের জন্যে বন্ধ রহিল।

আপাতত কিছু করার নেই বুঝতে পেরে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

মাতালটা সেই বন্ধ দরজার সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন দোতলার সব সদস্যরাই একে-একে কাগজপত্র নিয়ে কোন না-কোন ছুতোয় ওই বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এল। চোরা-গোপ্তা চাহনি হেনে তারা সেই রহস্যময় বিজ্ঞপ্তিটা পড়ল:

প্রভুর ভোজে নিমন্ত্রণের জন্যে বন্ধ রহিল।

(২)

ঘটনাটা হচ্ছে এই রকম। মাদাম তেলিয়ারের গ্রামে তার একটি ভাই থাকে। পেশায় ভাইটি ছুতোর। জাবেতোত-এ থাকার সময়েই সে তার ভাই-এর একটি মেয়ের "গড-মাদার" হয়েছিল; মেয়েটির নাম কনসট্যানস্ রিভেত; নামটা সেই ঠিক করে দিয়েছিল। মাদামের বাবার পদবী ছিল রিভেত। পরস্পর দূরে থাকার জন্যে আর যে যার নিজের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে ভাই-এর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হোত না বটে; কিন্তু ভাই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ভোলে নি। সে জানতো বোনের রোজগারপাতি ভালই। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটির বয়স প্রায় বারো হল এবং সেই বছরেই প্রভুর ভোজে প্রথম অংশ গ্রহণ করবে। এই সুযোগে তার ভাই তাদের মধ্যেকার আত্মীয়তাটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। সে বোনকে আসার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লিখলো যে উৎসবের দিনে তার জন্যে তারা অপেক্ষা করে বসে থাকবে। মেয়েটির দাদু-দিদিমা গতায়ু হওয়ার ফলে, উৎসবে যোগ-দান করাটা মাদাম অবশ্য করণীয় বলে মনে করল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল সে। মাদামের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না; ভাই যোশেফ আশা করেছিল যে অনু-রোধ উপরোধ করে সে তার ছোট মেয়েটির নামে মাদামের সম্পত্তিটা উইল করিয়ে নেবে।

বোনের ব্যবসা নিয়ে যোশেফের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তা ছাড়া, তার গাঁয়ের লোকেরা এই ব্যবসার সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতো না। তার সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই তারা জানিয়ে দিত যে মাদাম ফিক্যাম্পে থাকে। এই

থেকে গাঁয়ের লোকেরা ধরে নিয়েছিল যে মাদামের অবস্থা বেশ ভাল। ফিক্যাম্প থেকে ওই গাঁয়ের দূরত্ব কম করে পঞ্চাশ মাইলের কাথাকাছি; সভ্য মানুষের কাছে সমুদ্র যাত্রা করার চেয়ে স্থলপথে এই পঞ্চাশ মাইল পথ পরিভ্রমণ করা গাঁয়ের মানুষদের কাছে অনেক বেশী দুরূহ। ওখানকার মানুষেরা রাওয়েন ছাড়িয়ে কোনদিন কোথাও যায় নি। তাছাড়া সুদূর গ্রামাঞ্চলের একটি গ্রামের পাঁচশ ঘর মানুষদের কাছে ফিক্যাম্প কোনদিক থেকেই একটি আকর্ষণীয় জায়গা ছিল না। এক কথায় মাদামের ব্যবসায়িক গোপনীয়তাটুকু ওখানে সুরক্ষিত ছিল।

কিন্তু উৎসবের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, মাদামের সমস্যা ততই বাড়তে লাগল। তাঁর অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নেওয়ার মত উপযুক্ত সহকারী তাঁর ছিল না; এবং একদিনের জন্যেও প্রতিষ্ঠানটিকে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে যেতে তিনি রাজি ছিলেন না। দোতলা আর কাফের যুবতীদের মধ্যে বিদ্বেষের যে আগুন চাপা রয়েছে তাঁর অবর্তমানে সেই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। ফ্রেডারিক মদ খেয়ে পড়ে থাকবে; আর একবার মদ খেয়ে বেঁহুশ হলে সে কোনদিকেই তাকাবে না। অবশেষে ঠিক হল একমাত্র ফ্রেডারিক ছাড়া বাড়িশুদ্ধ সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই ভেবে দুদিনের ছুটি দেওয়া হল তাকে।

প্রস্তাবটা ভাইকে জানালো মাদাম। ভাই আপত্তি তো করলই না; বরং সোৎসাহে জানালো যে তার দলটির জন্যে একরাত্রি থাকার ব্যবস্থা সে করবে। সেই মত শনিবার সকাল আটটার এক্‌সপ্রেসে চেপে মাদাম তার সংসার নিয়ে ভাই-এর বাড়ি যাওয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেল।

বুজেভিল পর্যন্ত গোটা কামরাটা তাদের দখলে ছিল। সারা পথটা মেয়েরা ম্যাগপাইর মত কিচির মিচির করে কাটিয়ে দিল। বুজেভিল-এ অবশ্য একজন চাষী আর তার স্ত্রী কামরায় উঠলো। বৃদ্ধ স্বামীটির গায়ে নীল রঙের একটা জামা, ভাঁজ করা কলার; ঢিলে আস্তিন কব্জি পর্যন্ত মোড়া; শেষ প্রান্তে সাদা কারুকার্য করা। তার মাথার প্রাচীনপন্থী টুপীটা লালচে। এক হাতে সবুজ রঙের বিরাট একটা ছাতি; আর এক হাতে বিরাট একটা ঝুড়ি, সেই ঝুড়ির ভেতর থেকে ভীত হাঁসগুলি বাইরে তাদের মাথা তুলে ধরেছে। তার স্ত্রী দেহাতি পোশাক পরে সোজা হয়ে বসেছে। মুখটা তার মুরগীর মত; নাকটা ছুঁচোলো। এই রকম সুসজ্জিতা খুবসুরৎ দলের মধ্যে পড়ে তার বেশ অস্বস্তিই লাগছিল, সে তার স্বামীর মুখোমুখী বসলো; একটু নড়া-চড়া করতেও যেন সাহস হচ্ছিল না তার।

কামরাটিতে সত্যিই রঙের সমাবেশ ঘটেছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নীল সিল্কের পোশাকে দেহটি ঢেকেছে মাদাম তেলিয়ার। কাশ্মীরের অনুকরণে টকটকে লাল রঙের একটি ফরাসী দেশের শাল তার দুটি কাঁধের ওপরে।

একটি টাইট বডিস পরে ফার্গান্দি হাঁপাচ্ছে। তার বন্ধুরা সমবেতভাবে অনেক কসরৎ করে এই কাঁচুলিটি তার বুকে বেঁধে দিয়েছে। তার কুচযুগলকে গোলাকার করে বাইরে প্রকাশ করার জন্যেই এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার সেই নরম থলথলে বুক দুটি বন্ধনীর আবেষ্টনীর নিচে ধুক-ধুক করছে। র‍্যাফেলের টুপীটা দেখলেই মনে হবে এক ঝাঁক পাখি সেখানে বসে রয়েছে। রঙটা তার সোনালী। ইঙ্গিতটা প্রাচ্য দেশীয়। জু-রমণীর মুখের রঙ-এর সঙ্গে টুপীর রঙটা বেশ মিশ খেয়েছে। রোসার লালচে শার্টের সঙ্গে গভীর রঙের ঝালোর দেখলে মনে হবে সে একটা শিশু অথবা স্থূলকায় বামন বিশেষ। বাকি দুটি গোল আলুর গায়ে অদ্ভুত পোশাক দেখে মনে হবে "রেসটোরেশন" যুগের জানালার পর্দা ছিঁড়ে সেগুলি তৈরী করা হয়েছে। তাদের পোশাকের চার পাশে ফুলের নকসা কাটা।।

আগন্তুকরা কামরায় ঢোকার পরে, দলটি টুএক সংযত হল, এবং বাইরের মানুষের কাছ থেকে ভাল অভিমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নিজেরা সংযতভাবে ধীরে-ধীরে কথা বলতে লাগল। কিন্তু বলবেক স্টেশনে একটি ভদ্রলোক কামরায় উঠলেন, তাঁর গোঁফ জোড়াটা সুন্দর; আঙুলে আংটি, ঘড়ির চেনটি সোনার। তিনি ঢুকেই অ্যামেরিকান কাপড়ে মোড়া কতকগুলি পার্সেল বাক্সের ওপরে সাজিয়ে রাখলেন। ভদ্রলোকটি বেশ রসিক এবং স্ফূর্তিবাজ। জিনিসপত্র গুছিয়ে হালকা হয়ে দলটির দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন; তারপরে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথাটা নুইয়ে হেসে বললেন: মহিলারা বুঝি শিবির পরিবর্তন করছেন?

প্রশ্নটা কানে যেতেই সবাই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। মাদাম তেলিয়ার অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে দলের সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলল: আর কিছু না হোক, অন্তত ভদ্র ব্যবহারটা আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি।

ভদ্রলোকটি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিলম্ব করলেন না; বললেন: ক্ষমা করবেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম 'কনভেন্ট'।

উপযুক্ত উত্তর খুঁজে না পেয়ে, অথবা, বক্তব্যটি পরিমার্জিত করায় নরম হয়ে, মাদাম ঠোঁটদুটিকে জিবের ডগা দিয়ে ভারিক্কী চালে মাথাটা নোয়ালো। এর পরে ভদ্রলোকটি, যিনি রোসা আর বৃদ্ধ চাষীর মাঝামাঝি বসেছিলেন, বিরাট ঝুড়ির ভেতর থেকে মাথা-বার-করা তিনটি হাঁসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনি হাঁসের ঠোঁটগুলো ধরে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন, এবং তাঁর সঙ্গীদের ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে নানারকম হালকা ধরনের রসিকতা করতে সুরু করলেন: দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছোট পুকুর ছেড়ে—প্যাক, প্যাক, প্যাক—আমরা এই ছোট গর্তে এসে ঢুকেছি; অ্যাঁ। কোয়াক-কোয়াক-কোয়াক।

হতভাগ্য প্রাণীগুলি শরীর বাঁকিয়ে গলা কুঁচকিয়ে বিরক্তিকর হাতের ছোঁয়াচ থেকে এড়িয়ে থাকার জন্যে ছটফট করতে লাগল; তারপর খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলো। কোনটাতেই সফল হ'তে না পেরে হঠাৎ তিনজনে হৃদয়বিদারী কান্নায় ভেঙে পড়ল: কোয়াক-কোয়াক-কোয়াক।

হাঁসেদের এহেন চীৎকার শুনে মেয়েরা হো-হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপরেই তাদের ভেতরে একটা অর্থহীন অবাস্তর কৌতূহল জেগে উঠলো; নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে তারা সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল হাঁসগুলোর ওপরে। আর ভদ্রলোকটি বিপুল রসিকতার সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে সবাইকে হাসাতে লাগলেন।

সবচেয়ে কর্মঠ দেখা গেল রোসাকে। সে তার প্রতিবেশীর পায়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তিনটি হাঁসের ঠোঁটে পর-পর তিনটি চুমু দিল। এই দেখে সব মেয়েরা হাঁসগুলোকে চুমু খেতে সুরু করল; আর ভদ্রলোকটি পর্যায়ক্রমে মেয়েদের কোলের ওপরে বসিয়ে দোলাতে লাগলেন, নানাভাবে চিমটি কাটতে লাগলেন তাদের শরীরে। হাসিতে-আনন্দে ফেটে পড়ল মেয়েরা; এবং সবাই প্রায় এক সঙ্গে আত্মীয়তার সুরে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল।

এই ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনায় বেচারা হাঁসগুলো যতটা ভয় পেল তার চেয়ে অনেকবেশী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ওই কৃষকদম্পতি। তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে রইল; নড়া চড়া করতে পর্যন্ত সাহস পেল না; এমন কি তাদের সেই বৃদ্ধ, কোঁচকানো মুখের ওপরে ভাবদ্যোতক কোন চিহ্নও ফুটে উঠলো না।

বোঝা গেল ভদ্রলোক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রচারক। একটি পার্সেল তুলে নিয়ে সেটা খুলে ফেললেন তিনি; তারপরে বললেন, অবশ্য রসিকতা করে, যে তিনি মহিলাদের বক্ষবন্ধনী বিক্রী করবেন। কথাটা মিথ্যে; কারণ, সেই বিশেষ গাঁটরিতে বক্ষবন্ধনী ছিল না, ছিল গার্টার। সিল্কের হরেক রকম রঙের গার্টার; লাল, নীল, সবুজ, হলদে; তার সঙ্গে ছিল ধাতুর কোমর-বন্ধনী। এই সব রঙচঙে জিনিস দেখে মেয়েরা আনন্দে হাততালি দিয়ে প্রায় নাচতে সুরু করে দিল। তারপরে পোশাক দেখলে মেয়েরা স্বভাবতই যেরকম গম্ভীর হয়ে বিজ্ঞের মত তা যাচাই করতে বসে তারাও সেই ভাবে গার্টারগুলি পরীক্ষা করতে বসল। ইঙ্গিতের মাধ্যমে আর ফিসফিস করে জিনিসগুলি কেমন তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল; আর মাদাম তার মর্যাদার উপযুক্ত সবচেয়ে জাঁকজমক একজোড়া কমলালেবু রঙের গার্টার নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষা চালালো।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণ অপেক্ষা করে বসেছিলেন; তিনি বললেন: সুন্দরী মহিলাবৃন্দ, এবারে পরে দেখুন।

এই মন্তব্যে মেয়েরা এক সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন স্বরে প্রতিবাদ জানালো। এখনই কোন একটা অশোভনীয় ঘটনা ঘটবে এই ভয়ে যে যার নিজের স্কার্ট পায়ের দিকে টেনে দিল। কিন্তু ভদ্রলোকটি চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকটি বললেন: বুঝতে পারছি এ-জিনিস আপনাদের লাগবে না। তাহলে এগুলো আমি প্যাক করে ফেলি।

তারপরেই তিনি চালাকি করে বললেন: যদি কোন মহিলার পছন্দ হয় তাহলে যে কোন একটা তিনি এমনি নিতে পারবেন। কোন দাম লাগবে না।

কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না; তাদের সম্ভ্রম পুরোমাত্রায় বজায় রাখার জন্যে তারা সোজা হয়ে চুপচাপ বসে রইল। গোল-আলু দুটির মুখে তখন বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। এই দেখে তিনি আবার তাঁর প্রস্তাবটি রাখলেন, বিশেষ করে ফ্লোরার মনে তখন যন্ত্রণার ঢল নেমেছে। একটা কিছু পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে সে। প্রস্তাবটি সে গ্রহণ করবে কি না ঠিক বুঝতে পারছে না।

ফ্লোরার মুখের অবস্থা দেখেই ভদ্রলোক অভ্যর্থনা জানালেন: আসুন, আসুন। ভয় কী? দেখুন, দেখুন, এই ফিকে লাল রঙের গার্টারটা আপনার পোশাকের সঙ্গে ভালই মানাবে।

আর তাকে ধরে রাখা গেল না। সে তার স্কার্টটা পায়ের ওপরে তুলে ধরল। গোয়ালিনীর পায়ের মত শক্ত পা তার; সেই পা দুটিতে মোটা বেখাপ্পা একজোড়া মোজা। ভদ্রলোকটি নিচু হয়ে বসলেন; গার্টারটা নিয়ে হাঁটটা মেপে নিলেন; তারপরে মাপলেন দাবনা। তারপরে তার দাবনায় একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দিলেন। যুবতীটা ছোট্ট একটা শব্দ করে প্রায় লাফিয়ে ওঠার যোগাড় করল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে একজোড়া গার্টার উপহার দিলেন।

এবারে কে আসবেন?—জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো: আমি, আমি।

প্রথমেই তিনি সুরু করলেন রোসাকে নিয়ে। নরম তুলতুলে গোলগোল পা দুটো; প্রায় গোড়ালিহীন; ছিরি ছাঁদ বলতে কিছু নেই পায়ের। ফার্দিনান্দের শক্ত থামের মত দাবনা দুটিকে বেশ প্রশংসা করলেন ক্যানভাসার ভদ্রলোকটি। সুন্দরী জু-এর দাবনার খাঁজটা তেমন প্রশংসিত হল না। লাউসী কোকোতি খেলার ছলে তার সায়াটা ভদ্রলোকের মাথার ওপরে চাপিয়ে দিল; কিন্তু এই রকম অশোভনীয় ঠাট্টার জন্যে মাদাম তাকে ঠিক সময়ে সাবধান করে দিল। শেষ কালে মাদাম নিজে তার শক্ত, সুষম নরম্যান পা দুটি দিল বাড়িয়ে। সত্যিকার ফরাসী সৌজন্য দেখিয়ে ভদ্রলোক তাঁর টুপীটি খুলে তার সুন্দর দাবনা দুটির বেশ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করলেন। ভয় আর আতংকে শিলীভূত হয়ে কৃষক-দম্পতি আড়চোখে এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগল।

তাদের তখন দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুটো মুরগী চুপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ সেই গোঁফ-ওয়ালা ভদ্রলোকটি তাঁর বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠলেন; তারপরে তাদের মুখের কাছে মুখ নিয়ে মুরগীর ডাক ডাকলেন। এই শুনে সমবেত মহিলা সমাজে আবার হাসির আলোড়ন জেগে উঠল।

মটেভিল স্টেশনে কৃষকদম্পতি তাদের ঝুড়ি, হাঁস, আর ছাতা নিয়ে নেমে গেল। নেমে যাওয়ার সময় স্ত্রীটি তার স্বামীকে ফিসফিস করে বলল: আর একদল হতচ্ছাড়া মেয়ে জঘন্য প্যারিসে যাচ্ছে।

রাওয়েনে সেই কৌতুকপ্রিয় ব্যবসাদারটি নেমে গেলেন; যাওয়ার আগে এমন সব অভদ্র ব্যবহার করে গেলেন যে বাধ্য হয়ে মাদামকে তাঁর সঙ্গে কড়া ব্যবহার করতে হয়েছিল। লোকটি বিদায় নেওয়ার পরে মাদাম নীতিবচন একটি উদ্ধৃত করে বলল: অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে কথা বলা যে আমাদের উচিত হয় নি এই ঘটনা থেকে আমাদের সেই শিক্ষা হল।

অয়সেল-এ এসে তারা গাড়ী পরিবর্তন করল; তারই পরের স্টেশনে তারা দেখে মঁসিয়ে যোশেফ রিভেত তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে বড় একখানা গাড়ী, ভেতরে চেয়ার লাগানো; আর একটা সাদা টাট্টু ঘোড়া।

বেশ বিনীতভাবে ছুতোরটি মেয়েদের চুমু খেয়ে তাদের প্রত্যেককে হাত ধরে গাড়ীতে তুলল। গাড়ীর পেছনে চেয়ারের ওপরে বসল তিনজন। সামনের দিকে তিনটি চেয়ার অধিকার করল র‍্যাফেল, মাদাম, আর তার ভাই। রোসার জন্যে কোন জায়গা পাওয়া গেল না। সে স্থূলকায়া ফার্নান্দির কোলের ওপরে কোন রকমে একটু জায়গা করে নিল। বসার ব্যবস্থা শেষ হওয়ার পরে গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু সেই এবড়ো-খেবড়ো, অমসৃণ পথের ওপরে ছোটার সময় গাড়ীটা এমন ঝাঁকানি খেতে লাগল যে গাড়ীর ওপরে নিশ্চিন্তে বসে থাকা দায় হয়ে উঠলো; চেয়ারগুলো নেচে কুঁদে অস্থির করে তুলল সবাইকে। এক এক-বার গাড়ীটা নেচে উঠে আরোহী আর আরোহিণীদের চেয়ার থেকে তুলে ফেলে দিল; একজন পড়ল আর একজনের গায়ে। ভয়ে মেয়েরা চীৎকার করতে লাগল; কিন্তু তাদের চীৎকার চাকার প্রচণ্ড ধাক্কার মধ্যে ডুবে গেল। বাইরে গড়িয়ে পড়ার ভয়ে মেয়েরা প্রাণপণে গাড়ীটাও ধরে রইল। ঝাঁকানির চোটে কারও টুপী খুলে চোখের ওপরে ঝুলতে লাগলো, কারও পিঠের ওপরে, কাঁধের ওপরে কারও। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, ইঁদুরের লেজের মত ছোট লোমহীন লেজটা পেছনের দিকে সোজা করে সাদা টাট্টুটা লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল। একটা পা সামনের দিকে, আর একটা পা গাড়ীর প্রান্তে চেপে কনুই দুটো ওপরে তুলে যোশেফ রিভেত লাগামটা ধরে রইল; মাঝে-মাঝে তালু দিয়ে একরকম শব্দ করতে লাগল; সেই শব্দ টাট্টুটা কান পেতে শুনল।, তারপর আবার বীর বিক্রমে ছুটতে লাগলো।

রাস্তার দুপাশে সবুজ বনভূমি দুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ফুলে ভরা সরষের গাছগুলো নির্ভেজাল হলুদ রঙে নিজেদের সাজিয়ে মিষ্টি সুস্বাদু গন্ধ ছড়িয়ে থিকথিক করছে চারপাশে। রাই গাছগুলি ইতিমধ্যে যথেষ্ট লম্বা হয়ে উঠেছে। তাদের ফাঁকে-ফাঁকে ঘন নীল মাথা তুলে যব আর ভুট্টা গাছগুলি মেয়েদের প্রলুব্ধ করছিল। কিন্তু মঁসিয়ে রিভেত গাড়ী থামাতে চাইল না। মাঝে-মাঝে ঘন পপি গাছের ঝোপ, লাল টকটকে—মনে হচ্ছিল যেন তাজা রক্তে মাখানো। প্রকৃতির ফুলে শোভিত সমতলভূমির ওপর দিয়ে কতকগুলি জমকালো রঙ মাখানো মানুষের ফুলের তোড়া নিয়ে গাড়ীটা ছুটছে। সাদা টাট্টুর গতির মধ্যে পড়ে দূরত্ব কমে আসতে লাগলো; বড়-বড় গাছগুলো সামনে এসে পিছিয়ে গেল; দেখা দিল খামার; খামার পেছনে মিলিয়ে গেল; সামনে এগিয়ে এল সবুজ গাছের সারি; রোদের ভেতর দিয়ে, সবুজ আর হলুদবর্ণের শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে লাল আর নীল দৃশ্যের আস্তরণের ভেতর দিয়ে এক-গোছা মানুষের ফুল নিয়ে এগিয়ে চলল ঘোড়াটা।

ছুতোর মিস্ত্রীর বাড়ির কাছে আসতে বেলা একটা বেজে গেল। সকাল থেকেই মেয়েরা কিছু খায় নি। এবার তারা ক্ষিদে আর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল। মাদাম রিভেত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রত্যেককে চুমু খেয়ে নামালো, তার-পরে ননদটিকে অধিকার করে নিল। নামিয়ে এনে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। সেই আলিঙ্গন যেন শেষ হ'তে চায় না।

পরের দিন ভোজ-উৎসবের জন্যে কারখানাটা আগেই পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল। সেইখানেই সকলকে খেতে দেওয়া হল; খাবারের আয়োজন ছিল উৎকৃষ্ট; ওমলেট, সঙ্গে ভাজা সসেজ, তার পিছু-পিছু আপেল থেকে তৈরী করা মদ। উৎকৃষ্ট খাবার খেয়ে সবাই বড় পরিতৃপ্ত হল; রিভেত অতিথিদের স্বাস্থ্য কামনা করে প্রথম খেতে সুরু করল; মাদাম রিভেত খাবার ভর্তি পাত্র নিয়ে প্রত্যেককে বারবার জিজ্ঞাসা করল আর কারও কিছু দরকার রয়েছে নাকি; কারখানার একপাশে স্তূপীকৃত কাঠের বস্তা থেকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বেরোচ্ছিল—সেই সঙ্গে উগ্র গন্ধ আসছিল স্পিরিট আর রঙের।

বাচ্চা মেয়েটিকে খুঁজে বেড়ালো অতিথিরা; কিন্তু শুনলো সে গির্জায় গিয়েছে; সন্ধ্যের আগে তার ফিরে আসার কোন রকম সম্ভাবনা নেই। তখন সবাই দলবেঁধে বেড়াতে বেরোল। আয়তনের দিক থেকে গ্রামটি ক্ষুদে; উঁচু বড় রাস্তার দু'পাশে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই গ্রামের রাস্তা বলতে ওই একটিই। রাস্তার একপাশে এক ডজন বাড়ি সারি-বন্দীভাবে সাজানো। ওগুলি হচ্ছে স্থানীয় দোকানদারদের। তাদের মধ্যে রয়েছে কসাইখানা, মুদীর দোকান, সরাইখানা, ছুতোর মিস্ত্রী, মুচি আর রুটিওয়ালার দোকান। রাস্তার শেষপ্রান্তে একটা কারখানা; তার ভেতরে বিরাট চারটে পাইন গাছের মধ্যে ঢাকা গির্জা। গির্জা ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠ, মাঝে-মাঝে

গাছের ছোট-ছোট বন। ওই অঞ্চলেই যত ক্ষেত-খামার।

পেশাদারী পোশাক গায়ে থাকা সত্ত্বেও, রিভেত বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তার বোনের হাত ধরে বেশ ভারিক্কী চালে এগিয়ে চলল; র‍্যাফেলের সোনালী গাউনে অভিভূতা হয়ে মাদাম রিভেত র‍্যাফেল আর ফার্নান্দির মধ্যে নিজের স্থান করে নিল। ফ্লোরা আর লাউসী কোকোত্তোর সঙ্গে স্থূলাকার রোসা শোভাযাত্রার একেবারে শেষের লাইনটি বেছে নিল। ফ্লোরা ক্লান্তভাবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো।

সমস্ত গ্রামবাসী তাদের দেখার জন্যে দরজার সামনে বেরিয়ে এল; ছেলেরা খেলা বন্ধ করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। মাঝে-মাঝে পর্দা সরিয়ে মসলিনের টুপী পরা দু একটা মাথা উঁকি দিতে লাগলো। একটি প্রায়-অন্ধ বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাজার হোক, অনেক দূর শহর থেকে এই সব সম্মানিতা মহিলারা গ্রামে এসেছেন রিভেতের মেয়ের শুভকার্যে যোগ দিতে। তাদের দিকে সবাই বেশ সপ্রশংস আর আগ্রহশীল দৃষ্টি দিয়ে না তাকিয়ে পারল না। তাদের আগমন ছুতোর যোশেফের সম্মান তার গ্রামবাসীদের কাছে অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিল।

গির্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ছেলেদের স্তোত্রপাঠ শুনতে পেল। ছেলেরা গির্জার ভেতরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করছে। গির্জার মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল সকলের; কিন্তু পাছে বাচ্চাদের ঈশ্বর ভজনায় অসুবিধে জন্মায় এই ভয়ে মাদাম তেলিয়ার দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইল না। বেড়াতে-বেড়াতে যোশেফ রিভেত তার জমি-জায়গার পরিমাণ কত, কত তার আয় হয়—সে সব বিষয় নিয়ে বোনের সঙ্গে আলোচনা করল; তারপর দলবল নিয়ে পরিভ্রমণ শেষ করে ফিরে এল তারা। ফিরে এসে যোশেফ তার ঘর দেখাতে লাগলো।

ঘরের প্রাচুর্য তাদের ছিল না। যে ক'টি ঘর ছিল ভাগ-ভাগ করে অতিথিদের সে-সব জায়গায় থাকতে দেওয়া হল। ঠিক হল, যোশেফ শোবে তার কারখানায়। মাদাম যোশেফ তার ননদ মাদাম তেলিয়ারের সঙ্গে তার নিজস্ব বিছানায় রাত কাটাবে। ফার্নান্দি আর র‍্যাফেলের জন্যে পাশের ঘরটি বরাদ্দ করা হল। রান্নাঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে সেইখানে শুতে দেওয়া হল লাউসি আর ফ্লোরাকে। সিঁড়ির ধারে একটা ছোট ভাঁড়ার ঘর ছিল সেটা দেওয়া হল রোসাকে। এইখানেই যোশেফের ছোট মেয়ে কনসট্যানস-এর উৎসবের আগের রাত্রিতে শোওয়ার কথা ছিল।

কনসট্যানস বাড়িতে ফেরার পরেই সবাই তাকে চুমু খাওয়ার জন্যে হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। অপরকে তোয়াজ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অভ্যস্ত মেয়েরা শিশুটিকে আদর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল; এই প্রবৃত্তির বশেই তারা ট্রেনের

কামরায় হাঁসগুলির ঠোঁটে সবাই মিলে চুমু খেয়েছিল। প্রত্যেকেই মেয়েটিকে এক একবার কোলে তুলে নিল; তার সেই সুন্দর সিল্কের চুলগুলি টেনে-টেনে আদর করতে লাগলো, তাকে বুকের মধ্যে ধরে চিপে ফেলল। এগুলির কোনটাই কৃত্রিম নয়; সবই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস; পরের দিনের শুভ উৎসবের ভাবে ভরপুর থাকার ফলেই শান্ত ভদ্র মেয়েটি বিনা বাধায় প্রত্যেকের আদর আর উচ্ছ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

সারাদিনই বেশ পরিশ্রম গিয়েছে সকলের। তাই ডিনার শেষ হওয়ার পরে বৃথা কালক্ষেপ না করে যে যার ঘরে রাত্রির মত বিশ্রাম করতে চলে গেল। সহর থেকে দূরে এই ফাঁকা গ্রামটির ওপরে অনন্ত শান্তি নেমে এল। সীমাহীন সুপরিব্যাপ্ত শান্ত সমাহিত একটি নিস্তব্ধতা আকাশ আর বাতাস ছাপিয়ে গ্রামটির ওপরে বিছিয়ে দিল তার মোহময় আবেশ। মাদাম তেলি-য়ারের সরাইখানার সান্ধ্য মজলিসের উদ্দাম আনন্দে অভ্যস্ত এই মেয়েদের মনের ওপরে সেই বোঝা নিস্তব্ধতা পাষাণের মত ভারি হয়ে চেপে বসল। তারা কাঁপতে লাগলো; শীতের জন্য নয়; মনে হল তারা বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তাদের মনের মধ্যে ঢুকে তাদের বিষণ্ণ হৃদয়গুলিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। বিছানায় শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকে তার সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরল; তাদের হাবভাব দেখে মনে হল যে সুগভীর প্রশান্তি পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে তারই হাত থেকে তারা যেন বাঁচতে চায়। সব চেয়ে বিপদ হল রোসার। কাউকে না কাউকে হাত দিয়ে জড়িয়ে না ধরে সে ঘুমোতে পারে না, সেই বেচারী একলা একটা ঘরে শুয়ে রইল। কিছুতেই তার ঘুম এল না। একটা নাম-না জানা পরম অস্বস্তিকর অস্থিরতা তাঁর বুকের মধ্যে ঢুকে তোলপাড় শুরু করে দিল। বিছানায় কেবল সে এপাশ আর ওপাশ করতে লাগল; ঘুমোতে পারল না। হঠাৎ চমকে উঠল সে; কান পেতে শুনল। তারই পাশের ঘর থেকে একটা বাচ্চা খুব মৃদু স্বরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে যেন কাঁদছে। ভয় পেয়ে গেল সে। আস্তে-আস্তে ডাকল। কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিল বাচ্চাটা। গলাটা বাচ্চা কনসট্যানস-এর। মায়ের সঙ্গে শোয়ার অভ্যাস তার। ,ছোট কুঠরির ভেতরে একা-একা ভয় পেয়ে সে কাঁদছে। খুব খুশি হয়ে রোসা কোন রকম গোলমাল না করেই ধীরে-ধীরে উঠে গেল; বাচ্চাটাকে সঙ্গে করে তার গরম বিছানার ওপরে শুইয়ে দিল। বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করতে লাগলো, উপর্যুপরি চুমু খেতে লাগলো তাকে; সুড়সুড়ি দিতে লাগলো তার গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে আদর করার পরে তার উত্তেজনা কমে এল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। বাচ্চাটাও সকাল পর্যন্ত একটি পতিতার খোলা বুকের ওপরে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগলো।

সারা রাত্রি বা অনেক রাত্রি পর্যন্ত হইচই করার পরে সকাল বেলাটা নিরুপদ্রবেই ঘুমোতে অভ্যস্ত ছিল ওরা। সেদিন কিন্তু ভোর পাঁচটাতেই

গির্জার জোরালো ঘণ্টার শব্দ তাদের বিছানা থেকে ঠেলে তুলে দিল।

গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে। কর্মব্যস্ত মহিলারা এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি সুরু করেছে আসা যাওয়া। আলোচনায় মুখরা হয়ে উঠেছে তারা। অতি সন্তর্পণে কেউ-কেউ শক্ত ইস্ত্রীকরা মসলিন ফ্রক বয়ে নিয়ে আসছে; কারও হাতে সোনার কাজ করা বাতিদানের ওপরে বিরাট বাতি; পরিষ্কার নীল আকাশের এক কোণে সূর্য উঠেছে। দিকচক্রবালে এখন তার ফিকে লাল আভা দুলছে; প্রভাতের শেষ ম্রিয়মান রশ্মি। মুরগীরা দলবল নিয়ে তাদের ঘরের চারপাশে ছোটাছুটি করতে সুরু করেছে। মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে কালো পালক-ওয়ালা ধেড়ে মোরগ তার পালকের ঝাপটা দিয়ে শূন্যে মুখ তুলে বিশেষ ভঙ্গিমায় ঘাড় বাড়িয়ে চীৎকার করছে; সেই চীৎকারে যোগ দিচ্ছে অন্য মোরগরা।

পাশের সব গ্রাম থেকে গাড়ি আসতে সুরু করেছে। সেই সব গাড়িতে আসছে দীর্ঘ চেহারার নরম্যান মহিলার দল। নানা রকম উপহার নিয়ে তারা যথাস্থানে রেখে দিচ্ছে। পুরুষরা এসেছে উৎসবের পোশাকে।

ঘোড়াগুলিকে আস্তাবলে বেঁধে গাড়িগুলোকে রাস্তার একপাশে সারিবন্দী করে দাঁড় করানো হল। হরেক রকম গ্রাম্য গাড়ির সমাবেশ হয়েছে: শকট, চেসেস, জিপ, ওয়াগোনেট। কোন-কোন গাড়িকে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে; কোনটার পেছন রাস্তার ওপরে ঠেলে দিয়ে মুখটাকে নামিয়ে রাখা হয়েছে।

মৌচাকের মত কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে ছুতোর মিস্ত্রী যোশেফ রিভেতের বাড়ি। ড্রেসিং গাউন আর সায়া পরে পিঠের ওপর কবরী এলিয়ে দিয়ে মেয়েরা বাচ্চা কনসট্যানসকে থামানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের দেখলে মনে হবে এরকম কাজে তাদের দক্ষতা অনস্বীকার্য। টেবিলের ওপরে বাচ্চাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাদাম তেলিয়ার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার ছুটন্ত সেনাবাহিনীকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিচ্ছে। সবাই মিলে বাচ্চাকে ধুয়ে পরিষ্কার করল; চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে দিল, ফ্রক পরালো, আর অসংখ্য পিন গেঁথে-গেঁথে স্কার্ট ঠিক করল। বিপদ হল বক্ষবন্ধনী নিয়ে। ওটা কিছুতেই লাগছিল না বুকে। সেটাকে কেটে ছেঁটে ছোট করে সাজানো শেষ করল সবাই। সব কাজ শেষ করে তারা তাদের শিকারটিকে আলতোভাবে তুলে নিয়ে চেয়ারের ওপরে বসিয়ে দিল; ধমক দিয়ে বলল: খবরদার নড়াচড়া করো না। তারপরে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে নিজেরা সাজতে গেল তারা।

গির্জায় আবার ঘণ্টা বাজতে সুরু করল। এর করুণ শব্দটা বাতাসের মধ্যে উঠে দিকচক্রবালে হারিয়ে গেল, ঠিক যেমন একটা ক্ষীণ স্বর ইথারের অনন্ত গভীরে ডুবে নিঃশেষ হয়ে যায়।

পূজার্থীরা দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, এগিয়ে গেল পাবলিক

বিলডিং-এর দিকে। পাবলিক বিলডিং বলতে দুটি স্কুল আর মিউনিসিপ্যাল অফিস—এগুলির সব ক'টিই গ্রামের শেষ প্রান্তে। এদেরই ঠিক উলটো দিকে দেবতার ঘর—গির্জা। প্রথমে শিশুর দল। তাদের পেছনে রবিবারের সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে তাদের বাবা-মায়েরা; দৈনন্দিন জীবনে খেটে-খেটে তাদের শরীর আর চলনে বাঁক ধরেছে। বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েরা সাদা জরীর ঝালরের মধ্যে ডুবে গিয়েছে; আর ছেলেরা সুগন্ধি তেলে মাথার চুলগুলি পালিশ করেছে। তাদের দেখলে মনে হবে শিশু খানসামার দল। কালো ট্রাউজার যাতে নষ্ট না হয় এই ভয়ে তারা সব পা ফাঁক করে হাঁটছে।

ছোট মেয়ের উৎসবে সহর থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে এবং তাকেই চারপাশে ঘিরে গির্জায় যাচ্ছে এই রকম একটা দৃশ্য সত্যিকারের সম্মানই; এবং এদিক থেকে যোশেফ ছুতোর সকলের কাছে বেশ সম্মানিত বলে প্রতিভাত হল। তেলিয়ারকে পুরোভাগে রেখে পুরো তেলিয়ার বাহিনী কনসট্যানস-এর আগে-আগে চলেছে। তার বাবা হাত ধরেছে মাদাম তেলিয়ারের। তার মা জোট বেঁধেছে র‍্যাফেলের সঙ্গে; ফার্নান্দি চলেছে রোসার সঙ্গে; পাশে চলেছে গোল আলু দুটি। সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত বাহিনীর মত দলটি এগোচ্ছে। এই রকম গম্ভীর এবং জমজমাট শোভাযাত্রা সকলকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল।

শোভাযাত্রাটি গির্জায় হাজির হওয়ার পরে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। গির্জার ভেতরে সমবেত জনতা তাদের দেখার জন্যে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করতে লাগল। মহিলাদের অতি উৎকট জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক গির্জার গায়কদের চটকদার সাজ-পোশাককেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। এ হেন মহিলাদের দেখে পূজারীরাও নীতিভ্রষ্ট হয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলতে সুরু করলেন। গির্জার গায়কদের জন্যে যে জায়গা ছিল, তারই পাশে সংরক্ষিত আসন থেকে উঠে মেয়র সেটি তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন। এই সংরক্ষিত জায়গায় বসল মাদাম তেলিয়ার, মাদাম রিভেত, ফার্নান্দি, র‍্যাফেল; রোসা, দুটি গোল আলু আর যোশেফ বসল তার পেছনের জায়গায়। পূজারীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ছেলে মেয়েরা দুদিকে লাইন করে হাঁটু মুড়ে বসল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লম্বা-লম্বা বাতি; বর্শার চারপাশে ওঁচানো। একপাশে তিনটি গায়ক বেশ আবেশের সঙ্গেই গান জুড়েছে। সেই সুরের সঙ্গে সুর মিশিয়ে ছেলেরাও ধুয়া ধরল। মাঝে-মাঝে পুরোহিত দাঁড়িয়ে উঠে কিছু বললেন, বলা শেষ করে বসে পড়লেন তিনি। পুরোহিত বসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গায়করা আবার তাদের প্রার্থনা সুর করে পড়তে সুরু করল; একটা কাঠের ঈগল পাখির প্রসারিত ডানার ওপরে খোলা বই থেকে দেখে-দেখে তারা গান পড়তে লাগলো। তার পরে সবাই চুপ করল। সবাই একসঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসল; ভেতরে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধ সম্মানিত অস্থায়ী প্রধান পুরোহিত।

যীশুর শেষ নৈশভোজনের স্মরণপর্বে যে পাত্র ব্যবহৃত হয় সেটি বাঁ হাতে ধরে, তার ওপরে একটু ঝুঁকে এগিয়ে এলেন তিনি। লাল পোশাক পরে দুজন সহকারী তাঁর আগে-আগে এলেন; পেছনে এল ভারি বুট পরে ঐক্যতান সঙ্গীতের গায়ক দল। গির্জায় গায়কদের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে তারই পাশে এরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছোট একটা ঘণ্টার ধ্বনি বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। তারপরই আরম্ভ হল শুভ কাজ। সুসজ্জিত বেদীর সামনে, পুরোহিত ধীরে-ধীরে নড়াচড়া করলেন, ভাঙা গলায় বার্ধক্যের কাঁপানো সুরে তিনি সুরু করলেন স্তোত্রপাঠ। এক একবার তিনি থামেন; সঙ্গে-সঙ্গে গায়ক দল তাঁর সুর অনুকরণে ধুয়া তোলে; তাদের সঙ্গে চাপা সুরে যোগ দেন সমবেত পূজার্থীরা। হঠাৎ সমবেত সকলের কণ্ঠ এত জমজমাট হয়ে ওঠে যে সেই শব্দের গভীর ঝঙ্কার পুরনো গির্জার দেওয়ালে-দেওয়ালে, ছাদের গায়ে গিয়ে আঘাত করে; গির্জার জানালা দরজাগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে; তারই ফলে কিছু-কিছু চুণ-সুরকী ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ে সেই ধ্যানগম্ভীর আর সঙ্গীতমুখর পূজার্থী আর পূজার্থিনীদের ওপরে। টালির ছাতের ওপরে গরম রোদ পড়ায় গির্জার ভেতরটা আগুনে-চুল্লীর মত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একটা গভীর অনুভূতি আর সেই সঙ্গে অনির্বচনীয় স্বর্গীয় একটি রহস্যের আবির্ভাব প্রত্যাশায় সমবেত শিশু আর তাদের মায়েরা পরম আবেশে অভিভূত হয়ে রইল।

পুরোহিত তাঁর জায়গা থেকে উঠে আবার বেদীর দিকে ফিরে গেলেন। সাদা মাথার ওপরে যে আবরণীটি ছিল সেটি খুলে তিনি পূজা অর্চনায় ব্যস্ত হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। পূজার্থীদের দিকে ঘুরে দুটি হাত প্রসারিত করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: ভাই সব, প্রার্থনা করুন আপনারা। সমবেত জনতা প্রার্থনায় যোগ দিল। পুরোহিত নিচু গলায় ধর্মের গূঢ় কথাগুলি উচ্চারণ করলেন। ছোট ঘণ্টাটি টুং-টুং করে বারবার বাজতে লাগল। হাঁটু মুড়ে বসে জনতা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালো। সেই অসহ্য উৎকণ্ঠায় শিশুরা মূর্ছাতুর হয়ে পড়ল।.

দুটি হাতের চেটোয় মুখটা ঢেকে রেখে রোসাও হাঁটু মুড়ে বসেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল তার গ্রাম্য গির্জার কথা, প্রভুর ভোজের উৎসবে সেও যেদিন প্রথম গির্জায় গিয়েছিল সেদিনের কথাও মনে পড়ে গেল তার। সমস্ত পূর্বস্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল সে। তার মনে হল সাদা ঝালর দেওয়া পোশাক পরে সে-ও আবার সেই ছোট মেয়েটিতে পরিণত হয়েছে। সে কাঁদতে সুরু করল। প্রথমে নিঃশব্দে; চোখের জল চোখের পাতাগুলি ভিজিয়ে দিল ধীরে-ধীরে; কিন্তু পূর্বস্মৃতিগুলি একটি-একটি করে তার স্মরণ পথে এসে হাজির হওয়ার ফলে তার আবেগ

বাড়তে লাগল, তার গলায় কাঁপুনি জাগলো, বুকের স্পন্দন বাড়লো, সে জোরে-জোরে ফোঁপাতে লাগলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে তার চোখ মুছতে লাগলো, নাক আর মুখের মধ্যে গুঁজে দিল; কিন্তু কিছুতেই তার ফোঁপানি কমলো না। তার বুকের মধ্যে থেকে যে গোঙানি উঠলো তার সঙ্গে যোগ দিল পার্শ্ববর্তিনী লাউসি আর ফ্লোরার গোঙানি। রোসার মত তাদেরও মনে পূর্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল; সেই সব স্মৃতির ভার তারাও সহ্য করতে পারছিল না। তারাও কাঁদতে শুরু করল।

অশ্রুর মত সংক্রামক জিনিস আর নেই। মাদাম তেলিয়ারও বুঝতে পারলো তার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। মাদাম রিভেতের দিকে তাকিয়ে দেখলো সবাই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পুরোহিতের আরাধনা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল; আর বেশী কিছু ভাবতে না পেরে ধর্মীয় ভীতির প্রাচুর্যে মুহ্যমান হয়ে শিশুরা মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এখানে-ওখানে কিছু মহিলা, হয়ত কারও বোন অথবা মা সেই ভীষণ ভয়াতুর আবেগের শিকার হয়ে ফোঁস-ফোঁস করে ফোঁপাতে লাগলো; এক হাতে কম্পমান বুক টিপে চেপে আর এক হাতে কেলিকো রুমাল নিয়ে চোখের জল মোছার জন্যে নাকে মুখে ঘসতে সুরু করল।

পাকা ধানের ক্ষেতে একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ যেমন করে সারা মাঠের বুকে দাবানলের সৃষ্টি করে সেই রকম রোসা আর তার সঙ্গিনীদের কান্না সমবেত জনতার মনের মধ্যে একটা দুর্নিবার আবেগের সৃষ্টি করে কান্নায় উদ্বোধিত করল তাদের। একটু পরেই দেখা গেল ছেলে-বুড়ো, মহিলা, এবং পরিপাটি করে সাজা যুবকরাও সব কাঁদছে। মনে হল সকলের অলক্ষ্যে যে কোন অতিমানবিক শক্তির আবির্ভাব হয়েছে সেখানে; সেই শক্তি তাদের মাথার ওপরে চক্রাকারে ঘুরে-ঘুরে তাদের প্রভাবিত করেছে।

একটি ছোট অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ সেই সুগভীর মুখর স্তব্ধতাকে টুকরো-টুকরো করে দিল। গির্জার সেবিকা তাঁর ধর্মগ্রন্থের ওপরে আঙুল দিয়ে ঠকঠক করলেন; প্রভুর আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্যে সকলকে ইঙ্গিত করলেন। উপস্থিত জনতা সারিবন্দী হয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো; রূপোর জাল দিয়ে মোড়া ধর্মীয় পাত্র হাতে করে বৃদ্ধ পুরোহিত সেই সারির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন; প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সেইটি ধরলেন; শিশুরা ভয়ে বিবর্ণ মুখে চোখ বন্ধ করে সেটি তাদের থুতনিতে ছোঁওয়ালো; রেলিংএর ওপরে সাদা ঝালর দেওয়া যে ঢাকনিটি ছিল সেটি মৃদু হাওয়ায় জলের ছোট ঢেউয়ের মত কাঁপতে লাগলো। সমস্ত গির্জার মধ্যে একটা মাতাল আবেগ দাবানলের মত একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। সবাই পাগলের মত মূর্ছাতুর হয়ে গভীর উদ্বেগে কাঁদতে লাগলো। প্রবল ঝড়ের মুখে অরণ্যের বৃক্ষ যেমন ভাবে আনত হয়, সেই রকম একটি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস সবাইকে আঘাত করল। সেই

সর্বব্যাপী আবেগে চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে পুরোহিত ধর্মীয় পাত্রটি হাতে নিয়ে একজায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপরে বিড়-বিড় করে তিনি বললেন:

"স্বয়ং ভগবান আজ আমার আহ্বানে এখানে উপস্থিত হয়েছেন; ভক্তদের কাছে আবির্ভাব হয়েছে তাঁর।"

ধীরে-ধীরে জনতা শান্ত হল। গায়ক দল তাদের সঙ্গীত সুরু করল। সেই সঙ্গীত জনতার চোখের জলে বেশ আর্দ্র। এমন কি বাপের স্বরটাও কেমন মোটা-মোটা লাগলো। মনে হল, সে-ও এতক্ষণ ধরে কাঁদছিল। তারপরে হাত তুলে পুরোহিত সবাইকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জায়গায় গিয়ে হাজির হলেন। বেশ জোরে-জোরে রুমাল দিয়ে ঝেড়ে চেয়ারগুলি সশব্দে সরিয়ে দিয়ে জনতা উঠে যে যার জায়গায় বসলো। পুরোহিতকে দেখা মাত্র তারা আবার সব চুপ করে গেল। নিচু জড়ানো স্বরে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি শেষের দলটিকে বললেন: প্রিয় ভাইবোনেরা, আমার প্রিয় পুত্রকন্যারা, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই সর্বোত্তম আনন্দের জন্যে আমি তোমাদের কাছে ঋণী। আমি ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করেছি। আমারই প্রার্থনায় খুশি হয়ে তিনি আজ এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এখানে এসেছিলেন; তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি তোমাদের আত্মাকে পূর্ণ করে তুলেছিলেন। তাইত তোমরা কাঁদছিলে। এখানকার ধর্মীয় সাম্রাজ্যে আমি সবচেয়ে বয়স্ক পুরোহিত। সেদিক থেকে আমিও আজ যথেষ্ট আনন্দিত। একটি সত্য, মহান এবং সুগভীর অপূর্ব ঘটনা আজ ঘটেছে। যীশুর মত ভগবানের আত্মা তোমাদের সকলের শরীরে প্রবেশ করে বাতাস যেমন সব গাছ নুইয়ে দেয় তেমনি তোমাদেরও নুইয়ে দিয়েছেন।

দুটি সারিতে সাজানো ছুতোর মিস্ত্রীর অতিথিদের সম্বোধন করে তিনি বললেন: আর আমার প্রিয় বোন, আপনাদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের উপস্থিতি, আপনাদের বিশ্বাস আর ধর্মপ্রবণতা আমাদের কাছে অমূল্য। আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের এই গির্জা নিজেকে সম্মানিত মনে করছে। আপনাদের আবেগ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। আপনারা উপস্থিত না থাকলে এই স্মরণীয় দিনটি কিছুতেই হয়ত ভগবানের আবির্ভাবে পুত হোত না। অনেক সময় সত্যিকার খোঁয়াড়ের একটি মাত্র মেষই ভগবানকে তাদের টেনে আনে।

আর তিনি বলতে পারলেন না; বক্তৃতা শেষ করলেন তিনি: তোমাদের মঙ্গল হোক। আমেন।

উপাসনা শেষ করার জন্যে তিনি বেদীর কাছে ফিরে গেলেন। এরই ভেতরে জনতা বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ ধরে মানসিক পরিশ্রমের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত

অস্থির হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, তাদের খিদেও পেয়েছে বেশ, সমাপ্তি উপদেশের জন্যে অপেক্ষা না করে অনেক বাপ-মায়েরাও ডিনার খাওয়ার জন্যে ধীরে-ধীরে স্থান ত্যাগ করল।

গির্জার দরজার কাছে একটি দল জমায়েত হল। তারা সবাই হইচই করতে লাগলো। সেই সব তালগোল পাকানো শব্দের ভেতর থেকে কারও কথাই স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। কেবল নরম্যান গলার শব্দগুলি-ই জোরালো বলে মনে হল। গির্জার প্রধান ফটকের সামনে দু'সারিতে ভাগ হয়ে গেল জনতা। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে যে যার সম্পত্তিকে ছোঁ দিয়ে ধরে নিল।

কনসটানসকে তার নিজের আত্মীয় স্বজনেরা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো, চুমু খেতে লাগলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে রোসার কোন ক্লান্তি দেখা গেল না। তারপরে অবশ্য মেয়েটির হাত ধরল সে। তার আর একটি হাত ধরল মাদাম তেলিয়ার। ধুলো না লাগে এই জন্যে তার লম্বা মসলিনের স্কার্ট হাতে তুলে নিল ফার্নান্দি আর র‍্যাফেল। মাদাম রিভেতের সঙ্গে লাউসী আর ফ্লোরা পেছনে-পেছনে চলল। এইভাবে চারপাশে পরিবেষ্টিতা হয়ে স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিতা আর সেই সঙ্গে কিছুটা মুহ্যমান হয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে কনসট্যানস বাড়ির পথ ধরলো।

কারখানার ঘরে বিস্তৃত পায়াযুক্ত লম্বা একটা কাঠের মঞ্চের ওপরে খাবার দেওয়া হল। দরজার ভেতর দিয়ে ভোজের আসরে মুখর জনতার কাকলি বাইরে রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আজ উৎসবে মত্ত। প্রত্যেকটি জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাবে রবিবারের সবচেয়ে ভাল পোশাকে সেজে সবাই টেবিলের পাশে বসে খাচ্ছে, প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে আনন্দের কলরব ভেসে আসছে। গ্রাম্য লোকগুলি আস্তিন গুটিয়ে গ্লাসের পর গ্লাস আপেলের নির্যাস থেকে তৈরী করা মদ উদরস্থ করতে লাগলো। প্রত্যেকটি দলের কেন্দ্রে হয় দুটি বাচ্চা মেয়ে না হয় বাচ্চা ছেলে বসে রয়েছে। এরা সবাই নিমন্ত্রিত এবং নিমন্ত্রিতা। মাঝে-মাঝে সেই দুপুরের রোদে দু'একখানা মাথা খোলা গাড়ি রাস্তা দিয়ে ঘড়-ঘড় শব্দ করে যাচ্ছে; যাওয়ার সময় ড্রাইভারটি এই ভোজের উৎসবের দিকে হিংসার দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছে।

ছুতোর মিস্ত্রীর টেবিলে উৎসবের উচ্ছ্বাস যেন কিছুটা চাপা বলে মনে হল, হয়ত সকালের ভাবাবেগ তখনও তাদের একেবারে কেটে যায় নি। কেবল রিভেতই যা কিছু হইচই করছে; এরই মধ্যে সে বেশ কয়েক গ্লাস পেটেও ঢেলেছে। মাদাম তেলিয়ার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। ছুটি দিন বাঁচাতে হলে তাকে তিনটে পঞ্চাশের ট্রেন ধরতে হবে; সেই ট্রেন ফিক্যাম্পে পৌছবে সন্ধ্যে বেলায়।

পরের দিন পর্যন্ত অতিথিদের ধরে রাখার জন্যে ছুতোর মিস্ত্রী বোনের দৃষ্টি

অন্য দিকে ঘোরানোর জন্যে কম চেষ্টা করে নি। কিন্তু মাদাম তেলিয়ারকে সেদিক থেকে বিভ্রান্ত করা গেল না। ব্যবসা নিয়ে ঠাট্টা মস্করা সে পছন্দ করে না। কফি খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের সে তৈরী হয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল; তারপরে ঘুরে ভাইকে বলল: আর যোশেফ, গাড়ি ঠিক করতে বলে দাও, এখনই।

এই বলে সে দোতলায় চলে গেল জামাকাপড় বদলানোর জন্যে। ফিরে এসে সে দেখল তার ভাই-এর স্ত্রী ছোট মেয়েটির বিষয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যে তার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে আলোচনাটা দীর্ঘই হল; কিন্তু ফল প্রাপ্তির দিক থেকে বিশেষ তা কার্যকরী হল না। মা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে প্রস্তাবটা তার কাছে রাখলো; আবেগও কম দেখালো না; কিন্তু মাদাম তেলিয়ার মেয়েটিকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে আদর করল বটে; কিন্তু কোন রকম স্পষ্ট কথা না বলে ইতি-উতি করে এগিয়ে গেল। মেয়েটিকে সে যে ভুলে যাবে না একথা বলতে অবশ্য সে দ্বিধা করল না। ওই পর্যন্ত, তাছাড়া এর পরে, আরও অনেক বার এইভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পাবে তারা; সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ভবিষ্যতে আরও অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে।

তখনও পর্যন্ত কারও দেখা সাক্ষাৎ নেই; না গাড়ি, না মেয়েরা। ওপর থেকে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল; একটা মেয়ের চীৎকারও ভেসে এল। সেই সঙ্গে হো-হো করে হাসি, হাততালিরও আওয়াজ শোনা গেল। গাড়ি ঠিক হয়েছে নাকি দেখতে মাদাম রিভেত আস্তাবলের দিকে যাত্রা করল; এবং অবশেষে মাদাম তেলিয়ার ছুটলো দোতলার দিকে। দেখা গেল, মদের ঝোঁকে রিভেত রোসাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে; আর রোসা হাসতে-হাসতে ফেটে পড়ছে। সকাল বেলাকার ওই রকম গভীর উৎসবের পরে এই ধরনের ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে গেল মাদাম; গোল আলু দুটি রিভেতকে জোর করে ধরে ফেলেছে; শান্ত করার চেষ্টা করছে তাকে। কিন্তু র‍্যাফেল আর ফার্নান্দি দুজনে একযোগে মহা আনন্দে হাততালি দিতে-দিতে রিভেতকে রোসার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছে। বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে মাদাম ভাই-এর কাঁধ ধরে এত জোরে ঘরের বাইরে ঠেলে দিল যে বেচারা দেওয়া-লের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো।

সামান্য কিছুক্ষণের ভেতরে দেখা গেল নিচে উঠোনে দাঁড়িয়ে রিভেত মাথায় জল ঢালছে; তারপরে সে যখন গাড়িটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল তখন সে স্বাভাবিক মানুষ। সবাই গাড়িতে উঠে বসলো; আর সেই সাদা টাট্টু ঘোড়াটি তার স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততার সঙ্গে নাচতে-নাচতে, ঝাঁকানি দিতে-দিতে এগিয়ে চলল। খাওয়ার পরে যেটুকু অবসাদ দেখা দিয়েছিল, প্রখর সূর্যালোকে সে-অবসাদটুকু তাদের কেটে গেল। বর্তমানে যুবতীদের গাড়ির

নাচন আর ঝাঁকানি এতই ভাল লাগল যে তারা আনন্দে চীৎকার করতে-করতে প্রতিবেশীদের জড়িয়ে ধরতে লাগলো। রিভেত যে রোসাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল এই ব্যাপারটাই সবাইকে বেশ রসিকতার উচ্ছ্বাসে দিয়েছিল ভরিয়ে। চারপাশে প্রখর আলোর রশ্মিগুলি রাস্তার ওপরে, গাছের পাতায়-পাতায় নাচতে-নাচতে চললো। রাস্তার পুরু ধুলোর ওপরে দুটো দাগ কেটে গাড়ি ছুটতে লাগলো; পেছনে রেখে গেল রাশি-রাশি ধুলোর মেঘ। ফার্নান্দির গানের নেশা রয়েছে। সে রোসাকে একটা গান গাইতে বলল। রোসা সুরু করল গান—"দি ফ্যাট প্রিস্ট অফ মিদন।" কিন্তু মাদাম তেলিয়ার তাকে তক্ষুণি থামিয়ে দিল। তার মনে হল, আজকের দিনে এরকম একটি গান ঠিক খাপ খায় না।

সে বলল: তার চেয়ে বেরাঙ্গার থেকে কিছু গাও।

একটু থেমে ভাঙা গলায় রোসা 'ঠাকুমার গান' সুরু করল:

ঠাকুমা একটু একটু করে মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে,
বরফের মত সাদা মাথা দোলাচ্ছে; আর বলছে:
"হে প্রিয় প্রেমিকের দল, সে মধুর অতীতে
কতজন আমাকে ভালবাসতে!
হায়রে, তখন আমার কোমর ছিল সরু
আর গালে খেত টোল
আমার পা আর গোড়ালি ছিল গোল
আজ যা নেই, সেই সব লাবণ্য সেদিন আমার ছিল।"

যুবতীরা মাদাম তেলিয়ারের সঙ্গে গলা মিশিয়ে ধুয়া তুলল:

হায়রে, তখন আমার কোমর ছিল সরু
আর গালে খেত টোল
আমার পা আর গোড়ালি ছিল গোল
আজ যা নেই, সেই সব লাবণ্য সেদিন আমার ছিল।"

সেই সুরে মুগ্ধ হয়ে রিভেত চীৎকার করে উঠলো: ঠিক হ্যায়। এইতো চাই:

রোসা গেয়ে চলল গান:

....আমার জন্মে তোমরা সেদিন কোন কিছু
পরোয়া কর নি,
হায়রে, নিদ্রাহীন সেই স্বর্গীয় রাতগুলি আজ কোথায়?
কারণ, পনের বছরে কোথায় আমার আকর্ষণ
তা আমি জানতাম।

সবাই মিলে একসুরে গানের ধুয়া তুলল। একপা গাড়ির গায়ে আর এক পায়ে লাগাম ধরে রিভেত সময় কাটাতে লাগলো। সেই গানের শব্দে টাট্টুটার

মনে আনন্দের জোয়ার লাগলো। সেও প্রচণ্ড বেগে লাফের পর লাফ দিতে লাগলো। সেই ঝাঁকানি সহ্য করতে না পেরে মেয়েরা হুড়মুড় করে গাড়ির ভেতরে গাদাগাদি হয়ে পড়ে গেল। পাগলের মত হাসতে-হাসতে তারা গা ঝেড়ে উঠে বসলো; তারপরে যে যার জায়গায় বসে প্রচণ্ড বিক্রমে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সেই গানটা গাইতে সুরু করল আবার। তাদের গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাকা ফসলের মাঠের পাশ দিয়ে টাট্টু-ও ছুটতে লাগলো, এক-একটা লাফ তার মাঝে-মাঝে একশ গজের মত হয়ে দাঁড়ালো। যাত্রীরা বিপুল আনন্দে হাততালি দিতে লাগলো। মাঝে-মাঝে পথের ওপরে পাথর ভাঙার কাজে রত কোন নিঃসঙ্গ মানুষ অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো একটি গাড়ি একদল সঙ্গীতমুখরা যুবতীদের নিয়ে পেছনে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে তীরের মত ছুটে চলেছে।

স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো। রিভেত দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

"বড় দুঃখের কথা, তোমরা চলে যাচ্ছ। আর ক'টা দিন থাকলে এতগুলি কোকিলকণ্ঠীর গান শোনা যেত।"

মাদাম তেলিয়ার বেশ বিজ্ঞের মতই বলল: সব জিনিসেরই সময় আছে। সব সময় স্ফূর্তি করে কাটানো যায় না।

ছুতোর মিস্ত্রীর মনে একটা সুন্দর মতলব খেলে গেল।

সে বলল: তোমার সঙ্গে দেখা করতে ফিক্যাম্পে আমি একদিন যাব।

মাদাম তেলিয়ার বলল: পার তো যেয়ো; কিন্তু সেখানে ভদ্রভাবে চলবে, বোকার মত নয়।

কোন উত্তর দিল না সে। যখন ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল তখন সে বিদায় জানানোর জন্যে সবাইকে চুমু খেতে লাগলো। রোসার কাছে এসে তার ঠোঁটে মুখ ঘসার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করল; কিন্তু হাসতে-হাসতে ছুটো ঠোঁট চিপে সে তার মাথাকে এপাশে-ওপাশে ঘোরাতে লাগলো; যদিও রোসাকে সে ছুটো হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল তবু একটা হাতে তার চাবুক থাকার ফলে কিছুতেই সে রোসার মুখটাকে নিজের মুখের ওপরে টেনে আনতে পারলো না।

গার্ড এসে বললেন: যাঁরা রাওনে যাবেন তাঁরা কামরায় উঠে যান।

মেয়েরা গাড়িতে উঠে গেল; বাঁশী বাজলো। সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ জোরে শব্দ করতে-করতে, ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ধীরে-ধীরে গাড়িটা চলতে সুরু করল।

স্টেশন ছেড়ে রিভেত রোসাকে শেষ দেখার জন্যে রেলিং ধরে দাঁড়ালো। গাড়িটা যখন মানুষ বোঝাই কামরা নিয়ে তীব্র বেগে তার গন্তব্য পথে এগিয়ে গেল সেই সময় বাতাসের বুকে চাবুক কসাতে-কসাতে সে খুব জোরে-জোরে গান গাইতে লাগলো:

হায়রে, তখন আমার কোমর ছিল সরু
আর গালে খেত টোল
আমার পা আর গোড়ালি ছিল গোল।
আর হারিয়ে যাওয়া লাবণ্য....

কেউ যেন কামরার ভেতর থেকে একটা সাদা রুমাল নাড়লো; দূরান্তে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেটি দেখলো।

(৩)

গন্তব্যস্থলে পৌছানোর আগে পর্যন্ত তারা বেশ শান্তিতেই ঘুমোল। সারা দিনের পরিশ্রমের পরে এই বিশ্রাম অবসাদ নষ্ট করল। সন্ধ্যাবেলার কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে তারা বাসায় ফিরে এল। বাড়িতে ফিরেই মাদাম তেলিয়ার ঘোষণা করল: তোমাদের বলতে আপত্তি নেই, আজ ফিরে আসার জন্যে আমি যথেষ্ট উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে, সাজ-পোশাক শেষ করল; তারপরে বাঁধা খদ্দেরদের জন্যে তারা অপেক্ষা করে রইল। আবার সেই সিঁড়ির ওপরে জাফরির পেছনে সেই পরিচিত লণ্ঠনটি জ্বলে উঠলো; সবাইকে জানিয়ে দিল যে মেষের দল খোঁয়াড়ে ফিরে এসেছে। কী করে জানি নে, খবরটা চারপাশে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কের ছেলে মঁসিয়ে ফিলিপ উদারতার সঙ্গে তুর্নেভোর কাছে একটা জরুরী বার্তা পাঠালেন, তুর্নেভো তখন সংসার-কারাগারে বন্দী হয়ে ছিলেন। রবিবার দিন মাছের কারবারীর বাড়িতে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রায়ই ডিনার থাকতো। সেদিন-ও তাই ছিল। অতিথিদের সঙ্গে তিনি কফি খাচ্ছিলেন এমন সময় একটি লোক এসে তাঁকে চিঠিটা দিল। গভীর উত্তেজনায় খামটি ছিঁড়ে চিঠিটা পড়লেন মঁসিয়ে তুর্নেভো; মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর। পেন্সিলে কিছু লেখা ছিল চিঠিতে:

কড-বোঝাই মাল এসেছে। বন্দরে জাহাজ ভিড়েছে। ব্যবসা করার সুবর্ণ সুযোগ। এখনি চলে আসুন।

পকেটের মধ্যে চিঠিটা রেখে ভগ্নদূতের দিকে মরীয়া হয়ে একবার চেয়ে দেখলেন; তারপরে একটু লাজুক হাসি হেসে বললেন: তোমাদের রেখেই আমাকে এখনই একবার উঠতে হবে।

সেই সংক্ষিপ্ত অর্থদ্যোতক অদ্ভুত চিঠিটি স্ত্রীর হাতে দিয়ে তিনি পরিচারিকাকে কোট আনতে বললেন। রাস্তায় পড়া মাত্রই তিনি ছুটতে শুরু করলেন: ছুটতে-ছুটতে শিস দিতে লাগলেন। এতটা অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর মনে হল রাস্তাটা যেন হঠাৎ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।

মাদাম তেলিয়ারের বাড়িটি উৎসব-শয্যায় সজ্জিত হয়েছে। একতলার ঘরে

নাবিক প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করছে। লাউসি আর ফ্লোরার হয়েছে এক বিপদ। তারা যে কী করবে ভেবেই পেল না। তারা একজনের কোলে বসে মদ খায় তো আর একজন ডাকাডাকি করে। খদ্দের খুশি করতে-করতে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। রোজগার-পাত্তিটা ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে।

রাত্রি ন'টার মধ্যেই দোতলার জুপিটার হল জমজমাট। আরবিট্রেটর মঁসিয়ে ভাস মাদামের পরিচিত স্তাবক। মাদামকে তিনি যে প্রশংসা করতেন তার চরিত্রটি ছিল প্লেটনিক। তিনি এক কোণে বসে মাদামের সঙ্গে বসে শান্তভাবে গল্প করছিলেন। মাঝে-মাঝে আলাপের ফাঁকে-ফাঁকে দুজনের মুখেই হাসির রেখা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দুজনের মধ্যেই একটা বোঝাপড়া হয়ে এসেছে। ভূতপূর্ব মেয়র মঁসিয়ে পলাঁ রোসাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন। রোসা তার মুখটি মঁসিয়ের মুখের কাছে ধরে মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে সম্মানিত ভদ্রলোকের সাদা গোঁফ জোড়া নিয়ে খেলা করছে। তার বেগুনে রঙের স্কার্টটি দাবনার ওপরে ওলটানো; ফলে তার দাবনার কিছুটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। মঁসিয়ে পলাঁর কালো ট্রাউজারের ওপরে তার সাদা দাবনাটি পড়ায় সেটির জেল্লা বেশ বেড়ে উঠেছে। ট্রেনের কামরায় ব্যবসাদার ভদ্রলোকটি তাকে যে নীল গার্টার উপহার দিয়েছিল তার লাল মোজার ওপরে সে দুটি আঁটা রয়েছে।

স্থূলকায়া ফার্নান্দি একটি সোফার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার দুটি পা ট্যাক্স-কালেকটার মঁসিয়ে পিমপেশীর কোলের ওপরে। মাথাটি রয়েছে মঁসিয়ে ফিলিপের কোটের ওপরে। ডান হাত দিয়ে সে মঁসিয়ে পিমপেশীর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে; বাঁ হাতে একটা সিগারেট।

ইনসুয়েরেন্স এজেণ্ট মঁসিয়ে দুপের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে র‍্যাফেল; সে বলল: ঠিক আছে। আজ আর আপত্তি করব না আমি।

এই বলে নিঃসঙ্গ নৃত্যের ছন্দে সে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে-ঘুরতে সে আহ্বান জানালো: আজকে আমার কাছে আপনারা কেউ কিছু চাইলে তা পাবেন।

দরজা খুলে গেল দড়াম করে। চৌকাঠের কাছে মঁসিয়ে তুর্নেভোকে দেখা গেল। সবাই তাকে হইহই করে অভ্যর্থনা জানালো: থ্রি চিয়ারস ফর তুর্নেভো।

র‍্যাফেল তখনও ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; সে দৌড়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল মঁসিয়ে তুর্নেভোর। একটিও কথা না বলেই, তিনি তাকে জোরে জড়িয়ে ধরলেন; পলকের মধ্যে তুলে নিলেন তাকে; তাঁর সেই জীবন্ত বোঝাটি নিয়ে বসার ঘর পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে যে শোওয়ার ঘর ছিল তার মধ্যে ঢুকে গেলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ করতালির সঙ্গে তাঁকে শুভকামনা জানালেন।

রোসা এতক্ষণ ধরে ঘন-ঘন চুমু খেয়ে ভূতপূর্ব মেয়রকে উত্তেজিত করছিল।

তাঁর দাড়ি টেনে-টেনে তার মাথাটাকে সোজা করে ধরছিল। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে তার লাভই হল।

সে বলল: আসুন। তিনি আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথেই আমরা এগিয়ে যাই।

সম্মানিত ভদ্রলোকটি এই কথা শুনে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, পকেটের টাকাগুলি হাত দিয়ে নেড়ে দেখলেন; তারপরে তার পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চারজনের সঙ্গে মাদাম তেলিয়ার আর ফার্নান্দি বসে রই-লেন সেই ঘরে।

ম'সিয়ে ফিলিপ বললেন: আমি শ্যাম্পেনের দাম দেব। মাদাম, তিন বোতল শ্যাম্পেন আনতে বলুন।

ফার্নান্দি সোহাগের সুরে তার কানে ফিসফিস করে বলল: আসুন, আমরা নাচবো, আপনি একটু বাজান।

ম'সিয়ে ফিলিপ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন; ঘরের এক কোণে একটা পুরনো টুল ছিল। সেই টুলের ওপরে বসে তিনি করুণ সুরে একটি গানের কলি বাজালেন। ফার্নান্দি আর ট্যাক্স কালেকটর নাচতে সুরু করল; আর মাদাম আত্মসমর্পণ করল ম'সিয়ে ভাসের প্রসারিত বাহুর মধ্যে। জোড়া দুটি মেঝের ওপরে ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগলো; নাচতে-নাচতে পরস্পর পরস্পরকে খেতে লাগলো চুমু। ম'সিয়ে ভাস উঁচু সমাজের মানুষ; তিনি বেশ মেজাজী চালে নাচলেন। মাদাম তেলিয়ার বেশ প্রশংসার দৃষ্টি নিয়েই তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্রেডারিক শ্যাম্পেন নিয়ে হাজির হল। প্রথম বোতলটির ছিপি খোলার সঙ্গে-সঙ্গে ম'সিয়ে ফিলিপ কোয়াড্রিল নাচতে সুরু করলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরা দুজনেই সমস্ত ভঙ্গিমা আর দ্যোতনার মধ্যে দিয়ে নাচলেন। নাচ শেষ হল, শ্যাম্পেন খাওয়া সুরু হল। একটু পরেই ম'সিয়ে তুর্নেভো ফিরে এলেন। তাঁর অস্থির হৃদয় শান্ত হয়েছে; মুখের ওপরে ফুটে উঠেছে একটা জ্যোতি।

তিনি বেশ চীৎকার করেই বললেন: র‍্যাফেলের ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি নে; আর রাত্রিতে সে একেবারে নিখুঁত।

তাঁর হাতে এক গ্লাস শ্যাম্পেন দেওয়া হল। সেই গ্লাসটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করে তিনি বললেন: একেবারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্তু।

ম'সিয়ে ফিলিপ পোলকা নাচ সুরু করলেন; সেই সঙ্গে সুরু করলেন গান। ম'সিয়ে তুর্নেভো সুন্দরী জু-কে টেনে নিয়ে নাচতে লাগলেন। ম'সিয়ে পিমপেশী আর ম'সিয়ে ভাস আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নাচের আসরে। মাঝে-মাঝে মদের সদ্ব্যবহার হ'তে লাগলো। মনে হল, নাচ যেন আর শেষ হবে না। এমন সময় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পিঠের চুল এলো করে নাইট গাউন

চড়িয়ে, চটি পরে একটা বাতি হাতে নিয়ে হাজির হল রোসা।

সে চেঁচিয়ে বলল : আমি নাচবো।

র‍্যাফেল জিজ্ঞাসা করল : কিন্তু তোমার সেই বুড়ো সঙ্গীটি কোথায় ?

তিনি। তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাজ হয়ে গেলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। দেরী করেন না।

এই বলেই সে মঁসিয়ে ভুপেকে জড়িয়ে ধরল। ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। আবার পোলকা নাচ সুরু হল। এরই মধ্যে তিন বোতল শ্যাম্পেন শেষ।

মঁসিয়ে তুর্নেভো স্বেচ্ছায় বললেন : আমি এক বোতল শ্যাম্পেনের দাম দেব।

মঁসিয়ে বললেন : আমিও এক বোতল।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর করতালির সঙ্গে মঁসিয়ে ভুপে বললেন : আমিও এক বোতল।

নাচ পরিণত হল একটি পূর্ণ বল-এ। এমন কি লাউসী আর ফ্লোরা পর্যন্ত এক একবার দোতলায় দৌড়ে যায় ; একতলায় তাদের খদ্দের বাগিয়ে একটু স্ফূর্তি করে আসে। তারপরে দুঃখের সঙ্গে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে তারা কাফেতে নেমে আসে।

মধ্যরাত্রি এগিয়ে এল ; তবু পূর্ণোদ্যমে নাচ চলছে। মাঝে-মাঝে এক একটি যুবতী হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ; এবং যখনই অপরে জোড় তৈরী করার জন্যে তাকে খুঁজতে যান তখনই তাঁদের মধ্যে একজন না একজন অনিবার্য ভাবেই নিখোঁজ হয়ে যান।

মঁসিয়ে পিমপেশী ফার্ণান্দিকে নিয়ে ঘরে পুনঃপ্রবেশ করলে মঁসিয়ে ফিলিপ তাঁকে ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করেন : আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

ট্যাক্স কালেকটার উত্তর দিলেন : নিদ্রামগ্ন মঁসিয়ে পলাঁকে দেখছিলাম।

এই রসিকতা বিপুলভাবে সফল হল। তাঁদের সকলেই মাঝে-মাঝে ওপরে উঠে গেল নিদ্রাতুর মঁসিয়ে পলাঁকে দেখতে। তাঁদের সঙ্গে একটি বা একাধিক যুবতী গেল। এদিক থেকে কোন যুবতীই কারও আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল না। মাদাম তেলিয়ার চোখ দুটি বন্ধ করে বসে রইলো, কিছু দেখেও দেখলো না। একটি কোণে বসে মাদাম মঁসিয়ে ভাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কোন একটি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল ; তাদের আলোচনা দেখে মনে হল স্থিরকৃত কোন একটি বিষয়ের বিশদ আলোচনায় তারা ব্যস্ত।

অবশেষে রাত্রি প্রায় দুটোর সময় দুটি বিবাহিত ভদ্রলোক মঁসিয়ে তুর্নেভো আর মঁসিয়ে পিমপেশী ঠিক করলেন এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে ; আর দেরী করা যাবে না ; তাঁরা বিল চাইলেন। শ্যাম্পেন ছাড়া অন্য কোন জিনিসেরই দাম ধরা হল না। তাও যথারীতি বোতল পিছু দশের পরিবর্তে ছ' ফ্রাঁ। এই

উদারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হলে মাদাম তেলিয়ার হেসে বলল : আজকের দিনটি স্মরণীয়। এমন দিন প্রায় আসে না।

রোজ

[Rose]

দেখে মনে হল যুবতী দুটি ফুলের চাঁদোয়ার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বিরাট ল্যান্‌ডো গাড়িতে মাত্র তারা দুজন। বিরাট-বিরাট ফুলের তোড়াতে গাড়িটা একেবারে বোঝাই। গাড়ির সামনে যে বসার জায়গা রয়েছে সেখানে ঢাকনি দেওয়া বেশ বড় আকারের দুটো ভায়োলেট বোঝাই ফুলের ঝুড়ি। ঝুড়ি দুটো সাদা সাটিনে মোড়া। ফুলগুলি নিস থেকে আমদানি করা হয়েছে। ভালুকের চামড়ায় যুবতীদের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। হাঁটুর ওপরে নানান জাতের আর রঙের স্তূপীকৃত গোলাপ: সিল্কের তৈরী কৃত্রিম গোলাপের সঙ্গে সেগুলি সব সুতো দিয়ে গাঁথা। মনে হচ্ছে ফুলের ভারে যুবতীদের দুটি কৃশ তনু চ্যাপটা হয়ে যাবে। এই চকচকে সুগন্ধি ফুলের বিছানার বাইরে দেখা যাচ্ছে কেবল তাদের ঘাড়, হাত, গাউনের ওপরের কিছু অংশ। একজনের গাউনের রঙ নীল, আর একজনের লাইল্যাক ফুলের মত।

গাড়োয়ানের চাবুকটি অ্যানিমোন ফুলের খাপে মোড়া; ঘোড়াগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে একজাতীয় সুগন্ধি ফুলের ডাল দিয়ে; গাড়ির চাকায় ফুলের গুচ্ছ। বাতিদানের ওপরে বিরাট গোলাকার দুটি ফুলের তোড়া; ওই দুটি চলন্ত গাড়িটির দুটি অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখ বলে ভুল হবে মানুষের।

অ্যানটিব রাস্তার উপর দিয়ে তীর বেগে ল্যান্‌ডোটা ছুটে চলেছে। সামনে পেছনে চলেছে ফুলের তোড়ায় সাজানো আরও অনেক গাড়ি। সেগুলিতেও সব মহিলাদের দল ভায়লেটের সমুদ্রে ডুবে রয়েছে। ক্যানেতে আজকের দিনটা হচ্ছে ফুলের যুদ্ধোৎসব।

এরা সবাই বুলেভার্ডে পৌছলে সত্যিকার যুদ্ধ সুরু হবে। কারণ এই দীর্ঘ পথটি ধরে দুপাশে লম্বা ফিতের মত অসংখ্য ফুলে বোঝাই গাড়ি ছুটোছুটি করছে। একদল আর একদলের গায়ে ফুল ছুঁড়ছে। ফুলের তোড়াগুলি বাতাসের মধ্যে বুলেটের মত ছুটছে, অসহায় কারও মুখের ওপরে পড়ে ছত্রাকার হয়ে রাস্তার ওপরে যাচ্ছে ঝরে। রাস্তার ছোকরারা সেগুলি সব কুড়িয়ে নিচ্ছে।

রাস্তার ওপরে লোকে গিজগিজ করছে। সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে। হই-চই করছে; কিন্তু সুশৃঙ্খল। ঘোড়ার ওপরে চড়ে পুলিশের

দল জনতাকে সংযত করে ফুটপাতের ওপরে আটকে রেখেছে। তারা মাথা উঁচু করে উদ্ধত ভঙ্গীতে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটা-চলা করছে। যারা কৌতূহলী হয়ে রাস্তার ওপরে নেমে পড়ছে তাদের ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে তারা। মনে হচ্ছে তারা যেন ধনীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে মিশতে দিতে চায় না।

আসা-যাওয়ার পথে গাড়িতে-গাড়িতে ডাকাডাকি চলেছে, চলেছে প্রীতি আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা, সেই সঙ্গে রাশি রাশি গোলাপ ছোঁড়াছুঁড়ি। লাল শয়তানের মত পোশাক পরা সুন্দরী মেয়ে বোঝাই গাড়ি সবাইকে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে সকলকে। চতুর্থ হেনরীর মত দেখতে কোন স্ফূর্তিবাজ যুবক স্থিতিস্থাপক দড়িতে ফুলের তোড়া বেঁধে মহানন্দে অপরের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। এই বর্বরতা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে মহিলারা হাত দিয়ে নিজেদের চোখ ঢেকে ফেলছে; ছোকরারা মহিলাদের আক্রমণ বাঁচানোর জন্যে চকিতে সরিয়ে নিচ্ছে তাদের মাথা। কিন্তু এই পরিচ্ছন্ন প্রভুভক্ত অস্ত্রটি বাতাসে একটি বৃত্তাংশ তৈরী করে আবার তার প্রভুর কাছেই ফিরে আসছে। প্রভুটি কাল-বিলম্ব না করে আর একজনের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সেটিকে।

দুটি যুবতী তাদের ফুলশরের ভাঁড়ার শেষ করে ফেলল; প্রতিঘাতে পেল কয়েকটি ঝলক ফুলের 'বুকে'। প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধ করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তারা; সমুদ্রের উপকূলে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল গাড়োয়ানকে।

পাহাড়ের ওপাশে সূর্য অস্ত গেল; তার রঙিন আলোতে ঝলমল দিক-চক্রবালের ওপরে পাহাড়ের ছায়াচিত্র পড়ল। সমুদ্রের নীল শান্ত জলরাশি পরিচ্ছন্নভাবে দিকচক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে হল, আকাশের অনন্ত গভীর-তার মধ্যে তারা নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে। উপসাগরের মাঝখানে নোঙর করা জাহাজগুলো দেখলে একদল অতিকায় দানবীয় জানোয়ার বলে মনে হবে।

বেশ গরম কম্বলের মধ্যে দেহদুটি ঢেকে যুবতী দুটি ক্লান্তভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে একজন মুখ খুলল: সুখের জীবনে কয়েকটি সুন্দর চমৎকার সন্ধ্যার দেখা মেলে তাই না মারগট?

অপর যুবতীটির উত্তর আসে: হ্যাঁ। আজকের সন্ধ্যাটি বড় সুন্দর। কিন্তু যাই বল ভাই, একটি জিনিসের অভাব রয়ে গেল আজ।

কী বললে। আমার মন আজ আনন্দে ভরে উঠেছে। অপূর্ণতার অভাব নেই আমার।

তা বটে; তবে অভাব একটা আছেই। বর্তমানে তোমার চোখে তা পড়ছে না। আমাদের দেহে যতই সুখ থাক, তাতে সব সময় আমাদের হৃদয় ভরে ওঠে না।

অপর যুবতীটি হেসে বলল: একটু ভালবাসা চাই, এই তো। একটু ভালবাসা চাই—কেমন?

ঠিক তাই।

এর পরে কেউ আর কোন কথা বলল না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে মারগট নামে মেয়েটি নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলল: প্রেম ছাড়া, ভালবাসা ছাড়া বাঁচা যায় না। যাই বল, সিমোন, আমরা সবাই ভালবাসার কাঙাল।

না বন্ধু, না। কেউ আমাকে ভাল না বাসুক সে-ও-ভি আচ্ছা; তবু যে-সে লোকের ভালবাসা আমি পেতে চাই নে। তুমি কি ভাব যে কেউ ইচ্ছে আমাকে ভালবাসলেই আমি খুশি হব? ধর··· এই যেমন···

যার ভালবাসা সে পেতে চায় এই ধরনের একটি মানুষকে খুঁজে বার করার জন্যে সে মনের ভেতরটা হাতড়াতে লাগল; সেই বিস্তৃত উপকূলে সেই ধরনের একটি মানুষকে খুঁজে বার করতে সে চারপাশে তাকালো। দিকচক্রবাল পর্যন্ত অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে তার চোখ দুটি নিবদ্ধ হল তার গাড়োয়ানের পিঠে চকচকে দুটি পেতলের বোতামের ওপরে। হেসে শেষ করল সে তার কথাটা: ধর ওই সহিসটা আমাকে ভালবাসলে আমি কী খুশি হব? উঁহু।

মাদাম মারগট একটু মৃদু হাসলো; তারপরে নিচু গলায় বলল:

তোমার চাকর-বাকররা তোমার প্রেমে পড়লে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে মজার হয়ে দাঁড়ায়। দু'তিনবার আমার জীবনে এরকম মজাদার ঘটনা ঘটেছে। প্রেমে প'ড়ে ভাঁড়ের মত এমনভাবে তারা তাকিয়ে থাকে যে হাসতে-হাসতে মরে যাই আর কী। অবশ্য যত তারা তোমাকে ভালবাসবে তত কঠোরই তোমাকে তাদের ওপরে হ'তে হবে। তারপরে যে-কোন একটা ছুতোতেই চাকরি থেকে তাদের বরখাস্ত করতে বাধ্য হবে তুমি; কারণ, ব্যাপারটা অন্য লোকের চোখে পড়লে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে তোমার।

সামনের দিকে তাকিয়ে মাদাম সিমোন তার কথাগুলি শুনলো; তারপরে ঘোষণা করল: না; আমার পরিচারকের হৃদয়টি আমার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কিন্তু তোমার চাকররা তোমার প্রেমে পড়েছিল এটা তুমি আবিষ্কার করলে কেমন করে?

কেন? অন্যের বেলায় যে-ভাবে আবিষ্কার করি, এখানেও সেইভাবে। প্রেমে পড়লে মানুষ যে বোকা হয়ে যায় তা তুমি জান না?

কিন্তু আমার প্রেমিকরা যে বোকা সে-কথা তো আমার মনে হয় না।

না বন্ধু, না। তারা সত্যিকারের ইডিয়ট হয়ে যায়—না পারে কথা বলতে, না পারে কোন কথার যুতসই উত্তর দিতে; এমন কি, কী যে বলি তা-ও তারা বুঝতে পারে না।

কিন্তু কোন চাকর তোমার প্রেমে পড়েছে এটা বুঝতে পারলে তোমার কেমন লাগে বলতো? খুব খারাপ লাগে না, গর্বে বুক ভরে যায়···কী হয়।

খারাপ? না, তা লাগবে কেন? বুক ফুলে ওঠে? হ্যাঁ; তা একটু ওঠে বইকি। পুরুষ মানুষ, পেশা তার যাই হোক, কোন মেয়েকে ভালবাসলে বুক-

তার ফুলে ওঠারই কথা।

মারগট, সত্যিই?

হুঁ, সত্যি। নিছক সত্যি। আমার জীবনে এই রকম একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তোমাকে তা বলছি। আমার কাহিনী শুনলে তুমি বুঝতে পারবে এই সব ব্যাপারে কী ধরনের অদ্ভুত আর পরস্পরবিরোধী ভাব মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

বছর চারেক আগে আমার কোন পরিচারিকা ছিল না। পরপর পাঁচ ছ'টা পরিচারিকা রাখলাম। কিন্তু সবক'টাই অকর্মণ্য। ভাল লোক পাওয়ার আশা আমি যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় কাগজের একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ল। সেলাই, পোশাকে নকসা, এবং চুল বাঁধার কাজে দক্ষ কোন একটি যুবতী কাজ চায়। ভাল পরিচয়পত্র তার রয়েছে। সেই সঙ্গে সে ইংরেজিও বলতে পারে।

কাগজ থেকে ঠিকানা নিয়ে পত্র দিলাম তাকে। পরের দিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেশ লম্বা-চওড়া মেয়েটি; রোগাটে, কিছুটা ফ্যাকাশে, তার চলা ফেরার মধ্যে বেশ একটা সঙ্কোচ-সঙ্কোচ ভাব। তার চোখ দুটি ভারি সুন্দর কালো, মুখের আদলটাও বড় চমৎকার। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ভাল লেগে গেল। পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে ইংরেজীতে লেখা একখানা পরিচয়পত্র সে আমাকে দেখালো। সে বলল লেডী রিমওয়েলের কাছে সে দশ বছর চাকরি করেছিল। সেই চাকরি সে এইমাত্র ছেড়েছে।

পরিচয়পত্রে লেখা ছিল মেয়েটি স্বেচ্ছায় ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার জন্যে চাকরি ছেড়েছে। তার এই দীর্ঘ চাকুরী জীবনে সামান্য কিছু ফরাসী ন্যাকামি ছাড়া এমন কিছু গর্হিত কাজ সে করে নি যার জন্যে তার মনিব কোন তিরস্কার করার সুযোগ পান।

ইংরাজ মহিলার নীতিবাগীশ ইংরিজি লেখন ভঙ্গীতে আমি একটু হাসলাম মাত্র। তাকে আমি তক্ষুণি পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করলাম। সেইদিনই সে কাজে যোগ দিল। তার নাম রোজ।

মাসখানেকের ভেতরেই তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলাম আমি।

মেয়েটি অদ্ভুত; মুক্তোর মত; যাকে বলে বিস্ময়কর তার দক্ষতা।

চুল বাঁধার দক্ষতাটি তার ছিল অনির্বচনীয়। যে-কোন ভাল দোকানদারের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে সে টুপী পরাতে পারতো; সেই সঙ্গে জানতো পোশাক তৈরী করতে।

তার কৃতিত্বে চমৎকৃত হয়ে উঠলাম। এরকম পরিচারিকা আর কখনও আমি পাই নি।

খুব তাড়াতাড়ি সে আমাকে সাজিয়ে দিত। ওরকম হালকা হাত আমি খুব কমই দেখেছি। আমার দেহের ওপর কোনদিনই তার হাতের স্পর্শ পড়ে

নি; চাকর-বাকরদের হাতে এমন একটা খসখসে ভাব থাকে যা আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারি নে। মেয়েটির সান্নিধ্যে এসে আমি ক্রমশ অলস হ'তে লাগলাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, শেমিজ থেকে দস্তানা পর্যন্ত—এই ভীরু লম্বা মেয়েটি আমাকে সাজাতো; আমি গভীর আনন্দে চুপচাপ পড়ে থাকতাম। মেয়েটির মুখের ওপরে সব সময় একটা মৃদু লজ্জার আভা ছড়িয়ে থাকতো। সে কোন সময়ই কথা বলত না। স্নানের পরে সে আমার গা ঘষে দিত; টিপে দিত হাত-পা। সোফার ওপরে বসে-বসে আমি ঢুলতাম। সত্যি-কথা বলতে কি যদিও সে দরিদ্র ছিল, তবু তাকে আমি বন্ধুর মতই দেখতাম; নিছক পরিচারিকা হিসাবে নয়।

একদিন সকালে দারোয়ান এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার চেহারায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। একটু অবাক হয়েই আমি তাকে ডেকে পাঠালাম। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারার লোক সে—পুরনো সৈনিক—এক সময় আমার স্বামীর আর্দালি ছিল।

কথাটা বলতে গিয়ে সে কয়েকটা ঢোক গিলল; তারপরে কিন্তু-কিন্তু করে বলল: মাদাম, জেলার পুলিশ ইনস্পেকটর সাহেব সদরে অপেক্ষা করছেন।

আমি একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম: কেন?

তিনি ঘর সার্চ করতে চান।

পুলিশের লোকেরা সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু অস্বীকার করি নে। কিন্তু তাদের আমার ভাল লাগে না। পুলিশের কাজটা বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে হয় না আমার। তাই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কেন? সার্চ করবেন কেন? তাদের আমি ভেতরে ঢুকতে দেব না।

দরোয়ান বলল: ইনস্পেকটর সাহেব বলছেন এখানে একজন অপরাধী লুকিয়ে রয়েছে।

কথাটা শুনেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে আমি ইনস্পেকটর সাহেবকে ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললাম। বেশ ভদ্র অফিসার এই ইনস্পেকটর সাহেব—'লিজন অফ অনার' পদক তাঁর পোশাকটির শোভা বর্দ্ধন করেছে। ঘরে ঢুকেই তিনি ভদ্রভাবে আমাকে অভিবাদন জানালেন, অসময়ে আমাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তারপরে শেষকালে তিনি ঘোষণা করলেন যে আমার বাড়িতে একটা জেল-কয়েদী আত্মগোপন করে রয়েছে।

আমি রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলাম, আমি বললাম: এ অসম্ভব; আমার বাড়ির কোন লোকই যে জেল-কয়েদী নয় সে কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। নিজের বক্তব্যটিকে সমর্থন করার জন্যে আমি এক একজনের নাম করতে লাগলাম:

পেয়ারি—আমার দরোয়ান—একজন পুরনো সৈনিক।

তিনি বললেন : ও নয়।

আমার সহিস ফ্রাঁকয় শ্যামপ্যাগনি থেকে এসেছে। পেশায় সে চাষী। তার বাবা আমার বাবার জমিদারীতে চাষ-আবাদের কাজ করে।

তিনি বললেন : ও-ও নয়।

আমার একটি পরিচিত চাষীর ছেলে এখানে আস্তাবলে কাজ করে; তার বাড়িও শ্যামপ্যাগনিতে।

তিনি বললেন : সে-ও নয়।

বললাম : তাহলে মঁসিয়ে, আপনি বুঝতেই পারছেন অনুসন্ধানে ভুল হয়েছে আপনার।

তিনি বললেন : আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম; এদিক থেকে আমার যে কোন ভুল হয় নি সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। চরিত্রের দিক থেকে কয়েদীটি দুর্দান্ত; সেই জন্যে আমি আপনার সমস্ত চাকরদের দেখতে চাই। দয়া করে আপনি কি তাদের ডাকবেন?

প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলাম; তারপরে কী যেন ভেবে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি। সমস্ত চাকর-চাকরাণীদের আমাদের সামনে ডেকে পাঠালাম।

ইনস্পেকটর সাহেব তাদের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই বললেন : আর কোথায়?

বললাম : আমি দুঃখিত মঁসিয়ে। এখানে আর একজনই অনুপস্থিত রয়েছে—সেটি হল আমার নিজস্ব পরিচারিকা। তাকে নিশ্চয় আপনি জেল পালানো কয়েদী বলে ভুল করবেন না?

তাকে দেখতে পারি?

রোজকে ডেকে পাঠালাম। সঙ্গে-সঙ্গে সে হাজির হল। সে ঘরে ঢোকা মাত্র ইনস্পেকটর একটা কী ইঙ্গিত করলেন। দরজার পেছনে যে দুজন লোক লুকিয়ে ছিল তাদের আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। সাহেবের ইশারা পেয়েই তারা পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার হাত দুটো জাপটে ধরে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

রেগে কাঁই হয়ে গেলাম আমি। তাকে বাঁচানোর জন্যে তক্ষুনি আমি ছুটে যেতাম; কিন্তু ইনস্পেকটর সাহেব আমাকে বাধা দিয়ে বললেন : মাদাম, এই মেয়েটি মেয়ে নয়, পুরুষ। এর নাম জাঁ-নিকোলা লিকাপেত। একটি মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করার অপরাধে ১৮৭৯ সালে এর মৃত্যুদণ্ড হয়। পরে সেই মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে একে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাস চারেক আগে এ জেল থেকে পালিয়ে যায়। সেই থেকে আমরা একে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমি তো হতভম্ব, যাকে বলে, বজ্রাহত। তাদের কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না। একটু হেসে সাহেব বললেন : আমি আপনাকে একটি

প্রমাণ দেখাতে পারি। ওর ডান হাতে একটা টাট্টু চিহ্ন রয়েছে।

তার জামার আস্তিন গোটাতেই ইনস্‌পেকটরের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। সাহেবটি তারপরে কিছুটা বোকার মতই বললেন: আর যে সব পরীক্ষা সেগুলি করার জন্যে আমাদের ওপরে আপনাকে আস্থা রাখতে হবে।

এবং তারা সেই মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

এখন, তুমি কি বিশ্বাস করবে আমি যদি বলি যে তখন আমার মন যাতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল সেটা ক্রোধ নয়, একটা ভয়ানক অমর্যাদা? সে যে কৌশলে আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে অপদস্থ করেছে, সেই লজ্জায়, সেই রাগে আমি অভিভূত হই নি; আমি অভিভূত হয়েছি নারীর মর্যাদা সে আমাকে দেয় নি; সে দিক থেকে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বুঝতে পারলে?

না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পারলে না... হায়রে কপাল...ওই লোকটার শাস্তি হয়েছিল কেন? নারী ধর্ষণের জন্যে। আমি ভাবছিলাম সেই মেয়েটির কথা যাকে সে ধর্ষণ করেছিল; এবং এই চিন্তাটাই আমাকে অপমানিত করেছে; অথচ আমাকে এমন ভাবে পেয়েও...এখন তুমি বুঝতে পারলে?

মাদাম মারগট কথা বলল না। একটি অদ্ভুত আর উদাসীন দৃষ্টি দিয়ে তার সহিসের পোশাকের ওপরে যে দুটি চকচকে বোতাম রয়েছে সেই দিকে সে তাকিয়ে রইল শুধু। মাঝে-মাঝে মহিলারা যে রকম রহস্যময় হাসি হাসে সেই রকম একটা বাঁকা হাসি তার ঠোঁটের ওপরে চিকচিক করে উঠল মাত্র।

কবর

(The Tomb)

আঠারো শ' তিরাশি সালের সতেরই জুলাই রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় বেজিয়ারস কারখানার তত্ত্বাবধায়ক কুকুরের চীৎকারে হঠাৎ জেগে উঠলেন। কবরখানার শেষ প্রান্তে একটি ছোট ঘরে তিনি বাস করতেন; রান্নাঘরে বাঁধা থাকতো তাঁর কুকুরটা।

তিনি তক্ষুনি নিচে নেমে এলেন; দেখলেন তাঁর কুকুর দরজার নিচে কী যেন শুঁকছে, আর বেশ রেগে-রেগে চেঁচাচ্ছে। তার চীৎকারের রকম দেখে মনে হল কোন ছিঁচকে চোর হয়তো ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক ভিনসেণ্ট তাঁর বন্দুকটা নিয়ে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জেনারেল বোনেতের অ্যাভিন্যুর দিকে তাঁর কুকুরটা ছুটতে লাগলো, ছুটতে-ছুটতে মাদাম তোমোয়সুর সমাধির কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

সন্তর্পণে কিছুটা এগিয়ে ভিনসেণ্ট লক্ষ্য করলেন ম্যালেঁভারস অ্যাভিন্যুর দিক থেকে সরু একটা আলোর রেখা আসছে। সমাধিমন্দিরগুলির পাশ দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে এগোতে-এগোতে একটি ভয়ানক রকমের অপবিত্র ঘটনা তাঁর চোখে পড়লো।

একটি যুবক একটি যুবতীর মৃতদেহ কবরের ভেতর থেকে বাইরে টেনে এনেছে। যুবতীটিকে আগের দিনই কবরস্থ করা হয়েছিল। একগাদা খোলা মাটির ওপরে ছোট একটা লণ্ঠন বসানো ছিল; সেই ক্ষুদে আলোতেই এই ভীতিকর দৃশ্যটি চোখে পড়লো।

তত্ত্বাবধায়ক ভিনসেণ্ট ক্রিমিন্যালটির ওপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন; তারপরে তার হাত দুটো মোচড় দিয়ে বেঁধে সোজা তাকে নিয়ে হাজির হলেন থানায়।

যুবক আসামী আর কেউ না, ওই সহরেরই একটি উকিল, ধনী, সম্ভ্রান্ত এবং বিশেষভাবে পরিচিত। নাম কোর্বাতেল।

বিচার হল তার। সার্জেণ্ট বার্টাও যে সব ভয়ানক কাজ করেছিল সেই সব ভীতিপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করে পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতে উপস্থিত দর্শকদের চাঙ্গা করে তুললেন।

ঘেন্নায়-পিত্তিতে সবাই ছি-ছি করে উঠলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এজলাসে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে জনতা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো: 'ওকে ফাঁসিতে চড়ান, ওকে ফাঁসিতে চড়ান।' অনেক কষ্টে জনতাকে শান্ত করলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

তারপরে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় তিনি বললেন: অপরাধী, আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার আছে তোমার?

আসামী কোন উকিল নিযুক্ত করে নি। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে নিজেই উঠে দাঁড়ালো। চেহারার দিক থেকে সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী; রঙটা শ্যামলা, পরিচ্ছন্ন মুখ, শক্ত চেহারা, আর নির্ভীক চাহনি।

জনতা ঠাট্টার মেজাজে হিস-হিস করে উঠলো।

এতে সে ঘাবড়ালো না। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করল। প্রথম-প্রথম স্বরটা তার একটু ভারি-ভারি লাগলো; মৃদু লাগলো শুনতে; তারপরে তা শক্তি সঞ্চয় করল।

ধর্মাবতার,

সম্মানিত জুরীর সদস্যবৃন্দ,

বলার সামান্যই আমার রয়েছে। যে-মহিলার সমাধি নিয়ে আমি নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছি সে ছিল আমার রক্ষিতা। আমি তাকে ভালবাসতাম।

আমি তাকে ভালবাসতাম; সে ভালবাসা দেহজ ছিল না; সেই ভালবাসার মধ্যে কোনরকম উদারতাও ছিল না; আমার ভালবাসার মধ্যে

কোনরকম অপূর্ণতা ছিল না। আমি তাকে উন্মাদের মত ভালবাসতাম।

আমার কী বলার রয়েছে শুনুন:

তাকে যখন আমি প্রথম দেখলাম তখনই আমার হৃদয় একটা অদ্ভুত শিহরণে কেঁপে উঠেছিল। তাকে দেখে আমি অবাক হই নি; প্রশংসাও করি নি। এটাকে আমি প্রথম দর্শনে প্রেম বলতে পারি না। একটা সুখের আমেজে আমার হৃদয় ভরে উঠেছিল; ঈষদুষ্ণ জলে অবগাহন করলে এই রকম আমেজ লাগে দেহ আর মনে। তার চালচলন মুগ্ধ করেছিল আমাকে, মোহিত করেছিল তার স্বর। তার বিষয়ে সব কিছু জানা আর দেখার জন্যে আমি অনন্ত আনন্দ নিয়ে বসে থাকতাম। মনে হল, তাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, আগেও তার সঙ্গে আমার যেন দেখা হয়েছে। আমার আবেগের কিছুটা যেন তার মধ্যেও রয়েছে।

মনে হোত, আমার আত্মার সমস্ত আবেদনের প্রতিবেদন তার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে; সেই সমস্ত অস্পষ্ট এবং নিয়ত আবেদন যা চিরজীবন ধরে আমাদের বেঁচে থাকায় উজ্জীবিত করে তোলে।

তার সঙ্গে আরও একটু পরিচিত হওয়ার পরে তাকে আবার দেখার জন্যে আমার মন অপূর্ব উন্মাদনায় পূর্ণ হয়ে থাকতো। তার হাত আমার দেহ স্পর্শ করলে আমার মনে হোত এরকম আনন্দ আর কখনও আমি পাই নি। তার মুখে হাসি দেখলে আমার চোখ আনন্দে চকচক করে উঠতো; মনে হোত, আমি নাচতে-নাচতে চারপাশে ছুটে বেড়াই।

তারপরে সে আমার ঘরে এল, আমার রক্ষিতা হল।

কিন্তু সে আমার নিছক রক্ষিতা ছিল না; সে ছিল আমার জীবন। পৃথিবীতে আর কিছু আমি আশা করি নি, আর কিছুই পেতে চাই নি আমি।

একদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে নদীর ধারে ধারে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। এমন সময় বৃষ্টি নামলো। ঠাণ্ডা লাগলো তার।

পরের দিনই তার ফুসফুস ফুলে গেল। আট দিন পরে মৃত্যু হল তার।

তার মারা যাওয়ার আগে কয়েকটি ঘণ্টা আমি ভয়ে বিস্ময়ে কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। কোন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাই আমার তখন ছিল না।

সে মারা যাওয়ার পরে একটা নৃশংস হতাশা এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলল। কী যে ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু কাঁদলাম।

দেহটিকে সৎকার করার জন্যে যে সমস্ত ভয়ানক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমাদের এগোতে হয়েছিল তা যে কতটা আমার মনের ওপরে চাপ দিয়েছিল তা আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। শোকে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম। কী করছি আর কী করছি না সে-সব বিষয়ে কোন সম্বিৎ ছিল না আমার।

যখন সে মারা গেল, যখন তার দেহ মাটির নীচে ঢাকা পড়লো তখনই আমার মনটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। যে ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় আমি মুচড়ে-মুসড়ে উঠলাম তাতে মনে হল যে ভালবাসা সে আমাকে দিয়েছিল তার জন্যে এই দামটা বড় বেশী দেওয়া হচ্ছে।

তারপরেই একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপলো মাথায়।

আমি তো আর তাকে দেখতে পাব না।

সারাদিন ধরে এই রকম একটা চিন্তা করলে নিশ্চয় আপনারা পাগল হয়ে যাবেন।

ভেবে দেখুন। কিছুক্ষণ আগেও এখানে একজন ছিল। যাকে আপনি ভালবাসতেন। পৃথিবীতে যার সমকক্ষ আপনার কাছে আর কেউ ছিল না; সেই মানুষটি আপনাকে তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিল; আত্মার সঙ্গে আত্মা মিশিয়ে দিয়ে দুজনের মধ্যে সে যে মিলন গড়ে তুলেছিল তারই নাম প্রেম। তার চাহনি ছিল সর্বত্র, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত সেই চাহনি ছিল ছড়িয়ে, পৃথিবীর সহস্র সৌন্দর্যের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী সে ছিল, মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছিল তার মুখ। এই মানুষটি আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে ভালবাসার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দেয়।

এবং তারপরেই হঠাৎ একদিন সমস্ত নিঃশেষ করে সে হারিয়ে গেল। ভেবে দেখুন, কেবল যে আপনার কাছ থেকেই সে হারিয়ে গেল তা নয়, হারিয়ে গেল সকলের কাছ থেকে। সে মৃত। এই শব্দটির অর্থ কী, দ্যোতনা কী তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন? আর কোথাও তাকে দেখা যাবে না; আর কখনও তাকে দেখা যাবে না। চেষ্টা করলেও না। মানুষের সমাজে আর কেউ সে যে স্বরে কথা বলত সেই স্বরে কথা বলবে না।

তার মত মুখ নিয়ে আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না। না, না—আর কখনও না। পাথরের মূর্তির ছাঁচ রেখে দেওয়া যায়; অন্য জিনিসের প্রতিকৃতি ঠিক একইভাবে রক্ষা করা যায়; কিন্তু যে মারা গেল তার দেহ আর মুখ আর কোন দিন পৃথিবীতে দেখা যাবে না। তবু পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হবে, লাখ লাখ কোটি কোটি—অথবা তার চেয়েও অনেক বেশী মানুষ পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াবে, কিন্তু এমন একটি মহিলাকে আপনি খুঁজে পাবেন না যে তারই মত দেখতে। এ-ও কি সম্ভব? একথা ভাবতে গেলেই পাগল হয়ে যায় মানুষ।

কুড়িটা বছর সে বেঁচে ছিল; তার বেশী নয়। তারপরেই সে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। সে ভাবতো, হাসতো, সে ভালবাসতো আমাকে। এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তার। শরৎকালে যে মাছি মারা যায় তার চেয়ে এই বিশ্বে আমাদের দাম এতটুকু বেশী নয়। এতটুকু না। তার সেই নরম সুন্দর তাজা গরম দেহটি কেমন করে মাটির মধ্যে আছে তাই ভাবতে লাগলাম

আমি। এবং তার আত্মা, মন, তার ভালবাসা—এরা সব কোথায় ?

আর তাকে দেখতে পাব না। আর কখনও না। তার সেই গলিত দেহটার কথা বার-বার আমার মনে পড়লো। এখনও হয়ত তাকে আমি চিনতে পারি।

একটা কোদাল, লণ্ঠন আর হাতুড়ী নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কবর-খানার দেওয়ালের ওপরে উঠলাম। যে গর্তের মধ্যে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেটাকে খুঁজে বার করলাম। পুরোপুরি মাটি দিয়ে বোঝাই হয় নি গর্তটা। কফিনের ডালাটা খুলে ফেললাম আমি; তক্তা সরালাম। একটা বিশ্রী গন্ধ, একটা জঘন্য পচা গন্ধ আমার মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হায়রে, কী বিছানাতেই সে শুয়ে রয়েছে, এই বিছানার ওপরে কত দামী আতর ছড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি।

যাই হোক, কফিনটা খুলে আমি লণ্ঠনটা তার ভেতরে ঢোকালাম; দেখলাম তাকে। তার মুখটা নীল হয়ে গিয়েছে, ফুলে উঠেছে দেহটা। বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। মুখের ভেতর থেকে কালো রঙের তরল একটা পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে কষ বেয়ে।

সে! এই কি সেই মেয়ে! প্রচণ্ড একটা ভয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু ঝুঁকে পড়ে তার চুলগুলো ধরলাম হাত দিয়ে; তারপরে তার সেই ভয়ঙ্কর মুখটাকে আমার মুখের দিকে টানতে লাগলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করার পরে মানুষ যেমন সারা রাত্রি ধরে আত্মতৃপ্তির সুবাস নিয়ে ঘুমোয় আমিও সেই রকম আমার প্রিয়তমার গলিত শবদেহের নোংরা গন্ধ গায়ে মেখে সারাটা রাত কাটালাম।

এবার আপনি আমাকে যে শাস্তি হয় দিন।

একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আদালতের মধ্যে থমথম করতে লাগলো। দর্শকরা আরও কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্যে জুরীর সদস্যরা আদালত থেকে উঠে গেলেন। তাঁরা যখন ফিরে এলেন আসামী তখন নির্বিকারভাবে বসে রয়েছে। তার মধ্যে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; কোন রকম চিন্তাও যে সে করছে তাও গেল না বোঝা। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জজসাহেব ঘোষণা করলেন জুরি তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন।

একথা শুনতে তার শরীরে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না; কিন্তু জনতা হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো।

ঘাতক

(The Assasin)

অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করেছেন বয়সে তরুণ একজন কাউনসেল: এইটাই তাঁর প্রথম মামলা। তিনি জুরীদের সম্বোধন করে বললেন: ভদ্রমহোদয়গণ, যে ঘটনাগুলির পটভূমিকাতে এই মামলা সুরু হয়েছে সেগুলিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমার মক্কেল একজন ভদ্রলোক, একজন আদর্শ কর্মচারী, শান্ত এবং ভীরু প্রকৃতির মানুষ। হঠাৎ রাগের বশে তিনি তাঁর মনিবকে হত্যা করলেন কেন একথাটা আমাদের ঠিক মাথায় ঢুকছে না। এই অপরাধের পেছনে যে মনস্তত্ব, যদি অবশ্য তেমন কিছু থেকেই থাকে, রয়েছে সেটি যথাযথ-ভাবে আলোচনা করার অনুমতি আমাকে দেবেন কি? আমার বক্তব্য শোনার পরে আপনারা রায় দেবেন।

জাঁ-নিকোলা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, চরিত্রের দিক থেকে যাকে সরল আর ভক্তিমান করেই মানুষ করা হয়েছে। সত্যিকার অপরাধ হয়েছে এইখানে, অপরকে শ্রদ্ধা আর ভক্তি করার শিক্ষায়। ভদ্রমহোদয়গণ, এটা এমন একটা শিক্ষা আজকাল আমাদের সমাজে যার দেখা আপনারা পাবেন না বললেই হয়। কেবল শব্দটাই রয়েছে পড়ে। এর অন্তর্নিহিত অর্থটাকে আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি। এর দেখা পেতে গেলে অবসরপ্রাপ্ত নম্র ভদ্রলোকদের সংসারে আপনাদের প্রবেশ করতে হবে। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত সামান্য; সেই মুষ্টিমেয় কিছু স্থিতপ্রজ্ঞ, ধর্মপ্রবণ মানুষের কাছে এই নীতিটি আবহমানকাল ধরে তার সমস্ত ভাবমূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে; এর অস্তিত্ব নিয়ে কোনদিনই কোন রকম সন্দেহ পোষণ করেন না তাঁরা।

অপরকে শ্রদ্ধা আর ভক্তি করতে না জানলে যে কেউ মানুষ, সত্যিকার মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এই ধরনের মানুষরা সব সময় চোখ দুটি বুজিয়ে থাকেন; তিনি সব কিছু বিশ্বাস করেন। আর বাকি যারা অর্থাৎ, আমাদের মত পৃথিবীর মানুষরা বিশ্বের দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় দলের মানুষ আমরা। আমাদের কানের ভেতরে অপরের লজ্জাকর ঘৃণ্য কাহিনীগুলি ঢেলে দেওয়া হয়; আমরা মানুষের প্রতিটি নোংরা কাজের ভক্ত ও সমর্থক, প্রতিটি সন্দেহজনক চরিত্রকে আমরা আস্তানা দিই; নারী আর পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান আমাদের কম, রাজার পুত্র অথবা বস্তীর মাতাল—সেদিক থেকে দুই-ই আমাদের কাছে সমান। তারা যে-সমস্ত অন্যায় কাজ করে সেই অন্যায়কে সমর্থন করার জন্যে আমরা তাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাই, দয়া-দাক্ষিণ্য জানাই, প্রতিটি অপরাধীকে বেকসুর খালাস

করে দেওয়ার জন্যে আমরা ন্যায়-ধর্মের বস্তাপচা বুলি আউড়িয়ে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াই। দেশের সবচেয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে সুরু করে সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে নৈতিক অবনতি ঘটেছে তা আমরা বেশ ভাল-ভাবেই দেখছি; আমরা বেশ ভালভাবেই জানি কেমন করে সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেমন করে মানুষের সব কিছু ভাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা অর্থের কাছে আত্মবিক্রয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সারা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘর-বাড়ি, অফিস-কাচারি, আমাদের সম্মান-সম্ভ্রম সামান্য স্বর্ণখণ্ডের বিনিময়ে কত প্রকাশ্যেই না বিক্রীত হচ্ছে? আমাদের বংশগরিমা, ব্যবসায়ের অংশ—কোন কিছুই বাদ নেই; এমন কি আরও সরল ভাষায় বলতে গেলে, নারীর চুম্বনের বিনিময়ে সব কিছু—সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে আমরা প্রস্তুত। আমাদের কর্তব্য, আমাদের পেশা কোন কিছুতেই অজ্ঞ থাকতে আমাদের দেয় না; প্রত্যেককে সন্দেহ করার শিক্ষা দেয় আমাদের, কারণ প্রতিটি মানুষের চরিত্রই সন্দেহজনক। আমরা তখনই বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি যখনই আমরা আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট আমার মক্কেলের মত কোন মানুষের দেখা মাঝে-মাঝে পাই যিনি শ্রদ্ধার নীতিতে এতখানি বিশ্বাসী যে তার জন্যে শহীদ হ'তেও তার কোন আপত্তি নেই।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা সকলেই সম্মানিত, কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই পরিচ্ছন্ন; নোংরা কাজকে আমরা অপছন্দ করতে শিখি নি: ব্যক্তিগত সম্ভ্রম আর গর্বকে আমরা ভুলে যেতে পারি নি। কিন্তু আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় সত্যিকার সম্মানকে ভাস্বর করে রাখার জন্যে যে অন্ধ, সহজাত, আর বর্বর বিশ্বাসের বাতি জ্বালিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় সেই বাতি সেখানে জ্বলে না, যেমন জ্বলছে এই ভদ্রলোকটির অন্তরে।

ওঁর জীবনের কাহিনীটা এবারে আপনাদের শোনাচ্ছি।

মানুষের সমস্ত কাজ ভাল আর মন্দ এই দুটি ভাগে বিভক্ত এই শিক্ষায় যে সমস্ত শিশু মানুষ হয় শৈশব কাল থেকে উনি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত। একটি অনতিক্রম্য নির্দেশের ভিত্তিতে ভাল বলতে কী বোঝা যায় তা তিনি জানতেন; সেই, শিক্ষার বলে দিন আর রাতের মত ভাল আর মন্দের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা তিনি বুঝতে পারতেন। ওঁর বাবা সেই জাতীয় উন্নতমানের মানুষ ছিলেন না যিনি উঁচু চূড়ায় বসে নীচের জীবনকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন; যারা বিশ্বাসের উৎস কোথায় অথবা সামাজিক কোন্ প্রয়োজনে সৎ আর অসতের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা অনিবার্য হয়েছে জানেন, তিনি সেই-জাতীয় মানুষ ছিলেন না।

সেই জন্যেই উনি ধর্ম আর বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গোঁড়া এবং সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠলেন।

বাইশ বছর বয়সে উনি বিয়ে করলেন। বিয়ে হয়েছিল তাঁরই সম্পর্কের

একটি বোনের সঙ্গে। চরিত্রের দিক থেকে, শিক্ষা আর দীক্ষার দিক থেকে তিনিও ছিলেন ওনার মতই সরল প্রকৃতির এবং নির্ভেজাল। এই রকম একটি সচ্চরিত্র এবং ভক্তিমতী মহিলাকে, যা সাধারণত পাওয়া বড় দুষ্কর, স্ত্রী হিসাবে পেয়ে উনি নিজেকে সত্যিকার সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। পিতৃশাসিত সংসারে মাকে দেবতার মত পূজা করে ছেলেরা। উনিও মাকে সেইভাবেই পূজা করতেন। সেই শ্রদ্ধার কিছুটা অংশ উনি ওঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন; বিবাহ-জনিত অন্তরঙ্গতার ফলে সেই শ্রদ্ধা কোনদিনই ওর কমে যায় নি। প্রতারণা কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। চরিত্রে এতটুকু চিঁড় খায় নি ওঁর; একটি অনুত্তেজক শান্ত সুখই ছিল ওঁর জীবনের রসদ। এই সব দিক থেকে উনি ছিলেন একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি নিজে কারও সঙ্গে প্রতারণা করেন নি; কোন দিন কেউ যে ওঁর সঙ্গে প্রতারণা করবে সেকথা ভাবতেও পারেন নি উনি।

বিয়ের কিছুদিন আগে তিনি মঁসিয়ে ল্যাঙ্গলে, যাঁকে উনি সম্প্রতি হত্যা করেছেন, অফিসে কেশিয়ারের চাকরি নেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, মাদাম ল্যাঙ্গলে, তাঁর স্বামীর ব্যবসার অংশীদার আর সেই সঙ্গে তাঁর ভাই মঁসিয়ে পার্থুই, তাঁদের সংসারের প্রতিটি মানুষ, এবং ব্যাঙ্কের প্রতিটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই মামলায় যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে জাঁ-নিকোলা, বর্তমান আসামী, তাঁর সততা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং ওপরওয়ালার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ব্যাপারে একজন আদর্শ কর্মচারী ছিলেন।

তাঁর এই আদর্শ চরিত্রের জন্যে কিছুটা সুযোগ-সুবিধাও তিনি পেয়েছিলেন। এই সম্মানে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন; কেবল তিনিই নন, তাঁর স্ত্রীও। সকলেই তাঁর স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী মারা যান।

তিনি এই মৃত্যুতে যে গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এই দুঃখ ছিল শীতল; কোন কিছু উচ্ছ্বাসেই অনভ্যস্ত হৃদয়ের শান্ত দুঃখ। কেবল তাঁর মুখের পাণ্ডুরাভা আর চাহনির পরিবর্তনই বুঝিয়ে দিত স্ত্রীবিয়োগের ক্ষত তাঁর মনের কতটা গভীরে গিয়ে পৌচেছে।

তারপরেই, ভদ্রমহোদয়গণ, একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা ঘটলো।

এই মানুষটি দশ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। দশ বছর ধরে একটি নারীর নিরবিচ্ছিন্ন সাহচর্য তিনি উপভোগ করেছিলেন। একটি নারীর সেবায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। অফিস থেকে ফিরে আসার পরে একটি নারীর পরিচিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। তিনি তাঁকে নিয়মিত শুভরাত্রি জানাতেন, সকালে উঠে আবার তাঁকে জানাতেন অভিনন্দন; নারীর কানে সেই শব্দ মিষ্টি লাগতো। তাঁর স্ত্রীর অর্ধেক উচ্ছ্বাস আর মাতৃসুলভ

আদর তাঁর জীবনের বোঝা হালকা করত, সময়ের গতিকে শ্লথ করে দিত। হয়ত খাওয়ার বিষয়েও কিছুটা অতিরিক্ত সোহাগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্ত্রীবিয়োগের পরে আর তিনি একা থাকতে পারলেন না। সেই জন্যে এই দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি কাটানোর জন্যে কাছের একটি কাফেতে যেতে সুরু করলেন তিনি। তিনি এক গ্লাস বিয়ার খেতেন; অজস্র ধোঁয়ার মধ্যে বিলিয়ার্ড বলের ছোটাছুটির দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকতেন; কখনও-কখনও পাশাপাশি মানুষদের রাজনৈতিক আলোচনাও তাঁর কানে আসতো; কখনও-কখনও বা খেলোয়াড়দের তর্ক-বিতর্কও শুনতেন; মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারতেন না। কখনও-কখনও ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল রসিকতার অট্ট-হাসিও শুনতে পেতেন। কিন্তু কোন কিছুতেই যোগ দেওয়ার শক্তি ছিল না তাঁর। ক্লান্তি আর একঘেয়েমীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রায়ই তিনি কাফেতে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর মনের নিভৃতে, তাঁর রক্ত-মাংস-মজ্জায় সব সময় একটি নারীর সাহচর্যের জন্যে লালায়িত ছিলেন; এবং প্রতিদিনই নিজের অজ্ঞাতেই কাউণ্টারে যে সুন্দরী যুবতীটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেচাকেনা করত তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এর পেছনে যুক্তি ছিল একটিই; সেটি হল কাউণ্টারের মানুষটি একটি যুবতী নারী।

অনতিবিলম্বেই দুজনের মধ্যে আলাপ জমে উঠলো; তারপর থেকে প্রতি-দিন তিনি মেয়েটির কাছাকাছি বসতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা বেশ ভালই লাগতো তাঁর কাছে। মেয়েটিও এদিক থেকে বেশ উদার ছিল, এই সব ক্ষেত্রে যে রকম উদার হওয়া উচিত সেই রকমই, অনেকটা ব্যবসায়িক উদারতা। এইভাবে মেয়েটি তাঁর মুখে মদের গ্লাস তুলে ধরতে লাগলো—সেটাও ব্যবসার স্বার্থে। কিন্তু দিনের পর দিন জাঁ-নিকোলা লগারি এই অজানা অচেনা মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন; মেয়েটিকে তিনি ভালবেসে ফেললেন; কারণ একটি নারী ছাড়া আর কিছু সে নয়।

এই ক্ষুদে চেহারার সুন্দরীটি মোটেই মূর্খ ছিল না। সে অতি দ্রুতই বুঝে নিল যে এই সরল প্রাণীটিকে সে লাভজনক কাজে ব্যবহার করতে পারে। কী ভাবে তাকে দিয়ে লাভজনক কাজ করা যায় সেই কথাই সে ভাবতে লাগলো। সেদিক থেকে বিজ্ঞের মত কাজ মেয়েটির কাছে একটিই ছিল; সেটি হল তাকে বিয়ে করতে লগারিকে বাধ্য করা।

বিশেষ কোন ঝামেলা না করেই সেই কাজটি সুসম্পন্ন করল মেয়েটি।

ভদ্রমহোদয়গণ, এর পরেও কি আমার বলা দরকার যে মেয়েটির পরবর্তী আচরণ খুবই গর্হিত হয়েছিল? সেই বিবাহ তার স্বাধীন চলাফেরায় বাধা তো দিলই না, বরং তার গতিবিধি আরও লজ্জাকর হয়ে দাঁড়ালো।

নারীর স্বভাবসুলভ চাতুরীর বলে এই সৎ মানুষটিকে তাঁর অফিসের সমস্ত সহকর্মীদের কাছে প্রতারণা করার আনন্দে মসগুল হয়ে রইল;—আমি

বলছি—সমস্ত সহকর্মীদের কাছে। ভদ্রমহোদয়গণ, এ বিষয়ে আমাদের কাছে চিঠিপত্র রয়েছে। অনতিবিলম্বে ব্যাপারটা জনসাধারণের কাছে একটা নিন্দাজনক আলোচনায় পরিণত হল; সবক্ষেত্রে যে রকমটি হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই হল। এই নিন্দার কথা এক স্বামী ছাড়া অন্য সবাই জানতে পারলো।

অবশেষে এই চরিত্রহীন রমণী নিছক স্বার্থসিদ্ধির আশায় উদ্বোধিত হয়ে, ব্যাপারটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না, ফার্মের বড় কর্তার ছেলেটিকে কুপথে টেনে আনলো। ছেলেটির বয়স উনিশ। সেই তরুণটির মনের ওপরে এবং দেহেও, একটা ঘৃণ্য প্রভাব বিস্তার করে বসলো। তাঁর এই কর্মচারীটির প্রতি সদয় থাকার জন্যেই ম'সিয়ে ল্যাঙ্গলে এত দিন সব জেনেও চোখ দুটি বন্ধ করে বসেছিলেন; কিন্তু যেদিন তিনি তাঁর পুত্রটিকে ওই রমণীর হাতের মধ্যে, অর্থাৎ বাহু দুটির মধ্যে আলিঙ্গনাবস্থায় দেখলেন সেদিন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না; ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এই ক্রোধের পেছনে তাঁর যে যুক্তি ছিল সেটিকে অযৌক্তিক বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

কিন্তু তিনি পিতৃসুলভ ঘৃণার বশবর্তী হয়ে তক্ষুণি লগারেকে ডেকে উত্তেজনার বশে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে গিয়েই চরম ভুল করলেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, এর পরে কেমন ক'রে হত্যাটি সংগঠিত হল তা জানার জন্যে মৃত ব্যক্তিটি মৃত্যুর আগে যে কথাগুলি বলে গিয়েছেন, এবং যেগুলি তাঁর শেষ এজাহার হিসাবে সরকারী দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সেই থেকে আমি আপনাদের পড়ে শোনাই—

আমি এইমাত্র খবর পেলাম যে আমার ছেলে গতকাল ওই মেয়েটাকে দশ হাজার ফ্রাঁ দিয়েছে! খবরটা শুনেই প্রচণ্ড ক্রোধে আমার সমস্ত জ্ঞান লোপ পেল। অবশ্য এদিক থেকে কোনদিনই আমি লগারেকে সন্দেহ করি নি; তবু কোন কিছু না দেখে করাটা মাঝে-মাঝে অন্যায় কিছু করার চেয়ে বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

আমি তাকে ডেকে পাঠালাম; সে এলে তাকে জানিয়ে দিলাম চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করতে আমি বাধ্য হয়েছি।

এই কথা শুনে আমার সামনে সে চুপচাপ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল, আমার কথার অর্থটা তার মাথায় ঢুকলো না। শেষকালে বেশ জোরের সঙ্গেই এর কারণটা জানতে চাইলো।

ঘটনাটির সঙ্গে আমার একান্ত গোপনীয় একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার জড়িয়ে ছিল বলেই কারণ জানাতে অস্বীকার করি আমি। এতে তার মনে হল, আমি বুঝি তার চরিত্রে সন্দেহ করেছি, তার দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছি। এই রকম একটা সন্দেহ হওয়ার ফলে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠলো; ব্যাপারটা ঠিক কী তা খোলাখুলিভাবে বলার জন্যে সে প্রথমে অনুনয় জানালো, তারপরে নির্দেশ দিল। এই রকম একটা সন্দেহ তার মাথার মধ্যে ঢোকায়, কারণটা

বলার জন্যে বারবার সে আমাকে তাগিদ দিতে লাগলো; তার মনে হল, কারণটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম দেখে সে আমাকে গালাগালি দিতে লাগলো; এবং এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে আমার মনে হল এখনই হয়তো আমাদের মধ্যে হাতাহাতি সুরু হয়ে যাবে।

তারপরে হঠাৎ সে আমাকে একটা অপমানজনক কথা বলল; কথাটা আমার মর্মে গিয়ে আঘাত করল; এবং সত্যি কথাটা তার মুখের ওপরে বলে দিলাম।

কয়েকটি মিনিট সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; আমার দিকে তাকিয়ে রইল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে; তারপর আমি দেখলাম আমার দেরাজের ভেতর থেকে সে একটা লম্বা ঘাস-কাটা কাঁচি বার করে নিল; তারপরেই সে হাত উঁচু করে আমার দিকে দৌড়ে এল; মনে হল, বুকের ঠিক ওপরে আমার গলার মধ্যে একটা শক্ত জিনিস ঢুকে গেল; তার জন্যে কোন যন্ত্রণা বুঝতে পারি নি আমি। ভদ্রমহোদয়গণ, আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামীর এইটুকুই বলার রয়েছে। প্রথম স্ত্রীকে যেমন সে শ্রদ্ধা করত, দ্বিতীয় স্ত্রীকেও তেমনি অন্ধভাবেই সে শ্রদ্ধা করত।'

সামান্য কিছু আলাপ আলোচনার পরে বেকসুর খালাস পেল আসামী।

মিস্‌তি

(Misti)

একটি অবিবাহিতের স্মৃতিচারণ থেকে।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে আমার অদ্ভুত প্রকৃতির একটি প্রেমিক ছিল। দেখতে বেঁটে-খাটো। প্রেমিকাটি অবশ্য বিবাহিতা ছিল; কারণ অবিবাহিতা মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা ভয় ছিল। সত্যি কথা বলতে কি অবিবাহিতা মেয়েদের অসুবিধে দুটো। প্রথমত তারা বিশেষ কারও নয়; দ্বিতীয়ত, সকলের কাছেই তারা সমানভাবে উপভোগ্যা। এই রকম সর্বভূতে প্রেম বিতরণকারিণীকে প্রেমিকা হিসাবে পাওয়ার মধ্যে আনন্দ কোথায়? আর সত্যিই, নীতির কথা ছেড়ে দিয়েও, পেশাগত প্রেমটাকে আমি কেমন বরদাস্ত করতে পারি নে। কোন মহিলা ভালবাসাটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে জানতে পারলে বিরক্তিতে আমার শরীর রি-রি করে ওঠে। জানি, এটা আমার দুর্বলতা; তবু আমি তা স্বীকার করছি।

কোন একটি বিবাহিতা রমণীকে প্রেমিকা হিসাবে পাওয়াটা যে-কোন

অবিবাহিত পুরুষের পক্ষেই আনন্দের কথা। সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে প্রেমিকা তাকে একটা আস্তানা দেয়, সেই সঙ্গে দেয় ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম,—এমন একটা ঘরোয়া আমেজের সৃষ্টি করে যেখানে সবাই—স্বামী থেকে সুরু করে বাড়ির চাকর-চাকরাণীরা পর্যন্ত—তোয়াজ করতে-করতে তাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলে। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, বিছানা, খাবার টেবিল, এমন কি শিশুর পিতৃত্ব পর্যন্ত—এক কথায় ঘরের সুখ বলতে যা বোঝায় সব এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেই আনন্দে। তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকে বিরাট একটা সুবিধে। সুবিধেটা হল, প্রয়োজনবোধে মাঝে-মাঝে আপনি বাড়ি বদল করতে পারবেন; গ্রীষ্মের সময় ঘুরে-ফিরে হয়ত গ্রামে গেলেন, কোন শ্রমিকের বাড়িতে হাজির হলেন; শ্রমিকটি তার বাড়িতে একটি ঘর আপনাকে দেবে থাকতে, শীতকালে হয়ত মধ্যবিত্ত কোন সংসারে আস্তানা নিলেন; অথবা আপনার যদি উচ্চাকাঙ্খা থাকে, বা বেপরোয়া হ'তে পারেন, তাহলে এমন কি কোন ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও আশ্রয় পেতে পারেন আপনি।

আমার আর একটা দুর্বলতা রয়েছে। আমি আমার প্রেমিকাদের স্বামী-দের পছন্দ করি। স্বীকার করি এমন অনেক স্বামী রয়েছে যাদের রুচি স্থূল এবং বিকৃত। যত সুন্দরীই হোক, সেই সব স্বামীদের স্ত্রীদের আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু যে-স্বামীদের সূক্ষ্ম রসবোধ এবং রুচিবোধ রয়েছে তাদের আমি ভাল না বেসে পারি নে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে-বুকে গেলেও, তার স্বামীর সঙ্গে যাতে কাট ছাঁট না হয় সেদিক থেকে আমি বেশ সতর্ক থাকি। এইভাবেই জীবনে আমি অনেক ভাল বন্ধু সংগ্রহ করেছি; এবং পুরুষরা যে এদিক থেকে নারীদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত তার প্রমাণ আমি অনেকবার পেয়েছি। কোন রকম সন্দেহের ছায়াপাত হলেই, মেয়েরা আপনাকে যত রকমে পারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে; হই-চই করবে, তিরস্কার করবে; আপনাকে বিব্রত করার যত রকমের অস্ত্র তাদের হাতে রয়েছে তাদের কোনটাই ব্যবহার করতে তারা দ্বিধা করবে না। আর স্বামীরা, যদিও অভি-যোগ করার সমান অধিকার তাদেরও থাকে, আপনার সঙ্গে গৃহদেবতার মত ব্যবহার করবে।

যা বলছিলাম। আমার প্রেমিকা বেঁটে-খাটো চেহারার একটা বেশ মজার মহিলা ছিল: কালো রঙ, খামখেয়ালী, অদ্ভুত প্রকৃতির, ধর্মপ্রবণা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধুর মত বিশ্বাসী—কিন্তু বড় লাবণ্যময়ী। সবার ওপরে তার একটা মাদকতা ছিল; সেটা নিহিত ছিল তার চুমু খাওয়ার রীতিতে। তার চুমু খাওয়ার ধরনটা এত চমৎকার ছিল যে-রকমটি আমি অন্য কোন মহিলার মধ্যে দেখতে পাই নি।...কিন্তু সেসব কথা এখন থাক....আর কী নরম তার চামড়া। আর তার চোখ দুটি...তার চাহনি মনে হবে একটা অনির্বচনীয় মিষ্টি সোহাগ যেন আপনার সারা সত্তার ওপরে আদর করে বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রায়ই আমি

তার কোলের ওপরে মাথা রেখে শুয়ে চুপচাপ থাকতাম ; নারীদের স্বভাবসিদ্ধ প্রাণ কাঁপানো মিষ্টি ছোট-ছোট হাসির টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে সে আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়তো, আমি ধীরে-ধীরে উঁচিয়ে দিতাম আমার মুখ। মনে হোত, কোন সুস্বাদু মদ কোঁটা-ফোঁটা ক'রে সে আমার মুখের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে ; আমি তাই একটু-একটু করে পান করছি ; আমার সারা শরীর আর মন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে।

তার স্বামী ছিলেন সরকারী চাকুরে ; চাকুরির খাতিরে তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হোত ; ফলে সন্ধ্যাবেলাটা প্রায়ই আমাদের ফাঁকা থাকতো। অনেক দিনই ওই সময়টা আমি তার ঘরে কাটাতাম। ডিভানের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতাম আমি। আমার কপালটা তার একটা পায়ের ওপরে থাকতো চাপানো ; তার অন্য একটা পায়ের ওপরে শুয়ে থাকতো একটা বিরাট কালো বিড়াল। তার নাম ছিল মিস্তি। বিড়ালটাকে সে বড় ভালবাসতো। সেই জানোয়ারের পুষ্ট কাঠের ওপরে সিল্কের মত চকচকে লোমের ভেতরে চিরে-চিরে আমাদের হাতের আঙুলগুলি পরস্পরকে সোহাগ জানাতো। আমার গালের ওপরে গা ঘেষে শুয়ে থাকতো বিড়ালটা ; শুয়ে-শুয়ে গর-গর করে সারাক্ষণই সে শব্দ করতো। কখন-ও বা থাবাটা তার আমার মুখের ওপরে ছড়িয়ে দিত ; চোখের ওপরে মেলে দিত তার পাঁচ-পাঁচটা খোলা নখ ; সেই নখগুলো দিয়ে আমার গালে খোঁচা দিয়ে বিদ্যুতের বেগে আবার থাবার মধ্যে ঢুকিয়ে নিত।

মাঝে-মাঝে আমরা কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতাম। আসলে সেগুলি সব নির্দোশ উচ্ছৃঙ্খলতা। কখনও-কখনও আমরা একটু দূরের রেঁস্তোরাতে গিয়ে খেতাম ; অথবা, বাড়িতে খাওয়া সেরে, বাইরে ঘুরে আসতাম, কোনদিন বাঁধন ছেঁড়া ছাত্র ছাত্রীদের মত আমরা নিচু দরের রেঁস্তোরাতে হাজির হতাম।

মাঝে-মাঝে একেবারে জলো মদের দোকানে হাজির হতাম আমরা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সেই ঘরের এককোণে একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিলের ধারে গিয়ে সরু লিকলিকে মচকানো চেয়ারের ওপরে বসতাম। ডিনারের পরে ভাজা মাছের যে উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে তার ভেতর থেকে একটা তীব্র কটু গন্ধ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো। ছোট জামা গায়ে দিয়ে খদ্দেররা সব গোলমাল করতো আর ব্রানডি টানতো। ওয়েটাররা আশ্চর্য হয়ে আমাদের পরিবেশন করতো 'চেরি' ব্রানডি।

মিসতি ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে দু'ভাঁজ করা কালো ঘোমটাটা নাকের ওপরে তুলে দিয়ে সে মদের পেয়ালাতে চুমুক দিত—মনে হোত, সে যেন পরম পরিতৃপ্তিকর কোন একটা পাপ করছে। শেরির এক একটা ঢোক তার গলার ভেতর দিয়ে ঢুকছে, আর সে ভাবছে, একটা পাপ করা হল ; নিষিদ্ধ

জিনিস ভক্ষণ করায় মানুষের যে আনন্দ রয়েছে এ আনন্দ তার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না আমার প্রেমিকার কাছে।

তারপরে সে আমাকে বলতো: এবারে চল, ওঠা যাক। আমরা বেরিয়ে আসতাম। মাথা নিচু করে ছোট ছোট পা ফেলে অতিথিদের পাশ দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরে আসতো; মদ্যপায়ীরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখতো; রাস্তার ওপরে বেরিয়ে আসার পরে আমরা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম; মনে হোত যেন একটা বিষম বিপদ থেকে এইমাত্র মুক্তি পেয়েছি আমরা।

মাঝে-মাঝে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করত: আচ্ছা এই রকম কোন জায়গায় কেউ যদি আমাকে অপমান করে তাহলে তুমি কী করবে? আমি বড়াই করে বেশ উচ্চ নাদেই বলতাম: করলেই হল? আমি তোমাকে রক্ষা করতাম। এই কথা শুনে সে পরম সুখে আমার হাত ধরে মোচড় দিত; তার হাবভাব দেখে মনে হোত, সে যেন এই রকমের একটা পরিস্থিতি ঘটুক তাই চাইছে। সে যেন চাইছে কেউ তাকে অপমান করুক; আর আমি তার সঙ্গে সকলের সামনে লড়াই করি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা মন্টমার্টি কাফেতে একটি টেবিলের ধারে বসে রয়েছি এমন সময় একগোছা তেল চিটচিটে ময়লা তাস হাতে নিয়ে একটা ভিখারিণীকে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম। সম্ভ্রান্ত একটি মহিলা বসে রয়েছে দেখে বৃদ্ধাটি সোজা আমাদের কাছে এসে হাজির হল; বলল আমার সঙ্গিনীর ভাগ্য গণনা করে দেবে। এমার (আমার প্রেমিকার নাম) আস্থা ছিল অসীম। পৃথিবীর সব কিছুই সে বিশ্বাস করতো। তার কথা শুনে সে যুগপৎ পুলকিত হল, আর অস্বস্তিতে পড়লো। ডাইনী চেহারার বুড়ীটাকে সে নিজের পাশে বসতে দিল।

বৃদ্ধাটিকে ডাইনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি আমি। কাঁচা মাংসের আংটি তার কপালের ওপরে ঝোলানো; দন্তহীন মাড়ি। সে-চেহারা দেখলে এমনিতেই অস্বস্তি জাগে। সে তার সেই নোংরা তাসগুলি টেবিলের ওপরে বিছিয়ে দিল। সে সেগুলিকে একসঙ্গে জড় করল, আবার দিল বিছিয়ে; বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগলো। বিবর্ণ মুখে, দুঃখ আর কৌতূহলে হাঁপাতে-হাঁপাতে এমা সব শুনতে লাগলো; উত্তেজনায় তখন তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে।

মুখ খুললো ডাইনী বুড়ী। তার ভবিষ্যৎ বাণীগুলির সব ক'টিই অস্পষ্ট: সুখ এবং ছেলেপিলে, একটি সুন্দর যুবক, ভ্রমণ, অর্থ, মামলা, একজন কালোপানা ভদ্রলোক, একটি বন্ধুর প্রত্যাবর্তন, একটি সফলতা এবং একটি মৃত্যু। মৃত্যুর কথাটা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার সঙ্গিনীটি বিব্রত হয়ে উঠলো। কার মৃত্যু? কখন? কেমন করে?

বৃদ্ধাটি বলল : সে-কথা আমার এই তাস দিয়ে বলা শক্ত। যদি জানতে চাও কাল আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা করতে হবে। আমি কফির চিহ্ন দিয়ে তা তোমাদের বলে দেব। কফির চিহ্ন কোনদিন মিথ্যে কথা বলে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে এমা আমার দিকে তাকালো।

কাল আমরা যেতে পারি, কি বল ? চল, চল ; লক্ষ্মীটি ! না গেলে আমি কী রকম কষ্ট পাব তা তুমি বুঝতে পারছ না।

আমি হাসতে লাগলাম।

ঠিক আছে। তুমি যেতে চাইলে নিশ্চয় যাব।

বৃদ্ধাটি তার ঠিকানা দিয়ে গেল।

বুতিস-শ্যামোণ্ট-এর পেছনে যে ভীতিপ্রদ বাড়িটা রয়েছে তারই ছ'তলায় বৃদ্ধাটি থাকতো। পরের দিন সেখানে হাজির হলাম আমরা।

ঘর তো নয় যেন একটা চিলেকোঠা। দুটি চেয়ার আর একটি বিছানা ; অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসে ঘরটা একেবারে বোঝাই। পেরেক থেকে চারপাশে নানারকম গাছের ডাল ঝুলছে ; মরা জানোয়ারের শুকনো দেহ, বোতল, শিশি—শিশির ভেতরে নানারকম তরল পদার্থ ভর্তি। টেবিলের ওপরে একটা কালো বিড়াল। তার চকচকে চোখ দুটো দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাকে দেখেই মনে হল এই অশুভ ঘরের সেইটিই হল অশুভ আত্মা।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়েই এমা আমাকে লক্ষ্য করে বলল : দেখ দেখ, বিড়ালটাকে দেখ। ঠিক আমাদের মিস্‌তির মত দেখতে, নয় ?

তারপরেই সে বৃদ্ধাটিকে বুঝিয়ে দিল যে তারও একটা ওই রকম বিড়াল রয়েছে। একেবারে ওই রকম দেখতে।

ডাইনীটি বেশ গম্ভীর গলাতেই বলল : যদি তুমি কাউকে ভালবাস তাহলে কখনও বিড়াল পুষবে না।

রীতিমত ভয় পেয়ে এমা জিজ্ঞাসা করল : কেন ?

বেশ সহজভাবেই বৃদ্ধাটি তার পাশে বসে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল : আমার জীবনে দুঃখ বয়ে এনেছে।

আমার বান্ধবীটিকে আর ধরে রাখা গেল না। বৃদ্ধার জীবনে কী করে সে দুঃখ ডেকে আনলো তা শোনার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। সেই কথা বলার জন্যে সে বৃদ্ধাটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। অলৌকিকত্বে বিশ্বাসিনী দুটি নারী একইভাবে চিন্তা করে ; ফলে তারা হৃদয় আর মনের দিক থেকে খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের ভগ্নীর স্থান অধিকার করে ফেলল। অবশেষে বৃদ্ধাটি মনোস্থির করে ফেলল।

সে বলল : বিড়ালটাকে আমি নিজের ভাই-এর মত ভালবাসতাম। যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়স ছিল কম ; আর একাই থাকতাম

আমি। ঘরে আমি সেলাই-এর কাজ করতাম। মনটন (বিড়ালের নাম) ছাড়া আর কেউ আমার নিজের বলতে ছিল না। এখানকারই একজন বাসিন্দা ওকে দিয়েছিল। শিশুর মতই ও ছিল চালাক; সেই সঙ্গে শান্ত-ও। আমাকে ও পুজো করত; অন্ধপূজারী বলতে যা বোঝা যায় ও ছিল তা-ই। সারা দিন ধরে ও আমার কোলে বসে ঘড়-ঘড় শব্দ করত। সারা রাত আমার বালিশের ওপরে আরাম করে শুয়ে থাকতো। ওর বুকের ধুঁকধুঁকানিটা পর্যন্ত আমি শুনতে পেতাম; হ্যাঁ, পেতাম।

এই সময় একটি যুবকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। ছেলেটি সুন্দর; ছিটের দোকানে সে কাজ করত। এইভাবে মাস তিনেক কাটলো। এর ভেতরে তাকে আমি কিছুই দিই নি। কিন্তু তুমি জান ব্যাপারটা কী। ধীরে-ধীরে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে—সকলের জীবনেই এ-রকম ঘটনা ঘটে। তা ছাড়া, ছেলেটিকে আমিও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। ছেলেটা সত্যিকার ভাল; আচার-ব্যবহার একেবারে নিখুঁৎ। হৃদয়টা তার বড় উদার ছিল। ব্যয়-সঙ্কোচ করার জন্যে সে চেয়েছিল আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকি। একদিন সন্ধ্যের সময় আমার ঘরে আসার জন্যে তাকে আমি নিমন্ত্রণ করলাম। একসঙ্গে বাসা বাঁধবো কিনা সেবিষয়ে তখনও আমি মনোস্থির করে উঠতে পারি নি—না, না, পারি নি। তবে ঘণ্টাখানেক এক সঙ্গে থাকার চিন্তাটা আমার ভালই লেগেছিল।

প্রথম দিকে সে বেশ সংযতই ছিল। তার মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনে আমার মনটা নড়ে উঠলো। মাদাম, তারপরে সে আমাকে চুমু খেল—একটি দীর্ঘ প্রেমিকের চুম্বনে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। চোখ দুটি বন্ধ করে বিকল হয়ে আমি তখন একটি স্বর্গীয় আনন্দে মসগুল হয়ে রয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঠেলে দিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো যন্ত্রণায়। সে চীৎকার আমি আজও ভুলতে পারি নি। চোখ খুলে দেখি মনটন তার মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নখ দিয়ে তার গলাটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ছিঁড়ছে। স্রোতের মত রক্ত ঝরে পড়ছে তার গাল থেকে।

আমি বিড়ালটাকে টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম; কিন্তু পারলাম না। সে শক্ত করে তার গালের মাংস কামড়ে ধরেছে। সে ক্রমাগত তাকে আঁচড়াতে লাগলো; রাগে সে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে আমাকেও সে আঁচড়াতে এলো। শেষ কালে অনেক কষ্টে তাকে আমি ধরে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপরে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলাম। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল; তাই জানালাগুলো খোলা ছিল।

হতভাগ্য বন্ধুটির মুখ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি দুটি চোখই তার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাকে হাসপাতালে যেতে হল; কিন্তু বাঁচলো না। মনের দুঃখে কাতরাতে

কাতরাতে একটি বছর পরে সে মারা গেল। আমি তাকে এখানে এনে সেবা-যত্ন করতে আর খাওয়াতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে এল না। ওই ঘটনার পরে সে আমাকে রীতিমত ঘৃণা করতে লাগলো।

নীচে পড়ে যাওয়ার ফলে মনটন তার পিঠের শিরদাঁড়াটা ভেঙে ফেললো। এবাড়ির দরোয়ান ওর দেহটাকে কুড়িয়ে এনে দিল। বিড়ালটার ওপরে আমার কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। আমি ওর শিরদাঁড়াটা ভাল করে বেঁধে দিলাম। ও যে ওরকম একটা কাজ করল তার একমাত্র কারণ ও আমাকে ভালবাসতো। তাই নয় কী?

কাহিনীটি শেষ হল বৃদ্ধার। মরা জানোয়ারের দেহটিকে হাত দিয়ে সে একবার চাপড়ালো; সেই শীর্ণ কঙ্কালটা কেঁপে-কেঁপে উঠলো।

এমার মনটাও তখন মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে। যে 'মৃত্যু'র কথা শুনতে আসা সে কথা সে একেবারেই ভুলে গেল। যাই হোক, ও নিয়ে আর সে কোন কথাই বলল না। বৃদ্ধাকে পাঁচটি ফ্রাঁ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

পরের দিনই এমার স্বামী ফিরে এলেন। সেই জন্যে কয়েকটা দিন তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।

তারপরে আবার তার বাড়িতে আমাদের যখন দেখা হল তখন মিস্তিকে দেখতে না পেয়ে আমি একটু অবাকই হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায়?

এমা লজ্জায় একটু হেসে বলল: তাকে আমি বিলিয়ে দিয়েছি। তাকে আমার ভাল লাগছিল না।

আশ্চর্য হলাম।

ভাল লাগছিল না। ব্যাপারটা কী বলতো?

একটি দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিয়ে এমা বিড়-বিড় করে বলল: মিষ্টি ছেলে, আমার ভয় লাগছিল তোমার চোখ দুটির জন্যে।

দরজা
(The Door)

কার্ল ম্যাসোলিগনি চেঁচিয়ে বললেন: আঃ! বিনয়ী স্বামীদের প্রশ্নটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। অনেক জাতের স্বামী আমি দেখেছি; কিন্তু তবু

তাদের কারও বিষয়েই কোন মত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা অন্ধ, না দুর্বল, না অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির মানুষ তা জানার জন্যে আমি কম চেষ্টা করি নি। আমার ধারণা কিছু স্বামী রয়েছে, যারা একসঙ্গে তিনটি শ্রেণীর।

অন্ধ স্বামীদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনার কিছু নেই। তাদের ঠিক আমরা বিনয়ী বলতে পারি নে; কারণ, তারা কিছুই জানে না; কিন্তু প্রাণী হিসাবে তারা ভালই, নাকের বাইরে তারা কিছু দেখতে পায় না। কত সহজে মানুষকে—পুরুষ এবং মহিলা, আমি সমস্ত মহিলাদেরই বলছি—ঠকানো যায় তা লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক আর চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের বন্ধুবান্ধব, চাকর-বাকর ব্যবসায়িক প্রতিনিধি—যারা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কত সহজেই না আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। সহজে বিশ্বাস করার প্রবৃত্তিটা মানুষের সহজাত। যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে আমরা প্রতারণা করি, অন্য লোকের প্রতারণা অনুমান করে তাকে বানচাল ক'রে দেওয়ার জন্যে আমরা তার দশ ভাগের এক ভাগও বুদ্ধি খাটাই না।

বিনয়ী স্বামীদের আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থের জন্যে, উচ্চাকাঙ্খা সফল করার উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য যে-কোন স্বার্থের প্রয়োজনে একদল স্বামী তাদের স্ত্রীকে এক বা একাধিক প্রেমিকের হাতে ছেড়ে দেয়। বাইরের ঠাটটা মোটামুটি বজায় থাকলেই তারা খুশি। এদের পরের দলটিতে রয়েছে সেই সব স্বামী যারা স্ত্রীর পদস্খলনে চটে যায়। তাদের নিয়ে কি সুন্দর-সুন্দর উপন্যাস না লেখা যায়। আর একদল স্বামী রয়েছে যারা দুর্বল। তারা সব জিনিসটা হজম করে কুৎসা রটার ভয়ে।

আর একদল স্বামী রয়েছে যারা শক্তিহীন, অথবা ক্লান্ত, যারা স্ত্রীর হর্ষা থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদে এক বিছানায় রাত্রিযাপন করে না; বন্ধু-বান্ধবদের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েই তারা খুশি।

কিন্তু এমন একটি স্বামীর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল যার তুলনা মেলা ভার। একটি অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধি ক'রে এই জাতীয় সাধারণ দুর্ঘটনা থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।'

প্যারিসে মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং সৌখীন একটি দম্পতির সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল। সৌখীন সমাজে এই জাতীয় দম্পতির বেশ চাহিদা রয়েছে। মহিলাটি একটু ভীরু প্রকৃতির; দীর্ঘাঙ্গিনী, কৃশকায়া, এবং বহু-প্রশংসিতা। বোঝা যায় জীবনে অনেক দুঃসাহসিক অভিসারে তিনি অংশ-গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত রসজ্ঞ ব্যবহারে তিনি আমাকে খুশি করেছিলেন; এবং আমার বিশ্বাস সেদিক থেকে আমিও তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলাম। আমি তার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলাম। আপাত ক্রোধের সঙ্গে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু তার পরেই আমরা এমন একটা জায়গায় এসে

পৌঁছলাম যেখান থেকে মিষ্টি চোখে তাকিয়ে থাকাটা দুজনের পক্ষেই সম্ভব হল ; তারপরেই চলল হাত টেপাটেপি, এবং ওই জাতীয় ছোটখাটো বীরত্বের কাজ, বড় আক্রমণের পূর্বে যেগুলি কুচকাওয়াজ ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না।

তবু সোজাসুজি বড় আক্রমণের দিকে ঝটপট করে এগিয়ে না গিয়ে আমি একটু থমকে দাঁড়ালাম। আমার বিশ্বাস, সমাজে যে-সব গোপন প্রণয়লীলা চলে, তা যত সামান্যই হোক না কেন, সেগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করাই ভাল ; কারণ এ সব ব্যাপারে লাভ যতটুকু হয় তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদ বা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় আমাদের। সেই জন্যেই আমি এ ব্যাপারে সুবিধে কতটা হতে পারে আর অসুবিধেই বা কতখানি তা বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। সেই চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ভদ্র-মহিলার স্বামীটি আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছেন ; এবং লক্ষ্য করছেন আমাকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বল-এ এই যুবতীটির সঙ্গে আমার দেখা হল। যে বিরাট হল ঘরটিতে নাচের আসর বসেছিল তারই সামনে ছোট একটি ঘরে যুবতীটিকে একলা পেয়ে কিছু প্রেম নিবেদন করার তাল করছিলাম, এমন সময় আরশীর ওপরে একটি প্রতিচ্ছবি আমার চোখে ধরা পড়লো। প্রতিচ্ছবিটি একটি ভদ্রলোকের ; তিনি আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। ইনি সেই ভদ্রলোক ; অর্থাৎ ওই যুবতীর স্বামী। চোখাচোখী হল আমাদের। তার পরেই দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে তিনি স্থানত্যাগ করছেন।

বিড় বিড় করে বললাম : তোমার স্বামীটি আমাদের ওপরে গোয়েন্দাগিরি করছেন।

মনে হল তিনিও যেন অবাক হয়ে গিয়েছেন ; জিজ্ঞাসা করলেন : আমার স্বামী ?

হ্যাঁ। কিছুক্ষণ ধরেই তিনি আমাদের লক্ষ্য করছেন।

বোকা কোথাকার। তুমি ঠিক জান ?

ঠিক জানি।

কি আশ্চর্য। আমাদের বন্ধুদের দেখলে তো উনি খুশিই হন।

হয়ত তিনি অনুমান করেছেন আমি তোমাকে ভালবাসি।

বোকা কোথাকার। আমার স্তাবকদের মধ্যে তুমি প্রথম নও। তা ছাড়া প্রতিটি মহিলা যে-ই বাইরে বেরোয়, তারই পেছনে কিছু না কিছু স্তাবক ঘুরে বেড়ায়।

হ্যাঁ। তা সত্যি, কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি ; আর বেশ গভীর-ভাবেই।

ধরে নিলাম তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে কোন

স্বামী তা বুঝতে পারবে?

তাহলে, তিনি হিংসে করছেন না?

না—না।

একটু ভাবলেন তিনি; তারপরে বললেন: না। তিনি যে কাউকে হিংসে করেন এ-সংবাদ আমার জানা নেই।

তিনি কি কোন দিন তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করেন নি?

না। আমি আগেই বলেছি, আমার বন্ধুদের সঙ্গে সব সময়ই তিনি ভদ্র ব্যবহার করেন।

সেই দিন থেকে আরও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁকে আমি প্রেম নিবেদন করতে লাগলাম। এর কারণ এই নয় যে ভদ্রমহিলা আগের চেয়ে আমাকে বেশী খুশি করতে পেরেছিলেন; এর কারণ ভদ্রলোকের মতিগতি। তাঁর সম্ভাব্য ঈর্ষা আমাকে ওই পথে এগিয়ে যেতে গভীরভাবে প্রলুব্ধ করছিল।

মহিলাটির কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হবে যে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় আর পরিষ্কারভাবে তাঁকে আমি বাজিয়ে দেখেছিলাম। পার্থিব লাবণ্য বলতে যা বোঝায় সেটুকু তাঁর ছিল। তাঁর চাল-চলন-বলনের মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণীয় দ্রুততা ছিল। কিন্তু যাকে বলে সত্যিকার, গভীর আকর্ষণ সে রকম কিছু ছিল না তাঁর। আমি আগেই বলেছি প্রকৃতির দিক থেকে তিনি কিছুটা ভীরু ছিলেন, অবশ্য বাইরে থেকে সেই রকমই মনে হোত আমার; এবং মার্জিত রুচিসম্পন্না। ঠিক ভালভাবে বোঝাতে পারছি নে····জলুস ছিল তাঁর বেশী; ঘরোয়া তিনি মোটেই ছিলেন না।

একদিন সকলে মিলে ডিনার শেষ করে যখন বেরিয়ে আসছি এমন সময় তাঁর স্বামী আমাকে বললেন: বন্ধু, (তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করতে সুরু করেছেন অধুনা) আমরা শীঘ্রই আমাদের দেশের বাড়িতে যাচ্ছি। আমরা যাঁদের পছন্দ করি তাঁরা সেখানে গেলে আমার স্ত্রী এবং আমি দুজনেই বেশ খুশি হব। আশা করি মাসখানেক আপনি সেখানে কাটিয়ে আসবেন।

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি; কিন্তু তবু তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আমি।

তুরেন-এ ভার্ত ক্রিসোঁতে তাদের জমিদারী। মাসখানেক পরে সেইখানে হাজির হলাম আমি। তাদের বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে স্টেশন। সেখানে তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দলে ছিলেন তিনজন: ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং আমার অপরিচিত তাঁদের বন্ধুস্থানীয় একটি ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশ আনন্দই পেলেন; অবশ্য সেই রকমই মনে হল আমার।

দুপাশে সবুজ ঝোপের ভেতর দিয়ে সুন্দর পথ। সেই পথের ওপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আমরা যখন ছুটে চলেছি তখন কতকগুলি অদ্ভুত চিন্তা আমার মনে উদয় হল। আমি নিজের মনে-মনেই কথা বলতে লাগলাম: এর অর্থটা কী দেখা যাক। এই স্বামীটি জানেন, কেবল জানেন না, সন্দেহাতীত-ভাবেই জানেন যে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা সাধারণ বন্ধুত্বের ওপরে। তবু তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন; শুধু জানালেনই না, পুরনো বন্ধুর মত আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে এলেন; তিনি যেন বলতে চাইলেন: বন্ধুবর, এগিয়ে যাও; পথ পরিষ্কার।

তারপরে, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন একটি ভদ্রলোকের। সম্ভবত, আগে থাকতেই ওই বাড়িতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ···এবং··· এবং সম্ভবত তিনি ওই বাড়ি থেকে কেটে পড়তে চান; এবং যিনি ওই স্বামীটির মতই আমার আগমনে যথেষ্ট খুশি হয়ে উঠেছেন।

উনি কি ভূতপূর্ব কোন প্রণয়ী—বর্তমানে অবসর গ্রহণ করতে চান? সেই রকমই মনে হয়। কিন্তু তাহলে কি সমাজে হামেশাই যে সব ছোট-ছোট অপমানজনক গোপন চুক্তি হচ্ছে—সেই রকমেরই কোন একটা গোপন চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হয়েছেন? এবং আমার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা না করেই তারা ঠিক করে ফেলেছেন যে আমি এই দলের মধ্যে প্রবেশ করে নিঃশব্দে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করব? সবাই তো দেখছি দুহাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, অধিগ্রহণ করার জন্যে সব সুবিধেই আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। আমার জন্যে সমস্ত দরজা আর হৃদয় আজ উন্মুক্ত।

আর ওই মহিলাটি? একটি প্রহেলিকা। তিনি যে এসব বিষয়ে কিছু জানেন না তেমন কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যাই হোক ··যাই হোক... ব্যাপারটা হচ্ছে···আমি অতল সমুদ্রে ভাসছি।

ডিনারটা ভালই হল, এবং বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। ডিনার টেবিল থেকে উঠে স্বামী আর তাঁর বন্ধুটি তাস খেলতে বসলেন। আর মাদামের সঙ্গে চন্দ্রকিরণের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে আমি বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। ভদ্র-মহিলাকে দেখে মনে হল প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি গভীরভাবে অভিভূতা হয়ে পড়েছেন। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। গ্রাম্য পরিবেশ তাঁকে যেন আরও কমনীয়, অথবা ক্ষীণ করে দিয়েছে। বিরাট ফুলের টবের ধারে পাথরের সিঁড়ির ধাপের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। তাঁর লম্বা, কৃশ শরীরটি বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে। আমার ইচ্ছে হল তাঁকে গাছের ছায়ায় নিয়ে যাই, সেইখানে তাঁর

পদতলে নিজেকে নিবেদন করে প্রেমের বাক্য স্তব করি তাঁর।

স্বামীর স্বর শোনা গেল: লাউসি?

আমি এখানে।

চা-এর কথা ভুলে গেছ তুমি।

আমি এখনি যাচ্ছি, ডিয়ার।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম; ভদ্রমহিলা আমাদের চা পরিবেশন করলেন। দুজন ভদ্রলোক তাস খেলা শেষ করে ঘুমোতে যাওয়ার উদযোগ করলেন। আমাদেরও ঘরে ঢুকতে হল। অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম এল না; তারপরেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন বিকেলের দিকে ঠিক হল আমরা সবাই প্রমোদ ভ্রমণে বেরোব। কিছু ধ্বংসস্তূপ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে আমরা খোলা গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়লাম। ভদ্রমহিলা আর আমি বসলাম গাড়িটির পেছনে; সহিসের দিকে পেছন করে আমাদের মুখোমুখী বসলেন তাঁরা। আলাপ আলোচনা বেশ জীবন্তই হল; সেদিক থেকে কারও ওপরে কোন রকম বাঁধা নিষেধ আরোপিত হয় নি। আমার সংসার বলতে ধরাধামে কিছু ছিল না; আমার মনে হোল আমি সেই সংসারে ফিরে এসেছি। তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম আমি।

হঠাৎ ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্বামীর দুটি পায়ের মধ্যে নিজের একটি পা বাড়িয়ে দিলেন। স্বামীটি এই দেখে তিরস্কারের সুরে বললেন: ছিঃ লাউসি, তোমার এই পুরনো জুতো পরা উচিৎ হয় নি। গ্রামের চেয়ে প্যারিসে যে বেশী পরিষ্কার হবে এই নীতিটা অর্থহীন।

নিচু হয়ে দেখলাম আমি। সত্যিই ভদ্রমহিলা ছেঁড়া জুতো পরেছেন; এবং মোজা দুটিও বেশ ভালভাবে আঁটা হয় নি। বন্ধুটির এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি উদাসীনভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

স্বামীটি আমাকে একটি সিগার দিলেন। আমি সেটি গ্রহণ করলাম। পরের ক'টা দিন দুটো মিনিটের জন্যেও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্বামীটি সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর ব্যবহারটি বেশ অমায়িক ছিল।

পরের দিন সকালে লাঞ্চের আগে তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। নানান আলোচনার ভেতরে এক সময় বিয়ের আলোচনায় নামলাম আমরা। নিঃসঙ্গতার বিপদ আর নারীর সাহচর্যে সেই নিঃসঙ্গ জীবন কেমন করে মধুর হয় এই বিষয়ে আমি নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলাম। হঠাৎ আমার আবেগকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন: বন্ধু, যা জানেন না সে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্ত কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে না। প্রথম পরিচয়ের ব্রাহ্মমুহূর্তে নারীরা ছোট-খাট ছলনা দেখায়, এবং সেই ছলনাগুলির জন্যে তারা আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে

বিয়ে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা তাদের সমস্ত সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ফেলে। এবং তারপর···সেই সম্মানিতা ভদ্রমহিলারা···অর্থাৎ আমাদের পত্নীরা সব ভুলে যান···অর্থাৎ নারীর কর্তব্য কী তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারলেন?

এর পরেই তিনি চুপ করে গেলেন। কেন তিনি এই সব কথা বললেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।

এই আলোচনার দু'দিন পরে খুব সকালে কয়েকটি খোদাই শিল্প দেখানোর জন্যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। তাঁর স্ত্রীর ঘরের সামনে যে বিরাট দরজাটি রয়েছে তারই মুখোমুখী একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমি বসলাম। দরজার ওপাশে কে যেন মেঝের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হল। তার পায়ের শব্দ আমার কানে এল। আমি খোদাই শিল্পের দিকে মোটেই নজর দিতে পারি নি যদিও আমি তারিফ করে বলতে লাগলাম: কী সুন্দর, ও, কী চমৎকার···ইত্যাদি।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন: আমার একটা চমৎকার সংগ্রহ পাশের ঘরে রয়েছে। নিয়ে আসছি।

দৌড়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। দরজায় ধাক্কা দেওয়াটা বেশ নাটকীয় হয়েছিল।

সেই বিরাট ঘরটিতে সবই ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল—স্কার্ট, জামার কলার, ব্লাউজ মেঝের ওপরে ছিল ছড়ানো। তাদের ওপরে দাঁড়িয়েছিল দীর্ঘাঙ্গিনী শুকনো প্যাকাটির মত একটি নারী—চুলগুলি তার খোলা। তার শরীরের নিচু অংশটি ঢাকা ছিল একটি ছেঁড়া পুরনো সায়াতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার ছোট বিরল কেশগুলিকে বুরুশ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। তার দুটি বাহু সূক্ষ্ম কোণের ভঙ্গিতে বাঁকানো ছিল; এবং অবাক হয়ে মেয়েটি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ কাপড়ের তৈরী শেমিজের নিচে আমি তার পাঁজরার হাড়গুলি দেখতে পেলাম; সেগুলিকে কঙ্কাল ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না। বুঝতে পারলাম সেগুলি সে তুলোর প্যাড বসিয়ে পুরুষ্টু করে তোলে।

স্বামীটি স্বাভাবিকভাবেই আর্তনাদ করে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এলেন; এবং তারপরে ভগ্নমনোরথ হয়ে বললেন: হায় ভগবান, কী মূর্খ আমি। কি নির্বোধ। এর জন্যে আমার স্ত্রী কোনদিনই আমাকে ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু মনে-মনে আমি তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। তিন দিন পরে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। আসার সময় বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই দুটি ভদ্রলোকের করমর্দন করলাম; আর ভদ্রমহিলার আঙুলের ডগায় চুমু খেলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে একটি ঠাণ্ডা বিদায় জানালেন।

কার্ল ম্যাসোলিগনি চুপ করলেন। কে একজন প্রশ্ন করল: কিন্তু সেই

বন্ধুটির কী হল ?

তা আমি জানি নে···তবে···তবে···আমি অতটা তাড়াতাড়ি চলে এলাম দেখে তিনি রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলে মনে হল।

একটি মোরগ ডাকলো
(The Cock Crowed)

এখনও পর্যন্ত মাদাম বার্থা দ্য অ্যাভানসেলি তাঁর প্রেমিক ব্যারণ যোশেফ দ্য ক্রয়সার্ড-এর কোন প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন নি। শীতকালে প্যারিসে ব্যারণ মাদামের পিছু-পিছু অনেক ঘুরেছেন; কিছু ফল হয় নি। বর্তমানে তিনি তাঁর নরম্যানডির কারভিল প্রাসাদে মাদামের সম্মানার্থে উৎসবের আয়োজন করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন শিকারের।

মাদামের স্বামী মঁসিয়ে দ্য অ্যাভানসেলি যথারীতি কিছুই জানতেন না; দেখতেন না কিছুই। শোনা যায় শারীরিক দুর্বলতার জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সরে থাকতেন; স্বামীর এই অপরাধকে মাদাম ক্ষমা করতে পারেন নি। বেশ শক্ত মানুষ ছিলেন মঁসিয়ে অ্যাভানসেলি, মাথায় টাক, দেখতে খাটো, হাত, পা, ঘাড়, গর্দান—সব ছোট ছিল তাঁর; মাদামের চেহারা ছিল ঠিক তাঁর বিপরীত—দীর্ঘাঙ্গিনী, উজ্জ্বল শ্যাম—'যাহা ধরিব তাহাই করিব' এই প্রকৃতির যুবতী। স্বামী যখন সকলের সামনে তাঁকে 'শ্রীমতী গৃহকর্ত্রী' বলে ডাকতেন তখন তিনি তাঁর মুখের ওপরেই জোরে হেসে উঠতেন। তাঁর সর্বজনবিদিত প্রেমিক ব্যারণ যোশেফ দ্য ক্রয়ার্ডের বিস্তৃত কাঁধ, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, আর সুন্দর গোঁফ জোড়াটির দিকে তিনি কিছুটা স্নেহের দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকতেন।

এখন-ও পর্যন্ত অবশ্য মাদাম তাঁর ভক্তকে কিছু দেন নি। তাঁকে পাওয়ার জন্যে ব্যারণ নিজেকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছেন। তাঁকে খুশি করার জন্যে উৎসব, শিকার, পার্টি, এবং নিত্য নতুন-নতুন আনন্দের আয়োজন করেছেন তিনি; সেই সব উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছেন স্থানীয় বিত্তশালীদের। শেয়াল অথবা বন্য শুয়োরের পেছনে দৌড়তে-দৌড়তে সারাদিন ধরে শিকারী কুকুরগুলো বনে-বনে চীৎকার করছে; প্রতিটি রাত্রিতে চকচকে জ্বলন্ত বাজি নক্ষত্রদের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে থেকে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি জানালার ভেতর দিয়ে বিস্তৃত লনের ওপরে ছড়িয়ে পড়ছে, আর ছায়ারা বিব্রত হয়ে এখানে ওখানে সরে যাচ্ছে।

সময়টা শরৎকাল, কিছুটা লালের সঙ্গে তামাটে রঙের ঋতু। পাখির

ঝাঁকের মত ঝরা পাতার দল ঘুরে-ঘুরে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ছে। বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ ছেড়েছে—উলঙ্গ মাটির গন্ধ ; নাচের পরে মহিলারা পোশাক খুলে ফেলার পরে তাদের নগ্ন দেহ থেকে যে রকম গন্ধ বেরোয় এ-ও সেই রকম গন্ধ।

গত বসন্ত কালে উৎসবের সময় একদিন সন্ধ্যায় মাদাম তাঁর ভক্তের আকুল প্রার্থনার উত্তরে বলেছিলেন : 'বন্ধু, যদি তোমার কাছে আমাকে আত্মসমর্পণই করতে হয় তাহলে তা পাতা-ঝরার আগে নয়। আগামী গ্রীষ্মে আমার অনেক কিছু করার রয়েছে ; তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করার মত সময় পাব না।' ব্যারণ মাদামের সেই সাহসী আর চিত্তাকর্ষক উক্তিটি ভুলে যান নি ; তারপর থেকে প্রতিদিন তিনি তাঁর চাহিদা জোর করে প্রকাশ করেছেন, প্রতিদিন তাঁকে বুকের ওপরে টেনে আনার জন্যে বারবার এগিয়ে গিয়েছেন ; এবং ক্রমাগত এই চেষ্টার ফলে সেই সুন্দরী দুঃসাহসিক মহিলাটির হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। মাদামের কাছ থেকে তখনও যে কিছুটা প্রতিরোধ আসছিল সেটা কেবল বাহ্যিক শোভনীয়তার দিক থেকে।

সন্ধ্যা কাল। বিশাল বন্য-শূকর শিকারের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। মাদাম বার্থা হেসে ব্যারণকে বললেন : ব্যারণ, তুমি যদি আজ জানোয়ারটাকে মারতে পার তাহলে আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। এবং সেই জন্যে, ব্যারণ প্রাতঃকালে উঠে সেই বন্য জানোয়ারটার আস্তানা কোথায় তা খুঁজে বার করার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জন্তুদের খেদিয়ে বার করে আনার জন্যে তিনি লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, কোথায়-কোথায় ঘোড়া আর লোক বদল করতে হবে সেই জায়গাগুলি ঠিক করলেন, অভিযানে ব্যক্তিগত ভাবে সফল হওয়ার জন্যে সমস্ত আয়োজনটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলেন ; এবং যাত্রা সুরু করার জন্যে যখন শিঙা বেজে উঠলো তখনই তিনি যোদ্ধবেশ ধারণ করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। উজ্জ্বল লালের সঙ্গে সোনালী রঙ মেশানো আঁট-সাঁট কোট পরলেন, কোমরটাকে শক্ত করে বাঁধলেন, ফোলালেন বুকের ছাতি ; চকচক করে উঠলো চোখ দুটো। মনে হল, সারা রাত্রি বিশ্রামের পরে, শক্ত আর সতেজ হয়ে তিনি এইমাত্র বিছানা থেকে উঠে এলেন।

অভিযান সুরু হল। গৃহচ্যুত হয়ে বুনো শুয়োরটা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটতে সুরু করল। চীৎকার করতে-করতে তার পিছু-পিছু ছুটলো শিকারী কুকুরের দল। অরণ্যের সঙ্কীর্ণ পথের ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে ছুটলো ঘোড়ার দল। আর নরম মাটির ওপর দিয়ে প্রথম বাহিনী থেকে দূরে নিঃশব্দে চললো গাড়ি।

বিপদ থেকে দূরে, মাদাম দ্য অ্যাভানসেলি ব্যারণের পাশে-পাশে যাচ্ছিলেন ; ডালপালায় সঙ্কীর্ণ একটি রাস্তার ওপরে তিনি ব্যারণের পেছনে

গিয়ে পড়লেন ; এই রাস্তার ওপরে চারটে সারি ওক গাছ তাদের ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; মনে হল, একটা বিরাট খিলান তৈরী করেছে তারা। প্রেম-জ্বর আর উদ্বেগে কাঁপতে-কাঁপতে ব্যারণ এক কান দিয়ে পশ্চাৎবর্তিনী যুবতীটির আস্ফালন শুনছিলেন, আর এক কান দিয়ে শুনছিলেন দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাওয়া শিকারী কুকুরের ডাক।

মাদাম বললেন : তাহলে তুমি আর আমাকে ভালবাস না, কেমন ?

ব্যারণ বললেন : একথা বলছ কেন ?

মাদাম বলতে লাগলেন : মনে হচ্ছে আমার চেয়ে শিকারের দিকে লক্ষ্য তোমার বেশী।

ব্যারণ প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বললেন : জানোয়ারটাকে নিজের হাতে মারার জন্যে তুমিই কি আমাকে হুকুম কর নি ?

মাদাম বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার চোখের সামনে জানোয়ারটাকে মারতে হবে তোমায়।

ঘোড়ার ওপরে বসে ব্যারণ কেঁপে উঠলেন ; ঘোড়ার বুকে খোঁচা দিতেই সে লাফিয়ে উঠলো ; সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ব্যারণ চীৎকার করে উঠলেন : কিন্তু মাদাম, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তা করা যে অসম্ভব।

কিন্তু মাদাম হাসতে-হাসতে আবার বললেন : কিন্তু মারতেই হবে ; অন্যথায় তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তারপরে তিনি ব্যারণের সঙ্গে বেশ মিষ্টি করে কথা বললেন। তাঁর হাতে হাত রাখলেন ; অথবা এমন হতে পারে, তিনি ব্যারণের ঘোড়ার মাথায় হাত রাখতে গিয়েছিলেন ; ভুল করে তাকে আদর করে ফেলেছেন।

ঠিক সেই সময় ডান দিকে ঘুরে তাঁরা একটা সরু রাস্তার ওপরে এসে পৌঁছলেন। গাছের ডালগুলো রাস্তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল। এবং তারপরে একটা ঝুঁকেপড়া ডালের খোঁচা এড়ানোর জন্য মাদাম হঠাৎ ব্যারণের মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন ; তাঁর চুলগুলি ব্যারণের গালে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। ব্যারণ হঠাৎ তাঁর হাত দুটি দিয়ে পাশবিক শক্তিতে মাদামকে জড়িয়ে ধরলেন ; এবং তাঁর কপালটা নিজের ঘন গোঁফের মধ্যে চেপে ধরে একটি জবরদস্ত চুমু খেলেন তাঁকে।

প্রথমে মাদাম নড়লেন না ; ব্যারণের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের কাছে চুপ করে রইলেন ; তারপরে, একটা ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটাকে সরিয়ে নিলেন তিনি ; এবং তারপরে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারার জন্যেই হোক, অথবা ইচ্ছে করেই হোক, মাদামের ছোট দুটি ঠোঁট সুন্দর গোঁফের গোছার নিচে ব্যারণের দুটি ঠোঁটের ওপরে গিয়ে পড়লো। এবং মুহূর্তের মধ্যেই হয় হতভম্ব হয়ে, অথবা অনুতপ্ত হয়ে, মাদাম তাঁর ঘোড়ার পিঠে জোরে একটা চাবুক কষিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা লাফ দিয়ে ছুটতে সুরু করল। কিছুক্ষণ

তাঁরা দুজনেই এইভাবে ছুটে চললেন, কেউ কারও দিকে একবারের জন্যে ফিরেও তাকালেন না।

শিকারের শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এল। মনে হল, ঝোপগুলো কাঁপছে। হঠাৎ সেই বুনো শুয়োরটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দৌড়ে। গোটা গায়ে তার রক্ত। বোঝা গেল, কুকুরগুলোকে এড়ানোর জন্যেই সে চেষ্টা করছে। তাকে দেখেই ব্যারণ বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন: আমাকে যে ভালবাস সে আমার পিছু-পিছু এস। হুংকার দিয়েই তিনি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন; মনে হল, বিরাট অরণ্য তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে।

কয়েক মিনিট পরে মাদাম একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলেন। ব্যারণ সেইমাত্র ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। গোটা শরীরে তাঁর মৃত্তিকার আবরণ; তাঁর কোট ছিন্নভিন্ন, হাত দুটি রক্তাক্ত। তাঁর সামনে জানোয়ারটা লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার কাঁধের মধ্যে হাতল পর্যন্ত ব্যারণের বিরাট শিকারী ছোরাটা ঢুকে রয়েছে।

সেই বন্য এবং বিধুর রাত্রিতে টর্চের আলো জ্বালিয়ে শিকারটিকে কাটা হল। টর্চের আলোর ওপরে চাঁদের হলদে আলো ছড়িয়ে পড়ায় রাত্রিটাকে ধুলোর ধোঁয়া ভরা জ্যালজ্যালে দেখতে লাগলো। কুকুরগুলো সেই বুনো শুয়োরের পচা নাড়িভুঁড়িগুলো খেয়ে শেষ করে ফেলার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি চেঁচামেচি সুরু করল। ঢ্যাঁরাবাদকরা আর ভদ্রলোকেরা শিকারের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বিপুল উদ্যমে বিজয় ঘোষণা করার জন্যে শিঙা ফোঁকালো। সেই নিস্তব্ধ রাত্রিতে শিকারীদের শিঙার ধ্বনি অরণ্যের ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো; দূরের পাহাড়ের ওপরে সেই ধ্বনি ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল; সেই শব্দের ধাক্কায় ভীরু হরিণের দল জেগে উঠলো, শেয়ালগুলো সুরু করল চেঁচাতে; আর অরণ্যের ধারে-ধারে যে সমস্ত ধূসর রঙের ক্ষুদে খরগোসরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এই হট্টগোলে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করতে লাগলো।

শিকারী কুকুরদের মাথার ওপর দিয়ে ভীত-ত্রস্ত নিশাচর পাখির দল উড়ে গেল; সেই মৃদু এবং ভয়ঙ্কর কার্যাবলীতে অভিভূতা হয়ে মহিলারা পুরুষদের বাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো; তারপরে কুকুরদের ভোজনপর্ব শেষ হওয়ার আগেই তারা রাস্তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সারাদিনের শ্রান্তি আর কমনীয়তার অবসাদে অবসন্ন হয়ে মাদাম দ্য অ্যাভানসেলি ব্যারণকে বললেন: বন্ধু, পার্কের দিকে একটু বেড়াবে কি? কোন উত্তর দিলেন না ব্যারণ; কিন্তু ভীরু হৃদয়ে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি মাদামের কোমরটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করলেন। প্রায় পত্রহীন গাছের নিচ দিয়ে ছাঁকা চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে তাঁরা হাঁটতে লাগলেন। তাঁদের প্রেম, তাঁদের অভীপ্সা, পরস্পরকে আলিঙ্গন করার কামনা এত জোরালো হল্যে

উঠলো যে একটা গাছের তলায় তাঁরা প্রায় ঢলে পড়লেন।

শিকারী শিঙাগুলি সব নীরব হয়ে গিয়েছে; ক্লান্ত কুকুরের দল ফিরে গিয়েছে তাদের খোয়াড়ে। যুবতীটি বললেন: চল, আমরা ফিরে যাই; এবং তাঁরা ফেরার পথ ধরলেন।

বাড়িতে ফেরার পরে, এবং ভেতরে প্রবেশ করার আগে, মাদাম ক্লান্ত স্বরে বললেন: বন্ধু, আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমি ঘুমোতে চললাম।

শুভরাত্রির চুমু খাওয়ার জন্যে ব্যারণ তাঁর হাত দুটি প্রসারিত করার সঙ্গে-সঙ্গে মাদাম দ্রুত সরে গেলেন; সরে গিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে বললেন:...না... আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। ...আমাকে যে ভালবাসে সে আমার পিছু পিছু আসুক।

এক ঘণ্টা পরে সমস্ত শ্যাটো (বড়লোকদের প্রাসাদ) নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ব্যারণ চুপি-চুপি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, মাদামের দরজার কাছে গিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলেন। মাদামের কাছ থেকে কোন শব্দ না পেয়ে দরজায় দিলেন ঠেলা; দেখলেন দরজা ভেজানো রয়েছে মাত্র।

জানালার ধারে বসে-বসে মাদাম স্বপ্নের জাল বুনছিলেন। ব্যারণ তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর নাইট-গাউন-এর ভেতর দিয়ে মাদামকে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না মাদাম; পরম আদরে ব্যারণের চুলের ভেতরে তাঁর সুন্দর নরম আঙুলগুলি বোলাতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ যেন বিরাট মতলব ভেঁজে ফেলেছেন এইভাবে তিনি সাহস-ভরা দৃষ্টি মেলে বললেন: তুমি অপেক্ষা কর। আমি আসছি। খাওয়ার সময় ঘরের শেষ প্রান্তে একটা অস্পষ্ট সাদা জায়গার দিকে তিনি তাঁর আঙুলটা বাড়িয়ে দিলেন। এটা তাঁর বিছানা।

তারপর সেই অন্ধকারে কম্পমান হাতে এবং কী করছেন তা ঠিক বুঝতে না পেরেই, ব্যারণ তাড়াতাড়ি বিবস্ত্র হতে সুরু করলেন। বিবস্ত্র হয়ে তিনি ঠাণ্ডা বিছানার ওপরে শুয়ে পড়লেন। আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে দিলেন বিছানার ওপরে। তাঁর ক্লান্ত শরীরের ওপরে বিছানা তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিল। সেই সুখে তিনি তাঁর ভালবাসার কথা ভুলে গেলেন। মাদাম ফিরলেন না। হয়ত কৌতুকের সঙ্গে তিনি ব্যারণের ধৈর্য পরীক্ষা করছিলেন। অনির্বচনীয় সুখের মোহে পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি চোখ দুটি বোজালেন। যাঁকে তিনি গভীরভাবে পেতে চাইলেন তাঁর কথা চিন্তা করতে-করতে মনটা তাঁর শ্রান্তিতে ভরে উঠলো।

ধীরে-ধীরে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শিথিল হয়ে এল, তাঁর চিন্তাগুলি হয়ে এল অস্পষ্ট; তারপরে একসময় বিরাট একটা ক্লান্তি এসে তাঁকে গ্রাস করে ফেললো; ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

একটি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত শিকারীর অপ্রতিরোধ্য গভীর ঘুমে তিনি ঘুমিয়ে

পড়লেন, এবং ঘুমোলেন সেই সকাল পর্যন্ত। জানালা অর্দ্ধেকটা খোলা ছিল বলেই হয়ত একটা মোরগের ডাক হঠাৎ তাকে জাগিয়ে দিল। চোখ মেলে তাকালেন তিনি ; অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর পাশে নিবিড়ভাবে একটি মহিলা শুয়ে রয়েছেন। মুহূর্তের জন্যে পূর্বরাত্রির সব কথা ভুলে গিয়ে তিনি আমতা-আমতা করে তোতলাতে লাগলেন : কী ব্যাপার ? কোথায় আমি ..

মাদাম মোটেই ঘুমোন নি। তিনি সেই উলঙ্গ মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ; কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি তাঁর মোটা। যে রকম উদ্ধত স্বরে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন সেই রকম স্বরে মাদাম বললেন : ও কিছু নয়। মোরগ ডাকছে। আবার ঘুমিয়ে পড়, মঁসিয়ে। তোমার সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।

পিতা

(The Father)

জাঁ দ্য ভলনয়স্ত আমার বন্ধু। মাঝে-মাঝে তাঁর বাড়িতে আমি যাই। নদীর ধারে বনের মধ্যে একটা ছোট বাড়িতে তিনি বাসা বেঁধেছেন। পনেরটি বছর ধরে উদ্দাম জীবন যাপন করার পরে প্যারিস থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। ডিনার বলুন, পুরুষ বন্ধু বলুন, মহিলা বলুন, তাস-পাশা—জীবনে আনন্দ করার যত রকম জিনিস রয়েছে সব তিনি হঠাৎ-ই পেয়েছিলেন ; অবশেষে জন্মভূমির ছোট জায়গাটিতে তিনি ফিরে এসেছেন।

আমাদের মধ্যে দু'তিন জন আছেন যাঁরা মাঝে-মাঝে তাঁর বাড়িতে যায় ; কেউ দু'সপ্তাহ থাকে, কেউ থাকে তিন সপ্তাহ। আমরা সেখানে গেলে তিনি বেশ আনন্দিতই হন ; আমরা চলে এলে তাঁকে একলা থাকতে হয় বটে ; কিন্তু তার জন্যে তিনি অখুশি নন। গত সপ্তাহে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আদর করেই অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা কখনও-কখনও একসঙ্গে বসে সময় কাটাতাম, কখনওবা কাটাতাম একা একা। তিনি সাধারণত পড়তেন ; দিনের বেলায় আমি করতাম কাজ। এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আমরা বেড়াতাম।

গত মঙ্গলবার রোদের তাপটা বড় বেশী ছিল। সন্ধ্যা ন'টা নাগাদ আমরা জলের ধারে বসে-বসে পায়ের তলায় স্রোতের খেলা দেখছিলাম। স্রোতের ঢেউ-এ ডুব-সাঁতার কাটা নক্ষত্রদের সম্বন্ধে আমাদের যে অস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে তারই ওপরে ভিত্তি করে তারামণ্ডল নিয়ে আলোচনায় মেতেছিলাম আমরা। ওদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জ্ঞান ছিল তা সামান্য এবং গোলমেলে কারণ

আমাদের মনটা হচ্ছে সীমাবদ্ধ, দুর্বল এবং শক্তিহীন। গ্রেট বিয়ার-এর মধ্যে যে সূর্যের মৃত্যু হয়, সেই সূর্য নিয়ে আমি কিছুটা ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম। ঝরঝরে পরিষ্কার আকাশেই লোকে 'গ্রেট বিয়ার'কে দেখতে পায়; কত ম্লান তার আভা। আকাশে এতটুকু মেঘের আমেজ দেখা দিলেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই সব জগৎগুলিতে কোন্ ধরনের প্রাণী বাস করে, তাদের চেহারা কেমন, কী বিশেষ গুণ তাদের রয়েছে, তাদের ইন্দ্রিয় কতগুলি, ওখানকার জন্তু জানোয়ার, গাছ-পালা, ওদের রাজত্ব, ওখানকার পদার্থ কী জাতীয়—এই সব নানা বিষয়ে মানুষের কল্পনা যাদের ধারেও পৌঁছতে পারে না—সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা মগজ মারছিলাম।

হঠাৎ দূর থেকে একটি মানুষের স্বর শোনা গেল: মঁসিয়ে—মঁসিয়ে।

জাঁ উত্তর দিলেন: আমি এখানে।

আমাদের দেখতে পেয়ে চাকরটি ঘোষণা করল: মঁসিয়ে, বেদেনী এসেছে।

আমার বন্ধুটি সাধারণত যা করেন তাই করলেন। তিনি হা-হা করে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: আজ কি সতেরই জুলাই?

হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

ঠিক আছে। তাকে অপেক্ষা করতে বল। কিছু খাবারও ব্যবস্থা কর। দশ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

লোকটি চলে গেলে বন্ধুটি আমার হাত ধরে উঠে পড়ে বললেন: এর গল্পটা বলতে-বলতে আমরা ধীরে-ধীরে হেঁটে যাই চল।

সাত বছর আগের কথা। আমি তখন এখানে এসেছি। একদিন সন্ধ্যা-বেলায় বনের ভেতরে বেড়াতে গিয়েছি। আজকের মতই সে-দিনটাও বড় চমৎকার ছিল। রাত্রি আর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া নক্ষত্রের আলো দেখতে-দেখতে বিরাট-বিরাট গাছের তলা দিয়ে ধীরে-ধীরে হাঁটছিলাম।

প্যারিসকে চিরকালের জন্যে বর্জন করে আমি সেই মাত্র ফিরে এসেছি। অনেক নীচু, নোংরা, অর্থহীন হট্টগোল আমি সেখানে দেখেছি; কেবল দেখেছি নয়, নিজেও সেই সব ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। তার চেয়েও বেশী হয়েছি বিরক্ত।

এখান থেকে মাইল দশেক দূরে ক্রোজিল গাঁয়ের পথ ধরে সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে সেদিন হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি আমি। হঠাৎ আমার সঙ্গী কুকুর 'বক' এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েই চীৎকার করতে সুরু করল। মনে হল হয়ত কাছাকাছি কোথাও একটা শেয়াল, নেকড়ে অথবা শুয়োর লুকিয়ে রয়েছে। পাছে কোন শব্দ হয় এই ভয়ে আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলাম। কিন্তু হঠাৎ মানুষের একটা কাতর

কান্নার স্বর আমার কানে ঢুকলো। সেই কান্নার মধ্যে কোন ভাষা ছিল না; তালগোল পাকানো যন্ত্রণাদায়ক একটা কান্নার স্বর অস্থির করে তুলল আমাকে। ভাবলাম, নিশ্চয় কেউ কাউকে খুন করছে। মনের মধ্যে এই রকম একটা চিন্তা আসার সঙ্গে-সঙ্গে, আমার মোটা ভারি ওক কাঠের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলাম।

যেখান থেকে কান্নাটা আসছিল তারই কাছাকাছি এসে পড়লাম। কান্নাটা এবারে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত রকমের জড়ানো মনে হল আমার। কাছেরই কোন একটা বাড়ি থেকে কান্নাটা ভেসে আসছে; ওই কয়লার দোকানটার কাছ থেকে হয়ত। আমার কিছুটা সামনে দিয়ে বক দৌড়াচ্ছিল। দৌড়তে-দৌড়তে কখনও সে থামছিল, কখনও ঘেউ ঘেউ করছিল। মাঝে-মাঝে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিরাট কালো কুকুর দৌড়ে এসে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো তখন ধকধক করে জ্বলছে। তার মুখের ভেতর থেকে সাদা চকচকে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

লাঠিটা উঁচিয়ে আমি তার দিকে ছুটে গেলাম; কিন্তু তার আগেই বক ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে তার ওপরে; দুটি কুকুর কামড়াকামড়ি করতে-করতে মাটির ওপরে লুটোপুটি খেতে লাগলো। তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেলাম আমি; একটা ঘোড়ার গায়ে ধাক্কা খেলাম। রাস্তার ওপরে ঘোড়াটা শুয়ে ছিল। জন্তুটাকে পরীক্ষা করার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলাম আমার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সার্কাস পার্টির মালপত্তর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, অথবা, ব্যবসাদাররা যে রকম গাড়ীতে মাল ভ'রে বাজারে নিয়ে যায়—সে-ও অনেকটা সেই রকম দেখতে। সেখান থেকেই সেই তাল-গোল পাকানো ভয়ঙ্কর কান্নাটা আসছিল। অন্য পাশে দরজা খোলার শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির পাশ দিয়ে তিনটে কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে আমি দুষ্কৃতকারীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

যা দেখলাম তা এতই আশ্চর্যজনক যে আমার মাথায় কিছুই ঢুকলো না। একটা লোক হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। মনে হল সে প্রার্থনা করছে। ঘরে একটি মাত্র বিছানা। সেই বিছানার ওপরে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটি জীব শুয়ে রয়েছে। তার মুখ আমি চিনতে পারলাম না। বিছানার ওপর সে ছটফট করছে, পাক খাচ্ছে, চীৎকার করছে। মেয়েটির প্রসব বেদনা উঠেছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আমার উপস্থিতির কথা প্রকাশ করলাম। লোকটা কিম্ভুতকিমাকার। তার চাহনি আর স্বর শুনে মনে হল সে মার্সেলি অঞ্চলের মানুষ। মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্যে সে কাতর কণ্ঠে গদ গদ চিত্তে আমার সাহায্য প্রার্থনা করল। কারও জন্ম হতে আমি কখনও দেখি নি। নারী, কুকুর, বেড়াল বা অন্যান্য কোন মেয়ে জন্তুর এই বিশেষ অবস্থার সঙ্গে কোন দিনই

আমার কোন পরিচয় ছিল না। খাটের ওপরে শায়িতা ক্রন্দনরতা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বোকার মত এবিষয়ে আমার অজ্ঞতার কথাই তাকে জানালাম। তারপর বুদ্ধি ফিরে এল আমার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম পাশের গ্রামে সে মেয়েটিকে নিয়ে যায় নি কেন? সে জানালো যে ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকার ফলে সেই ব্যবস্থা করতে পারে নি সে।

আমি চীৎকার করে বললাম: আমরা দুজন পুরুষ রয়েছি। আমরাই গাড়ি টেনে তোমার স্ত্রীকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

কিন্তু কুকুরের চীৎকার আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল। প্রচণ্ড মার মেরে সেই যুদ্ধমান দুজনকে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হই আমরা। তারপর মাথায় একটা মতলব এল আমার। কুকুর দুটিকে ঘোড়ার মত গাড়ীর সঙ্গে বেঁধে দিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা পাকা করে সেই অসুস্থ মহিলাটিকে গাড়ীর ওপরে চাপিয়ে আমরা আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

রাস্তা বলে রাস্তা! বাপরে বাপ! হাঁপাতে-হাঁপাতে, গোঙাতে-গোঙাতে হোঁচট খেতে-খেতে, ঘামতে-ঘামতে, পা পিছলাতে-পিছলাতে আমরা এগোতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে কুকুর দুটোও লাগলো গোঙাতে।

তিনটি ঘণ্টা লাগলো বাড়ি আসতে। বাড়িতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির কান্না থেমে গেল। বাচ্চাটা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। দুজনেই ভাল রয়েছে।

মা আর বাচ্চাটাকে নামিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তারপর গাড়ীতে চেপে ডাক্তার আনতে গেলাম আমি। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সত্যিকারের মার্সেলের অধিবাসীর মত নিশ্চিন্ত হয়ে, সান্ত্বনা পেয়ে, বিজয়ীর গর্বে প্রচুর পরিমাণে খাবার খেয়ে আর মদ গলায় ঢেলে শিশুটির জন্মোৎসব পালন করতে লাগলো।

বাচ্চাটা হচ্ছে একটা মেয়ে।

এদের সাতদিন আমার বাড়িতে রেখেছিলাম। মা, অর্থাৎ, ম্যাদময়সেল এলমির বেশ অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারে। সে আমার শতায়ু আর সহস্র সুখ গণনা করেছে।

পরের পর সেই একই দিনে রাত্রির দিকে ডিনার সেরে আমি ধূমপান করছি এমন সময় এই চাকরটি এসে আমাকে বলল: মঁসিয়ে, গতবছরের সেই বেদেনীটি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।

আমি তাকে ঘরের ভেতরে আসতে বললাম। তার সঙ্গে একটা সুন্দর লম্বা লোককে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। লোকটিকে উত্তর অঞ্চলের বলে মনে হল আমার। সে মাথাটা একটু নুইয়ে আমাকে অভিবাদন জানালো; তারপরে তার সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে আমার সঙ্গে কথা বলল। ম্যাদময়সেল এলমির-এর ওপরে আমি যে দয়া দেখিয়েছি সে কথা সে

শুনেছে। বৎসরপূর্তির উৎসবে সে আমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা না দেখিয়ে পারে নি।

রাত্রিতে খাবার ব্যবস্থা করে সে-রাত্রির মত থাকতে দিলাম তাদের। পরের দিন তারা চলে গেল।

এলমির প্রত্যেক বছর একই তারিখে তার মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এখানে আসে; এবং সঙ্গে থাকে একটি করে নতুন সাথী, প্রত্যেক বছরেই তারা নতুন। কেবল একটি লোককে আমি পর-পর দুবার দেখেছিলাম। বাচ্চা মেয়েটা এখন বেশ ফুটফুটে হয়েছে। সে ওদের সকলকেই 'পাপা' বলে ডাকে, যেমন আমাকে সবাই ডাকে মঁসিয়ে বলে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লাম আমরা। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে দরজার সামনে যে তিনটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়েছিল তাদের চিনতে আমাদের অসুবিধে হয়েছিল। সবচেয়ে দীর্ঘ মূর্তিটি কয়েক পা এগিয়ে এসে অনেকটা মাথা নুইয়ে বলল: আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে আমরা আজ এখানে এসেছি।

লোকটি বেলজিয়ান।

তার কথা শেষ হওয়ার পরে ছোট মেয়েরা চড়া গলায় যেমনভাবে আবৃত্তি করে সেইভাবে বাচ্চা মেয়েটা তার বক্তব্য শেষ করল।

দেখালাম আমি যেন কিছুই জানি নে। আমি ম্যাদময়সেল এলমিরকে একপাশে ডেকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

ওই ভদ্রলোকটিই কি তোমার মেয়ের বাবা?

না, না মঁসিয়ে।

ওর বাবা কি মারা গিয়েছে?

না, মঁসিয়ে। মাঝে-মাঝে আমাদের দেখা হয়। সে পুলিশে চাকরি করে।

কি! সে তাহলে মার্সেলির সেই লোকটি নয় যে তোমার প্রসবের সময় তোমার কাছে ছিল?

না, মঁসিয়ে। সেই লোকটা একটা রাসকেল। সে আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে কেটে পড়েছে।

আর ওই যে লোকটি পুলিশে চাকরী করে বললে। মেয়েটির আসল বাবার কথা আমি বলছি। সে কি তার মেয়েকে চেনে?

হ্যাঁ নিশ্চয়, মঁসিয়ে। মেয়েটিকে সে খুবই ভালবাসে; কিন্তু সে এর জন্য কিছু করতে পারে না। তার অন্য বউ-এর ছেলেপিলে রয়েছে কিনা।

বিবাহবিচ্ছেদ

(Divorce)

মেত্রে বঁত্রঁা ও-অঞ্চলে একজন নামকরা উকিল। যে সব দম্পতিরা নিজে-দের মধ্যে বোঝাপড়া করে থাকতে পারে না তাদের জন্যে আদালতে তিনি দশ বছর ধরে সওয়াল করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সব ক'টি বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় তিনি জয়লাভ করেছেন। তিনি তাঁর মন্ত্রণাকক্ষটি খুললেন। একজন নতুন মক্কেল তাঁর ঘরের ভেতরে ঢুকে এলেন।

আগন্তুকটি স্বাস্থ্যবান; মুখটি লাল, ঘন সুন্দর এক জোড়া গোঁফ; কিছুটা স্থূল, বেশ শক্ত সমর্থ; ধমনীর ভেতরে রক্ত চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগন্তুকটি মাথা নীচু করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

দয়া করে বসুন—উকিলটি তাঁকে বললেন।

মক্কেলটি বসলেন; একটু কাশলেন, তারপরে বললেন: বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করব আমি। আমার মামলাটি পরিচালনা করার জন্যে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি স্যার।

বলে যান—আমি শুনছি।

আমি নিজেও উকিল; তবে সম্প্রতি আমি অবসর গ্রহণ করেছি।

এরই মধ্যে?

হ্যাঁ; এরই মধ্যে। আমার বয়স সাঁইতিরিশ।

বলে যান।

আমি অসুখী; বিয়েটা আমার জীবনে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে।

সেদিক থেকে হতভাগ্য আপনি একাই নন।

আমি তা জানি; তাদের ওপরে আমার সহানুভূতি রয়েছে; কিন্তু আমার নজির আর কোথাও আপনি পাবেন না। স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ-গুলি আনতে চাই তাদের চরিত্র আলাদা; অর্থাৎ গতানুগতিক নয়। কিন্তু প্রথম থেকেই সুরু করব আমি। আমি যে বিয়ে করেছি তা-ও অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে পড়ে। বিপজ্জনক ধারণা অথবা আদর্শ বলে যে একটা কথা রয়েছে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ করি। সম্ভবত।

আগন্তুকটি বললেন: আমার কিন্তু সেদিক থেকে কোন রকম সন্দেহ নেই। এমন কতকগুলি ধারণা রয়েছে যেগুলি আমাদের মধ্যে ঢোকে, আমাদের কুরে কুরে খায়, আমাদের হত্যা করে, উন্মাদ করে দেয় আমাদের—যদি না আমরা অবশ্য সময় মত তাদের রুখতে পারি। এ যেন একটা আধ্যাত্মিক বীজাণুর

মত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সব বীজাণুর যদি একটাকে আমরা মাথার মধ্যে ঢুকতে দিই, অনুপ্রবেশের প্রথম ধাপেই যদি এদের আমরা আক্রমণকারী বলে চিনতে না পারি, যদি না বুঝতে পারি এরা আমার ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করবে, আমার ওপরে অত্যাচার করবে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়, দিনের পর দিন মনের নিগূঢ় সত্তার গভীরে এরা শেকড় চালিয়ে দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে আমাদের, এরা কেবল আসবে আর যাবে, আমাদের বিভ্রান্ত করবে, আমাদের সমস্ত কাজ নষ্ট করে দেবে, ধ্বংস করে দেবে আমাদের বিচার বুদ্ধি—তাহলে আমরা সত্যিকারেরই দুর্ভাগা।

আমার কাহিনীটা এবারে শুনুন। আমি আপনাকে আগেই বলেছি রাওনে আমি নোটারি ছিলাম। অবস্থা আমার মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। যাকে আপনারা দরিদ্র বলেন ঠিক সেরকম না হলেও; সব সময়েই আমাকে খুব হিসেব করে চলতে হোত; কমিয়ে রাখতে হোত চাহিদাকে। আমার মত বয়সে সেটা বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল।

খবরের কাগজের চতুর্থ পৃষ্ঠার ওপরে ব্যবসায়িক প্রয়োজনের খাতিরেই আমাকে চোখ বুলোতে হোত; বিশেষ করে 'ব্যক্তিগত', 'চাকরি খালি', 'চাকরি চাই' ইত্যাদি কলমগুলির ওপরে। এইগুলির ওপরে নির্ভর করেই অনেক সময় মক্কেলদের আমি ভাল-ভাল পাত্রীদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছি।

একদিন আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম: সুন্দরী সুশিক্ষিতা, সৎবংশজাতা কোন যুবতী কোন ভদ্রলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। পণ আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ। ঘটকের প্রয়োজন নাই।

সেই দিনই দুজন বন্ধুর সঙ্গে আমি খাচ্ছিলাম। একজন সলিসিটর, আর একজন একটি মিলের মালিক। কথা বলতে-বলতে কেমন করে যে আমরা বিয়ের প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলাম আজ আর ঠিক তা মনে নেই। আমি হাসতে-হাসতে তাঁদের ওই পাত্রীটির কথা বলেছিলাম।

মিল মালিকটি বলল: এই সব মহিলারা কেমন হে?

এই রকম বিজ্ঞাপনের ওপরে নির্ভর করে সলিসিটর নিজে অনেক ভাল-ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন; সেই সব বিয়ের-বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনাও তিনি দিলেন; তারপরে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনি বললেন: তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেল না হে। আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ পেলে তোমার সুবিধেই হবে।

এই প্রস্তাবে আমরা তিন জনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম; তারপরে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম আমরা।

ঘণ্টাখানেক পরে আমি বাসায় ফিরে গেলাম।

সেদিন রাত্রিটা বেশ ঠাণ্ডাই ছিল। তা ছাড়া, আমি যেখানে থাকতাম

সেটাও শহরতলীর একটি পুরনো বাড়ি। সিঁড়ির লোহার রেলিঙ-এর ওপরে হাত রাখার সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা কনকনে ঠাণ্ডা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। আর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি দেওয়ালটা স্পর্শ করলাম। স্পর্শ করার সঙ্গে-সঙ্গে ভিজে দেওয়ালের শৈত্য আমার হাতটাকে কাঁপিয়ে তুললো। দু'পাশ থেকে দুটি শীতল শিহরণ এগিয়ে এসে আমার বুকের মধ্যে এক হয়ে গেল; হঠাৎ একটা ক্লান্তিকর অবসাদ এসে আমাকে গ্রাস করে বসলো। হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল কথাটা: ভগবান, আমার যদি আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ থাকতো।

আমার শোওয়ার ঘরটিতে কোন রকম আনন্দের সরঞ্জাম ছিল না; অবিবাহিত মানুষের ঘর বলতে সাধারণত যা বোঝা যায় সেটিও ছিল অবিকল সেই-জাতীয়। ছিল একটি চাকর; আর একটি রাঁধুনী বনাম পরিচারিকা। অবস্থাটা একবার অনুমান করুন। মশারিহীন একটা বড় বিছানা, একটা ওয়ার্ডব, হাত ধোওয়ার বেসিন। কিন্তু কোন আগুন জ্বালানোর চুল্লী ছিল না। চেয়ারের ওপরে পড়ে থাকতো আমার পোশাক, কাগজপত্র ছড়ানো থাকতো মেঝের ওপরে।

সত্যি কথা বলতে কি ওই মহিলাটির কথা আগে আমি চিন্তাও করি নি, হঠাৎ বিছানার ওপরে কুঁকড়ি মেরে শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার কথাটা মনে পড়ে গেল। কেবল মনে পড়েই গেল না, তার কথাটা আমি এমন গভীর-ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম যে সেদিন ঘুমোতে আমার অনেক দেরীই হয়েছিল।

পরের দিন সকালে রোদ বেরোনোর আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। খেয়াল হল যে বেলা আটটার সময় দারনেতাল-এ আমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে। সেই কাজ যথাসময়ে সারতে গেলে আমায় সকাল ছটার সময় উঠতে হবে; কিন্তু শীতটা সেদিন বেশ জবরদস্ত হয়েই নেমে এসেছিল।

ক্রাইস্ট, আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ যদি আজ আমার থাকতো!

বেলা দশটার সময় নিজের অফিসে ফিরে এলাম আমি। ঘরের ভিতর তখন মরচেপড়া স্টোভের গন্ধ ছাড়ছে, কোর্টের ময়লা; নোংরা কাগজের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ; চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে কেরাণীদের ঘামের গন্ধ, পঁয়ষট্টি ডিগ্রী গরমে সেঁকা জুতো, ফ্রক-কোট, শার্ট, চুল, দেহ, শীতকালে ভাল করে ধোয়া নয়—এমন অজস্র বস্তু থেকে বেরনো দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস একেবারে মাতোয়ারা।

দিনে যা খাই তাই খেলাম—একটা পোড়া কাটলেট আর একটুকরো পনীর দিয়ে সারলাম লানচ। তারপরে কাজে বসলাম। ঠিক সেই সময়েই আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁর সত্বাধিকারিণী যুবতীটির কথা আমি প্রথম বেশ আগ্রহের সঙ্গেই চিন্তা করতে সুরু করলাম। কে মেয়েটি? তাকে লিখলে

কেমন হয়? ব্যাপারটা অনুসন্ধান করি নে কেন?

সত্যি কথা বলতে কি তারপর পনেরটি দিন ধরে আমি ওই এক চিন্তাতে বিভোর হয়ে রইলাম। এতদিন ধরে যে অজস্র ছোট-খাট অসুবিধেগুলি নিজের অজান্তেই ভোগ করে আসছিলাম সেইগুলিই হঠাৎ বড় হয়ে আমাকে বিঁধতে লাগলো; তাদের খোঁচার জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আর ঠিক তখনই ওই আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁর সত্বাধিকারিণীর দিকে আমি প্রবল আগ্রহের সঙ্গেই ঝুঁকে পড়লাম। মেয়েটি কেমন তাই নিয়ে মনে-মনে অনেক চিন্তা করলাম আমি; কোন কিছু পেতে চাইলে মানুষ সব সময় নিজের মনের মাধুরী দিয়েই তাকে সৃষ্টি করে তোলে। সেদিক থেকে আমার মধ্যেও কোন রকম ব্যতিক্রম দেখা দেয় নি। অবশ্য অত বিপুল অর্থের মালিক সদবংশজাত কোন যুবতী এভাবে পাত্রের সন্ধান সাধারণত করেন না; তবে এই বিশেষ মহিলাটি হয়ত সদবংশজাত হয়েও দুর্ভাগিনী।

প্রথম থেকে অবশ্য আড়াই মিলিয়ন ফ্রাঁ আমার কাছে হই-হই করার মত সম্পদ বলে মনে হয় নি; ছ, সাত, আট, দশ মিলিয়ন যৌতুকের বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে অনেকেই পড়েছে। বারো মিলিয়ন তো খুব সাধারণ। এই-জাতীয় বিজ্ঞাপনগুলি মানুষকে আকর্ষণ করে; কিন্তু অনেক সময়েই সেগুলি বেশ সম্মানজনক বিবাহ প্রস্তাব হয় না।

এই মেয়েটির কথাই ধরুন। হয়ত এর মা কোন মহিলার পরিচারিকা ছিল। তারই ফলে সে তার বাবার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিরাট অর্থ পেয়েছে। কিন্তু পাছে প্রেম করে বিয়ে করতে গেলে তার জন্মের কলঙ্কটা প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে সে এই চিরাচরিত প্রথার মাধ্যমে যে কোন অপরিচিতকে বিয়ে করতে চায়। এই থেকে বোঝা যায় মেয়েটির ঐতিহ্য কলঙ্কময়, অন্তত সন্দেহাতীতভাবে কলঙ্কমুক্ত নয়।

নিশ্চয় আমি বোকার মত চিন্তা করছিলাম, কিন্তু তবু সেটাকে আমি অবাস্তর বলে উড়িয়ে দিতে পারি নি। আমার পেশার মানুষদের নভেল পড়া উচিৎ নয়; কিন্তু আমি তা পড়েছি।

সেই জন্যে একটি মক্কেলের নাম করে আমি মেয়েটিকে চিঠি দিলাম। চিঠি দিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পাঁচ দিন পরের কথা। তখন প্রায় বিকেল তিনটে। অফিসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। এমন সময় হেড ক্লার্ক এসে বললেন: মিলি ক্যানতে-ক্রিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

তাঁকে আসতে বলুন।

একটি ভদ্রমহিলা দ্বিধাগ্রস্থ পায়ে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। বয়স তাঁর তিরিশের কাছাকাছি; বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা তাঁর; একটু কালোর দিকে রঙ।

মাদাম, অনুগ্রহ করে বসুন।

ভদ্রমহিলা বসে স্বগতোক্তির মত করে বললেন : আমি এসেছি, স্যার।

কিন্তু মাদাম, আপনি কে তাতো বুঝতে পারছি নে।

আমাকেই আপনি চিঠি লিখেছিলেন।

বিয়ের সম্বন্ধে?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়েছে বটে।

আমি নিজেই এলাম; কারণ এসব ব্যাপারে নিজেদেরই কথাবার্তা বলা উচিৎ।

ঠিক কথা বলেছেন! তাহলে, আপনি বিয়ে করতে চান?

চাই।

আপনার বাবা-মা বেঁচে আছেন?

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন তিনি; তারপরে মুখ নীচু করে বিড়বিড় করে বললেন : না—আমার মা—আমার বাবা—দুজনেই মারা গিয়েছেন।

চমকে উঠলাম আমি। তাহলে আমার অনুমান ঠিকই। এই হতভাগ্য প্রাণীটির জন্যে হঠাৎ আমার মায়া হল। পাছে তাঁকে আঘাত করা হয় এই ভয়ে আর বেশী প্রশ্ন তাঁকে করলাম না।

আপনার সম্পত্তির অন্য কোন ভাগীদার নেই?

না।

তাঁর দিকে আমি বেশ ভাল করে তাকালাম; আমার খারাপ লাগলো না; যদিও বয়সের দিক থেকে কিছুটা প্রবীণ। এতটা প্রবীণ আমি তাঁকে আশা করি নি। তবে হ্যাঁ, দেখতে ভালই, এবং স্বাস্থ্যবতী। তাঁর সঙ্গে একটা মিষ্টি খেলা খেলতে সখ হল আমার। ইচ্ছে হল, নিজেকে আমার কাল্পনিক মক্কেলের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁর সঙ্গে একটু প্রেমের অভিনয় করতে; তাঁর বরপণটা কাল্পনিক নয় এটা ভালভাবে জানার পরে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা হল আমার। কথায়-কথায় আমার মক্কেলটির সামান্য পরিচয় দিয়ে বললাম : ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির এবং সম্ভ্রান্ত, শরীরের দিক থেকে কিছু পঙ্গু।

তিনি বললেন : তাই বুঝি! আমি কিন্তু স্বাস্থ্যবান মানুষদেরই পছন্দ করি।

অবশ্য তাঁকে আপনি দেখবেন; তবে তিন-চার দিনের আগে নয়; কারণ গতকাল তিনি ইংলণ্ড গিয়েছেন।

ঘটনাটি বিরক্তিকর, সন্দেহ নেই।

তা, তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন। ফেরার তাড়া রয়েছে?

মোটেই না।

তাহলে এখানে অপেক্ষা করুন। আপনাকে খুশি করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হবে না আমার দিক থেকে।

আপনি বড় উদার।

আপনি কি হোটেলে আছেন?

রাওনের সবচেয়ে ভাল হোটেলের নাম করলেন তিনি।

আচ্ছা মাদাম, আপনার ভবিষ্যৎ নোটারি যদি আজ সন্ধ্যের সময় আপনাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে তাহলে কি আপনি দ্বিধা করবেন?

তিনি একটু দ্বিধাই করলেন; অস্বস্তি বোধ করলেন; কী করা উচিৎ ঠিক করতে পারলেন না যেন; তারপরে বললেন: না করব না।

তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম আমি। সাতটার সময় আমি তাঁর হোটেলে গেলাম। পরিপাটি প্রসাধন করে তিনি আমাকে স্বাধীন ভক্তকার মত অভ্যর্থনা জানালেন। পরিচিত একটি রেস্তোরাঁয় তাঁকে নিয়ে গেলাম আমি; বেশ দামী একটি ডিনারের অর্ডার দিলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম। তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। তাঁর মা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তাঁকে একটি 'নোবল ম্যান' ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরাই তাঁকে মানুষ করে। বাবা আর মায়ের কাছ থেকে বিরাট সম্পত্তি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তবে তাঁদের নাম তিনি কিছুতেই বলবেন না। সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। আমি তাঁকে তাঁর সম্পত্তির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এমনভাবে উত্তর দিলেন যা থেকে মনে হল তিনি বেশ চতুরা এবং সংসারাভিজ্ঞা। কী ভাবে টাকা পয়সা ভাল করে খাটাতে হয় তা তিনি বেশ ভাল করেই জানেন এই তথ্যটি অবগত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ওপরে আমার আস্থাটাও কেমন যেন বেড়ে গেল। তাঁকে খুশি করার জন্যে চেষ্টা করলাম আমি; দূরত্বও বজায় রাখলাম কিছুটা। তবে তাঁকে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে তাঁকে আমারও বেশ ভাল লেগেছে।

কিন্তু পাছে আসল ব্যাপারেই গলদ বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ে কয়েক বোতল খাওয়া এবং খাওয়ানো সত্ত্বেও, আমি টাকার কথাটা পাড়লাম; এবং পরীক্ষা করার জন্যে তিনি উপযুক্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কিনা সে কথাও জিজ্ঞাসা করতে ভুললাম না। তিনি জানালেন যে সব কাগজই তিনি এনেছেন, এবং সেগুলি তাঁর হোটেলে রয়েছে।

খবরটা শুনে আমি বেশ আশ্বস্ত হলাম; তারপরে খাবারের সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর হোটেলে ফিরে এলাম। কাগজপত্র সব পরীক্ষা করে আমি এত খুশি হলাম যে তাঁকে তক্ষুনি বুকে জড়িয়ে ধরার অদম্য একটি স্পৃহা জেগে উঠলো আমার মনে। এবং সত্যি কথা বলতে কি তাঁকে শেষ পর্যন্ত আলিঙ্গন না করে পারি নি আমি। তখনও শ্যাম্পেনের কবলস্থ

ছিলাম আমরা। আমি তাঁকে বার-বার বুকে জড়িয়ে ধরলাম। পিষে ফেললাম তাঁকে—যদিও কোন রকম অসৎ উদ্দেশ্য আমার এতটুকু ছিল না: শেষ পর্যন্ত আমি...না, না.. তিনি আমার কাছে ধরা দিলেন।

প্রচণ্ড উন্মাদনায় আমরা দুজনেই উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—দেখবেন, একথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমার ভবিষ্যৎ যেন আপনি ধ্বংস করে দেবেন না।

আমি তাঁকে কথা দিলাম। তারপরে প্রচণ্ড একটা মানসিক অশান্তি নিয়ে আমি বাসায় ফিরে এলাম।

এর পরে আমার কী করা উচিৎ তাই ভাবতে লাগলাম আমি। মক্কেলের আমি শ্লীলতাহানি করেছি। তাতেও বিশেষ কিছু যেত আসত না যদি সত্যি-সত্যিই আমার হাতে কোন পাত্র থাকতো। কিন্তু আমার হাতে তখন কোন পাত্র ছিল না। আমি নিজেই সেই পাত্র, সেই সরলমতি প্রবঞ্চিত পাত্র—নিজের সঙ্গে নিজে প্রবঞ্চনা করেছি আমি। কী বিপদেই যে পড়লাম। আমি অবশ্য তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন করে রাখতে পারতাম, কিন্তু ওই টাকা! ওই টাকা তো মিথ্যে নয়। তাছাড়া, ওই ঘটনার পরে তাঁর সঙ্গে ছলনা করা আর কি শোভনীয় হবে আমার পক্ষে? কিন্তু দুশ্চিন্তারও কি অবসান হল আমার? যে স্ত্রী অত সহজে অপরের অঙ্কশায়িনী হয় তার অর্থের ওপরে ভরসা কী?

সারা রাত্রি ধরে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে বেড়ালাম আমি। একবার অনুতাপ, একবার ভয় পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করল আমাকে; দ্বিধা এসে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু সকাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বেশ ভাল করে সাজলাম; তারপর এগারটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে আমি তাঁর হোটেলে হাজির হলাম।

আমাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জায় তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল।

আমি বললাম: গতকাল আপনার ওপরে যে অবিচার আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে একটি কাজই আমার করণীয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে আমাকে বিয়ে করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করা।

তিনি তোতলাতে লাগলেন; তারপরে বললেন: আমি রাজি।

আমি তাঁকে বিয়ে করলাম।

*　　*　　*　　*

ছটি মাস ভালই কাটলো আমাদের।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে বরপণের টাকা খাটিয়েই দিন কাটাতে লাগলাম। সত্যি কথা বলতে কি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত একটি ঘটনাও ওই ক'টি মাসে ঘটে নি।

অবশ্য লক্ষ্য করলাম যে আমার স্ত্রী মাঝে-মাঝে বাইরে গিয়ে অনেকটা

সময় কাটিয়ে আসেন। তারপরে এই বাইরে যাওয়া ব্যাপারটা প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়ালো; সপ্তাহে দুটি দিন—মঙ্গলবার আর শুক্রবার। আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে তিনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। আমি তার পিছু নিলাম।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। প্রায় একটা নাগাদ তিনি বেরিয়ে গেলেন, পায়ে হেঁটেই গেলেন; রু ত্য লা রিপার্বালিক-এর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেন, ডান দিকে বেঁকে যে রাস্তাটা আর্চবিশপের বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরলেন। সেন নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে পিয়ারী ব্রিজের কাছে থামলেন; তারপরে নদী পেরিয়ে এলেন। ঠিক এইখানে এসে তিনি অস্বস্তি বোধ করলেন; ঘুরে ফিরে পথচারীদের তিনি বেশ ভালভাবেই পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়লার দোকানের কুলির বেশ ধরে ছিলাম বলে আমাকে তিনি চিনতে পারলেন না।

অবশেষে নদীর বাঁ দিক দিয়ে তিনি স্টেশনে হাজির হলেন। একটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে যে তাঁর প্রেমিক এসে নামছেন সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। একটা চার চাকার গাড়ীর পেছনে লুকিয়ে থেকে আমি তাঁর গতিবিধি আর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম।

হুইশিল বাজলো—ট্রেন এল—প্লাটফর্মের ওপরে ভিড় জমে গেল প্যাসেঞ্জারদের। তিনি তাদের দিকে এগোতে লাগলেন; তারপরে লাগলেন ছুটতে। একটা বেশ মোটা-সোটা দেহাতী মেয়ে তিন বছর বয়সের একটি শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সে শিশুটিকে নিবিড়-ভাবে চুমু খেলেন। তারপরে তিনি ঘুরে তাকালেন; এদিকে-ওদিকে দেখলেন; আর একটি দেহাতী মেয়েমানুষের কোলে একটি শিশু; প্রথমটির থেকে এর বয়স কিছুটা কম। শিশুটি ছেলে না মেয়ে ঠিক ধরতে পারলাম না। আমার স্ত্রী তাকে দেখতে পেয়েই ছুটে গেলেন; তারপরে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপরে সেই দুটি নার্স আর দুটি শিশু নিয়ে কুর-লা-রাইন এর নির্জন পরিত্যক্ত পার্কের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গভীর দুঃখ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল্যাম আমি। কী যে ঘটলো তার কিছুই মাথায় ঢুকলো না আমার। কিছু অনুমান করে নেওয়ার শক্তিটুকুও তখন আমার ছিল না।

ডিনারের সময় তিনি বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে গেলাম আমি; বেশ উত্তেজিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম: ওই ছেলেমেয়েগুলি কার?

কোন্ ছেলেমেয়ে?—অবাক হয়ে গেলেন আমার স্ত্রী।

যাদের সঙ্গে স্টেশনে তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে?

এই কথা শুনেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন; তারপরেই মূর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পরে কাঁদতে কাঁদতে তিনি আমাকে জানালেন যে তার চারটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, চারটি—দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। দুটিকে

তিনি মঙ্গলবার দেখতে যান, দুটিকে দেখতে যান শুক্রবার।

তাহলে ব্যাপারটা এই...কী লজ্জা, কী লজ্জা! তোমার সম্পত্তির উৎস ওইখানেই!! চারটি বাবা ওদের। এই করেই তুমি তোমার বিয়ের পণ যোগাড় করেছ!

স্যার, এখন আপনি আমাকে কী করতে উপদেশ দেন?

উকিলটি বেশ গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন: আমার উপদেশ একটিই। শিশুদের আপনার নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে নিন। সব ঝামেলা চুকে যাবে।

একটি বারবণিতার কাহিনী

(The Odessay of a prostitute)

হ্যাঁ। সেদিন সন্ধ্যার স্মৃতিটি কিছুতেই আমার মন থেকে মুছে যাবে না। মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্য যে কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে সেদিন আধ ঘণ্টা ধরে আমি তা উপলব্ধি করেছিলাম। মাটির গভীরতম খাদের নীচে নামার সময় মানুষ যেমন আতংকিত হয়ে ওঠে সেদিন ঠিক তেমনিভাবেই আমি আতংকিত হয়েছিলাম। দুঃখ মানুষকে যে কতটা নীচে নামাতে পারে সেদিন আমি তা মেপে দেখেছিলাম। বুঝতে পারছি এমন কিছু মানুষ এ জগতে রয়েছে যাদের পক্ষে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকাটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল মধ্যরাত্রির কিছু পরেই; ভদেভিল থেকে রু দুরোত-এর দিকে যাচ্ছিলাম। দ্রুতগামী অসংখ্য ছাতার ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে হাঁটছিলাম আমি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তবে যতটা পরিমাণ বৃষ্টি পড়ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কালো মেঘ জমাট হয়ে বসেছিল মাথার ওপরে। অন্ধকারে ভরে উঠেছিল চারপাশ। মৃদু আলোতে ফুটপাত ঠিক ভিজে নয়, কিছুটা চিটচিটে দেখাচ্ছিল। পথচারীদের কোন দিকে তাকানোর সময় ছিল না। যে যার বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল।

সেই ম্রিয়মান আলোতে বারবণিতাদের দেখতে পেলাম। তারাও কর্মব্যস্ত। হাঁটুর কাছাকাছি স্কার্ট তুলে মোজায় ঢাকা পা-গুলি দেখিয়ে পথচারীদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বারান্দার নিচে ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কেউ-কেউ বা পথচারীদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করছে; আবার কেউ-কেউ বা রাস্তার ওপরে বেরিয়ে এসে নির্লজ্জের মত পথচারীদের গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলছে তাদের। কোন-কোন লোকের সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছুদূর হেঁটে

যাচ্ছে, কী যেন তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। তাদের নোংরা নিঃশ্বাস তাদের গা আর মুখের ওপরে ফেলছে ; তারপরে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পেরে তারা হঠাৎ তাদের ছেড়ে দিচ্ছে। তারপরে রেগে গরগর করতে-করতে আর সেই সঙ্গে নানা রকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখাতে-দেখাতে আবার তারা যে যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার সময় বিকৃত করছে ঠোঁটগুলিকে।

ঠিক একইভাবে বারবণিতাদের ব্যূহ আর আকুতি ভেদ করে আমি এগিয়ে চললাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তিনটি বেশ্যা ছুটতে সুরু করেছে ; ছোটার সময় নিজেদের মধ্যে কী যেন সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাও বলছে তারা। মনে হল তারা বেশ ভয় পেয়েছে। তারপরই দেখলাম, অন্য বেশ্যারাও পড়ি-কি-মরি এইভাবে চার পাশে ছোটাছুটি সুরু করেছে ; সহজভাবে তাড়াতাড়ি ছোটার জন্যে তারা নিজেদের পোশাকগুলিকে পুটলি করে হাতে ধরে নিয়েছে। বুঝলাম পুলিশে তাড়া করেছে তাদের।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বেশ আর্তকণ্ঠেই বলল : স্যার, আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। বয়স তার কুড়িও হবে না। তবু তারই ভেতরে সে কেমন যেন বুড়িয়ে গিয়েছে। আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম : তুমি আমার সঙ্গে থাক ; ভয় নেই।

সে বিড়-বিড় করে বলল : ও, ধন্যবাদ। আমাকে বাঁচালেন।

পুলিশ-ব্যারিকেডের ধারে হাজির হলাম আমরা। তারা আমাদের ছেড়ে দিল। গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললাম আমি।

সঙ্গিনীটি জিজ্ঞাসা করল : আমার বাসায় যাবেন ?

বললাম : না।

কেন যাবেন না ? আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আমি তা ভুলতে পারব না।

তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমি বললাম : কারণ আমি বিবাহিত।

তাতে কী হয়েছে ?

বললাম : ঠিক আছে, ঠিক আছে। হাজতবাস থেকে তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি ; এবার তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

সারা রাস্তাটাই নির্জন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ; সত্যিই বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার মনের ওপরে এমনিতেই একটা ভীতিপ্রদ অস্বস্তিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল ; মেয়েটির ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সেই পরিস্থিতিটিকে আরও জটিল করে তুলল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কড়া স্বরেই আমি তাকে বললাম : সর। চুপ কর। বকবক করো না।

বেশ চটেই সে সরে দাঁড়ালো; তারপরে, হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো। আমি তো অবাক। কেমন মায়াও লাগলো; কিন্তু তার কান্নার কারণটা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম: কী হ'ল তোমার?

কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল: এ-জীবন সুখের নয়। যদি আপনি তা জানতেন?

কী সুখের নয়?

আমার জীবন—যে ভাবে আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

এ-পথে এলে কেন?

এ-পথে আসার জন্যে দোষী আমি নই।

কে দোষী?

কে দোষী তা আমি জানি।

এই পরিত্যক্ত প্রাণীটিকে বোঝার জন্যে কেমন একটা কৌতূহল জাগলো আমার।

সে বলল: আমার বয়স তখন ষোল। ইভেতোত-এ মঁসিয়ে লেরাবেল-এর বাড়িতে আমি তখন চাকরী করি; আমার বাবা-মা কেউ বেঁচে ছিলেন না। কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন না আমার। আমি বেশ ভাল করেই জানতাম যে আমার মনিবটির স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি মাঝে-মাঝে আমার গাল টিপতেন। কিন্তু তা নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই নি। সেই বয়সেই আমি কয়েকটা ব্যাপার জেনেছিলাম। গ্রামের মেয়েরা এসব ব্যাপারে একটু বেশী মাত্রায় পোক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মঁসিয়ে একজন ধার্মিক মানুষ। কেবল বয়সেই তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না; প্রতিটি রবিবারে তিন গির্জায় যেতেন যীশুর ভজন-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে। তিনি যে এ-রকম কাজ করতে পারেন তা আমি ভাবতেও পারি নি। তারপর একদিন রান্নাঘরে তিনি আমাকে বলাৎকার করার চেষ্টা করলেন। আমি বাধা দিলাম। ফিরে গেলেন তিনি।

আমাদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকে মঁসিয়ে দুতান-এর মুদির দোকান ছিল। তাঁর কর্মচারীটিকে আমার বেশ ভাল লাগতো। তাকে আমি কিছুটা প্রশ্রয় দিতাম। এরকম ঘটনা প্রতিটি মেয়ের জীবনেই ঘটে। তাই নয় কি? সেই জন্যে প্রত্যেক দিন রাত্রিতেই আমি দরজা খুলে রাখতাম। সে আমার ঘরে আসত।

তারপর একদিন রাত্রিতে মনিব একটা শব্দ শুনে দোতলায় উঠে এলেন; দেখলেন আমার ঘরে অ্যানতোয়েন বসে রয়েছে। তাকে তিনি মেরে ফেলার চেষ্টা করলেন। দুজনের মধ্যে মারামারি সুরু হল। চেয়ার, টেবিল, জলের কুঁজো, যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে তারা পরস্পরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছু জামা কাপড় নিয়ে আমি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম; তারপরে

দিলাম ছুট।

তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলাম আমি। একটা বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমি জামা কাপড় বদলিয়ে নিয়ে সোজা সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আমার মনে হল দুজনের মধ্যে নিশ্চয় একজন মরেছে; আর পুলিশ আমাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার রাওনে পৌছতে পারলে নিজেকে আমি লুকিয়ে রাখতে পারব এই ভেবে আমি রাওনে যাওয়ার পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

এত অন্ধকার যে কোথায় থানা আর কোথায় খোঁদল রয়েছে তা আমি দেখতে পেলাম না। খামারে কুকুর ডাকছে শুনতে পেলাম। রাত্রিতে কত রকমের যে শব্দ হয় তা কেউ জানে না। পাখিরা এমন করে চেঁচায় যে মনে হয় গলা-কাটা অবস্থায় কোন মানুষ যেন কঁকাচ্ছে। ভয়ে আমার শরীরের রক্ত জমাট বেঁধে গেল। সকাল হলে পুলিশের ভয়ে আবার আমি ছুটতে লাগলাম। তারপর এক সময় আমার উত্তেজনা কমে এল।

আশংকা তখনও আমার বেশ ভালই ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বেশ খিদে পেয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তখন একটি পয়সাও ছিল না। আসার সময় সব আমি বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম—এ-পৃথিবীতে আমার সমস্ত সঞ্চয় ছিল আঠারোটি. ফ্রাঁ। সুতরাং পেটের খিদে পেটের মধ্যে রেখেই আমি হাঁটতে লাগলাম। রোদ বাড়লো। পুড়ে গেল আমার গা। দুপুর কাটলো। তবু হাঁটতে লাগলাম আমি।

হঠাৎ পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলাম। ঘুরে চেয়ে দেখি পুলিশ। ভয়ে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো বুকটা। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করলাম না। তারা আমার কাছে এল; আমার দিকে তাকালো। একজন বেশ ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করল: কোথায় চলেছ?

বললাম: রাওনে; চাকরীতে যোগ দেওয়ার জন্যে।

পায়ে হেঁটে এইভাবে রাওন যাচ্ছ?

হ্যাঁ; এইভাবেই যাচ্ছি।

এত জোরে আমার বুক তখন ধড়ফড় করতে শুরু করেছে যে ভাল করে কথা বলার শক্তিটুকুও তখন আমি হারিয়ে ফেলেছি। মনে-মনে ভাবছি—এবার আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তখন আমি ছুটতে পারলে বেঁচে যাই। কিন্তু তারা ছাড়লো না।

তাদের মধ্যে একটা বুড়ো ছিল। সে বলল: আমরাও ওই দিকে যাব। আমাদের সঙ্গেই চল।

বললাম: আনন্দের সঙ্গেই।

চলতে-চলতে যতটা সম্ভব তাদের সঙ্গে বেশ হেসেই গল্প করতে লাগলাম আমি—কারণ ও ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার তখন ছিল না। তারপরে একটা বনের মধ্যে এসে হাজির হলাম আমরা। বুড়োটা বলল: চল না, ওই

ছায়ার তলায় দুজনে শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই।

কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি বললাম: বেশ তো চলুন।

এই কথা শুনে সে ঘোড়া থেকে নামলো; সঙ্গীর জিম্মায় ঘোড়াটা রেখে আমাকে নিয়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

'না' বলার কোন উপায় ছিল না আমার। আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন? সে যা চেয়েছিল তাই তাকে দিতে হল। তার চাহিদা মিটিয়ে সে উঠলো; তারপরে বলল: আমার বন্ধুটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই বলে সে চলে গেল। হাজির হল তার বন্ধুটি। লজ্জায় আমি মরে গেলাম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। কিন্তু বাধা দিতে পারলাম না।

আমার পথ চলা সুরু হল। খিদেতে আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। গ্রামের মধ্যে ঢুকে তারা অবশ্য আমাকে এক গ্লাস মদ খেতে দিয়েছিল। সেটা খেয়ে খানিকটা বল পেলাম দেহে। তারপরে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমাকে ফেলে গেল পেছনে। একটি খানার ধারে বসে আমি কাঁদতে লাগলাম।

রাওনে পৌছতে তখনও আমার তিন ঘণ্টা লাগার কথা। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমি সেখানে পৌছলাম। প্রথমে সহরের আলো দেখেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কোথায় যে বিশ্রাম করব তাও আমি জানতাম না। পথের ওপরে তবু খানা-ডোবা রয়েছে, ঘাস রয়েছে। ইচ্ছা করলে সেখানে আপনি একটু সময়ের জন্যে বিশ্রাম করতে পারেন। সহরে সে-সব বালাই নেই।

আমি এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে মনে হল এবার আমি মরে যাব। সুরু হল মিহি দানার বৃষ্টি—ঠিক আজকের মত—আপনি জানতেও পারবেন না, আপনাকে একেবারে ভিজিয়ে শপশপে করে দেবে। এই রকম দিনে আমাদের রোজগারপাতি কমে যায়। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। ঘরের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম: এ সহরে এত বাড়ি, এত বিছানা, এত খাবার। আর আমার একটুকরো রুটি নেই; একটুকরো চট নেই যে একটু বিশ্রাম করি। যে সব রাস্তায় মেয়েরা চলমান মানুষকে ডাকে সেই রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। ওই রকম অবস্থায় আপনি কী যে করেন সে-সম্বন্ধে আপনার কোন ধ্যান ধারণা থাকে না। অন্য মেয়েরাও যে রকমটি করছিল আমিও তাই করলাম। কেউ আমার ডাকে সাড়া দিল না; ইচ্ছে হল, আর না; এবার আমি মরে যাই। মাঝ রাত পর্যন্ত লোক ডেকে-ডেকেই কেটে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত একটা লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কোথায় থাক তুমি?

প্রয়োজন মানুষকে ক্ষুরধার করে তোলে; আমি বললাম: বাড়িতে আমার মা রয়েছেন। সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। তোমার

জানা কোন বাড়ি নেই?

সে বলল: ঘরের জন্যে একটি ফ্রাঁ-ও আমি খরচ করি নে। এস; একটা জায়গায় যাই চল। সেখানে আমাদের কেউ বিরক্ত করবে না।

ব্রিজের ওপর দিয়ে সহরের প্রান্তে একটা নদীর ধারে সে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে সে আমাকে বসালো; তারপরে যে কাজের জন্যে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই কাজ সারার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কাজ সারতে তাঁর এত দেরী হতে লাগলো যে ক্লান্তিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

লোকটা যে আমাকে কিছু না দিয়েই চলে গেল সেটা আমি লক্ষ্যই করলাম না। সে রাত্রিটা ভিজে মাঠের ওপরেই কেটে গেল আমার। সেই থেকে পিঠে একটা বেদনা ধরেছে। এখনও সেটা সারে নি।

পরের দিন সকালে দুটি পুলিশ এসে আমাকে টেনে তুলল; তারপরে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নিয়ে গেল থানায়। পাছে সব জানাজানি হয়ে যায় এই ভয়ে আমার পরিচয় আমি তাদের জানাতে ভরসা পাই নি। থানা থেকে কয়েক দিন জেলে কাটালাম আমি। আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না পেয়ে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে আমাকে তারা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল।

আবার আমি কাজ খুঁজতে বেরোলাম; কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আসার ফলে কেউ আমাকে কাজ দিতে রাজি হল না। তারপরে আমার সেই বুড়ো জজটির কথা মনে পড়ে গেল। আমার বুড়ো মনিবের মত সেই বুড়ো জজসাহেব-টিও বিচারের সময় আমাকে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। আমার অনুমানে কোন ভুল হয়নি। ফিরে আসার সময় তিনি আমাকে পাঁচটি ফ্রাঁ দিয়ে বললেন: প্রতিবার পাঁচ ফ্রাঁই তুমি পাবে; তবে সপ্তাহে দু'বারের বেশী এস না।

আমি তাঁর কথার অর্থটি বুঝলাম। হাজার হোক বুড়ো মানুষ তো। কিন্তু একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারলাম আমি। নিজের মনে-মনেই বললাল: ফুর্তি করার জন্যে যুবকরা মোটামুটি ভালই। কিন্তু তাদের দেহ দিলে তোমার খাওয়া-পরা জুটবে না। বৃদ্ধদের বেলায় অন্য ব্যাপার। তবে বুড়ো হলেই চলবে না। আসল লোকটিকে খুঁজে বার করতে হবে আপনাকে—সেই সব বুড়ো বাঁদর, মেড়ার মত নিরীহ ভিজে-ভিজে চোখ, চকচকে টেকো মাথা।

তারপরে আমি কী করলাম জানেন? আমার এই সব ধম্ম-বাপদের খুঁজে বার করার জন্যে পরিচারিকার বেশ ধরে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দেখলেই মনে হবে আমি যেন বাজার করে ফিরে আসছি। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি এদের চিনে ফেলতাম; মনে মনে বলতাম, এই লোকটা চরে ভিড়বে।

প্রথম দু'চারটে মামুলি কথাবার্তার পর লোকটি আমাকে তাঁর সঙ্গে যাও-য়ার জন্যে চাপ দেন, প্রথমদিকে বারকয়েক "না-না" করে শেষ পর্যন্ত আমি রাজি হয়ে যাই। প্রতিদিন সকালের দিকে এই রকম দু'তিনজন মক্কেল আমি

পাকড়াই। সারা বিকালটাই আমি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাই। সেই সময়টাই আমার সবচেয়ে ভাল সময় ছিল। কোনরকম দুর্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু বেশী দিন মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারে না। আমারই দুর্ভাগ্য যে সেই সময় আমার একটা বুড়ো শয়তানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লোকটা ছিল ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট—বয়স তার কম করে পঁচাত্তর হবেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলা সহরতলির কোন একটা রেস্তোরাঁতে সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। লোকটার মধ্যে সংযম বলতে কোন পদার্থই ছিল না। খেতে-খেতে সে হঠাৎ মরে গেল।

তিনমাস জেল হল আমার—কারণ আমি রেজিষ্টার্ড বেশ্যা ছিলাম না। তারপরে আমি প্যারিসে গিয়ে হাজির হই।

এখানে জীবন বড় কষ্টের স্যার। রোজ এখানে সকলের খাওয়া জোটে না। আমার মত বেশ্যা এখানে অনেক রয়েছে। কিন্তু উপায় কী বলুন? আমাদের প্রত্যেকেরই অল্প-বিস্তর কিছু-না-কিছু অসুবিধে রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত চুপ করল মেয়েটি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার পাশে-পাশে হাঁটছিলাম আমি। তারপর হঠাৎ সে আবার ঘনিষ্ঠতার সুরে কথা বলতে লাগলো। তুমি তাহলে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আসছ না?

না। সেকথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।

তাহলে বিদায়। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি; তোমাকে যে প্রতিদানে কোন কিছু দিতে পারলাম না সেজন্যে অপরাধ নিয়ো না। কিন্তু আমি তো বলছি না এসে ভুল করলে তুমি।

আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম পাতলা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সে দৃষ্টিরেখার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। হতভাগ্য মানুষ।

আর্দালী

[The Order'y]

মিলিটারী অফিসারে গিজ গিজ করছে কবরখানা, ফুলে-ফুলে ভরে উঠেছে জায়গাটা। সামরিক বাহিনীর লোকরা তাদের জমকালো পোশাক পরে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সমাধিগুলির চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা সবাই এসেছে কর্নেল লিমোসিনের স্ত্রীকে কবর দিতে। ভদ্রমহিলা দুদিন আগে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে গেল। পাদরী তার কাজ শেষ করে বিদায় নিলেন। কিন্তু কর্নেল তখনও সেই খোলা গর্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে

রইলেন। তাঁকে দুপাশ থেকে ধরে রেখেছেন তাঁরই দুজন সহকর্মী মিলিটারী অফিসার। গর্তের অনেক নিচে কাঠের যে বাক্সটি বসানো রয়েছে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন কর্নেল। ঐ বাক্সের মধ্যেই তাঁর যুবতী স্ত্রীর গলিত শবটি শোয়ানো রয়েছে।

বয়স হয়েছে কর্নেলের। লম্বা, রোগাটে চেহারা; গোঁফজোড়া সাদা। তিন বছর আগে তিনি তাঁর একটি বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে মেয়েটিকে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না।

ক্যাপটেন আর লেফটেন্যান্ট-এর গায়ে ভর দিয়ে কর্নেল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁকে সরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করলেন। উদ্গত অশ্রুকে জোর করে চেপে তিনি তাঁদের বাধা দিলেন; নিচু গলায় বললেন: না, না, আর একটু, আর একটু। দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল; তবু তিনি সেই কবরের ধারটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কাছে মনে হল ওই গর্তটি অনন্ত, ওর কোন তল নেই; সেই অতলান্ত অন্ধকারে প্রেম, জীবন—এ জগতে নিজস্ব বলতে তাঁর যা কিছু রয়েছে—সব সমাধিস্থ হয়েছে।

হঠাৎ জেনারেল ওঁরমত এগিয়ে এসে জোর করে তাঁকে টেনে আনলেন: চলুন, চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই।

কোন বাঁধা না দিয়েই ফিরে এলেন কর্নেল।

পড়ার ঘরের দরজা খুলতেই কর্নেল লক্ষ্য করলেন টেবিলের ওপরে একখানা খাম পড়ে রয়েছে। চিঠিটা কম্পিত হাতে তুলে নিলেন তিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চিঠিটার দিকে; ভাবাবেগে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্ত্রীর হস্তাক্ষর চিনতে অসুবিধে হল না তাঁর। চিঠির ওপরে পোষ্ট অফিসের যে ছাপ রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় চিঠিটি সেইদিনই বিলি হয়েছে। খামটি খুলে পড়তে লাগলেন তিনি:

বাবা—আশা করি, আগেও যে নামে তোমাকে ডাকতাম আজও সেই নামে ডাকতে পারি।—এ চিঠি যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন আমি মৃত, কবরস্থ। সেই জন্যেই হয়ত তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

তোমার কাছ থেকে করুণা পাওয়ার আশায়, অথবা, আমার অপরাধ কমানোর চেষ্টায় কিন্তু আমি এই চিঠি লিখছি না। যে নারী আর একটি ঘণ্টার মধ্যে আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর সেই নারীর সমস্ত আন্তরিক সততা নিয়েই আমি এই চিঠিটা লিখছি—এর প্রতিটি কথাই সত্যি এইটাই কেবল তোমাকে আমি জানাতে চাই।

তোমার উদারতায় যখন তুমি আমাকে বিয়ে করলে তখন থেকেই আমি তোমার হয়ে গেলাম। ভাল-ও তোমাকে বেসেছিলাম—যুবতীর পক্ষে যতটা ভালবাসা সম্ভব তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। নিজের বাবাকে আমি যেমন ভালবাসতাম, তোমাকেও আমি ঠিক তেমনি

ভালবাসতাম। একদিন কোলে নিয়ে তুমি যখন আমাকে বুকে চেপে ধরেছিলে তখন আমি অজ্ঞাতসারেই তোমাকে 'বাবা' বলে ডেকে ফেলেছিলাম। ওই ডাকটা স্বতস্ফূর্তভাবেই আমার অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তুমি আমার কাছে বাবারই মত ছিলে, এতটুকু কম ছিলে না। তুমি হেসে বলেছিলে—ওই নামেই আমাকে তুমি ডাকবে—আমি খুব খুশি হব।

আমার এই সহরে এলাম; আমায় ক্ষমা করো, বাবা, আমি প্রেমে পড়লাম। মনের সেই উন্মাদনাকে চেপে রাখার জন্যে দুটি বছর ধরে আমি কী চেষ্টাই না করেছি। তুমি বিশ্বাস কর, দুটি বছর ধরে··· দীর্ঘ দুটি বছর ধরে নিজের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেছি আমি। তারপরে আর পারি নি; হাল ছেড়ে দিয়েছি আমি। তারপর থেকেই আমি অপরাধিনী; সেদিন থেকেই আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি।

সে কে? সেদিক থেকে কোন অনুমান করো না তুমি। এপাশ থেকে আমিও অত্যন্ত সহজ ছিলাম, কারণ আমার আশেপাশে সব সময়েই ডজন-খানেক অফিসার ঘুরে বেড়াতেন; তাদের তুমি বলতে—আমার উপগ্রহ।

বাবা, এই মানুষটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো না তুমি, কোন বিদ্বেষও রেখ না তার ওপরে। তার অবস্থায় পড়লে অন্য মানুষ যা করত, সে-ও তাই করেছে; তা ছাড়া, আমি নিশ্চয় বলতে পারি সে-ও আমাকে সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতো।

কিন্তু যা বলছিলাম। উইণ্ডমিলের কাছে যে ছোট দ্বীপটা রয়েছে একদিন ওখানে আমরা গোপনে দেখা করব বলে ঠিক করলাম। সাঁতার কাটতে কাটতে আমি সেখানে গিয়ে নামবো; সে ঝোপের মধ্যে বসে থাকবে আমার জন্যে। দুজনে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে কাটাবো—যেন ফিরে আসার সময় তাকে কেউ দেখে না ফেলে। তার সঙ্গে আমার সবেমাত্র দেখা হয়েছে, এমন সময় ডালগুলি সরিয়ে দেখি তোমার আর্দালী ফিলিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধরা পড়ে গিয়েছি এইভাবে আমি চীৎকার করে উঠলাম। কিন্তু সে আমাকে কী বলল জান? বলল: ভয় নেই যাদু; তুমি সাঁতার কাটো গে যাও। আমি এই লোকটির সঙ্গে বসে রয়েছি।

মনের উত্তেজনা নিয়ে আমি ফিরলাম; সেই উত্তেজনার ভারে আমি প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম আর কি। বাড়িতে এসে হাজির হলাম; এর পরে কী একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যাবে এই ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এক ঘণ্টা পরে ড্রয়িংরুমের বারান্দায় ফিলিপের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে নিচু গলায় বলল: মাদাম, যদি আমাকে কোন চিঠি দেন আমি তা যথাস্থানে পৌঁছে দেব।

আমি জানতাম সে তাকে বিক্রী করে দিয়েছে; এবং আমার বন্ধুটি টাকা দিয়ে তাকে কিনে নিয়েছে।

আমি তার হাতে চিঠি দিলাম—সব চিঠি। ফিলিপ সেগুলি তাকে দিয়ে এল; বয়ে নিয়ে এল তার উত্তর।

এইভাবে দুটো মাস কাটলো। তাকে আমরা বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম, যেমন তুমি তাকে বিশ্বাস করতে।

বাবা, তারপরে কী ঘটলো শোন। একদিন সেই দ্বীপটিতে যথারীতি সাঁতার কেটে হাজির হলাম আমি। একাই গিয়েছিলাম সেদিন। আবার তোমার আর্দালীর সঙ্গে দেখা। সে আমাকে আশা করছিল। সে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল আমি যদি তার ইচ্ছা পূরণ না করি তাহলে আমাদের দুজনের কথা সে তোমাকে বলে দেবে; আর সেই সঙ্গে আমাদের যে ক'টা চিঠি সে চুরি করে রেখে দিয়েছে সেগুলিও সে তুলে দেবে তোমার হাতে।

তার প্রস্তাবটা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম; একটা বীতিকিচ্ছ্রী, নোংরা ক্লীবের ভয় এসে আচ্ছন্ন করল আমাকে। সবার ওপরে আমার ভয় হল তোমার জন্যে। এত দয়ালু তুমি; তবু আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করলাম। ভয় পেলাম তার জন্যে; কারণ, তাকে নিশ্চয় তুমি মেরে ফেলতে। নিজের ওপরেও ভয় হল আমার। কী করে আমার মনের অবস্থাটা তোমাকে আমি বোঝাবো? কী যে করব কিছুই বুঝতে পারলাম না; সেই জন্যে আমি ভাবলাম আর একবার এই দুষ্ট লোকটাকে আমি কিনে নেব; ওই লোকটাও আমাকে ভালবাসে।

আমরা, নারীরা, এত দুর্বল! তোমাদের চেয়ে কত সহজে আমরা মাথা হারিয়ে ফেলি। এবং তারপর একবার যদি আমরা নীচে নামতে আরম্ভ করি তখন আর ওঠার সুযোগ পাইনে—নামতে-নামতে অতলে তলিয়ে যাই। কী যে করছিলাম কী তোমাকে বলব? আমি কেবল এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে মরতেই হবে। এই ভেবে সেই পশুটার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

বাবা, তুমি বুঝতে পারছ নিজের দোষ স্খালন করার জন্যে এতটুকু চেষ্টা আমি করছি না।

তারপরে যা ভেবেছিলাম তাই ঘটলো। বরাবর আমাকে ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে নিজের ইচ্ছে মত সে আমাকে ভোগ করতে লাগলো। আর একজনের মত সে-ও আমার প্রেমিক ছিল। জিনিসটা খুব নক্কারজনক, তাই না? তার জন্যে কী শাস্তিই না আমাকে ভোগ করতে হয়েছে।

অবশেষে, আমি ঠিক করে ফেললাম, আমাকে মরতেই হবে। বেঁচে থেকে তোমার কাছে এ-অপরাধ আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। মৃত্যুর পর সব কিছু করারই সাহস থাকবে আমার। মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই আমার; আর কিছুই আমার কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে পারবে না। আমার মনে হল, আর কাউকে আমি ভালবাসতে পারব না, আর কেউ

আমাকে ভালবাসতে পারবে না; এমন কি আমার হাতের স্পর্শও কলঙ্কিত বলে মনে হবে।

আর একটু পরেই আমি স্নান করতে নামবো; আর উঠবো না।

এই চিঠি আমি আমার প্রেমিকের বাড়িতে পাঠালাম। আমার মৃত্যুর পরে সে এই চিঠি পাবে; এবং এর মধ্যে কী আছে না জেনে এটিকে সে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। এইটিই আমার অন্তিম বাসনা। আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে ফিরে আসার পর এই চিঠি তোমার হাতে আসবে।

বিদায় বাবা; আর কিছু বলার নেই আমার। তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। ক্ষমা করো আমাকে।

চিঠিটা শেষ ক'রে কর্ণেল তাঁর কপালের স্বেদবিন্দুগুলি মুছলেন। হঠাৎ তাঁর সংযমবোধ ফিরে এল। ফিরে এল যুদ্ধকালীন স্থৈর্য। আপন সত্তায় ফিরে এলেন তিনি।

বেল বাজালেন। হাজির হল চাকর।

ফিলিপকে ডেকে দাও।—এই কথা বলে তিনি ড্রয়ারটা একটু টানলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একটি লোক ঘরে ঢুকলো—লম্বা চেহারা, লাল গোঁফ—সৈনিক; ধূর্ত চাহনি তার চোখে।

কর্ণেল তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন: আমার স্ত্রীর প্রণয়ীর নাম বল।

কিন্তু স্যার...

কর্ণেল ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বার করে বললেন: তাড়াতাড়ি বল। তুমি জান আমার আদেশ অমান্য করা যায় না।

ঠিক আছে স্যার...ক্যাপটেন সেন্ট্ অ্যালবার্ট।

নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝলক অগ্নি শলাকা তার চোখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা; একটি বুলেট কপালের সামনে দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল তার।

বন রক্ষক

(The keeper)

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই মিলে আমরা শিকারের ঘটনা আর দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

মঁসিয়ে বোনিফেস আমার পুরনো বন্ধু; জীবনে তিনি কত জানোয়ার

হত্যা করেছেন তেমনি খেয়েছেন মদ। বেশ শক্ত-সমর্থ, শক্তিমান পুরুষ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, যেমন রসিক তেমনি দার্শনিক। রসিকতা করে মানুষকে যেমন বিদীর্ণ করতে পারতেন, তেমনি আবার বিশাল সমুদ্রে ডুবে যেতেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন: আমি একটা শিকারের গল্প জানি; তাকে তোমরা শিকারের নাটক-ও বলতে পার। শিকারের কাহিনী বলতে সাধারণত যা বোঝায় এটি কিন্তু সে-রকম নয়। এ কাহিনী আমি আগেও বলি নি কোথাও। কেউ যে সে-কাহিনী শুনতে আগ্রহী হবে না তা আমি জানতাম।

গল্পটা শুনতে ভাল লাগবে না; অর্থাৎ শিকারের কাহিনীর মধ্যে যে রকম উত্তেজনা থাকে এতে সে-রকম কিছু নেই। যাই হোক, গল্পটা শোন।

বয়স তখন আমার পঁয়তিরিশ। শিকারের গন্ধ পেলেই আমি ক্ষেপে উঠতাম তখন। জুমিয়েগেজের বাইরে আমাদের একটা সুন্দর জায়গা ছিল। চারপাশে তার বন। শশক আর শশক জাতীয় প্রাণী শিকারের পক্ষে জায়গাটা ছিল একেবারে আদর্শ। বাড়িটা ছিল ছোট। তাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করার সুযোগ সেখানে ছিল। তবে আমি বছরে একবার করে যেতাম; কাটিয়ে আসতাম দু'চার দিন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকে বাড়িঘর দেখার জন্যে নিযুক্ত করেছিলাম। স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে লোকটা ভাল; তবে হঠাৎ চটে যেত; কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে জানতো না এতটুকু। যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে চুরি করত তাদের যম ছিল সে; এবং ভয় বলে কিছুই জানা ছিল না তার। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে ছোট একখানা বাড়িতে, কুটিরও বলতে পার, সে একাই থাকতো। একতলায় দু'খানা ছোট-ছোট ঘর। একখানা রান্না ঘর, একটা ছোট ভাড়ার ঘর। দোতলায় ঘর ছিল দুখানা। দোতলারই একখানা আমার জন্যে রাখা ছিল।

লোকটি থাকতো অপরটিতে। ঠিক একা থাকতো বললে সত্যি কথা বলা হবে না। সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার একটি ভাইপোকে—বছর চোদ্দ বয়স হবে তার। দু'মাইল দূরের গ্রাম থেকে সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতো; বৃদ্ধটিকে তার দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করতো।

ছোকরাটি বেশ লম্বা, রোগা; একটু নুয়ে-নুয়ে হাঁটতো। চুলের রঙ ছিল ফিকে হলদে; মনে হোত একমুঠো মুরগীর ছেঁড়া পালক। পরিমাণে এত কম যে মনে হোত ছোঁড়াটার মাথায় টাক ধরেছে। দীর্ঘ পা; আর বিরাট হাত; যেন দৈত্যের হাত নিয়ে সে জন্মেছে।

চাহনি কিঞ্চিৎ বাঁকা; কারও মুখের দিকে সে সোজা চোখে তাকাতে পারতো না; কিন্তু নেউল শেয়ালের মত চতুর। দোতলার ঘরে যাওয়ার পথে যে সিঁড়ি ছিল তারই একটা খোপে সে রাত্রিতে ঘুমোত। কিন্তু আমি

যে ক'টা দিন সেখানে থাকতাম সেই ক'টা দিন মারিয়া তার ঘরটি ছেড়ে দিত। সেখানে থাকতো সিলেসতি নামে একটি বৃদ্ধা; ওল্ড ক্যাভেলিয়ার অর্থাৎ দারোয়ানের ঘ্যাঁট আমার মুখে রুচতো না বলে রান্নার জন্যে তাকেই আনা হোত।

এতক্ষণে নিশ্চয় তোমরা এই নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছ, পরিচিত হয়েছ পটভূমিকার সঙ্গে। এবার আমার আসল গল্প সুরু করি শোন :

১৮৫৪ সালের পনেরই অকটোবর। দিনটা এখনও আমার মনে রয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে রাওন ছাড়লাম আমি। পেছনে আমার বিরাট শিকারী কুকুর। পেছনে আমার ব্যাগ, কাঁধে ঝোলানো বন্দুক। দিনটা ছিল ঠাণ্ডা কনকনে; বাতাস উঠেছিল ঝড়ো—আকাশে চলাফেরা করছিল কালো-কালো মেঘের দল। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমি সেখানে পৌছলাম। সেখানে বৃদ্ধ ক্যাভেলিয়ার আর সিলেসতি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

বিগত দশটি বছর ধ'রে একই ঋতুতে একই ভাবে আমি সেখানে হাজির হতাম, আর সেই দুটি মানুষই একই ভাষায় আমাকে অভ্যর্থনা জানাতো : নমস্কার মহাশয়। আপনি ভাল আছেন ?

দেহের দিক থেকে ক্যাভেলিয়ারের কোন পরিবর্তন আমার চোখে পড়ে নি। সময়ের অগ্রগতিকে রোধ করে সে অটবীর মতই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সিলেসতিকে বিশেষ করে শেষের চারটি বছরে যেন চেনাই যেত না। শরীরটা তার অসম্ভব বেঁকে গিয়েছিল। তখনও অবশ্য সে বেশ কর্মঠই ছিল। কিন্তু তার দেহের ওপরের বাঁকা অংশটাকে নিয়ে সে যখন হাঁটতো তখন মনে হোত একটি সমকোণ হেঁটে চলেছে।

বৃদ্ধাটি আমাকে বেশ ভালবাসতো। আমাকে দেখে তার বেশ আনন্দ হোত; প্রত্যেকবার ওখান থেকে চলে আসার সময় বলতো : মনে হচ্ছে এই আমার শেষ। এর পরের বার আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি মরণোন্মুখিনী সেই বৃদ্ধার আর্ত বিদায়বাণী প্রতিবার চলে আসার সময় আমাকেও বেশ ব্যথিত করত।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। একটি ছোট ছাউনির দিকে ক্যাভেলিয়ার আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল। ওটাকেই আমরা ওই ক'টা দিন আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করতাম। সিলেসতিকে সঙ্গে নিয়ে আমি রান্না ঘরের দিকে এগোলাম। ওটাই ছিল আমার সাময়িক ড্রয়িং রুম।

তারপরে ফিরে এল বন রক্ষক ক্যাভেলিয়ার। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মুখের সাধারণ অভিব্যক্তিটা তার যেন অন্তর্হিত হয়েছে। সে যেন ভাবছে। কী একটা দুশ্চিন্তায় সে যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম : খবর কী হে ? সব ভাল তো ?

সে বিড়-বিড় করে বলল : ভাল-ও বলতে পারেন। আবার নাও পারেন।

কী এমন একটা ব্যাপার রয়েছে যাকে মোটেই ঠিক বলা যায় না।

ব্যাপারটা কী? আমাকে খুলে বল।

কিন্তু সে মাথা নাড়লো: না; সেরকম কিছু তাড়াহুড়ো নেই। তাছাড়া, আপনি এইমাত্র এসেছেন। এরই মধ্যে ওই সব ঝামেলা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই নে।

তবুও আমি শুনতে চাইলাম। কিন্তু রাত্রির খাওয়া শেষ হওয়ার আগে কিছুতেই সে সেকথা বলতে রাজি হল না। কিন্তু তার চোখ মুখের চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল ব্যাপারটা হয়ত আদৌ উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

তাকে কী বলব ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম: শিকারের খবর কী? অনেক রয়েছে নিশ্চয়।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। অনেক শিকার পাওয়া যাবে। ভগবানকে ধন্যবাদ; সেদিকে সজাগ রয়েছি আমি।

এমন একটা গম্ভীর মেজাজে সে কথা ক'টি বলল যে আমার হাসি পেল। মনে হল, ধূসর রঙের বিরাট গোঁফ জোড়া এখনই তার ঠোঁট থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

হঠাৎ মনে হল, আমি তো তার ভাইপোকে এতক্ষণ দেখি নি।

মারিয়ার খবর কী? কোথায় গিয়েছে সে? তাকে তো দেখছি নে!

বন রক্ষক চমকে উঠলো। তীব্রভাবে ঘুরে দাঁড়ালো সে; আমার মুখোমুখী হয়ে বলল: তার কথা আগেই আপনাকে খোলাখুলি বলা ভাল মঁসিয়ে—আগেই বলে দেওয়া ভাল। তার ব্যাপারটাই আমাকে বিব্রত করেছে।

তাই বুঝি? সে কোথায়?

আস্তাবলে, মঁসিয়ে। আশা করছি যে কোন মুহূর্তেই সে এসে পড়বে।

কী করছে সে?

সেই কথাই বলছি মঁসিয়ে····

বলতে গিয়েই সে একটা ঢোক গিলল; স্বরে দেখা দিল পরিবর্তন; কাঁপতে লাগলো। ভুরু দুটো কুঞ্চিত হল; বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন দেখা দিল তার কপালে।

ধীরে-ধীরে সে বলল: ব্যাপারটা হচ্ছে এই—লক্ষ্য করলাম, কেউ রোজারীর বনে জাল পাতছে। কিন্তু লোকটাকে আমি ধরতে পারি নি। রাতের পর রাত আমি সেখানে কাটালাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আর ঠিক সেই সময়ে ইকোরভ্যালীর দিকেও জাল পড়তে লাগলো। রেগে কাঁই হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু চোরটাকে কিছুতেই ধরতে পারলাম না। মনে হবে নচ্ছার পাজিটাকে আমার পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়ে দিয়ে কেউ যেন তাকে সাবধান করে দিয়েছে।

কিন্তু একদিন সকালে মারিয়ার প্যাণ্ট বুরুশ করার সময় তার পকেটে

চল্লিশ সে রয়েছে দেখলাম। এখন কথা হচ্ছে এতগুলি সে ছোকরা কোথা থেকে পেল? সপ্তাহখানেক ধরে ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম। তারপরে লক্ষ্য করলাম ছোকরাটা প্রায়ই বেরিয়ে যায়। আমি যখন শুয়ে পড়ি তার পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

তারপরেই আমি তার ওপরে নজর রাখতে লাগলাম কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে আমি সন্দেহ করতে পারি নি। একদিন অনেক রাত্তিরে তার সামনেই আমি শুতে গেলাম; তারপরেই তাড়াতাড়ি উঠে তার পিছু নিলাম। আর পিছু নেওয়ার কথা যদি বলেন মঁসিয়ে, আমার জোড়া আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাকে আমি ধরলাম—মঁসিয়ে, আপনারই জমিতে জাল পেতেছে আমারই ভাইপো—আপনার রক্ষকের ভাইপো। ভাবতে পারেন একথা?

আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগলো; আমি প্রায় তাকে মেরে ফেলেছিলাম আর কি। আমি তাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিলাম। সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলাম আপনি এলে আপনার সামনেই তাকে আর এক প্রস্থ ধোলাই দেব। তবেই শিক্ষা হবে তার।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই। দুঃখে ভেঙে পরেছি আমি। এরকম ঘটনা ঘটা যে কত বড় অবাঞ্ছিত তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। কিন্তু আপনি করবেন কী? ছেলেটার বাপ-মা নেই। আপনজন বলতে কেবল আমিই। আমিই তাকে মানুষ করেছি। তাকে তো আর আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। পারি কি?

কিন্তু তাকে আমি বলে দিলাম, আবার যদি সে একাজ করে তাহলে আর দয়ামায়া নয়—সব খতম হয়ে যাবে। বলুন মঁসিয়ে, ঠিক বলেছি কি না?

তার দিকে সমর্থনের ভঙ্গীতে একটি হাত প্রসারিত করে বললাম: ঠিক বলেছ ক্যাভেলিয়ার, তুমি সৎ লোক।

সে উঠলো; বলল: ধন্যবাদ মঁসিয়ে। তাকে এবারে নিয়ে আসি। তাকে শাস্তি পেতেই হবে। নাহলে শিক্ষা হবে না তার।

আমি বুঝলাম বৃদ্ধটি যা করবে বলে ঠিক করে রেখেছে তা থেকে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা বৃথা। সুতরাং কোন বাধা দিলাম না আমি।

কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে ছেলেটাকে নিয়ে হাজির হল সে।

একটা বেতের চেয়ারের ওপরে জজসাহেবের মত ভারিক্কী মুখ করে বসেছিলাম আমি। দেখে মনে হল মারিয়া বড় হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় একটু যেন কুৎসিত হয়েছে বেশী; মুখের চেহারা দেখে মনে হল দুষ্টুমি করার বুদ্ধিটা পেকেছে বেশ, চতুরও হয়েছে কিছুটা। তার সেই বিরাট হাত দুটো দানবীয় বলে মনে হল আমার।

ছেলেটাকে আমার সামনে ধাক্কানি দিয়ে সে সামরিক নির্দেশের ভঙ্গীতে

হুংকার দিল : প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও।

একটা কথাও বলল না ছেলেটা।

এই দেখে সে কী করল জান? ছেলেটাকে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে ধোলাই দিতে সুরু করল। শেষ পর্যন্ত তার মার থামাতে আমাকে উঠে দাঁড়াতে হল।

ছেলেটা ততক্ষণে চীৎকার করতে সুরু করেছে—ক্ষমা করুন…আমি প্রতিজ্ঞা করছি…

ক্যাভেলিয়ার তার জামার কলার ধরে টেনে তাকে দাঁড় করালো; তারপরে ঘাড়ে একটা ভীম রদ্দা বসিয়ে দিয়ে বলল : দূর হ'।

সেই ধাক্কা কোন রকমে সামলে নিয়ে ছেলেটা পালিয়ে গেল। সেদিন রাত্রিতে আর তাকে দেখি নি আমি। কিন্তু ক্যাভেলিয়ার বেশ ভেঙে পড়েছে দেখলাম।

খেতে বসে সারাক্ষণই সে বক-বক করতে লাগলো : ছেলেটা একেবারে ব'য়ে গিয়েছে, মঁসিয়ে। আমার কী কষ্ট, মঁসিয়ে, আমার কী দুঃখ।

আমি তাকে বৃথাই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরের দিন ভোরের দিকে শিকারে বেরোতে হবে এই জন্যে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আমার বিছানার ধারে পায়ের কাছে মেঝের ওপরে কুকুরটা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিভিয়ে দিলাম আমি।

মাঝ রাতে কুকুরটা ভীষণ চীৎকার করে উঠলো। সেই চীৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম আমার ঘরটা ধোঁয়াতে ভরে গিয়েছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আলো জ্বালালাম; তারপরে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে খিল খুললাম। আগুনের শিখাগুলো লকলক করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। বুঝলাম ঘরে আগুন লেগেছে।

আমি তাড়াতাড়ি ওক কাঠের শক্ত দরজা বন্ধ করে দিলাম; কোন রকমে প্যাণ্টের ভেতরে পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে জানালা দিয়ে কুকুরটাকে নামিয়ে দিলাম নিচে; আমার পোশাক, ব্যাগ, বন্দুক ওপর থেকে দিলাম ফেলে; তারপরে একইভাবে আমি নিচে নেমে এলাম।

নিচে নেমে আমি প্রাণপণে চীৎকার করলাম : ক্যাভেলিয়ার, ক্যাভেলিয়ার।

কিন্তু বন রক্ষকের ঘুম ভাঙলো না; লোকটা একেবারে কুম্ভকর্ণের জেঠামশাই।

উঁকি দিয়ে দেখি নিচের ঘরগুলো একেবারে আগুনের চুল্লীতে পরিণত হয়েছে! আরও লক্ষ্য করলাম সেই সব ঘরে শুকনো ডালপালার গাদা সাজানো; তাতেই আগুনের সুবিধে হয়েছে বেশী।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেউ ইচ্ছে করেই এই ঘরে আগুন দিয়েছে।

আবার চীৎকার করলাম, এবারে বেশ রেগেই : ক্যাভেলিয়ার।

তারপরেই আমার মনে হল, হয়ত ধোঁয়ায় লোকটা দম বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। হঠাৎ একটা খেয়াল চাপলো মাথায়। বন্দুকের ভেতরে দুটো কার্টিজ পুরে আমি সোজাসুজি তার ঘরের জানালাকে তাক করে ছুঁড়লাম। জানালার ছ'টা কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে গেল। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো বৃদ্ধটির। সে ভয়ার্ত চেহারায় শোওয়ার পোশাকেই জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। ঘরের সামনে যে বিরাট আগুনের লেলিহান জিহ্বাগুলি লকলক করছিল তাতেই সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

আমি চীৎকার করে উঠলাম : তোমার ঘরে আগুন লেগেছে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড় তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ নিচের জানালা বেয়ে আগুনের শিখাগুলি ওপরের ঘরটিকে সদর্পে আক্রমণ করে দেওয়াল বেয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে-পড়বে করছে এমন সময় সে বেড়ালের মত ঝুপ করে নিচে লাফিয়ে পড়ল। তারই কিছুক্ষণ পরে গোটা বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না তার।

হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল : আগুন লাগলো কেমন করে?

আমি বললাম : কেউ রান্নাঘরে আগুন লাগিয়েছে।

কে এমন কাজ করল?—প্রশ্ন করল সে।

হঠাৎ একজনের কথাই মনে এল আমার, বললাম : মারিয়া, আবার কে?

বৃদ্ধেরও মনে ধরল কথাটা, বলল : হায় ভগবান। সেই জন্যেই সে আর ফিরে আসে নি?

হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি; চীৎকার করে বললাম : কিন্তু সিলেসতি। সিলেসতি!!

সে কোন উত্তর দিল না; কিন্তু আমার চোখের সামনেই ঘরটা বিরাট শব্দ করে ভেঙে পড়ে গেল। সেই বিরাট আগুনের চুল্লীতে বৃদ্ধাটির নিশ্চয় আর কিছু অবশিষ্ট নেই; থাকলেও তাকে হয়ত আর চেনা যাবে না।

একটি আর্তনাদও শুনি নি আমরা।

বাড়ি ছেড়ে আগুন তখন আস্তাবলের দিকে ছুটে চলেছে। সেখানে আমার ঘোড়া রয়েছে। তাকে খুলে দেওয়ার জন্যে ক্যাভেলিয়ার সেই দিকে ছুটলো। আস্তাবলের দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে একটি নরম দেহ তার দুটো পায়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল; দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লো ক্যাভেলিয়ার। জীবটি আর কেউ নয়; মারিয়া। সে এখন পালাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে ক্যাভেলিয়ার দাঁড়িয়ে উঠলো। সে ওই হতভাগাটার পেছনে ছুটতে চেয়েছিল; কিন্তু ছুটলো না। সে বুঝতে পেরেছিল ছুটে সেই অন্ধকারে তাকে ধরা যাবে না। হঠাৎ সে রাগে ফেটে পড়ল; তারপরেই সে এমন একটা কাজ করে বসলো যার নজির আমি কোথাও দেখি নি এবং তার মধ্যে আত্ম-

সংযমের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছিল না। তারই সামনে মাটির ওপরে আমার বন্দুকটা পড়ে ছিল। সেই বন্দুকটা সে কুড়িয়ে নিল; কাঁধের ওপরে বসালো এবং আমি বাধা দেওয়ার আগেই, বন্দুকটায় গুলি ভরা আছে কিনা তা না জেনেই সে ঘোড়াটা দিল টিপে।

বিন্দুকে একটা মাত্র টোটাই ছিল—যে দুটি আমি আগেই পুরেছিলাম তাদের মধ্যে একটি—টোটাটি ফাটলো; পলাতক আসামীর পিঠে ঢুকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিল তাকে। গোটা দেহ রক্তে ভরে উঠলো তার। সে মাটি আঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল; শিকারীকে আসতে দেখে মরণ-আঘাতে আহত শশক যেমন পালানোর চেষ্টা করে, সেও সেই রকম দুটো হাত আর দুটো পায়ের ওপরে ভর দিয়ে চেষ্টা করল পালাতে।

আমি দৌড়ে গেলাম তার কাছে। ছেলেটা তখন মর-মর। ঘরের আগুন নেভানোর আগেই তার জীবনের আলো নিভে গেল। মারা যাওয়ার সময় পর্যন্ত একটা কথাও বলে নি সে।

রাত্রির পোশাক পরে খালি পায়ে ক্যাভেলিয়ার চুপচাপ হতভম্ব হয়ে আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্রাম থেকে লোকজন হাজির হল; তারা আমার বন রক্ষকটিকে নিয়ে গেল। সে তখন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে।

* * *

বিচারের সাক্ষী হয়ে আমি আদালতে গেলাম। যা যা ঘটেছিল সেই সব ঘটনাগুলি যথাযথভাবেই বর্ণনা করলাম আমি। ক্যাভেলিয়ার ছাড়া পেল। কিন্তু সেইদিনই সেখান থেকে চলে গেল; অদৃশ্য হয়ে গেল তার পরে।

তারপর থেকে আর কোন দিনই তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার শিকার কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি।

ব্যারনেস

(The Baroness)

বন্ধু বয়স্ত্রে; বললেন, ওদিকে দেখার মত জিনিস রয়েছে কিছু; খুশি হবে দেখলে। আমার সঙ্গে এস।

প্যারিসের একটি বড় রাজপথ। তারই ওপরে সুন্দর একখানা বাড়ি। সেই বাড়িরই একতলায় তিনি আমাকে নিয়ে এলেন। আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন যে ভদ্রলোক তিনি একেবারে কেতাদুরস্ত। আচার-ব্যবহারে ত্রুটিহীন, ভদ্র। আমাদের তিনি এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে আর এক ঘরে

ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখাতে লাগলেন। দামও বলতে লাগলেন সেগুলির; তবে অনাগ্রহ করে। দশ, কুড়ি, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার ক্রাঁর মত বিরাট-বিরাট দামের সংখ্যাগুলি এত সুন্দর আর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর ঠোঁটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো যা শুনে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না যে এই বিশ্ব-ব্যবসায়ীটির ড্রয়ারে লক্ষ-লক্ষ ক্রাঁ চাবি-দেওয়া হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভদ্রলোকের নাম আগেই আমি শুনেছিলাম। অত্যন্ত চতুর, রসজ্ঞ, বুদ্ধিমান মানুষ; নানান রকম কেনা-বেচার দালালি করেন তিনি। প্যারিসের, এমন কি য়েরোপ এবং আমেরিকার পয়সাওয়ালা সৌখীন মানুষদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তাদের রুচির সঙ্গে পরিচয় ছিল তার; তারা কোন্ ধরনের জিনিস চায় তাও তিনি জানতেন। সেই জন্যে অনেক দূরের খদ্দেরদের সঙ্গেও তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে সংযোগ রাখতেন; সময় বিশেষে জরুরী তারবার্তাও পাঠাতেন কখনও-কখনও। বাজারে কোন নতুন জিনিস এলেই তিনি তাঁর সম্ভাব্য খদ্দেরদের তালিকা নিয়ে বসে যেতেন।

সবচেয়ে ভাল-ভাল বংশের ছেলে-মেয়েরাও সাময়িক অসুবিধা দূর করার জন্যে তাঁর দ্বারস্থ হোত; রেস খেলার জন্যে হয়ত কারও কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, কাউকে হয়ত কোন দেনা মেটাতে হবে, কেউ হয়ত কোন ছবি বিক্রী করতে চায়, কারও হয়ত জমি বা বাড়ি বিক্রী করা দরকার—এই জাতীয় সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে তাদের প্রায়ই তাঁর কাছে আসতে হোত। লাভের সুযোগ দেখতে গেলে কাউকেই দূরে সরিয়ে দিতেন না তিনি।

এই অদ্ভুত ব্যবসায়ীটির সঙ্গে আমার বন্ধুর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেশ আগ্রহ নিয়েই মানুষটির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। লম্বা, রোগাটে মাথায় টাক; অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন। তাঁর ভদ্র বক্রোক্তির নিজস্ব একটা সুন্দর ঢঙ ছিল, ছিল মানুষকে অভিভূত করার দক্ষতা; তারই ফলে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতো। কোন একটি জিনিস আঙুলের মধ্যে ধরে এমন নিবিড়ভাবে তার দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কলাবিদের মত নানান ভঙ্গিমায় সেটির ব্যাখ্যা করতেন ক্রেতাদের কাছে, কথা বলার সময় এমন নাটকীয়ভাবে হাত-পা নাড়াতেন যে তাতেই ক্রেতারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত; দামের কথা বাদ দিয়েও, সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটতো জিনিসটির। তাঁর হাতের ছোঁওয়া পেয়ে কোন জিনিস-ই আর আগের জিনিস থাকতো না। নতুন মূল্যায়নে কৌলীন্য অর্জন করতো।

আমার বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার সেই যীশুটি কোথায়? রেনেসাঁ যুগের সেই সুন্দর মূর্তিটি—গত বছর যে মূর্তিটা আমাকে দেখিয়েছিলেন—সেটি কোথায়?

লোকটি হেসে বললেন: সেটিকে আমি বিক্রী করে দিয়েছি; এই বিক্রী

করার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার রয়েছে। শুনবেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আপনারা ব্যারনেস স্থামোরীর নাম শুনেছেন আশা করি?

বললাম: শুনেছি বলতে পারেন; আবার শুনিনি-ও বলতে পারেন। আমি তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলাম; কিন্তু তিনি কী করেন তা আমি জানি।

সত্যি-সত্যিই তাঁকে আপনি চেনেন?

সত্যি।

বলুন তো কী জানেন? তাহলে বুঝতে পারব কোন জায়গায় আপনার ভুল হচ্ছে কিনা।

বললাম: নিশ্চয় বলব। মাদাম স্থামোরী একটি পার্থিব মহিলা। তাঁর স্বামীর পরিচয় কেউ না জানলেও, তাঁর যে একটি মেয়ে রয়েছে একথা আমরা জানি। যাই হোক, স্বামী বলতে কেউ যদি তাঁর না থেকেই থাকে—তাতেও কোন রকম অসুবিধে হয় নি তাঁর। প্রণয়ীদের সঙ্গে তিনি বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই মেলামেশা করেন; এবং যে-সমাজের মধ্যে তাঁর গতিবিধি সেই সমাজের মানুষেরা হয় তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে ক্ষমার চোখে দেখেন, অথবা, সেগুলির বিষয়ে তাঁরা অন্ধ।

নিয়মিতভাবেই যথারীতি তিনি গির্জায় যান; বেশ ভক্তিভরেই প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন, ভাল না লাগলে কোনদিনই সেই ভাল-না-লাগার সঙ্গে আপোষ করেন না তিনি। তাঁর মেয়ে যে সুপাত্রস্থা হবে সে-আশা তাঁর রয়েছে। ঠিক বলছি?

তিনি বললেন: ঠিক কথা। কিন্তু আপনার তথ্য সংগ্রহে যেটুকু ফাঁক রয়েছে সেটুকু আমি ভরিয়ে দিচ্ছি। মূলত, তিনি অপরের রক্ষিতা; কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তাঁর ওপরে তাঁর প্রণয়ীদের অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে—অঙ্কশায়িনী কোন নারীর ওপরে যে শ্রদ্ধা মানুষের থাকে তার চেয়েও অনেক বেশী। এই রকম একটা গুণ সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। আর যে-মহিলার এই বিশেষ গুণটি থাকে তিনি যা চান যে-কোন পুরুষের কাছ থেকেই স্বচ্ছন্দে তা আদায় করে নিতে পারেন। যাঁকে তিনি গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করে রাখেন সে তাঁর মনের কথা জানতেও পারে না। তাঁকে পাওয়ার জন্যে সে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে, তাঁকে যে সে পেতে চায় এটা তার কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়—সেই ঔদ্ধত্যের কথা ভেবে সে নিজের মনে কাঁপতে থাকে; তাঁকে অনুরোধ করে, আর নিজেকে অনুপযুক্ত ভেবে সেই অনুরোধের জন্যে লজ্জিত হয়, যখন তিনি আত্মসমর্পণ করেন তখন সে অবাক হয়ে যায়—শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মনপ্রাণ। তার দেওয়া অর্ঘ ভদ্রমহিলা এমন সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন যে সেই মানুষটি তাঁর জন্যে যে কিছু

খরচ করছে একথা তার মনেও স্থান পায় না। নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটিকে তিনি এতখানি নিবিড়, ঘনীভূত, সম্ভ্রান্ত এবং নির্ভুল ক'রে রাখেন যে তাঁর অঙ্ক থেকে উঠে আসার পরে কেউ যদি তার রক্ষিতার চরিত্রের ওপরে বিন্দু-মাত্র কটাক্ষপাত করার-ও চেষ্টা করে তা হলে সেই মানুষটি সেই অভিযোগকারী অথবা কারিণীকে খুন করতেও দ্বিধা করে না; আর এই কাজটা সে করে ঠিক করছি ভেবে।

'ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এই ভদ্রমহিলার সান্নিধ্যে আমি কয়েকবারই এসেছি; তাঁর জীবনের কোন কাহিনীই আমার কাছে তিনি গোপন করেন নি।

'যা বলছিলাম। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে তিনি আমার কাছে তিরিশ হাজার ফ্রাঁ ধার করতে এসেছিলেন। অবশ্য সে-ধার আমি তাকে দিই নি; কিন্তু তাঁকে আমি সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম; আর যাতে আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারি সেই জন্যে তিনি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছেন, অর্থাৎ, তাঁর এতগুলি ফ্রাঁর হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন তাই আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে জানতে চাইলাম।

'তিনি তাঁর অবস্থাটিকে এমন অদ্ভুত সংযম আর সুন্দর ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে বললেন যে মনে হবে তাঁর শিশু কন্যার প্রভুর ভোজে প্রথম অংশগ্রহণের কাহিনী তিনি বলে যাচ্ছেন। তাঁর কাহিনী শেষ হওয়ার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে সেই সময়টা তাঁকে বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে; এবং তিনি কপর্দকহীনা হয়ে পড়েছেন।

'বুঝলাম বাণিজ্য সংকট-ই এর জন্যে দায়ী। ইচ্ছে করে সরকার যে-সমস্ত রাজনৈতিক গোলমালের সৃষ্টি করেছে, যুদ্ধের গুজব ছড়াচ্ছে তার ফলে জন-জীবনে বিশৃঙ্খলা নেমে এসেছে, ব্যবসায় নেমেছে মন্দাভাব; ফলে টাকা পয়সার লেনদেনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; এমন কি প্রণয়ীর হাত দিয়েও টাকা বেরোতে দ্বিধা করছে। আর তা ছাড়া, তাঁর মত সম্মানিতা মহিলার পক্ষে যে-কোন নবাগতের কাছে আত্মসমর্পণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

'তিনি এমন একটি মানুষ চাইছিলেন, এমন একটি পার্থিব মানুষ, উন্নত সমাজের মানুষ যে তাঁর সামাজিক সম্ভ্রম আর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর দৈনন্দিন খাওয়া-পরার অভাব মেটাতে পারবে। মানুষের অর্থটাই তাঁর কাছে সব ছিল না; চরিত্রটাকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি জানতেন দুশ্চরিত্র অথবা বিপজ্জনক কোন মানুষের পাল্লায় পড়লে তাঁর মেয়েকে সুপাত্রস্থা করার পথে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দেবে। তাঁর এই সাময়িক অসুবিধা দূর করার জন্যে কোন দালালের সাহায্য নিতে তিনি রাজি নন।

'তা ছাড়া, তাঁর একটা বাড়ি রয়েছে; সেখানকার ঠাট বজায় রাখতে হবে তাঁকে; সেদিক থেকে এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না। এই ঠাট বজায় রাখতে হবে সেই সমস্ত বিত্ত এবং চিত্তশালী পুরুষ বন্ধুদের জন্যে যাদের জন্য

তিনি প্রতীক্ষা করছেন।

আমি তাঁকে জানালাম আমি যদি তাঁকে তিরিশ হাজার ফ্রাঁ ধার দিই সে টাকা আর আমি ফিরে পাব না; কারণ সেই অর্থ নিঃশেষ হওয়ার পরে তাঁকে আরও ষাট হাজার ফ্রাঁ সংগ্রহ করতে হবে। তবেই তিনি আমার ধার শোধ করতে পারবেন। সে আশা সুদূরপরাহত।

বেশ গভীর বেদনার সঙ্গেই তিনি আমার কথা শুনলেন। তাঁকে কী বলে যে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল—বুদ্ধিটা একেবারে আনকোরা নতুন। যে রেনেসাঁ যীশুর মূর্তিটিকে আপনাকে আমি দেখিয়েছিলাম, সেটি সেইমাত্র আমার দোকানে এসেছে। এমন সুন্দর মূর্তি আমি আর কোন দিন দেখি নি।

আমি তাঁকে বললাম: বন্ধু, আমি হাতির দাঁতের তৈরী এই মূর্তিটি আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে একটি গল্প তৈরী করতে হবে। যে কোন গল্প হলেই চলবে—আপনার খুশিমত। গল্পটির মধ্যে যেন বেশ মুন্সীয়ানা থাকে, চিত্তাকর্ষণের মাল মশলা থাকে; সেই কাহিনী শুনে লোকে যেন ব্যথা পায়। সেই রকম একটি কাহিনী সাজিয়ে আপনি বলবেন এই মূর্তিটির সঙ্গে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান। সেই জন্যে আপনি অবশ্য প্রচার করে দেবেন যে এটি আপনাদের বংশগত সম্পত্তি—বাবার উত্তরাধিকারিণী হিসাবে এটা আপনি পেয়েছেন।

যারা এই ধরনের জিনিস সংগ্রহ করে তাদের আমি আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব; প্রয়োজন মনে করলে নিজেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাকিটা আপনি করবেন। কাউকে পাঠালে বা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমি একদিন আগে জানিয়ে দেব। এই মূর্তিটির দাম পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। কিন্তু এটিকে আমি তিরিশ হাজারে ছেড়ে দিতে রাজি রয়েছি। বাকিটা আপনার কমিশন।

আমার প্রস্তাবটি তিনি অনেকক্ষণ বেশ গম্ভীরভাবেই ভেবে দেখলেন; তারপর বললেন: প্রস্তাবটা ভালই। ধন্যবাদ।

পরের দিনই মূর্তিটি তাঁর বাসাতে পৌঁছে দিলাম; এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় ব্যারণ ড্য সেন্ট হর্দপিট্যালকে পাঠালাম তাঁর বাড়িতে।

তিনটি মাস ধরে আমি তাঁর বাড়িতে মক্কেলের পর মক্কেল পাঠাতে লাগলাম; আমার সবচেয়ে ধনী এবং নির্ভরযোগ্য মক্কেল তাঁরা; তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা করে আমি সুখী হয়েছি। কিন্তু ব্যারনেস চুপচাপ।

তারপরে আমার দোকানে একদিন একটি বিদেশী এলেন। ফরাসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল একেবারে নিচু স্তরের। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে তাঁকে নিয়ে আমি ব্যারনেসের বাড়ি যাব ঠিক করলাম।

কালো পোশাক পরা একটি চাকর দরজা খুলে আমাদের সুন্দর একটি ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পরে ব্যারনেস হাজির

হলেন। তাঁকে দেখতে তখন খুব ভাল লাগছিল। আমার সঙ্গে করমর্দন করে বসার জন্যে অনুরোধ জানালেন আমাদের। আমাদের সেখানে যাওয়ার কারণ শুনে তিনি বেল বাজালেন।

চাকরটি উঁকি দিল।

তিনি বললেন: জেনে এস তো মিলি ইসাবেল আমাদের তার মন্দিরটা দেখতে দেবে কিনা।

উত্তর দিতে মিলি নিজেই নেমে এল। বছর পনের বয়স মেয়েটির; প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভরাট। পোশাকের দিকে এতটুকু বাহুল্য তার ছিল না।

ঘরটি মহিলাদের পবিত্র খাসমহল বলে মনে হল আমার। সেই ঘরে কালো ভেলভেটের বিছানায় যীশুখৃষ্ট—যীশু শুয়ে আছেন। তাঁর সামনে একটি রূপোর বাতিদানে আলো জ্বল্‌ছে। সমস্ত পারিপার্শ্বটিই বেশ সুন্দর আর চাতুর্যের সঙ্গে সাজানো।

বুকের ওপরে দুটি হাত এড়োএড়ি করে ক্রশের পদ্ধতিতে রেখে মেয়েটি আমাদের বলল: বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে না?

জিনিসটিকে হাতে তুলে পরীক্ষা করে অভিমত দিলাম: সত্যিই বড় অদ্ভুত। বিদেশীটিরও অভিমত আমারই মত; কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হল যীশুখৃষ্টের চেয়ে তাঁর কাছে আকর্ষণীয়া হচ্ছেন ওই দুটি মহিলা।

বসার ঘরে সকলে ফিরে আসার পরে আমি বেশ ভদ্রভাবেই দামের কথাটা তুললাম। ব্যারনেস-ও তাঁর চোখদুটি নিচু ক'রে বেশ ভদ্রভাবেই বললেন: পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ।

তারপরেই তিনি যোগ করলেন: মঁসিয়ে, আর একবার যদি এটিকে দেখতে ইচ্ছে যায় তাহলে আসবেন। তিনটের আগে আমি প্রায় বেরোই না, প্রতিদিনই আমি বাড়িতে থাকি।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পরে ব্যারনেসের সম্বন্ধে আরও কিছু বলার জন্যে বিদেশীটি আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ব্যারনেসকে দেখে তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তারপর থেকে ব্যারনেস বা বিদেশী —কারও সম্বন্ধেই কিছু আর জানতে পারি নি।

আরও তিন মাস এমনিভাবেই কেটে গেল।

সেদিন সকালে, পনের দিনও হয় নি এখনও—ব্রেকফাস্টের সময় ব্যারনেস এখানে এসে হাজির হলেন; আমার হাতে একটা পকেট বই তুলে দিয়ে বললেন: আপনি একেবারে দেবদূতের মত। আপনার জন্য আমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ-ই নিয়ে এসেছি। আপনার যীশুকে আমিই কিনে নিলাম—যে দাম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন তার চেয়ে কুড়ি হাজার বেশীই দিলাম; তবে শর্ত রইল একটি। আপনি আমাকে এই রকম মক্কেলের পর মক্কেল পাঠাবেন; কারণ যীশু আবার বিক্রীর জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে…আমার যীশু…

নেকড়ে
(The Wolf)

সেণ্ট হুবার্ট-এর সম্মানে যে ভোজের আসর বসেছিল সেখানেই বৃদ্ধ মার্কুইস দ্য অরভিল আমাদের গল্পটি বললেন। নিমন্ত্রিতের দল' সেদিন একটি হরিণ শিকার করেছিলেন। মার্কুইস-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেই শিকারে কোন অংশগ্রহণ করেন নি। কেবল সেদিন বলেই নয়; কোন দিনই তিনি শিকার করেন নি জীবনে।

ভোজের দীর্ঘ আসরে পশু হত্যা ছাড়া নিমন্ত্রিতেরা অন্য কোন গল্প করেন নি। এমন মহিলারাও সেই রক্তাক্ত এবং অনেক সময় অসম্ভাব্য কাহিনীতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন; এবং ভদ্রমহোদয়গণ পশু আর মানুষদের যুদ্ধে পরস্পরের অনুকরণ করেছিলেন হাত-পা আর দন্ত বিকশিত করে। মাঝে মাঝে বিরাট হট্টগোলে উদ্বেলিত হয়েছিল ভোজের আসর।

মঁসিয়ে অরভিল কথা বেশ ভালই বলেন; কথার মধ্যে কবিত্ব রয়েছে; জোরও কম নেই। কাহিনীটি বেশ স্বচ্ছ ভাষায় বলে গেলেন তিনি; কোথাও কোন বাধা পেলেন না। এই দেখেই মনে হয় এ-গল্পটা তিনি আরও অনেকবারই করেছেন।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কোন দিন শিকার করি নি; আমার পিতা, পিতামহ, এবং প্র-পিতামহ—তাঁরাও শিকার করেন নি কোন দিন। আমার প্র-পিতামহের বাবা এত শিকার করেছিলেন যে আপনারা সকলে মিলে অত শিকার করতে পারেন নি। সতের শ' চৌষট্টি সালে তিনি মারা যান। কী করে তিনি মারা গেলেন সেই কাহিনীই বলছি। তাঁর নাম ছিল জঁা; বিবাহিত ছিলেন। তাঁরই পুত্র হচ্ছেন আমার প্র-পিতামহ। লোরেনের গভীর বনে আমাদের একটি দুর্গ ছিল। সেখানেই তিনি তাঁর ছোট ভাই ফ্রাঙ্কয় দ্য অরভিলের সঙ্গে বাস করতেন।

শিকার-প্রেমিক হওয়ার ফলে ফ্রাঙ্কয় কোন দিন বিয়ে করার সময় পান নি। বছরের প্রথম থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত এক নাগাড়ে তাঁরা শিকার করে যেতেন, কোনদিন কোন ক্লান্তি অনুভব করেন নি। শিকারের কথা ছাড়া আর কিছু তাঁরা বলতে জানতেন না। একমাত্র শিকার করার জন্যেই তাঁরা বেঁচে ছিলেন। শিকারের নেশায় তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শিকার ছাড়া আর কিছুই জানতেন না তাঁরা। তাঁদের কড়া নির্দেশ ছিল শিকারের সময় কোন কারণেই কেউ যেন তাঁদের বিরক্ত না করে। আমার প্র-পিতামহের যখন জন্ম হল তখন তাঁর বাবা শেয়ালের পিছু-পিছু দৌড়চ্ছেন; ছেলের জন্ম-সংবাদ পেয়ে তিনি

বলেছিলেন শেয়াল মারা যাওয়া পর্যন্ত ছোঁড়াটা অপেক্ষা করতে পারত। তাঁর ভাই ফ্রাঙ্কয়-এর মাথাটা আরও গরম। ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে তিনি দেখতে যেতেন কুকুরগুলোকে, তারপরে ঘোড়াগুলিকে। তারপরে শিকার করতেন আশপাশের কিছু পাখি ; তারপরে তৈরী হতেন বড় শিকারের জন্যে।

চেহারার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন দশাসুর। বিরাট বপু, শক্ত, গোটা গায়ে লোম বোঝাই, দুর্দান্ত এবং শক্তিমান। ছোট ভাইটি আবার দাদার চেয়েও লম্বা। ও-অঞ্চলে একটা প্রবাদ ছিল, এবং সেই প্রবাদের জন্যে তিনি নিজেও বেশ গর্ব বোধ করতেন, যে তিনি যখন চীৎকার করতেন তখন বনের পাতারা সব ভয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে যেত। তাঁরা যখন ঘোড়ায় চেপে বেরোতেন তখন দেখতে তাঁদের চমৎকারই লাগতো। মনে হোত দুটি দানব ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাশাপাশি চলেছে। সতের শ চৌষট্টি সালের শীতের মাঝামাঝি সময় ; ঠাণ্ডা পড়েছিল প্রচণ্ড। নেকড়েগুলো হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর। রাতের অন্ধকারে একটু দেরী করে কোন চাষী ফিরে এলে তারা তাকে আক্রমণ করত ; রাত্রিতে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতো ; সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত চীৎকার করত, এবং নষ্ট করত মরাই।

শীগগীর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। ধূসর আর সাদায় মেশানো বিরাট একটা নেকড়ে দুটো বাচ্চাকে খেয়েছে, একটি মহিলার একটা হাত উদরস্থ করেছে, ওই অঞ্চলের সমস্ত প্রহরী কুকুরদের গলা টিপে মেরে ফেলেছে। এখন সে পরম নির্ভয়ে মনুষ্য বসতির কাছে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ঘরের দরজার বাইরে ছোঁক-ছোঁক করছে। অনেক বাসিন্দাই বলে বেড়ালো যে নেকড়ের নিঃশ্বাস তাদের গায়ে এসে পড়েছে ; সেই নিঃশ্বাসের ঝাপটায় বাতি নিবে যায়। দেখতে-দেখতে চারপাশে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। সন্ধ্যের পরে কেউ আর ঘরের বাইরে বেরোতে সাহস করত না। কোন ছায়া দেখলেই তাদের মনে হোত নেকড়েটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

দ্য অরভিল ভাই-এরা ঠিক করে ফেললেন এই শয়তানটাকে খুঁজে বার ক'রে হত্যা করবেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি বিরাট শিকারে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁরা পাশাপাশি সমস্ত ভদ্রমহোদয়দের আহ্বান জানালেন।

কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তারা সারা বনটাকে খেদালো, ঝোপ-ঝাড় চষে ফেলল ; কিন্তু নেকড়ের দেখা মিললো না। অনেক নেকড়ে মেরে ফেল-লেন তাঁরা ; কিন্তু আসলটাই হাওয়া। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, প্রতি রাত্রিতে পণ্ড যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরে খবর আসতো সেই জানোয়ারটা, যেন প্রতিহিংসা নেওয়ার বাসনাতেই, কোন পথচারীকে আক্রমণ করেছে, নয়ত কারও গরু-ছাগল উদরস্থ করেছে। যেখানে তাকে সবাই খুঁজে বেড়িয়েছে সেখান থেকে অনেকটা দূরে নির্বিবাদে সে ওই সমস্ত কুকাজ করে বেরিয়ে গিয়েছে। শেষকালে হতচ্ছাড়াটা করল কী জানেন ? দ্য অরভিলের

দুর্গের মধ্যে যে আস্তাবল ছিল ব্যাটা সেইখানে ঢুকে তাঁদের সবচেয়ে দুটি তেজী ঘোড়াকে খেয়ে ফেলল।

এই দেখে দুটি ভাই-ই ক্ষেপে লাল। এই রকম বীরত্বের একটা কাজ করে দৈত্যটা যেন প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের উপহাস করে গেল। এর পরে আর তাঁদের ধরে রাখা গেল না। ঝোপ-ঝাড় বা লুকানো জায়গা থেকে পশুদের বাইরে টেনে আনতে ওস্তাদ সবচেয়ে দক্ষ শিকারী কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে—রাগে গর-গর করতে করতে সেই জানোয়ারটার একটা হেস্তনেস্ত করার উদ্দেশ্যে দুটি ভাই একদিন সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা বন-অঞ্চল তাঁরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু কিছুই হল না। জানোয়ারটার বুদ্ধি আর দক্ষতা দেখে তারা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। ব্যর্থমনোরথ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধ এসে আক্রমণ করল তাঁদের। তাঁরা তখন সোজা রাস্তা পরিত্যাগ করে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে যে সব সরু-সরু রাস্তা গিয়েছে সেই দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। ঠিক এমনি একটা সময়ে একটা অদ্ভুত ভীতি তাঁদের আচ্ছন্ন করল।

বড় ভাইটি বললেন: জানোয়ারটা মোটেই সাধারণ জাতের নয়। মনে হচ্ছে, মানুষের মত চিন্তা করার ক্ষমতা তার রয়েছে।

ছোট ভাইটি বললেন: মনে হচ্ছে তাকে বুলেটবিদ্ধ করার জন্যে দাদা বিশপকে দিয়ে আমাদের বুলেটগুলিকে শুদ্ধ করিয়ে নিতে হবে; অথবা আমাদের সাহায্যের জন্যে কোন পাদরীকে নিয়ে স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপরে চুপ করে গেলেন তাঁরা।

জঁা বললেন: সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ। কী লাল দেখেছ? বিরাট নেকড়েটা আজ রাত্রিতে নিশ্চয় কারও ক্ষতি করে যাবে।

কথা বলা তাঁর শেষ হ'তে না হ'তেই, তাঁর ঘোড়াটা পিছু হটে এল; সেই একই সময় ফ্রাঙ্কয়-এর ঘোড়াটাও ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। মরা পাতায় ভরা একটা ঝোপ তাঁদের চোখের সামনেই ফাঁক হয়ে গেল; ধূসর-সাদায় মেশানো বিরাট একটা জানোয়ার লাফিয়ে বেরিয়ে এল সেই ঝোপ থেকে; তারপর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই বনের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা দেখে দুটি ভাই-ই আত্মপ্রসাদে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলেন; তারপর দুজনে দুটি হুংকার দিয়ে ঘোড়ার ঘাড়ের ওপরে ঝুঁকে বিপুল বেগে তাদের তাড়া করলেন; ঘোড়া দুটিও প্রায় নক্ষত্রের গতিতে সেই প্রায়ান্ধকার অরণ্যের মধ্যে ছুটতে সুরু করল। ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে, ডাল-পালা ভেঙে, মরা আর ঝরাপাতার স্তূপের ওপর দিয়ে, খানা-খোঁদল অগ্রাহ্য করে দুটি ভাই বিপুল উদ্যমে ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপত্তি ঘটে গেল। এই ঘাড়-গর্দান-ভাঙা দ্রুততালে দৌড়ানোর ফলে আমার পূর্বপুরুষ হঠাৎ একটা বিরাট ডালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তাঁর মাথার খুলিটি উড়িয়ে দিলেন। মরার মত মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি; আর তাঁর ঘোড়াটি সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই দেখেই ছোট ভাইটি থমকে দাঁড়ালেন; মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন; দাদার মাথাটা তুলে নিলেন হাতের ওপরে; দেখলেন, মাথার ঘিগুলি সব বেরিয়ে এসেছে খুলির ভেতর থেকে, রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে তাঁর দেহ। তিনি হাঁটু মুড়ে বসে দাদার রক্তাক্ত মৃত মুখটির দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে-ধীরে একটা আতংক তাঁর মনের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে এল—এ রকম ভয় তিনি আর কখনও পান নি; সেই ভীতি ছায়ার ভীতি, নিস্তব্ধতার ভীতি, নির্জন অরণ্যের ভীতি; সেই সঙ্গে সেই উদ্ভট নেকড়েটা তাঁর ভাইকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে তার ভীতি।

চাষারা সব ঘন হয়ে এল; গাছের ডালেরা সব কনকনে ঠাণ্ডায় কঁকাতে লাগলো। ফ্রাঙ্কয়-এর শরীরও কাঁপতে সুরু করল। আর সেখানে অপেক্ষা করার ক্ষমতা যেন রইল না; মনে হল, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিছুই আর শোনা যাচ্ছে না; না কুকুরের ডাক, না শিকারীদের শিঙার শব্দ। সেই অদৃশ্য দিগন্তের মধ্যে সবই যেন মূক হয়ে গিয়েছে। এবং সেই বিষণ্ণ স্তব্ধতা আর বরফ-শীতল সন্ধ্যায় একটা যেন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কিছু ওৎ পেতে বসে রয়েছে।

তাঁর সেই শক্ত হাতে তিনি জাঁর বিরাট দেহটি ধরে বাড়ি ফেরার জন্যে ঘোড়ার ওপরে এড়োএড়িভাবে শুইয়ে দিলেন। তারপরে ভারাক্রান্ত মনে নেশাগ্রস্ত মানুষের মত চারপাশের ভয়ঙ্কর ছায়ার ভেতর দিয়ে তিনি ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন।

হঠাৎ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বনপথের ওপর দিয়ে বিরাট একটি চেহারা পেরিয়ে গেল। এ সেই নেকড়ে। একটি ভয়ানক আতংক শিকারীর ওপরে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা চিটচিটে জলের মত একটা পদার্থ গড়িয়ে পড়ল তাঁর পিঠ থেকে। শয়তান তাড়া করলে পাদরী যেমন ভয়ার্ত চিত্তে ক্রশের চিহ্ন তাঁর বুকের ওপরে ধারণ করেন তিনিও তাই করলেন। তারপরে তার মৃত ভাইটির শায়িত শবের ওপরে তাঁর চোখ দুটি গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ভীতির প্রকোপ নষ্ট হয়ে গেল। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিল ক্রোধে; একটা উদগ্র ক্রোধে তিনি কাঁপতে লাগলেন।

ঘোড়ার পেছনে খোঁচা দিয়ে তীরের মত পশুটার পেছনে ছুটে গেলেন তিনি।

আবার সেই দৌড় সুরু। ঝোপ-ঝাড়, খানা-খোঁদল, ছোট-বড় টিলা, ডাল-পালা, আর অন্ধকার, আর তারই সঙ্গে একটি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা—এরই মধ্যে দিয়ে ছুটন্ত একটি সাদা বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে

দিলেন তিনি। তাঁর ঘোড়াটিও প্রভুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে-ছুটতে দুজনেই বনের বাইরে বেরিয়ে এসে একটা উপত্যকার দিকে ছুটলো। পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে। সেই আলোতে দেখা গেল উপত্যকাটা পাথরে বোঝাই ; বিরাট-বিরাট পাথরের চাঙড়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই পথে সামনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় ফলে নেকড়েটা ঘুরে দাঁড়ালো।

আনন্দের উত্তেজনায় আর প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় চীৎকার করে হুংকার ছাড়লেন ফ্রান্বয়। সেই চীৎকার বজ্রগর্জনের মত চারপাশে প্রতিধ্বনিত হল। ছোরা বাগিয়ে তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন নিচে।

সারা শরীরে রোম খাড়া করে দিয়ে পিঠটা ফুলিয়ে সেই জানোয়ারটা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। জ্বল-জ্বল করে জ্বলতে লাগলো তার দুটো চোখ। কিন্তু যুদ্ধে নামার আগে সেই শক্তিমান শিকারী তাঁর ভাই-এর রক্ত-মাখা শবটাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে পাথরের ওপরে খাড়া করে বসিয়ে দিলেন। পাথরের কয়েকটা চাঙড় তুলে নিয়ে ঠেকা দিলেন দেহটির পাশে—যেন গড়িয়ে না পড়ে যায় এই ভাবে ; তারপরে তাকে সম্বোধন করে বললেন : জাঁ, দেখ ; দেখ।

এই কথা বলেই তিনি সেই দৈত্যটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর শিরায়-শিরায় তখন বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ; তাই দিয়ে তিনি পাথর-ও গুঁড়িয়ে ফেলতে পারতেন। জানোয়ারটা তাকে কামড়াতে চেষ্টা করল, চেষ্টা করল তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়িগুলি সব বার করে ফেলতে। কিন্তু শিকারীটি কোন অস্ত্র না নিয়ে তার টুটিটা সজোরে চেপে ধরলেন। যতক্ষণ না জানোয়ারটার দম বন্ধ হয়ে হৃৎস্পন্দন একেবারে থেমে না গেল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর মুঠো ছাড়লেন না ; ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগলেন। তারপরে টুঁটিটা আরও জোরে চাপতে-চাপতে তিনি পাগলের মত অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়লেন ; বিকারগ্রস্ত মানুষের মত চীৎকার করে বললেন : জাঁ, দেখ, দেখ।'

সমস্ত প্রতিরোধ শেষ হয়ে গেল নেকড়েটার ; দেহটা তার নেতিয়ে পড়ল। জানোয়ারটা মরে গেল।

ফ্রান্বয় তার দেহটা দুহাতে তুলে তাঁর ভাই-এর মৃতদেহের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন : জাঁ, প্রিয় জাঁ, এই সেই শয়তান।

তারপরে ঘোড়ার ওপরে দুটি মৃতদেহকে তিনি পর-পর সাজিয়ে বাঁধলেন, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বাড়ির দিকে।

দুর্গে ফিরলেন ফ্রান্বয়, কাঁদতে-কাঁদতে, হাসতে-হাসতে ; চীৎকার করতে-করতে হাতপা ছুঁড়ে জানোয়ারটাকে কী ভাবে তিনি হত্যা করেছেন সেই কথা

সকলকে বলতে লাগলেন ; আর সেই সঙ্গে নিজের দাড়ি ছিঁড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন ভাই-এর মৃত্যুর কথা।

তারপরে যখন তিনি ওই দিনটির কথা কাউকে বলতেন—তখনই চোখের জলে ভিজে একটা কথাই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো: জানোয়ারটার সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করেছিলাম জঁা যদি তা দেখতো, তাহলে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, সে খুশি হয়েই মরতে পারতো।

থামলেন মার্কুইস। মিষ্টি সুরে একটি ভদ্রমহিলা বললেন: এই রকম ভাবপ্রবণতা থাকাটা সত্যিই বড় সুন্দর।

মডেল

(The Model)

ইত্রিরাত এর ছোট সহরটি অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বিস্তৃত। তার সাদা চূড়া, সাদা পাথরে বোঝাই রাজপথ, আর তারই একধারে নীল সমুদ্রকে নিয়ে মধ্য-জুলাই মাসের একটা দিনে সহরটি ঝিমোচ্ছিল। এই চন্দ্রাকৃতির দুই প্রান্তে দুটি বন্দর; ডান দিকে ছোট; বাঁ দিকে বড়। সমুদ্রের মধ্যে একটি বন্দর তার বামনের পা একটি বাড়িয়ে দিয়েছে, বিরাট পা বাড়িয়ে দিয়েছে বড় জাহাজ-ঘাটাটি।

বেলাভূমির ওপরে ঢেউ-এর পাশে বসে লোকে স্নানার্থী এবং স্নানে রত মানুষদের দেখছিল। ক্যাসিনোর ধারে অসংখ্য রঙিন ছাতার বাগানের ভেতরে আরও বেশী লোক বসেছিল; কেউ-কেউ আবার ঘুরেও বেড়াচ্ছিল। আর উপকূলের ধারে যে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষেরা যে যার ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছে—উঁচু শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে তারা একটু তফাতে থাকতে চায়।

প্রথিতযশা চিত্রকর যুবক জঁা সামার একটি ছোট গাড়ির পাশ দিয়ে বেশ বিষণ্ণ মনেই হাঁটছিলেন। সেই গাড়িটির ভেতরে ছিলেন একটি যুবতী, শুয়েই ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ওই চিত্রকরের স্ত্রী। চাকা লাগানো আরাম কেদারাটিকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসছিল একটা চাকর; আর সেই বিকলাঙ্গ যুবতীটি গাড়ির মধ্যে থেকে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেন নি তাঁরা; কেউ কারও দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান নি-ও পর্যন্ত।

যুবতীটি বললেন: এখানে একটু অপেক্ষা করি এস।

তাঁরা থামলেন। চাকর একটা ভাঁজকরা চেয়ার পেতে দিল। চিত্রকর বসলেন তার ওপরে।

সেই শান্ত চুপচাপ দম্পতির পাশ দিয়ে যারা চলাফেরা করছিল তারা তাঁদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে দেখছিল তাকিয়ে। তাঁদের নিয়ে অনেক গুজব প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। গুজব, পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, এবং করেছিলেন ভালবাসার জন্যে। একটু দূরে কাছি জড়ানোর একটি যন্ত্রের ওপরে বসে দুটি যুবক আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল।

না: একথা সত্যি নয়। আমি বলছি এ-সত্য হ'তে পারে না। জাঁ সামারকে আমি বেশ ভাল করেই জানি।

বেশ তাই যদি হবে, তাহলে তিনি ওই ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করলেন কেন, বিয়ের আগেই তো ভদ্রমহিলা পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন ; তাই নয় কি ?

ঠিক তাই। তিনি মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন···হ্যাঁ, বিয়েই করেছিলেন। যে জন্যে মানুষে বিয়ে করে···অর্থাৎ তিনি একটি মূর্খ ছিলেন।

কিন্তু তা ছাড়া ?

তা ছাড়া···তা ছাড়া আর কী হতে পারে বন্ধু ? তা ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষ একটি গর্দভ ; কারণ গর্দভ ছাড়া সে অন্য কিছু নয়। তবে একটা কথা আমাদের অস্বীকার করে লাভ নেই যে চিত্রশিল্পীরা চিরকালই অদ্ভুত ধরনের বিয়ে করে। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিয়ে করে হয় কোন মডেলকে, অথবা, বৃদ্ধা কোন রক্ষিতাকে ; অথবা, এক বা একাধিক কারণে নষ্ট হয়েছে এমন কোন মেয়েমানুষকে। ওরা এই ধরনের বিয়ে করে কেন ? ভগবান জানেন। আমার বরং মনে হয়, অকর্মন্য মডেলদের সমাজে যে সমস্ত পুরুষরা ঘুরে বেড়ায় এই জাতীয় মহিলাদের ওপর তাদের একটা দীর্ঘস্থায়ী অনীহা জন্মানো উচিত। কিন্তু তা জন্মায় না। সেই সব মেয়েদের মডেল হিসাবে ব্যবহার করে তারা ; তারপরে বিয়ে করে তাদের।

ওই যে এক জোড়া মানুষ বসে রয়েছেন ওঁদের ভাগ্য নিয়ে বিধাতাপুরুষ কী নির্মম খেলাই না খেলেছেন। ওই ক্ষুদে চেহারার মেয়েটি একটা হাসির নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন : অথবা, নাটকটি কি সত্যিই ভয়াবহ ? কে জানে ? এক কথায়, সব কিছু পাওয়ার জন্যে মহিলাটি সব কিছু পণ করেছিলেন। সেই চাহিদার মধ্যে কি কিছু ভেজাল ছিল তাঁর ? তিনি কি জাঁকে সত্যিই ভালবাসতেন ? কে বলবে ? মহিলাদের অসংখ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোন্‌টা তাদের হৃদয়জাত, আর কোন্‌টা তাদের মগজজাত, কোন্‌টা তাদের স্বতস্ফূর্ত আর কোন্‌টা তাদের পরিকল্পিত সে কথা কে জানে ? তাদের মানসিক সততার মূলে রয়েছে নিয়ত পরিবর্তনশীল একটা মানসিকতা। ভাবের উচ্ছ্বাসে তারা সব সময়েই মসগুল হয়ে থাকে, আর সেই উচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয় আবেগমুখরা, কেউ-কেউ পরের ক্ষতি করার জন্যে সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকে, কেউ প্রেমাস্পদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে,

কেউ যায় জাহান্নামে ; কেউ আবার উন্মত্ত প্রবৃত্তির ঝাপটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে। তারা ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যায় ; মিথ্যে কথা বলব বলে যে বলে তা নয়, মিথ্যে কথা যে তারা বলছে অনেক সময় সে-জ্ঞান-ও তাদের থাকে না ; প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েও, নির্ভেজাল প্রেমের আলোতে তাদের মন-প্রাণ-সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেও, আত্মতৃপ্তির জন্যে, অথবা অতৃপ্তির আকাঙ্খায় তারা কী যে করে, আর কী করে না, তা আমরা ভেবে পাই নে ; তাদের হৃদয়ের গভীরতা মাপতে গিয়ে আমাদের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যর্থ হয়ে যায়, সেই জন্যে তাদের আমরা বুঝতে পারি নে ; সেই জন্যেই তারা আমাদের কাছে প্রহেলিকার মত। তাই আমাদের অবাক হয়েই ভাবতে হয় : সত্যিই কি ওদের চিন্তাধারা নিখাদ ; নাকি, মিথ্যার খাদে ভরাট।

সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ওঁরা দুজনেই ভেজাল আর সেই সঙ্গে নির্ভেজাল—দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়ে ভরপুর। সবচেয়ে যাদের আমরা খাঁটি বলি সেই সব মহিলাদের কর্মপদ্ধতির কথা একবার ভেবে দেখ ; তারা যা পেতে চায় আমাদের কাছ থেকে কী ভাবে তারা তা আদায় করে নেয় সেটাও ভাববার কথা। সেই প্রক্রিয়াগুলি এতই জটিল যে আগে থাকতে তা আমরা বুঝতে পারি নে ; এতই সহজ যে তাদের কবলে পরে কেমন যেন অবাক হয়ে যাই আমরা। কিন্তু তারা সব সময়েই সফলতা অর্জন করে বন্ধু ! বিশেষ করে কাউকে যদি তারা বিয়ে করবে ব'লে মনস্থ করে বসে তাহলে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

যাই হোক সামার-এর গল্পটা শোন।

অবশ্য ওই মহিলাটি ছিলেন ওঁর মডেল। ওঁর কাছে বসে থাকতেন তিনি ; আর তাঁকে দেখে সামার ছবি আঁকতেন। চেহারা আর লাবণ্যের দিক থেকে মহিলাটি ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরী, স্বর্গীয়াও. বলতে পার। সামার তাঁর প্রেমে পড়লেন ; একটি খুপসুরৎ যুবতী যদি সব সময় তোমার পাশে বসে থাকে তাহলে তুমি প্রেমে না পড়ে করবে কী ? তিনি ভাবতে লাগলেন মেয়েটিকে তিনি সত্যি-সত্যিই ভালবাসেন। ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে একান্ত করে পেতে চায় তখন সে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে বাকি জীবনে তাকে নিয়ে সে কোন দিনই ক্লান্ত হবে না। সে জানে যে এরকম ঘটনা তার জীবনে আগেও ঘটেছে ; পাওয়ার পরেই দেখা দিয়েছে তিক্ততা, আর একজনের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটানো যায় কেমন করে ? ভোগে নয়, দেহের পাশবিক ক্ষুধা মিটিয়ে নয় ; দুজনে একসঙ্গে কাটাতে পারে তখনই যখন মনের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, সাধনার দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া জন্মায়। পুরুষের জানা উচিত যে মোহতে সে আচ্ছন্ন হয়েছে সেটি দেহজ, না, আত্মিক। যাই হোক, সামার-ও তাই করেছিলেন। মেয়েটিকে আশা দিয়ে ভালবাসা জানিয়ে

নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মেয়েটিও সত্যিকারের সুন্দরী ছিল। সামারের বাড়িতে এসে সে সব সময় ছটফট করে বেড়াতো, পাখির মত কিচির-মিচির করত; আলতু-ফালতু কথা বলত; কথা বলার ধরনে মিষ্টি লাগতো সে-সব কথা। তার চলা-ফেরা হাব-ভাব আদব-কায়দা চিত্রকরের মনে অভূতপূর্ব একটা আনন্দের সৃষ্টি করত। উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

তিন মাস এইভাবে কেটে গেল। জাঁ এর ভেতরে কোন দিনই বুঝতে পারেন নি যে মূলত সে অন্যান্য মডেলদের মতই।

একদিন সন্ধ্যায় আমি তাঁদের বাসায় গিয়েছিলাম। সেই দিনই আমার বন্ধুর মনে প্রথম সন্দেহ জাগে। চাঁদের আলোতে রাত্রির বুকে রূপালি জোয়ার নেমে এসেছিল। আমরা নদীর ধারে বেড়াতে লাগলাম। এই অদ্ভুত সুন্দর রাতে অনেক কিছুই অসম্ভব কাজ করা যেত; কিছুই করলাম না আমরা। মুগ্ধ হয়ে, চুপ করে সেই আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। সেই বিশ্বব্যাপী শান্ত, সুন্দর, মুখর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম নিজেদের।

হঠাৎ যোশেপিন [মেয়েটির নাম] চীৎকার করে উঠলো: দেখ, দেখ, কি বিরাট মাছ লাফালো।

সামার কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে, বা সেই দিকে না তাকিয়েই বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।

বিরক্ত হল মেয়েটি; বলল: না, না, তুমি দেখ নি, কারণ, এদিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি।

তিনি হেসে বললেন: ঠিক কথা। আজকের রাতটা এত সুন্দর যে অন্য কোন কথাই আমি ভাবতে পারছি নে।

চুপ করে গেলো যোশেপিন; একটু পরেই আবার তার কথা বলার ইচ্ছে হল; সে জিজ্ঞাসা করল: কাল কি আমরা প্যারিসে যাচ্ছি?

তিনি ইচ্ছে করেই বললেন: জানি নে।

আবার চটে উঠলো যোশেপিন; বলল: তুমি কি মনে কর এই রকম করে চুপচাপ কথা না ব'লে হাঁটাটা খুব আনন্দের? মূর্খ, নির্বোধ ছাড়া মানুষ সব সময়েই কথা বলে।

সামার কোন মন্তব্য করলেন না। তারপরে, মহিলাদের বিকৃত রুচিবোধকে নমস্কার, তিনি ক্ষেপে যাবেন এটা জেনেই, যোশেপিন গত দু'বছর ধরে যে গানটা শুনে-শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে সেই গানটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গাইতে লাগলো।

মৃদু স্বরে বললেন সামার: চুপ কর।

তুমি এমন একটি সুন্দর ছবিকে নষ্ট করে দিচ্ছ।

তারপর সেই পুরাতন নাটকের সুরু হল—যে নাটক নারীরা চিরকালই করে আসছে।—সেই কান্নাকাটি, সেই অভিযোগ, অপমানজনক উক্তি—

তারপরে চোখের জল—কোনটাই বাদ গেল না। তারপরে একসময় তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। যোশেপিন আগেই দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো; তিনি ঢুকলেন পরে, সন্ধ্যার আনন্দে মুগ্ধ হয়ে, আর যোশেপিনের উন্মত্ত অভিযোগে ব্যথিত হয়ে তিনি ধীরে-ধীরে ফিরলেন।

পরের তিনটি মাস দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে কাটলো তাদের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলহ, অসন্তোষ, ঝগড়া, গালাগালি—এসব তো ছিলই; সেই সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণাও ছিল। শেষকালে সামার ঠিক করে ফেললেন—যথেষ্ট হয়েছে; আর না। এবার ছাড়াছাড়ির পালা; তিনি তাঁর ক্যানভাসগুলি বিক্রী করে দিলেন, বন্ধুর কাছ থেকে ধার করলেন কিছু অর্থ, নামকরা চিত্রকর না হলেও, প্রায় কুড়ি হাজার ফ্রাঁ সংগ্রহ করলেন; তারপরে সেগুলি চিমনির ওপরে রেখে একদিন সকালে তিনি বাসা ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্গে রেখে গেলেন একখানি চিঠি।

আমার বাড়িতে এসে উঠলেন তিনি। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরের কলিং বেল বেজে উঠলো; দরজা খুলে দিলাম আমি। একটি মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে এল; আমাকে ঠেলে স্টুডিয়োর মধ্যে চলে গেল সোজা। আগন্তুকটি সেই মহিলা।

যোশেপিনকে দেখেই আমার বন্ধুটি উঠে দাঁড়ালেন। একটা সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে সে খামটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল: এ টাকা তোমার। আমি ও চাই নে।

উত্তেজনায় কাঁপছিল মেয়েটি; যেন যে-কোন মূর্খের কাজ করতেই সে পিছপা-ও হবে না। আর বন্ধুটির অবস্থাও তাই। তিনিও তখন উত্তেজনায় কাঁপছেন। বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর মুখের রঙ; যে-কোন সংঘর্ষের জন্যে তিনিও প্রস্তুত।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী চাও?

সে বলল: আমি বারবণিতা নই; আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করা চলবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে। সেই জন্যেই আমি তোমার বাড়িতে এসেছি। তোমার কাছে আমি কিছু চাই নি। আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও।

আমার বন্ধুটি মাটির ওপরে পা ঠুকে বললেন: না, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি মনে কর···

বাধা দিলাম আমি; তার একটা হাত চেপে বললাম: শান্ত হও জাঁ। ব্যাপারটা ছেড়ে দাও আমার হাতে।

ধীরে-ধীরে ভদ্রভাবে মেয়েটির কাছে আমি এগিয়ে গেলাম; বোঝাবার চেষ্টা করলাম তাকে; সামনের দিকে তাকিয়ে গোঁয়ারের মত মুখ করে সে আমার কথাগুলো শুনলো। অবশেষে সমস্যার আপাত কোন সমাধান দেখতে

না পেয়ে, এবং ঘটনাটা খারাপের দিকে গড়িয়ে যেতে পারে এই ভেবে আমি ইচ্ছে করেই কথাটা বললাম: আপনাকে ও এখনও ভালবাসে। কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা চান ও বিয়ে করুক। বুঝতেই পারছেন···

সুরু করল মেয়েটি: ও, তাই বল, তাই বল...তাহলে বুঝবো...

বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি: তাহলে, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ?

বন্ধুটি বললেন: যাচ্ছি।

মেয়েটি এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল: তুমি বিয়ে করলে আমি আত্মহত্যা করব—বুঝেছ?

বেশ তো; আত্মহত্যা কর।

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়েটি। একটা অভাবনীয় দুঃখবোধ তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল; দু'তিন বারের চেষ্টায় সে বিড়-বিড় করে বলল: কী বললে····কি বললে··· আর একবার বল····

বন্ধুটি পুনরুক্তি করলেন: ঠিক আছে। আত্মহত্যাই কর; তাতে যদি তোমার আনন্দ হয়···

হঠাৎ তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। বলল: আমাকে খেপিয়ো না! এই জানালা দিয়ে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়বো আমি।

বন্ধুটি হো-হো করে হেসে উঠলেন; তারপরে জানালার ধারে গিয়ে দুটো পাল্লাই খুলে দিলেন তার; তারপরে অভ্যর্থনা করার ভঙ্গিতে মাথাটা কিঞ্চিৎ অবনত করে তিনি বললেন: দরজা খোলা রয়েছে। ঝাঁপ দাও।

এক মুহূর্তের জন্যে মেয়েটি বিকৃত দৃষ্টি দিয়ে ভীতি বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপরে গ্রামের পথে কোন একটা বেড়ার ওপরে লাফ দিচ্ছে এইভাবে ছোট একটা লাফ দিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল সে, রেলিং পেরোল, তারপরে অদৃশ্য হয়ে গেল...

মেয়েটি জানালার ভেতর থেকে লাফ দেওয়ার পরে আমার মনের যে কী অবস্থা হল তা আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না। মনে হল, এই জানালা যেন আকাশের মত,বিস্তৃত; আর মহাশূন্যের মত ফাঁকা।

হতভম্ব হয়ে নড়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও লোপ পেয়ে গেল আমার।

রাস্তার মানুষেরা সেই হতভাগ্য মেয়েটিকে কুড়োল; তখন তার দুটি পা-ই ভেঙে গিয়েছে। আর কোনদিনই সে হাঁটতে পারবে না।

আর তার প্রণয়ী? দুঃখ আর অনুশোচনায় মর্মাহত হয়ে বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করলেন; এই ব্যাপারে কৃতজ্ঞতার কথাটাও একেবারে নাকোচ করে দিতে পারি নে।

সন্ধ্যা এগিয়ে এল। যুবতীটির ঠাণ্ডা লাগছিল; সে বাড়ি ফিরে যেতে চাইলো। চলতে সুরু করল চাকা দেওয়া চেয়ারটি। চিত্রকরও তার পাশে চলতে লাগলেন: একঘণ্টার মধ্যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা কথাও বলেন নি।

রজার দাওয়াই

(Roger's Method)

রজারের সঙ্গে একদিন আমি বেড়াচ্ছিলাম; এমন সময় একটি হকার কানের কাছে চীৎকার করে উঠলো; শাশুড়ীদের বিদায় করার নতুন রীতি বেরিয়েছে মশাইরা, একখানা কপি কিনুন।

দাঁড়িয়ে পড়ে আমার সঙ্গীটিকে বললাম: হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। তোমার স্ত্রী যে প্রায় 'রজার-দাওয়াই'-এর কথা বলেন বস্তু হিসাবে সেটা কী? এমন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসিমুখে তিনি কথাটা উচ্চারণ করেন যে আমার মনে ওটি একটি প্রেমের সাঙ্কেতিক চিহ্ন; যার সমাধানের চাবিকাঠিটি তোমার হাতে রয়েছে। যখনই কেউ ক্লান্ত হয়ে শক্তিক্ষয় করেছে তখনই ভদ্রমহিলা তোমার দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে উপদেশ দেওয়ার ছলে বলেছেন: রজার-দাওয়াই-এর কথাটা তোমার ওদের বলে দেওয়া উচিৎ। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই কথা শুনে তুমি সব সময়েই লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছ।

রজার বলল: কারণ তার অবশ্যই একটা রয়েছে। আসল গল্পটা আমার স্ত্রী যদি জানতো তাহলে এই রকম কথা বলার চেষ্টাটা সে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিত। তোমাকে গল্পটা আমি বলব; কিন্তু অত্যন্ত গোপনে। দেখ, যেন ফাঁস না হয়।

তুমি জান একটি বিধবাকে আমি ভালবাসতাম; আর তাকেই আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী চিরকালই কথা বলতে বড় ভালবাসে; এবং বিয়ের আগে আমরা দুজনে রঙদার কথায় বেশ মসগুল হয়ে থাকতাম। অবশ্য, বিধবাদের সঙ্গে ওই ধরনের গল্প করা সম্ভব। বুঝতেই পারছ, এই ধরনের গল্পের স্বাদ তাদের মুখে লেগে রয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে যে সমস্ত রসের কথা বলা হয় সেই সব কথার ওপরে তার আকর্ষণটা বড় বেশী। নিছক খারাপ কথা বলার জন্যে কারও ক্ষতি হয় না। সেই জন্যেই বোধ হয় সে বুক ফুলিয়ে খারাপ কথাগুলো বলে যায়। আর সেই কথা শুনে আমি লজ্জা পাই। বিয়ের আগে এমন সব ঠাট্টা আর প্রশ্ন করে সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো যেগুলির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তার এই বাচালতার জন্যেই আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। আর ভালবাসার কথা যদি বল তাহলে একথা সত্যি যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমি তাকে ভালবাসি, আর ওই ক্ষুদে চেহারার মেয়েমানুষটি তা বেশ ভাল করেই জানে।

আমরা ঠিক করলাম বিয়েতে আমাদের কোন রকম হইচই হবে না; 'হনিমুন'ও হবে না আমাদের। ঠিক হল, বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পরে সাক্ষীরা আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন; তারপরে আমরা হাওয়া খেতে বেরিয়ে যাব; রাত্রিতে ফিরে আসব আমার বাড়িতে; ডিনার খাব। সেইমত সাক্ষীরা বিদায় নিলেন; আমরাও বেরিয়ে পড়লাম যথারীতি; সহিসকে বললাম—আমাদের বয় ভ বোলন-এ নিয়ে চল। সময়টা হচ্ছে জুনের শেষ—প্রকৃতির বুকে রঙের মেলা বসেছে যেন।

আমরা দুজনে একান্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে হাসতে সুরু করে দিল, বলল: প্রিয় রজার, তোমার বীরত্ব দেখানোর সময় এসেছে এবার। পরীক্ষা দাও তোমার দক্ষতার।

এই আমন্ত্রণ আমাকে একেবারে স্থবির করে দিল। আমি তার হাতে চুমু খেলাম; বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি; এমন কি তার ঘাড়ের পেছনে দু' দুবার সাহস করে চুমু দিলাম; কিন্তু পথযাত্রীদের দেখে আমার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। আর সে রসিকতা করে বারবার আমাকে তাতাতে লাগলো: তারপর? তারপর ··

এই 'তারপর' শব্দটা আমার সমস্ত কর্মশক্তি নিঃশেষে পান করে ফেলল। যাই হোক, খোলা রাস্তায়, গাড়ির ভেতরে, পার্কে, ময়দানে, দিনের বেলায় কি ওই সব··· যাক গে, আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ।

আমার এই অস্বস্তি দেখে তার খুব মজা লাগলো; মাঝে-মাঝে সে রসিকতা করে বলতে লাগলো—ভয় হচ্ছে, কোন নপুংসককে বিয়ে করলাম নাতো? তোমার জন্যে আমার বড় অস্বস্তি লাগছে।

নিজের সম্বন্ধেও আমি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। কেউ আমাকে ভয় দেখালে আমার ধাত ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা দাঁড়াতো। অকর্মন্য হয়ে পড়তাম আমি।

ডিনারের সময় খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। সাহস সঞ্চয় করার জন্যে চাকরটাকে আমি সরিয়ে দিলাম। তার সামনে কিছু করাটা আমার কাছে বড় অস্বস্তিকর লাগছিল। অবশ্য আমরা দুজনেই সেদিক থেকে অত্যন্ত সংযমী; অর্থাৎ এতটুকু অশ্লীল নয়; তবু প্রেমে পড়লে নারী আর পুরুষের মাথার স্ক্রুগুলো কিছুটা ঢিলে তো হয়ই। একই গ্লাস থেকে মদ খেলাম আমরা, খাবার একই প্লেট থেকে তুলে; একই কাঁটায় করে খাবার তুললাম মুখে। একটা বিস্কুটের দুটি প্রান্ত দুজনে দাঁতে চিপে ধরে বেশ খানিকটা মজাও করলাম আমরা।

সে বলল: আমি একটু স্যাম্পেন খাব।

বোতলটা পাশেই পড়েছিল; সেটাকে হাতে নিয়ে ছিপিটা দিলাম টিপে; সেটার কথা ছিল লাফিয়ে ওঠার। কিন্তু সেটা লাফালো না। এই দেখে গ্যাব্রিয়েল হাসতে-হাসতে বলল: অশুভ লক্ষণ দেখছি।

কত রকমে খোলার চেষ্টা করলাম বোতলটা কিন্তু কিছুতেই তা খুলল না ; বেশী চাপাচাপি করার ফলে মাঝখান থেকে ভেঙে গেল ছিপিটা।

গ্যাব্রিয়েল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : হায় রজার !

ছিপি খোলার একটা যন্ত্র নিয়ে কত কসরতই না দেখালাম ; কিন্তু ছিপির টুকরোগুলো কিছুতেই বার করতে পারলাম না। চাকরটাকে ডাকতে হল তখন। আমার স্ত্রী তো হেসেই অস্থির। হাসতে-হাসতে সে বলল : মনে হচ্ছে তোমার ওপরে আমি নির্ভর করতে পারবো।

বুঝতে পারলাম মাথাটা তার টলছে। কফির পাত্র টেনে নেওয়ার সময় মনে হল আর একটু টলছে তার মাথাটা।

অবিবাহিতা যুবতীদের যেমন গায়ে হাত বুলিয়ে মাতৃস্নেহে বিছানায় শোওয়ার জন্যে টানা হেঁচড়া করতে হয়, বিধবাদের ক্ষেত্রে সে সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না। গ্যাব্রিয়েলও শান্তভাবেই ঘরে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল : সিগারেট খাওয়ার জন্যে পনের মিনিট তোমার ছুটি।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই কিন্তু, মিথ্যে বলে লাভ নেই, আমি আমার আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেললাম। মোটেই অস্বীকার করছি না যে আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার আইনসঙ্গত স্থানটি অধিকার করলাম। সে কোন কথা বলল না। ঠোঁটের ওপরে হাসির আভাটি ফুটিয়ে সে আমার দিকে তাকালো মাত্র ; হয়ত বিদ্রূপ করার জন্যেই। এই রকম সময়ে বিদ্রূপ একেবারে মারাত্মক অস্ত্র। স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমি কেমন যেন অসহায়-অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমাকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে দেখেও তা থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে সে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করল না বরং আমাকে ঠাট্টা করে পরম উদাসীনতার সঙ্গে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : তুমি কি চিরকাল এই রকমই জীবন্ত ?

আমি না বলে পারলাম না : চোপ। তুমি অসহ্য।

তবু সে হাসতে লাগলো—খিলখিল করে—গিলগিল করে হাসতে-হাসতে গড়াতে লাগলো বিছানার ওপরে। কিছুতেই থামানো যায় না তাকে ; সে হাসি প্রাণঘাতিনী।

সত্যি কথা, নিজেকে সেদিন আমি বিরাট একটা মূর্খে পরিণত করে-ছিলাম। সেদিনের পরীক্ষায় আমি সম্মানজনকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

মাঝে-মাঝে হাসির ঝোঁক কমে এলে সে হাসতে-হাসতে বলল : চলে এস, এগিয়ে এস ; ভয় কী ? সাহস সংগ্রহ কর ইত্যাদি।

তারপরেই সে এতটা জোরে হাসতে সুরু করল যে মনে হল সে চীৎকার করে কাঁদছে।

অবশেষে আমি এতটা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত আর সেই সঙ্গে রেগে উঠলাম যে মনে হল হয় ঘুষি মেরে ওর নাকটা থ্যাবড়া করে দিই ; আর তা করা সম্ভব না

হলে, কেটে পড়ি।

বিছানা থেকে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। বেশ মেজাজ নিয়ে তাড়াতাড়ি পোশাক গায়ের ওপরে চড়িয়ে দিলাম। একটা কথাও বললাম না তাকে।

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল; আমি রেগে গিয়েছি দেখে সে জিজ্ঞাসা করল: করছ কী? যাচ্ছ কোথায়?

কোন উত্তর না দিয়ে সোজা আমি রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে কিছুটা সময় আমি বাইরে কাটিয়ে আসতে চাই—কিছুটা পাগলামি করারও ইচ্ছে হল আমার। খুব দ্রুতপদে আমি এগোতে লাগলাম; হঠাৎ মনে হল, একটা মেয়েমানুষ পেলে কেমন হয়? কে বলতে পারে? এরই ভেতর দিয়ে আমার পরীক্ষা হবে হয়ত, অভিজ্ঞতাটাও বাড়বে—এবং সম্ভবত ব্যবহার প্রণালীটাও....যাই হোক, উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে তাকে। আর কোনদিন যদি আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রতারণা করে, তাহলে সেই প্রতারণাটা স্বামী হিসাবে আমারই তার সঙ্গে আগে করা উচিৎ।

দ্বিধা করলাম না আমি। আমি একটি মেয়েকে জানতাম। আমার বাড়ি থেকে তার বাড়িটা বেশী দূরে নয়। আমি দৌড়ে গেলাম সেখানে। সাঁতারটা ভুলে গিয়েছি কি না জানার জন্যে মানুষ যেমন জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিও সেই রকম অথৈ জলে লাফ দিলাম—শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্যে যে আমিও পুরুষ মানুষ।

দেখা গেল তখনও আমি সাঁতার কাটতে পারি; কাটলামও ভাল সাঁতার। আবার সেই গোপন আর সূক্ষ্ম প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেদিন আমি অনেকক্ষণ সেই বাড়িতে আনন্দও করেছিলাম। তারপরে রাস্তায় ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে পড়ার পরে আমি বেরিয়ে এলাম তার ঘর থেকে। আমার তখন মানসিক উত্তেজনা কমেছে, শক্তি ফিরে এসেছে শরীরে; প্রয়োজনবোধে তখনও আমি বীরত্বের কাজ করার ক্ষমতা রাখি।

ধীরে-ধীরে ঘরে গিয়ে কপাট খুললাম আমি। বালিশের ওপরে কনুই-এর ভর দিয়ে গ্যাব্রিয়েল তখন পড়ছিল। সে মাথা তুলে বেশ ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করল: এসেছ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কোন উত্তর দিলাম না আমি। গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমি পোশাক খুললাম; যেখান থেকে পরাজিতের মত আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম সেই বিছানায় আমি বিজয়ী বীরের মত উঠে গেলাম।

সে অবাক হয়ে গেল; আমার শক্তি অর্জনের পেছনে যে একটা গোপন রহস্য রয়েছে সে সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য ঘটনাটা ঘটেছিল বছর দশেক আগে, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখন আর সম্ভব নয়, অন্তত আমার পক্ষে। তবে তোমার কোন বন্ধুর যদি বিয়ের

রাত্রিতে স্নায়ুবৈকল্য ঘটে তাহলে তাকে আমার পথটি বাৎলে দিয়ো। সেই সঙ্গে তাদের বলে দিয়ো যে পঁচিশ থেকে পঁয়তিরিশ বছর পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

একটি বিবাহবিচ্ছেদ

[A Divorce Case]

মাদাম ক্যাসেল-এর উকিল তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন : ধর্মাবতার, এবং জুরিদের সভ্যবৃন্দ, যে-মামলার পক্ষে আমাকে আজ আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে সেই মামলার সমাধান করার জন্যে ন্যায় ও নীতির বিচার অনুপযুক্ত। আসামীকে একমাত্র বাজারের ওষুধ খাওয়াতে পারলেই তার অসুখ সেরে যাবে। মনস্তত্ত্বের চেয়ে তাদের কাছে শরীরতত্ত্বটাই বড় বেশী প্রয়োজনীয়। প্রথম দৃষ্টিতে ঘটনাগুলি সবই সহজ বলে মনে হবে আপনাদের।

বয়সে যুবক ; উদার হৃদয় ; প্রচুর অর্থশালী ; এবং উচ্ছ্বাসময়, সেই সঙ্গে মনটা তাঁর ছিল বেশ উঁচু মানের। এই রকম একটি যুবক প্রেমে পড়লেন যে যুবতীটির সঙ্গে তিনি-ও রূপে যেমন গরীয়সী, গুণে তেমনি মহীয়সী। দেহের অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে মনের লাবণি মিশে তাঁকে এক অপরূপাতে পরিণত করেছিল। সেই মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করলেন। কিছুদিন তিনি প্রেমিক মোহগ্রস্ত স্বামীর মতই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন ; তারপরে তিনি তাঁকে অগ্রাহ্য করতে সুরু করলেন, কড়া-কড়া কথা বললেন, তাঁর প্রতিটি চলাফেরায় খুঁৎ ধরতে লাগলেন। তাঁর ওপরে যুবকটির একটা দুর্নিবার বিতৃষ্ণা জেগে উঠলো, একটা অজেয় ভাল-না-লাগার ভাবটা গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। একদিন তিনি তাঁকে প্রহার-ও করে ফেললেন। এই রকম কুৎসিত ব্যবহার করার তাঁর যে কেবল অধিকারই ছিল না তা নয় ; সত্যিকার কোন কারণ-ও ঘটে নি তাঁর।

তাঁর এই অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য ব্যবহার কতটা বিকৃত ছিল তার প্রকৃতি বিশদভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি না। এই দুটি প্রাণীর দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদাক্ত, অনির্বচনীয় দুঃখ এবং সেই যুবতীটির অপরিমেয় ক্ষোভের বিস্তারিত বিবরণ-ও আমি এখানে পেশ করতে চাই না। অবস্থাটা বোঝানোর জন্যে সেই হতভাগ্য উন্মাদ যুবক প্রতিদিন যে ডায়রী লিখতেন তারই কিছু-কিছু অংশ আমি আপনাদের পড়িয়ে শোনাচ্ছি। কারণ, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের আলোচনার বস্তু উন্মাদ ছাড়া

আর কে? ব্যাপারটা আরও কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে এই কারণে যে, যে হতভাগ্য প্রিন্স সম্প্রতি মারা গিয়েছেন এবং যিনি ব্যাভেরিয়াতে নিষ্কাম প্রেমের রাজত্ব করেছিলেন তাঁরই চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। কেসটির অন্য নামকরণ করতে চাই আমি: একটি রোমাণ্টিকের উন্মাদনা।

সেই অদ্ভুত রাজকুমারের অনেক কাহিনীই আপনাদের মনে রয়েছে, তাঁর রাজত্বের সব চেয়ে সুন্দর জায়গাটিতে তিনি তৈরী করেছিলেন রূপকথার দুর্গ। বাস্তব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল না। সেই সব মনোরম স্থানকে আরও সুন্দর ক'রে তোলার জন্যে তিনি কৃত্রিম সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করতেন; নতুন ধরনের আলো জ্বালাতেন, সুন্দর করে ক্যানভাসের ওপরে কৃত্রিম পাহাড় অরণ্য নদী আঁকাতেন—গাছ আঁকাতেন—শুধু গাছই নয়, সুন্দর সুন্দর পল্লব আঁকার-ও ব্যবস্থা করতেন। বিরাট-বিরাট পাহাড়ের ওপরে কৃত্রিম তুষারস্তূপ দেখতে পেতেন আপনারা। এক কথায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে আনন্দ দিতে পারতো না—তিনি চাইতেন আরও সৌন্দর্য—সুন্দরকে সুন্দরতর করে তোলার চেষ্টাই তাঁকে উন্মাদের পর্যায়ে নিয়ে হাজির করেছিল। এই মানুষটি বড় পবিত্র ছিলেন—চরিত্রের দিক থেকে এতটুকু কলঙ্ক তাঁর মধ্যে ছিল না। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই তিনি ভালবাসতেন না, কাউকেও মনে ধরতো না তাঁর।

একবার একটি সুন্দরী যুবতী গায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে লেকের ওপরে বিহার করছিলেন। তাঁকে রাজকুমার গান গাইতে অনুরোধ করলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রমণীটি সুন্দর গান গাইলেন; তারপরে ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি রাজকুমারের বুকের ওপরে ঢলে পড়ে তাঁর ওষ্ঠের সঙ্গে নিজের ওষ্ঠ দুটি মিলিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজপুত্র তাঁকে লেকের জলে ফেলে দিলেন; তারপরে দাঁড় বেয়ে ফিরে এলেন তীরে। মেয়েটিকে কেউ উদ্ধার করল কি না সে সংবাদ নেওয়াও প্রয়োজন মনে করলেন না তিনি।

ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যে কাহিনীটি আমি বলছি এটিও সেই রাজকুমারের অনেক কাহিনীর মতই। এই ভদ্রলোকের ড্রয়ারের মধ্যে যে ডায়রীটি আমরা পেয়েছি তা থেকেই কিছু অংশ আমরা পড়ছি।

প্রতিটি জিনিস কী কুৎসিত, কি রকম বিবর্ণ। একই জিনিস, বীভৎস, কোন পরিবর্তন নেই তার, নেই কোন সুন্দরতর হওয়ার প্রচেষ্টা। আরও সুন্দর, আরও মহৎ, আরও পরিবর্তনশীল একটি জগতের জন্যে কতই না স্বপ্ন দেখি আমি! যে-ভগবান বার বার একই জিনিস সৃষ্টি করেন, নতুন-নতুন সৃষ্টির দিকে যাঁর কোন চেষ্টা নেই, মানুষ তাঁকে ভগবানের বলে স্বীকার করে কেমনভাবে জানি নে; আমার মনে হয় সেরকম কোন ভগবান কল্পনা করাটা মানুষের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। বন—সেই এক; নদী-নালা একইভাবে বয়ে চলেছে চিরকাল;

পাহাড় পর্বত—সব একঘেয়ে। আর মানুষ। কী ধরনের দুষ্ট, গর্বিত আর বিরক্তিকর এই পশুটি।

মানুষের ভালবাসা উচিৎ; হ্যাঁ; পাগলের মত ভালবাসা উচিৎ; কিন্তু যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াটা উচিৎ নয়। কারণ, দেখার অর্থই হচ্ছে বোঝা; আর বোঝার অর্থই হচ্ছে ঘৃণা করা। মদ খেতে-খেতে মানুষ যেমন মাতাল হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত কী খাচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না, তেমনি ভালবাসতে-বাসতে মানুষকে প্রেমের উন্মাদনায় মেতে উঠতে হবে; কাকে ভালবাসছে তা জানলে তার চলবে না। ভালবাসার পেয়ালা পূর্ণ করে তা পান কর, দিন রাত্রি, রাত্রি দিন, কোনরকম বিশ্রাম নিয়ো না, বিরতি দিয়ো না এতটুকু।

মনে হচ্ছে, আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি। তার সারা সত্তায় এমন একটি আদর্শ জড়িয়ে রয়েছে যা ইহজগতের নয়; আমার স্বপ্নলোকের। আমার স্বপ্নের জগতে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে বাস্তব জগতের মানুষের পার্থক্য কত বেশী। আমার প্রেয়সী সুন্দরী, সত্যিকারের সুন্দরী; তার চুলের গোছায় অনির্বচনীয় চারুত্ব মাখানো। তার চোখ দুটি নীল; এই নীলাঞ্জন ছায়াই আমার আত্মাকে উল্লাসে ভরিয়ে তোলে। নারীর সমস্ত সত্তা, আমার অন্তরের গভীরে যার প্রতিফলন রয়েছে—তার চমৎকারিত্ব আমার চোখে, কেবল আমার চোখে।

হায়রে। কী রহস্যের খেলা চলেছে। এই দুটো চোখ....সারা বিশ্ব ধরা পড়েছে এদের কাছে; কারণ এই চোখ তাকে দেখতে পায়; এর বুকে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। এই চোখের মধ্যেই তো বিশ্ব—জিনিসপত্র, জীবিত প্রাণী, অরণ্য, সমুদ্র, মানুষ, পশু, পাখি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা—আরও, আরও অনেক কিছু এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে; মানুষের আত্মা, যে-মানুষ চিন্তা করে সে, যে-মানুষ ভালবাসে সে, যে-মানুষ হাসে, কাঁদে—সব ওরই মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর নীল চোখ দুটির মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখ; সেখানে সমুদ্র তার গভীরতা নিয়ে প্রকাশ করেছে নিজেকে; আকাশে রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সাগরেরও রঙ বদলাচ্ছে...তারই মধ্যে দিয়ে আমাকে দেখা যায়—যে আত্মা মানুষকে উদ্বোধিত করে, স্বর্গীয় করে তোলে মানুষকে।

হ্যাঁ; এই আত্মার মধ্যেই আমার রঙ ছড়িয়ে পড়েছে; কেবল নীল

আত্মাই স্বপ্ন দেখে ; সমুদ্র আর আকাশের সব নীল স্বপ্নই এ চুরি করে রেখেছে।

আর চোখ? চোখের কথা একবার ভেবে দেখ। চিন্তার খোরাক যোগানোর জন্যে এ সব সময় বাস্তব জগতের মধ্যে ডুবে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত রঙ, রূপ, গতি, স্থিতি, সৌন্দর্য, কদর্যতা—সবই এ নির্বিশেষে পান করে; এবং তাদের ভেতর যা সৃষ্টি করে তাকেই আমরা বলি কল্পনা। সে যখন আমার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মন একটি পার্থিব আনন্দে ভরে ওঠে। যে সব বিষয়ে আমরা একেবারে অজ্ঞ, যা আমরা জানি নে, বুঝি নে তা-ই এ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে বাস্তব চিন্তার মত জঘন্য জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

* * *

তার চলার ধরনটি বড় চমৎকার। সেই জন্যে তাকে আমি ভালবাসি। সে যখন চলে তখন মনে হয় না সে এ জগতের কোন মহিলা। মনে হয় সে স্বর্গের। আমি তাকে বিয়ে করব...আমার ভয় করছে—অনেক কারণে ভয় করছে আমার।

* * *

দুটি জানোয়ার, দুটি কুকুর, দুটি নেকড়ে, দুটি শেয়াল বনের মধ্যে শিকারের অন্বেষণে ঘুরতে-ঘুরতে পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ল। একটি পুরুষ, আর একটি মেয়ে। পরস্পর যৌন আসঙ্গে লিপ্ত হল। তারা যে যৌন আসঙ্গে লিপ্ত হল তার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ ছিল। সেই কারণটা হল প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তারা তাদের বংশটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ; তাদের জাত, তাদের বংশ, তাদের চেহারা, আচার, ব্যবহার, গতি প্রকৃতি, পৃথিবী থেকে যাতে বিলোপ হয়ে না যায় তারই জন্যে এই চেষ্টা।

প্রতিটি জানোয়ার একই কাজ করে ; জানে না কেন তারা করে।

আমরাও করি তাই...

* *

বিয়ে করে আমি সেই কাজ করেছি ; নারীর সঙ্গে আসঙ্গে লিপ্ত হওয়ার যে একটা অর্থহীন মোহ, আকর্ষণ পুরুষের মধ্যে রয়েছে তারই পূর্তির উদ্দেশ্যে আমিও তাকে বিবাহ করেছি।

সে আমার স্ত্রী। যতক্ষণ তাকে আমি কল্পনায় ভোগ করতে চেয়েছিলাম ততক্ষণই সে আমার কাছে ছিল স্বপ্ন—যে স্বপ্নকে মানুষ পেতে-পেতে হারিয়ে ফেলে, ধরার মধ্যে এসেও সে ধরার বাইরে চলে যায়।

যে মুহূর্তে তাকে আমি বাহুর ভেতরে পেলাম, যে মুহূর্তে তার স্থূল দেহটি আমার স্থূল দেহের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে পড়ল ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল আমার সমস্ত আশা আর স্বপ্নকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলার জন্যে প্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সত্যিই কি সে আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে? না; করে নি। তবু মনে হল আমি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; তাকে আর আমার ভাল লাগছে না, তার দেহ, তার লাবণ্য, তার সৌন্দর্য আমার কাছে যেন ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে; তার চুম্বন আমার কাছে নক্কারজনক মনে হয়েছে, তার আলিঙ্গন মনে হয়েছে ক্লেদাক্ত, তার সঙ্গে যৌন লিপ্সার কথা ভাবতে গিয়েই অকারণে কণ্টকিত হয়েছে আমার দেহ। মনে হচ্ছে এই সব কাজ আমার লুকিয়ে ফেলা দরকার, কোন সুচারু মনন শিল্পীর কাছে এই মিলন অশোভনীয়।

আমার স্ত্রী যখন হাসতে-হাসতে আমার কাছে এগিয়ে আসতো, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতো, আমার হাতে তার হাত রাখতো তখন আমি তা সহ্য করতে পারতাম না। একদিন ভাবতাম তার চুম্বন আমাকে স্বর্গের অমৃত মদিরা দান করে তৃপ্তি দেবে; একদিন তার সামান্য একটু জ্বর হল; তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা পচা দেহের মিহি দুর্গন্ধ তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে আমার নাকে এসে লাগলো। একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম আমি।

হায়রে, এই মানুষের দেহ, জীবন্ত বিষ্টার মত, চলন্ত ধ্বংসের মত—যে ধ্বংস চলে, কথা বলে, হাসে, সোহাগ জানায়, যে দেহ পচা খাবার খায়, সুন্দর মিষ্টি খাবার যা শেষ পর্যন্ত পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়, এই তো তার দেহ-সুষমা।...

ফুলের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এইখানেই। তারাও সুন্দর, তারাও আমাদের আকর্ষণ করে, আমাদের আত্মিক আকাঙ্খাটাকে মাধুর্যের রঙে ভরিয়ে দেয়; তারাও তাদের বংশবৃদ্ধি করে, প্রযনন নীতিতে তারাও বিশ্বাসী এবং পরম উদ্‌যোগী; কিন্তু মানুষের দেহের মত তারা মিহি অথচ প্রাণঘাতী পচা গন্ধ ছড়ায় না।...

ছ মাস পরের ডায়রী থেকে...নির্বাচিত অংশবিশেষ।

...আমি ফুল ভালবাসি। ফুল বলে নয়; তাদের ভালবাসি সুন্দর জীবন্ত বস্তু হিসাবে। আমি তাদের সবুজ পাতার ছাউনির মধ্যে দিন রাত্রি কাটাই; মহিলাদের মত তাদের আমি হারেমের মধ্যে রাখি লুকিয়ে।

আমি ছাড়া কে তাদের চেনে? তাদের মিষ্টতা, লাবণ্য, পার্থিব আর সেই সঙ্গে অপার্থিব স্পর্শের মাদকতা আমি ছাড়া আর কে জানে? লাল গোলাপের ঠোঁটের ওপরে আমি যে চুম্বন করি তার শিহরণ আমি ছাড়া আর কে এমন ভাবে উপভোগ করে? আমার সবুজ পাতার বাগানে আমি আর আমার মালি ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না। সেখানে প্রবেশ করার সময় মনে হয় আমি এমন একটি নিভৃত মন্দিরে ঢুকছি যেখানে আমার জন্যে অন্তরের সমস্ত আবেগ নিয়ে একটি সুন্দরীর প্রতীক্ষা—হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে বসে রয়েছে। তাদের অর্দ্ধ বিকশিত ওষ্ঠগুলি আমাকে চুম্বন দেওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এরাই, এই সব ফুলেরাই; যারা আমার পাশের ঘর আলো করে রয়েছে, তারা আমার ভৃত্য; তারা আমার প্রিয় নয়। আমার যাওয়া আসার পথের ধারে তারা তাদের রঙের পেখম মেলে দাঁড়িয়ে থাকে, অভ্যর্থনা জানায় আমাকে। তাদের দেখে আমার মন আনন্দে নেচে ওঠে; ধমনীতে শিরায়-শিরায় গরম রক্ত ছুটতে থাকে টগবগিয়ে, আমার আত্মা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের স্পর্শ করার জন্যে আমার হাত ছটফট করে। আমি এগিয়ে যাই। আমার উঁচু গ্যালারীর পাশে তিনটি বন্ধ দরজা রয়েছে। তিনটি হারেম আমার। যে-কোন একটিতেই আমি প্রবেশ করার অধিকার রাখি।

কিন্তু অর্কিড ফুলগুলিকেই আমি পছন্দ করি বেশী। তাদের ঘরটি নিচু। হাওয়া বাতাস বিশেষ খেলে না সেখানে। ভিজে গরম বাতাসে আমার গা চিটচিট করে, বাতাসের অভাবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়; আঙুলগুলি কাঁপতে থাকে। এই বিদেশী মহিলারা ভিজে মাটির দেশ থেকে, জলজঙ্গল থেকে, অস্বাস্থ্যকর দেশ থেকে এসেছে। এরা ডাইনী গায়িকাদের মতই মনো-মুগ্ধকর, বিশেষ মারাত্মক, অদ্ভুত রকমের হাস্যকর, আত্মা বিনাশকারিণী, ভয়ঙ্করী। প্রজাপতির মত বিরাট-বিরাট তাদের পাখা; ছোট-ছোট পা, ছোট-ছোট চোখ। কারণ এদেরও চোখ রয়েছে; এরা সেই চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকায়। এরা কি উড়তে পারে? এরা কি ডানায় ভর দিয়ে আমার কাছে আসবে? না। আমার হৃদয়ই উড়ে যাবে তাদের কাছে।

এরা কত শীর্ণ, কত রহস্যময়ী, আকাঙ্খার ওষ্ঠ এরা গোলাপ নির্যাসে সিক্ত করে! আমি তাদের বড় ভালবাসি। মাঝে-মাঝে কয়েকটি কয়েকটি রাত তাদের ঘরে কাটানোর জন্যে আমার বড় ইচ্ছে হয়। আমি থেকেও যাই সেখানে কখন-ও কখন-ও। তাকে আমি গ্রাস করে ফেলি, তার সুবাস আমি প্রাণ ভরে গ্রহণ করি, তার নির্যাস পান করি আমি; অবর্ণনীয় আদর করে তার পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলি আমি।

এই সব টুকরো-টুকরো অংশগুলি পড়া শেষ করে উকিল বললেন:

ভদ্রমহোদয়গণ, এই লজ্জাহীন আদর্শবাদী উন্মাদ যে সব কৌতূহলোদ্দীপক স্বীকারোক্তি করেছেন তা থেকে আর বেশী কিছু আপনাদের অবগতির জন্যে বলাটা রুচির দিক থেকে গর্হিত হবে বলে মনে করছি আমি। যেটুকু আপনাদের সামনে আমি পড়লাম তা থেকেই মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষটিকে বুঝতে পারবেন আপনারা; আমাদের এই নৈতিক অবনতির যুগেও এই ধরনের আদর্শবাদী উন্মাদের সংখ্যা বড় কম।

এই উন্মাদ রোগগ্রস্ত স্বামীর ঘরে আমার মক্কেল যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছেন। আমার বিশ্বাস এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহবিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে।

মন্‌ট সেন্‌ট মিচেলের পৌরাণিক কাহিনী

(The Legend of Mont Saint Michel)

সমুদ্রের মধ্যে তৈরী করা এই রূপকথার দুর্গটিকে প্রথম আমি দেখেছিলাম ক্যাংকেল থেকে। কুয়াশায় ঢাকা আকাশের মধ্যে ধূসর ছায়ার মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এটি। সেই ছায়ার অস্পষ্ট আলোতে দুর্গটিকে আমি দেখে-ছিলাম। আবার এটিকে দেখেছিলাম সূর্যাস্তের সময় অ্যাভ্রাঁচেস থেকে। বেলাভূমির বিরাট একটি অংশ লালবর্ণ ধারণ করেছিল—দিগন্ত-ও হয়ে উঠেছিল লাল। সীমাহীন উপসাগরটিও রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। দূর থেকে কেবল গির্জাটিকেই দেখে মনে হয়েছিল···ওটি একটি কাল্পনিক জমিদারীবিশেষ —একটি স্বপ্নময় প্রাসাদ ছাড়া আর কিছু নয়। অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত এবং সুন্দর—চারপাশে লালের মধ্যে ওই প্রাসাদটিই কেবল কালো হয়ে ছিল দাঁড়িয়ে।

পরের দিন সকালে বেলাভূমি অতিক্রম করে ওই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। সেই বিরাট খোদাই করা বিরাট হীরেটির দিকে তাকাতেই আমার চোখ দুটি কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। যতই তার কাছে যেতে লাগলাম ততই আমি অবাক হ'তে লাগলাম। মনে হল পৃথিবীতে এরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর জিনিস আর কোথাও চোখে পড়ে নি আমার।

দেবতার বাসস্থান খুঁজে পেলে মানুষ যেমন আশ্চর্য হয় আমিও সেই রকম আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ছোট-বড় থাম দেওয়া বিরাট অন্দরমহলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম; আকাশের দিকে খোলা করিডর দিয়ে গেলাম এলাম, ভাস্কর্যের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

আমি যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গির্জাটি দেখছি, এমন সময় নরম্যানডির দেহাতি মানুষ আমার কাছে এসে সেন্‌ট মিচেলের সঙ্গে শয়তানের যে লড়াই বেধেছিল সেই কাহিনীটি শোনালো।

কোন একটি নাস্তিক প্রতিভাবান ব্যক্তি বলেছেন: মানুষকে ভগবান তাঁর সাদৃশ্যে গড়েছেন, আর মানুষ ভগবানকে তার দান ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই প্রবাদটি শাশ্বত সত্য; প্রতিটি মহাদেশে স্থানীয় গির্জার চারপাশে যে-সমস্ত স্বর্গীয় গল্প ছড়িয়ে রয়েছে, আর আমাদের দেশে প্রতিটি গির্জার সঙ্গে যে সব বাস্তু-পুরোহিতদের নাম জড়িয়ে রয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়াটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই। নিগ্রোটির চারধারে নরখাদক ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহুবিবাহকারী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গুরু স্বর্গটিকে মহিলা দিয়ে ভর্তি করে ফেলেছেন; আর বাস্তবধর্মী হওয়ার ফলে গ্রীকরা মানুষের সমস্ত কাঙালপনার একটা ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ফ্রান্সের প্রতিটি গ্রাম একটি না একটি কুলগুরুর ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত। এই সব কুলগুরুর সম্বন্ধে নানা রকম চিত্তাকর্ষক গল্পও ছড়িয়ে রয়েছে; বিশেষ-বিশেষ জায়গার অধিবাসীরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত সেই সব কাহিনী, আর অর্দ্ধ কাহিনীর ওপরে রঙ-তুলি বুলিয়ে তাদের মনোমত করে সেগুলিকে সাজিয়ে নিয়েছে।

সেন্‌ট মিচেল লোয়ার নরম্যানডির ওধারে তদারকী করেন। সেন্‌ট মিচেল হচ্ছেন খড়্গধারী দেবদূত; তাঁর দেহের ওপরে সূর্যের ছটা ঝলমল করছে; চির বিজয়ী—শয়তানকে জয় করেছেন তিনি—এই জাতীয় অনেক প্রবাদ ওই গির্জাটিকে ঘিরে এ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা সেই সব কাহিনী জানে।

সেই রকম একটা কাহিনী লোয়ার নরম্যানডির সেই দেহাতী লোকটি আমাকে শোনালো। গল্পটা সে নিজে বিশ্বাস করত কিনা জানি না; তবে সে বেশ চতুর তা তার চোখ মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি। গল্পটা হচ্ছে সেন্‌ট মিচেল আর শয়তানের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল তারই কাহিনী।

প্রতিবেশী দানবের বিদ্বেষ থেকে বাঁচার জন্যে সমুদ্রের ওপরে সেন্‌ট মিচেল এই বিরাট প্রাসাদটি তৈরী করেছিলেন। এতবড় রাজপ্রাসাদ যেমন তেমন দেবদূতদের জন্যে নয়; কেবল যাঁরা প্রথম শ্রেণীর দেবদূত তাঁরাই এই রকম প্রাসাদে বাস করতে পারতেন। এবং এই রকম জাকজমকপূর্ণ তৈরী করার ক্ষমতা তাঁর মত প্রথম শ্রেণীর সেন্‌ট-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিন্তু পাছে দানবটি সেই প্রাসাদেও নাক গলানোর চেষ্টা করে এই ভয়ে তিনি প্রাসাদটির চারপাশে চোরাবালি দিয়ে বোঝাই করে দিলেন। সমুদ্রের

চেয়েও চোরাবালি যে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর সেকথা কে না জানে ?

পাহাড়ের ওপরে দানবটি একটা সামান্য কুটিরে বাস করত। কিন্তু তার জমিদারী ছিল বিরাট। সমুদ্র পর্যন্ত যে সমস্ত সবুজ গোচারণ ক্ষেত্র ছিল, যে সমস্ত মাঠে সব চেয়ে ভাল ফসল জন্মাতো, ফলে-ফুলে ভরা উপত্যকা, আর ও-অঞ্চলে সমস্ত উর্বর ভূমির মালিকানা ছিল তার। কিন্তু সেন্ট-এর আধিপত্য ছিল বালিতে বোঝাই সমুদ্রের উপকূলটুকু মাত্র ; সেই জন্যে দানবটি ছিল বেশ ধনী ; আর সেন্ট ছিলেন দরিদ্র।

কয়েকটি বছর একটানা উপবাস করার পরে সেন্ট ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ; তখনই তিনি দানবটির সঙ্গে চাইলেন একটা রফা করতে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না ; কারণ তাবৎ অঞ্চলের সমস্ত শস্যের ওপরে একচ্ছত্র মালিকানা ছিল তার।

ব্যাপারটা নিয়ে প্রায় ছ'টি মাস ধরে তিনি চিন্তা করলেন। তারপর একদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের সামনে বসে দানবটি তখন 'সুপ' খাচ্ছিল ; এমন সময় দেখতে পেল সেন্ট তার দিকে এগিয়ে আসছেন। সে তক্ষুণি অভ্যর্থনা করার জন্যে তাঁর দিকে ছুটে গেল, তাঁর পাদরীর লম্বা পোশাকের একটি প্রান্ত ধরে চুমু খেল, তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করল।

সেন্ট মিচেল এক ভাঁড় দুধ গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললেন : আমি তোমার কাছে এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে। এতে যদি রাজি হও তাহলে তোমার ভালই হবে।

সরল প্রকৃতির দানব তাঁর কথা বিশ্বাস করল ; বলল : ভাল কথা।

আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে এই—তোমার সমস্ত জমি আমাকে দাও।

প্রস্তাব শুনে ঘাবড়িয়ে গেল দানব, বলল : কিন্তু...

সেন্ট শেষ করলেন তাঁর কথা : আগে আমার সব কথাটা শোন। তোমার সব জমি আমাকে দাও। লাঙল দেওয়া বল, সার দেওয়া বল, বীজ ফেলার কথা বল—যা কিছু রয়েছে সব করার দায়িত্ব হচ্ছে আমার। ফসল যা হবে তা-ই আমরা ভাগ করে নেব। রাজি ?

প্রকৃতির দিক থেকে দানবটি ছিল অলস ; সে রাজি হয়ে গেল প্রস্তাবটিতে। সে শুধু বাড়তি কিছু চাইল—সেগুলি হচ্ছে সুস্বাদু লাল মুলেট—নির্জন পাহাড়ের গায়ে অজস্র মুলেট মাছ খাড়ির গায়ে ঘুরে বেড়ায়। সেন্ট রাজি হয়ে গেলেন।

তাঁরা পরস্পরের করমর্দন করলেন ; তারপরে একই ধারে দুজনে থুতু ফেললেন ; এই থুতু ফেলার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়িক আলোচনা সমাপ্ত হল। সেন্ট বললেন : শোন, বখরা নিয়ে যাতে তোমার মনে এরকম কোন ধারণা না হয় যে আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি—সেই জন্য কী নেবে তুমিই সেই প্রস্তাব

দাও। মাটির ওপরে যে সব ফসল জন্মাবে সেই অংশই তুমি নেবে, না, মাটির তলায় যা জন্মায় সেগুলি নেবে। দুটোর কোন্‌টা তুমি নেবে ঠিক করে ফেল।

দানবটি চীৎকার করে বলল : মাটির ওপরে যা ফলবে তাই আমার।

সেন্ট বললেন : বহুৎ আচ্ছা।

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ছটি মাস পরের কথা। দানবের সেই বিশাল মাঠ ফসলে ফসলে সবুজ হয়ে উঠলো, সবাই দেখলো গাজর, শালগম, পেঁয়াজ প্রভৃতি সুস্বাদু অথচ যেগুলি মাটির নিচে জন্মায় সেই সব গাছেই বোঝাই হয়ে উঠেছে মাঠ। এই সব গাছের পাতা এক গরু বাছুর ছাড়া অন্য কেউ খায় না।

দানবের কপালে কিছুই জুটলো না। সে চটে লাল হয়ে সেন্টকে জুয়াচোর বলে গালাগালি দিয়ে বলল : আর কোন চুক্তি নয়।

চাষে ইতিমধ্যেই বেশ আগ্রহ জন্মে গিয়েছে সেন্ট-এর। তিনি দানবটির কাছে গিয়ে বললেন : সত্যিই, একথা আমি ভাবিই নি। এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার কোন দোষ নেই। যাই হোক, যাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়—সেই উদ্দেশ্যে এবারে বখরাটা ঠিক উলটো হোক; অর্থাৎ মাটির নিচে তোমার, ওপরটা হবে আমার।

দানব বলল : তাই হবে।

পরের বসন্তে দানবের মাঠ জুড়ে রবি শস্যে ভরে উঠলো চারদিক; শিম-বরবটির মত বড়-বড় জই গাছ, তিসি গাছ, লাল তিন পাতার গাছ, কড়াই-শুঁটির গাছ, কপি—ইত্যাদি-ইত্যাদি হরেক রকমের গাছ জন্মালো; সেই সব গাছ যাদের ফল মাটির ওপরে জন্মায়। এবারেও দানবের কপালে কিছুই জুটলো না। এবারে সে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। সে তার মাঠ ছাড়িয়ে নিল; তার প্রতিবেশী যে সব নতুন-নতুন প্রস্তাব দিলেন তাদের কোনটাই আর সে কানে তুলল না।

এমনি করে একটি বছর গড়িয়ে গেল। তাঁর নিঃসঙ্গ প্রাসাদের ছাদ থেকে সেন্ট মিচেল দূরের সেই উর্বর জমিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন; দানবটি তার ক্ষেতে মজুরদের খাটাচ্ছে তা-ও দেখলেন তিনি; মিচেল দেখলেন দানবটি ক্ষেতের ফসল কাটিয়ে ঘরে তুলল, মাড়ান দিয়ে ফসল ঝাড়লো। এই সব দেখে সেন্ট ভীষণ চটে উঠলেন; নিজের অক্ষমতায় হাত কামড়াতে লাগলেন তিনি। দানবকে ঠকানোর সুযোগ না পেয়ে তার ওপরে তিনি প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। পরের সোমবার দানবকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন : আমার সঙ্গে ব্যবসায় নেমে তোমাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আমি তা জানি। আমি চাই নে আমাদের মধ্যে কোন রকম মনকষাকষির ব্যাপার থাক। আমার বাড়িতে দুজনে একসঙ্গে

খাব এস একদিন। আমি তোমাকে কিছু ভাল জিনিস খাওয়াব।

দানবটি কেবল অলসই ছিল না, ছিল দস্তুরমত লোভী। নিমন্ত্রণ সে তক্ষুণি গ্রহণ করল। নিমন্ত্রণ খাওয়ার দিন সে বেশ ভাল পোশাক পরলো, তারপরে সেন্ট-এর বাড়ির দিকে রওনা হল।

সেন্ট মিচেল ভোজের আয়োজন করেছিলেন রাজকীয়। প্রথম ধাপে মোরগের মাথা আর কিডনী; সেই সঙ্গে মাংসের তাল; তারপরে ক্রিম মাখানো বিরাট দুটি লাল মুলেট মাছ, মদে ভেজানো বাদাম দিয়ে সেদ্ধ করা বড় একটা টার্কি, নুনে জারক করা নরম কিছু ভেড়ার মাংস, সেই পরিমাণ ঘৃতপক্ক শাকসব্জী ইত্যাদি-ইত্যাদি—যাকে বলে একেবারে রাজসিক ব্যাপার। নির্ভেজাল আপেল থেকে তৈরী করা মদ—তা-ও পরিমাণে প্রচুর; সেই সঙ্গে পুরনো আপেল নির্যাসের মদ—!

পেট আর মন ভরে খেল দানব; সত্যি কথা বলতে কি, খাওয়াটা তার এতই বেশী হয়ে পড়েছিল যে তার রীতিমত অস্বস্তি হতে লাগলো।

তারপরে চোখ পাকিয়ে রাগে গরগর করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন মিচেল; বজ্রগর্জনে বললেন: কি! আমার সামনে রাসকেল····আমার সামনে····

ভয় পেয়ে শয়তান দৌড়ে পালিয়ে গেল; আর একটা ছড়ি নিয়ে সেন্ট তার পিছু-পিছু দৌড়লেন। হলের ভিতর দিয়ে, থামের পাশ দিয়ে, সিঁড়ির ওপর দিয়ে, এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে লাফাতে-লাফাতে শয়তানটি ছুটতে লাগলো; তার পিছু-পিছু ছুটলেন সেন্ট মিচেল। হতভাগ্য শয়তান খেয়ে এতই অসুস্থ হয়ে পড়লো যে সে পাগলের মত দৌড়তে-দৌড়তে সেন্ট-এর প্রাসাদে পায়খানা করে ভরিয়ে তুললো। অবশেষে সে প্রাসাদের শেষ ছাদটিতে লাফিয়ে পড়লো, সেখান থেকে বিরাট উপসাগর দেখা যায়; সেই সঙ্গে চোখে পড়ে দূরের শহর, বেলাভূমি, আর গোচারণ ক্ষেত্রগুলি। আর সে পালানোর পথ না দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো; সেন্ট তার পেছনে এসে হাজির হলেন। তারপরে এমন জোরে একখানা লাথি কষিয়ে দিলেন যে সে বেচারা কামান থেকে ছিটকে-পড়া গোলার মত মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

নিক্ষিপ্ত বর্শার মত সে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মরটেন শহরের সামনে ধপাস করে পড়ে গেল। তার শিং আর নখগুলি পাহাড়ের গায়ে ঢুকে গেল। সেইখানেই শয়তানের পতনের চিরস্থায়ী চিহ্নগুলি বিদ্যমান।

সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো; সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল সে। সেখান থেকে দূরে সূর্যাস্তের লাল আভায় রাঙানো সেই ভয়ঙ্কর গির্জাটির দিকে যখনই সে তাকিয়ে থাকতো তখনই সে বেশ বুঝতে পারতো যে এই অসম যুদ্ধে সে সব সময়ই পরাভূত হবেই। এই ভেবে সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আরও দূর দেশের দিকে এগিয়ে গেল—শত্রুর হাতে তার সমস্ত জমি-জমা,

তার অত সাধের ফসল, তার উপত্যকা আর গোচারণ ভূমি—সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সে।

এবং এইভাবে নরম্যানডির কুল-পুরোহিত সেন্ট মিচেল শয়তানকে পরাজিত করলেন।

আর এক ব্যক্তি এই যুদ্ধটিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে কল্পনা করে।

কাদা-খোঁচা পাখি

(The Snipe)

বিগত চল্লিশটি বছর ধরে ব্যারণ দ্য ব্যাভোটস তাঁর অঞ্চলের সেরা শিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু শেষের পাঁচ-ছ'টি বছর প্যারালিসিস হওয়ার ফলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেন না। বর্তমানে ড্রয়িংরুমের জানালা অথবা তাঁর ঘরের সামনে যে বিরাট সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়েছে সেখান থেকে পায়রা শিকার করে সময় কাটান। বাকি সময়টা পড়ায় কেটে যায় তাঁর।

মানুষ হিসাবে ব্যারণের স্বভাবটি ছিল বেশ ভাল; বিগত শতাব্দীর সাহিত্যলিপ্সা তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি টুকরো-টুকরো গল্প শুনতে ভালবাসতেন; বিশেষ করে সেই সব কাহিনীগুলি যদি দুঃসাহসের হয় তো আরও ভাল। পাশাপাশি অঞ্চলে যে সব ঘটনা ঘটতো সেগুলি শুনতেও তিনি বড় ভালবাসতেন। কোন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন: নতুন কোন খবর রয়েছে নাকি হে?

উকিলের মত কেমন করে মানুষকে ক্রশ-একজামিন করতে হয় তা তিনি জানতেন।

যে সব দিন আকাশ থেকে গরম রোদ ছড়িয়ে পড়তো সেদিন বিরাট আরাম কেদারায় তিনি আরাম করে গা এলিয়ে দিতেন। সেই চেয়ারের সঙ্গে চাকা লাগানো থাকতো। চাকার ওপর দিয়ে ঠেলে চেয়ারটিকে হল-ঘরের দরজার কাছে টেনে আনা হোত। পেছন থেকে একটি চাকর তাঁর বন্দুকটি ধরতো, টোটা পুরতো, তারপরে সেই ভর্তি বন্দুকটি মনিবের হাতে তুলে দিত। আর একটি চাকর লুকিয়ে থাকতো কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে; সেখান থেকে মাঝে-মাঝে সে একটা আধটা পায়রা উড়িয়ে দিত; সেইজন্যে ব্যারণ প্রস্তুত থাকার সুযোগ পেতেন না; আর পেতেন না বলেই শিকারের রীতি অনুযায়ী সারাক্ষণই তাঁকে সজাগ থাকতে হোত।

এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পাখিদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তেন, কোন পাখি তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে উড়ে পালালে ভীষণ বিরক্ত হতেন তিনি,

গুলি খেয়ে পাখিটা মাটিতে পড়ে গেলে, অথবা, মাটির ওপরে প'ড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ডিগবাজি খেলে তিনি হো-হো করে হাসতেন। যে-চাকরটি তাঁর বন্দুকে টোটা পুরে দিয়েছিল হাসতে-হাসতে বদ্ধগলায় তাঁকে তিনি বলতেন: যোশেপ, সেই গুলিটাই ওকে ফেলে দিয়েছিল, তাই না? কেমন করে পড়ে গেল তুমি তা দেখলে?

তার উত্তরে যোশেপ একটা কথাই বলতো: নিশ্চয়, নিশ্চয়। ব্যারণ কোন দিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি।

শরৎকালে যখন শিকারের ঋতু আসতো, আগের মতই বন্ধুদের তিনি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনতেন; এবং দূরের আকাশ লক্ষ্য করে তাঁরা যখন গুলি ছুঁড়তেন তখন তিনি বেশ খুশিই হতেন। একটি-একটি করে গুলির শব্দগুলি তিনি গুণতেন; এবং সেই শব্দগুলি যখন পর-পর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হোত তখন তিনি বেশ সন্তুষ্ট হতেন। দিনের শেষে প্রতিটি অতিথিকে অনুরোধ জানাতেন তাঁর ব্যক্তিগত শিকারের কাহিনী বর্ণনা করতে। শিকারের কাহিনীগুলি বর্ণনা করার সময় অতিথিরা খাবার টেবিলে প্রতিদিন প্রায় তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

তাঁরা যে-সব শিকারের কাহিনী বর্ণনা করতেন সেগুলির সবই প্রায় অদ্ভুত এবং অসম্ভাব্য দুঃসাহসিক কাহিনী। এই সব কাহিনী বর্ণনায় বাচাল শিকারীরা বেশ আনন্দই পেতেন। তাঁদের মধ্যে কতকগুলি ছিল ঐতিহাসিক কাহিনী; এবং সেগুলির মধ্যে কিছু কাহিনী এইখানেই আরও অনেকবার বিবৃত হয়েছে আগেই। কেমন ক'রে একটি শশক ক্ষুদে চেহারার ভাইকোঁৎ-দ্য বোরিল-এর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেই কাহিনীটি প্রতি বৎসরই এখানে নতুন উদ্যমে বলা হোত: এবং সেই কাহিনী শুনে প্রতি বছরই তাঁরা হেসে একেবারে লুটোপুটি খেতেন। প্রতিটি পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর একটি নতুন বক্তা বলবেন: আমি একটা শব্দ শুনলাম—"বার বার।" আমার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একটি সুন্দর শশকের দল বেরিয়ে এল। আমি তাদের তাক করলাম—বন্-বন্ শব্দে বন্দুক থেকে বেরিয়ে গেল গুলি: ব্যাঙ-ব্যাঙ। এক ঝাঁক পাখি আমার নজরে গেল পড়ে। এক ঝাঁকে সাত-সাতটা পাখি।

এই কথা শুনে অতিথিরা সবাই হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিতেন: কিন্তু কেউ কারও কাহিনী মিথ্যে বলে নস্যাৎ করে দিতেন না।

কিন্তু এখানে একটা পুরনো গল্পের প্রচলন ছিল: সেটি হচ্ছে: একটি কাদা-খোঁচার কাহিনী। এই পক্ষীরাণীটির আসার সময় হলেই প্রতিটি ডিনার টেবিলের ধারে একই রকমের উৎসব সুরু হোত। এই অতুলনীয়া পাখিটিকে সকলেই পছন্দ করতেন বলে প্রত্যেক অতিথিই প্রতিটি সন্ধ্যায় একটি করে পাখির সদ্ব্যবহার করতেন, ডিশের ওপরে ফেলে রাখতেন কেবল তার মাথাটা।

তখন ব্যারণ বিশপের ভূমিকায় অবতরণ করতেন। তাঁর সামনে একটি প্লেট নিয়ে আসা হোত। সেই প্লেটের ওপরে থাকতো কিছুটা চর্বি, পাখিগুলির সরু স্ুঁচের মত শীর্ণ মাথাগুলি আঙুলের ডগায় ধরে তিনি সেগুলিকে মন্ত্রঃপূত করতেন। তাঁর পাশে একটি বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হোত; এবং কোন কিছু স্বর্গীয় প্রত্যাশায় সবাই উদ্বেগের সঙ্গে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন।

তারপরে ব্যারণ একটি আলপিন গাঁথতেন পাখিটির মাথায়, আর একটি ফুটাতেন তার গায়ে। তারপরে দুটি পিনকে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ওপরে তুলে নিতেন।

অতিথিরা সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করতেন: এক—দুই—তিন।

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যারণ দক্ষ অঙ্গুলি সঞ্চালনে খেলনার মত মাথাটিকে ঘোরাতে সুরু করতেন।

ঘুরতে-ঘুরতে যার দিকে পাখিটার লম্বা চঞ্চুটি থেমে যেত, সেই অতিথিরই জয় জয়কার। তাঁকেই সমস্ত কাদা-খোঁচার মাথাগুলি দেওয়া হোত; এই রাজকীয় সম্মানে অন্য সব অতিথিদের মনেই বেশ হিংসার উদ্রেক হোত।

তিনি মাথাগুলিকে একটি-একটি করে ধরে বাতির ওপরে সেঁকতেন; আগুনের স্পর্শে এসে চর্বিগুলো গলে-গলে পড়তো; মাংসগুলি ঝলসে যেত: আর সেই অতিথি পাখিগুলির চঞ্চু হাতে ধরে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সেগুলি উদরস্থ করতেন। এবং এক একটি মাথা চর্বন করার সময় অন্য অতিথিরা মদের গ্লাস তুলে সমস্বরে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন।

শেষ মাথাটি উদরস্থ করার পরে ব্যারণের নির্দেশ মত নিরাশ অতিথিদের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে তাঁকে একটি গল্প বলতে হোত।

প্রতিশোধ

(The Revenge)

প্রথম দৃশ্য

[মঁসিয়ে দ্য গ্যারিলি, একা, একটি আরাম কেদারার ওপরে হেলান দিয়ে শুয়ে রয়েছেন।]

গ্যা. ক্যানেতে হাজির হয়েছি আমি—একটি চিদানন্দ অবিবাহিত পুরুষ আমি। ব্যাপারটা বেশ হাসিরই সন্দেহ নেই। আমি ব্যাচিলর। প্যারিসে, একথাটা মনেই হয় না যে আমি অবিবাহিত। বাড়ি থেকে দূরে, এ-ব্যাপারটাই আলাদা। দিব্যি করে বলছি, আমার এই অবস্থার জন্যে কারও বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই।

আমার স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে।

আমি অবাক হয়ে ভাবি পরের ভদ্রলোকটি কি সুখী হয়েছে এই বিয়েতে—অর্থাৎ আমার চেয়ে বেশী সুখী? নিশ্চয় সে একটি মহামূর্খ—আমি যাকে ছেড়ে দিলাম তাকেই সে বিয়ে করেছে। সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয় তাহলে অস্বীকার করে লাভ নেই যে মূর্খ বলেই আমি তাকে প্রথমে বিয়ে করেছিলাম। তারও অবশ্য কিছু বলার ছিল—আর সেই বক্তব্যগুলিকে একেবারে নাকোচ করেও দেওয়া যায় না।... শরীরের কথা...ও কথাটা সত্যিই যুক্তিপূর্ণ; তবে কি না আমার স্ত্রীটিও ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না; নৈতিক অপরাধ সে-ও কিছু কম করে নি।

মেয়েটা কী ধরনের নোংরা, মিথ্যেবাদী, স্বৈরিণী, আর ন্যাকা। আর স্বামী ছাড়া অন্য যে কোন পুরুষের কাছেই তার আকর্ষণটা কত তীব্র ছিল। আমি কি চরিত্রহীন লম্পট? হায় ভগবান, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই একটা দুশ্চিন্তায় মেতে থাকাটা কি কষ্টদায়ক? এত কষ্টের পরেও কি ছাই আপনি বুঝতে পারবেন নিজেকে?

তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কত ফন্দি-ফিকিরেরই আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হয়েছে কি? যাই হোক এক সময় আমি যদি পরস্ত্রীতে আসক্ত থাকার অপরাধে অপরাধী হয়েই থাকি, আজ আর সে সব বালাই আমার নেই। আপনারা যাই বলুন, বিবাহ-বিচ্ছেদ বস্তুটা কত সহজ। এর জন্যে আমাকে দশটি ফ্রাঁ খরচ করতে হয়েছিল; একটা ঘোড়ার চাবুকের দাম কি ওর চেয়ে বেশী? হ্যাঁ, তার সঙ্গে ডান হাতের কিছু শক্তিও অবশ্য খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু আনন্দটা দেখুন। যে নারী আমাকে প্রতারণা করার অপরাধে অপরাধিনী, অন্তত যার চরিত্রকে আমি সন্দেহ না করে পারি নি, তাকে প্রাণভরে চাবুক কষানোর তৃপ্তিটা আমার কম হয় নি।

ওঃ, কী ধোলাই, কী ধোলাই-ই না তাকে আমি দিয়েছিলাম।

[তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন; দু'চার পা হাঁটলেন, তারপরে আবার বসে পড়লেন]

কথাটা সত্যি, আদালত তারই পক্ষে রায় দিয়েছিল, এবং আমার বিপক্ষে...কিন্তু কী জব্বর ধোলাই-ই তাকে আমি দিয়েছিলাম।

বর্তমানে শীতকালটা কাটাতে আমি দক্ষিণে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন আমি ব্যাচিলর—ফুর্তিবাজ বেপরোয়া ব্যাচিলর। কী ভাগ্য আমার! এইভাবে বেপরোয়া হয়ে মেজাজে ঘুরে বেড়াতে কী ভালই না লাগে। যে-কোন জায়গায়, যে-কোন অবস্থায় এখন আমি আবার কারও সঙ্গে স্বচ্ছন্দে প্রেমে পড়তে পারি—অন্ততঃ সে-অধিকার আমার রয়েছে। এই হোটেলে কার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে—অথবা এই লাউঞ্জে—অথবা রাস্তায়—কোন্ অভিসারিকার সঙ্গে দেখা হবে আমার? আমাকে আগামী কাল যে ভালবাসবে যার প্রণয়ী

আমি হব সেই মহিলাটি কে? তার চোখ দুটি কেমন, ঠোঁট—চুল আর হাসি—সেগুলিই বা কেমন? যে-নারীটি প্রথম আমাকে চুম্বন দেবে, আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে সে-মেয়েটি কেমন দেখতে? কালো, ফর্সা? লম্বা, বেঁটে? ফুর্তিবাজ না গম্ভীর? মোটা থলথলে · হ্যাঁ, সে স্থূলাঙ্গিনীই হবে।...

হায়রে, সারা জীবনে প্রতীক্ষা করতে জানে না, প্রতীক্ষার চমৎকারীত্ব যাদের আনন্দ দেয় না তারা সত্যিই বড় হতভাগ্য। যে-নারীটিকে আমি ভালবাসি সে অজানা—আকাঙ্খিতা, তাকে আমি পেতে চাই—তাকে আমি আগে কোন দিন দেখি নি—সে আমার আদর্শের কল্পনার স্বপ্নের প্রেয়সী। কিন্তু সে কোথায়? এই হোটেলেই কি সে রয়েছে? এই হোটেলেরই কোন একটি ঘরে কি তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? এত কাছে, অথচ কত দূরে। তাতে কী যায় আসে? আমি তো তাকে পেতে চাই—তার সঙ্গে আমার দেখা হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ। তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই, আজ না হয় কাল, এই সপ্তাহে কিংবা পরের সপ্তাহে, কিংবা তারও পরে, একদিন না একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই, দেখা না হয়ে পারে না।

এবং আমিই তাকে প্রথম চুম্বন দেব, প্রথম চুম্বনের স্বর্গসুখ আমিই প্রথম অনুভব করব; নারীর প্রথম কৌমার্য অপহরণের সমস্ত সুখ, উচ্ছ্বাস, আনন্দ আর দক্ষতা থাকবে একমাত্র আমারই—নারী হৃদয়ের প্রথম রহস্য উদ্‌ঘাটন করব আমিই। হায়রে, কী মূর্খ আমরা। নারীর মুখের আবরণ প্রথম উন্মোচন করার যে প্রাণঘাতী উচ্ছ্বাস—সে উচ্ছ্বাস আমাদের নেই। কী গর্দভ আমরা—আমরা যারা বিয়ে করতে যাই...কারণ ওই আবরণ যত কম উন্মোচন করা যায় ততই ভাল—বিশেষ করে একই রাত্রিতে...

কে একজন মহিলা আসছে না এদিকে...

[লম্বা বারান্দার আর এক প্রান্ত দিয়ে একটি মহিলা হেঁটে এল—চালচলনে ভদ্র, কৃশ এবং কোমরটা ছুঁচোলো।]

মার গোলি। চেহারাটা ভালই দেখছি—দাম্ভিক-দাম্ভিক বলে মনে হচ্ছে একটু। দেখা যাক—চোখাচোখী হোক... মুখের চেহারাটা কেমন...

[মহিলাটি আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে-থাকা ভদ্রলোকটির দিকে না তাকিয়েই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিসফিস করে নিজের মনেই বললেন তিনি]

যা বাব্বা, এ যে আমার স্ত্রী দেখছি। আমার স্ত্রী, অথবা, এখন আর আমার নয়, বর্তমানে সে অন্য লোকের। যাই হোক, মেয়েটি বড় সুন্দর দেখতে।...

আমি কি এখনই আবার ওকে বিয়ে করব নাকি? ভাল—ভাল; কাগজটা নিয়ে সে বসে পড়ল দেখছি। আমি একটু নিচু হয়েই থাকি।

আমার স্ত্রী! কথাটা ভাবতেও আমার মনে কী একটা অদ্ভুত শিহরণ

আগে। আমার পত্নী। অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, এক বছর বা তারও কিছুটা বেশী—সে আর আমার স্ত্রী নেই।…হ্যাঁ, নিশ্চয়, এই বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে সে যেসব কারণ দেখিয়েছে সেগুলি যুক্তিপূর্ণ.. খুবই যুক্তিপূর্ণ…, কিন্তু পা দুখানা একবার দেখেছ? ওদের কথা ভাবলেই আমার বুকটা দুরদুর করে কেঁপে ওঠে। আর বুক দুটো—একেবারে জবাব নেই। ওপ্‌স। একেবারে নিখুঁৎ, শুধু নিখুঁৎ নয়—অতুলনীয়।

কিন্তু ভয়টার কথা একবার ভেবে দেখুন…এই নারী যখন অধঃপাতে যায়…

ওর কি কোন প্রণয়ী ছিল? মানে, একাধিক—এই সন্দেহের জ্বালায় কম জ্বলেছি আমি? কিন্তু এখন? এখন আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। সেই সন্দেহ আমাকে আর কষ্ট দেয় না। অঙ্কশায়িনী হওয়ার সময় এই মহিলাটি যেরকমভাবে পুরুষকে মোহগ্রস্ত করে তোলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে-দক্ষতা অন্য কোন নারীর মধ্যে রয়েছে কি না সে-সম্বন্ধেও আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল নই। অদ্ভুতভাবে বিছানার ওপরে লাফিয়ে পড়ে লেপের মধ্যে শরীরটা ঢুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে চারু ছন্দের আভাষ পাওয়া যেত তেমনটি আর কোথাও আমি দেখি নি।…

বহুৎ আচ্ছা…আবার তার সঙ্গে আমি প্রেমে পড়ব।

ধর, আমি তার সঙ্গে কথা বললাম…কিন্তু কী বলব?

একবার সে আমার কাছ থেকে ধোলাই খেয়েছিল—সে ভয়টা তার রয়েছেই। আমাকে দেখেই সে যদি ভয়ে চীৎকার করে ওঠে? ধোলাইটা অবশ্য জব্বরই হয়েছিল—অতটা বাড়াবাড়ি করা উচিৎ হয় নি আমার—সেকথা আমি নিজেই স্বীকার করছি…

ধর, তার সঙ্গে আমিই কথা বললাম? বেশ মজার হবে, তাই না? করার মত কিছু একটা করাও হবে আমার দিক থেকে। মরুকগে, আমিই তার সঙ্গে কথা বলব…দেখা যাক না কী হয়…

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তিনি সেই যুবতীটির দিকে এগিয়ে গেলেন। যুবতীটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজ পড়ছিল। তিনি তার পাশে গিয়ে বেশ মিষ্টি সুরেই বললেন:]

গ্যারিন্সি: ভয় করার দরকার নেই মাদাম। এখন, আমি আর তোমার স্বামী নই।

যুবতী: কি! আবার আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন…যা কেলেঙ্কারী ঘটেছে তার পরেও…এত দুঃসাহস আপনার!

গ্যা: দুঃসাহস বলতেও পার, আবার নাও বলতে পার। তুমি যা হয় ভাবতে পার; কিন্তু কথাটা সত্যি যে তোমাকে দেখামাত্র তোমার কাছে না

এসে পারলাম না, তোমার সঙ্গে কথা বলার লোভ সংবরণ করা রীতিমত কষ্ট-কর হয়ে উঠলো আমার কাছে।

যুবতী : আশাকরি, রসিকতা করার সেই প্রচেষ্টা শেষ হয়েছে আপনার?

গ্যা : এটা রসিকতা নয়।

যুবতী : রসিকতা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নে আমি; যদি না অবশ্য তার মধ্যে ঔদ্ধত্য থাকে। তাছাড়া, যে পুরুষ মহিলার গায়ে হাত তুলতে পারে, সে করতে পারে না পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই।

গ্যা : মাদাম, আমার ওপরে তুমি নির্মম হয়ো না। আমার ধারণা এক-দিন রাগের বশে আমি কী করে ফেলেছিলাম তার জন্যে আজ এই রূঢ় কথা বলাটা তোমার উচিৎ নয়; বিশেষ করে সে-কাজের জন্যে আমি অনুতপ্ত। তা ছাড়া আমি স্বীকার করছি—তুমি আমাকে ক্ষমা করবে এই কথাটাই ভেবে-ছিলাম আমি।

যুবতী : (অবাক হয়ে) কী! আপনি নিশ্চয় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। অথবা, আবার অসভ্যের মত ঠাট্টা সুরু করেছেন।

গ্যা : দুটির কোনটিই নয়, মাদাম। আমাকে যদি তুমি বুঝতে না পার তাহলে তুমিই অসুখী হবে।

যুবতী : কী বলতে চান আপনি?

গ্যা : আমার স্থানটি বর্তমানে যিনি গ্রহণ করেছেন তাঁকে পেয়ে যদি তুমি সুখী হয়ে থাক তাহলে তার জন্যে আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ —কারণ আমি তোমার ওপরে অত্যাচার না করলে এ-সুযোগ তোমার আসতো না।

যুবতী : পরিহাসটিকে আপনি, স্যার, অনেকটা বেশী দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। দয়া করে আমার কাছ থেকে আপনি চলে যান।

গ্যা : কিন্তু মাদাম—একটু ভেবে দেখ। আমি যদি সেদিন তোমাকে প্রহার করার জঘন্য অপরাধে অপরাধী না হতাম, তাহলে আজও আমাদের সেই ঘানি টেনে দিন কাটাতে হোত।

যুবতী : [আহত হয়ে] নিশ্চয়। সেদিন প্রহার করে আপনি আমার যথেষ্ট উপকারই করেছিলেন।

গ্যা : নিশ্চয় করেছিলাম। সেই উপকারের জন্যেই আজ তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলাম আমি।

যুবতী : সম্ভবত, তাই করা উচিৎ ছিল আমার। কিন্তু আপনার মুখ দেখতে রাজি নই আমি।

গ্যা : তোমার মুখের সম্বন্ধে সেই কথা বলতে আমি রাজি নই।

যুবতী : আপনার প্রশংসা আপনার প্রহারের মতই আমার কাছে অপ্রিয় —অখাদ্য!

গ্যা: তাহলে, মাদাম, আমি কী করব বলত? তোমাকে প্রহার করার অধিকার থেকে আমি এখন বঞ্চিত। আমাকে সদালাপী, গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আমি বাধ্য।

যুবতী: ভাল কথা, খোলাখুলি কথা বলেছেন আপনি। নয়-এর ভাল। কিন্তু যদি আপনাকে সত্যিই ভাল লাগাতে হয়—তাহলে আপনার উচিৎ অচিরাৎ এখান থেকে চলে যাওয়া।

গ্যা: তোমাকে খুশি করার জন্যে বর্তমানে অতদূর পর্যন্ত যেতে আমি রাজি নই।

যুবতী: তাহলে?

গ্যা: যদি আমি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে তার প্রতিকার করতে চাই।

যুবতী: [চটে, ঘৃণার সঙ্গে] কী! যদি কোন অন্যায় করে থাকেন? যদি! আপনি উন্মাদ। আমাকে সেদিন প্রচণ্ডভাবে প্রহার ক'রে ভেবেছিলেন বুঝি আমার সঙ্গে আপনি উচিৎ ব্যবহারই করছেন।

গ্যা: হয়ত সেই রকমই একটা কিছু ভেবেছিলাম।

যুবতী: কী বললেন? সেই রকমই…

গ্যা: হ্যাঁ, মাদাম। কথাটা হচ্ছে, আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা ছিল কি না। সেইটাই তো প্রশ্ন। যাই হোক, ধোলাইটা তুমিই সেদিন খেয়েছিলে, এবং সুখী হও নি…

যুবতী: [উঠে পড়ে] আপনি আমাকে অপমান করছেন, স্যার।

গ্যা: [আগ্রহের সঙ্গে] অনুরোধ করছি, একটু বস; আমার কথা আর একটু শোন। আমি তখন হিংসুটে ছিলাম। তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে আমি তোমাকে ভালবাসতাম। আমি তোমাকে প্রহার করেছিলাম তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে আমার ভালবাসা ছিল মহৎ; তোমাকে যে আমি প্রচণ্ড প্রহার করেছিলাম তা থেকে প্রমাণ করা সহজ যে আমার ভালবাসা ছিল মহত্তর। যাই হোক, তুমি যদি আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী না হয়ে মার খেয়ে থাক তাহলে অবশ্য প্রতিবাদ করার পেছনে তোমার যুক্তি রয়েছে…সে আমি অস্বীকার করছি নে…

যুবতী: আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে না আপনাকে।

গ্যা: সহানুভূতি বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও? এর দুটো অর্থ হতে পারে। হয় তুমি আমার সহানুভূতিকে ঘৃণা করছ, অথবা তোমার মনে হ'তে পারে, এই সহানুভূতির পেছনে কোন যুক্তি নেই, যাই হোক, যদি তোমার মনে হয় তোমাকে সহানুভূতি দেখানোটা আমার পক্ষে অর্থহীন—তাহলে তোমাকে আমি ঘুষি মেরে ঠিকই করেছি—সেইটাই তোমার ভাবা উচিৎ।

যুবতী: আপনার যা খুশি হয় ভাবতে পারেন।

গ্যা: ভাল কথা। তাহলে মাদাম, আমি যতদিন তোমার স্বামী ছিলাম ততদিন তুমি বিশ্বাসঘাতিনী ছিলে।

যুবতী: সে কথা বলতে আমি রাজি নই।

গ্যা: প্রকাশ্যে না বললেও, তোমার বক্তব্যটা তাই হওয়া উচিৎ।

যুবতী: আমি আপনাকে এই কথাটা বোঝাতে চাই যে, আপনার সহানুভূতির কোন প্রয়োজন আমার নেই।

গ্যা: কথার প্যাঁচ কষে লাভ নেই। খোলা মনে স্বীকার কর যে আমি ..

যুবতী: ওই ঘৃণ্য কথাটা বারবার উচ্চারণ করে লাভ নেই। আমার ভাল লাগে না—ঘেন্না করে শুনতে।

গ্যা: ঠিক আছে—শব্দটা না হয় নাই ব্যবহার করলাম। কিন্তু কথাটাতো তুমি স্বীকার কর।

যুবতী: না; করি নে। ওটা মিথ্যা অপবাদ।

গ্যা: তাহলে, আমার সমস্ত হৃদয় দিয়েই তোমাকে আমি করুণা করছি। এখন বুঝতে পারছি যে ইঙ্গিত তোমাকে আমি দিচ্ছিলাম সেটা যুক্তিহীন।

যুবতী: কোন্ ইঙ্গিত?

গ্যা: সে কথা বলার দরকার নেই এখন। সে ইঙ্গিতটা করা যেত যদি তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে।

যুবতী: ঠিক আছে। তর্কের খাতিরে যদি বর্তমানে ধরেই নেওয়া যায় আমি তাই করেছিলাম।

গ্যা: যদির কথা নয়। করেছিলে, কি না।

যুবতী: স্বীকার করছি, করেছিলাম।

গ্যা: ওটাও যথেষ্ট হল না। প্রমাণ চাই আমার।

যুবতী: [হেসে] চাহিদার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে আপনার।

গ্যা: না মাদাম। ব্যাপারটা তা নয়। আমি আগেই বলেছি আমার কিছু সত্যিকার বলার ছিল। তা যদি না থাকতো তাহলে এতদিন পরে—অর্থাৎ তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, এবং তার পরে আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি—তার-পরেও আমি এইভাবে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতাম না। এখন তোমাকে যা বলতে এসেছি তার ফলটা সত্যিকারেরই সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু যদি তুমি আমাকে সত্যি-সত্যিই প্রতারিত করে না থাক—তাহলে সেই প্রস্তাব করে এখন আর কারও পক্ষেই কোন লাভ হবে না।

যুবতী: আপনি আমাকে অবাক করে তুলেছেন। কিন্তু আর আপনি কী চান। আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। এবারে হয়েছে?

গ্যা: শুধু মুখে বললে হবে না। প্রমাণ চাই।

যুবতী: কিন্তু কী প্রমাণটা আমি আপনাকে দেব। এখন আর তারা কেউ

নেই ; তাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

গ্যা : তারা বর্তমানে কোথায় তা আমি জানতে চাইনে। তাদের নাম আমি চাই।

যুবতী : এই সব ব্যাপারে কেউ কোন দিন প্রমাণ রাখে না। [একটু থেকে] আশা করি আমি যা বলছি সেটাই যথেষ্ট।

গ্যা : (মাথাটা সামান্য একটু নিচু করে) তাহলে, তুমি শপথ করে বলছ ?

যুবতী : (মাথা তুলে) বলছি।

গ্যা : (গম্ভীরভাবে) মাদাম, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। এবং কার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলে ?

যুবতী : আপনার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।

গ্যা : আমার তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

যুবতী : সে কথা বলা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

গ্যা : কেন ?

যুবতী : কারণ, আমি বিবাহিতা।

গ্যা : অর্থাৎ ?

যুবতী : এটাকে আপনি পেশাগত গোপনীয়তা বলতে পারেন।

গ্যা : ঠিক কথা।

যুবতী : তা ছাড়া, মঁসিয়ে ক্যানটেভার অর্থাৎ যাঁকে আমি বিয়ে করেছি, তারই জন্যে আপনাকে আমি প্রতারণা করেছিলাম।

গ্যা : কথাটা সত্যি নয়।

যুবতী : কেন নয় ?

গ্যা : কারণ, তিনি তাহলে তোমাকে বিয়ে করতেন না।

যুবতী : ঔদ্ধত্যের সীমা থাকা উচিৎ আপনার...

গ্যা : কথাটা হচ্ছে এই। তুমি এইমাত্র স্বীকার করলে যে আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করেছিল। তুমি প্রতারণা করে আমাকে সেই জাতীয় প্রাণীতে পরিণত করেছিলে যারা চরিত্রহীনা স্ত্রীদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিবাদ জানাতে না পারার ফলে সমাজের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়—আবার কথা বললেও লোকে তাদের অদ্ভুত জীব বলে মনে করে। এরাই হচ্ছে সংসারে প্রতারিত স্বামীর দল। ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে তোমার শরীরে আমি যে ক'টা ক্ষত সৃষ্টি করেছি, আমাকে প্রতারণা করে, লোক সমাজে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষত তুমি আমার মনে সৃষ্টি করেছ। তার ক্ষতিপূরণ করার সময় এসেছে তোমার—বিশেষ করে বর্তমানে আমি আর তোমার স্বামী নই বলে।

যুবতী : আপনি উন্মাদ হয়েছেন।

গ্যা : আমি চাই, অন্য লোককে দেওয়ার জন্যে বিবাহিত জীবনে তুমি যে

আমার কাছ থেকে সুন্দর মুহূর্তগুলি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেই মুহূর্তগুলি আজকে আবার তুমি আমার জন্যে খরচ করবে—অন্য লোকের অর্থাৎ তোমার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ··

যুবতী : আপনি উন্মাদ।

গ্যা : মোটেই না। তোমার প্রেমে ছিল একচ্ছত্র অধিকার আমার। ছিল না? তোমার সমস্ত চুম্বন—সব, সব—ছিল একান্তভাবে আমারই। অন্য লোকের সুবিধের জন্যে তাদের কিছু-কিছু অংশ তুমি আমার কাছ থেকে পাচার করে দিয়েছিলে। এটা তাই আমার কাছ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় যে তুমি আমার সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেবে—যেমন করে হোক—এমনভাবে দেবে যাতে কোন রকম প্রকাশ্য কলঙ্ক না ছড়ায়, অত্যন্ত গোপনে—নির্লজ্জ চোরেরা যেমনভাবে চুরি করে সেইভাবে।

যুবতী : আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কী জানতে পারি?

গ্যা : তুমি হচ্ছ মঁসিয়ে দ্য ক্যানটেভার-এর পত্নী।

যুবতী : না, না। জিনিসটা খুব খারাপ।

গ্যা : ক্ষমা করো। যে লোকটির জন্যে তুমি আমাকে প্রত্যারণা করেছিলে সে-ও নিশ্চয় জানতো যে তুমি মঁসিয়ে দ্য গ্যারিলির পত্নী। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমিও ন্যায়ত সেই সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। সত্যিকার খারাপ হচ্ছে যা তুমি নিয়েছিলে তা সসম্মানে ফিরিয়ে না দেওয়াটা।

যুবতী : যদি আমি হ্যাঁ বলি ..তাহলে তুমি...

গ্যা : নিশ্চয়।

যুবতী : তাহলে, এতে লাভ কী হবে?

গ্যা : আমাদের পুরনো ভালবাসাটাই ঝালাই হবে।

যুবতী : তুমি কোন দিনই আমাকে ভালবাসনি।

গ্যা : তবু তোমাকে আমি সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ দিচ্ছি যে তোমাকে আমি ভালবাসতাম।

যুবতী : কোন্ দিক থেকে?

গ্যা : তাই জিজ্ঞাসা করছ? যখন কোন লোক মূর্খের মত কোন নারীর কাছে আত্মসমর্পণ করে—প্রথমে তার স্বামী হিসাবে, পরে তার প্রণয়ী হিসাবে—তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে সে মেয়েটিকে ভালবাসে। তা যদি না হয় তাহলে, ভালবাসা কাকে বলে আমি তা জানি নে।

যুবতী : দুটো আলাদা জিনিসকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলাটা উচিৎ হবে না আমাদের। কোন মহিলাকে বিয়ে করার পেছনে দুটির একটি কারণ রয়েছে : হয় সে তাকে ভালবাসে, অথবা সে তাকে পাওয়ার কামনা করে। কিন্তু সেই মহিলাটিকে রক্ষিতা হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ একটিই—তাকে ঘৃণা করা। প্রথম ক্ষেত্রে মেয়েটির সব দায় আর দায়িত্ব থাকে তার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই

সব দায় আর দায়িত্ব মেয়েটির আইনসঙ্গত স্বামীর ওপরে ছেড়ে দিয়ে সে শুধু মেয়েটিকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়; এবং যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে মেয়েটি তাকে আর খুশি করতে পারছে না তখনই সে তাকে ছেড়ে চলে যায়। কোন রকম বিবেক দংশন করে না তার। দুটি জিনিস কখনই এক হ'তে পারে না।

গ্যা: প্রিয় বালিকা, তোমার যুক্তিটি বড়ই দুর্বল; কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে ভালবাসে, তখন সেই নারীটিকে বিয়ে করা তার কিছুতেই উচিত নয়। যদি তা সে করে তাহলে তার স্ত্রী তাকে প্রতারিত করবেই—যেমন তুমি করেছিলে। এর প্রমাণ রয়েছে। কথাটা অবিসংবাদিতরূপে সত্যি যে কোন নারী যেমন গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে বিপুল উদ্যমে মরীয়া হয়ে তার স্বামীকে বঞ্চনা করে তেমনি উদ্দামভাবেই সে তার প্রণয়ীকে ভালবাসে। তাই নয়? তুমি কী বল? যদি কোন নারীর সঙ্গে তুমি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চাও, তাহলে অন্য একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। বিয়েটা হচ্ছে একটা সরু সুতো। যে কোন মুহূর্তেই তাকে ছিন্ন করা যায়। তারপর তুমি তাকে ভোগ কর। বন্ধনহীন প্রেমই আসল প্রেম—এ বাঁধন কোন দিন ছেঁড়ে না। আমরা সেই বন্ধন ছিন্ন করেছি। আমি তোমাকে শৃঙ্খলটি এগিয়ে দিচ্ছি।

যুবতী: তোমার তো বেশ আনন্দ হচ্ছে দেখছি। কিন্তু আমি রাজি নই।

গ্যা: তাহলে মঁসিয়ে, অর্থাৎ তোমার বর্তমান স্বামীকে আমি সাবধান করে দেব।

যুবতী: কী বলে?

গ্যা: বলব, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলে।

যুবতী: কখন আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি··· তুমি···

গ্যা: যখন তুমি আমার স্ত্রী ছিলে।

যুবতী: অর্থাৎ?

গ্যা: তিনি তোমাকে কখনই ক্ষমা করবেন না।

যুবতী: তিনি?

গ্যা: জাহান্নামে যাক। এরপরে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না।

যুবতী: [হেসে] ও কাজটি করো না, হেনরী।

সিঁড়ির ওপর থেকে একজন ডাকলো: ম্যাথিলডি।

যুবতী: [স্বর নামিয়ে] আমার স্বামী। বিদায়।

গ্যা: [উঠে] চল তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমার পরিচয়টা দিয়ে আসি।

যুবতী: না, না। ও কাজ করো না।

গ্যা: দেখ, করতে পারি কি না।

যুবতী : করো না—প্লীজ।

গ্যা : তাহলে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি?

নেপথ্যে : ম্যাথিলডি!

যুবতী : তুমি এখন দয়া করে যাও।

গ্যা : আবার কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

যুবতী : এইখানে—আজ সন্ধ্যায়—ডিনারের পর।

গ্যা : [তার হাতে চুমু খেয়ে] আমি তোমাকে ভালবাসি…

যুবতীটি ছুটে চলে গেল।

গ্যারিলি শান্তভাবে তাঁর আরাম কেদারার কাছে ফিরে গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন।

গ্যারিলি : যাই বল, এইটাই ভাল। আগে আমার যে ভূমিকা ছিল তার চেয়ে অনেক ভাল। মেয়েটি সত্যিই বড় লাবণ্যময়ী—চিরাচরিত স্বামীত্বের অধিকারে ক্যানটিভার যেমন মিষ্টি স্বরে 'ম্যাথিলডি' বলে ডাকলেন তার চেয়েও মিষ্টি।

বৃদ্ধ-বোনিফেস-এর অপরাধ
(Old Boniface s Crime)

পোস্ট অফিস থেকে সেদিন চিঠি বিলি করার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েই বোনিফেস বুঝতে পারলো অন্যদিনের মত বেশী চিঠি তার ঝোলাতে নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তার মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। তার কাজই ছিল সহরের বাইরে ডাক বিলি করা; সারাদিন পরিশ্রমের পরে নানা জায়গায় ডাক বিলি করে যখন রাত্রিতে সে বাসায় ফিরত তখন সে ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়তো; তার মনে হোত, পা দুটো তখনও তার চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পড়ে রয়েছে।

আজ তার কাজ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার পথে আজ সে একটু বেড়াতেও পারবে। বেড়িয়ে বেলা তিনটে নাগাদ ফিরে আসবে সে। একেই বলে কপাল।

সহর এলাকা ছাড়িয়ে সে তার কাজ সুরু করল। ফল আর ফুলের মাস এই জুন। গাছে, মাঠে-ঘাটে ফুলের সমারোহ চারপাশে। গায়ে হাতকাটা নীল জামা ঝুলিয়ে আর মাথায় কালো টুপি চড়িয়ে যব আর গমের মাঠের ওপর দিয়ে সরু পথটা ধরলো সে। কাঁধ-উঁচু শস্যের গাছের ভেতর দিয়ে চলন্তে-

চলতে তার মনে হল মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত সবুজ সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে সে হাঁটছে।

ঝোপের বেড়া দেওয়া দু-সার বীচ গাছের ছায়ার নিচে কাঠের গেট-ওয়ালা ক্ষেতের ভেতরে সে ঢোকে, চাষীটির নাম ধরে ডাকে—ম'সিয়ে চিকট—প্রাতঃপ্রণাম। এই বলে সে একখানি খবরের কাগজ তার হাতে তুলে দেয়। চাষীটি কপালের ঘাম মুছে কাগজটি নিয়ে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। দুপুরে সে ওটি পড়বে। নুয়ে-পড়া একটা আপেল গাছের গোড়ায় লোহার পিপের মধ্যে একটা কুকুর বাঁধা থাকে। পিয়নটিকে দেখে সে চেঁচাতে সুরু করে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে মিলিটারী চালে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাঁ হাতে চিঠির থলে আর ডান হাতে নিত্যসঙ্গী ছড়িটি নিয়ে পিয়ন আবার বেরিয়ে পড়ে পথে।

সেনামারের ছোট্ট গ্রামটির মধ্যে চিঠি বিলি করে সে আবার মাঠের পথ ধরল; এবার সে যাবে ট্যাকস্ কলেকটারের বাড়ি চিঠি দিতে। গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে তাঁর বাড়ি। এঁর নাম ম'সিয়ে চাপাটি। ভদ্রলোক আগের সপ্তাহেই এখানে এসেছেন—সামান্য কিছুদিন হল বিয়ে হয়েছে তাঁর। প্যারিসের একটি কাগজ তিনি নিতেন; এবং মাঝে-মাঝে হাতে সময় থাকলে পিয়ন বোনিফেস কাগজটি বিলি করার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিত।

সেইভাবে সে তার ঝুলিটা খুলে কাগজটা বার করে নিল; তারপরে সেটার ভাঁজ খুলে হাঁটতে-হাঁটতে পড়তে লাগল কাগজটা। প্রথম পৃষ্ঠায় তার পড়ার মত কিছু ছিল না। রাজনীতির কচকচানি তার ভাল লাগে না। বিভিন্ন রকমের আর্থিক সংবাদও তাকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু সাধারণ সংবাদগুলি তার মনে চমক লাগিয়ে দেয়।

সেই দিন এই জাতীয় সংবাদগুলি তার কাছে বিশেষভাবে চমকপ্রদ মনে হল। কোন একটি দরোয়ানের কুঁড়েতে একটি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার কাহিনী সংবাদ হিসাবে সেই কাগজে স্থান পেয়েছিল। এই সংবাদটি তার কাছে এতই চমকপ্রদ লাগলো যে সে একটু দাঁড়িয়ে কাহিনীটা আগাগোড়া পড়ে শেষ করল। ঘটনার বিবরণ পড়লে সত্যিই বড় ভয় লাগে। একজন কাঠুরে সকালের দিকে দরোয়ানটির ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ সে লক্ষ্য করল দরজার সামনে একটু রক্ত পড়ে রয়েছে। মনে হল, কারও যেন নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে। সে ভাবলো, গত রাত্রিতে দরোয়ান হয়ত কোন শশক মেরেছে, এ-রক্ত তারই। তারপরে কাছে গিয়ে দেখলো দরজা কিছুটা খোলা রয়েছে, আর তালাটাকে কে বা কারা যেন ভেঙে দুমড়ে দিয়েছে।

এই দেখেই সে ভয় পেয়ে সোজা ছুটলো গ্রামের দিকে মেয়রকে খবর দিতে। মেয়র তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন একজন কনস্টেবল, আর একজন স্কুলের শিক্ষককে। চারজনে মিলে ফিরে এলেন সেখানে। তাঁরা দেখলেন ফায়ার

প্রেসের ধারে দরোয়ানটি পড়ে রয়েছে ; তার গলাটা কাটা ; বিছানার নীচে তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করা হয়েছে ; আর তাদের ছ বছরের মেয়েটিকে মারা হয়েছে দুটো মাদুরের মধ্যে রেখে গলা টিপে।

হত্যা আর হত্যার সেই ভয়ঙ্কর কাহিনী পড়ে পিয়ন বোনিফেস যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হল ; কেমন যেন দুর্বল-দুর্বল লাগলো তাকে ; সে চেঁচিয়ে বলল : ভগবান, এ দুনিয়ায় কিছু দুষ্ট মানুষ রয়েছে।

তারপর কাগজটিকে যথাস্থানে রেখে সে এগোতে লাগলো ; মাথার মধ্যে সেই হত্যার বিভীষিকা তখনও কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এইভাবে সে মঁসিয়ে চাপাটির বাড়ির সামনে হাজির হল ; বাগানের সামনে ছোট কপাটটি খুলে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিচু একতলা বাড়ি। নিকটস্থ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে এই বাড়িটির দূরত্ব হচ্ছে কম করে পাঁচশ গজের কাছাকাছি।

পিয়নটি সিঁড়ির দুটি ধাপ উঠলো। কপাটের কাছে দাঁড়ালো, দরজা খোলার জন্যে হাতলটা ঘোরালো। বুঝতে পারলো দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তারপরে সে লক্ষ্য করল যে খড়খড়িগুলো তখনও খোলা হয় নি ; আর তখন-ও পর্যন্ত কেউ বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় নি।

কেমন-কেমন লাগলো ব্যাপারটা। এখানে আসার পর থেকে সবাই জানে মঁসিয়ে চাপাটি খুব সকালে ওঠেন। বোনিফেস তার ঘড়িটাকে টেনে দেখলো সাতটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে অবশ্য ঘণ্টাখানেক আগেই সে এখানে এসে পৌঁছেছে ; তবু এরই ভেতরে মঁসিয়ে চাপাটির উঠে পড়ার কথা।

ব্যাপারটা কী জানার জন্যে সে ঘরের চারপাশে ঘুরলো ; খুব সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগলো। মনে হল সে নিজেই যেন কোন বিপদে পড়েছে। একটি মানুষের পদচিহ্ন ছাড়া আর কোন সন্দেহজনক জিনিসই তার চোখে পড়লো না।

জানালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখ। ঘরের ভেতরে কতকগুলো গোঙানির শব্দ উঠছে। জানালার ধারে দাঁড়ালে বেশ শোনা যায়। ব্যাপারটাকে ভাল করে বোঝার জন্যে খড়খড়ির ওপরে সে তার একটা কান চেপে ধরল। হ্যাঁ, গোঙানিই বটে ; সেদিক থেকে শুনতে কোন ভুল হয় নি তার। কেউ যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, কেউ যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে ; কেউ যেন কারও হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছটফট করছে। একমনে শুনলো বোনিফেস। হঠাৎ সেইগুলি যেন তীব্র হয়ে উঠলো—তাই পরে পরিণত হল আর্তনাদে।

বোনিফেসের বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না ঠিক সেই মুহূর্তে ট্যাকস্ কলেকটারের বাড়িতে একটা খুন খারাপীর মহড়া চলেছে। সে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। বাগান পেরিয়ে এল মাঠের কাছে, মাঠ

পেরিয়ে ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে—থলি ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে, জোরে-জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে, হাঁপাতে-হাঁপাতে সে হাজির হল থানার কাছে।

ইনসপেকটর সাহেব তখন বসে-বসে নিজের হাতেই ভাঙা চেয়ার সারাচ্ছিলেন। একটি কনস্টেবল ভাঙা চেয়ারের অংশগুলি নিজের পায়ের মধ্যে চেপে সাহেবকে যথাসাধ্য সাহায্য করছিল; আর ইনসপেকটর সাহেব গোঁফ চিবোতে-চিবোতে একটা হাতুড়ি নিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পেরেক পিটতে গিয়ে বারবার তাঁর সহকারীটির হাতের ওপরে বসিয়ে দিচ্ছিলেন:

তাদের দেখেই বোনিফেস চীৎকার করে উঠলো: তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, ট্যাকস্ কলেকটরকে কেউ বা কারা খুন করেছে।

কাজে বাধা পেয়ে দুটি লোক বোকার মত হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাঁদের হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে তাড়া লাগালো: তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। ঘরের মধ্যে চোর ঢুকেছে। তাদের চীৎকার আমি শুনেছি। তাড়াতাড়ি চলুন। আর সময় নেই।

ইনসপেকটর তাঁর হাতুড়িটি সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে এই সংবাদটা কে দিল?

ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল বোনিফেস।

তুমি তাঁদের সাহায্য করনি? জিজ্ঞাসা করলেন ইনসপেকটর।

বোনিফেস বলল: না। আমার সঙ্গে লোকজন ছিল না। আমি সাহস পাই নি।

ইনসপেকটর বললেন: অপেক্ষা কর। তোমাকে নিয়ে আমি যাব।

একটু পরেই কনস্টেবলটিকে সঙ্গে নিয়ে ইনসপেকটর বেরিয়ে পড়লেন। বোনিফেস-ও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলল। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সবাই গতির দ্রুততা কমিয়ে দিল। ইনসপেকটর তাঁর রিভলভারটা বার করলেন। খুব ধীরে-ধীরে প্রায় নিঃশব্দে তাঁরা বাগান পেরিয়ে ঘরের কাছে হাজির হলেন। দুর্বৃত্তেরা যে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে এরকম কোন চিহ্ন দেখা গেল না। দরজা তখনও বন্ধ রয়েছে; তখন-ও পর্যন্ত তোলা হয়নি খড়খড়িগুলি।

ইনসপেকটর চাপা গলায় বললেন: ব্যাটাদের আমরা ধরে ফেলেছি।

উত্তেজনায় বোনিফেসের গলার স্বর কাঁপতে লাগলো। সেই ইনসপেকটরকে সঙ্গে করে বন্ধ খড়খড়ি দেওয়া একটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল: ঐখানে ম'সিয়ে।

ইনসপেকটর সাহেব নিজেই এগিয়ে গিয়ে বন্ধ খড়খড়ির ওপর কান চেপে ধরলেন; বাকি দুজন সম্ভাব্য কোন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ধরে ইনসপেকটর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, শুনলেন। কিন্তু

সত্যিই কি কিছু শুনতে পেলেন তিনি? তাঁর মুখের চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ তাঁর গোঁফের দুটি প্রান্তভাগ উঁচু হয়ে উঠলো, মনে হল নিঃশব্দ হাসিতে তাঁর গালের শিরাগুলি সঙ্কুচিত হচ্ছে। আর একবার ভাল করে তিনি ওদের কাছে ফিরে এলেন। লোক দুটি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন; ওরা দুজন-ও সেই একই পদ্ধতিতে তাঁর পিছু-পিছু চলতে লাগলো। দরজার কাছে এসে তিনি বোনিফেসকে বললেন: ওই ফাঁক দিয়ে চিঠিপত্র ভেতরে ঢুকিয়ে দাও।

হতভম্ব অবস্থাতেই পিয়নটি তাঁর নির্দেশমত কাজ করল।

তারপরে তিনি বললেন: এখন ফিরে যাওয়া যাক।

গেটের সামনে এসেই তিনি বোনিফেসের দিকে তাকালেন; চোখ দুটো তাঁর হাসির ছটায় ভরে উঠলো; ঠাট্টার ছলে বেশ চিবিয়ে-চিবিয়েই তিনি বললেন: তুমি একটি বেশ চালাক কুকুর, তাই না?

বৃদ্ধ বোনিফেস বলল: কী বলছেন ··আমি নিজের কানে শুনেছি।

এতক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার আর তাঁকে ধরে রাখা গেল না। তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। এত জোরে হাসতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত দম আটকে না মারা যান। তাঁর কাণ্ড দেখে দুজন তো কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ইনসপেকটর সাহেব তখন কথাও বলতে পারছেন না, হাসি-ও থামাতে পারছেন না। হঠাৎ তাঁর উচ্ছ্বাস এতটা বাড়াবাড়িতে এসে পৌঁছলো কেন তা বোঝাতে না পেরে তিনি তাঁর হাত দিয়ে একটি কুৎসিত আর জঘন্য ইঙ্গিত করলেন; এবং তাতেও যখন কেউ কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না, তখনই তিনি বন্ধ খড়খড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে কয়েকবারই সেই আগের কুৎসিত ইঙ্গিতের পুনরাবৃত্তি করলেন।

এতক্ষণে কনস্টেবলটির মগজে ব্যাপারটা বোধহয় ঢুকলো; সে-ও হো-হো করে হাসতে সুরু করল।

বৃদ্ধ বোনিফেস বোকার মত ফ্যা-ফ্যা করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

অবশেষে ধাতস্থ হলেন সাহেব; ওই বৃদ্ধ লোকটির পেটে রসিকতা করে কয়েকটা খোঁচা দিয়ে বললেন: তুমি একটি চালাক কুকুর—তুমি আর তোমার ওই রসিকতা।

বৃদ্ধ বোনিফেস তার বড়-বড় দুটো চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল: আমার দিব্যি, আমি শব্দ শুনেছি।

ইনসপেকটর আবার হাসতে লাগলেন: ওঃ, তুমি শব্দ শুনেছ? তাই বুঝি? এইভাবে তুমি তোমার স্ত্রীকে হত্যা কর বুঝি?

আমার স্ত্রী?—শেষকালে বলল: আমার স্ত্রী; হ্যাঁ, তার গায়ে হাত দিলেই সে চীৎকার করে ওঠে; কিন্তু যদি সে শব্দই করে, সে কি এই রকম? ম'সিয়ে চাপাটি কি তার স্ত্রীকে মারধোর করছেন?

ইনসপেকটর আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন; তারপরে বোনিফেসকে বুঝিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে কানে-কানে কী একটা কথা বলতেই বোনিফেস লজ্জায় লাল হয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল; তারপরে বলল: না...ঠিক ওরকম নয়...একদম ওরকম নয়...আমার স্ত্রী কিছু বলে না...আমি বিশ্বাসই করতে পারছি নে...যে কোন লোক ভাববে ওখানে কেউ কাউকে খুন করেছে।

লজ্জায়, অপমানে, এবং হতভম্ব হয়ে, সে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে সুরু করল; পেছনে ইনসপেকটর তখনও হাসছেন; তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাঁর সহকারী।

উন্মাদিনী

(The Mad Woman)

ম'সিয়ে দ্য এনদোলিন বললেন: ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের একটি কাহিনীর কথা আমার মনে পড়ে গেল; ফবোর্জ-দ্য-করমেইল-এ আমার বাড়িটার কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে রয়েছে। প্রাশিয়ানরা যখন এল তখন আমি সেখানেই ছিলাম। আমার পাশের বাড়িতে একটি মহিলা থাকতেন। তিনি উন্মাদিনী। পর-পর কয়েকটি দুর্ঘটনায় তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর তখন তাঁর বয়স। এক মাসের মধ্যে তাঁর বাবা মারা গেলেন, স্বামী মারা গেলেন; সেই সঙ্গে মারা গেল সদ্যজাত শিশুটি।

কোন বাড়িতে একবার মৃত্যু ঢুকলে, সে সেই বাড়িতে অনতিবিলম্বে আবার এসে ঢুকবেই। যেন ঘরে ঢোকার রাস্তাটা সে চিনে ফেলেছে। ওই যুবতীটি শোকের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে বিছানা নিলেন; এবং পরে ছটি মাস ধরে বিকারের ঝোঁকে কাটালেন। সেই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার পরে কিছুটা শান্ত হলেন বটে; কিন্তু চুপচাপ পড়ে রইলেন। কিছুই প্রায় খেলেন না; কেবল চোখ চিরে চিরে দেখতে লাগলেন। যতবারই তাঁকে তুলে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তিনি চীৎকার করেছেন। তিনি ভেবেছেন হয়ত সবাই তাঁকে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করছে। সেই জন্যে কেউ তাঁকে আর তুলতো না, একমাত্র পরিষ্কার করা আর পোশাক পরিবর্তন করার সময়টুকু ছাড়া নাড়াচাড়া করত না তাঁকে।

একটি বুড়ো চাকর সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতো; মাঝে মাঝে সেই তাঁকে কিছু খেতে দিত—কখনও-কখনও একটু পানীয় বা ঠাণ্ডা মাংসের টুকরো।

তাঁর সেই দুঃখ-জর্জরিত মনের মধ্যে কী হোত কে বলবে? কেউ তা জানত না; কারণ, মুখ ফুটে কাউকেই তিনি কোন কথা বলতেন না। তিনি কি মৃতদের কথা চিন্তা করতেন? তিনি খারাপ কোন স্বপ্ন দেখতেন? তাঁর জীবনে কী ঘটেছে সে-সব কথাও তিনি স্মরণ করতে পারতেন না। অথবা, স্রোতহীন জলের মতই তাঁর চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে পড়েছিল? পনেরটি বছর ধরে তিনি এই রকম নির্জীব অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

যুদ্ধ বাঁধলো। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে জার্মানরা করমেইল-এ হাজির হল। সে-সব ঘটনা আমার বেশ পরিষ্কার মনে রয়েছে। সেবারে এত ঠাণ্ডা পড়েছিল যে মনে হল যে পাথর-ও বোধ হয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। আমি নিজেও ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে থাকতাম। বাতের বেদনার জন্যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারতাম না আমি। ইজি-চেয়ারে বসে-বসে আমি জার্মানদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দ শুনতাম—ভারি-ভারি বুটের শব্দ; জানালার ভেতর দিয়ে দেখতাম তাদের।

ডল পুতুলের মত তাঁরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। তারপর অফিসাররা তাঁদের লোকজনদের আমাদের মত গৃহস্থদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলেন। আমাকে পুষতে হোত সতেরজনকে। আমার প্রতিবেশীর, ওই উন্মাদিনীর বাড়িতে ছিল বারোজন; তাদের মধ্যে একজন আবার উগ্র স্বভাবের মোটা চেহারার মেজর ছিলেন।

প্রথম কয়েকটা দিন বেশ ভালভাবেই কাটলো আমাদের। আমাদের পাশের বাড়িতে যে অফিসারটি ছিলেন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল যে মহিলাটি অসুস্থ; কিন্তু সেদিকে তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু অতিশীঘ্রই এই অদৃশ্য মহিলাটি তাঁদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলেন। মেজর জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর অসুখটা কী? তাঁকে জানানো হল গভীর দুঃখের কবলে পড়ে তিনি পনেরটি বছর ধরে বিছানাতেই শুয়ে আছেন। নিঃসন্দেহ যে তিনি এই কাহিনী বিশ্বাস করলেন না। তিনি ভাবলেন সেই হতভাগ্য উন্মাদিনী দম্ভ করে বিছানা থেকে উঠছেন না পাছে তাঁকে প্রাশিয়ানদের আদর-আপ্যায়ন করতে হয় এই ভয়ে।

তিনি তাঁকে নামিয়ে আনার জন্যে বারবার তাগিদ দিলেন। তাঁকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তাঁকে বেশ রূঢ় ভাষাতেই বললেন: মাদাম, গাত্রোত্থান করার জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি নিচে আসুন। আমরা সবাই আপনাকে দেখতে চাই।

কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না; কেবল শূন্য দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই দেখে মেজর বললেন: অবাধ্যতা সহ্য করতে আমি রাজি নই। আপনি যদি স্বেচ্ছায় না ওঠেন তাহলে আমি জানি কেমন করে বিনা সাহায্যে

আপনাকে হাঁটানো যায় ; আর সেই উপায়টি বার করতে কোন অসুবিধে হবে না আমার।

মেজরের কথা তাঁর কানে ঢুকেছে তাঁর চেহারা দেখে তেমন কিছু বোঝা গেল না। তিনি চুপচাপ পড়ে রইলেন। তাঁর সেই নিস্তব্ধতা চরম অপমানজনক মনে করে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে শেষ কথা বলে দিলেন : কাল সকালে আপনি যদি নিচে না নামেন···

এই বলে তিনি নেমে গেলেন।

বৃদ্ধ চাকরটি রীতিমত ভয় পেয়ে পরের দিন সকালে তাঁকে পোশাক পরানোর চেষ্টা করল ; কিন্তু উন্মাদিনী তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ভীষণভাবে চেঁচাতে লাগলেন। অফিসারটি এই শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন ; চাকরটি তাঁর পায়ের কাছে বসে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল : উনি নামবেন না, মঁসিয়ে, ওঁকে নামানো যাবে না। ওঁকে আপনি ক্ষমা করুন—হতভাগিনী উনি।

রাগ হওয়া সত্ত্বেও, সেনানীটিও বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাঁকে জোর করে টেনে বিছানা থেকে নামানোর জন্যে সৈন্যদের কোন নির্দেশ তিনি দিলেন না ; কিন্তু তারপরেই তিনি হাসতে লাগলেন, এবং সৈন্যদের জার্মান ভাষায় কী সব নির্দেশও দিলেন। অনতিবিলম্বে কয়েকজন সেনানী একটা বড় মাদুর নিয়ে ওপরে হাজির হল। মনে হবে তারা যেন কোন আহতকে মাদুর চাপা দিয়ে নিয়ে আসছে। সেই বিছানায় উন্মাদিনী চুপ করে পড়েছিলেন। যতক্ষণ তাঁরা তাকে স্পর্শ করে নি ততক্ষণ তিনি উদাসীনভাবে চুপচাপ শুয়েছিলেন। তাঁর পেছনে একটি সেনানী এক বাণ্ডিল মহিলাদের পরিধেয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসারটি হাতটি ঘষে বললেন : আমরা এখনই দেখতে চাই আপনি নিজেই পোশাক পরে একটু হাঁটতে রাজি রয়েছেন কি না।

এবং তারপরেই দলটি বনের দিকে বেরিয়ে গেল। দু ঘণ্টা পরে তারা আবার ফিরে এল। সেই উন্মাদিনীর কী হল তা কেউ জানলো না। তারা তাঁকে নিয়ে কী করল ? কোথায় তারা তাঁকে রেখে এল ? কেউ তা আজও জানে না।

দিনরাত্রি ধরে বরফ পড়তে সুরু করল। গাছ-পালা-মাঠ-ঘাট সব বরফের আস্তরণে চাপা পড়ে গেল ; নেকড়েগুলো বেরিয়ে এসে আমাদের ঘরের আশে-পাশে চীৎকার করতে লাগলো।

সেই হতভাগিনী নিরুদ্দিষ্টা রমণীর চিন্তাটা আমাকে অস্থির করে তুলল। তাঁর সংবাদ জানার জন্যে প্রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আমি আর্জি পেশ করেছিলাম ; এর জন্যে আমি তাদের হাতে গুলি খেতে-খেতে বেঁচে গিয়েছি। বসন্ত কাল এল। অবরোধবাহিনী আমাদের শহর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িটির দরজা খোলা হল না। বাড়ির চত্বরটি

বিরাট-বিরাট ঘাসের জঙ্গলে বোঝাই হয়ে গেল। শীতকালে বৃদ্ধ চাকরটি মারা গিয়েছে। কেউ আর বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামায় নি। আমিই কেবল ভুলতে পারি নি ব্যাপারটা। তারা মহিলাটিকে নিয়ে করল কী? তিনি বনের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন? কেউ কি তাঁকে পেয়ে তাঁর কোন সংবাদ বার করতে না পেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁকে? কোন সম্ভাবনাই আমাকে আশ্বস্ত করতে পারে নি। একমাত্র সময়ই ধীরে-ধীরে আমার সেই অশান্তি দূর করতে পেরেছিল।

তারপর শরৎকাল এল। অসংখ্য বন-মোরগে ছেয়ে গেল চার পাশ। বাতের বেদনা তখন আমার কিছুটা কমেছে। আমি কষ্টেসৃষ্টে বন পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। চার-পাঁচটা লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখি আমি শিকার করলাম; তাদের ভেতরে একটা পড়ল ডালপালায় ঢাকা খানার মধ্যে। সেটাকে কুড়িয়ে আনার জন্যে আমি সেই গর্তে নামতে বাধ্য হলাম। মনে হয়, আমি একটা মানুষের মাথার খুলির ওপরে পা মাড়িয়ে দিলাম। ঠিক সেই সময়েই কেন জানি নে, সেই উন্মাদিনীর স্মৃতিটা আমার বুকে এসে লাগলো। সেই ভয়ঙ্কর বছরে অনেকেই ওই অরণ্যে প্রাণ দিয়েছে। কেন জানি নে, তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ যে আমি সেই হতভাগ্য উন্মাদিনীর মাথার খুলিটাই মাড়িয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ মনে হল, আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেই শীতল পরিত্যক্ত অরণ্যে মাদুরের ওপরে তাঁকে রেখে তারা চলে এসেছিল; এবং বাতিকগ্রস্ত হওয়ার ফলে, সেই মোটা অথচ হালকা বরফের আবরণের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছেন। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে একটুও চেষ্টা করেন নি তিনি।

তারপরে নেকড়েরা এসে তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। পাখিরা তাঁর সেই ছেড়া বিছানা থেকে উল খুলে নিয়ে তাদের বাসা বেঁধেছে। তাঁর দেহের ধ্বংসাবশেষ-টুকু আমি কুড়িয়ে নিলাম। আমি কেবল এইটুকুই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন আর যুদ্ধ দেখতে না হয়।

কুমারী কোকোতী

(Madmoiselle Cocotte)

পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে আসব এমন সময় একটি লোককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাইরে উঠোনের একটি কোণে লোকটি দাঁড়িয়েছিল—লম্বা রোগাটে চেহারা। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটি কাল্পনিক কুকুরকে বেশ জোরে-

জোরে হাত-পা নাড়িয়ে সে ডাকছিল। বেশ মিষ্টি স্বরে দরদ মিশিয়ে সে ডাকলো: 'কোকোতী আমার আদরের কোকোতী—এস, আমার কাছে এস, সুন্দরী এস।' কোন জন্তুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে মানুষে যেমন করে মাটির ওপরে পা ঠুকে শব্দ করে সে-ও সেই রকম মাটিতে পা ঠুকছিল। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম: ওর কী হয়েছে?

তিনি বললেন: তেমন কিছু নয়। ছেলেটার নাম ফ্রাঙ্কয়; পেশায় ছিল ও সহিস। ওর কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছিল ও। সেই থেকে ওর মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে।

চাপ দিলাম আমি: বলুন না ওর গল্পটা। অতি সাধারণ জিনিসও মাঝে-মাঝে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

গল্পটা শুনলাম সেদিন।

প্যারিসের শহরতলীতে একটি মধ্যবিত্ত সংসার বাস করতো। সেন নদীর ধারে একটি পার্কের মধ্যে একটি আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভিলাতে তাঁরা থাকতেন। তাঁদের সহিস ছিল এই ফ্রাঙ্কয়। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, চাল-চলনে কিছুটা গাঁইয়া, হৃদয়টা বড় মিষ্টি; কিন্তু সরল; আর সরল বলেই বোধ হয়, সহজেই সে ঠকে যেত।

একদিন সন্ধ্যের সময় সে প্রভুর বাসায় ফিরছিল এমন সময় একটা কুকুর তার পিছু নিল। প্রথম দিকে ব্যাপারটা সে আমলই দেয় নি; কিন্তু তারপরে তার পেছনে-পেছনে একটানা আসার জিদ দেখে সে কুকুরটার দিকে ফিরে তাকালো। সে তাকিয়ে দেখলো কুকুরটা তার পরিচিত কিনা। না; এরকম কুকুর আগে কোন দিন তার চোখে পড়ে নি।

কুকুরটা ভীষণ রোগা, ক্ষুধার্ত। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। পেছনের দুটো পায়ের পেছনে লেজটা ঢুকিয়ে, কান দুটো মাথার ওপরে চাপিয়ে সে করুণ দৃষ্টিতে তার পিছু-পিছু আসছিল। সে যখন থামছিল তখন কুকুরটাও থামছিল; সে যখন চলছিল তখন কুকুরটাও আবার চলতে সুরু করছিল।

সেই কঙ্কালসার প্রাণীটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সে চেষ্টা করল: যা, যা—পালা-পালা, যা-ও! হাউ-হাউ! মাদী কুকুরটা কিছুটা পেছিয়ে যায়; একটু বসে; আবার যখন সহিসটি সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে যায় তখন সে-ও উঠে তার পিছু নেয়। সে মাটি থেকে ইট কুড়িয়ে তার দিকে ছোঁড়ার ভাণ করে; কুকুরটা কাঁপতে-কাঁপতে বেশ কিছুটা পিছিয়ে যায়; সে যখন এগোতে সুরু করে তখন কুকুরটাও যথারীতি তার পিছু নেয়।

হঠাৎ দয়া হয় সহিসের। সে কুকুরটাকে কাছে ডাকে। কুকুরটা ভয়ে-ভয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে, পিঠটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে দেয়। চামড়ার ভেতর থেকে তার সব পাঁজরাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। সহিস তার সেই বাইরে বেরিয়ে আসা পাঁজরাগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে দেয়; তারপরে তার

দুঃখে অভিভূত হয়ে বলে : তাহলে আয় আমার সঙ্গে। সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা মনের আনন্দে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দেয়। সে বুঝতে পারে লোকটি তাকে আশ্রয় দিয়েছে, গ্রহণ করেছে তাকে : এখন আর সে তার মনিবের পিছনে নয় ; এবার সে মনিবের সামনে-সামনে দৌড়তে লাগলো।

সহিসটি আস্তাবলে তার জন্যে খড়ের বিছানা পেতে দিল ; তারপরেই রান্নাঘরে ছুটলো কিছু রুটি আনতে। পেট ভরে রুটি খেয়ে কুকুরটা কুঁকড়ি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সহিস ব্যাপারটা তার মনিবকে জানালো। আস্তাবলে কুকুরটাকে থাকতে দিতে তিনি রাজি হলেন। সত্যিকার ভাল কুকুর, বুদ্ধিমতী, বিশ্বাসী, স্নেহশীল এবং ভদ্র।

কিন্তু শীঘ্রই সকলে লক্ষ্য করল এই কুকুরটির একটি বড় দোষ রয়েছে। প্রেমময়ী নারী সে ; শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সে প্রত্যেককে প্রেম বিতরণ করে চলেছে। অনতিবিলম্বেই দেখা গেল ওই অঞ্চল এবং তার আশেপাশের তাবৎ সারমেয়দের সঙ্গে তার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ; এবং তারাও এই নারীটির প্রেমে মুগ্ধ হয়ে দিনরাত্রি এই বাড়িটির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারবণিতার উদাসীনতা নিয়ে সকলের সঙ্গেই সে প্রিয়তমের মত ব্যবহার করছে। ফলে তার স্তাবকদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে ; সেই দলের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ চেহারার কুকুর-ও যেমন রয়েছে তেমনি আবার এমন সব কুকুরও রয়েছে যাদের চেহারা গাধার মত। এই বিরাট স্তাবক-বাহিনীদের নিয়ে সে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো ; যখন সে কোন বৃক্ষছায়ায় ঘুমোত তখন এই বাহিনীই চারপাশে ঘিরে তাকে পাহারা দিত ; আর মাঝে-মাঝে তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে জিব বার করে লালা ঝরাতো। সন্ধ্যাকালে কুকুরটি যখন তার আস্তাবলে ফিরে আসতো, এরাও তার পিছু-পিছু এসে বাড়িটিকে অবরোধ করে থাকতো। পার্কের সমস্ত অলিগলির মধ্যেই ছড়িয়ে থাকতো তারা, পা দিয়ে গর্ত খুঁড়তো, গাছ নষ্ট করতো ; ফুল ছিঁড়তো। মালি তো ওদের অত্যাচারে চটে লাল হয়ে যেত। কেবল কি তাই ? সারা রাত্রি ধরে তারা তাদের প্রিয়তমার অদর্শন সহ্য করতে না পেরে তার-স্বরে চেঁচাতো। কিছুতেই তাদের তাড়ানো যেত না। দিনের বেলাতেও তারা ঘরের মধ্যে ঢুকে সবাইকে তটস্থ করে তুলতো। সিঁড়িতে, রান্নাঘরের উঠোনে, ঘরের দাওয়ায়,—কোথায় নেই তারা ? দশ মাইলের ভেতর যত পরিচিত আর অপরিচিত কুকুর ছিল সবাই এখানে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসলো।

এর পরেও ফ্রান্কয় কিন্তু কোকোতীকে ভালবাসতো খুব। সে বারবার বলতো—এতো কুকুর নয় ; মানুষ। কেবল কথা বলতে পারে না—এই যা।

একটা বেশ ভাল লাল চামড়ার বকলেশ তৈরী করিয়ে তার সঙ্গে একটা

তামার চাকতি দিল জুড়ে; তাতে খোদাই করিয়ে আনলো: "ম্যাদমোয়সেল কোকোতী; সহিস ফ্রাঙ্কয়-এর সম্পত্তি।"

বিরাট চেহারা হয়ে গেল কোকোতীর। একদিন যেমন রোগা ছিল, তেমনি মোটা হয়ে গেল সে। হঠাৎ মুটিয়ে যাওয়ার ফলে সে আর ভাল করে দৌড়তে পারতো না। অল্পেতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, নিঃশ্বাস নিত হাঁ করে। বছরে চারবার সে বাচ্চা দিত। সারমেয় জাতীয় নানান শ্রেণীর বাচ্চাতে গিজগিজ করত চারপাশ। দুধ খাওয়ানোর জন্যে একটা মাত্র বাচ্চাকে তার কাছে রেখে অন্যগুলোকে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে সে নদীর ধারে নিয়ে যেত; তারপরে নির্মমভাবে তাদের নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এতদিন তো মালি চেঁচাচ্ছিল। এবারে রাঁধুনী চেঁচাতে সুরু করল। রান্নাঘরের ভেতরে কুকুর ঢুকতে সুরু করেছে, কাবার্ডের নিচে, কয়লা রাখার কুঠরীতে, সর্বত্র তারা অবাধে বিচরণ করছে; আর যা পাচ্ছে তাই মুখে করে নিয়ে পালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো মনিবের। কোকোতীকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন ফ্রাঙ্কয়কে। নির্দেশ পেয়েই সে অস্থির হয়ে উঠলো। কোথায় তাকে রাখা যায় সেই কথাটাই সে ভাবতে লাগলো। কেউ তাকে রাখতে চাইল না। তখন সে ঠিক করল দূরের কোন জায়গায় সে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। একটি গাড়ির ড্রাইভারের জিম্মায় কোকোতীকে তুলে দিল সে। কথা রইল প্যারিসের অপরপারে গ্রামের মধ্যে সে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময়েই কোকোতী যথাস্থানে ফিরে এল।

আরও কড়া পন্থা নেওয়া হল। পাঁচটি ফ্রাঁ ঘুষ দিয়ে সে হাভ্রেগামী ট্রেনের একটি গার্ডের জিম্মায় তাকে তুলে দিল। ঠিক হল হাভ্রেতে পৌঁছিয়েই সে কোকোতীকে ছেড়ে দেবে।

তিন দিন পরে কোকোতী আবার স্বস্থানে ফিরে এল; এবারে সে বেশ অভুক্ত হয়েই ফিরে এসেছে; সেই সঙ্গে রোগাটে হয়েছে, হয়েছে পরিশ্রান্ত, আর ক্ষতবিক্ষত।

মনিবের মন গলে গেল; তিনি আর তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন না।

কিন্তু আবার তারা আসতে লাগলো—পাড়া-বেপাড়া থেকে রাজ্যের যত কুকুর; এবার আরও বেশী সংখ্যায়; তাদের চীৎকার, হম্বিতম্বি আরও গেল বেড়ে। একদিন সন্ধ্যায় বেশ বড় একটা ভোজের আসর থেকে একটা হুলো কুকুর রান্না করা একটা আস্ত মুরগী মুখে করে নিয়ে কেটে পড়ল, রাঁধুনী দেখল; কিন্তু প্রাণের ভয়ে কিছু করতে পারল না।

খবরটা পেয়ে মনিব ভীষণ চটে গেলেন; ফ্রাঙ্কয়কে ডেকে বললেন,

আগামীকাল সকালের মধ্যে জানোয়ারটাকে যদি তুমি ডুবিয়ে না মেরে ফেল তাহলে তোমার চাকরি যাবে। আমার কথাটা মাথায় ঢুকেছে?

এতটা আশা করে নি ফ্রাঙ্কয়। মনিবের কথা শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কুকুরটাকে ডুবিয়ে না মারার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়া অনেক ভাল এই ভেবে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করার জন্যে নিজের ঘরে গেল সে। তারপর সে ভাবল এই জানোয়ারটাকে পেছনে বেঁধে কোন জায়গাতে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ হবে না। তাছাড়া, এ বাড়িটা ভালই; খাওয়া পরার দিক থেকে সে ভালই আছে এখানে; মাইনেপত্তর-ও খারাপ নয়। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে ঠিক করল যে পরের দিন সকালেই সে কোকোতীকে নদীতে ডুবিয়ে মেরে ফেলবে।

রাত্রিতে সে একরকম ঘুমোতেই পারে নি। ভোরের দিকে সে উঠে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে কুকুরটার ঘরে গেল। কুকুরটা তার সাড়া পেয়ে দাঁড়ালো, গা নাড়ালো, হাত-পা ছড়িয়ে দিল; তারপরে তার মনিবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে সামনে এগিয়ে এল। ফ্রাঙ্কয় কেমন যেন হয়ে গেল। সে কুকুরটাকে আদর করতে লাগলো; গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে চুমু খেল তাকে—বুকে জড়িয়ে ধরল।

পাশের বাড়িতে ছ'টা বাজার শব্দ হতেই সে বাস্তব জগতে ফিরে এল।

'আয়'—

কুকুরটা তার পিছু-পিছু বেরিয়ে এল। বেচারী বুঝলো না কিছুই; ভাবলো মনিবের সঙ্গে সে বেড়াতে যাচ্ছে।

নদীর ধারে পৌঁছল তারা। ফ্রাঙ্কয় ঘুরে-ঘুরে এমন একটা জায়গায় হাজির হল যেখানে নদীর জল অনেক গভীর। দড়ির একটা অংশ সে কুকুরটার সুন্দর বকলেসের সঙ্গে বেঁধে দিল; আর একটা অংশে বাঁধলো একটা বিরাট পাথরের চাঙড়। তারপর সে আবার আদর করতে লাগলো তাকে। কুকুরটাও ল্যাজ নেড়ে জিব বার করে মনিবের আদর খেতে-খেতে আনন্দে গরগর শব্দ করতে লাগলো।

বার দশেক সে চেষ্টা করল তাকে জলে ফেলে দেওয়ার জন্যে; দশবারই সে পিছিয়ে এল। তারপরে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চোখ বুজিয়ে তাকে জাপটে ধরে জোর করে তাকে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল। প্রথমে কোকোতী সাঁতার কাটতে চেষ্টা করল; স্নানের সময় সে এমনি করেই সাঁতার কাটতো; কিন্তু পাথরের ভারে তার মাথাটা জলের তলায় ডুবে যেতে লাগলো। সে একবার করুণ দৃষ্টিতে তার মনিবের দিকে তাকালো—একেবারে মানুষের মত চাহনি—জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার সময় বাঁচার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে মানুষ শেষ বারের মত যে রকম করুণ চাহনি দিয়ে তাকিয়ে থাকে—এ-চাহনি সেই রকম। প্রথমে তার ওপরের অংশটা ডুবে গেল। তখনও তার পেছনের পা

ছুটি জলের ওপরে ছটফট করতে লাগলো। তারপরে ধীরে-ধীরে সব মিলিয়ে গেল জলের তলায়।

পাঁচ মিনিট ধরে জলের ওপরে বুদবুদ উঠতে লাগলো; মনে হল নদীর জল যেন ফুটছে। বিমর্ষভাবে অসীম বেদনার সঙ্গে ফ্রাঙ্কয় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে সে বাড়িতে ফিরে এল।

তখন সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে। এক মাস ধরে সে অসুস্থ হয়ে রইল; প্রতিটি রাত্রিতে সে দেখতো কুকুরটা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে আদর করছে, চাটছে তার হাত। গরগর করছে।

ডাক্তার ডেকে আনা হল: শেষকালে সেরে উঠলো ফ্রাঙ্কয়। তখন তার মনিব আর মনিব-পত্নী তাকে রাওনের কাছে তাঁদের যে জমিদারী রয়েছে সেইখানে নিয়ে গেলেন। সেইখানে বাড়ির চাকরের সঙ্গে সে রোজই প্রায় সেন নদীতে স্নান করতে যেতো, সাঁতার কাটতো—এপার ওপার হোত।

একদিন তারা দুজনে নদীর মধ্যে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল; হঠাৎ ফ্রাঙ্কয় চীৎকার করে তার সঙ্গীকে বলল: দেখ দেখ, কী একটা ভেসে আসছে। দাঁড়াও, আমি আজ তোমাকে কাটলেট খাওয়াব।

বিরাট একটা পশুর মৃতদেহ ভেসে আসছিল। ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে গিয়েছে তার দেহ। লোমগুলো উঠে গিয়েছে দেহ থেকে। ওপরের দিকে থাবাগুলো তুলে স্রোতের টানে তাদের দিকে ভেসে আসছিল দেহটা।

সেটার কাছে সাঁতরে গিয়ে ফ্রাঙ্কয় ঠাট্টা করে বলল: হায় ভগবান, এ যে বিশাল জন্তু হে। অনেকটা মাংস হবে।

তারপরেই সে পচা দেহটা থেকে নিজেকে একটু তফাতে রেখে সে দেহটা উলটে দিল।

তারপরে হঠাৎ সে চুপ করে গেল; অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল সেই দিকে, আবার সে এগিয়ে গেল। মনে হল দেহটাকে সে স্পর্শ করবে। সে বেশ ভাল করে বকলেসটা পরীক্ষা করল। তারপরে হাতটা বাড়িয়ে দিল। গলাটা তার ধরলো, তার দিকে দেহটা টেনে নিয়ে এসে দেখলো বকলেসের সঙ্গে একটা তামার পাত আঁটা রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে: "মাদমোয়সেল কোকোতী; সহিস ফ্রাঙ্কয়-এর সম্পত্তি।"

বাড়ি থেকে ষাট মাইল দূরে মৃত কোকোতী তার মনিবকে খুঁজে পেয়েছে।

চীৎকার করে উঠলো ফ্রাঙ্কয়; তাড়াতাড়ি তীরের দিকে সাঁতার কেটে পালিয়ে আসতে লাগলো সে। তীরে না ওঠা পর্যন্ত সে অনবরত চীৎকার করেছে। তীরে উঠেই উলঙ্গ হয়ে সে গ্রামের পথে ছুটতে লাগলো। আতংকে কাঁপতে-কাঁপতে সে ছুটলো। ততক্ষণে সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

একটি বড়দিনের গল্প

(A Christmas Tale)

স্মৃতিচারণা করতে-করতে ডঃ বোনো অর্দ্ধোচ্চারিতভাবে বললেন: "বড়দিনের গল্প—বড়দিনের কিছু স্মৃতি?"

তারপরে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: হ্যাঁ; মনে পড়েছে; কিন্তু ঘটনাটি বড় অদ্ভুত। আমি একটি অসম্ভব ঘটনা ঘটতে দেখেছি। ভদ্রমহিলাগণ, ঘটনাটি সত্যিই অলৌকিক—ঘটেছিল শুভ বড়দিনের রাত্রিতে।

আমার মত মানুষ যে অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না তার মুখ থেকে এই কথা শুনে নিশ্চয় আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন। আমি নাচার। আমি একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি—হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি—যাকে বলে সত্যিকার চোখ দিয়ে দেখা।

আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি কি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিলাম? না, তা নয়। কারণ আপনারা যে সব জিনিস বিশ্বাস করেন তাদের অনেকের ওপরেই আমার আস্থা নেই বটে, কিন্তু আমি প্রত্যয়ে বিশ্বাসী। আমি জানি এই প্রত্যয়ের বলে পাহাড় সরে পথ করে দেয় মানুষকে। আমার বক্তব্যটির পক্ষে আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি; তাতে আপনারা বিরক্ত হবেন: তাছাড়া, অনেকের মধ্যে পড়ে আমার এই কাহিনীটি তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলবে।

আমি তখন একটি গ্রামে ডাক্তারি করি; থাকি রোলেভিল শহরে—নরম্যানডি-তে। সে বছর বড় কড়া ধরনের শীত পড়েছিল। এক সপ্তাহ কুয়াসার পরে নভেম্বর মাসের শেষাশেষি তুষারপাত সুরু হল। উত্তর থেকে বিরাট-বিরাট তুষার-মেঘ পাক খেয়ে-খেয়ে এগিয়ে আসতে অনেক দূর থেকেই মানুষে দেখেছিল। তারপরে সুরু হল মিহি গুঁড়োর মত সাদা সাদা তুষারপাত। এক রাত্রিতেই সমতল ভূমি ভরাট হয়ে গেল বরফে; গাছ-পালা বাড়ি-ঘর সব বরফের নিচে চুপচাপ ঘুমোতে লাগলো।

সেই নিস্তব্ধ গ্রামে কোথাও কোন শব্দ শোনা গেল না। কেবল দেখা গেল আকাশের গায়ে দল বেঁধে কাকের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে; খাদ্য অন্বেষণের বৃথা চেষ্টায় তারা মাঝে-মাঝে নিচে নেমে আসছে; আর তাদের লম্বা-লম্বা ঠোঁট-গুলি বরফের মধ্যে খোঁচাচ্ছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, এইমাত্র বরফ পড়ার নিরবিচ্ছিন্ন সাঁই-সাঁই মিহি শব্দ ছাড়া। মাটির ওপরে পাঁচ ফুট পুরু বরফের স্তর জমে উঠলো।

মনে হল সব মৃত—সমতলভূমি, ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা—যেখানে যা কিছু রয়েছে ঠাণ্ডা বরফের নিচে সমাধিস্থ হয়েছে সকলের। না মানুষ, না জন্তু—

বাইরে বেরোতে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেবল চিমনীর ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে কুয়াশাসদৃশ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই থেকেই মনে হয় মানুষ এখনও বেঁচে রয়েছে। মাঝে-মাঝে গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে —মনে হচ্ছে, চালের তলায় গাছের কোন অঙ্গ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। মানুষের বিচ্ছিন্ন বসতিগুলি দেখে মনে হচ্ছে সেগুলির মধ্যে দূরত্ব একশ মাইলের কাছা-কাছি। যে যেভাবে পারে বেঁচে রয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে বরফে ঢাকা গর্তের মধ্যে পড়ে সমাধিস্থ হওয়ার দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে আমিই কেবল কাছাকাছি রোগীদের বাড়িতে প্রয়োজনমত যাতায়াত করতে লাগলাম।

অনতিবিলম্বেই বুঝতে পারলাম সারা অঞ্চলে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সকলের ধারণা এ ধরনের আতঙ্ক ঠিক স্বাভাবিক নয়। রাত্রিতে তাদের মনে হোত কে বা কারা যেন জোরে শিস দিচ্ছে, চীৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। ওই শব্দগুলি আমি জানি রাত্রিতে যে সব বিদেশী পাখিরা উড়ে-উড়ে দূর থেকে দূরান্তে চলে যায় বা শীতের আকর্ষণে গাঁয়ের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে যায় তাদেরই। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের যুক্তি দিয়ে তো সেকথা বোঝানো যায় না। আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তারা; একটা অলৌকিক ঘটনার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বৃদ্ধ ভ্যাটিনেলের কামারশালা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে—বড় রাস্তার ওপরে—যে রাস্তা বরফে ঢেকে যাওয়ার ফলে অদৃশ্য আর পরিত্যক্ত হয়েছে। চারপাশ বরফে ঢেকে গিয়েছে বলে তো আর মানুষ না খেয়ে বসে থাকতে পারে না।—সেই খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কামার একদিন গ্রামের ভেতরে যাবে ঠিক করল। যেখানে সে গেল সেটাই হচ্ছে গ্রামের কেন্দ্র; ছটি বসতবাড়ি সেখানে রয়েছে। সেখান থেকে সে রুটি সংগ্রহ করল; সেই সঙ্গে সংগ্রহ করল ওই ছোট্ট সংবাদটি—যে ভয়ের সংবাদ চার পাশের মানুষদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই দুটি জিনিস সংগ্রহ হওয়ার আগেই সে বাড়ির দিকে যাত্রা করল।

হঠাৎ একটা বেড়া পেরোনোর সময় তার মনে হল বরফের ওপরে সে একটা ডিম পড়ে থাকতে দেখেছে। হ্যাঁ ডিমই তো; পৃথিবীর সব ডিমের মতই সাদা। সে ঝুঁকে পড়ে দেখল; হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিম-ই; ডিম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এটা এল কোথা থেকে? কার বাড়ির মুরগী বেরিয়ে এসে এখানে ডিম পেড়ে গেল? একটু আশ্চর্যই হল কামার। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো না তার। কিন্তু সে এটা কুড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীর কাছে হাজির হল।

দেখ, এই ডিমটা আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

তার স্ত্রী মাথা নাড়লো: রাস্তার ওপরে ডিম? আর এই আবহাওয়ায়? নেশা করেছ মনে হচ্ছে?

না গো না। বেড়ার ধারে পড়েছিল। জমে ঠাণ্ডা হয়ে যান নি। দেখ, এখনও গরম রয়েছে। নাও, ধর। যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না যায় এই জন্যে বুকের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। রাত্রে এটাকে খেয়ে ফেলো।

যে পাত্রে করে ঝোল রান্না হল সেই লোহার পাত্রে চকচকে ডিমটাকে রাখা হল। গ্রাম থেকে যে অস্বস্তিকর সংবাদটা সে শুনে এসেছে সেই কথাটা কামার তার স্ত্রীকে শোনালো; মহিলা বিবর্ণ মুখে কাহিনীটি শুনতে-শুনতে চমকে উঠলো।

কাহিনীটি শুনে মহিলাটি বলল: অবশ্য ওই রকম শিসের শব্দ আমিও শুনেছি; কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম চিমনীর শব্দ ওটা।

তারপরে তারা খেতে বসলো; প্রথমে খেল স্যুপ; তারপরে যখন স্বামীটি রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল তখন তার স্ত্রী সেই ডিমটি হাতে তুলে নিল; বেশ সন্দেহের সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করতে লাগলো। তার পরে জিজ্ঞাসা করল: যদি এই ডিমের মধ্যে অন্য কিছু থাকে?

কী থাকতে পারে?—প্রশ্ন করল কামার।

কী করে জানব?

ওসব আলতু-ফালতু না ভেবে খেয়ে নাও তো। বোকার মত বকো না।

ডিমটাকে ছাড়িয়ে ফেলল মহিলাটি। অন্য ডিমের মতই এর চেহারা, বেশ টাটকা। ডিমটা মুখে দিতে গিয়ে একটু দ্বিধা করল; একটু কামড়ালো; আবার চাখলো।

কামারটি জিজ্ঞাসা করল: কেমন লাগছে খেতে?

কোন উত্তর না দিয়েই ডিমটি খেয়ে ফেলল তার স্ত্রী। তারপরে হঠাৎ সে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল; তার চোখে তখন কোন পলক ছিল না; একটা আতঙ্কের ছাপ সেই দৃষ্টির ওপরে ফুটে বেরিয়েছে। তারপরে দুটো হাত ওপরে তুলে, একটু ঘুরিয়ে, মোচড় দিতে-দিতে পাক খেতে লাগলো; পা-থেকে মাথা পর্যন্ত সারা দেহটা তার কাঁপতে লাগলো; তার পরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে-দিতে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। সারা রাত্রি ধরে এইভাবে সে ছটফট করতে-করতে ভয়ঙ্কর আর্তনাদে চারপাশ কাঁপিয়ে তুলল; শরীরের কাঁপুনিতে অস্থির হয়ে উঠলো বেচারী। সে ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগলো: এইখানে—দেহের এইখানে যন্ত্রণা হচ্ছে।

পরের দিন ডাক পড়ল আমার। শরীরের বেদনা উপশম করার জন্যে যত রকমের ওষুধ আমার জানা ছিল সেগুলি দিলাম আমি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে তখন উন্মাদ। তারপরে প্রচুর তুষারপাতের ফলে পথ দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও, সেই সংবাদ, সেই অদ্ভুত সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো: 'কামারের বউকে ভূতে ধরেছে।' চারপাশ থেকে তারা দলে-দলে আসতে লাগলো; ঘরের ভেতরে ঢুকতে কেউ সাহস পেল না; বাইরে দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে সেই হতভাগ্য রমণীটির প্রাণঘাতী আর্তনাদ শুনলো ; সেই আর্তনাদ এতই তীব্র যে তারা ভাবতেই পারলো না রক্তমাংসের কোন মানুষ ওই রকম শব্দ করতে পারে।

গ্রামের পাদরীকে ডেকে আনা হল। সাদাসিদে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তিনি। পরনে তাঁর যাজকের শ্বেতশুভ্র বহির্বাস ; মৃত্যুপথযাত্রীদের কাছে পুত-মন্ত্র উচ্চারণ করার ভঙ্গিমায় তিনি রোগীর সামনে এসে দাঁড়ালেন ; তারপরে দুটি হাত প্রসারিত করে তিনি ভূত-ছাড়ানোর মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ; আর চারজন লোক সেই রমণীটিকে বিছানার ওপর ধরে রইল ; তার মুখ দিয়ে তখন গ্যাঁজলা বেরিয়ে শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে।

বড়দিন এগিয়ে এল। কোন পরিবর্তন হল না আবহাওয়ার। ক্রীসমাস ইভ-এর সকালে পাদরী আমার কাছে এসে বললেন : আমি ভাবছি, এই হতভাগিনী রমণীটিকে আজকে প্রার্থনা সভায় নিয়ে যাব। যে-মুহূর্তে নারীর গর্ভ থেকে ভগবান ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সেই শুভ মুহূর্তেই হয়ত তিনি কোন অলৌকিক স্পর্শ দিয়ে এই হতভাগিনীকে রোগমুক্ত করবেন।

আমি বললাম : আপনার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। এই পবিত্র প্রার্থনার প্রভাব যদি তার ওপরে পড়ে সত্যিই তাহলে অন্য ওষুধ না খেয়েই সে সেরে যাবে।

বৃদ্ধ পাদরী বললেন : ভগবানের অলৌকিক তত্ত্বে তোমার আস্থা নেই, ডাক্তার। তবু, আশা করি তুমি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবে। করবে না ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—প্রতিজ্ঞা করলাম।

সন্ধ্যা এল ; তারপরে এল রাত্রি। গির্জায় ঘণ্টা বাজতে লাগলো ; সেই পরিত্যক্ত জমাট-বাঁধা বরফের মরুভূমির ওপরে সেই ধ্বনি করুণ আর্তিতে চার-পাশে ছড়িয়ে পড়লো। সেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনে কালো মূর্তিগুলি ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গির্জার দিকে আসতে লাগলো। আকাশ থেকে পূর্ণচন্দ্র তার ম্লান কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে সেই কুয়াসাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত বরফের আস্তরণের ওপরে। চারটি বলিষ্ঠ লোক নিয়ে আমি কামারশালার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সেই ভূতে-পাওয়া রমণীটিকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ক্রমাগত চীৎকার করছিল সে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ উপেক্ষা করেই সবাই মিলে তাকে পোশাক পরালো ; তারপর তাকে বয়ে নিয়ে গেল সেই গির্জায়। সেই শীতল আলোকোজ্জ্বল গির্জা লোকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ; একভাবে গায়কদল গান গেয়ে চলেছে। বিশ্বাসীদের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গির্জার সহকারীর ঘণ্টাটা টুং টাং করে বাজছে। গির্জার রান্নাঘরে সেই উন্মাদ রমণীটিকে আমি বন্ধ করে রেখেছিলাম, উপযুক্ত সময়ে আমি তাকে বার করে আনবো।

খৃষ্টের ভোজ সংক্রান্ত উৎসব শেষ হওয়ার পরেই তাকে বার করে আনার

সিদ্ধান্ত ছিল আমার। শান্ত পরিবেশের মধ্যে পাদরী তাঁর ভজনা শেষ করলেন। উপস্থিত সকলে নত মস্তকে গভীর শ্রদ্ধা আর ভক্তির সঙ্গে ভগবানের আশীর্বাদ গ্রহণ করল; ঠিক সময় আমার নির্দেশে চারজন সেই উন্মাদিনীকে নিয়ে এল।

চারপাশে আলোর জ্যোতি দেখে, সমস্ত মানুষকে নতজানু হয়ে বসে থাকতে দেখে, আর গায়কদের গান গাইতে দেখে সে আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করলো; আমরা সতর্ক না থাকলে, হাত ফসকে হয়ত পালিয়েও সে যেত; কিন্তু তা পারল না; বুকফাটা তীব্র চীৎকারে সে ফেটে পড়লো; সেই চীৎকার গির্জায় সমবেত সকলের হৃদয় আপ্লুত করে তুললো। সবাই অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নিচু করে রইলো: কেউ-কেউ পালিয়েও গেল। তাকে দেখে মনে হল না যে মানবদেহ ধারিণী কোন রমণী সে; সে মেঝের ওপরে শুয়ে শুয়ে পাক খেতে লাগলো, হাত-পা মুড়তে লাগলো; বাঁকাতে লাগলো দেহটা; মুখটা গেল লম্বা হয়ে, দৃষ্টি তার উন্মাদিনীর মত। তারা তাকে 'কয়ার'-এর সিঁড়ির কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে ধরে মাটিতে শুইয়ে রাখলো।

পাদরী উঠলেন। অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সবাই শান্ত হলে তিনি সোনার বন্ধনী দিয়ে বাঁধা ধর্মগ্রন্থটি তুলে নিলেন, সেই গ্রন্থের ওপরে, ঠিক মাঝখানে, কিছুটা সাদা আঁটা লাগানো রয়েছে। সেইটি দুহাতে ধরে তিনি কয়েকটি ধাপ এগিয়ে এলেন, মাথার ওপরে দুটি হাত প্রসারিত করে সেই উন্মাদিনীর ভীতিবিহ্বল চোখের ওপর সেইটিকে ধরলেন। সেই চকচকে জিনিসটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ ধরে চীৎকার করল। পাথরে গড়া মূর্তির মত পাদরীও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সেইভাবে।

অনেকটা সময় এইভাবে কাটলো। মেয়েটি যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল; সে সেই গ্রন্থটির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল; অদ্ভুত প্রাণঘাতী কাঁপুনিতে কেঁপে-কেঁপে উঠলো; কিন্তু সেই কাঁপুনি বেশীক্ষণ রইল না; সে তখন চীৎকার করতে লাগলো; সেই আগের মত তীব্র, ভয়ঙ্কর। কিন্তু সেই চীৎকারও ধীরে-ধীরে কমে এল। আবার সুরু হল কিছুক্ষণ পরে।

মনে হল, চোখ দুটোকে কিছুতেই সে সরাতে পারছে না। সে এবারে গোঙাতে লাগলো। তার সেই শক্ত দেহটা শিথিল হয়ে এল, সে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লো। সমবেত জনতা একসঙ্গে মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে প্রণতি জানালো।

ভূতে-পাওয়া রমণীটি এবারে দ্রুতভাবেই চোখ নামাতে লাগলো আবার লাগলো ওপরের দিকে তুলতে। সে যেন কিছুতেই ভগবানের সামনে চোখ তুলে দাঁড়াতে পারছে না। রমণীটি স্তব্ধ হয়ে গেল। এবং তারপরেই আমি লক্ষ্য করলাম তার চোখের পাতা দুটো বুজে এসেছে। সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে

পড়েছে—ক্ষমা করবেন—ধর্মযাজকের স্বস্তি উচ্চারণের বলে সে এখন ঘুমোচ্ছে।'

কামারের স্ত্রী চল্লিশটি ঘণ্টা একটানা ঘুমোল ; তারপরে সে জেগে উঠলো ; জেগে ওঠার পরে, পুরনো কথা তার একদম মনে ছিল না—না ভূতে পাওয়ার কথা, না মুক্তি পাওয়ার কথা। এইটিই সেই অলৌকিক কাহিনী যা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তিনি একটু বিরক্তির সুরেই বললেন : লিখে পড়ে একথা স্বীকার করতেও আমার আপত্তি নেই।

রাণী হর্টেনসী

(Queen Hortense)

আর্জেন্টিউলে লোকে তাঁকে রাণী হর্টেনসী বলে ডাকতো ; কেন ডাকতো তা কেউ জানে না। সম্ভবত, হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে সব সময় তিনি কড়া ভাষায় কথা বলতেন বলে ; তিনি বিশাল বপু, স্বাস্থ্যবতী ছিলেন বলে ; নাকি মেজাজটা তাঁর বেশ তিরিক্ষি ছিল সেই জন্যে। হয়ত, একপাল জন্তু জানোয়ার ছিল বলে—হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল, ক্যানারি দ্বীপের সুস্বর পাখি, বনটিয়া —বৃদ্ধাটির বড় প্রিয় ছিল এরা। কিন্তু ভদ্রমহিলা কোনদিনই এদের আদর দিয়ে নষ্ট করেন নি, কখনও এদের মিষ্টি কথায় সম্বোধন করেন নি। ভেলভেটের লোমে বোঝাই পুশী বেড়ালকে দেখে গৃহস্থ মহিলাদের মুখ থেকে যেরকম আদরের ডাক বেরিয়ে আসে সেরকম আদরের ডাক কেউ কোন দিন তাঁর মুখে শোনে নি। কঠোর হস্তে তিনি তাদের ওপরে প্রভুত্ব করতেন। রাজত্ব করতেন তিনি। আর সবাই তাঁর প্রজা।

ইনি সেই জাতীয়া বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন যাঁদের গলার স্বর বড়ই কঠোর, চাল-চলন কুৎসিত, যাঁদের হৃদয় বাইরে থেকে অতি নির্মম বলেই মনে হয়। চাকর-বাকর সব সময়েই তিনি কম বয়সী রাখতেন ; কারণ, যৌবনেই মানুষ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা অবনত করে। প্রতিবাদ বলুন, তর্ক বলুন, কেউ তাঁর মুখের ওপরে করলে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না ; আর সহ্য করতে পারতেন না দ্বিধা, ক্লান্তি, আলস্য অথবা ঔদাসীন্য। অভিযোগ অথবা কোন কাজে দুঃখ প্রকাশ করতে কেউ কোনদিন তাঁকে দেখে নি ; অথবা কাউকে তিনি হিংসা করেছেন এ-সংবাদও তাদের কাছে অজানা ছিল। ভাগ্যের ওপরে তাঁর আস্থা ছিল অগাধ ; তিনি প্রায়ই বলতেন, কপালে যা রয়েছে তা ভুগতেই হবে। কোন দিনই তিনি গির্জায় যান নি ; পাদরীদের কোন দিন

তিনি সমীহ করে চলেছেন একথা কেউ বলতে পারবে না; ভগবানে তাঁর কোন রকম বিশ্বাস ছিল না বললেই হয়; সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই শ্মশান-যাত্রীদের কলরব বলে তিনি অভিহিত করতেন।

তিরিশ বছর ধরে তিনি তাঁর ওই ছোট ঘরটাতে বাস করেছেন; ছোট বাগানটি তাঁর ঘরের দুয়ার থেকে রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় এতটুকু পরিবর্তন কেউ কোন দিন লক্ষ্য করে নি। একমাত্র পরিবর্তন করতেন পরিচারিকাদের—একুশ বছর বয়স হলেই তাদের তিনি নির্মমভাবে পরিত্যাগ করতেন। বৃদ্ধ হয়ে অথবা দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর পোষা কোন জন্তু জানোয়ার মারা গেলে তাঁর চোখে কোন দিন এক ফোঁটা জল-ও পড়ে নি; কোন দিন শোকও করেন নি তিনি; শূন্য স্থান পূরণ করার জন্যে নতুন জানোয়ার নিয়ে এসেছেন; ফুলের বিছানা পেতে তাদের কবর দিতেন; ছোট একটা কোদাল দিয়ে সেই গর্ত বুজিয়ে পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে তার ওপর দিয়ে পা মাড়িয়ে যেতেন।

সহরে তাঁর পরিচিতের সংখ্যা ছিল সামান্য; কিছু কেরাণীর দল রুজি-রোজগারের ধান্দায় যাদের প্রতিদিন প্যারিসে আসতে হোত। মাঝে-মাঝে গল্পগুজব করার আর চা খাওয়ার জন্যে তাঁকে তারা সন্ধ্যেবেলায় তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতো, এই সব উপলক্ষ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়বেনই। বাড়ি ফেরার জন্যে তারাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে তুলে দিতে বাধ্য হোত। কি দিন, কি রাত—ভয় কাকে বলে তা তিনি জানতেন না; এবং পথের সঙ্গী হিসাবে কাউকেই তিনি সঙ্গে নিতেন না। শিশুদের ওপরে তাঁর কোন স্নেহ ছিল বলে মনে হয় না।

ছুতোরের কাজ, বাগান কোপানোর কাজ, কাঠ কাটা বা চেরাই করার কাজ, পুরনো ঘর সারানোর কাজ প্রভৃতি পুরুষেরা যা করে থাকে সেই সব কাজই তিনি করতেন; প্রয়োজন হলে এমন কি রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেও তিনি পিছপাও হতেন না।

তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন যাঁরা তাঁকে বছরে দুবার দেখতে আসতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দুটি বোন, মাদাম সিমী আর মাদাম কলামবেল; দুজনেই বিবাহিতা; একজন বিয়ে করেছেন এক ওষুধের গাছ-গাছড়া বিক্রেতাকে; আর একজনের স্বামী সামান্য রোজগারপাতি করতেন; মাদাম সিমীর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না; মাদাম কলামবেলের ছিল তিনটি ছেলে; হেনরী, পলিন, আর যোশেপ। হেনরির বয়স একুশ, পলিনের সতের; আর যোশেপের বয়স মাত্র তিন; যে বয়সে মেয়েরা সন্তান উৎপাদন করার শেষ ধাপে হাজির হয় এই সেই প্রান্তিক বয়সের সন্তান। এঁদের সঙ্গে ভদ্র মহিলার সত্যিকার কোন রকম নাড়ির সম্পর্ক ছিল না।

১৮৮২ সালে বসন্ত কালে রাণী হর্টেনসী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রতি-

বেশীরা ডাক্তার নিয়ে এল ; তিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। পাদরী এলেন ; তাঁকে দেখেই তিনি বিছানা থেকে উঠে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে তাড়া করলেন তাঁকে। বাচ্চা পরিচারিকাটি কাঁদতে-কাঁদতে গাছ-গাছড়া সেদ্ধ করে তাই দিয়ে চা বানিয়ে খাওয়ালো।

তিন দিন বিছানায় পড়ে থাকার পরে তাঁর অবস্থা এতখানি খারাপের দিকে এগিয়ে গেল যে ডাক্তার নিজের দায়িত্বেই তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন ; তারপরে ভদ্রমহিলার প্রতিবেশী একজন ছুতোর মিস্ত্রীকে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সংবাদ দিতে পাঠালেন।

বেলা দশটা নাগাদ তাঁর পূর্বোক্ত দুটি বোন স্বামীদের সঙ্গে নিয়ে ছুতোরের সঙ্গে একই ট্রেনে চেপে হাজির হলেন। যোশেপ ছাড়া ছেলেরা আর কেউ আসে নি।

বাগানের মধ্যে ঢুকেই তাঁরা দেখলেন দেওয়ালের পাশে একটি চেয়ারের ওপরে বসে-বসে পরিচারিকাটি কাঁদছে, সদর দরজার কাছে মাদুরের ওপরে শুয়ে কুকুরটা ঘুমোচ্ছে ; বিড়াল দুটি দেখলেই মনে হবে মরে গিয়েছে, জানালার ধারে পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটি তাদের বোজানো। বিরাট একটা মুরগী হলদে পালকে ঢাকা একপাল বাচ্চা নিয়ে কঁক-কঁক করে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো বিরাট একটা খাঁচার মধ্যে বসন্তের সকালে গরম রোদে এক ঝাঁক পাখি মনের আনন্দে গান ধরেছে। ছাউনি-দেওয়া ছোট একটা খাঁচায় দুটি পাখি দাঁড়ের ওপরে গায়ে গা লাগিয়ে চুপচাপ রয়েছে বসে।

মঁসিয়ে সিমী বিরাট চেহারার মানুষ ; শাঁ-শাঁ করে হাঁটেন। প্রয়োজন মত সব সময় তিনি সামনের লোককে হটিয়ে দিয়ে হই-হই শব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসেন। বাগানের গেট দিয়ে ঢুকেই তিনি পরিচারিকাকে সম্বোধন করে বললেন : ব্যাপার কী সিলেসতি। অবস্থা খুব খারাপ নাকি ?

বাচ্চা পরিচারিকাটি চোখের জলে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল : আমাকেও আর চিনতে পারছেন না। ডাক্তার বলেছে এ যাত্রা আর নয়।

তাঁরা সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মাদাম সিমী আর মাদাম কলামবেল মুখে কিছু না বলে পরস্পরকে তৎ-ক্ষণাৎ জড়িয়ে ধরলেন।

মাদাম সিমী তাঁর ভায়রা ভাই-এর দিকে ফিরে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখের রঙ বিবর্ণ, হলদে। চেহারা শীর্ণ ; সব সময় অজীর্ণ রোগে ভুগছেন ; বেশ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরভাবেই সিমী বললেন : এবার চলুন।

মরণাপন্ন ভদ্রমহিলাটি তাঁর একতলার একটি ঘরে শুয়েছিলেন। সিমীর কথা শোনার পরে কেউ সে ঘরে ঢুকতে সাহস করলেন না। সকলকে তাঁর

আগে ঘরে ঢোকার জন্যে সিমী দরজা ছেড়ে দিলেন। প্রথমে মনোস্থির করলেন কলামবেল। মেঝের ওপরে ছড়ি ঠুকতে-ঠুকতে জাহাজের মাস্তুলের মত কেঁপে-কেঁপে তিনি প্রথমে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রমহিলা দুটি ঢুকলেন তাঁর পেছনে। সকলের শেষে মঁসিয়ে সিমী।

কুকুর দেখে আকৃষ্ট হয়ে বাচ্চা যোশেপ ঘরের বাইরে রয়ে গেল।

বিছানার ওপরে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছিল; সেই আলোতে দেখা গেল দুটি হাত ক্লান্তভাবে নড়ছে, একবার মুঠি করছে, একবার ছড়িয়ে দিচ্ছে। হাতের কম্পন দেখে মনে হল তাদের শায়িতা রমণীটি মনের কোন একটি অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে চায়—কোন অকথিত বাণীকে প্রকাশ করতে চায় ইঙ্গিতে। চাদরের তলায় ঢাকা দেহের বাকি অংশটার মধ্যে কোন রকম কম্পন নেই, চোখ দুটি বোজানো।

কোন কথা না বলে, আত্মীয় স্বজনরা অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রইলেন; শায়িতা রমণীটির ছোট-ছোট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করলেন। বাচ্চা পরিচারিকাটিও চোখের জল মুছতে-মুছতে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারবাবু ঠিক কি বলেছেন বলতো?—জিজ্ঞাসা করলেন সিমী।

পরিচারিকা তোতলাতে-তোতলাতে বলল: তিনি বললেন আমাদের আর করার কিছু নেই। ওঁকে একলা থাকতে দাও।

হঠাৎ বৃদ্ধার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। মনে হল, তাঁর সেই মরণোন্মুখ মাথার মধ্যে এমন কয়েকটি মূক কথা রয়েছে যেগুলি তিনি প্রকাশ করতে চান। তার হাতগুলিও অদ্ভুতভাবে নড়তে লাগলো। তারপরেই যা তাঁর কোনদিনই স্বভাব ছিল না—সেইভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি কিছু বলতে চাইলেন—সেই স্বর যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

দৃশ্যটি মর্মান্তিক বিবেচনা করে সিমী আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে ঘুরতে লাগলেন; ক্লান্ত হয়ে কলামবেল বসে পড়লেন। আগন্তুক মহিলা দুটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাণী হর্টেনসী বিড়বিড় করে কিছু বললেন; স্বর তাঁর বেশ মোটা লাগলো শুনতে। কী যে তিনি বলতে চাইলেন ঠিক বোঝা গেল না। মনে হল কিছু নাম তিনি উচ্চারণ করছেন—কয়েকজনকে বেশ নরম স্বরে ডাকছেন: ফিলিপ, আমার ফিলিপ, এস; মাকে চুমু খাও। তুমি তোমার মাকে ভালবাস তাই না? বোস, আমি বাইরে গেলে তুমি তোমার ছোট্ট ভাইটির দিকে লক্ষ্য রেখো। তাকে কখনও একা ছেড়ে দেবে না, বুঝেছ? আর বারণ করছি, কখনও দেশলাই-এ হাত দেবে না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বেশ জোরেই সুরু করলেন তিনি: হেনরিয়েটি! একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন: তোমার বাবাকে বলো অফিসে বেরোনোর আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যান। তারপরেই

হঠাৎ বলে উঠলেন : আমার শরীরটা আজ বিশেষ ভাল নেই। দেরী করবে না বলে প্রতিজ্ঞা কর। মনিবকে বলো যে আমি অসুস্থ। তুমি জান আমি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা কালে ছেলেমেয়েদের একলা ছেড়ে রাখা বিপজ্জনক। তোমার ডিনারের জন্যে আমি এক ডিশ ভাত আর চিনি রেখে দেব। বাচ্চারাও খুশি হবে খুব। ক্লেয়ার-ও খুশি হবে।

এই বলেই তিনি হাসতে লাগলেন—যৌবনের উচ্চকিত হাসি। এ-হাসি আগে কোন দিনই তিনি হাসেন নি। জঁার দিকে দেখ। জ্যাম মেখেছে গোটা গালে ; দুষ্টু কোথাকার।

কলামবেল এতক্ষণ ধরে খোঁড়া পা-টাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে মাঝে-মাঝে ঘুরে-ঘুরে বসছিলেন ; তিনি ফিস-ফিস করে বললেন : উনি স্বপ্ন দেখছেন যে ওঁর স্বামীপুত্র সংসার রয়েছে। শেষ হওয়ার আর দেরী নেই বলে মনে হচ্ছে।

দুটি বোন নড়াচড়া করলেন না ; মনে হল, তাঁরা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছেন ; অবাক নয়, একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন।

বাচ্চা পরিচারিকাটি বলল : আপনারা কি এবারে টুপী আর আলোয়ান খুলবেন ? অন্য ঘরে যাবেন ?

আর কোন কথা না বলে তাঁরা উঠে গেলেন। এবং কলামবেল মরণোন্মুখ মহিলাকে একা ঘরের মধ্যে ফেলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তাঁদের পিছু-পিছু চলে গেলেন।

পোশাক পরিবর্তন করার পরে মহিলারা আরাম করে বসলেন। একটা বিড়াল জানালা ছেড়ে উঠে এল, টান করে নিল শরীরটা, ঘরের ভেতরে লাফিয়ে পড়ে মাদাম সিমীর কোলের ওপরে উঠে বসলো। মাদাম তাকে আদর করতে লাগলেন।

পাশের ঘর থেকে মরণোন্মুখ মহিলাটির স্বর তাদের কানে আসতে লাগলো। মহিলাটি তখনও বেঁচে রয়েছেন। যে জীবনে বেঁচে থাকার এত আগ্রহ ছিল তাঁর সেই জীবনের একেবারে শেষ ধাপে তিনি পৌঁচেছেন। যে মুহূর্তে তার সব শেষ হয়ে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি সারা জীবনের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছিলেন।

বাইরে বাগানের ভেতরে মঁসিয়ে সিমী শিশু যোশেপ আর কুকুরটার সঙ্গে গ্রামের মধ্যে স্থূল বপুরা যেমন মনের আনন্দে খেলা করে তেমনি আনন্দে খেলছিলেন। মরণোন্মুখ মহিলাটির কথা চিন্তা করার মত সময় ছিল না তাঁর।

তারপরে হঠাৎ তিনি ভেতরে ঢুকে এসে পরিচারিকাকে বললেন : আমাদের জন্যে লাঞ্চের কোন ব্যবস্থা হবে কি ? আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে ?

খাওয়ার ব্যবস্থা হল—ওমলেট, একটুকরো করে ফিলেট, সেই সঙ্গে আলু,

পনীর আর কফি।

মাদাম কলামবেল তাঁর পকেট হাতড়ালেন : কিন্তু সিমী তাঁকে বাধা দিয়ে পরিচারিকাকে বললেন : তোমার কাছে নিশ্চয় কিছু টাকা রয়েছে।

আছে স্যার।

কত?

পনের ফ্রাঁ।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা কর। আমার খুব ক্ষিদে পাচ্ছে।

মাদাম সিমী এতক্ষণ পরিচ্ছন্ন সূর্যকিরণে সুন্দর ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন; আর দেখছিলেন দুটি পায়রাকে; তারা সামনের ছাদে বসে প্রেমালাপে মত্ত ছিল। এই দেখে ভগ্নমনোরথ হয়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন: এই রকম শোকাবহ ঘটনার জন্যে এইভাবে আসা সত্যিই কি দুর্ভাগ্যজনক। আজকের দিনে গ্রামে থাকতে পারলে কত আনন্দই না হোত।

তাঁর বোন কোন উত্তর দিলেন না; দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাঁটার কথা উঠতেই কলামবেল অভিযোগ করার ভঙ্গিতে বললেন : আমার পা দুটো ভীষণ টনটন করছে।

বাচ্চা যোশেপ আর কুকুরটা বাইরে তখন বেশ গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। একজন আনন্দে নাচছে, আর একজন ঘেউ-ঘেউ করে তার আনন্দ জানাচ্ছে। ফুলের বাগানের চারপাশে পাগলের মত ছুটে-ছুটে তারা লুকোচুরি খেলছে।

মরণোন্মুখ মহিলাটি একইভাবে তাঁর ছেলেমেয়েদের ডেকে চলেছেন, তাদের পক্ষে কল্পনায় কথা বলছেন, আদর করছেন, তাদের একজনকে পড়াতেও শিখাচ্ছেন: সাইমন, আবার বল—এ, বি, সি, ডি—উঁহু হল না; ভাল করে বল—ডি-ডি-ডি-ডি। আবার বল ..

সিমী মন্তব্য করলেন : এই সময়ে এইভাবে কথা বলাটা অতীব আশ্চর্যজনক।

মাদাম কলামবেল বললেন : চলুন, আমরা সবাই ঘরের ভেতরে যাই।

বাধা দিলেন সিমী: গিয়ে কী হবে? আমরা কি ওঁর কোন উপকারে আসব? তাছাড়া আমরা এখানে তো আরামেই রয়েছি।

যাওয়ার জন্যে কেউ তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন না। দুটি সবুজ রঙের পাখির দিকে লক্ষ্য পড়ল মাদামের। দুটি পাখির অনবদ্য প্রেম দেখে তিনি খুশ মন্তব্যও করলেন। মানুষরা যে এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রেম আর পারস্পরিক আনুগত্য অনুকরণ করে না কেন—এই প্রশ্ন করে পুরুষ জাতের ওপরে তিনি কিছু কড়া মন্তব্য করলেন।

বেলা একটা নাগাদ সবাই খেতে বসলেন।

মদের গ্লাসটা টেনে নিলেন কলামবেল। ভাল মদ ছাড়া আর কিছুই তাঁর মুখে রুচতো না। পরিচারিকাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সেলারে এর চেয়ে ভাল মদ আর নেই নাকি গো?

আছে স্যার। আপনি যখন এখানে আসতেন সেই সময় থেকে কিছু বোতল সেলারে জমানো রয়েছে;—জবাব দিল পরিচারিকা।

যাও; নিয়ে এস। তিনটে বোতল নিয়ে আসবে।

বোতল এল। সবাই ভাল করে খেলেন। সত্যিই একেবারে প্রথম শ্রেণীর। মাল মসলা যে প্রথম শ্রেণীর তা নয়। তবে পনের বছর ধরে মাটির নিচে রয়েছে সেটা তো কম কথা নয়। সিমী ঘোষণা করলেন: পঙ্গু-অথর্বদের কাছে এ-মদ ওষুধের মত কাজ করে।

আরও খানিকটা মদ গলায় ঢালতে ইচ্ছে গেল কলামবেলের; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ-জিনিস আরও কতখানি রয়েছে?

পরিচারিকাটি বলল: প্রায় সবটাই। মাদময়সেল ওসব খেতেন না। সবই সেলারের তলায় রয়েছে।

কলামবেল তাঁর ভায়রা-ভাই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন: দেখ ভাই, এটা আমি নিয়ে যাব; অবশ্য তার পরিবর্তে কিছু দিতে আমি রাজি রয়েছি। মদটা আমার বেশ কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে। যদি অবশ্য তোমাদের আপত্তি না থাকে।

ইতিমধ্যে সেই মুরগীটা তার বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে। মহিলা দুটি খাবারের টুকরো তাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। যোশেপ আর কুকুরটিকে বাগানে খেলতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনেক খেয়েছে তারা।

রাণী হর্টেনসী ক্রমাগতই বকে যাচ্ছিলেন; তবে ফিস-ফিস করে। এখন আর বেশ স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছিল না তাঁর কথা।

কফি শেষ হওয়ার পরে অসুস্থ মহিলার অবস্থাটা কী জানার জন্যে তাঁরা তাঁর ঘরে এলেন। ভদ্রমহিলার মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা দেখা গেল না।

এই দেখে তাঁরা ঘরের বাইরে গিয়ে গোল হয়ে বসলেন। খাবার হজম করার জন্যে বিশুদ্ধ হাওয়ার উপকারিতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

মরণোন্মুখ মহিলাটি আবার জোরে-জোরে কথা বলতে সুরু করলেন। তারপরেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন। সিমী রোদে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; কলামবেল আর বাকি দুটি মহিলা সেই শব্দ শুনে দৌড়ে গেলেন ঘরের ভেতরে। সেই শব্দ শুনে সিমীরও ঘুম ভেঙে গেল বটে তবে অনর্থক উঠে শরীরটাকে আর কষ্ট দিতে চাইলেন না তিনি।

মরণপথযাত্রী মহিলাটি ততক্ষণ বিছানার ওপরে উঠে বসেছেন। বিকৃত

চোখ দুটো দিয়ে কী যেন দেখতে চাইছেন। যোশেপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর কুকুরটা তাঁর বিছানার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুটি বালিশের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সে তার বন্ধু যোশেপের দিকে চকচকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল। মনে হল, এক্ষুণি একটা লাফ দিয়ে সে আবার খেলতে বেরিয়ে যাবে। তার মুখে মনিবের এক ফালি চটি; এতক্ষণ ধরে খেলে সেটাকে দাঁতে কুটি-কুটি করে ফেলেছে প্রায়।

আর বাচ্চা যোশেপ ভদ্রমহিলাকে ওইভাবে হঠাৎ বিছানায় বসে থাকতে দেখে কেমন যেন ঘাবড়িয়ে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মুরগীটাও ঘরের মধ্যে চরছিল; এই গোলমালে ভয় পেয়ে সে-ও চেয়ারের ওপরে লাফিয়ে পড়ে। লাফিয়ে পড়ে বাচ্চাদের ডাকতে সুরু করল।

রাণী হর্টেনসী এবারে মর্মান্তিকভাবে চীৎকার করে উঠলো: না, না। আমি মরতে চাই না; কিছুতেই আমি মরব না। আমি মারা গেলে আমার শিশুদের দেখবে কে? কে তাদের যত্ন নেবে—কে তাদের ভালবাসবে? না, আমি মরব না...না...না।

বিছানার ওপরে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। সব শেষ হয়ে গেল।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে কুকুরটা বিছানার ওপর থেকে মহা আনন্দে একটা লাফ দিয়ে মেঝের ওপরে পড়লো; তারপরেই উর্দ্ধশ্বাসে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কলামবেল জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে ভায়রা-ভাইকে হাঁক দিলেন: তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি—মনে হচ্ছে মারা গিয়েছেন ভদ্রমহিলা।

এই কথা শুনে সিমী দাঁড়ালেন; তারপরে বেশ শক্ত শক্ত পা ফেলেই ঘরের ভেতরে এসে বললেন বিড়বিড় করে: যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম তার আগেই মারা গেলেন দেখছি।

ময়রেঁা

(Moiron)

ম'সিয়ে মালোরিউ অ্যাটর্নী জেনারেল বললেন: আমি আপনাদের একটা অদ্ভুত কাহিনী শোনাব। কাহিনীটা যে কত বড় অদ্ভুত আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

আমি তখন পাবলিক প্রসিকিউটর। আমার বাবা ছিলেন প্যারিসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট; বাবার দৌলতে আদালতে আমার পসার বেশ ভালই জমে উঠে-

ছিল। সেই সময় একটা মামলা পরিচালনা করার ভার আমার হাতে আসে: স্কুল শিক্ষক ময়রেঁা মামলা নামে সেটি বিখ্যাত।

মঁসিয়ে ময়রেঁা ছিলেন উত্তর ফ্রান্সের কোন একটি স্কুলের শিক্ষক। তাবৎ অঞ্চলে তাঁর সুনাম ছিল যথেষ্ট। বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, অতিশয় ধার্মিক প্রকৃতির, একটু চুপচাপ, বেশী কথা বলতে ভালবাসতেন না। বিয়ে করেছিলেন বয়লিনট জিলায়। সেখানেই তিনি শিক্ষকতা করতেন। তাঁর ছেলে ছিল তিনটি। যক্ষ্মারোগে পর-পর তিনজনই মারা যায়। শিশু পুত্রদের মৃত্যুর পরে, পিতৃহৃদয়ের সমস্ত মায়া আর মমতা দিয়ে তিনি তাঁর অবোধ ছাত্রদের পাগলের মত ভালবাসতে সুরু করলেন। তাঁর সবচেয়ে সেরা ছাত্র, সবচেয়ে ভদ্র আর সৎ স্বভাবের ছাত্রদের জন্যে নিজের পয়সা খরচ করে তিনি খেলনা কিনে এনে দিতেন। তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে মিষ্টি, কেক প্রভৃতি সুস্বাদু খাবার প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতেন। প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসতো, তাঁর কোমল হৃদয়ের জন্যে প্রশংসা করত। ঠিক এমনি একটা সময়ে একটা অদ্ভুত অসুখে তাঁর পাঁচটি ছাত্রই হঠাৎ মারা গেল। সবাই ভাবলো অনাবৃষ্টির ফলে জল দূষিত হয়েছে; এবং তারই ফলে আকস্মিক কোন মহামারীর আবির্ভাব হয়েছে। সবাই এর কারণ খুঁজে বেড়াতে লাগলো; কোন কারণই খুঁজে পেল না; কারণ শিশুগুলি যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল তাদের লক্ষণগুলি ছিল বড় অদ্ভুত ধরনের। প্রথমেই মনে হোত শিশুরা সব অবসন্ন হয়ে পড়েছে; কিছু খেতে পারতো না তারা। বলতো পেট কনকন করছে, তারপরে ভীষণভাবে কাতরাতে-কাতরাতে তারা মারা যেত।

শেষকালে যে ছেলেটি মারা গেল তার দেহ ব্যবচ্ছেদ করার ব্যবস্থা হল। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। পাকস্থলীর ভেতরে যেসব জিনিস পাওয়া গেল সেগুলিকে প্যারিসে পাঠানো হল রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্যে; কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

পরের একটি বছর আর কারও মৃত্যু হয় নি। তারপরে বৃদ্ধ ময়রেঁার সব চেয়ে প্রিয় দুটি সেরা শিশু চার দিনের মধ্যে মারা গেল। শব ব্যবচ্ছেদ হল। দেখা গেল, মৃতদেহের নাড়ির মধ্যে মিহী কাঁচের গুঁড়ো লেপটে বসে রয়েছে। পরীক্ষকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ছেলেরা এমন কিছু খাবার খেয়েছে যেগুলি খুব অসতর্কভাবে তৈরী হয়েছে। এক ভাঁড় দুধের মধ্যে কিছু কাঁচের ভাঙা টুকরো পড়লে এক ধরনের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্যাপারটা ওইখানেই হয়ত যেত; কিন্তু হল না; কারণ ওরই কাছাকাছি একটা সময়ে ময়রেঁার চাকর অসুস্থ হয়ে পড়লো। এর আগে মৃত শিশুদের শরীরে রোগের যে বিশেষ লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছিল চিকিৎসক এখানেও সেই সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। পরিচারিকাটিকে অনেক প্রশ্ন করলেন চিকিৎসক; অনেক জেরার পরে সে স্বীকার করল যে ময়রেঁা তাঁর ছাত্রদের জন্যে যে মিষ্টি

কিনে এনেছিলেন তার কয়েকটা সে চুরি করে খেয়ে ফেলেছে।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী স্কুলবাড়ি ভাল করে খোঁজা হল, তারই ফলে একটা ছোট ঘর আবিষ্কৃত হল; দেখা গেল সেই ঘরের মধ্যে ছেলেদের জন্যে অনেক খেলনা আর মিষ্টি রয়েছে। প্রায় সব খাবারেই ভাঙা গ্লাসের মিহী টুকরো অথবা ভাঙা ছুঁচের সরু মুখ মেশানো রয়েছে দেখা গেল।

ময়রেঁাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হল; কিন্তু এই সন্দেহের শিকার হওয়ায় তিনি এতই বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। তবু আমি যখন তাঁকে প্রথম দোষী সাব্যস্ত করলাম তখন আমার ধারণা সকলেই আমার বিরুদ্ধমত পোষণ করেছিল। অস্বীকার করছিনে এই বিরুদ্ধ মত পোষণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণও ছিল। সেগুলি হল তাঁর সুনাম, তাঁর নির্ভেজাল চরিত্র আর মোটিভ। এই সব হত্যার পেছনে তাঁর যে কোন লাভ থাকতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি। এই রকম একটি সৎ, সাদাসিদে, ধর্মপ্রাণ মানুষ শিশুহত্যা করবেন কেন, বিশেষ করে যে সব শিশুদের তিনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন? তা ছাড়া যে সব শিশুদের তিনি মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করতেন এবং নিজের মাইনের অর্দ্ধেক খরচ করে যাদের খুশি করার জন্যে তিনি কিনে আনতেন বেছে-বেছে তাদেরই বা তিনি হত্যা করবেন কেন?

এই সব হত্যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে এ কথা স্বীকার করতে হলে তিনি যে বিকৃত মস্তিষ্ক এছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না তাঁকে। কিন্তু ময়রেঁা তো তা নন; তাঁকে দেখলে মনে হবে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক, যুক্তিবাদী, অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ। যা তা কিছু করা তাঁর স্বভাব নয়; কিন্তু কারও ভাল ছাড়া কোন মন্দ তিনি চিন্তা করেন না। তিনি যে উন্মাদ একথা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু তবু প্রমাণ জমা হল। যে দোকান থেকে ময়রেঁা মিষ্টি কিনে আনতেন সেই দোকানের খাবার পরীক্ষা করা হল। সন্দেহজনক কোন কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে।

তিনি অভিযোগ করলেন যে কোন অদৃশ্য শত্রু চাবি দিয়ে তাঁর ঘর খুলে ওই সব খাবারের সঙ্গে কাঁচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে। তিনি জানালেন যে এই অপবাদ তাঁর ঘাড়ে একটি চাষী চাপিয়ে দিয়েছে; কারণ মৃত শিশুদের একটির মৃত্যুতে তার কিছু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই বললেন সেই পশুটা কেবল একটি শিশুকে হত্যা করেই খুশি হয় নি, সেই সঙ্গে একটি মৃত্যুকে চাপা দেওয়ার জন্যে অন্য হতভাগ্য শিশুগুলিকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।

কারণটাকে ভিত্তিহীন বলে একেবারে নাকচ করা গেল না। নিজের মতবাদে তিনি কেবল নিশ্চিত-ই ছিলেন না; এই সব দুর্ঘটনায় তিনি রীতিমত

ব্যথিত হয়েছিলেন; এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন যে আমরা প্রায় তাঁকে ছেড়েই দিতাম যদি না সেই সময় পর-পর দুটি আবিষ্কার আমাদের মুহ্যমান করে তুলতো: প্রথমটি হল একটি নস্যির ডিবে। এটি তাঁরই নিজস্ব ডিবে; যেখানে তিনি টাকা পয়সা রাখতেন সেই তাঁর ব্যক্তিগত লেখার টেবিলের ড্রয়ারে এইটি ছিল। দেখা গেল সেই ডিবেটি গুঁড়ো কাঁচে ভর্তি হয়ে রয়েছে।

এই অঘটনের কারণটাও তিনি বেশ গ্রহণযোগ্যভাবেই বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বললেন এটি সেই অজ্ঞাত অপরাধীর একটি শেষ চাল। কিন্তু সেন্ট মারলোফ থেকে একটি বস্ত্র ব্যবসায়ী জজসাহেবের বাড়িতে এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে ময়রোঁ অনেকবার তার দোকান থেকে সূঁচ কিনে নিয়ে এসেছেন; সব সময়েই তিনি সব চেয়ে সরু সূঁচ কিনতেন; এবং কেনার আগে ভেঙে দেখতেন সেগুলি তাঁর কাজে লাগবে কি না। সেই বস্ত্র ব্যবসায়ীটি তার কথার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্যে একজন সাক্ষী হাজির করল। একবার দেখেই ময়রোঁকে চিনতে পারল তারা। অনুসন্ধান করে জানা গেল বস্ত্র ব্যবসায়ীটি যে দিনের কথা বলছে সেইদিন ময়রোঁ সেন্ট মারলোফ-এ গিয়েছিলেন।

এর পরে আমি ছেলেদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম। তাদের মুখ থেকে শুনলাম শিক্ষকটি তাদের নানা রকম সুস্বাদু খাবার খাওয়াতেন, খাবার সময় বসে তাদের আদর করতেন; এবং তারপরে ভোজনের সব চিহ্ন একেবারে লোপাট করে দিতেন।

জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল: ফাঁসি দাও ওকে, শঙ্কিত জনমত বেশ জোরের সঙ্গেই এই মতবাদ পোষণ করল। তারা বৃথা কালক্ষেপের পক্ষপাতী নয়; তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা তখন রীতিমতই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল আমার পক্ষে।

ময়রোঁর প্রাণদণ্ড হল। প্রাণদণ্ড রহিত করার জন্যে তিনি যে আবেদন করলেন তা-ও নাকচ হয়ে গেল। তাঁকে ক্ষমা করার আর কোন পথই খোলা রইলো না। বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম যে সম্রাটও তাঁকে জীবনভিক্ষা দেবেন না।

একদিন সকালে অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় কারাগারের পাদরী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তিনি বৃদ্ধ; মনুষ্য চরিত্রে বিশেষজ্ঞ; অনেক জেল কয়েদীর সঙ্গেই তাঁর বেশ পরিচয় ছিল। দেখে মনে হল তিনি বেশ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন; সেই সঙ্গে হয়ে পড়েছেন কিছুটা অস্বাভাবিক এবং অস্থির। অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন; তারপরে বললেন: যদি ময়রোঁর শিরচ্ছেদন করা হয় তাহলে আপনারা একটি নির্দোষ মানুষকে জবাই করবেন।

তারপরে কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই তিনি স্থান ত্যাগ করলেন।

তাঁর কথাগুলি শুনে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমি। বেশ বুঝলাম একটি মানুষকে বাঁচানোর জন্যে তিনি এই রকম গম্ভীর এবং আর্ত ভাষায় কথাগুলি বলে গেলেন।

একঘণ্টা পরে আমি প্যারিসের দিকে যাত্রা করলাম, এবং আমারই অনুরোধে বাবা সম্রাটের সঙ্গে অনতিবিলম্বে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন।

পরের দিনই সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটি ছোট ঘরে তৃতীয় নেপোলিয়ন কাজ করছিলেন। সেখানেই তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। সমস্ত ঘটনাটাই আমি তাঁকে খুলে বললাম; বললাম পাদরীর কথাও। আমাদের এই আলোচনার মাঝখানে সম্রাটের পেছনের দরজাটি খুলে গেল। সম্রাট একা রয়েছেন মনে করে সম্রাজ্ঞী ঘরে ঢুকে এলেন। সম্রাট ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করলেন। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তিনি একটু চেঁচিয়েই বললেন: এই লোকটিকে জীবন ভিক্ষা দিতেই হবে কারণ সে নিশ্চয় নির্দোষ।

এই ভদ্রমহিলাটির পূত প্রত্যয় আমার মনটাকে একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহে নাড়া দিয়ে গেল কেন? দণ্ডের কিছুটা হ্রাস হোক এই রকম একটা সত্যিকার ইচ্ছা তখনও পর্যন্ত আমারও হয়েছিল: এখন আমার মনে হল ওই অপরাধীর ছলনার আমি একটি শিকার ছাড়া আর কিছু নই। লোকটা শেষ পর্যন্ত জেলের পাদরীকেও ব্যবহার করেছে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে।

সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমি যে ঠিক একমত হতে পারি নি সেটা আমি হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলাম। সম্রাট নিজেও ঠিক করতে পারলেন না কী তাঁর করা উচিৎ। একদিকে ছিল তাঁর স্বভাবজাত শুভবুদ্ধি। আর একদিকে একটা হতভাগা জানোয়ারের হাতে তিনি ধরা দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নিশ্চিত যে পাদরী ভগবানের ইচ্ছাই মুখে প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন: কী আসে যায় এতে? একজন নির্দোষকে হত্যা করার চেয়ে একজন দোষীকে মুক্তি দেওয়াও ভাল।

শেষ পর্যন্ত জয় হল তাঁরই। মৃত্যুদণ্ড রহিত হল; তার পরিবর্তে দেওয়া হল সশ্রম কারাদণ্ড।

তারপর থেকে আর কিছু সংবাদ পাই নি তাঁর।

বছর দুই আগে গ্রীষ্মের সময়টা আমি আমার একটি খুড়তুতো ভাই-এর বাড়িতে কাটাচ্ছিলাম। বাড়িটি ছিল লিলিতে। সেইখানে একদিন আমরা ডিনার খেতে বসেছি এমন সময় সংবাদ পেলাম আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে পাদরী বসে রয়েছেন।

পাদরীকে নিয়ে আসতে বললাম। তিনি ভেতরে এসে বললেন: আপনাকে এখনই একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে। একজন মরণোন্মুখ

মানুষ আপনার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চায়।

আমার বিচারকের দীর্ঘ জীবনে এরকম ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে। যদিও রিপাবলিক আমাকে কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে বাধ্য করেছে তবু মাঝে-মাঝে এরকম ডাক আমার আসেই।

আমি পাদরীকে অনুসরণ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে একটি বিরাট শ্রমিক কলোনীর নিকৃষ্ট কুঠরীতে হাজির হলেন। সেখানে দেখলাম খড়ের বিছানার ওপরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় একটি মরণোন্মুখ মানুষ দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। কঙ্কালসার চেহারা; মুখের ওপরে বিকৃত একটা হাসি। চোখ দুটি কোটরগত, কিন্তু তীক্ষ্ণ চকচকে।

আমাকে দেখেই লোকটি বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করল। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন?

না।

আমি ময়রো।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম: অর্থাৎ স্কুল মাস্টার?

হ্যাঁ।

আপনি এখানে কী করতে এসেছেন?

সে অনেক কথা। সে-সব কথা বলার সময় নেই এখন। আমি শীঘ্রই মারা যাব। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে ওরা এই পাদরীটিকে ডেকে এনেছে। আমি শুনেছিলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনাকে ডেকে পাঠালাম। আপনার কাছেই আমি আমার সব কথা খুলে বলতে চাই কারণ আপনিই একবার আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন।

খড়ের বিছানা দুটো হাতে শক্ত করে ধরে হাঁপাতে-হাঁপাতে সে খনখনে গলায় বলল: আপনার কাছে সত্যি কথাই বলব আমি; কারণ মৃত্যুর পূর্বে কারও কাছে জীবনের সব কথা বলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আমিই ছেলেদের মেরে ফেলেছি—আমিই—সবাইকে। প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে।

শুনুন। চরিত্রের দিক থেকে আমি চিরকালই সৎ ছিলাম—ভগবানকে পূজা করতাম—সৎ এবং নির্মল ভগবান—যে ভগবান আমাদের ভালবাসতে শেখান সেই সত্যিকার ভগবানের পূজারি ছিলাম আমি; কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে যে হত্যাকারী দস্যুতা করে বেড়াচ্ছে, ভয় দেখিয়ে পৃথিবী শাসন করছে, সেই মিথ্যাচারী দস্যু ভগবানকে কোন দিনই আমি পূজা করতে পারিনি। জীবনে কোনদিনই আমি অন্যায় করিনি—কোনদিনই দুর্বৃত্তের মত কাজ করিনি আমি। অজাত শিশুর মতই আমি ছিলাম পবিত্র।

বিয়ের পরে আমার ছেলে হল। তাদের আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। এত ভাল আজ পর্যন্ত কোন বাবা মা তাঁদের সন্তানদের বাসেননি। তাদের

জন্যেই আমি বেঁচেছিলাম। আমি মূর্খ ছিলাম। তারা মারা গেল—তিনজনই—একটার পর একটা। কেন, কেন? কী আমি করেছিলাম? আমি—আমি? হঠাৎ আমার হৃদয় পরিবর্তিত হল। সে-পরিবর্তন ভয়ঙ্কর। হঠাৎ আমার চোখ দুটো খুলে গেল—মনে হল স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছি আমি। সেই খোলা চোখে আমি দেখলাম ভগবান দুষ্ট প্রকৃতির। তিনি আমার সন্তানদের হত্যা করলেন কেন? আমার জ্ঞানোদয় হল। আমি দেখলাম, আমি বুঝলাম যে ভগবান হত্যা করতে ভালবাসেন। হত্যা ছাড়া, মঁসিয়ে, তাঁর অন্য কোন চিন্তা নেই। তিনি জীব সৃষ্টি করেন তাদের হত্যা করার জন্যে। সত্যিকার ঘাতক হচ্ছেন ভগবান। প্রতিটি দিনই তাঁর হত্যা চাই। নিজের আমোদের জন্যে নানান কৌশলে তিনি জীব হত্যা করেন। তিনি অসুখের সৃষ্টি করেছেন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তিনি আনন্দের রীতি পরিবর্তন করার জন্যে দুর্ঘটনা আবিষ্কার করেছেন এবং এসব জিনিসও যখন তাঁর কাছে একঘেয়ে হয়ে যায় তখনই তিনি পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দেন মহামারী, প্লেগ, কলেরা, ডিপথিরিয়া আর বসন্ত। জীব হত্যার জন্যে এই দানবের কাছে আরও কী সব মারাত্মক আয়ুধ রয়েছে তা আমি জানি নে।

এগুলিও সব নয়। এই সব বিপদের পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়েও তিনি খুশি হতে পারেন নি। মাঝে-মাঝে তিনি যুদ্ধ-দানবদের ছেড়ে দেন। দুপক্ষের হাজার-হাজার মানুষ মরে যায়, হাত-পা ভাঙে, কারও-কারও মাথার খুলি যায় উড়ে; রক্তাক্ত হয়ে যায় সর্বাঙ্গ তাদের, যন্ত্রণায় লাখ-লাখ মানুষ আর্তনাদ করে ওঠে। তিনি মনের আনন্দে হাসতে-হাসতে সেই সব দৃশ্য দেখেন, সেই সব আর্তনাদ—মানুষের জীবনযন্ত্রণা পরম রসিকতার সঙ্গে উপভোগ করেন।

এ-ও বুঝি যথেষ্ট নয়। তিনি এমন সব মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা পরস্পরের মাংস খায়। তারপরে মানুষ যখন ভগবানের ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করে তখনই তিনি সৃষ্টি করেন জন্তু জানোয়ার। মানুষ তাদের পিছু-পিছু দৌড়ায়, হত্যা করে, খায়। তিনি এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যারা চব্বিশ ঘণ্টার বেশী বেঁচে থাকে না, এমন কোটি-কোটি কীট সৃষ্টি করেছেন যাদের জীবন এক ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয় না; সৃষ্টি করেছেন পিঁপড়ে যাদের আমরা সব সময় মাড়িয়ে চলি—এরকম আরও কত জীব সৃষ্টি করেছেন তা আমরা জানি নে। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিছু ধাওয়া করছে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, খেয়ো-খেয়ি করছে—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অপরকে ধ্বংস করছে, নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর আপনাদের সেই মহান উদারচেতা দেবতাটি কী করছেন? তিনি অনেক উঁচুতে বসে বেশ আনন্দের সঙ্গে সব দেখে যাচ্ছেন—বৃহত্তম ঘটনা থেকে ক্ষুদ্রতম ঘটনা পর্যন্ত কোনটারই তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তিনি দেখছেন, আর মনের আনন্দে তা উপভোগ

করছেন। উঃ! জানোয়ার কোথাকার।

মঁসিয়ে, আমিই বা বাদ যাই কেন? সেই জন্যে আমিও হত্যার নেশায় উদ্বুদ্ধ হলাম—আমি শিশু হত্যা করলাম। এই কৌশল সেই ভগবানের ওপরেই প্রয়োগ করলাম আমি। ভগবান তাদের হত্যা করতে পারেন নি; করেছি আমি। তাঁর ওপরে টেক্কা দিয়েছি আমি। আরও অনেককে হত্যা করতে পারতাম আমি। কিন্তু আপনি দিলেন না; আমাকে গ্রেপ্তার করলেন আপনি, এই আমার শেষ কথা।

আমি মরতে যাচ্ছিলাম। আমার শিরচ্ছেদ হওয়ার কথা ছিল। তা যদি হোত তাহলে ভগবানরূপী শয়তানটি কী হাসিই না হাসতেন। তখন আমি পাদরীকে ডেকে তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বললাম। স্বীকার করছি তাঁর কাছে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। তারই ফলে আমি এতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলাম।

এখন সব শেষ আমার। তাঁকে আমি এড়িয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু তাঁকে আমি ভয় করি নে; মঁসিয়ে, তাঁকে আমি ঘৃণা করি।

কথা শেষ করলেন ময়রেঁা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর; দম বন্ধ হয়ে আসছিল, বাইরের অফুরন্ত বাতাস তাঁর কাছে এসে প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। হাঁপাতে-হাঁপাতে বিরাট মুখ ব্যাদান করে অনেক কষ্টে তিনি নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে একটা-একটা কথা তাঁর জিব আর দাঁতের ঘর্ষণে ধাক্কা খেয়ে বাইরে আসছিল অস্পষ্টভাবে। খড়ের বিছানার ওপরে বসে কালো মলিন একখানা চাদরের ভিতর থেকে শীর্ণ পা দুটিকে তিনি টেনে বার করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। এখনই তিনি যেন কোথাও ছুটে পালাতে চান। এই হতভাগ্য প্রাণীটিকে দেখে সত্যিই আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হায়রে! কী ক্লেদাক্ত মানুষ! কী ক্লেদাক্ত ভয়াবহ তাঁর স্মৃতিচারণ!

জিজ্ঞাসা করলাম: আর কিছু বলার আছে আপনার?

না, মঁসিয়ে।

তাহলে চললাম।

হ্যাঁ; বিদায়। কোন দিন...

পাদরীর দিকে ফিরে তাকালাম আমি। তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। দেওয়ালের গায়ে তাঁর স্তম্ভিত মূর্তির ছায়াটি লেপটে গিয়েছে।

আপনি থাকবেন?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ময়রেঁা ব্যঙ্গ করে বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়। মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্যে কাকের দল লেলিয়ে দিতে হবে তো?

আমার কথা যদি বলেন, আমার শোনার কাজ শেষ হয়েছে। দরজা খুলে আমি ছুটে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

একটি কু-ড্যেটা

(A Coup D Etat)

সিডানের বিপর্যয়ের কথা প্যারিসে সেইমাত্র এসে পৌঁচেছে। রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়েছে। কমিউন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সারা ফ্রান্স বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হাঁপাচ্ছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সবাই সেনানীর মত কুচকাওয়াজ করছে।

এতদিন যারা টুপী বিক্রী করত তারা রাতারাতি কর্ণেল বনে গেল; জেনারেলের ভঙ্গিতে দাপাদাপি করতে লাগলো। বিরাট মোটা পেটের পাশে রিভলবার আর ছোরা ঝুলিয়ে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তারা; সাধারণ নাগরিকেরা হয়ে দাঁড়ালো অস্থায়ী সেনানী; হই-চইয়ে স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী পরিচালনা করার ভার নিল তারা; নিজেদের দাম বাড়ানোর জন্যে নিয়মিত সেনানীদের মত তারা পরস্পরকে গালিগালাজ করতে লাগলো।

এতদিন যারা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ব্যবসা করতো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে এই আনন্দে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো; এবং মূখের মত শত্রুপক্ষের প্রথম ধাক্কাতে বেসামাল হয়ে পড়লো। হত্যা করতে যে তারাও জানে এটা প্রমাণ করার জন্যে কিছু নির্দোষ মানুষকেও তারা জবাই করল; এবং যে সমস্ত জায়গায় প্রাশিয়ানরা তখনও ঢোকে নি সেই সব জায়গায় ঘুরে তারা কতকগুলো কুকুরকে গুলি করে মারলো, আর মারলো আরামে শুয়ে রোমন্থন করছে এমন কিছু গরু, আর নির্বিবাদে চরে বেড়াচ্ছে এমন কিছু রুগ্ন ঘোড়া। এই যুদ্ধে সকলেরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে প্রতিটি নাগরিকই তা বিশ্বাস করেছিল, এমন কি ক্ষুদ্রতম গ্রামগুলির কাফেতে ব্যবসাদাররা যুদ্ধের পোশাক গায়ে জড়িয়ে গুলতানি করতে শুরু করল। মনে হল সেগুলি যেন সব মিলিটারি ব্যারাক অথবা, আহত সৈন্যদের হাসপাতাল।

সৈন্যদের অথবা রাজধানীর প্রকৃত সংবাদ কী ক্যানেভিল সহরের লোকেরা তখনও পর্যন্ত তা জানতো না। তবে একটা উগ্র ধরনের উত্তেজনা বিগত একটি মাস ধরেই সহরটিকে গ্রাস করে ছিল; এবং দুটি বিরুদ্ধ দল প্রস্তুত হচ্ছিল—নিজেদের মধ্যে মোকাবিলা করার জন্যে। মেয়র ভাইকোঁত দ্য ভারনেতোত—ক্ষুদ্রকায়, রোগাটে, বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোক নাম কেনার জন্যে আর ভবিষ্যৎ কায়েমী করার বাসনায় সম্প্রতি তাঁর দলবল নিয়ে রাজার দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী উঠছে। ইনি হচ্ছেন ডকটর ম্যাসারেল। জেলার রিপাবলিক দলের প্রধান তিনি। শুধু তাই নয়, সহরে যে "ম্যাসনিক লজ" রয়েছে তার তিনি সম্মানিত প্রধান কর্মকর্তা, সোসাইটি অফ এগ্রিকালচার-এর প্রেসিডেণ্ট, ফায়ার ডিপার্টমেণ্টে যে

ভোজসভা বসে তার চেয়ারম্যান, এবং দেশকে বাঁচানোর জন্যে যে গ্রামীণ সংস্থা তৈরী হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রধান উদ্যোক্তা।

দুটি সপ্তাহে তেষট্টিজন লোককে তিনি এই সংস্থার সদস্য করেছিলেন। সবাই বিবাহিত, সংসারী মানুষ, বিজ্ঞ চাষী, এবং সহরের ব্যবসাদার। দেশকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তারা স্বেচ্ছায় এই সংস্থার সদস্য হয়েছিলেন। ডঃ ম্যাসারেল প্রতিদিন সকালে টাউন হলের সামনে যে ফাঁকা মাঠ রয়েছে সেইখানে এদের কুচকাওয়াজ করাতেন। যখনই মেয়র লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের বাড়িতে আসতেন তখন সেনাপতি ম্যাসারেল কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে হাতে তরোয়াল বাগিয়ে গর্বের সঙ্গে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে হাঁটা চলা করতেন, এবং তাদের চীৎকার করাতেন: "আমাদের দেশ দীর্ঘজীবি হোক।" এবং তারা লক্ষ্য করেছিল যে এই চীৎকার ওই ক্ষুদ্রকায় মেয়রটিকে যথেষ্ট বিব্রত করে তুলতো। এই চীৎকারের মধ্যে তিনি বিদ্রোহের সুর শুনতে পেতেন, দেখতে পেতেন মহান বিপ্লবের ঘৃণ্য ছায়া।

পাচই সেপ্টেম্বর সকালে মিলিটারি পোশাকে সেজেগুজে ডাক্তার তাঁর চেম্বারে বসে রোগী দেখছিলেন। টেবিলের ওপরে তাঁর রিভলবারটা পড়েছিল। একজোড়া বৃদ্ধ কৃষকদম্পতি তাঁকে দেখতে এসেছিল। এদের মধ্যে স্বামীটি সাত বছর ধরে স্ফীত শিরার অসুখে ভুগছিল; কিন্তু তার স্ত্রীরও সেই একই অসুখ হওয়ার আগে পর্যন্ত সে ডাক্তারের কাছে আসে নি। এই দুটি রোগীর সঙ্গে ডাক্তার আলোচনা করছিলেন এমন সময় পিয়ন খবরের কাগজটি তাঁকে দিয়ে গেল।

ডাক্তার ম্যাসারেল কাগজটি খুললেন, পড়লেন। হঠাৎ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর মুখ। তিনি তারপরেই খাড়া হয়ে বসলেন এবং আকাশের দিকে দুটি হাত তুলে আনন্দ প্রকাশ করার ভঙ্গিতে হতভম্ব দেহাতী রোগী দুটির সামনেই যত জোরে পারেন চীৎকার করে উঠলেন: রিপাবলিক দীর্ঘজীবি হোক। রিপাবলিক দীর্ঘজীবি হোক!! রিপাবলিক দীর্ঘজীবি হোক!!

তারপরে অতিরিক্ত ভাবাবেগে মুহ্যমান হয়ে তিনি চেয়ারের ওপরে নেতিয়ে পড়লেন।

রোগের ব্যাখ্যা করার জন্যে যখন চাষীটি তাঁকে বলল যে তাঁর সব সময় মনে হচ্ছে একদল পিঁপড়ে যেন তার পায়ের ভেতরে ওঠা-নামা করছে তখন ডাক্তার চীৎকার করে বললেন: তোমরা এবারে কাট; ওই সব আজে বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়েছে। সম্রাট কারারুদ্ধ। ফ্রান্স আজ বিপন্মুক্ত। রিপাবলিক দীর্ঘজীবি হোক। এই পর্যন্ত বলেই তিনি দরজার গোড়ায় ছুটে গিয়ে হাঁকলেন: সিলেসতি, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি।

এই ডাক শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে দৌড়ে এল পরিচারিকা। ডাক্তার এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেলেন: আমার জুতো, আমার তরোয়াল, আমার টোটার বাক্স, এবং স্প্যানিশ ড্যাগার...নিয়ে এস...নিয়ে এস...জলদি।

নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যেই বোধ হয় একটু থামলেন ডাক্তার; সেই সুযোগে গেঁয়ো চাষীটি সুরু করল আবার: পায়ের গাঁটগুলো চলতে গেলে বড় টনটন করে।

চটে লাল হয়ে গেলেন ডাক্তার; ধমক দিয়ে বললেন: চো-প্। ভগবানের দিব্যি, চুপ কর। যদি বেশী করে হাত-পা ধুতে তাহলে এ রোগ তোমার হোত না।

তারপরে লোকটির ঘাড় ধরে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন: তুমি কী বুঝতে পারছ না আমরা এখন রিপাবলিক-এ বাস করছি। মূর্খ কোথাকার!

কিন্তু পেশার কথা মনে হতেই তিনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন; তারপরে সেই দুটি হতভম্ব রোগীকে তাঁর চেম্বার থেকে বার করে দিয়ে বললেন: কাল এস বন্ধু, কাল এস। আজকে আমার এতটুকু সময় নেই।

তারপরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাকে সাজতে-সাজতে পরিচারিকাকে তিনি আরও কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিলেন: তুমি এখনই লেফটন্যান্ট পোমেলের বাড়িতে দৌড়ে যাও; বলে এস আমি এখনই তাঁদের এখানে চাই—এখনই। টর্চবিউফকেও পাঠিয়ে দেবে। সে যেন টাকটা নিয়ে আসে। যাও-যাও; তাড়াতাড়ি যাও।

নির্দেশ নিয়ে পরিচারিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি তাঁর চিন্তাগুলিকে একসঙ্গে জড় করে ভাবতে লাগলেন এই কঠিন পরিস্থিতিটিকে কী করে আয়ত্বে আনা যায়।]

তিনজনেই একসঙ্গে হাজির হলেন। তাঁদের গায়ে অসামরিক পোশাক। সেনাপতি ভেবেছিলেন তাঁরা সামরিক পোশাক চড়িয়ে আসবেন। তাঁদের ওই পোশাকে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন: হায় ভগবান, তোমরা তাহলে কিছুই জান না এখনও? সম্রাটকে বন্দী করা হয়েছে, ঘোষণা করা হয়েছে রিপাবলিক। আমাদের এখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার অবস্থা কী বুঝতেই পারছ? বিপজ্জনক বলতে পার।

অধীনস্থ অফিসারদের অবাক দৃষ্টির সামনেই তিনি কয়েক মিনিট মনে-মনে কী ভাবলেন; তারপরে বলতে লাগলেন: মনে কোন রকম দ্বিধা না রেখেই আমাদের কাজ করতে হবে। এখন মিনিট ঘণ্টার সামিল। জরুরী এবং দ্রুত ব্যবস্থাপনার ওপরে সব কিছু নির্ভর করছে। পিকার্ট, তুমি যাও, পাদরীকে খুঁজে বার কর; তাকে গির্জায় ঘণ্টা বাজাতে নির্দেশ দাও, যেন লোকজন পার্কে জমায়েত হয়। তাদের কাছে আমি ভাষণ দেব। আর তুমি টর্চবিউফ,

অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তুমি ড্রাম বাজিয়ে এস। সবাই যেন মিলিটারী পোশাক পরে পার্কে হাজির হয়। পোমেল, তোমার মিলিটারী পোশাক পরে ফেল—অর্থাৎ জ্যাকেট আর ক্যাপ চড়াও। আমরা সবাই গিয়ে টাউন হল অধিকার করব। এবং মঁসিয়ে ভারনেত্তোতকে ডেকে পাঠাবে তাঁর দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। বুঝতে পেরেছ ?

পেরেছি।

তাহলে যাও, তাড়াতাড়ি কাজ কর।

পাঁচ মিনিট পরে সেনাপতি তাঁর সুসজ্জিত মিলিটারী বাহিনী নিয়ে পার্কে হাজির হলেন। ঠিক সময়ে ক্ষুদ্রকায় ভারনেত্তোত পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার পট্টি পরে, রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে অন্য পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে এলেন; সবুজ জ্যাকেট পরে, প্রত্যেকে হাতে একটা ছুরি নিয়ে, আর কাঁধে রাইফেল রেখে তিনজন শিকার রক্ষক তাঁর পিছু-পিছু আসতে লাগলো।

ডাক্তার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাকের ডগা দিয়ে চারজন মানুষ হল-এ ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বিড়-বিড় করে বললেন ডাক্তার : আমাদের ওরা ল্যাঙ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরও লোক না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখনই কিছু করা যাবে না।

লেফটন্যাণ্ট পিকার্ট হাজির হয়ে বললেন : পাদরী আমাদের নির্দেশ মানতে রাজী নন। তিনি তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে গির্জায় খিল দিয়ে বসে রয়েছেন।

ঠিক এমনি সময়ে ঢাকের শব্দ শোনা গেল; তারই প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে টর্চবিউফ ঢুকে এল পার্কের ভিতরে। সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার জন্যে সে বেশ জোরে-জোরে ঢাকের পিঠে তিনবার কাঠি মারলো; মিলিটারী কায়দায় সে পার্ক পেরিয়ে গ্রামের পথে ঢাক বাজাতে-বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে আশপাশের ঘরের জানালা দিয়ে অনেকে উঁকি দিতে লাগলো।

ডাক্তার ম্যাসারেল তাঁর তরোয়ালটা খুলে টাউন হলের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেন। সেইখানে শত্রুপক্ষ দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তরোয়ালটা মাথার ওপরে উঁচিয়ে ডাক্তার-সেনাপতি প্রাণপণে হুংকার ছাড়লেন : রিপাবলিক দীর্ঘজীবি হোক। বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু হোক। তারপরে ধীরে-ধীরে তিনি তাঁর অফিসারদের কাছে ফিরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোলমাল হ'তে পারে এই আশঙ্কায় একমাত্র মুদি ছাড়া সবাই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল।

ধীরে-ধীরে পার্কে সৈন্যরা জমায়েত হ'তে লাগলো। তাদের হাতে পুরনো মরচেপড়া বন্দুক—এগুলো এতদিন তাদের রান্নাঘরে চিমনীর পাশে দেওয়া-

লের গায়ে প্রায় তিরিশ বছর ঝোলানো ছিল। তাদের মাথায় সব লাল টুপী। দেখলেই মনে হবে যেন একপাল বন-মোরগ।

জন তিরিশেক লোক জমায়েত হয়েছে দেখে ডাক্তার তাদের কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন; তারপরে, তাঁর জেনারেল স্টাফের দিকে তাকিয়ে বললেন: এখন আমাদের কাজে এগোতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। পিকার্ট, তুমি টাউন হলের জানালার কাছে যাও, মঁসিয়ে ভারনেতোতকে নির্দেশ দাও তিনি যেন রিপাবলিকের নামে তাঁর কর্তৃত্ব আমার হাত ছেড়ে দেন।

কিন্তু লেফটন্যান্ট পিকার্ট একজন পাকা রাজমিস্ত্রি; তিনি এগিয়ে যেতে রাজি হলেন না। তিনি উলটে বললেন: আপনি বেশ চালাক, তাই নয়? আপনি জানেন ওদের লক্ষ্য অব্যর্থ। না, না; ধন্যবাদ। আপনি নিজেই যান।

সেনাপতির মুখ রাগে অগ্নিবর্ণ ধারণ করল; তিনি বললেন: শৃঙ্খলার নামে তোমাকে হুকুম দিচ্ছি।

বিদ্রোহ জানালো লেফটন্যান্ট: কারণটা না জেনে আমি আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে রাজি নই।

গ্রামের যে সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই হাসতে সুরু করলেন: একজন বললেন: পিকার্ট, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সময়ে ওর না যাওয়াই নিরাপদ।

ডাক্তার কেউ শুনতে না পায় এইভাবে নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন: কাপুরুষের দল। তারপরে একজন সৈনিকের হাতে তাঁর তরোয়াল আর বন্দুকটি তুলে দিয়ে তিনি মেপে-মেপে পা ফেলে এগোতে লাগলেন। কোন বন্দুকের নল তাঁর দিকে উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখার জন্যে তিনি তাঁর চোখ দুটিকে টাউন হলের জানালার দিকে রাখলেন উঁচিয়ে।

টাউন হলের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল দুপাশের দুটি দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে; ওই দুটি দরজা দিয়ে দুটি স্কুলে ঢোকা যায়। একটি দরজা দিয়ে একপাল বাচ্চা ছেলে আর একটি দরজা দিয়ে একপাল বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এসে উঠোনের ফাঁকা জায়গায় এক ঝাঁক পাখির মত চেঁচামেচি সুরু করে দিল। ডাক্তারের কথা কেউ শুনতে পেল না।

বাচ্চাগুলো বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আবার দুটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে ছেলেমেয়ের দল চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার পরে জায়গাটা শান্ত হল; সেই সুযোগে ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন:

মঁসিয়ে দ্য ভারনেতোত।

দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। মঁসিয়ে ভারনেতোত জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

সুরু করলেন সেনাপতি: মঁসিয়ে, যে মহান ঘটনাবলী সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন। যে দলের আপনি প্রতিনিধি সে-দল এখন আর নেই। যে-দলের আমি প্রতিনিধি সেই দলটি বর্তমানে ক্ষমতায় এসেছে। এই করুণ অথচ বাস্তব পরিস্থিতিতে আহ্বান জানাচ্ছি পুরাতন সরকার আপনাকে যে সব ক্ষমতা দিয়েছিলেন সেই সব ক্ষমতা আমাকে হস্তান্তরিত করার জন্যে। নতুন রিপাবলিকের নামে আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি।

মঁসিয়ে দ্য ভারনেভোত উত্তর দিলেন: ডাক্তার ম্যাসারেল, আমি ক্যানেভিলের মেয়র। সে-ক্ষমতা যোগ্য সরকারই আমার হাতে অর্পণ করেছেন: এবং যতদিন না সেই সরকার লিখিত আদেশের বলে আমার হাত থেকে সেই ক্ষমতা তুলে নেন ততদিন পর্যন্ত আমি ক্যানেভিলের মেয়রই থাকবো। মেয়র হিসাবে টাউন হলে থাকার যোগ্যতা আমার রয়েছে; এবং এখানেই আমি থাকবো। তা ছাড়া, আমাকে এখান থেকে বার করার চেষ্টা করে দেখুন না একবার।

এই বলেই তিনি জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

সেনাপতি তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে ফিরে এলেন; তারপরে লেফটন্যান্ট পিকার্টের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে একটু রাগতভাবেই বললেন: চমৎকার লোক তুমি—কাপুরুষ কোথাকার। সেনাবাহিনীর কলঙ্ক। তোমাকে আমি পদচ্যুত করলাম।

লেফটন্যান্ট উত্তর দিলেন: চুলোয় যাক তোমার পদচ্যুতি। এই বলে তিনি একদল সহরবাসীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। লোকগুলি সেনাপতির ক্রিয়াকলাপ দেখে বিরক্ত হয়ে এতক্ষণ গজগজ করছিল।

কী করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে সেনাপতি টাউন হলের উলটো দিকে যে টেলিগ্রাফ অফিস রয়েছে সেখানে হাজির হলেন; টেলিগ্রাম করলেন তিনটি: একটি হল প্যারিসে রিপাবলিকান সরকারের সদস্যদের কাছে। আর একটি হল: রাওনে নিউ রিপাবলিকান প্রিফেক্ট-এর কাছে; আর তৃতীয় হল: দিপির নিউ রিপাবলিকান প্রিফেক্ট-এর কাছে।

তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে লিখলেন তিনি। রাজার নির্বাচিত মেয়রের হাতে টাউন হলের দায়িত্ব রাখা যে বিপজ্জনক সেকথাও তাঁদের তিনি জানালেন; তাদের হয়ে তিনি যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে রাজি রয়েছেন সেকথা জানাতেও ভুললেন না। সব লিখে নাম সই করলেন তিনি। নামের পেছনে জুড়ে দিলেন তাঁর যতগুলি খেতাব রয়েছে তাদের সব ক'টি। তারপর ফিরে এসে পকেট থেকে দশটি ফ্রাঁ বার করে অনুচরদের বললেন: বৎসগণ, এই নিয়ে তোমরা সামান্য কিছু জলযোগ করে এস। জনদশেক এখানে থাক —ওরা যেন টাউন হল ছেড়ে পালিয়ে না যায়।

ভূতপূর্ব লেফটন্যান্ট পিকার্ট এতক্ষণ ঘড়ি মেরামতকারীর সঙ্গে খোশগল্প

করছিলেন; সেনাপতির কথা শুনে তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন: ক্ষমা করবেন; কিন্তু ওরা বাইরে চলে গেলে ভেতরে ঢোকার সুযোগ হবে আপনার। অন্যথায় কেমন করে যে আপনি ভেতরে ঢুকবেন তা তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

কোন উত্তর দিলেন না ডাক্তার। লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গেলেন। বিকেলের দিকে শহরের চারপাশে তিনি প্রহরী বসালেন; মনে হল, শহরটি হঠাৎ আক্রান্ত হ'তে পারে বলে ভয় হচ্ছে তাঁর। কয়েকবারই তিনি টাউন হল আর গির্জার দরজার পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেন। সন্দেহজনক কিছু একটা দেখা বা শোনার আশায় তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। ওই দুটি বাড়িতে কোন জীবনের লক্ষণ তাঁর চোখে পড়লো না। মনে হল, দুটি বাড়িই যেন পরিত্যক্ত হয়েছে।

সন্ধ্যের দিকে দোকানপাট সব খুলে গেল। সরকারের পতন নিয়ে গাল-গল্পও চলতে লাগলো বেশ। অনেকেই ভাবলো সম্রাটকে যদি বন্দীই করা হয়ে থাকে নিশ্চয় কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে। কোন্ রিপাবলিক এল তাও তারা জানে না।

রাত্রি প্রায় নটা নাগাদ একটা কুড়োল নিয়ে ডাক্তার নিঃশব্দে টাউন হলের দরজার কাছে হাজির হলেন; দরজাটা ভাঙার জন্যে মৃদু কুড়োলের আঘাতও করলেন; হঠাৎ প্রহরীর কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "কে ওখানে?"

এই শুনেই মঁসিয়ে ম্যাসারেল দ্রুত পশ্চাৎ অপসরণ করলেন।

আর একটি দিন এগিয়ে এল। অবস্থার কোন হেরফের হল না। সৈন্য-বাহিনী পার্কের ভেতরে জমায়েৎ হল। সমস্যার সমাধান কী ভাবে হয় দেখার জন্যে আশপাশ থেকে লোক আসতে লাগলো। পাশের সব গ্রাম থেকে লোকেরা এল মস্করা দেখতে। অবশেষে নিজের সুনাম জলে ডুবছে বুঝতে পেরে ডাক্তার যে কোন উপায়ে ব্যাপারটার একটা মোকাবিলা করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। মনে মনে তিনি একটা মোক্ষম পরিকল্পনার কথা চিন্তা করছেন এমন সময় টেলিগ্রাফ অফিসের দরজাটা খুলে গেল, আর দুটি কাগজ হাতে নিয়ে পোস্টমিসট্রেসের বাচ্চা পরিচারিকাটি সেই দরজার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রথমে সে গেল সেনাপতির কাছে; তাঁর হাতে একখানি কাগজ দিয়ে পার্কের পরিত্যক্ত অংশটি অতিক্রম করে টাউন হলের দিকে এগিয়ে গেল সে; দরজায় টোকা দিল। একটু ফাঁক হল দরজাটা। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে একজন হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। সারা শহরের দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে লজ্জায় তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল।

স্বরে কাঁপন জাগিয়ে ডাক্তার চীৎকার করলেন: চুপ, চুপ।

সবাই চুপ করলে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করলেন:

সরকারের কাছ থেকে আমি এই বার্তাটি পেয়েছি।

টেলিগ্রামটি হাতে করে উঁচিয়ে ধরে তিনি পড়লেন :

পুরনো মেয়রকে ডেকে পাঠানো হল। জরুরী কাজকর্ম দেখুন। বিস্তারিত নির্দেশ যাচ্ছে।

সাব প্রিফেক্ট-এর পক্ষে
"সাপি, কাউনসিলর"

তিনি জয়ী হয়েছেন। হৃদয় তাঁর আনন্দে নাচানাচি সুরু করে দিল। হাত কাঁপতে লাগলো তাঁর। কিন্তু তাঁর ভূতপূর্ব সৈন্যাধ্যক্ষ পিকার্ট পাশের দল থেকে চীৎকার করে বললেন : সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ভেতরে যারা আছে তারা যদি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে না আসে তাহলে ও-কাগজ আপনার বেশী উপকারে আসবে না।

মঁসিয়ে ম্যাসারেলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সত্যিই তো তারা যদি বেরিয়ে না আসে? এবার তো তাঁকে যথাযোগ্য বিপ্লবী পন্থা অনুসরণ করতে হবে। এই পন্থা গ্রহণ করার যে তাঁর অধিকার রয়েছে তা-ই নয়, গ্রহণ না করলে কতব্যে অবহেলা করা হবে তাঁর। তিনি ব্যাকুলভাবে টাউন হলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি আশা করছিলেন দরজাগুলি খুলে যাবে, তাঁর প্রতিপক্ষ দলবল নিয়ে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু রুদ্ধ দরজা রুদ্ধই রয়ে গেল। কী করবেন তিনি? মহা সমস্যায় পড়লেন ডাক্তার। চারপাশ থেকে দলে-দলে লোক আসছে, তারা সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে—তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

বিশেষ করে একটি চিন্তা ডাক্তারকে বড়ই বিব্রত করে তুললো। টাউন হলটি যদি আক্রমণই করতে হয় তাহলে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে সকলের আগে। তাঁকে একেবারে হত্যা করতে পারলেই সে প্রতিরোধ নষ্ট হয়ে যাবে একথা তাঁর প্রতিপক্ষ জানেন। বিশেষ করে সেই জন্যেই তাঁদের প্রথম কাজ হবে তাঁর শির লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া; আর লক্ষ্য যে তাঁদের অব্যর্থ সে-সম্বন্ধে পিকার্ট তাঁকে আগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ তাঁর মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পোমেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন : তুমি কেমিস্ট-এর কাছ থেকে একটা ডাণ্ডা আর একটুকরো রুমাল ধার করে নিয়ে এস তো; তাড়াতাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যে পোমেল একটুকরো কাপড় আর এক বাণ্ডিল ঝাঁটা নিয়ে হাজির হলেন। ডাক্তার সেই ঝাঁটার মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে একটা অস্থায়ী পতাকা তৈরী করলেন; তারপরে সেটাকে উঁচিয়ে ধরে টাউন হলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন : মঁসিয়ে ভারনেতোত?

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। মঁসিয়ে ভারনেতোত আর তাঁর তিন সহকারী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তার একটু পিছিয়ে এলেন;

তারপর শত্রুকে ভদ্রভাবে সেলাম জানিয়ে ভাব গদগদ কণ্ঠে বললেন : মহাশয়, এইমাত্র আমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি সেইটাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

কোনরকম অভিবাদন না জানিয়েই সেই ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন : মহাশয়, আমি এ-স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছি; তবে আমি যে ভয়ে পালাচ্ছি অথবা যে ঘৃণ্য সরকার জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে তারই নির্দেশ মেনে নিয়ে এ স্থান পরিত্যাগ করছি সেটা যে সত্যি নয় তা আপনি জেনে রাখুন। তারপরে প্রতিটি শব্দ দাঁতে কেটে-কেটে তিনি বললেন : আমি যাচ্ছি তার কারণ একদিনের জন্যেও আমি রিপাবলিকের চাকরি করব না। এ ছাড়া আমার স্থানত্যাগের পেছনে অন্য কোন কারণ নেই।

চমৎকৃত হলেন মাসারেল; কোন উত্তর দিলেন না। দেহরক্ষীদের নিয়ে মঁসিয়ে ভারনেতোত টাউন হল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গর্বে আত্মহারা হয়ে ডাক্তার ফিরে এলেন স্বস্থানে : হুররে, হুররে। জয় রিপাবলিকের।

তাঁর সেই উদ্দাম উৎসাহে কেউ সাড়া দিল না। এই দেখে জনসাধারণের মনে আশা আর উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার জন্যে ডাক্তার আবার চীৎকার করলেন : জনসাধারণ আজ মুক্ত। তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন। বুঝতে পারছ, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগঠিত হও সবাই।

ডাক্তারের এই উদ্দীপনাও জনসাধারণের মনের ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করল না। এই উদাসীন লোকদের দেখে তিনি বেশ বিরক্ত হলেন। তাদের জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি চটকদার কিছু কৌশলের আশ্রয় নেবেন ঠিক করলেন। কৌশলও খেলে গেল তাঁর মগজে; তিনি পোমেলকে হুকুম দিলেন : ভূতপূর্ব সম্রাটের মূর্তি মিউনিসিপ্যাল কাউনসিল হলে বসানো রয়েছে। তুমি সেই মূর্তিটা নিয়ে এস। সেই সঙ্গে আনবে একখানা চেয়ার।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আধখানা প্ল্যাসটারের মূর্তি ডান কাঁধের ওপরে চাপিয়ে বাঁ হাতে খড়ের ছাউনি দেওয়া একখানা চেয়ার ঝুলিয়ে লেফটন্যান্ট পোমেল হাজির হলেন।

চেয়ারের ওপরে সম্রাটের মূর্তিটা বসালেন মাসারেল; তারপরে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সম্রাটের চোখে চোখ রেখে তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন

অত্যাচারী দস্যু! অত্যাচারী দস্যু! অবশেষে তোমার পতন হল। তুমি এখন ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছ; তোমার দেহ আজ কর্দমাক্ত। একটা দেশ তোমার পায়ের তলায় পড়ে গোঙাচ্ছিল। তার ফল তুমি পেয়েছ। পরাজয় আর অপমানের গ্লানি আজ তোমার সারা শরীরে মাখা। তুমি আজ পরাজিত, প্রাশিয়ানদের হাতে তুমি আজ বন্দী; এবং তোমার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের

ওপরে নতুন রিপাবলিকের জন্ম হয়েছে; তোমার ভাঙা তরোয়াল কুড়িয়ে নিয়েছে তারা।

তিনি ভেবেছিলেন এই বক্তৃতার পরে সবাই করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু কারও মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোল না; কেউ করতালিও দিল না। হতভম্ব জনতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর সে গাল জুড়ে বিরাট গোঁফ জোড়া নিয়ে সম্রাটের মূর্তিটি কাঁটা দিয়ে শক্ত করে আঁটা নাপিতের দোকানের মূর্তির মত নিশ্চল রাজার আবক্ষ প্রতিকৃতিটি তাঁর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসিতে নিঃশব্দে ফেটে-ফেটে পড়লো।

তাঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। নেপোলিয়ন চেয়ারের ওপরে, আর তাঁর কাছ থেকে তিন পা দূরে ডাক্তার মাসারেল। হঠাৎ সেনাপতি চটে উঠলেন। কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি; তাঁর হাতটা কোমরে ঝোলানো পিস্তলের ওপরে গিয়ে পড়লো। পিস্তলটা খুলে নিয়ে দু'পা এগিয়ে এলেন তিনি; তারপরে ভূতপূর্ব সম্রাটকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। গুলিটা সম্রাটের কপালে একটা কালো গর্ত করে বেরিয়ে গেল। আর কিছু হল না। জনতার ওপরে কোন রকম প্রভাব বিস্তারিত হল না। তারপরে তিনি দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়লেন। আর একটা গর্ত দেখা দিল সম্রাটের কপালে। তারপরে পর-পর কয়েকটা গুলি করে সব গুলি শেষ করে ফেললেন তিনি। নেপোলিয়নের কপাল গুঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর চোখ, নাক আর গোঁফের সুন্দর রেখাটি অটুট রয়ে গেল। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ডাক্তার এক ঘুষি মেরে নেপোলিয়নকে চেয়ার থেকে উলটিয়ে দিলেন মাটির ওপরে; একটা পা দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সম্রাটের প্রতিকৃতির ওপর চেপে হতভম্ব জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন: এইভাবে সমস্ত অত্যাচারী নিপাত যাক।

তবু জনতার কাছ থেকে কোন উদ্দীপনার বাণী শোনা গেল না। তারা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। মুখে তাদের কোন শব্দ নেই। সেনাপতি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এবারে সব বাড়ি যাও। এবং তিনি তাঁর নিজের বাড়ির দিকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগোতে লাগলেন; মনে হল, কেউ যেন তাঁর পিছু নিয়েছে।

তিনি বাড়িতে ফিরলে তাঁর পরিচারিকা তাঁকে জানালো যে কতকগুলি রোগী তাঁর জন্যে তিন ঘণ্টা তাঁর অফিস ঘরে অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। রোগীদের মধ্যে সেই পুরনো শিরা-ফোলা রোগী দুটিও রয়েছে, তারা সকাল বেলাতেই আবার ফিরে এসেছে। রোগী দুটিই গোঁয়ার; কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল তারা।

ডাক্তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ লোকটি তার রোগের ব্যাখ্যা করতে

শুরু করল : মনে হচ্ছে যেন পিঁপড়ের দল আমার পায়ের সিঁড়ি বেয়ে কেবল ওঠা-নামা করছে।

চূড়ান্ত পরাজয়

(Checkmate)

কর্সিকার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম তুরিনে। নাইস-এ পৌঁছিয়ে আমি বাস্তিয়াগামী জাহাজ ধরলাম। জাহাজ ছাড়ার পরেই একটি যুবতীকে ব্রিজের ওপরে বসে থাকতে দেখলাম। যুবতীটি লাবণ্যময়ী; পোশাকের মধ্যেও কোন চটক ছিল না তাঁর। ব্রিজের ওপরে বসে তিনি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি ভাবলাম : এই সমুদ্রযাত্রায় উনিই আমার বন্ধু।

যুবতীটি যেখানে বসেছিলেন তাঁর ঠিক উলটো দিকে বসলাম আমি। তাঁর দিকে তাকালাম। একটি অপরিচিতা আর সেই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক কোন যুবতীকে দেখলে মানুষের মনে সাধারণভাবে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগে তাঁকে দেখে আমার মনেও প্রায় সেই ধরনেরই কিছু প্রশ্ন জাগলো। কোন শ্রেণীর মহিলা, তাঁর বয়সই বা কত? স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে মহিলাটিই বা কেমন? তারপর চর্মচক্ষে সে যা দেখতে পায় তা থেকেই সে কল্পনা করে নেয় যা সে দেখতে পায় না। চোখ আর মন মহিলাটির বক্ষ আবরণী ভেদ ক'রে পরিধেয়ের অন্তরালে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সে বসে থাকলে তার দেহের প্রতিকৃতিটি লক্ষ্য করে। দেখতে চেষ্টা করে তার পায়ের গোড়ালি। সে মেয়েটির হাতের বুনানির দিকে তাকিয়ে থাকে; এরই ভেতর দিয়ে মেয়েটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লালিত্য প্রকাশ পায়। তার কানের গঠন আর আয়তন—তা-ও তার চোখ এড়ায় না। জন্ম-লিপির চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরতার সঙ্গে এই দুটি জিনিস তার জন্মের ইতিহাস মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। সে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে; এবং মেয়েটির স্বর শুনে সে তার মনের সন্ধান পায়। কারণ, যে-কোন অভিজ্ঞ মানুষের কাছেই কোন মেয়ের উচ্চারণ-ভঙ্গির চারুকলা তার অন্তরের রহস্যময় গঠনটি প্রকাশ করে দেয়। যদিও মহিলাদের অন্তরের রহস্য ভেদ করা সত্যিই বড় কঠিন তবু মানুষের চিন্তা আর সেই চিন্তা প্রকাশ করার মধ্যে বেশ একটা সমঝোতা রয়েছে।

সেই জন্যেই আমার প্রতিবেশিনীটিকে বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করলাম আমি। তার হাবভাব মুখ আর হাত নাড়ার ভঙ্গি, চেয়ে থাকার ভঙ্গি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার রীতি—সব ক'টিই মনযোগ দিয়ে আমি দেখতে লাগলাম।

যুবতীটি ছোট একটা ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে নিলেন। আমি হাত কচলে বললাম: কী পড়ছেন আমাকে বলুন, আপনি কী করেন তা আমি বলে দেব।

তিনি একটা লেখা পড়ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল সুস্বাদু উপাদেয় ভোজ্য বস্তু মানুষ যেরকম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করে তিনিও লেখাটি পড়ছেন সেই রকম আনন্দের সঙ্গে। কাগজের নামটা আমার চোখে পড়ে গেল: একো দ্য প্যারিস। কাগজের নামটা দেখেই আমি কিছুটা গোলমালে পড়ে গেলাম। স্কলের লেখা কেচ্ছা-কাহিনী পড়ছেন তিনি। তাজ্জব ব্যাপার —স্কল পড়ছেন তিনি! স্কল! পড়তে-পড়তে তিনি হাসতে লাগলেন; হাসিটি নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গাত্মক। তাহলে তিনি বিনয়ী নন; এমন কি মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে অজ্ঞ সে কথা বলা যায় না জোর করে। আরও ভাল। ভদ্রমহিলা তাহলে স্কলের পাঠিকা—আমাদের জাতীয় রসিকতা, তার সূক্ষ্ম বয়নশিল্প, তার রুচি, এমন কি তার ঝাল—সবই তাঁর ভাল লাগে। লক্ষণটা ভালই বলতে হবে। ভাবলাম—অন্য দিক থেকে বাজিয়ে দেখা যাক তাঁকে।

উঠে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম; তারপর তাঁরই মত মনযোগ সহকারে ফেলিকস ফ্র্যাঙ্কের একটা কবিতা সঙ্কলন পড়তে লাগলাম। রাস্তায় পড়ার জন্য বইটা আমি কিনে নিয়ে এসেছিলাম।

লক্ষ্য করলাম উড়ন্ত পাখি যেমনভাবে মাছি ধরে ফেলে সেই রকম দক্ষতার সঙ্গে চকিতে তিনি আমার বইটির মলাট থেকে বইটির নাম পড়ে নিয়েছিলেন। কয়েকটি পুরুষ যাত্রী এপাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখলো। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। শহরের কেচ্ছার মধ্যে তিনি ডুবে রইলেন। পড়া শেষ করে কাগজটা ভাঁজ করে আমাদের দুজনের মধ্যে যে জায়গা ছিল সেখানে রেখে দিলেন।

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নুইয়ে আমি বললাম: আপনার কাগজটা একটু দেখতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সেই অবসরে আমার এই কবিতা সঙ্কলনটা একটু দেখবেন নাকি?

হ্যাঁ নিশ্চয়। পড়তে মজা লাগবে তো?

প্রশ্নটা শুনে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। কবিতা পড়তে গিয়ে কেউ সাধারণত এই রকম প্রশ্ন করে না। বললাম: তার চেয়েও ভাল লাগবে, বইটি বড় চমৎকার—সত্যিকার কবির রচনা।

তাহলে আমাকে দিন।

বইটি নিয়ে তিনি পাতা ওলটাতে লাগলেন। পড়তে-পড়তে মনে হল একটু অবাকও হচ্ছেন। কেন অবাক হচ্ছেন তা যেন তিনি-ও ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাঁর রকম সকম দেখে মনে হল কবিতা পাঠে তিনি বিশেষ অভ্যস্ত নন।

আমি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : ভাল লাগছে ?

হ্যাঁ। তবে আমি মজার জিনিসই ভালবাসি—মানে, বেশ মজার লেখা। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভাবপ্রবণ।

আমরা কথা বলতে সুরু করলাম। জানতে পারলাম তাঁর স্বামী অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপটেন; সম্প্রতি অ্যাজাকিয়োতে রয়েছেন; এবং সেখানেই স্বামীর কাছে যাচ্ছেন তিনি।

অনতিবিলম্বেই আমার মনে হল এই স্বামীটির ওপরে আকর্ষণ তাঁর কম। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন না; তবে হ্যাঁ, সামান্য একটু টান যে নেই সেকথাও বলা যায় না। প্রাক বিবাহিত যুগের কোন আশাই যে স্বামী পূরণ করতে পারে নি তার ওপরে এই জাতীয় টান প্রত্যেক স্ত্রীরই থাকে। ভদ্রলোক চাকরি জীবনে এক সৈন্য শিবির থেকে আর একটি শিবিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—একটি ছোট সহর থেকে আর একটি ছোট সহরে—শুধু ছোট নয়—বিবর্ণ। বর্তমানে তিনি ওই দ্বীপটিতে রয়েছেন। সেটাও নিশ্চয় খুব আরামের জায়গা হবে না। না, না। প্রত্যেকের জীবন সুখের হ'তে পারে না, হ'তে পারে না আনন্দের। বরং বাবা মার সঙ্গে তিনি লিয়নসএ থাকবেন—সেও ভাল; কারণ, ওখানকার সকলকেই তিনি চেনেন। কিন্তু এখন তাঁকে কর্সিকায় যেতে হচ্ছে। চাকরিতে যথেষ্ট সুনাম থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী মশাই তাঁর স্বামীর ওপরে যথেষ্ট অবিচার করেছেন।

এবং কোথায় তিনি থাকতে ভালবাসেন তা নিয়ে আমাদের কিছুটা আলোচনা চলল।

জিজ্ঞাসা করলাম : প্যারিস ভাল লাগে আপনার ?

তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন : ওঃ প্যারিস ভালবাসি কি না ? এরকম প্রশ্ন আপনি কী করে করলেন ?

তারপরেই তিনি একেবারে গদগদ হয়ে পড়লেন। চাপা ঔদরিকতার বেদনা; দেহাতিদের অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নিয়ে দূর থেকেই প্যারিসের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন। জানালার ধারে টাঙানো খাঁচায় পোরা পাখি যে রকম উন্মত্ত অধৈর্যে সারাদিন, দূরের অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে তিনিও তেমনি প্যারিসে যাওয়ার জন্যে সব সময়েই অধীর হয়ে দিন কাটান।

প্যারিসের সম্বন্ধে আমাকে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্যারিসের সম্বন্ধে সব কথা তিনি শুনতে চান। প্রশ্নের বাণে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে তিনি অনেক নামী আর বেনামী মানুষদের সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইলেন। প্যারিসে অনেক বিখ্যাত মানুষের নাম তিনি শুনেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন; সেই তালিকায় এমন অনেকেই ছিলেন যাঁদের নাম আমি কোন দিন শুনি নি।

মঁসিয়ে গুনো কেমন আছেন ? মঁসিয়ে সাদ্‌র্‌ রই বা খবর কী ? মঁসিয়ে

সার্ত্র-র নাটকগুলি কী চমৎকার? আমার বড় ভাল লাগে পড়তে। একদিন দেখলে সারা সপ্তাহ ধরে আমি স্বপ্ন দেখি। মঁসিয়ে ভাতেত-এরও বই পড়েছি আমি, বইটার নাম সকো। আপনি পড়েছেন? ভাতেত দেখতে কী খুব সুন্দর? তাঁকে আপনি দেখেছেন? আর মঁসিয়ে জোলা? কেমন দেখতে তিনি? তাঁর জার্মিনেল পড়ে আমি কেঁদেছিলাম তা যদি আপনি দেখতেন? অন্ধকারে যে বাচ্চাটা মারা গেল তাকে আপনার মনে রয়েছে? ওঃ, কী ভয়ঙ্কর। আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার কথা শুনে বিদ্রূপ করবেন না। বর্গেতি-এর একখানা বই-ও আমি পড়েছি। বইটার নাম "ক্রুয়েল এনিগমি"। মঁসিয়ে, আমার একটি খুড়তুতো বোন উপন্যাসটি পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে সেই বর্গেতকে একখানা চিঠি লিখেছিল। আমার ধারণা বইটা খুবই রোমান্টিক তবে হাস্যরসটাই আমার বেশী ভাল লাগে। মঁসিয়ে গ্রেভিঁকে আপনি চেনেন? মঁসিয়ে কোকোলিন, মঁসিয়ে দামালা, মঁসিয়ে রচিফোর্ট—এঁদের জানেন? সবাই বলে রচিফোর্ট একজন চিন্তাশীল লেখক। এবং মঁসিয়ে ত্ব ক্যাসাগন্যাক? এটা কি সত্যি রোজ একটা করে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন...।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁর প্রশ্নের ভাঁড়ার শূন্য হল; আমার কিছু উত্তর পেয়ে এবং বাকিগুলি নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পরম আত্মতৃপ্তিতে শান্ত হলেন তিনি। তারপরে কথা বলার সুযোগ পেলাম আমি।

সমাজের নানা গল্প তাঁকে আমি বললাম। সত্যিকার সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি প্যারিসের সেই শহুরে-সমাজের গল্প শোনালাম তাঁকে। কান আর মন দিয়ে সে-সব গল্প তিনি শুনলেন। সুন্দরী এবং নামজাদা প্যারিস মহিলাদের সুন্দর একটি ছবি নিশ্চয় তাঁর মনে গাঁথা হয়ে ছিল। তাঁদের সারা জীবন প্রেম-বৈচিত্র্য, গোপন সাক্ষাৎকারের জন্যে স্থান আর সময় নির্ধারণ, দ্রুত অভিযান এবং উচ্ছ্বাসময় পরাজয়ে ভারাক্রান্ত। এগুলি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী তাঁদের জীবনে নেই। আমার মুখ থেকে সেই সব কাহিনী শুনে তিনি বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন; সত্যিকার সোসাইটি বলতে কি এদের বোঝায়?

সবজান্তার হাসি হেসে আমি বললাম: নিশ্চয়। মধ্যবিত্ত চরিত্রের মহিলারাই তাদের ধর্ম আর সতীত্বের জন্যে প্যারিসে বিবর্ণ জীবন কাটায়। সেই সতীত্বের জন্যে কেউ তাদের এতটুকু প্রশংসা করে না।

এবং এই সমস্ত মানবিক গুণগুলিকে অর্থহীন অবাস্তব প্রমাণ করার জন্যে কখন-ও ব্যক্তিগত, কখনও দার্শনিক উক্তির আশ্রয় নিলাম আমি। সেই সমস্ত রমণী যারা দুর্বল একটা চারিত্রিক সততা বজায় রাখার জন্যে স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়, এবং জগতের অফুরন্ত প্রাণ সম্পদকে অবহেলা করে

অনেক সুন্দর জিনিস থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে যারা কবরে আশ্রয় গ্রহণ করে—সেই সব বঞ্চিতা রমণীদের নিয়ে আমি বেশ কিছুটা ঠাট্টা বিদ্রূপ করলাম; একটা স্বামী রয়েছে বলে যে সব মহিলা বহিঃজীবনের অমৃত পান করতে বিরত হয়, গোপন চুম্বনের জ্বালাময় মদিরা পান করে জীবনকে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তুলতে সাহস পায় না, প্রেমের উচ্ছ্বাসে পঙ্কিল স্রোতে যে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় না—তাদের উপহাস করে আমি অনেক মনোজ্ঞ কথা বললাম। তবে তা স্পষ্ট ভাষায় নয়; ব্যঙ্গোক্তি, বক্রোক্তি জাতীয় নানাবিধ রসাল উক্তির মাধ্যমে।

রাত্রি নেমে এল—শান্ত, গরম রাত্রি। নক্ষত্র খচিত মদের মত কালো আকাশের নীচে বিরাট জাহাজটি কাঁপতে-কাঁপতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। দেহাতি মহিলাটি এখন তাঁর কথা বলা বন্ধ করেছেন। এখন তিনি ছোট-ছোট নিঃশ্বাস ফেলছেন; আর মাঝে-মাঝে ছাড়ছেন দীর্ঘশ্বাস, হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। শুভ রাত্রি মঁসিয়ে।

আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি।

আমি জানতাম পরের দিন সন্ধ্যায় বাস্তিয়া থেকে যে গাড়ি অ্যাজাকিয়ো যায় সেই গাড়ি ধরতে হবে ভদ্রমহিলাকে, এবং সারারাত্রি সেই গাড়িতে চেপে তাঁকে পাহাড় টপকাতে হবে। তবেই তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবেন।

বললাম: শুভ রাত্রি মাদাম।

এবং আমিও আমার কেবিনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

পরের দিন যে-কাজটি আমি প্রথম করলাম সেটি হচ্ছে অ্যাজাকিয়োগামী গাড়িটিতে নিজের নামে তিনটি আসন সংরক্ষিত করা।

সন্ধ্যের পর যে পুরনো গাড়িটা বাস্তিয়া ছেড়ে যাচ্ছিল সেই গাড়িতে ওঠার সময় কনডাকটর আমাকে জিজ্ঞাসা করল একজন ভদ্রমহিলার জন্যে আমার সংরক্ষিত একটি কোণের আসন ছেড়ে দিতে পারব কিনা।

আমি বেশ রূঢ়ভাবেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন্ ভদ্রমহিলা?

ভদ্রমহিলা একটি অফিসারের পত্নী। অ্যাজাকিয়োতে যাবেন।

তাঁকে বলুন তিনি একটা আসন নিলে আমি খুশি হব।

ভদমহিলাটি এলেন। সারাদিন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন বলে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন; তারপরে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি গাড়িতে উঠে এলেন।

গাড়ি তো নয়, একখানা সিল-করা বাক্স—চাপা। এর ভেতরে বাইরের বাতাস ঢোকে না; একবার ঢুকলে সে-বাতাস আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এর মধ্যে আলো ঢোকে দুটি মাত্র দরজা দিয়ে। সুতরাং আমরা দুজনে একটা ঘরে বন্ধ হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা

চলতে শুরু করল; তারপরে পাহাড়ী রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলো। একটা তাজা মসলার জোরালো মিষ্টি গন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের নাকে এসে লাগলো। এই গন্ধ কর্সিকা আর আশপাশের বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। জাহাজের ওপরে নাবিকরা এই গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে সমুদ্রের জলে ভেসে যায়। গন্ধটা তীব্র; অনেকটা দেহের গন্ধের মত; প্রখর সূর্যের তাপে সবুজ মাটির যে ঘাম ঝরে পড়ে সেই গন্ধ মসলা গন্ধের সঙ্গে মিশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার সময় যে রকম উগ্র হয়ে যায় এই গন্ধ সেই রকম উগ্র।

আমি আবার প্যারিসের গল্প সুরু করলাম; তিনি উৎসাহ নিয়ে সেই সব গল্প শুনলেন। আমার গল্পগুলি এবার হল দুঃসাহসিক—যে গল্পগুলি মানুষের রক্তকে টগবগ করে ফুটিয়ে তোলে। সেই সব গল্পগুলি দ্ব্যর্থবাচক, পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় ভরপুর।

রাত্রি এগিয়ে এল। অন্ধকারে ভরে উঠলো চারপাশ। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না আর; এমন কি ভদ্রমহিলার সাদা মুখটি পর্যন্ত নিকষ কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কেবল মাত্র সহিসের লণ্ঠন থেকে যেটুকু আলো চারটে ঘোড়ার ওপরে এসে পড়েছিল সেই আলোতেই বুঝতে পারলাম ঘোড়াগুলো ধীরে-ধীরে পাহাড়ী পথের চড়াই ভাঙছে।

ধীরে-ধীরে আমার একটা পা ছড়িয়ে দিলাম। সেই পা-টি ভদ্রমহিলার পায়ে গিয়ে লাগলো; কিন্তু তিনি তাঁর পা সরিয়ে নিলেন না। চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। তারপরে হঠাৎ আমার স্বরে পরিবর্তন দেখা গেল; আমি মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে লাগলাম। এরই ফাঁকে এক সময় আমি আমার একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম—তাঁর হাতে গিয়ে সেই হাতটি ঠেকলো। তিনি তাঁর হাত-ও সরিয়ে নিলেন না। আমি কথা বলে গেলাম—তাঁর কানের কাছে মুখটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কথা বললাম, তারপরে তাঁর মুখের কাছে। বুঝতে পারলাম আমার বুকের ওপরে তাঁর বুকটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। তাঁর বুকটা বেশ দ্রুততালে কাঁপতে লাগলো—আর বেশ জোরে-জোরে। উত্তম কথা। তারপরে ধীরে-ধীরে তাঁর ঘাড়ের ওপরে আমার মুখটা আমি চাপলাম—আমি নিশ্চিন্ত হলাম, প্রয়োজন হলে বাজি ধরতেও আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হোত না, যে আমি তাঁকে পেয়েছি, তাঁকে সম্পূর্ণ-রূপে অধিকার করেছি আমি—তিনি বর্তমানে আমার।

কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠেই ঝাঁকানি দিলেন, মনে হল হঠাৎ তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। তারপরেই তিনি এত জোরে আমাকে ধাক্কা দিলেন যে আমি গাড়ির অন্য প্রান্তে গড়িয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা কী হল বুঝতে পারার আগেই তিনি জোরে-জোরে পাঁচ ছ'টা চড় কষালেন; তারপর প্রচণ্ড বেগে ঘুষি, কিল, চড় মারতে লাগলেন আমাকে। সেই অন্ধকারে ঘুষিগুলো কোন্‌দিক থেকে আসছে বুঝতে না পারার ফলে আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে

প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

তাঁর হাত দুটো ঝাপটে ধরার জন্তে বৃথাই হাত দুটোকে বাড়িয়ে দিলাম। তারপরে আর কী করা যায় বুঝতে না পেরে আমি পিঠটা পেতে দিলাম। ভাবখানা হচ্ছে ঝড়ঝাপটা যা আসে সব পিঠের উপর দিয়েই যাক ; মাথাটা আপাতত বাঁচুক।

তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, বিশেষ করে তাঁর ঘুষির শব্দ থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনিও হঠাৎ ঘুষি মারা বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরে তিনি তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন ; তার-পরেই চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। সেই কান্নার সুরু হল ফোঁপানো। তা-ও চলল অন্তত ঘণ্টাখানেক।

আমিও নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম। নিজের কাজের জন্যে শুধু ব্যথিত নয়, লজ্জিত-ও হলাম যথেষ্ট। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। কিন্তু বলার আর ছিল কী ? আমার মাথায় কিছুই এল না। ক্ষমা চাইব ? সম্ভব নয়। আপনি হলে এক্ষেত্রে কী করতেন ? আমি বাজি রেখে বলতে পারি—কিছুই পারতেন না।

এখন তাঁর কান্নার বেগ কমেছে। ধীরে-ধীরে ফোঁপাচ্ছেন তিনি। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তাঁর অবস্থা দেখে দুঃখ আর অনুশোচনায় আমিও ভেঙে পড়লাম। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার, একটু আদর করার, তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার, তাঁর কাছে হাঁটু গেড়ে বসার। কিন্তু সে সাহস আমার হল না।

এই রকম পরিস্থিতি মানুষকে সত্যিকারের বোকা বানিয়ে তোলে।

তারপরে একসময় তিনি ঠাণ্ডা হলেন। আমরা চুপচাপ, নিঃশব্দে যে যার জায়গায় বসে রইলাম ; মাঝে-মাঝে ঘোড়া বদল করা ছাড়া, গাড়ি তার নিজের গতিতে গড়িয়ে চলল। এই ঘোড়া পরিবর্তন করার সময় আস্তাবলের তীব্র আলো যখন আমাদের কোচের মধ্যে ঢুকে আসতো, তখন পাছে আমাদের চোখাচোখী হয়ে যায় এই ভয়ে আমরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চোখ বন্ধ করে দিতাম। আবার গাড়ি ছাড়তো। আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতাম আমরা। তারপরে কর্ণিকার সেই পাহাড়ী মসলার তীব্র সুগন্ধ আমাদের গায়ে-মাথায় তার স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগলো, মদের উত্তেজনায় শিরা চনমন করে দিল মাথার তন্ত্রীগুলিকে।

হায় ভগবান, আমার সঙ্গিনীটি যদি তাহা মূর্খ না হতেন তাহলে এই নিশীথ ভ্রমণটিকে অনবদ্য অপরূপ বলে স্মৃতির মন্দিরে তুলে রাখতে পারতাম।

কিন্তু ধীরে ধীরে বিবর্ণ ঊষার আলো কোচের মধ্যে ঢুকতে লাগলো। প্রতিবেশিনীর দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। তিনি ঘুমের ভান করে পড়ে

রয়েছেন। পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় সূর্যের কিরণ সোনালী আভায় ছড়িয়ে পড়লো। উপসাগরের তীরে তখনও পর্যন্ত ছায়ায় ঢাকা একটি শহরের সাদা মূর্তি জেগে উঠলো অস্পষ্টভাবে।

এমনি একটা সময়ে আমার সঙ্গিনীটি ঘুম থেকে জেগে ওঠার ভান করলেন। তিনি তাঁর রঙিন চোখ দুটি খুললেন; হাই তুললেন, একই ভাবে মুখ ব্যাদান করলেন; এমন একখানা ভাব দেখালেন যেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছিলেন। একটু দ্বিধা করলেন তিনি, একটু যেন লজ্জা পেলেন; তার-পরেই কিন্তু-কিন্তু করে বললেন: আমরা কি এসে গিয়েছি?

বললাম: হ্যাঁ, মাদাম। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাব।

আকাশের অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন: ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে সারা রাত কাটানো সত্যিই বড় কষ্টকর।

বললাম: হ্যাঁ। যা বলেছেন। এতে মানুষের ঘাড় ভেঙে যায়।

বিশেষ করে পাহাড় ডিঙানোর সময়।

হ্যাঁ; তাই।

অ্যাজাকিয়ো আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, মাদাম।

ওখানে পৌছতে পারলে বাঁচি।

আমিও সেই কথাই ভাবছি।

স্বর শুনে মনে হল, কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। তাঁর বলার ধরনটা কেমন যেন বেখাপ্পা। তাঁর সঙ্গে আমার চোখের মিলন প্রায়ই হচ্ছে না। কিন্তু মনে হল গত রাত্রির সমস্ত কাহিনীই তিনি ভুলে গিয়েছেন।

আমি তাঁর প্রশংসাই করলাম। কী ধরনের রঙ্গময়ী নারী, কী ধরনের দক্ষ রাজনীতিবিদ।

সত্যিকথা বলতে কী আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌছলাম। হারকিউলিস-এর মত শক্তিশালী বিশাল চেহারা একটি অশ্বারোহী অফিসার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কোচটি চোখে পড়তেই তিনি রুমাল নাড়তে লাগলেন।

আমার সঙ্গিনীটি কোচ থামামাত্র মাটিতে নেমে সেই পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরে প্রবল উচ্ছ্বাসে গুণে-গুণে অন্তত কুড়িটি চুমু খেল; চুমু খেতে-খেতে কেবলই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: তুমি ভাল আছ? তোমাকে আবার দেখার জন্যে আমি ছটফট করে মরে যাচ্ছিলাম।

ছাদের ওপর থেকে আমার ট্রাঙ্কটা আমার হাতে নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বিচক্ষণতার সঙ্গে কেটে পড়ছিলাম; হঠাৎ ভদ্রমহিলাটি চীৎকার করে উঠলেন: আরে, আরে; আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই আপনি চলে যাচ্ছেন যে বড়।

আমি কিন্তু-কিন্তু করে বললাম : মাদাম, আপনাদের এই আনন্দের মিলনে আমি বাধার সৃষ্টি করতে চাই না।

তখন তিনি তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন : ডারলিঙ, এই ভদ্রলোক-টিকে ধন্যবাদ দাও। সারা পথটা উনি আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করে এসেছেন। এমন কি, ওই কোচে যাতে আসতে পারি সেই জন্যে ওঁর একটি সংরক্ষিত আসন পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন। পথে-ঘাটে এই রকম সঙ্গী বন্ধু পাওয়াটা সত্যিই বড় আনন্দের।

স্বামীটি আমার সঙ্গে করমর্দন করে ধন্যবাদ জানালেন আমাকে।

সেই যুবতী স্ত্রীটি হাসতে-হাসতে লক্ষ্য করলেন আমাদের।

আমাকে তখন নিশ্চয়ই ভাঁড়ের মত দেখাচ্ছিল শুধু ভাঁড় নয়, যে ভাঁড়ের দেখা কচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায় সেই রকম ভাঁড়।

পরীক্ষা

(The Test)

বনভেলরা বেশ আমুদে দম্পতি, একটু যা বিবাদপ্রিয়। ঝগড়াঝাটি তাঁদের মধ্যে নিয়তই হয়; এবং তা সামান্য কারণেই। কিন্তু তা কোনদিনই মেয়াদী নয়; তাড়াতাড়ি তাঁদের সেই ঝগড়া মিটে যায়।

মঁসিয়ে বনভেল ব্যবসা করে যথেষ্ট অর্থ জমিয়েছেন। সাধারণভাবে খেয়ে পরে আনন্দ করে বেঁচে থাকার মত ব্যবস্থা করে তিনি অবসর নিয়েছেন। তারপরে, সেন্ট জারমেন-এ ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করছেন।

খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ তিনি। তাঁর দৃঢ়মূল ধারণাগুলিকে বেশ কষ্টের সঙ্গেই নতুন যুগের নতুন ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে মাজাঘষা করে নিতে হয়েছে। কিছুটা লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন; একটু উঁচু ভাব-ধারার কাগজপত্রই তিনি পড়তেন, তবে, মোটা ধরনের ঠাট্টাও তিনি বেশ উপভোগ করতে পারতেন। ফরাসী মধ্যবিত্তের যেগুলি সবচেয়ে বড় গুণ, সেই নীতিজ্ঞান, যুক্তি দিয়ে কথা বলার চেষ্টা, এবং বাস্তব শুভবুদ্ধি—এগুলি তাঁর মধ্যেও ছিল। চিন্তার জগতে তাঁর বিশেষ বক্তব্য সংখ্যায় অনেক ছিল না; যে ক'টি ছিল সেগুলির ভিত ছিল বড় মজবুত; এবং যে সব ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিত হতেন যে তিনি অভ্রান্ত সেই সব ক্ষেত্রেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের মতটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেন।

উচ্চতায়, মাঝামাঝি ধরনের চেহারা তাঁর, তবে সম্ভ্রান্ত। মাথার চুলে পাক ধরেছিল কিছু-কিছু।

তাঁর স্ত্রীর সত্যিকার সদগুণ ছিল অনেক; তবে কিছু দোষও ছিল তাঁর, চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন উচ্ছ্বাসপ্রবণা; কোন কিছু রেখে-ঢেকে বলা বা করা ছিল তাঁর অভ্যাসের বাইরে; সেই জন্যে অনেক সময়েই তাঁর বক্তব্য বা কর্মপ্রচেষ্টা মারমুখী হয়ে দাঁড়াতো; একটু একগুঁয়ে ছিলেন তিনি। মানুষের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল অনির্বাণ। এক সময়ে দেখতে তিনি সুন্দরীই ছিলেন; সম্প্রতি একটু বেশী মাত্রায় স্থূলকায়া হয়ে পড়েছেন। প্রসাধনের মাত্রাটাও বাড়িয়েছেন বেশ; কিন্তু তবু সেন্ট জারমেন-এর সমাজে তিনি এখনও সুন্দরী মহিলা হিসাবে পরিচিত—যদিও বিশ্রী রকমের স্থূলাঙ্গিনী বলে দুর্নামও কিছুটা তাঁর ছিল।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদটা প্রায়ই সুরু হত খাবার সময় কতকগুলি আজে-বাজে আলোচনা করতে-করতে। তারপরে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, মাঝে-মাঝে পরের দিন পর্যন্তও এই বাক্যালাপ বন্ধ থাকতো। তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ, সাধারণ এবং সীমাবদ্ধ। সেই জন্যেই বোধ হয় ছোট-ছোট বিষয়ের গুরুত্ব তাঁদের কাছে এত বেশী ছিল; এবং প্রতিটি আলোচনাই শেষ পর্যন্ত পরিণত হ'ত বিবাদে। হাতে জরুরী কাজ থাকলে অবশ্য এরকম বিবাদের সুযোগ থাকতো না; তখন পরস্পরের জন্যে উদ্বেগ তাঁদের আচ্ছন্ন করে ফেলতো। পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার খাতিরে নিজেদের মধ্যে একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হ'তেন তাঁরা।

কিন্তু সেন্ট-জারমেন-এ তাঁদের আলাপ পরিচয় খুব কম লোকের সঙ্গেই ছিল। এই রকম একটি অপরিচিত সমাজে, একটি নতুন এবং সম্পূর্ণরূপে কর্মহীন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, কিছু নতুন বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তাঁদের। তারপর, প্রতিটি দিন একঘেয়ে আর একই রকমের কর্মহীন থাকার ফলে নিজেদের মধ্যে খিটির-মিটির তাঁদের লেগেই ছিল; এবং যে শান্তির আশায় তাঁরা এখানে বাসা বেঁধেছিলেন সে-আশা পূরণ হল না।

জুন মাসের সকালে তাঁরা লাঞ্চের টেবিলে বসেছেন এমন সময় বনডেল জিজ্ঞাসা করলেন: রু ত্ব বারসিউ-এর শেষে ছোট লাল বাড়িটায় যাঁরা থাকেন তাঁদের তুমি জান?

এই প্রশ্নের মধ্যে মাদাম বনডেল নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধির গন্ধ পেয়েছিলেন; তিনি বললেন: হ্যাঁ-ও বলতে পার, না-ও বলতে পার। তাঁদের মুখ চিনি; তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করার আগ্রহ নেই আমার।

কেন বলতো? মনে হয় ওরা বেশ ভালই।

কারণ····

আজ সকালে স্বামীটির সঙ্গে আমার দেখা হল। আমরা দুজনে একটু বেড়ালাম আর কি।

আকাশে মেঘের সমাগম হচ্ছে বুঝতে পেরে, বনডেল তাড়াতাড়ি যোগ করলেন: অবশ্য ভদ্রলোকই যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, এবং কথা সুরু করলেন প্রথমে।

স্বামীর দিকে বিরক্তির দৃষ্টি হেনে মাদাম বললেন: তাঁকে এড়িয়ে চললে ভালই করতে।

কিন্তু কেন?

কারণ, তাঁদের নিয়ে চারপাশের লোকেরা কানাঘুষা করছে।

কানাঘুষা! হায় ভগবান! তবে মানুষ তো সব সময়ই অপরের কুৎসা গাইছে।

মঁসিয়ে বনডেল মূর্খের মত কিছুটা জোর করেই তাঁর বক্তব্য রাখলেন: তুমি জান এই কানাঘুষার ওপরে আমার বেশ একটা ভীতি জন্মে গিয়েছে। লোকে যে ওঁদের সম্বন্ধে কথা বলছে বিশেষ করে সেই জন্যেই ওঁদের আমার ভাল লাগে। আর আমার কথা যদি ধর, তাহলে অবশ্য সত্যি কথা বলাই ভাল, ওঁদের আমার ভালই লাগে।

ক্ষেপে গেলেন মাদাম; জিজ্ঞাসা করলেন: স্ত্রীটিকেও নিশ্চয়?

অবশ্য হ্যাঁ; তা বলতে পার—যদিও সেই মহিলাটিকে এখনও আমি দেখিই নি।

এইভাবে তাঁদের আলোচনা চলতে লাগলো; কথার পিঠে কথা, তার পিঠে কথা; মন্থরভাবে সুরু হয়ে তা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে লাগলো, স্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠলো, বিষাক্ত হল পরিবেশ; কর্মহীন জীবনে কোথাও কোন নাড়ির সংযোগ না থাকার ফলে এই আলোচনা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করল।

এই বিশেষ প্রতিবেশীদের ঘিরে ঠিক কী ধরনের আলোচনা চলছে সে কথা কিছুতেই বলতে রাজি হলেন না মাদাম বনডেল। তাঁর মন্তব্যের ধারা থেকে বোঝা গেল ব্যাপারটা অতীব গুরুতর, এই যা। তাঁর সেই মন্তব্যের ওপরে কোনরকম গুরুত্ব আরোপ না করে মঁসিয়ে বনডেল কাঁধ কোঁচকালেন, নাক বাঁকালেন। তাঁর এই অঙ্গভঙ্গি মাদামকে ক্ষেপিয়ে তুলল। মাদাম চীৎকার করে বললেন: শোন, শোন। তোমার ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীটি চরিত্রহীনা। হয়েছে?

এই কথা শুনে মঁসিয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না; বরং সাধারণভাবেই বললেন: আমি বুঝতে পারছি না স্ত্রী চরিত্রহীনা হলে ভদ্রলোকটির সুনাম নষ্ট হয় কেমন করে?

হতভম্ব হয়ে গেলেন মাদাম; কী, কী বললে? বুঝতে পারছ না? বুঝতে

পারছ না? বুঝতে পারছ না? আমি বলছি···এই যথেষ্ট···এই যথেষ্ট! আর তোমার মগজে ঢুকছে না? কিন্তু এটা একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী। স্ত্রী চরিত্র-হীনা হওয়ার ফলে সমাজে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মঁসিয়ে বললেন: মোটেই তা নয়। কোন ভদ্রলোককে কেউ ঠকালে কি তাঁর সম্মানহানি হয়? তাঁর সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কি তাঁর সম্মান-হানি হয়? অপহৃত হলে কারও কি সম্ভ্রম নষ্ট হয়? মোটেই হয় না। তুমি যে কথা বললে সে কথা খাটে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে; কিন্তু স্বামীর কথা যদি বল···

মাদাম খুব ক্ষেপে উঠে বললেন: ভদ্রমহিলার মত ভদ্রলোকও সমান অপরাধী। তাঁদের দুজনেরই সম্মানহানি হয়েছে। এটা একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী।

খুব শান্তভাবে বনডেল বললেন: প্রথম কথা হচ্ছে, এটা কি সত্যি? প্রকাশ্যে কেলেঙ্কারি ছড়ানো চুলোয় যাক একথা প্রমাণ করবে কে?

মাদাম বনডেল চেয়ারের ওপরেই লাফিয়ে উঠলেন: কী! একথা প্রমাণ করবে কে? কেন, লোকের অভাব কি? প্রত্যেকেই বলবে একথা। প্রত্যেকে, তোমার মুখের ওপরে নাকটা যেমন সত্যি—একথাও তেমনি সত্যি। প্রত্যেকেই এ কথা জানে, প্রত্যেকেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। পাবলিক হলি-ডের মত এ-ব্যাপারটা সবাই জানে।

ব্যঙ্গোক্তি করলেন মঁসিয়ে: এবং দীর্ঘ দিন ধরে মানুষে বিশ্বাস করত যে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে; এবং এই ধরনেরই আরও হাজার-হাজার জানা জিনিস রয়েছে মানুষে যা সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল; কিন্তু সেগুলি যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়েছে। এই ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে পূজা করেন; স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি বেশ ভালবাসা আর সম্মানের সঙ্গে কথা বলেন। তুমি যা বললে তা সত্যি নয়।

পুরো কথাটা একসঙ্গে উচ্চারণ করতে না পেরে মাদাম মাটিতে পা ঠুকলেন: স্ত্রীর সম্বন্ধে সমস্ত কথা জেনেও···মূর্খ···বোকা গর্দভ···অসম্মানিত পশু কোথাকার···

বনডেল চটলেন না; যুক্তি দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি: আমাকে ক্ষমা কর। ভদ্রলোক মূর্খ নয়। আমার মনে হয় তুমি যা বললে ভদ্রলোক ঠিক তার উলটো; অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং সূক্ষ্মদর্শী। তুমি আমাকে এ কথা নিশ্চয় বিশ্বাস করতে বলছ না যে তাঁর অন্দরমহলের যে খবর রাজ্যের লোকেরা যারা তাঁর বাড়িতে থাকে না জেনে গেল সেই খবর তাঁর মত এক-জন বুদ্ধিমান মানুষ জানতে পারলেন না, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর ব্যভিচারের প্রশ্নটা যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে? কারণ আমি তোমাকে বলছি, ওই প্রতি-বেশীরা ব্যভিচারের বিশদ বিবরণ জানে।

মাদাম বনডেল রেগে হেসে একেবারে ফুলে-ফুলে উঠলেন; তাঁর এই

হাসির ছটা ভদ্রলোকের স্নায়ুতে গিয়ে আঘাত করল।

মাদাম বললেন: ও-হো-হো! তোমরা সব সমান—সব পুরুষরা একই জাতের। এটা খুঁজে বার করার জন্যে পৃথিবীতে যেন একটি লোকই রয়েছে—যদি না অবশ্য সে নিজেই ওই জাতের হয়।

আলোচনা অন্য পথে ঘুরে গেল। প্রতারিত স্বামীরা অন্ধ কি না এই প্রশ্নের ওপরেই মাদাম চটে ব্যোম হয়ে গেলেন। মঁসিয়ের ধারণা স্বামীরা অন্ধ নয়। মাদাম অনাবশ্যকভাবে ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত ধাপে নিয়ে বেশ জোর গলাতেই বললেন যে প্রতারিত স্বামীরা অন্ধ না হয়ে যায় না। তাঁর এই মন্তব্যেই মঁসিয়ে তাঁর মস্তিষ্কটিকে হারিয়ে ফেললেন।

কলহটি শেষ পর্যন্ত চরমে উঠে গেল। সেই কলহে মাদাম নিলেন নারীদের পক্ষ, মঁসিয়ে পক্ষ নিলেন পুরুষদের।

মূর্খের মত ঘোষণা করলেন মঁসিয়ে: শোন, শোন; আমার কথাই বলি। আমি তোমাকে দিব্যি করে বলছি, আমি যদি এইভাবে প্রতারিত হতাম তাহলে তা বুঝতে পারতাম, এবং তখনই, অর্থাৎ প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে; এবং তোমার রোমান্স কাটানোর জন্যে যে-ব্যবস্থা আমি গ্রহণ করতাম তা থেকে সারিয়ে তোমাকে দাঁড় করানোর সাধ্য কোন ডাক্তারেরই হ'ত না।

মাদাম ক্ষেপে লাল; তিনি চীৎকার করে বললেন: তুমি! বটে! তুমিও সব পুরুষের মতই মূর্খ—বুঝেছ?

মঁসিয়েও প্রতিবাদ করলেন আরও জোরে: কিছুতেই নয়—দিব্যি করে বলতে পারি আমি।

এই প্রতিবাদ শুনে মাদাম এমন একখানা নির্লজ্জ হাসি ছাড়লেন যে মঁসিয়ের নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেল, সঙ্কোচন দেখা গেল ত্বকের ওপরে।

তৃতীয়বার মঁসিয়ে পুনরুক্তি করলেন: আমি তা জানতে পারতাম।

মাদাম একইভাবে হাসতে-হাসতে উঠে পড়লেন।

না, না। বড় বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে তোমার।—এই বলেই তিনি চলে গেলেন।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের দরজাটা তিনি ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে গেলেন।

॥ দুই ॥

চুপচাপ বসে রইলেন বনডেল। ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না তাঁর। এমন কতকগুলি বিষাক্ত মাছি রয়েছে যাদের হুল দেহে বিঁধলে প্রথম চোটে কিছুই মনে হবে না আপনার; কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আপনি যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠবেন। মাদামের সেই উদ্ধত এবং তাকে আঘাত করার জন্যে অট্টহাসিটি তাঁকে সেই রকম বেদনার্ত করে তুলল।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাইরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলেন। তাঁর এই নতুন জীবনের নির্জনতা তাঁকে অসুখী করে তুলছিল, বিষণ্ণ চিন্তায় ভারাক্রান্ত করে তুলছিল তাঁকে। সেদিন সকালে যে প্রতিবেশী-টির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল তিনি হঠাৎ তাঁর কাছে এলেন। করমর্দন করার পরে দুজনে গল্প করতে লাগলেন। নানা রকম গল্প-গুজবের পরে নিজেদের মহিষীদের নিয়ে তাঁরা গল্প করতে সুরু করলেন। দুজনেরই কিছু-কিছু নিজস্ব গোপন কথা ছিল যেগুলি তাঁরা বিশ্বাস করে অপরকে বলতে চেয়েছিলেন—এমন কয়েকটি জিনিস যা মুখে বলা যায় না, যা অস্পষ্ট অথচ বেদনাদায়ক; এইগুলি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এমন একটি জীবের—সেই জীবটি হচ্ছে মহিলা।

প্রতিবেশীটি বললেন: স্বামীদের বিরুদ্ধে মহিলারা একটা অদ্ভুত রকমের শত্রুতা পোষণ করে। তার কারণ কী জানেন? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তার স্বামী। এই আমার কথাই ধরুন। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, বেশ ভালভাবেই ভালবাসি। আমি তাঁকে বুঝি, তাঁর ওপরে আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে তিনি আমার চেয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেশী মন খুলে মেলামেশা করেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে নিলেন বনডেল: তাহলে আমার স্ত্রী তো ঠিক কথাই বলেছেন।

প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে নানারকম পরস্পরবিরোধী আবোল-তাবোল চিন্তার উদয় হচ্ছে সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—সেই সব চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, সেই উত্তেজনা তাঁকে রীতিমত অসুখী করে তুলেছে। তখনও তার কানে মাদামের সেই উদ্ধত অট্টহাসি, সেই বেপরোয়া অট্টহাসিটি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল: "মূর্খ, তুমিও ওদের সঙ্গে একই নৌকোতে ভাসছো।" এটা নিশ্চয় তাকে অগ্রাহ্য করার একটা ইঙ্গিত, এমন একটা উদ্ধত ভঙ্গিমা যা একান্তভাবে নারীদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি; যাদের ওপরে এরা বিরক্ত হয় তাদের আঘাতে-আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যে, অপদস্থ করার জন্যে যে-কোন দুঃসাহসিক কাজই করতে তারা প্রস্তুত, কোন কিছুর ঝুঁকি নিতেও যারা পিছপাও নয়।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আরও অনেকেরই মত, ওই হতভাগ্য প্রাণীটিও একটি প্রতারিত স্বামী। তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন: "তিনি মাঝে মাঝে আমার চেয়ে আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তার ভঙ্গিতে, বেশী খোলা মনে মেলামেশা করেন।" এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় কেমন করে স্বামী—যে অন্ধ আবেগকে স্বামী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে—তার স্ত্রী অন্য পুরুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে যে বিশেষ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে তারই ওপরে ভিত্তি

ক'রে তার মনোভাব তৈরী করে। এ ছাড়া আর কিছু চিন্তা করার নেই এখানে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রমাণ করার জন্যে আর কিছুই তার হাতে নেই। সে সকলের মতই···কোনরকম ইতরবিশেষ নেই।

তারপর, বনডেলের স্ত্রীর অদ্ভুত হাসি: "তুমিও তাদের মত।" এই প্রাণীরা যে কত বড় উন্মাদ, কতখানি উদ্ধত হতে পারে তা ভাবলেও অবাক লাগে তাঁর। স্বামীকে অগ্রাহ্য করার, অপমান করার নিছক আনন্দ উপভোগ করার জন্যে এরা তাদের মনে এ ধরনের সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

তাঁদের বিবাহিত জীবনের পুরনো দিনগুলির কথা তিনি ভাবতে লাগলেন। তাঁদের সেই দ্বৈত জীবনে এমন কি কোন ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে তাঁর সন্দেহ হ'তে পারে যে মাদাম তিনি ছাড়া তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশী খোলা মন আর আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন? সে-রকম সন্দেহ তো কোনদিনই তাঁর হয় নি; হলে কি অতটা শান্তভাবে, তাঁর ওপরে অতটা বিশ্বাস রেখে জীবন কাটাতে পারতেন তিনি? তবে হ্যাঁ, মাদামের একটি বন্ধু ছিল বটে—একটি বিশেষ বন্ধু। তাঁর নাম ট্যানক্রীট। অত্যন্ত সৎ আর ভাল-মানুষ এই ট্যানক্রীট। প্রায় বছরখানেক ধরে সপ্তাহে একদিন তিনি আসতেন ওঁদের সঙ্গে খেতে। বনডেল-ও তাঁকে ভাই-এর মতই ভালবাসতেন। এবং যখন মাদাম কোন রহস্যময় কারণে, কারণটা কী তা জানেন না, এই আমুদে মানুষটির সঙ্গে ঝগড়া করলেন, তখন তিনি নিজে কয়েকবারই গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন।

তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। অস্বস্তির সঙ্গে চোখ মেলে অতীতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই মনে-মনে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত উদ্ধত, হিংসুটে, বিদ্বেষপরায়ণ প্রবৃত্তি-গুলি লুকিয়ে রয়েছে তারা যে সব লজ্জাকর অভিযোগ তাঁর কাছে পেশ করে বসলো তারই বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন তিনি। যে বন্ধুটিকে মাদাম এত ভাল-বাসতেন, এবং যাঁকে তিনি কোন বড় ধরনের অপরাধ না করা সত্ত্বেও ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, তাঁর আসা-যাওয়া আর ব্যবহার পর্যন্ত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজেকেই অপরাধী মনে করে নিজের কাছেই নিজেকে অভিযুক্ত করলেন; অপমান করলেন নিজেকে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে আরও কতকগুলি স্মৃতি ভিড় করে এল। সেই স্মৃতিগুলিও একই রকমের বিচ্ছেদকে ঘিরে। প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে সেই সব বিচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল। কারও অপমান অবনত মস্তকে মেনে নেওয়ার পাত্রী মাদাম নন। তারপরেই তিনি খোলা মনে হাসলেন; তাঁর মনে হল যখন তিনি সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে গিয়ে বলতেন—ট্যানক্রীটের সঙ্গে দেখা হল, তুমি কেমন আছ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে—সেই শুনে মাদাম যে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করে তাকে আশ্বস্ত করত সেই কথাগুলি।

মাদাম সব সময়ই বলতেন: সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে তাঁকে জানিয়ে দিয়ো তাঁর কোন সংবাদ রাখার কষ্ট স্বীকার করতে আমি রাজি নই। কী বিতৃষ্ণা আর প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তিনি কথাগুলি বলতেন? তাকেই তিনি সন্দেহ করছেন? একমুহূর্তের জন্যেও? হায় ভগবান, কী মূর্খ তিনি?

কিন্তু মাদাম এত প্রতিহিংসাপরায়ণ হলেন কেন? ঝগড়াটা ঠিক কখন আর কোথায় সুরু হল, আর তাঁর এত রাগেরই বা কারণটা কী তা মাদাম তাঁকে বলেন নি। বন্ধুটির ওপরে মাদামের একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ জন্মেছিল··· একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ। তাহলে কি···কিন্তু না···বনডেল ভাবলেন এই সব আজেবাজে চিন্তা করে নিজেকে তিনি আবার অধঃপতিত করছেন।

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি যে তিনি নিজেকে অধঃপতিত করছেন; তবু তিনি না ভেবে পারছেন কোথায়? তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—এই সন্দেহ শেষ পর্যন্ত তাঁর মন থেকে বিদায় হবে তো? নাকি, চিরকাল বুকের মধ্যে কাঁটার মত খচ-খচ করবে? তিনি নিজেকে চিনতেন। এ চিন্তা তাঁর মন থেকে যাবে না। কোন চিন্তাই তাঁর মন থেকে এত সহজে বিদায় হয় না।

ইতিমধ্যেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন; তাঁর গতি দ্রুত হয়েছে; মানসিক শান্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না। এ দুর্ভেদ্য। কেউ একে ছুঁড়ে ফেলতেও পারে না, বিনষ্ট করতেও পারে না।

ট্যানক্রীটের সঙ্গে যতবারই তাঁর দেখা হয়েছে ততবারই তিনি মাদামের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন; এবং ততবারই বনডেল বলেছেন: সে এখনও একটু বিরক্ত হয়ে আছে। এই কথা। হায় ভগবান···সত্যিই কি তিনি আদর্শ স্বামী? হয়ত···

তিনি প্যারিসে যাবেন, দেখা করবেন ট্যানক্রীটের সঙ্গে, আজ সন্ধ্যের সময়েই তাঁকে নিয়ে বাড়িতে আসবেন। তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন যে তাঁর ওপরে মাদামের যে রাগ ছিল সেটা এখন নিঃশেষ হয়েছে। ভাল কথা, কিন্তু মাদামের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে? কি দৃশ্যেরই না অবতারণা হবে? কী ক্রোধের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়বেন তিনি? চুলোয় যাক···এটাও একটা প্রতিহিংসা নেওয়া হবে। তাছাড়া, অপ্রস্তুত মাদামের মুখোমুখী তাঁকে দাঁড় করিয়ে তিনি অলক্ষ্যে থেকে দেখবেন তাঁদের মুখের ওপরে কী রকম ছাপ পড়ে।

॥ তিন ॥

তখনই তিনি স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলেন, টিকিট কাটলেন, চেপে বসলেন ট্রেনে। ট্রেনটা যখন দ্রুত চলতে সুরু করেছে তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন; তার এই ঔদ্ধত্য দেখে নিজেরই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে

লাগলো। মানসিক দুর্বলতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এবং পাছে কাজটি অসমাপ্ত রেখে তাকে ফিরে আসতে হয় এই ভয়ে তিনি অন্য চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করলেন; মাঝে-মাঝে অপেরায় শোনা গানের কলিও গুন গুন করে গাইতে লাগলেন।

ট্যানক্রীট যে বাড়িতে রয়েছেন সেই রাস্তায় পড়েই তিনি আবার থেমে গেলেন। আশপাশের দোকানের সামনে কিছুক্ষণ তিনি পায়চারি করলেন, দু একটা জিনিসের দরদস্তরও করলেন, কয়েকটা জিনিসের কারুকার্যের প্রশংসা করলেন, ঝিমুনি কমানোর জন্যে এক বোতল 'বক' গলায় ঢালার কথাও ভাবলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করলেন না; তারপরে ধীরে-ধীরে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাড়ির সামনে এসে ভাবলেন ভদ্রলোক যদি আজ বাড়িতে না থাকেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কিন্তু ট্যানক্রীট সেদিন বাড়িতেই ছিলেন, একলা। পড়ছিলেন। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে তিনি লাফিয়ে উঠেই চীৎকার করে ডাকলেন: আঃ বনডেল! কী ভাগ্য!

এবং অস্বস্তির মধ্যে বনডেল বললেন: হ্যাঁ। একটা ছোট ব্যবসার জন্যে প্যারিসে এসেছিলাম। দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ।

খুব ভাল, খুব ভাল। আরও ভাল এই জন্যে যে আজকাল তুমি তো এদিকে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছ।

তা, তা, কী করব বল? জীবনে এমন অনেক বাধা রয়েছে যাদের এড়ানো যায় না; তা ছাড়া, আমার স্ত্রী কিছুটা বিরক্ত তো ছিলই···

গোল্লায় যাক। বিরক্তির কথা কী বলছ? আরও বেশী; ···অনেক বেশী ···ভদ্রমহিলা আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন···

কিন্তু তোমাদের মধ্যে কী ঘটেছিল বলতো? আমি তো কিছুই জানি নে।

তেমন কিছু নয়!···একটা তুচ্ছ ঘটনা···একটা আলোচনা···তাঁর সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি নি।

কিন্তু আলোচনাটা কী নিয়ে?

একটি মহিলার সম্বন্ধে; আমার বান্ধবী তিনি। মাদাম বুতি। তুমিও তাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়।

হ্যাঁ; নিশ্চয়। তবে আমার ধারণা আমার স্ত্রী সে সব পুরনো কথা ভুলে গিয়েছে। আজ সকালেই সে তোমাদের সম্বন্ধে কথা বলছিল। সেই কথার মধ্যে কোনরকম তিক্ততা ছিল না—ছিল বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্যানক্রীট ভীষণভাবে চমকে উঠলেন; তারপরেই এমন হতভম্ব হয়ে গেলেন যে কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না। সেই অবস্থাটা কেটে যাওয়ার পরে তিনি বললেন: তিনি তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন···বেশ বন্ধুর মত?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত ?

যা বাবা !···তোমার কি মনে হচ্ছে আমি দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখি !

মা-নে !

মানে প্যারিসে আসার পথে মনে হল খবরটা তোমাকে দিয়ে যাই, হয়ত খুশি হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

বনডেল কী যেন চিন্তা করলেন ; দ্বিধাও করলেন একটু ; তারপরে বললেন : একটা কথা আমি ভেবেও রেখেছি···একেবারে ওরিজিন্যাল পরিকল্পনাও বলতে পার।

পরিকল্পনাটা কী ?

তোমাকে আমাদের বাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসবে।

এই প্রস্তাবে ট্যানক্রীট একটু অস্বস্তি বোধ করলেন ; স্বভাবের দিক থেকে বিচার করলেও তিনি ঝোঁকের মাথায় সাধারণত কোন কাজ করেন না।

একটু থেমে তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর···এখনই তা করা উচিৎ হবে ··অর্থাৎ···আমি ভাবছি···কোন রকম গোলমাল হবে নাতো ?

মোটেই না ; মোটেই না।

তুমি নিশ্চয় জান···মাদাম বনডেলের স্মৃতিশক্তি তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার নয়।

তা জানি। তবে আমি নিশ্চয় করেই তোমাকে বলতে পারি যে সে এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইভাবে তোমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখলে সে যে খুব আনন্দ পাবে সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক বলছ ?

ঠিক বলছি।

বেশ, চল। আমিও খুব খুশি। বিশ্বাস কর, এই মনোমালিন্যটা আমার কাছে সত্যিই বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল।

এরপরে তাঁরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়লেন স্টেশনের দিকে।

সারাটা পথ তাঁরা আর কথা বলেন নি। দুজনেই নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলেন। গাড়ির মধ্যে তাঁরা উঠলেন, মুখোমুখী বসলেন, কেউ কোন কথা বললেন না ; দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ; মুখগুলি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—দুজনেরই।

ট্রেন থেকে নেমে হাত ধরাধরি করে তাঁরা বেরিয়ে এলেন ; তারপরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন—মনে হল, একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার বাসনায় দুজনে জোট বেঁধে এগিয়ে চলেছেন।

বনডেল তাঁর বন্ধুটিকে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন; তারপরে পরিচারিকাকে ডেকে বললেন: মাদামকে এখনই একবার আসতে বল।

তাঁরা দুজনেই আরাম কেদারার মধ্যে বসে পড়লেন। দুজনের মনেই তখন একই চিন্তা: কত তাড়াতাড়ি এই ভয়াল মানুষটিকে এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।

সিঁড়ির ওপরে একটা পরিচিত পদধ্বনি শোনা গেল। বাইরে থেকে একটি হাত এসে হাতলের ওপরে পড়লো; ভেতরে বসে তাঁরা দেখলেন হাতলটা ঘুরছে। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢোকার আগে সেখানে কে রয়েছে দেখার জন্যে মাদাম বনডেল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপরেই ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলেন; শরীর শিউরে উঠলো তাঁর। গাল দুটো হয়ে উঠলো রক্তাভ। দুটো হাতে দেওয়ালটা চেপে ধরে তিনি আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ট্যানক্রীটের মুখটাও বিবর্ণ হয়ে উঠলো—মনে হল তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলেন; মাথার ওপর থেকে তাঁর টুপীটা ছিটকে পড়লো মাটিতে। তিনি তোতলাতে-তোতলাতে বললেন: হে ভগবান···মাদাম···আমি, আমি এসেছি···আমি ভেবেছিলাম···তাই আমি আসতে সাহস করেছি···আমি বড় অসুখী···

মাদাম কোন উত্তর দিলেন না দেখে তিনি বললেন: শেষ পর্যন্ত তুমি তাহলে আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ?

এই কথা শোনার পরে যেন কোন ভেতরের উত্তেজনার ধাক্কা খেয়ে মাদাম দুটি হাত প্রসারিত করে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ট্যানক্রীট তাঁর সেই হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে ধরলেন। মাদাম ভাববিহ্বল কণ্ঠে কাঁপতে-কাঁপতে যে কথা বললেন সে রকম কথা তাঁর স্বামী কোনদিনই তাঁর মুখ থেকে শোনেন নি: তুমি এসেছ? ওঃ, আমি খুব খুশি হয়েছি।

আর বনডেল! তাঁদের ওই অবস্থায় দেখে চুপচাপ চেয়ারের ওপরে বসে রইলেন তিনি। তাঁর সারা দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল; মনে হল, এইমাত্র তিনি যেন ঠাণ্ডা জলে স্নান করে এলেন।

ভ্রমণ

(Travelling)

বন্ধুবরেষু, "সেণ্ট-অ্যাগনিস, ৬ই মে।

তুমি আমাকে প্রায়ই চিঠি দিতে অনুরোধ করেছিলে; বিশেষ ক'রে বলেছিলে, আমি যা দেখেছি তাই তোমাকে জানাতে। বেড়াতে-বেড়াতে পথে প্রান্তরে দেহাতী মানুষের কাছ থেকে অথবা হোটেল-ওয়ালা বা ভ্রাম্যমান কোন অপরিচিত পথিকের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের মাধ্যমে যে-সব টুকরো-টুকরো কাহিনী আমরা শুনি তাদেরই স্মৃতিচারণা ক'রে তোমাকে কিছু শোনাতে তুমি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলে। তোমার ধারণা কোন দেশকে বোঝার পক্ষে এগুলির দাম অনস্বীকার্য। কয়েকটা টুকরো কথায় কোন জায়গার বর্ণনা, অথবা, সামান্য দু'চার কথায় কোন গল্প বলার প্রয়াসের ভেতর থেকেই কোন দেশের ছবি, তার চরিত্র, তার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তোমার ইচ্ছামত সেই চেষ্টাই আমি করব। মাঝে-মাঝে তোমাকে আমি চিঠি দেব। সেই সব চিঠিতে আমাদের কোন ইঙ্গিত থাকবে না; থাকবে কেবল দেশ আর দেশের মধ্যে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা। এখন আমি সুরু করছি।

আমার ধারণা, বসন্তকাল এমন একটা সময় যখন মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে তাদের ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মেটায়। শরৎ যেমন চিন্তার ঋতু, তেমনি শিহরণের ঋতু এই মধু মাস। বসন্তে গ্রামগুলি আমাদের দেহকে চঞ্চল ক'রে তোলে, শরৎ প্রবেশ করে আমাদের মনের গভীরে।

এই বছর আমি কমলা-ফুলের গন্ধ সোঁকার জন্যে দক্ষিণে গিয়েছিলাম—ঠিক এই সময়ে মানুষ দক্ষিণ ছেড়ে চলে আসে। মক্কা আর জেরুজালামের প্রতিদ্বন্দ্বী তীর্থযাত্রীদের শহর মোনাকো আমি নিখরচায় পেরিয়ে গেলাম; তারপরে কাগজি লেবু, কমলা লেবু, আর অলিভ গাছের ছায়ায় ঘেরা পাহাড়ের ওপরে উঠলাম।

কমলা লেবুর ফুলে ভরা কোন মাঠে কোনদিন তুমি ঘুমিয়েছ? এখানকার বাতাস সুরভিত। এই অঞ্চলটা পাহাড়ী খাদে একেবারে বোঝাই। এখানকার পাহাড়ের ধারগুলি সব জোড়া, আর কাটা-কাটা সেই আঁকাবাঁকা ফাটলের মধ্যে কাগজি লেবুগাছের বন জমে উঠেছে। মাঝে-মাঝে পাহাড়ী খাদগুলি যেখানে এসে হঠাৎ উঁচু শৈলস্তবকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে থেমে গিয়েছে সেখানে মানুষ জলাশয় তৈরী করেছে; বৃষ্টির জলে সেগুলি প্রায় সব সময়ই ভর্তি হয়ে থাকে। এগুলি বেশ গভীর; এদের চারপাশে খাড়াই পাহাড়। এখানে হঠাৎ কেউ পড়ে গেলে হাত ধরে তুলে আনা বড়ই কষ্টকর।

পাতার ভেতর দিয়ে গাছের ডালে-ডালে চকচকে ফলগুলি দেখতে-দেখতে আমি উঠছিলাম ধীরে-ধীরে। এই সব অগভীর খাদের মধ্যে কমলা ফুলের গন্ধ জমাট হয়ে বসেছিল। বাতাস সেই গন্ধে ভারী হয়ে বসেছিল। ক্লান্ত হয়ে বসার জন্যে একটা জায়গা খুঁজছিলাম। ঘাসের ওপরে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তেই বুঝতে পারলাম কাছাকাছি কোথাও কোন ঝরণা রয়েছে; সেই ঝরণাটা ঠিক কোথায় দেখার জন্যে আমি আরও উপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু উঠতে-উঠতে আমি ওই জাতীয় একটি গভীর এবং বিরাট জলাধারের কাছে গিয়ে পড়লাম। আমি তারই ধারে পা-এর ওপরে পা দিয়ে বসলাম। সেখানকার নিস্তব্ধ জলের রঙ দেখে মনে হল গোটা জলাধারটাই যেন কালো ঘন কালিতে ভরে রয়েছে। তারই পাশে বসে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। অনেক নীচে পাতার ফাঁক দিয়ে ভূমধ্যসাগরের রোদে পোড়া আভা এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কিন্তু আমার দৃষ্টিটা বার-বার সেই গম্ভীর গভীর গর্তটির ওপরে এসে পড়তে লাগলো। মনে হল ওখানে জলচর প্রাণীর নামগন্ধ বলে কিছু নেই।

হঠাৎ একটি স্বর আমাকে চমকে দিল। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফুলের সন্ধানে সেখানে গিয়েছিলেন। সারা য়েরোপের মধ্যে এই অঞ্চলটিই উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌-দের বড় প্রিয় স্থান। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই দরিদ্র শিশুগুলির কি আপনি আত্মীয়?

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কোন্ ছেলেদের?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেন; তারপর মাথাটা কিঞ্চিৎ অবনত করে বললেন: আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে এই জলা-ধারের পাশে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমি ভেবেছিলাম এখানে যে একটি ভয়ঙ্কর নাটকের অভিনয় হয়েছিল, আপনি হয়ত সেই কথাই ভাবছেন।

কী ঘটেছিল তা জানতে আমার বড় আগ্রহ জন্মেছিল। গল্পটা বলার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম।

কাহিনীটি বড় করুণ আর হৃদয়বিদারক বন্ধু; কিন্তু একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। দৈনিক সংবাদপত্রে যেমন সব দুর্ঘটনার কথা শোনা যায় এটিও অনেকটা সেই জাতীয়। যে নাটকীয় ভঙ্গিতে কাহিনীটি আমার কাছে বর্ণিত হয়েছিল তারই জন্যে আমার এই উচ্ছ্বাস, অথবা, পাহাড়ী পটভূমিই এর জন্যে দায়ী তা আমি জানি নে। আনন্দমুখর অজস্র ফুল আর সূর্যকিরণ, আর তাদেরই মধ্যে সেই নরঘাতক বিরাট গহ্বর, এরাও আমার ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কাহিনীটি শুনে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, ঝাঁকানি খেয়েছিল আমার শিরাউপশিরা। যে পটভূমিকাতে ঘটনাটা ঘটেছিল সেখান থেকে অনেক দূরে ঘরের মধ্যে বসে আমার এই চিঠিটি পড়ার সময় তোমার কাছে হয়ত ততখানি তিক্ত বলে মনে হবে না।

কয়েক বছর আগের কথা। তখনও বসন্ত কাল। দুটি বাচ্চা ছেলে এই গর্তের ধারে বসে খেলা করত; আর একটা গাছের নীচে শুয়ে-শুয়ে বই পড়তেন তাদের শিক্ষক। একদিন বিকালের দিকে, বেশ গরমই ছিল দিনটা, শিক্ষকটি একটু ঝিমোচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে তিনি জেগে উঠলেন। কেউ যেন জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। এই রকম একটা শব্দ শুনে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। দুটির মধ্যে কম বয়সের যেটি, তার বয়স এগার, জলাধারের পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে; তার চোখ দুটো তার দাদার দিকে নিবদ্ধ। তার দাদা খেলতে-খেলতে পা ফসকে সেই জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

হতভম্ব শিক্ষকটি কোন কিছু চিন্তা না করেই ছেলেটিকে উদ্ধার করার জন্যে সোজা লাফিয়ে পড়লেন জলের মধ্যে। তিনিও আর উঠলেন না। তাঁর মাথাটা জলের নীচে পাথরের গায়ে ধাক্কা খাওয়ার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ছেলেটা জলের ওপরে ভাসতে-ভাসতে তাকে সাহায্য করার জন্যে হাত তুলে তার ছোট ভাইকে ডাকতে লাগলো। শুকনো ডাঙার ওপরে তার ছোট ভাইটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মাটির ওপরে শুয়ে পড়ে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিল; বড় ভাইটি সাঁতার কাটতে-কাটতে সেই দিকে এগিয়ে এল ধীরে-ধীরে। চারটি হাত একসঙ্গে হল। বাঁচার উৎসাহে দুজনেই বেশ খুশি হয়ে উঠলো; ভাবলো বিপদ কেটে গিয়েছে। বড় ভাইটি তীরে ওঠার চেষ্টা করল; কিন্তু পাড়টা খাড়াই ছিল বলে উঠতে পারলো না। ছোট ভাইটির শক্তিও বেশী ছিল না; দাদাকে টেনে তোলা সেই জন্যে তার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। দুর্বল থাকার ফলে সে একটু-একটু করে গর্তের দিকে এগিয়ে চলছিল। তারপরে আর টানাটানি না করে তারা একভাবে পড়ে রইলো; আবার আতংকে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো তারা।

ছোট ছেলেটা তার দাদার একটা হাত জোর করে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল: আমি তোমাকে টেনে তুলতে পারব না, আমি তোমাকে টেনে তুলতে পারব না। তারপরেই সে চীৎকার করে উঠলো: কে কোথায় আছ; সাহায্য কর, সাহায্য কর।

কিন্তু তার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ পল্লবের স্তর ভেদ করে বেশী দূর এগোতে পারল না। এইভাবে দুটি ছেলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে হাত ধরাধরি করে রইল; দুজনের মনেই একই আশংকা—একজন যদি ক্লান্ত হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। মাঝে-মাঝে তারা সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে লাগলো; কিন্তু সে-ডাক কারও কানে গিয়ে পৌছলো না। অবশেষে বড় ছেলেটা শীতে কাঁপতে-কাঁপতে বলল: আমি আর পারছি নে। আমি এবারে তলিয়ে যাব, বিদায়। ছোট ভাই বলল: আর একটু ধৈর্য ধর, আর একটু। সন্ধ্যা এগিয়ে এল; আকাশ ফুটে উঠলো

নক্ষত্রের দল! মূর্ছাতুর হয়ে বড় ভাইটি তার হাত ছেড়ে দিল; বলল: আমার একটা হাত ছেড়ে দাও। আমার হাত-ঘড়িটা তোমাকে আমি উপহার দেব। এই ঘড়িটা কয়েকদিন আগেই সে উপহার পেয়েছিল; এবং এটাই ছিল তার কাছে সব চেয়ে প্রিয় জিনিস। শেষ পর্যন্ত ঘড়িটা খুলে সে তার ছোট ভাইকে দিল। ছোট ভাই কাঁদতে-কাঁদতে সেটা তার পাশে ঘাসের ওপরে রেখে দিল। তারপরে একসময় বড় ভাইটি তলিয়ে গেল। আর সে উঠলো না।

ছোট ভাইটি পাগলের মত চীৎকার করতে লাগলো: পল, পল! কিন্তু তার ভাই আর ফিরে এল না। তারপরে সে পড়ি কি মরি এইভাবে গাছপালা সরিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে ফিরে এল। তাঁদের নিয়ে যখন সে সেই জলাধারের দিকে এগিয়ে এল তখন সে পথ হারিয়ে ফেলল। শেষকালে সে পথ চিনতে পেরে ঠিক জায়গায় হাজির হল। জলাধারটিকে জলশূন্য করতে হবে; কিন্তু বাতাবি লেবুগাছের গোড়ায় দেওয়ার জল কমতি পড়বে বলে মালিক জল ছেঁচতে রাজি হল না। পরের দিন অনেক চেষ্টার পরে দুটি দেহকে আবিষ্কার করা হল; কিন্তু তখন তারা মৃত।

প্রিয় বন্ধু, তুমি বুঝতেই পারছ, খবরের কাগজে যে রকম দুর্ঘটনার কথা ছাপা হয় এটা মূলত সেই জাতীয় একটি দুর্ঘটনা। কিন্তু যদি তুমি এই গহ্বরটি দেখতে তাহলে বাঁচার জন্যে সেই দুটি শিশুর—যারা কেবল খেলতে আর হাসতেই জানতো—কঠোর সংগ্রাম তোমাকে ব্যথিত না করে পারত না। সেই ঘড়িটি দেওয়ার ছোট্ট কাহিনীও কম করুণ নয়। আমি নিজের মনে-মনেই বললাম: ভগবান দোহাই, এ রকম স্মৃতিচিহ্ন যেন আমাকে কোন দিন বইতে না হয়। ভেবে দেখ, যখনই ছেলেটি ওই ঘড়িতে হাত দেবে তখনই তার সেই দৃশ্যটি মনে পড়ে যাবে; সেই জলাধার, সেই খাড়াই পাহাড়ের দেওয়াল, তার ভাই-এর সেই বিকৃত মুখ, তখনও সে জীবিত, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মৃত। সেই হাত-ঘড়িটিকে যখনই সে স্পর্শ করবে তখনই সেই সব ঘটনা তার মনে পড়ে যাবে—সে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠবে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি বিমর্ষ হয়ে বসে রইলাম। আমি কমলালেবুর বন ছাড়িয়ে অলিভ গাছের বনের দিকে উঠে গেলাম—অলিভ বন ছাড়িয়ে উঠলাম পাইন গাছের বনে। তারপরে আমি পৌঁছলাম পাথরের উপত্যকায়; এখানে একটি পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। লোকে বলে, দশম শতাব্দীতে একজন সারাসেন সর্দার এই দুর্গটি তৈরী করেছিলেন; সর্দারটি বিজ্ঞ ছিলেন; এবং একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন।

আমার চারপাশে পাহাড়, সামনে সমুদ্র—সেই সমুদ্রে কর্সিকা বা কর্সিকার কোন ছায়াই আর প্রতিফলিত হচ্ছে না।

কিন্তু শেষ সূর্যের আলোতে রঙিন পাহাড়ের ওপরে, সেই বিরাট আকাশে, সমুদ্রে, এবং অনির্বচনীয় সুন্দর দিকচক্রবালে, যাদের আমি প্রশংসা না করে

পারি নি, আমি কেবল দুটি শিশুকেই দেখতে পেলাম—একজন কালো জলাধারের পাশে শুয়ে আছে, আর একজন ডুবে রয়েছে গলা পর্যন্ত, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। দুজনেই কাঁদছে—মুখ তাদের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। আর সারাক্ষণ আমি কেবল ক্ষীণ কণ্ঠের একটা আর্তধ্বনি শুনতে পেলাম: ভাই, বিদায়। আমি তোমাকে আমার হাত-ঘড়িটা দিয়ে গেলাম।

বন্ধু, এই চিঠি পড়ে তোমার মনে হবে আমার দুঃখটা অনাবশ্যক রকমের বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছে। আর একসময় আমি প্রফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করব।

সমুদ্রে

(At Sea)

নিম্নলিখিত সংবাদটি খবরের কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

"বোলেন-সুর-মের, জানুয়ারী ২২"

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক)

একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটার ফলে সমুদ্রগামী খালাসীরা হতভম্ব হয়ে পড়েছেন; গত দুটি বছর ধরে এই রকম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। ক্যাপটেন যাভেলের তত্ত্বাবধানে একটা মাছধরা বোট বন্দরের মুখে ঢুকতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে; তারপরে পশ্চিম দিকে বাহিত হয়ে পাথরের বাঁধের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। লোকজনদের বাঁচানোর জন্যে লাইফ বোট ইত্যাদি ছুঁড়ে দেওয়া হয়; তা সত্ত্বেও, চারজন খালাসী, আর একটি কেবিন-বয় সেই দুর্ঘটনায় মারা যায়। খারাপ আবহাওয়া এখনও চলছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও নিরূপিত হয় নি।

এই যাভেল কে? একি সেই এক-বাহু যাভেল-এর ভাই? তরঙ্গ-বিতাড়িত, এবং সম্ভবত মূল এই হতভাগ্যটির দেহ হয়ত এখন ভাঙা ডিঙির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের ভয়ানক দুর্ঘটনা যা সমুদ্রের বুকে হামেশাই ঘটে থাকে, আঠারো বছর আগে একটি জেলে ডিঙিকে ঘিরে ঘটেছিল। সেই নাটক চোখের ওপরে ঘটতে যে দেখেছিল সে-ও এক যাভেল। এ কি সেই লোক?

বড় যাভেল সেই সময় একটা মাছধরা জাহাজের মালিক ছিল। এই জাতীয় ক্ষুদে জাহাজের মধ্যে এটা ছিল প্রথম শ্রেণীর। শক্ত, গোল গড়ণের জাহাজ; সমুদ্রের কোনরকম আবহাওয়াকেই সে তোয়াক্কা করত না। চ্যানেলের ঝড়ো আর নোনা বাতাস বার বার তার ওপরে আছাড় খেয়ে পড়েছে; কিন্তু তাদের সবকিছু অগ্রাহ্য করে ছিপির মত স্বচ্ছন্দে সে অক্লান্ত-

ভাবে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে; দীর্ঘপ্রসারি জাল ফেলতে-ফেলতে সে এগিয়ে চলেছে; সেই জাল সমুদ্রের একেবারে তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গর্তের ঘুমন্ত জলচর প্রাণীদের ছেঁকে নিয়ে এসেছে; তুলে নিয়েছ বালির নীচে থেকে চওড়া-চওড়া মাছ, বড়-বড় দাঁড়া-ওয়ালা ভারি ভারি অজস্র কাঁকড়া, আর ছুঁচোলো গোঁফ-ওয়ালা বিরাট-বিরাট চিংড়ি মাছ।

পরিচ্ছন্ন বাতাসে ঢেউগুলি যখন দুলতে থাকে তখন মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে বোটটি। লোহার রড মারা বিরাট কাঠের হাতলের সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা থাকে; বোটের শেষ প্রান্তে যে দুটো লাটাই রয়েছে তাদের ওপর দিয়ে সেই দড়িটাকে সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাতাস আর স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে বোটটি এই যন্ত্রটিকে টানতে-টানতে এগিয়ে চলে। তারই বেগে সমুদ্রের তলায় যা কিছু রয়েছে সে সমস্ত জিনিস ধ্বংস করতে-করতে যন্ত্রটি এগোতে থাকে বোটের সঙ্গে-সঙ্গে।

এই বোটে কাজ করত যাভেলের ছোট ভাই, চারজন লোক, আর একটি কেবিন-বয়। জাল ফেলার জন্যে পরিষ্কার আবহাওয়ায় যাভেল একদিন বোলোন থেকে তার বোটটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। তারপরে, হঠাৎ জোরালো হল বাতাস: দমকা হাওয়ায় ধাক্কা খেতে-খেতে এগিয়ে চলল বোট। ইংলণ্ডের উপকূলে এসে হাজির হলো তারা; কিন্তু ঝড়ের প্রকোপে সেখানকার সমুদ্র এতই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে বন্দরে ঢোকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ছোট জাহাজটিকে আবার খোলা সমুদ্রের ওপরে ভাসিয়ে দেওয়া হল। ফরাসী উপকূলে তারা ফিরে এল। তখন জেটির ওপরে সাদা ফেনার দল উদ্দাম নৃত্য করছে; বিরাট গর্জন করছে সমুদ্র তরঙ্গ; বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে প্রতিটি আশ্রয়স্থল। সেখানেও জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব হল না।

আবার ভাসলো জাহাজটি। বিরাট-বিরাট ঢেউ-এর নাগরদোলায় নাচতে নাচতে, কাঁপতে-কাঁপতে, ধাক্কা খেতে-খেতে টালমাটাল অবস্থায় জাহাজটি ছুটতে লাগলো; কিন্তু এই রকম বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভাসার অভ্যাস তার ছিল। অনেকবারই একাদিক্রমে ছ' সাতদিন ধরে কোন উপকূলে নোঙর না করেই দুটি দেশের মধ্যে পাক খেতে হোত তাকে।

শেষকালে ঘূর্ণী থামলো; তারা তখন মাঝদরিয়াতে। যদিও সমুদ্র তখনও দারুণ অশান্ত, তবু মালিক জাল ফেলার নির্দেশ দিল। বিরাট মাছ ধরার জালটা সমুদ্রের ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া হল; দুজন করে চারজন লোক দুপাশ থেকে লাটাই ঘুরোতে-ঘুরোতে দড়িটা ছাড়তে লাগলো। হঠাৎ জালটা সমুদ্রের তলায় গিয়ে পড়লো; ঠিক এমনি সময় একটা জোর দমকা বাতাস জাহাজটাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিল। যাভেলের ছোট ভাই সামনে দাঁড়িয়ে জাল ফেলার তদারকি করছিল; এই ধাক্কায় সে হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়লো; এরই ফলে তার একটা হাত সেই কাছি আর কাঠের গুলুই-এ

আটকে গেল। আর একটা হাত দিয়ে কাছিমটাকে একটু তোলার জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করল; কিন্তু জালটা তখন মাটির ওপরে ভারি হয়ে বসে যাওয়ার ফলে কাছিটাকে সে একটুও ওপরে তুলতে পারল না।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে চেঁচাতে সুরু করল। সবাই তাকে সাহায্য করার জন্যে দৌড়ে গেল। তার দাদা হাল ছেড়ে তার কাছে এগিয়ে এল। যে দড়িটা তার হাতের ওপরে চেপে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল সেই দড়িটাকে কিছুটা ওপরে তোলার জন্যে সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন যাভেল বলল: এটাকে আমাদের কেটে ফেলতেই হবে।

এই বলে সে তার পকেট থেকে বিরাট একটা ছুরি বার করল। সেই ছুরি দিয়ে দুবার কোপ বসালো। যুবক যাভেলের হাতটা বেঁচে যেত; কিন্তু দড়িটা কেটে দিলেই জালটা ঝুলে পড়বে; আর জালের অর্থই হচ্ছে টাকা, একটা আধটা নয়, অনেক—প্রায় পনেরশ' ফ্রাঁর মত। এর সমস্তটাই বড় ভাই যাভেলের। টাকা পয়সার সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন।

সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশংকায় সে চেঁচিয়ে উঠলো: না, না, দড়িটা কেটো না। আমি জাহাজটাকে বাতাসের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলেই সে হালটা ফেলে চাকার দিকে ছুটে গেল। জাহাজটা তার কথা মত তো ঘুরলোই না; বরং এই টানা হেঁচড়ার ফলে জালটা গেল জড়িয়ে। ফলে জাহাজের গতি ব্যাহত হল; বাতাসের দিকে ছুটতে লাগলো জাহাজটা।

দাঁত চিপে বিবর্ণ চোখে যুবক যাভেল হাঁটু গেড়ে বসে রইল। ছুরি দিয়ে কী করবে ভাবতে-ভাবতে বড় যাভেল ফিরে এল।

সে বলল: থাম, থাম। দড়ি কেটো না। নোঙর ফেলে দাও।

নোঙর ফেলে দেওয়া হল—যতগুলি শেকল ছিল ফেলে দেওয়া হল সবগুলিই। তারপরে তারা জালের চাপ থেকে দড়িটাকে আলগা করার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত দড়িটা আলগা হল; বার করে নিয়ে এল হাতটা। কিন্তু তখন আর হাত বলে কোন পদার্থ ছিল না। রক্তাক্ত অবস্থায় চামড়ার ওপরে ঝুলছিল মাত্র।

যুবক যাভেলের তখন চিন্তা করার বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। সবাই মিলে তার জার্সিটা খুলে দিল। জার্সিটা খুলে দেওয়ার পরেই একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাদের চোখে পড়লো। একতাল মাংস তার হাত থেকে ঝুলছে। সেই জায়গা থেকে রক্তের স্রোত বইছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন পাম্প বসিয়ে তার দেহ থেকে রক্ত বার করে দিচ্ছে। ছেলেটি তার সেই চূর্ণ বিচূর্ণ হাতটির দিকে তাকিয়ে বলল: আমি এবারে গেলাম।

রক্তের স্রোতে জাহাজের পাটাতন ভরে গেল। তাই দেখে সবাই চীৎকার করে বলল: এখনই ওর সব রক্ত বেরিয়ে যাবে। এস আমরা ওর ধমনীটাকে

বেঁধে দিই।

কিছু মোটা শক্ত আলকাতরা মাখানো পাটের দড়ি দিয়ে তারা তার ধমনীটিকে বেশ জোর করে বেঁধে দিল। ধীরে-ধীরে রক্তের স্রোত কমতে লাগলো; তারপরে একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

যুবক যাভেল উঠলো; তাঁর হাতের একটি অংশ ঝুলতে লাগলো। আর একটা হাত দিয়ে সে সেটিকে তুলে ধরলো, একটু নাড়লো; ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলো। সব ভেঙে গিয়েছে; গুঁড়িয়ে গিয়েছে হাড়। কেবলমাত্র চামড়ার মাংসের তালটা লেগে ছিল। করুণ দৃষ্টি দিয়ে সে সেই অংশটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে গোটানো পালের ওপরে বসলো। তার বন্ধুরা তাকে ঘিরে বসে বলল: ক্ষতটাকে সব সময় ভিজিয়ে রাখ। তা না হলে গ্যাংগ্রিন ধরে যাবে।

তারা এক বালতি জল তার সামনে রেখে দিল। সে একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেই পরিষ্কার জল ক্রমাগত সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতটির ওপরে ঢালতে লাগলো।

বড় ভাই বলল: তুমি বরং নিচে গিয়ে বিশ্রাম কর।

সে নিচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু ভাল মনে করে সে আবার ওপরে উঠে এল। একা থাকতে তার ভাল লাগছিল না। তা ছাড়া, বাইরের হাওয়াটা ভাল লাগছিল তার। ফাঁকায় বসে সে সেই ক্ষতটির ওপরে জল দিতে লাগলো।

মাছ বেশ ভালই পড়লো। সাদা চেহারার প্রচুর মাছ মৃত্যু যন্ত্রণায় আছাড় খেতে-খেতে তার পাশে স্তূপাকার হয়ে পড়ে রইলো। ক্ষত স্থানটিতে জলের ছিটে দিতে-দিতে সে মাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপরে তারা বেলোনের দিকে ফিরলো। পথে আবার ঝড় উঠলো। ছোট জাহাজটি আবার পাগলের মত কাঁপতে লাগলো; ঝড়ের ঝাপটায় টালমাটাল খেতে লাগলো; সেই সঙ্গে কাঁপতে লাগলো হতভাগ্য আহত মানুষটি।

রাত্রি এগিয়ে এল। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আবহাওয়া যথেষ্ট খারাপ ছিল। সূর্য ওঠার পর তারা ইংলণ্ডের উপকূল দেখতে পেল। কিন্তু সমুদ্রের অবস্থাটা তখনও খুব একটা ভাল না থাকায় তারা আবার প্রতিকূল বাতাসেই ফ্রান্সের দিকে পাড়ি জমালো।

সন্ধ্যের দিকে যাভেল তার সহকর্মীদের ডাকলো; তার ক্ষত হাতটিতে যে সব কালো-কালো দাগ পড়েছে সেগুলি তাদের দেখালো; তাছাড়া তার সেই মাংস পিণ্ডটি আর হাতের সঙ্গে লেগে ছিল না; সেটা দেহ থেকে ঝুলছিল।

নাবিকরা সেই দিকে লক্ষ্য করে দেখলো। একজন বলল: নিশ্চয় গ্যাংগ্রিন।

তারপরে তারা নোনা জল নিয়ে এসে সেই ক্ষতের ওপরে ঢালতে লাগলো।

আহত লোকটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল ; দাঁতে দাঁত চিপতে লাগলো ; ছটফট করতে লাগলো যন্ত্রণায়। কিন্তু সে একটুও চীৎকার করল না।

যন্ত্রণা একটু কমলে সে তার দাদাকে বলল : তোমার ছুরিটা দাও।

ছুরিটা নিয়ে সে বলল : এই হাত ধর ; ধরে টান।

তার ভাই নির্দেশমত কাজ করলে, যুবক যাভেল কাটতে সুরু করল ; ধারালো ছুরি দিয়ে সে খুব ধীরে-ধীরে সন্তর্পণে কাটতে লাগলো। কাটা শেষ হলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না আমার। না কাটলে, সারা শরীরে ওই গ্যাংরিন ছড়িয়ে পড়তো। হাতের যে-অংশটুকু তখনও তার দেহের সঙ্গে লেগেছিল সেইটুকুর ওপরে সে আবার জল ঢালতে সুরু করল।

সারা রাত্রিই ঝড়ের প্রকোপ থাকায় তারা তীরে নামতে পারে নি। সকাল হওয়ার পরে যুবক যাভেল তার সেই কেটে ফেলা হাতটা নিয়ে পরীক্ষা করল, এহাত-ওহাত করল, নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো।

তার ভাই বলল : এবারে এটাকে সমুদ্রে ফেলে দাও।

চটে উঠলো যুবক যাভেল ; না, না। কক্ষনো না। এটা আমার হাত ; তাই নয় ? এই বলে সে সেটাকে নিয়ে দুটো দাবনার মধ্যে চেপে ধরলো।

বড় ভাই বলল : কাছে আটকে রাখলে ওটা কম পচবে না।

তারপরেই আহত লোকটির মাথায় একটা চিন্তার উদয় হল। বেশ কিছুদিন সমুদ্রের ওপরে তাদের প্রায়ই থাকতে হোত বলে তারা কয়েক ব্যারেল নুন এনে রেখেছিল। সে জিজ্ঞাসা করল : একটা ব্যারেলের ভেতরে আমি এই হাতটা রাখবো ?

অন্য সবাই বলল : ঠিক আছে। তাই হবে।

কয়েকদিন ধরে যে সব ব্যারেলে মাছ বোঝাই ছিল তাদেরই একটা খালি করে, তারা তার হাতের টুকরোটাকে সেই ব্যারেলের নীচে রেখে দিল। তার ওপরে নুন ঢেলে দিয়ে চাপা দিল মাছ।

একটি নাবিক ঠাট্টা করে বলল : খুব সাবধান। বাজারে যেন এটা আমরা মাছের সঙ্গে বিক্রি করে না ফেলি।

এই ঠাট্টায় সবাই হাসতে লাগলো ; হাসলো না কেবল যাভেল ভ্রাতৃদ্বয়।

তবু ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো। পরের দিন সকাল দশটায় বোলোনের কাছাকাছি আসার আগে বাতাস থামলো না। আহত লোকটি তখন তার হাতে জল ঢালছে। মাঝে-মাঝে সে দাঁড়িয়ে উঠে ডেকের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছে। হালের সামনে দাঁড়িয়ে তার দাদা ঘাড় নাড়ে, আর যেদিকে সে যায় সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত তরী বন্দরে এসে ভিড়লো।

হাতটা পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন যে ক্ষতটি ভালই রয়েছে। ক্ষত-

স্থানটা তিনি ভাল করে বেঁধে তাকে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেই ছিন্ন হাতটিকে না নিয়ে যাভেল কিছুতেই শুতে যেতে পারল না। সে একটা ক্রশ চিহ্ন দিয়ে এসেছিল। সেই ব্যারেলটা খুঁজে বার করল।

সবাই মিলে ব্যারেলটাকে ঢেলে ফেলে তার সেই হাতের টুকরোটাকে খুঁজে বার করল। সে দেখলো নুনের মধ্যে থাকার ফলে হাতটা ভাল অবস্থাতেই রয়েছে; একটু কুঁচকেছে এই যা। সে একটা রুমাল নিয়ে এসেছিল। সেই রুমালে হাতটা জড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল।

তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তার সেই হাতের টুকরোটাকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করল, আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল, নখের নিচে যে নুন লেগেছিল সেগুলি খুঁটলো, তারপরে ছুতোর মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হল। মিস্ত্রী এসে ছোট একটা কাঠের কফিন তৈরী করল।

পরের দিন সেই মৃত, ছিন্ন হাতের টুকরোটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। সেই শোভাযাত্রায় জেলে-ডিঙির সবাই যোগ দিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুটি ভাই সমস্ত কাজটি পরিচালনা করল। গির্জার একটি কর্মচারী সেই কফিনটি হাতে ধরে রইলেন।

তারপর থেকে ছোট যাভেল আর সমুদ্রে যায় নি। জাহাজঘাটাতেই সে একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছিল। পরে এই দুর্ঘটনার কথা উঠলেই সে তার হিসাব পরীক্ষককে বলত: দাদা যদি জালের দড়িটা কাটতে রাজি হোত তাহলে নিশ্চয় আমার হাতটা বেঁচে যেত। কিন্তু দাদা তখন তার মূল্যবান সম্পত্তির কথা ভাবছিল।

(The Will)

আমি সেই দীর্ঘায়ত যুবকটিকে জানতাম। তার নাম রেনে দ্য বুরনেভ্যাল। সঙ্গী হিসাবে সে চমৎকার; কিছুটা বিষণ্ণ প্রকৃতির, কোন কিছুর ওপরেই তার আস্থা ছিল না, মানুষের সততায় তার বিশ্বাস ছিল না এতটুকু; তার চরিত্রগত দুর্নীতিগুলিকে সে কঠোরভাবে আক্রমণ করত, তার ভণ্ডামিকে, তার সামাজিক মূল্যবোধকে সে তীব্র ভাষায় বক্রোক্তির মাধ্যমে নির্মমভাবে প্রকাশ করে দিত। তাকে আমি প্রায়ই বলতে শুনতাম: সৎ মানুষ বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই। আমরা যে মানুষকে ভাল বলি তার অর্থ এই নয় যে সে সত্যিকারের ভাল; তার অর্থ এই যে শুয়োর জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করলে তাকে কিছুটা ভাল বলা যায়।

তার দুটি ভাই ছিল। তাদের সে এড়িয়ে চলত। তাদের পদবী ছিল কুরসিলস। এই পদবী থেকেই বোঝা যায় তারা অন্য পিতার সন্তান। ওদের সংসারে যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল সেকথা প্রায়ই আমার কানে আসতো; কিন্তু ঠিক কী ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ আমার জানা ছিল না।

ছেলেটিকে আমার বেশ ভাল লাগতো। সেই জন্যে, আমাদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি একটা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একদিন সন্ধ্যায় একা বসে-বসে আমরা খাচ্ছিলাম; কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি তোমার মায়ের কোন্ পক্ষের ছেলে—প্রথম, না, দ্বিতীয়?

প্রশ্নটা শুনে সে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। একটু লজ্জা পেল যেন; কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না সে; স্পষ্টই দেখা গেল সে বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছে; তারপরে তার স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা আর দুঃখের হাসি হেসে বলল: বন্ধু, যদি শুনতে বিরক্তিকর মনে না হয় তাহলে আমার জীবনের কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা আপনাকে আমি বলতে পারি। আমি জানি বিচার করার মত শিক্ষা আর ক্ষমতা দুই-ই আপনার হয়েছে। সেই জন্যে, আশাকরি, আমার জীবনের কাহিনী শোনার পরেও আমাদের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা নষ্ট হবে না; আর যদি নষ্ট হয়ই, তাতেও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না আমার।

"আমার মা, মাদাম দ্য কুরসিলস, বড়ই হতভাগিনী ভীরু মহিলা ছিলেন। অর্থের জন্যেই তাঁর স্বামী তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সারা জীবনটাই ছিল পরার্থে উৎসর্গীকৃত। চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন স্নেহশীলা, ভীরু এবং স্পর্শকাতর। আইনসঙ্গতভাবে যে বর্বর লোকটির, যাদের সাধারণভাবে দেহাতী ভদ্রলোক বলা হয়, আমার পিতা হওয়ার কথা, সেই লোকটি তাঁর সঙ্গে চিরকাল অসভ্যের মত ব্যবহার করে এসেছেন। তাঁদের বিয়ের একমাস পর থেকেই তিনি বাড়ির চাকরাণীর সঙ্গে সহবাস করতেন। তা ছাড়া, তাঁর প্রজাদের মেয়েদের আর স্ত্রীদের সঙ্গেও তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু তার জন্যে আমার মায়ের গর্ভে দুটি সন্তান উৎপাদন করতে তাঁর কোন দ্বিধা হয় নি; আমাকে যদি ধরেন, তাহলে মায়ের আমিই তৃতীয় সন্তান। আমার মা কোনদিন কোন প্রতিবাদ জানান নি। ঘরের আসবাবপত্রের নিচে নেংটি ইঁদুর যেমনভাবে লুকিয়ে পড়ে, এই হট্টগোলের সংসারে তিনিও সেই রকম নিজেকে লুকিয়ে ফেলতেন। আত্মগোপনকারিণী, দুর্বল স্বভাবের এই মহিলা পরম অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাঁর সেই উজ্জ্বল, অশান্ত চোখ দুটি দিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন; কোন সময়েই মন থেকে তিনি আশংকা দূর করতে পারতেন না। সব সময়েই একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুকটা কেঁপে-কেঁপে উঠতো। কিন্তু তিনি দেখতে সুন্দরী ছিলেন, সত্যিকার সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন অবিকল সেই রকম, ফ্যাকাসে; মনে হোত, অনবরত ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে রঙটা তার জেল্লা হারিয়ে ফেলেছিল।

ম'সিয়ে দ্য কুরসিলস-এর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁরা প্রায়ই তাঁর গ্রামের প্রাসাদে আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন ম'সিয়ে দ্য বুরনেভ্যাল। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব অফিসার; মৃতদার। মানুষটিকে ভয় করত সবাই; কিন্তু তাঁর হৃদয়টা ছিল বড় কোমল; তবে প্রয়োজনবোধে তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত হতে পারতেন; এবং এমন কিছু দুরূহ প্রতিজ্ঞা করে বসতেন যেগুলি পূরণ না করে তিনি শান্ত হতেন না। এঁরই পদবী আমি গ্রহণ করেছি। দীর্ঘায়ত চেহারার মানুষ তিনি, একটু রোগা, কালো ভারি জমাটি গোঁফ জোড়া; আমি অনেকটা তাঁরই মত দেখতে হয়েছি।

অনেক বই তিনি পড়তেন; এবং তাঁর চিন্তাগুলিও তাঁর শ্রেণীর অন্যান্য মানুষদের মত নয়। তাঁর প্র-মাতামহী ছিলেন জে-জে রুশোর বন্ধুস্থানীয়া। মনে হয়, পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগের ফলেই তিনি এই ধরনের চিন্তা করার শক্তি অর্জন করতে পেরেছিলেন। রুশোর যে-সব মননশীল গ্রন্থগুলি পুরনো ধারণা, রীতিনীতি, কুসংস্কার, অকেজো আইন, আর নপুংসক নীতিবোধ বিসর্জন দিতে মানুষকে উৎসাহিত করেছিল তিনি সেই সব গ্রন্থ পড়েছিলেন।

মনে হয়, তিনি আমার মাকে ভালবাসতেন। মা-ও ভালবাসতেন তাঁকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা এমনই সঙ্গোপনে চলতো যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে তা কোনদিন ধরা পড়ে নি। এই হতভাগিনী, অবহেলিতা, পদদলিতা, অসুখী রমণী নিশ্চয় মরীয়া হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে আমার মা-ও তাঁরই মত স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিলেন। প্রেমের ব্যাপারে-ও যে তাঁর স্বাধীনতা রয়েছে সেটা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতেও তাই তাঁর মনে কোন দ্বিধা জন্মায় নি। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে তিনি ভীরু প্রকৃতির ছিলেন বলেই বোধ হয় এই প্রেমের কথা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সাহস করেন নি, নিজের মনের গোপন অন্তরালে তাকে চিরকাল লুকিয়ে রেখেছিলেন।

বাবার মত আমার দুটি ভাই-ও তাঁর সঙ্গে বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। সংসারে তাঁর কোন দাম নেই এটা ধরে নিয়েই তারা তাঁর সঙ্গে চাকরাণীর মত ব্যবহার করত। আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান যে তাঁকে ভালবাসতো; তিনিও আমাকে তাই স্নেহ করতেন বেশী।

মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স আঠারো। পরের ঘটনাগুলি যাতে আপনি বুঝতে পারেন সেইজন্যে এখানে কিছু বলা দরকার। বাবার সম্পত্তি তদারক করার জন্যে একটি অছি নিযুক্ত করা হয়েছিল; যৌথ সম্পত্তি থেকে মায়ের সম্পত্তি তারাই পৃথক করে দিয়েছিল। আইন এবং যে আইনজ্ঞ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর দূরদর্শিতার জন্য, নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার সম্পূর্ণ অধিকার মায়ের ছিল।

আমরা শুনেছিলাম উকিলের কাছে মায়ের একটি উইল রয়েছে। সেই উইলটি পড়ার জন্যে আমাদের সকলকে তাঁর চেম্বারে আসতে বলা হল। সেদিনের কথা আমার এখনও মনে রয়েছে; মনে হচ্ছে যেন গতকাল। ঘটনার পরিবেশটি বড় চমৎকার হয়েছিল; কেবল চমৎকারই নয়, নাটকীয়ও। তবু তাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না; সেই নাটক দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই নাটক বিদ্রোহের নাটক; একটি মৃতা রমণী বেঁচে থেকে যে চিরকাল অপমানিতা হয়েছে, অত্যাচারে হয়েছে জর্জরিতা, কবর থেকে যে রমণী সংসারের সহস্র অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে—এ নাটক সেই মৃতা রমণীর শেষ বিপ্লবের বাণী।

লোকটি যাঁর ধারণা তিনি আমার বাবা—শক্ত সমর্থ, মুখের রঙ লাল; দেখলেই মনে হবে জাত-কসাই; তিনি চুপ করে উইলটা শোনার জন্যে চেয়ারে বসেছিলেন; তাঁর পাশে বসেছিল তাঁর দুটি ছেলে—বিশাল বপু তাদের—একটির বয়স কুড়ি আর একটির বয়স বাইশ; তারাও চুপ করে বসেছিল। মঁসিয়ে দ্য বুরনেভেলও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন; তিনি এসে আমার পেছনে দাঁড়ালেন। তাঁকে বেশ বিবর্ণ দেখা গেল; তিনি তাঁর গোঁফ কামড়াচ্ছিলেন। গোঁফে পাক ধরেছিল একটু। যা ঘটবে তার জন্যে তিনি যে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। দরজায় দুটি তালা দিয়ে উকিল লাল মোম দিয়ে আঁটা খামটি বার করে সকলের সামনেই তিনি সেটি ছিঁড়লেন। বার করলেন একটি উইল। উইলে কি লেখা ছিল তা তিনি জানতেন না। তারপরে পড়তে লাগলেন:

এইটিই আমার প্রিয় মায়ের উইল।

নিম্নস্বাক্ষরকারিণী আমি, অ্যানি-ক্যাথারিন-জিনিভিব মাথিলডি দ্য ক্রয়লু, লিয়োপলভ-যোশেফ-গোঁত্রা দ্য কুরসিলস-এর আইনসঙ্গত পত্নী—সুস্থ দেহ মনে নিম্নলিখিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

"যা আমি করতে যাচ্ছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করতে আমি প্রথমেই ভগবান আর আমার স্নেহভাজন পুত্র রেনেকে . আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আমাকে বোঝার মত মহৎ হৃদয় আমার শিশু পুত্রটির রয়েছে। সারা জীবন ধরে আমি কষ্ট পেয়েছি। অর্থের জন্যে আমাকে বিয়ে করা হয়েছিল; তারপরে আমার স্বামী আমাকে ঘৃণা করেছে, আমাকে ভুল বুঝেছে, আমার ওপরে অত্যাচার করেছে; প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে।

"তাকে আমি ক্ষমা করেছি। তার কাছে আমার কোন ঋণ নেই।

"আমার বড় দুটি ছেলে কোন দিনই আমাকে ভালবাসে নি, আদর করে নি কখনও। সারা জীবন ধরেই আমি তাদের সেবা করেছি; মৃত্যুর পরে তাদের আর কিছু দেওয়ার নেই আমার। প্রতিদিন স্নেহের আদান প্রদান ছাড়া রক্তের বাঁধন টিকে থাকে না। অকৃতজ্ঞ পুত্র অপরিচিত মানুষের মতই।

সে অপরাধী ; কারণ মায়ের প্রতি উদাসীন হওয়ার কোন অধিকার নেই তার।

"মানুষের সামনে, তাদের অন্যায় আইন, অমানুষিক রীতি-নীতি, তাদের নির্লজ্জ কুসংস্কার—এদের সামনে আমি সব সময় ভয়ে কেঁপেছি। ভগবানের কাছে আর আমার ভয় নেই। মৃত্যুতে মানুষের সমস্ত ঘৃণ্য ভণ্ডামি আমি ঘৃণার সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি ; এখন আমি আমার আসল কথাটা খুলে বলতে পারি ; আমার মনে যে সত্য এতদিন লুকিয়ে ছিল সেই সত্যকে আমি সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত করছি।

"সেই জন্যে আমার নিজস্ব সম্পত্তি আমার প্রণয়ী সাইমন দ্য বুরনেভ্যালের কাছে গচ্ছিৎ রেখে গেলাম। পরে তিনি সেই সম্পত্তি আমার প্রিয় পুত্র রেনেকে ফিরিয়ে দেবেন যথাসময়ে।

"এবং আমি সেই শ্রেষ্ঠ বিচারকের কাছে ঘোষণা করছি যে আমি যদি আমার প্রণয়ীর প্রেম প্রীতি, আর প্রত্যয়ের অংশীদার না হতাম, যদি আমি তাঁর বাহুর মধ্যে আশ্রয় না পেতাম তাহলে সৃষ্টিকর্তার প্রেম যে কত বিশাল, দুঃখের দিনে প্রেমিকের সহানুভূতির দাম যে কত, তা আমি বুঝতে পারতাম না ; জীবন আমার কাছে অর্থহীন জঞ্জাল বলে মনে হোত, সৃষ্টিকর্তাকে আমি অভিশাপ না দিয়ে পারতাম না।

"মঁসিয়ে দ্য কুরসিলস আমার জ্যেষ্ঠ দুটি পুত্রের জনক ; একমাত্র রেনেই মঁসিয়ে দ্য বুরনেভ্যালের ঔরসজাত আমার সন্তান। আমি সমাজের কর্ণধারদের কাছে প্রার্থনা করি তাঁরা যেন সামাজিক সমস্ত নীতিবোধের ওপরে উঠে মৃত্যু পর্যন্ত এদের ভালবাসতে সুযোগ দেন ; এবং মৃত্যুর পরও আমাকে তারা যাতে ভালবাসে তারও প্রতিবন্ধকতা না করেন।

এই গুলিই আমার শেষ চিন্তা ; এইগুলিই আমার শেষ বাসনা।"

মেথিলদি দ্য ক্রয়লু।

উইল পড়া শেষ হওয়ার পরে মঁসিয়ে দ্য কুরসিলস দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন : এটি একটি বিকৃত মস্তিষ্কা রমণীর উইল।

এই কথা শুনে মঁসিয়ে দ্য বুরনেভ্যাল সামনে এগিয়ে এসে বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন : আমি সাইমন দ্য বুরনেভ্যাল শপথ নিয়ে বলতে পারি যে মৃতা মহিলা যা বলেছেন তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি ; প্রয়োজন হলে আমি তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করতে পারি। এ সম্বন্ধে কিছু চিঠিও আমার কাছে রয়েছে।

মঁসিয়ে দ্য কুরসিলস এই কথা শুনে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। আমার মনে হল, এখনই তারা মারামারি শুরু করবেন। মুখোমুখি দুজনে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুজনেই সমান দীর্ঘ ; একজন মোটা আর একজন রোগা। দুজনেই রাগে ফুলতে লাগলেন।

আমার মায়ের স্বামী তোতলাতে-তোতলাতে বললেন : তুমি একটি নচ্ছার।

অপর জন রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে বললেন : মঁসিয়ে, অন্য জায়গায় আমরা এর মোকাবিলা করব। সেই চিরবঞ্চিত, অত্যাচারিত, শান্তিপ্রিয় মহিলাটির কথা ভেবে আমি তোমার ওই বিকৃত গালে চপেটাঘাত করতে পারি নি।

তারপরে আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন : তুমি আমার পুত্র। আমার সঙ্গে তুমি আসবে তো? তোমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার আমার নেই। যদি তুমি আসতে চাও তো আসতে পার।

কোন উত্তর না দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। তখন আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছি।

দুদিন পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মঁসিয়ে বুরনেভ্যাল মঁসিয়ে কুরসিলসকে হত্যা করলেন। প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে আমার ভাইরা চুপ করে রইলো। আমার মা আমাকে যে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন তার অর্দ্ধেকটা আমি তাদের দিলাম। তারা তা গ্রহণ করল। আইন আমাকে যে পদবী দিয়েছিল সেই পদবী আমার ছিল না; সেই পদবী পরিত্যাগ করে আমি আমার আসল বাবার পদবী নিয়েছি। মঁসিয়ে বুরনেভ্যাল পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছেন। এখনও আমি তার জন্য শোক করছি।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠলো; কয়েক পা সরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল : আমি মনে করি এই উইল করে মা ঠিক কাজই করে গিয়েছেন। সত্যিকার সৎ মহিলার কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না। একথা কি আপনি স্বীকার করেন?

দুটি হাত প্রসারিত করে বললাম : নিশ্চয় করি, নিশ্চয় করি।

একটি জীবন

[A Life]

১

কাপড়-চোপড় গোছানোর কাজ শেষ হয়ে গেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জিয়ান; দেখল তখনো বৃষ্টির বিরাম নেই। সারাটা রাত ধরে তাদের বাড়ির ছাদ ও জানালার শার্সির উপর অবিরাম বৃষ্টি ঝরার একটানা শব্দ শুনে এসেছে। সে বৃষ্টি এখনো থামেনি।

মাত্র গতকাল কনভেণ্টে পড়ার কাল শেষ হয়েছে জিয়ানের। এতদিনের পুরনো স্কুলকে বিদায় দিয়েছে সে। মুক্ত জীবনের যে অবাধ আনন্দের আস্বাদের স্বপ্ন দেখে এসেছে সে এতদিন সে আনন্দের আস্বাদ আজ সে পেতে চলেছে। কিন্তু জিয়ানের ভয় হচ্ছিল, এ ভাবে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি ঝরতে থাকলে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন না তার বাবা। তাই ঘন ঘন জলভরা বাদল মেঘে ভরা আকাশটার পানে তাকাতে লাগল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল জিয়ানের ক্যালেণ্ডারটা নিতে ভুলে গেছে সে। ১৮১৯ সালের সব মাসগুলো আছে সেই ক্যালেণ্ডারে। বছরের প্রথম থেকে মে মাসের দুই তারিখ পর্যন্ত চারটে মাসের ঘরগুলো পেনসিল দিয়ে কেটে দিল জিয়ান।

সহসা দরজার বাইরে কার গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'জিয়ান'।

এস বাবা। উত্তর করল জিয়ান। উত্তর পেয়ে ঘরে ঢুকলেন তার বাবা।

জিয়ানের বাবা ব্যারণ সাইমন জ্যাক লে পর্থুই দে ভঁদ প্রাচীনপন্থী কোন এক অভিজাত বংশের লোক; পুরুষোচিত গুণ বা যোগ্যতার কোন অভাব নেই তাঁর চরিত্রে। কিন্তু তিনি বড় খামখেয়ালী। জঁা জ্যাক রুশোর সুযোগ্য ভাবশিষ্য ব্যারণ সাইমন ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান প্রকৃতি প্রেমিক। তিনি মাঠঘাট, বন-জঙ্গল, পশু-পাখি প্রভৃতি জগতের সব কিছুই ভালবাসতেন। তাঁর বংশগত আভিজাত্যের জন্য ফরাসী বিপ্লবের অন্তর্বর্তীকালীন ১৮৯৩ সালটিকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিক মনোভাব ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদারনীতিবাদী, তাই জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না। সে অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কথনো কোন সক্রিয় প্রচণ্ডতায় ফেটে না পড়লেও সে অত্যাচারের নিন্দা করতেন। সে নিন্দা তিনি অকুণ্ঠভাবেই করতেন। তার অন্তরের শান্তি বা দুর্বলতার একমাত্র উৎস ছিল তাঁর দয়া।

সে দয়া কোনরকম বাদ-বিচার না করেই সকলকে অকাতরে বিলিয়ে বেড়াতে চাইত তাঁর মন। এই দয়ার কাণ্ডজ্ঞানহীন অবাধ বিতরণ শেষকালে পরিণত হয়ে উঠেছিল দোষে।

ব্যারণ সাইমন জীবনের সব সময় তত্ত্বের উপর জোর দিয়ে চলতেন বলে তিনি তত্ত্বগতভাবেই ঠিক করেছিলেন মনে মনে, তাঁর মেয়েকে তিনি এমন শিক্ষা দান করবেন যাতে সে জীবনে সুখী, ধার্মিক, উন্নতমনা ও স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। বারো বছর পর্যন্ত জিয়ানকে বাড়িতে রেখেই পড়িয়েছিলেন। তারপর তার মার অশ্রুপাতের কথা অগ্রাহ্য করে 'সেক্রেড হার্ট' নামে এক কনভেণ্ট স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে তার বাবার ইচ্ছানুসারে এক কঠোর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয় জিয়ানকে। বাস্তব জীবনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য থেকে একরকম জোর করেই দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাকে।

ব্যারণ সাইমন চাইতেন স্কুল থেকে সতের বছর বয়সে বাড়িতে ফিরে আসবে তাঁর মেয়ে। তখন তিনি তাকে দেবেন উপযুক্ত নীতি ও ধর্মশিক্ষা। তিনি চাইতেন গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে উর্বর মাঠে বেড়েওঠা ফসল ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠবে তাঁর মেয়ের আত্মা। তিনি হয়ত আরও চাইতেন, ভালবাসার ব্যাপারে জীবনের অবাধ মেলামেশার জটিলতাবিহীন আদর্শই পথ দেখাবে জিয়ানকে।

আজ সেই মেয়ে জিয়ান স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। তার ধরাবাঁধা স্কুল জীবনে কত বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্নে যে অবাধ ও মুক্ত জীবনের ছবি কতবার তার মনে অন্ধকার দিগন্তটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে সে জীবন এবারে সে বাস্তবে যাপন করতে চলেছে।

জিয়ানের গায়ের রঙে ও ত্বকে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। তার গাত্রত্বক যেমন মসৃণ, তার গাত্রবর্ণ তেমনি উজ্জ্বল। তবে তার মাথার চুলের মত গায়ের রঙেও একটু গোলাপী আভা আছে। তার চোখদুটো ছিল নীল। সব মিলিয়ে জিয়ানকে দেখে মনে হত সে যেন শিল্পী ভেরোনীজের আঁকা এক নিখুঁত ছবি। তার ডান দিকের চিবুকে ও বাঁ দিকের নাসারন্ধ্রে একটা করে আঁচিল আছে। সে বেশ লম্বা। বক্ষস্থল উন্নত এবং সুগঠিত। সে যখন হাসে তখন সে হাসির শব্দ অনেকক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় ঘরের মধ্যে। তার চুলটা ঠিক করে নেবার জন্য তার মাথার তালুতে হাতটা বোলানোর একটা বাতিক ছিল।

দরজার কাছে বাবার গলার শব্দ পেয়ে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুম্বন করে বলল, তাহলে আমরা এখন যাচ্ছি ত বাবা? জানালার দিকে বাইরে একবার তাকিয়ে সাইমন বললেন, এই রকম দুর্যোগে বাড়ি থেকে বেরোনোর কি করে আশা করতে পার তুমি?

আব্দারের সুরে জিয়ান বলল, বিকালের দিকে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তখন তার বাবা বললেন, ঠিক আছে, তোমার মাকে যদি রাজী করাতে পার তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মার ঘরে চলে গেল জিয়ান। বাড়ি ফেরার এই ব্যগ্রতার একটা কারণ ছিল জিয়ানের। রুয়েনের কনভেণ্টে ভর্তি হবার পর থেকে একবারও গাঁয়ের বাড়িতে যেতে পায়নি জিয়ান। মাত্র দুবার প্যারিসে গিয়েছিল। কিন্তু শহরে গিয়ে গ্রাম্য জীবন যাপনের পিপাসা মেটেনি। কোন এক খাড়াই পাহাড়ের ধারে বন্দরের গায়ে লে পোপ্লে নামে এক গাঁয়ে একটা খামারবাড়ি আছে জিয়ানদের। ঠিক হয়েছে তার বিয়ের পর জিয়ানকে এই খামারবাড়ির অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়-সম্পত্তি দেওয়া হবে। বিয়ের পর ইচ্ছা করলে সেখানেই সারাজীবন বসবাস করতে পারবে জিয়ান।

মার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে বাবাকে গাড়ি তৈরী করতে বলল জিয়ান। গাড়ি এল দরজার কাছে। কিন্তু বৃষ্টি থামল না, উল্টে বাড়তে লাগল। গাড়ির পা-দানিতে জিয়ান পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মা ব্যারণ-পত্নী নেমে গেলেন। স্থূলাঙ্গী ব্যারণ-পত্নীর চেহারাটা দিনে দিনে স্থূল হয়ে উঠছিল। তাঁর একটা হাত তাঁর স্বামী আর একটা কাত রোজালি নামে একটি মেয়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করছিল। রোজালি যদিও কাজ করত জিয়ানদের বাড়িতে এবং তার একমাত্র কাজ ছিল ব্যারণ-পত্নীকে এখানে সেখানে যেতে সাহায্য করা : তথাপি আসলে সে ছিল জিয়ানেরই এক সৎ বোন। তার বয়স আঠারো, কিন্তু তাকে দেখে কুড়ি বলে মনে হয়। গাড়িতে উঠতে গিয়ে নেমে গেলেন ব্যারণ-পত্নী। বললেন ; এই বৃষ্টিতে কোথাও যাওয়ার কথাটাই অবান্তর।

ব্যারণ সাইমন তখন বললেন, তুমিই ত মত দিয়েছিলে মাদাম এ্যাদিলেদ।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন কথা না বলে রাগের মাথায় গাড়ির উপর কষ্ট করে উঠে বসলেন মাদাম এ্যাদিলেদ। তার একপাশে ব্যারণ ও আর একপাশে জিয়ান ও রোজালি বসল।

ব্যারণ-পত্নী অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল : প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও জিয়ানের গান গাইতে ইচ্ছা করছিল। বন্ধ ঘরের মধ্যে বেড়েওঠা কোন চারা গাছকে বাইরে আলো হাওয়ার রাজ্যে আনলে যেমন হয় তারও ঠিক তাই হচ্ছিল।

সহসা একটা চামড়ার ব্যাগ তাঁর ঘুমন্ত স্ত্রীর কোলের উপর রাখলেন ব্যারণ। ব্যারণ-পত্নী মাদাম এ্যাদিলেদের কাঁচা ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে যেতেই তিনি নড়ে উঠলেন আর কোল থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল মেঝের উপর। ব্যাগের মধ্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা ও টাকার নোট ছিল, সেগুলোও পড়ে গেল।

ব্যারণ সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরে রেখে বললেন, এই টাকাটা আমাদের এলিতরে খামারবাড়ির ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে পেলাম।

ব্যারণ-পত্নী তা গুণে দেখলেন তাতে আছে ছয় হাজার চারশো ক্রাঁ। ব্যারণ বললেন, এই টাকা দিয়ে আমরা লে পোপ্লের খামারবাড়িটা মেরামত করব।

তাঁর বাবা-মার মৃত্যুর পর মোট উনত্রিশটা খামারবাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পান ব্যারণ। তার মধ্যে তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য নয়টা খামারবাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। দয়াদাক্ষিণ্যের দিক থেকে বাড়ির সকলেই সমান।

জিয়ান বলল, আমার বাড়িটা এখন দেখতে কেমন লাগছে?

ব্যারণ বললেন, তুমি গেলেই দেখতে পাবে।

বৃষ্টিটা থেমে গেল। বিকাল গিয়ে রাত্রি এল। অবশেষে দেখতে দেখতে গন্তব্যস্থল এসে গেল। জিয়ানদের গাড়িটা পোপ্লের সেই খামার-বাড়িতে গিয়ে পৌছতেই বাড়ির লোকজন লণ্ঠনের আলো হাতে এগিয়ে এল। পোপ্লের খামারবাড়িটা নরম্যান আমলের তৈরী। এর নাম খামারবাড়ি হলেও গোটা প্রাসাদটা শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী। কালের ব্যবধানে অবশ্য আগেকার সেই শুভ্রতা ধূসর রঙে পরিণত হয়েছে। বাড়িটা এত বড় যে একটা গোটা গাঁয়ের লোক তাতে থাকতে পারে। গোটা বাড়িটার মধ্যে বসার ঘর, পড়ার ঘর, শোবার ঘর প্রভৃতি সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠছিল জিয়ান। পুরনো আমলের দামী আসবাবপত্রে ভরা ঘরগুলো।

জিয়ানের সবচেয়ে ভাল লাগল তার শোবার ঘরটা। তার জন্য আধুনিক কালের কিছু আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম কিনেছেন ব্যারণ। তার শোবার খাটটা কিন্তু পুরনো। ওক কাঠের তৈরী চারটে কালো পালিশ করা পাখি খাটের পাগুলো ধরে রেখেছে।

আলো নিয়ে গোটা বাড়িটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করছিল জিয়ানের। তবু রাত হয়েছিল বলে শুতে যেতে হলো। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়তে পারল না জিয়ান। বসে বসে ঘরের বাইরে ও ভিতরে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে সাধ মিটিয়ে দেখতে লাগল।

ঘরের দেয়ালে আঁকা ছিল পিরামুস আর থিসবের প্রণয়লীলার ছবি। চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের ভিতরে। বাইরে জিয়ান দেখল ঘাসে ঢাকা বিরাট প্রশস্ত লন। তার ওপরে দুটো বড় গাছ দুধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওধারে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গলের সীমানা। চন্দ্রালোকপ্লাবিত এই গ্রাম্যরাত্রির শীতল স্তব্ধতায় আপন চিত্তের মধ্যে একটা আশ্চর্য প্রশান্তি অনুভব করছিল জিয়ান। তার মনে হচ্ছিল তাঁর অন্তরটাও চাঁদের আলোর মতই এক স্নিগ্ধসুন্দর উজ্জ্বলতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে চারদিকে। চাঁদের

আলোর মত তার সঙ্গেও ঐ সব গাছপালা ঘাস মাটির নিঃশব্দ নিবিড় এক সখ্যতা গড়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট সুখের আভাসমেশানো এক ভবিষ্যতের আশা উঁকি মারছিল জিয়ানের মনে। আর সে আশার সঙ্গে ছিল ভালবাসার এক স্বপ্ন।

ভালবাসা! নিজে নিজেই কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে যায় জিয়ান। কে তার ভালবাসার মানুষ তা সে জানে না। ভালবাসা বলতে কি বোঝে সে তাও সে জানে না। তবু এই দুটি বছর ধরে এই ভালবাসার কথাটা এক দুরন্ত ও অপ্রতিরোধ্য অবাধ্যতায় বারবার আনাগোনা করেছে তার মনে।

তাঁর ভালবাসার মানুষ দেখতে কেমন হবে সে বিষয়েও কোন ধারণা নেই জিয়ানের। সে শুধু জানে তার সেই ভালবাসার মানুষকে তার অন্তরের সকল ঐশ্বর্য পূজার নৈবেদ্যরূপে সাজিয়ে দিয়ে দেবতার মত করে পূজো করবে তাকে। আলোছায়ার খেলায় ভরা এমনি চাঁদের আলোয় নির্জন নৈশপ্রকৃতির মাঝে দুজনে পাশাপাশি বেড়িয়ে বেড়াবে ওরা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেতে যেতে দুজনে অনুভব করবে দুজনের দেহের মিষ্টি উত্তাপ। জিয়ান আরও জানে তাদের ভালবাসা হবে এমনই গভীর যে সেই গভীরতাকে সম্বল করে ওরা চলে যাবে পরস্পরের হৃদয়ের অতল গভীরে।

সহসা জিয়ানের মনে হলো তাদের বাড়ির পিছন দিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছন্দায়িত গতিতে এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জিয়ান দেখল ওটা তার মনের ভুল। গাড়িটা রাস্তা দিয়ে সোজা চলে গেছে।

পরিণয়বন্ধনের নিবিড়তার মধ্যে তাদের প্রণয়লীলা হবে সার্থক। তার সেই স্বামীকে নিয়ে এই নির্জন বাড়িতেই বাস করবে জিয়ান। ওদের বেশী নয়, মাত্র দুটি সন্তান হবে। ছেলেটি হবে তার স্বামীর মত আর মেয়েটি হবে তার নিজের মত।

জানালার রড ধরে চাঁদের আলোয় গা ভাসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল জিয়ান। রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে দিল এইভাবে। শেষ রাতের দিকে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। উঠতে সকাল আটটা বেজে গেল। পরদিন সকালে ব্যারণ জিয়ানকে সঙ্গে করে গোটা বাড়িটার সব কিছু দেখিয়ে বেড়ালেন। এবাড়ি একদিন তারই হবে। তাকেই থাকতে হবে এখানে। সুতরাং এ বাড়ির কোথায় কি আছে তা দেখে নিতে হবে। বিকালে বাবার সঙ্গে বন্দর দিয়ে বেড়াতে গেল জিয়ান। সমুদ্রের ধারে ইপোর্ত গাঁটা দেখল।

গাঁটা পার হলেই সমুদ্রের নীল জল দেখা যায়। সমুদ্র দেখে জিয়ানের মনে হতে লাগল সে যেন সমুদ্রের বুকে ছুটে বেড়ায়।

সমুদ্র দেখে পাহাড়ে কিছু দূর উঠল ওরা। ফেরার পথে একজন গ্রাম্য জেলের কাছ থেকে কিছু সস্তা দরে মাছ কিনে আনল জিয়ান।

হাতে কোন কাজ ছিল না। জিয়ানের অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে এমন এক মায়ার আবেশ জড়ানো ছিল যে তাতে কখনো কোন ক্লান্তি অনুভব করত না জিয়ান। কখনো বই পড়ে, কখনো ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, কখনো গাঁয়ের পথে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাত সে। তবু কখনো কোন বিরক্তি অনুভব করত না।

ব্যারণ সাধারণতঃ খামার বাড়িতে কৃষিকাজ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তার ব্যারণপত্নীকে হাঁটাহাঁটি করতে বলায় তিনি আজকাল প্রায়ই জিয়ানের সঙ্গে বেড়াতে বার হন। রোজালির কাঁধে ভর দিয়ে পথ হাঁটেন আর কিছুদূর গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন।

ব্যারণপত্নী মাদাম এ্যাদিলেদের দেহটা যে পরিমাণে ভারী হয়ে উঠেছিল তাঁর মনটা কেমন যেন হালকা হয়ে উঠেছিল সেই পরিমাণে। যৌবনে তিনি নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর চেহারাটা ছিল খুব লম্বা আর ছিপছিপে ধরনের। সম্রাটের কত সব বড় বড় অফিসারের সঙ্গে তিনি নেচেছেন। তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ব্যারণ যে সব চিঠি দিয়েছিলেন সেই সব প্রেমের চিঠিগুলি আজও যত্ন করে একটি মেহগনি কাঠের বাক্সে রেখে দিয়েছেন তিনি।

একদিন বিকালে জিয়ান আর তার মা যখন পথে বেড়াচ্ছিলেন তখন এক-জন যাজক তাদের দেখে মাথার টুপি খুলে তাদের দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে বলল, কেমন আছেন ব্যারণপত্নী ?

মাদাম এ্যাদিলেদ দেখলেন, তাঁদের এলাকার যাজক আবেব। বিপ্লবের যুগের আবহাওয়ায় মানুষ হন মাদাম এ্যাদিলেদ। তাঁর বাবা ছিলেন সংশয়-বাদী। ফলে ধর্ম সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না তাঁর। তিনি কোন-দিন গীর্জায় যেতেন না। তবে ধর্ম সম্বন্ধে যে এক নারীসুলভ কৌতূহল ছিল তাঁর অন্তরে সেই কৌতূহলের বশেই যাজকদের কিছুটা পছন্দ করতেন তিনি।

যাজক আবেব পিকতকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন মাদাম এ্যাদিলেদ। তিনি আবেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বললেন, আমি প্রথমটায় আপনাকে চিনতে পারিনি এজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত।

আবেব কিন্তু এ নিয়ে মনে কিছু করেন নি। মানুষ হিসাবে খুবই সরল এবং সাদাসিধে প্রকৃতির তিনি। তাঁর চেহারাটা খুবই মোটা এবং মুখটা লাল। গায়ে চর্বি বেশী থাকার জন্য অনবরত ঘামেন আবেব। পকেট থেকে বারবার একটা রুমাল বার করে মুখ মোছেন। টুপিটা হাঁটুর ওপর রেখে বসলেন আবেব। জিয়ানকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করলেন।

একজন গ্রাম্য যাজকের চরিত্রে যা যা গুণ থাকা দরকার তা সবই ছিল আবেবের মধ্যে। মনটা যেমন তাঁর সব সময় খুশিতে ভরা থাকত, তেমনি

মুখে তাঁর সব সময় লেগে থাকত হাসি। যাজক আবেবকে নৈশভোজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেন মাদাম এ্যাদিলেদ। পরে ব্যারণও তাদের কাছে এসে তাদের আলোচনায় যোগদান করলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের দিক থেকে ব্যারণ সাইমন ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী। ধর্ম সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করতেন না। তবু আবেবকে পছন্দ করতেন তাঁর সরল স্বভাবের জন্য।

তবে আবেবের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন ব্যারণপত্নী। আবেবের কথা বলার চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমা, তাঁর লালাভ মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি এবং পৃথুল দেহাবয়বের পূর্ণতা তাঁর প্রতি দুর্বার বেগে আকর্ষণ করত ব্যারণ-পত্নীর মনটাকে।

নৈশভোজন শেষ হলে যাজক আবেব একটা কথা ঘোষণা করলেন: সম্প্রতি আমি এক অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁর নাম ভিসকাউন্ট দ্য লামেয়ার। আমি একদিন তাঁকে নিয়ে আসব আপনাদের কাছে।

মাদাম এ্যাদিলেদের জানতে বাকি নেই এ শহরে কোথায় কোন অভিজাত পরিবার আছে। তাই যাজকের কথা শেষ হতে না হতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ভদ্রলোক কি ইয়েরের লামেয়ার বংশের লোক?

আবেব বললেন, হ্যাঁ, উনি হলেন ভিসকাউন্ট জঁ দ্য লামেয়ারের পুত্র। ওঁর বাবা গত বছর মারা যান।

আবেবকে লামেয়ার সম্বন্ধে আরও অনেক প্রশ্ন করলেন মাদাম এ্যাদিলেদ। পরে জানলেন, যুবক লামেয়ার পিতৃঋণ পরিশোধ করার জন্য তাদের বেশীরভাগ ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। এখন তাঁর শুধু আছে এত্রোভেঁ অঞ্চলে তিনটি খামারবাড়ি। তারই একটাতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এতে তাঁর আয় খুব বেশী হয় না। কিন্তু তিনি মিতব্যয়ী বলে তাতেই চলে যায়। তাঁর আয় ছিল মোট বছরে পাঁচ ছয় হাজার ফ্রাঁ। পিতার মৃত্যুর পর প্রথম দু তিন বছর খামারবাড়ির অন্তর্গত একটা কুঁড়ে ঘরে বিশেষ মিতব্যয়িতার সঙ্গে কাটান। অতি কষ্টে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই অর্থের জোরে তিনি অভিজাত সমাজে যোগাযোগ করে চলেছেন এবং বিয়ে করার কথা ভাবছেন।

আবেব আবার তুললেন কথাটা। বললেন, ছেলেটি বড় ভাল এবং শান্ত প্রকৃতির। তবে এ অঞ্চল তাঁর ভাল লাগছে না।

ব্যারণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, এখানে তাঁকে একদিন নিয়ে আসুন। এখানে এলে তিনি আনন্দ পাবেন।

খাওয়ার পর বাগানে আবেবকে নিয়ে কিছুক্ষণ বেড়ালেন ব্যারণ। আবেব একটা সিগারেট চিবিয়ে খেতে লাগলেন। ব্যারণ আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবেব বললেন, এতে আমার হজম ভাল হয়।

গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের দিকে মুখ তুলে উজ্জ্বল চাঁদের পানে তাকালেন আবেব। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আবেগের সঙ্গে বললেন, এমন দৃশ্য আমি সারারাত দেখতে পারি।

বাগান থেকে ফিরে এসেই বিদায় নিলেন আবেব।

৩

পরের রবিবার যাজক আবেবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই যেন জিয়ানকে সঙ্গে করে গীর্জায় গেলেন মাদাম এ্যাদিলেদ। প্রার্থনার কাজ সারা হয়ে গেলে আবেবের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর লম্বা চেহারার সুসজ্জিত এক যুবকের হাত ধরে চার্চের ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁদের কাছে এলেন আবেব। বললেন, কি ভাগ্যের কথা, আসুন ব্যারণপত্নী। এস জিয়ান, তোমাদের সঙ্গে ভিসকাউন্ট দ্য লামেয়ারের পরিচয় করিয়ে দিই।

লামেয়ারের মুখটা বড় মিষ্টি, যে মুখ সাধারণতঃ মেয়েরা চায়, কিন্তু পুরুষরা দেখতে পারে না। তার মাথার চুল কালো এবং কোঁকড়ানো। তার চোখের ভ্রূদুটো এমনই টানা টানা যে মনে হয় কে যেন তা টেনে দিয়েছে কৃত্রিমভাবে আর সেই লীলায়িত ভ্রূভঙ্গিমা তার কালো চোখে এনে দিয়েছে এক আশ্চর্যমধুর গভীরতার ভাব। তার প্রতিটি কথাকে করে তুলেছে তাৎপর্যময়। তার চোখপানে তাকালেই মনে হয় লামেয়ার যেন কি গভীরভাবে ভাবছে।

এমনি দুচারটে কথা হওয়ার পর ওরা চলে গেল। এর ঠিক দুদিন পর লামেয়ার এল জিয়ানদের বাড়িতে।

কথায় কথায় বেরিয়ে গেল, লামেয়ারের বাবা ছিলেন ব্যারণপত্নী মাদাম এ্যাদিলেদের বাবার বন্ধু। একথা জানাজানি হওয়ায় লামেয়ারের সঙ্গে প্রাণ খুলে আপন বংশপরিচয় ও পুরনো দিনের অনেক কথা অনর্গল বলে চললেন মাদাম এ্যাদিলেদ।

আপন বংশের কথা শেষ করে শহরের অনেক অভিজাত পরিবারের কথা বলতে লাগলেন। বললেন, জান ভিসকাউন্ট, মঁসিয়ে ক্রিমেজ ছিলেন আমার বন্ধু।

লামেয়ার বলল, হ্যাঁ, উনি পরে অন্য কোথাও চলে যান শহর ছেড়ে।

মাদাম এ্যাদিলেদ বললেন, উনি আমার এক বিধবা পিসিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আমার পিসিমা উনি নস্যি নেন বলে ওঁকে বিয়ে করতে চাননি।

নিজেদের সমাজের অনেক পরিবারের কথাই বললেন তাঁরা। ওঁদের কথা শুনে মনে হলো এই সব অভিজাত সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি শুধু

তাঁদের চেনা না, যেন আপন আত্মীয়। কে কাকে বিয়ে করেছে, কে কোথায় বাস করছে সে বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই তাঁদের এবং সে কথা যেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের কাছে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে একবার করে জিয়ানের মুখপানে তাকাতে লাগল লামেয়ার। নীরব ভাষায় কি যেন বলতে চাইল। জিয়ান এতক্ষণ নীরবে বসে তাদের কথা শুনে যাচ্ছিল।

ব্যারণও তাই। রুশোর দর্শনে বিশ্বাসী ব্যারণ কখনো স্বীকার করেন না এই সব আভিজাত্যের মধ্যে কোন গৌরব ও গর্বের বস্তু আছে। এ বিষয়ে কোন কৌতূহল নেই তাঁর। তিনি অভিজাত সমাজের কোন পরিবারকেই জানেন না। তাই প্রায়ই লামেয়ারকে বিভিন্ন লোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলেন। লামেয়ারের কথা শেষ হতে ব্যারণ জানতে চাইলেন এ অঞ্চলে কারা বাস করেন?

লামেয়ার বললেন, এ অঞ্চলে মেলামেশার মত কোন অভিজাত পরিবার নেই। তবে ওরই মধ্যে আছে তিন ঘর। এদের মধ্যে ভিসকাউণ্ট দ্য ব্রিসেভিল বড় বংশের সন্তান, কিন্তু কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। আর এক ঘর আছে। তিনি হলেন কাউণ্ট দ্য ফুরভিল। তিনি নাকি শিকার আর বন জঙ্গল ছাড়া কিছুই জানেন না। সবাই বলে লোকটা নাকি বর্বর প্রকৃতির এবং সে নাকি তার প্রথম স্ত্রীকে খুন করে। লা ভ্রিলেত গ্রামে একটা হ্রদের ধারে তার একটা বাড়ি আছে। জায়গাটা খুব নির্জন।

বিদায় নেবার সময় লামেয়ার আবার একবার জিয়ানের মুখপানে তাকাল।

লামেয়ার চলে গেলে ব্যারণপত্নী খুশি হয়ে বললেন, খাসা ছেলে। যেমন কথাবার্তা, তেমনি ব্যবহার।

ব্যারণও সেকথায় সায় দিয়ে বললেন, সত্যিই ছেলেটি সদ্‌বংশীয়।

এর পরের সপ্তায় একদিন নৈশভোজে ব্যারণ পরিবারে নিমন্ত্রিত হলো লামেয়ার। এরপর রোজ আসত। আসত ঠিক বিকাল ছয়টার সময়। এসে ব্যারণপত্নী আর জিয়ানকে নিয়ে বেড়াতে যেত। একদিকে জিয়ান আর একদিকে লামেয়ারের কাঁধের উপর ভর দিয়ে অনেকখানি পথ হাঁটতেন মাদাম এ্যাদিলেদ। এক একদিন আবার ব্যারণের সঙ্গে ইপোর্ত বন্দর দিয়ে বেড়াতে যেত লামেয়ার।

সেদিন ব্যারণের সঙ্গে বন্দরে যেতেই বুড়ো নাবিক লাতিস্ক এসে পাইপ মুখে বলল, যদি বাতাসটা থেমে যায় তাহলে আগামীকাল এত্রিয়াত গিয়ে আবার ফিরে আসতে পার নৌকোয় করে।

সেদিন ওদের সঙ্গে ছিল জিয়ান। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল জিয়ান। বলল, কী মজা হবে। আমরা যাব বাপি।

পরদিন সকালে আবহাওয়াটা ভাল থাকায় ওদের এত্রিয়াত বেড়াতে যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল।

সমুদ্রে যেমন ঢেউ ছিল না, তেমনি বাতাসের মধ্যেও কোন ঢেউ ছিল না। সেই শান্ত অনুকূল বাতাসে পাল তুলে এগিয়ে যেতে লাগল জিয়ানদের নৌকো। পিছনে বন্দরটা পড়ে রইল। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে পাহাড়। সামনে দিগন্ত। সে দিগন্ত সমুদ্রে গিয়ে মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। শান্ত সমুদ্রের সেই অপার অনন্ত নিস্তব্ধতায় ওদের মন যেন একেবারে ভিজে গেছে। ওদের মুখের সব কথা যেন হারিয়ে গেছে। জিয়ানের কেবলি মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবীর মধ্যে আলো জল আর আকাশ ছাড়া কোন সত্য নেই।

জিয়ান আর লামেয়ার পাশাপাশি বসেছিল দুজনে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না। অথচ তারা দুজনেই বেশ অনুভব করছিল তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এক নিবিড় আত্মীয়তার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাদের নিঃশব্দ নিবিড় দৃষ্টির মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে কত অকথিত কথার মাধুর্য।

আকাশে সূর্য উঠতেই লাজুক অথচ ছলনাময়ী কোন নারীর মত সোনালী কুয়াশার এক পাতলা ঘোমটা টেনে দিল সমুদ্র তার মুখে। সে যেন তার সে মুখ সমুদ্রকে দেখাবে না। অথচ সে জানে মাত্র কিছুক্ষণ পরেই সূর্য তার তীক্ষ্ণ রশ্মি দিয়ে সে ঘোমটা ছিঁড়ে খুঁড়ে দেবে।

এ দৃশ্য দেখে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে জিয়ান বলল, কী সুন্দর!

লামেয়ারও বলল, সত্যিই বড় সুন্দর।

ক্রমে এত্রিয়াত চলে এল। কূলে গিয়ে ওদের নৌকো ভিড়ল। আগে নামলেন ব্যারণ। তারপর জিয়ানকে দু'হাতে তুলে কূলে নিয়ে গেল লামেয়ার। তার পায়ে জল লাগল না।

কূলে গিয়ে একটা পান্থশালায় ওরা খাওয়ার কাজটা সেরে নিল। সমুদ্রে কেউ কোন কথা বলে নি। অনন্ত গভীর সমুদ্র মানুষের সব কথা স্তব্ধ করে দেয়, মানুষের সব চিন্তা কেড়ে নেয়। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওরা কারণে অকারণে অনেক কথা বলল। অনেক হাসাহাসি করল লাতিজ্বকে নিয়ে, খাবার পর জিয়ান বলল, একটু বেড়িয়ে আসি।

ব্যারণ বললেন, তোমরা যাও। আমি এই কূলেই থাকব। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এস তোমরা।

কতকগুলো কুঁড়ে ঘর পরে হয়ে ওরা পেল একটা খোলা উপত্যকা। সূর্যের তাপটা তখন বড় প্রখর হয়ে উঠেছিল। তাই ওরা গাছের ছায়াভরা একটা পথের ধারে গিয়ে বসল। কত অজানা ফুল ফুটে ছিল চারিদিকে আর মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছিল তার উপরে।

বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ জিয়ান একসময় বলল, আমি যদি মৌমাছি হতাম তাহলে কেমন করে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতাম। সুন্দর এ জীবন হয়ে উঠত আরো কত সুন্দর।

এরপর ওরা কথা বলতে লাগল দুজনে। কত সব ব্যক্তি-জীবনের কথা। কথা বলতে বলতে পরস্পরের মুখপানে তাকাতেই হেসে ফেলছিল ওরা। ওরা বেশ বুঝতে পারল এক গভীর বিশ্বাস গড়ে উঠেছে ওদের এই নূতন সম্পর্কের মধ্যে।

ওরা সেই হোটেলের কাছে ফিরে এসে দেখল ব্যারণ বেড়াতে গেছেন। ব্যারণ ফিরে এলেন বেলা পাঁচটার সময়। ব্যারণ আসার পরে আবার ওরা ঘাটে গেল।

নৌকো ছেড়ে দিল। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। আবার সেই সমুদ্র। সেই অনন্ত গম্ভীর সমুদ্র। যে সমুদ্র মানুষের সব কথা স্তব্ধ করে দেয়। মানুষের সব চিন্তা কেড়ে নেয়। শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল জিয়ানদের নৌকো।

এবার জিয়ান প্রথমে কথা বলল, আমি দেশভ্রমণ ভালবাসি।

লামেয়ার বলল, কিন্তু একা ভ্রমণ ভাল লাগে না। একজন অন্ততঃ সঙ্গী দরকার। কথা বলার জন্য একজন অন্ততঃ লোক চাই।

জিয়ান চুপ করে কি ভাবতে লাগল। পরে বলল, তা অবশ্য বটে। তবে আমি একা একা বেড়াতেই ভালবাসি। একা একা স্বপ্ন দেখতে বড় ভাল লাগে।

লামেয়ার বলল, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও দেখবে দুজন আছে। একা একা স্বপ্ন দেখাও হবে না। কোন বস্তু বা ব্যক্তি চাই।

জিয়ানের মুখের পানে লামেয়ার স্থির দৃষ্টিতে তাকাতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল জিয়ান। ভাবতে লাগল একথা লামেয়ার কি তাকে শিক্ষা দেবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলেছে?

দিগন্তে তাকিয়ে রইল জিয়ান। দিগন্তের পরপারে কি আছে তা ও যেন দেখতে চায়, সেখানে যদি কোন দেশ থাকে সেখানে সে যেতে চায়।

জিয়ান কি ভাবতে ভাবতে বলল, আমি ইটালি যেতে চাই। ।......হ্যাঁ গ্রীসেও যেতে চাই।

লামেয়ার কিন্তু যেতে চায় সুইজারল্যাণ্ডে।

জিয়ান বলল, আমি হয় কোন নূতন অথবা কোন পুরনো দেশে যেতে চাই।

লামেয়ারের মনটা জিয়ানের মত অতটা আবেগপ্রবণ নয়। সে বলল, আমি যেতে চাই ইংল্যাণ্ডে: সেখানে অনেক কিছু শেখার আছে।

এইভাবে ভ্রমণের কথা নিয়ে বিভিন্ন দেশের গুণাগুণ বিচার করে দেখতে

লাগল ওরা। অবশেষে এ বিষয়ে দুজনেই একমত হলো যে সবচেয়ে ভাল দেশ হলো ফরাসী। এ দেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সবচেয়ে ভাল। এর শীতল গ্রীষ্ম, নাতিতীব্র শীত, উর্বর মাটি, শান্ত নাব্য নদী, গভীর অরণ্য অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় এর আকর্ষণ হলো এ দেশের বিশুদ্ধ শিল্পচর্চা। এ দেশ যেন শিল্প ও সংস্কৃতির দেশ।

সূর্যটা আকাশ থেকে নেমে এসে পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রের জলের কাছে ঝুলছিল। একটু পরেই যেন সমুদ্রের গভীরে ডুবে যাবে। আর সেই মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে মুহূর্ত গণনা করছিল শান্ত সূর্যাভিমানিনী সমুদ্র। তার বুকের গভীরে একান্তভাবে সূর্যকে পেতে চায় যেন সমুদ্র।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে জিয়ানের হাতের উপর একটা আঙুল দিয়ে চাপ দিল লামেয়ার। জিয়ান কিছু বলল না বা সরিয়ে নিল না হাতটা। লামেয়ারের প্রথম স্পর্শে শুধু একবার শিউরে উঠল জিয়ান।

বাড়িতে ফিরে সে রাত্রিতে ঘুম হলো না জিয়ানের। ভালবাসা কাকে বলে তা সে জানে না। তবু তার বারবার মনে হতে লাগল সে যেন সত্যিই কাউকে ভালবাসতে শুরু করেছে। এরপর থেকে সে লামেয়ারকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করত।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ব্যারণ এসে জিয়ানকে বললেন, আগামী কাল সকালে তোমার সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরবে।

জিয়ান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন বাবা ?

ব্যারণ বললেন, পরে জানতে পারবে।

পরদিন সকালে মুখহাত ধুয়ে হালকা রঙের একটা ভাল দামী ফ্রক পরল জিয়ান। কিছুক্ষণ পর দেখল ভাল পোশাক পরে লামেয়ারও এল। ওদিকে মা তাঁর পোশাক পরে তৈরী হচ্ছে। ব্যারণ প্রস্তুত।

কিন্তু কোথায় তারা যাবে তা বুঝতে পারল না জিয়ান। লামেয়ারকে হাসিমুখে শুধাল, কি ব্যাপার বলত ?

লামেয়ার বলল, একটু পরেই জানতে পারবে।

বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ওরা চারজনে চেপে বসল তাতে।

রোজালির কাঁধে ভর দিয়ে মাদাম এ্যাদিলেদ এসে যখন চাপছিলেন তখন রোজালি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল লামেয়ারের দিকে। সে যেন জীবনে প্রথম এক সুদর্শন যুবককে দেখছে। তার বন্দীজীবনে এই প্রথম যেন মানুষের রূপসৌন্দর্যের চাক্ষুস আস্বাদন।

রোজালির দেখার ধরন দেখে ব্যারণ ঠাট্টা করে লামেয়ারকে বললেন, কি ভিসকাউন্ট, আমাদের বাড়ির ঝি যে তোমার রূপে একেবারে মজে গেছে।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল লামেয়ারের মুখখানা।

গাড়ি এসে ইপোত বন্দরের আগে সেই জেলেদের গাঁটায় থামল। ওরা সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। জিয়ান অবাক হয়ে দেখল জেলেরা সবাই নূতন কাপড় পরে আপন আপন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার বাবার সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর নীরবে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। লামেয়ার তার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা।

বন্দরে ঘাটের কাছে ওরা গিয়ে দেখল, ওদের পিছনে গ্রাম্য যাজকও এসে হাজির হয়েছেন। বন্দরে যেতে জিয়ানের চোখে পড়ল একটি জাহাজকে ফুলের মালা আর রঙীন ফিতে দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। যাজক মন্ত্র পড়তে পড়তে পবিত্র শান্তি জল ছিটোতে লাগলেন জাহাজটার গায়ে। জিয়ান আর লামেয়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন যাজক। কি হবে বুঝতে পারছিলনা জিয়ান। পরে কিন্তু লোকের মুখে বিয়ের কথা শুনে এবং যাজককে দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি সে-ই সে বিয়ের কনে?

জিয়ান দেখল লামেয়ার গম্ভীর মুখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সে নিজে এক অজানা অচেনা আবেগের মধুর আঘাতে ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে তার দেহটা। এ আঘাত এ অনুভব তার জীবনে এই প্রথম।

অবশেষে একসময় লামেয়ার ফিস ফিস করে জিয়ানকে বলল, এটা হচ্ছে আমাদের বাগদান প্রতিশ্রুতির পর্ব। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। সেই বিয়ের কথা পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করার জন্যই আজকের এই উৎসব।

বন্দর থেকে জিয়ানের সঙ্গে তাদের বাড়িতেই ফিরে এল লামেয়ার। শান্ত সন্ধ্যার এক নির্জন অবসরে বাগানের কোলে কিছুক্ষণ বসে রইল দুজনে। বিদায়ের একটু আগে জিয়ানকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করল লামেয়ার। লামেয়ার জানে একথা জিজ্ঞাসা করার কোন অর্থ হয় না। একথার উত্তর সে জানে। তবু সে কথার উত্তর জিয়ানের মুখ থেকে শুনতে চায় সে। নিঃশব্দ আচরণে ও শান্ত চোখের নিরুচ্চার দৃষ্টিতে প্রেমিক হৃদয়ের যে গভীর কথা ফুটে ওঠে সেকথায় তৃপ্ত হতে চায় না প্রেমাস্পদের মন। প্রেমিকের মুখ থেকে শুনতে চায় প্রেমের কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি।

তাই একসময় লামেয়ার বলল, আচ্ছা জিয়ান, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ ত? আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হবে ত?

জিয়ানের একটি হাত ধরে তার মুখপানে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লামেয়ার। জিয়ান কোন কথা বলল না। শুধু শান্ত উজ্জ্বল এক দৃষ্টি মেলে

তাকিয়ে রইল লামেয়ারের দিকে। যেন বলতে চাইল, এই দেখ, তোমার প্রশ্নের সব উত্তর লেখা আছে আমার চোখের তারার গভীরে।

৪

একদিন সকালবেলায় ব্যারণ জিয়ানের ঘরে এসে বললেন, ভিসকাউন্ট দ্য লামেয়ার তোমার পাণিগ্রহণ করতে চান। আমরা বলেছি, তাঁর প্রস্তাবটা ভেবে দেখে পরে উত্তর দেব।

আকস্মিক আবেগের এক অপ্রতিরোধ্য প্রবলতায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল জিয়ানের। কি বলবে কিছু খুঁজে পেল না।

হাসিমুখে ব্যারণ বললেন, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ না করে আমরা কিছুই ঠিক করতে পারি নি। অবশ্য তার থেকে তোমার বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল। কিন্তু যেখানে সারা জীবনের সুখের প্রশ্ন সেখানে অর্থটা বড় কথা নয়। তার পিতামাতা নেই। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হলে আমি তাকে ছেলের মত দেখব। ছেলেটিকে আমার ও তোমার মার খুবই পছন্দ। এ বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে দেখ, তোমার পছন্দ ত?

লজ্জায় মুখখানা রাঙা করে জিয়ান বলল, হ্যাঁ বাবা, পছন্দ।

ব্যারণ তেমনি হাসিমুখে বললেন, আমি তা জানতাম।

সকাল থেকে সারাটা দিন স্বপ্নের ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল জিয়ানের। কেমন যেন এক অজানা আবেগের ভারে দেহটা তার ক্লান্ত ও ভারী বোধ হচ্ছিল।

বিকালে ছটার সময় জিয়ান যখন তার মার কাছে বাগানে বসে ছিল তখন লামেয়ার এল। এসে মাদাম এ্যাদিলেদের হাতে একটা চুম্বন করে জিয়ানের একটা হাত টেনে নিয়ে তার উপর হালকাভাবে একটা চুম্বন করল।

বিয়ের দিন ঠিক হলো আগামী পয়লা আগস্ট। শুভ কাজে দেরী করে লাভ নেই। দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল প্রস্তুতি পর্ব। আরো ঠিক হলো নবদম্পতি মধুচন্দ্রিকা যাপনের জন্য কর্সিকা যাবে। কর্সিকা জায়গাটা নির্জনতার জন্যই বাছাই করেছে জিয়ান। আরো ঠিক হলো বিয়েতে আত্মীয় কুটুম্ব কাউকে বলা হবে না। একমাত্র জিয়ানের এক মাসি আসবে ভার্সাই থেকে।

মাদাম এ্যাদিলেদের লিজ নামে এক অবিবাহিত বোন ছিল। সে ভার্সাইএর কনভেন্টে বোর্ডিংএ থাকত। ছোট থেকেই সে এক অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। চেহারাটা তার খারাপ বলে তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাকে কেউ পছন্দ করবে না। সেই আশঙ্কার বশেই সে প্রতিজ্ঞা করে বসে জীবনে সে বিয়ে করবে না কখনো। মাদাম এ্যাদিলেদের বাবা মারা গেলে তিনি লিজকে তাদের বাড়িতে এসে থাকতে বলেন। কিন্তু লিজ

সাধারণ লোকসমাজে থাকতে চাইত না। তাছাড়া ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি লিজ'এর একটা বরাবরই আসক্তি ছিল। লিজ' একবার জলে ডুবে মরার চেষ্টা করে। কোন রকমে তাকে বাঁচানো হয়। সেই থেকে লিজ' যেন আরো বিষণ্ণ হয়ে যায়।

ছোট থেকে জিয়ান লিজ'কে বলত লিজ' মাসি। ব্যারণ এবং ব্যারণপত্নী দুজনেই লিজ'কে স্নেহ করতেন। আবার তার নিঃসঙ্গ বিষাদগ্রস্ত জীবনের জন্য স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে করুণাও করতেন।

তখন জুলাই মাসের শেষ। সারাদিন দারুণ গুমোট গরমের পর সন্ধ্যে-বেলায় চাঁদ উঠেছিল আকাশে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। ব্যারণপত্নী তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসে তাস খেলছিলেন। লিজ' তাদের পাশে বসে সেলাই করছিল। সে আজকাল ঘরে বসে সেলাইএর কাজ করে জীবিকা অর্জন করে। জিয়ান আর লামেয়ার জানালার ধারে বসেছিল বাইরে চাঁদের আলোয় দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে।

হঠাৎ জিয়ান একসময় ব্যারণকে বলল, বাবা, আমরা একবার বাগানে বেড়িয়ে আসি।

ব্যারণ খেলতে খেলতে মুখ তুলতেই বললেন, যাও।

বাড়ির বাইরে গেলেই সামনে পড়ে বিরাট লন। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ভরা প্রশস্ত লনটার দুদিকে প্রকাণ্ড গাছের ছায়া। তার ওপারে বন আর জলাশয়। ধবধবে সাদা চাঁদের আলোর পটভূমিকায় গাছপালার ঘন ছায়াগুলো বড় মায়াময় দেখাচ্ছিল। ওরা দুজনে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল সেই আলোছায়ার মাঝে।

তাস খেলা শেষ করে মাদাম এ্যাদিলেদ বললেন, ওদের ডাক। আমি শুতে যাচ্ছি।

ব্যারণ বললেন, থাক না। লিজ' থাকবে। ওদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমিও শুতে যাব।

ব্যারণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চলে গেল। লিজ' সেলাইএর কাজ ছেড়ে জানালা দিয়ে বাইরে চাঁদের আলোয়ভরা লনের দিকে তাকিয়ে রইল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকা দুটি মানুষের ছায়া একবার এগিয়ে যাচ্ছে আর একবার পিছিয়ে আসছে।

শিশির পড়ছিল বলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা অনুভব করছিল ওরা। জিয়ানরা ফিরে এলে লিজ' আবার সেলাইএর কাজ নিয়ে বসল। জিয়ান এসে লিজ'কে বলল, আর কাজ করো না মাসি। অনেক হয়েছে।

হঠাৎ জিয়ানের ভিজে চটিদুটো দেখে লামেয়ার বলে উঠল, হায় প্রিয়া, শিশিরে তোমাদের পা ভিজে গেছে?

এই প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লিজ'। ওরা দুজনে

অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় লিজ বলল, জীবনে আমাকে কেউ কথনো এই ধরনের কথা বলেনি। কেউ কোন স্নেহ মমতার কথা বলেনি।

জিয়ান হাসতে লাগল। লামেয়ার অবাক হয়ে গেল। সেলাই ছেড়ে তার ঘরে চলে গেল লিজ।

একপক্ষকালের মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় বেশী লোক ছিল না। যাজক আবেব পিকত, ইপোর্ডের স্থানীয় যাজক, মেয়র আর সাক্ষী হিসাবে ছিল জনকতক গ্রাম্য চাষী।

চার্চে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড সেরে বাড়ি ফিরে কাঁদতে লাগলেন ব্যারণ-পত্নী। তাঁর মেয়ে পরগোত্র হয়ে গেল এই ভেবে তিনি জুলিয়ানকে ধরে কাঁদতে লাগলেন। লামেয়ারের ডাক নাম জুলিয়ান। তার কান্না দেখে রোজালিও কাঁদতে লাগল।

জিয়ানের কিন্তু এসব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। বিয়ের পর যে নূতন জীবনে সে প্রবেশ করতে চলেছে সে জীবনের প্রতি একটা বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল আচ্ছন্ন করে ছিল তার মনকে।

রাত্রিতে শোবার ঘরে আগে শুতে গেল জিয়ান। সে গিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল এক পাশে। কিছু পরে জুলিয়ান এসে বিছানার ধারে নতজানু হয়ে বসে তাকে কিছুক্ষণ আদর করে তারপর পোশাক খুলে শুধু অন্তর্বাস পরে বিছানা থেকে জিয়ানকে দুহাত দিয়ে তুলে তাকে চুম্বন করতে লাগল পাগলের মত।

এই নগ্ননিবিড় দেহসংসর্গের জন্য প্রস্তুত ছিল না জিয়ান। তার এ সব ভাল লাগছিল না। তাই বারবার কাতরভাবে জুলিয়ানের কাছে আবেদন জানাল, এখন না। আলতোভাবে হাতে হাত দিয়ে নির্জন পথে বেড়ান, কিছু মিষ্টি কথা বলা, মাঝে মাঝে শান্ত দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরস্পরের আত্মার সুবাসকে আস্বাদন করা প্রভৃতি সুক্ষ্মশোভন সেই সব প্রণয়লীলার কথা যত ভাবতে লাগল জিয়ান ততই জুলিয়ানের এই উন্মত্ত আলিঙ্গনের ভয়ঙ্কর চাপে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

জিয়ানের ঘুম আসছিল না। অথচ কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল জুলিয়ান। আশ্চর্য হয়ে গেল জিয়ান। আজকের রাতে কেউ কথনো এমন করে ঘুমোয়?

পরদিন থেকে জুলিয়ান জিয়ানদের বাড়ির একজন লোকের মত থেকে গেল।

৫

মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য কর্সিকায় রওনা হলো চারদিন পর। প্রথম প্রথম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে জিয়ান জুলিয়ানের আদর ও চুম্বন আতিশয্যে।

গাড়ি এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। প্রথমে ওরা যাবে মার্সাই বন্দরে।

সেখান থেকে প্যাকেট বোটে করে কর্সিকা দ্বীপে। জিয়ানের সেই স্বপ্নের রাজ্যে।

বেরোবার সময় জিয়ানের মা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। জিয়ান গাড়িতে উঠে বসলে তার কোলে একটা টাকার থলে রেখে বললেন, এই রইল তোমার হাত-খরচ।

গাড়ি ছেড়ে দিল। সন্ধ্যার সময় জুলিয়ান জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা তোমার মা দিলেন?

জিয়ান তখনো গুণে দেখেনি। থলেটা সরিয়ে রেখেছিল কোল থেকে। সেকথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। এবার গুণে দেখল, সব স্বর্ণমুদ্রা, সবসুদ্ধ দু হাজার ফ্রাঁ। জিয়ান মনে মনে ভাবল, যাক, প্রাণ খুলে সাধ মিটিয়ে খরচ করা যাবে।

মার্সাই পৌঁছতে এক সপ্তাহ লেগে গেল। পথে গরমে কষ্ট পেল ওরা। তারপর মার্সাই থেকে প্যাকেট বোটে করে কর্সিকা।

কর্সিকা! ঝোপ জঙ্গল আর পাহাড়ঘেরা এক মনোরম দেশ, নেপোলিয়নের জন্মভূমি। জিয়ানের মনে হচ্ছিল সে যেন কঠিন বাস্তব জগৎ থেকে যাচ্ছে এক স্বপ্নের মায়াময় জগতে। এখানে সমুদ্রটা এত শান্ত যে মনে হচ্ছিল পটে আঁকা সমুদ্র। পাহাড়ঘেরা ধূসর দিগন্তের পটভূমিকায় এখানে আকাশটাকে অত্যন্ত নীল দেখায়। সূর্যের আলোটা যেমন উজ্জ্বল তেমনি জ্বলন্ত গরম।

দিন গিয়ে রাত এল। তারপর সকাল। অবশেষে স্টীমারের ক্যাপ্টেন এসে জিয়ানকে বলল, কিসের একটা গন্ধ পাচ্ছেন না?

জিয়ান সত্যিই এক অজানা জলজ আগাছার বুনো গন্ধ পাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন বলল, এ হচ্ছে কর্সিকার গন্ধ মাদাম। কর্সিকা যেন এক সুন্দরী নারী, এটা তার দেহের সুবাস। আমি যদি কুড়ি বছর বিদেশে থাকার পর এখানে ফিরি তাহলেও পাঁচ মাইল দূর থেকে এ গন্ধ পেয়ে আমি বুঝতে পারব কর্সিকায় এসেছি। আমাদের সম্রাট আছেন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়। তিনি যেন সব সময় এই দেশের সুনাম অর্থাৎ গুণের কথাই ঘোষণা করছেন বিশ্ববাসীর কাছে। সম্রাট নেপোলিয়ন ছিলেন আমাদেরই বংশের পূর্বপুরুষ।

পিরামিডের মত পাহাড়ের চূড়াগুলোর উপর পাতলা কুয়াশার একটা ওড়না ঢাকা ছিল যেন। মনে হচ্ছিল মায়াবিনী কর্সিকা দ্বীপ যেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে ছলনা করছে আগন্তুকদের সঙ্গে। পাহাড়গুলোর নিচের দিকটা শ্যাওলাধরা। ক্যাপ্টেন বলল, এই জন্যেই কর্সিকাকে বলে ঝোপ জঙ্গলের দেশ।

মালপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে জুলিয়ান বলল, স্টীমার থেকে যে নৌকো করে

কূলে যাওয়া হবে তার লোককে একটা ক্রাঁ দিলেই যথেষ্ট হবে।

জিয়ান বলল, মানুষকে খুব কম দেওয়ার থেকে কিছু বেশী দেওয়া ভাল।

কূলে নেমে নৌকোর মাঝির সঙ্গে পয়সা নিয়ে ঝগড়া বাধল জুলিয়ানের সঙ্গে।

একটা বড় অথচ বেশ নির্জন হোটেলে গিয়ে উঠল ওরা। কিন্তু খাবার পর হোটেলের পরিচারকরা যখন বিল নিয়ে এল তখন তাদের বখশিস্ দেওয়া নিয়ে আবার কথাকাটাকাটি হতে লাগল জুলিয়ানের সঙ্গে। ভয়ে ও লজ্জায় শিউরে উঠল জিয়ান। এই ধরনের উঞ্ছবৃত্তি ভাল লাগে না তার। সামান্য পয়সা নিয়ে দর-কষাকষির কোন অর্থ খুঁজে পায় না সে।

সেইদিনই জিয়ান বলল, চল শহরটা ঘুরে দেখে আসি। কিন্তু জুলিয়ান বলল, আজ থাক। চল বিশ্রাম করিগে।

তিন দিন তারা শহরেই রয়ে গেল। তারপর তারা দূর পার্বত্য অঞ্চলের পথে রওনা হলো। একজন গাইড আর দুটো ঘোড়া ভাড়া করল ওরা। প্রথম প্রথম রাস্তাটা উপকূলভাগের কাছাকাছি মসৃণভাবে চলছিল, কিন্তু ক্রমে পথটা হারিয়ে গেল অগভীর এক উপত্যকার মাঝে। ওরা দেখল এই উপত্যকাটাই ধীরে ধীরে উঠে গেছে পাহাড়গুলোর উপরে।

জুলিয়ান ভাল ঘোড়ায় চাপতে জানে না। জিয়ান অনেকটা এগিয়ে ছিল। পিছন ফিরে জুলিয়ানের অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল তার। ভয়ে ভয়ে জুলিয়ান তার ঘোড়ার কাঁধ আর কেশরগুলোকে ধরে ছিল। অথচ সে দেখতে ভাল এবং সে একজন ভাল অশ্বারোহীর ভাণ করছিল।

পথের দুপাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেই জঙ্গলের সবুজ আস্তরণে পাহাড়গুলোর পাথুরে গা ঢাকা আছে।

দিনের শেষে পথে যেতে যেতে পিয়ানা বলে যে একটা গাঁ পেল সেই গাঁয়েই একটি বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হলো তারা। রাতটা এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার রওনা হবে তারা। এ অঞ্চলে ভ্রমণের এই হলো রীতি।

জুলিয়ান প্রথমে যে বাড়িটা পেল তার দরজায় কড়া নাড়ল। সে বাড়িতে বাস করত তাদের মতই এক নবদম্পতি। তারা প্রচুর আদর যত্ন করল তাদের। সে বাড়িতে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোন উপকরণ না থাকলেও বড় ভাল লাগছিল জিয়ানের। তার মতে পরিচিত জগৎ থেকে এমনি করে বহু দূরে না গেলে ভ্রমণের আসল আনন্দ পাওয়া যায় না। ভ্রমণ মানেই নূতন পথ নূতন পরিবেশ আর সেই পথ ও পরিবেশের সঙ্গে যে স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা ও অস্বাচ্ছন্দ জড়িয়ে আছে তারই মধ্যে আছে ভ্রমণের প্রকৃত আনন্দ।

পরদিন সকাল হতেই আবার শুরু করল যাত্রা। চারদিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। ঘন বনের ভেতর দিয়ে নীলচে গ্রানাইট পাথরে ভরা উঁচু

একটা পাহাড়ে উঠতে লাগল ওরা। গাইড যাচ্ছিল আগে আগে। যে দিকেই তাকাচ্ছিল নির্জন বনপ্রকৃতির দৃশ্যসৌন্দর্যে মুগ্ধ বিষয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল জিয়ান। একসময় আবেগের সঙ্গে ডাক দিল জুলিয়ান।

জুলিয়ান পিছন ফিরে বলল, কি ব্যাপার?

না এমনি। হাসিমুখে উত্তর করল জিয়ান। জিয়ান বলল, আমি এত আনন্দিত যে যা কিছু দেখছি তাতেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার খুব ভাল লাগছে।

জুলিয়ান জানে এসব হচ্ছে নারীসুলভ উচ্ছ্বাস। দেখল আনন্দে চোখে জল এসেছে জিয়ানের। এই সব আবেগ বা উচ্ছ্বাসের কোন অর্থ বুঝতে পারে না জুলিয়ান। সে বরাবরই বাস্তববাদী। তার প্রেমাস্পদকে ভালবাসে, সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু আবেগের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে না কখনো। জিয়ানের একটা বড় দোষ, আনন্দ বা বেদনা, আশা বা হতাশা যে-কোন আবেগে সমানভাবে সমপরিমাণ নিবিড়তার সঙ্গে বিচলিত হয়ে পড়ে সে।

জুলিয়ান বলল, এবার পথ বড় খারাপ, বড় উঁচুনিচু। এখন ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

ওরা দুজনে পিছনে খাড়াই পথে সাবধানে উঠতে লাগল। ওদের গাইড ঘোড়া দুটো আর তার খচ্চরে মালপত্র চাপিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। পথটা দারুণ খাড়াই। জিয়ান বেশ তাড়াতাড়ি উঠছিল। তার উৎসাহ বেশী। জুলিয়ান তার পিছনে ছিল। সে হাঁপিয়ে উঠছিল।

কিছুটা খাড়াই পথ বেয়ে আবার একটা উপত্যকা পেল। মনে হলো ওরা উঠে এসেছে নরক থেকে অনেক উপরে। ওদের পিপাসা পেয়েছিল। একটা ছোট্ট ঝর্ণার জল খেল ওরা।

এখানে জায়গাটা বেশ ফাঁকা। পর্যাপ্ত সূর্যালোকে স্নান করতে লাগল যেন ওরা। অবিচ্ছিন্ন পার্বত্য অরণ্যের ব্যাপক ছায়া ছায়া অন্ধকারের পর এত অবাধ সূর্যালোকের স্পর্শ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জিয়ান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই নিবিড়তর অনুভূতি তার অন্তর্নিহিত প্রেমের আবেগকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল যেন নতুন করে।

সহসা জুলিয়ানকে জড়িয়ে ধরে জিয়ান বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি জুলিয়ান।

একটা গাছের ছায়ায় পাথরের উপর শুয়ে পড়ল জিয়ান। তাকে দুহাতে ধরে কোলে তুলে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরল জুলিয়ান।

অনেকক্ষণ পর আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু করল ওরা। সন্ধ্যার একটু আগে ওরা পৌঁছল এভিসা নামে একটা পাহাড়ী গাঁয়ে। সেখানে ওদের গাইডের এক আত্মীয় ছিল। নাম পাওলি। তার বাড়িতেই রাতটা কাটাবে

ওরা।

লোকটা লম্বা। ইতালি ও ফরাসীতে মেশা তার ভাষা। তার স্ত্রীর রংটা রোদে পোড়া তামাটে। চোখগুলো বেশ কালো। ওরা দুজনেই খুব ভাল লোক, বড় অতিথিবৎসল। পাওলিকে দেখে খুব রোগা ক্ষয়রোগের রোগী বলে মনে হচ্ছিল।

রাত্রিতে খাবার আগে গোটা গাঁটা ঘুরে দেখিয়ে দিল পাওলি। জিয়ান আর জুলিয়ানের মাঝখানে যেতে যেতে কাশছিল প্রায়ই পাওলি। বলছিল, এখানকার আবহাওয়াটা বড় ঠাণ্ডা আর তার জন্যেই আমার এই রোগ।

সহসা বাদাম গাছের ছায়াঘেরা পথের ধারে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পাওলি। বলল, ঠিক এই জায়গাটায় আমার এক খুড়তুতো ভাই ম্যাথু লোরি নামে একটা লোকের দ্বারা নিহত হয়েছিল। আমার ভাই-এর নাম ছিল জিয়ান বিলালদি। আমি তখন আমার ভাই-এর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ম্যাথু আর আমার ভাই জিয়ান দুজনেই একটা মেয়েকে ভালবাসত। মেয়েটার নাম ছিল পলিনা। সহসা ম্যাথু চীৎকার করে বলে উঠল, আচ্ছা জিয়ান, তুমি কি পলিনার কাছে এখনো যাও? তাহলে আমি তোমাকে খুন করব। তার হাতে তখন সত্যিই একটা বন্দুক ছিল। এদিকে আমার ভাই জিয়ান জোর গলায় বলল, হ্যাঁ, যাই আর তোমার ভয়ে তার কাছ থেকে কখনই দূরে সরে যাব না। তার কথাটা শেষ হতেই তার বন্দুকটা হতে গুলি করল ম্যাথু আর তার আঘাতে একটা লাফ দিয়ে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জিয়ান। আর সে কোন কথা বলতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গেই ওর জীবনটা বেরিয়ে গেল।

জিয়ান ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু খুনীটা? সে কি পালিয়ে গেল?

অনেকক্ষণ ধরে কাশতে লাগল পাওলি। তারপর উত্তর করল, খুনীটা তখন পাহাড়ের উপর দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বছরখানেক পরে আমার ভাই নামকরা দস্যু ফিলিপ্পি তাকে খুন করে সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

জিয়ান আবার ভয় পেল, তোমার ভাই ডাকাত?

সফল দস্যুবৃত্তির গর্বে গর্ববোধ করে কর্সিকার অধিবাসীরা। গর্বের সঙ্গে পাওলি বলল, হ্যাঁ মাদাম। সে একা দুটো পুলিশের সমান। একবার সে আর নিকোলাস মোরালিকে পুলিশে ঘেরাও করে। দুদিন ধরে যুদ্ধ চলে দুই পক্ষে। তারপর তাদের খাবার ফুরিয়ে গেলে ধরা পড়ে। আমাদের এ দেশের এই হচ্ছে রীতি মাদাম।

জিয়ান বুঝতে পারল জলহাওয়ার মতই দস্যুবৃত্তির কথাটা সহজ এখানে।

রাত্রিতে পাওলিদেরই একটা কুঁড়ে ঘরে শুতে দেওয়া হলো জিয়ানদের। দিনের বেলায় সেই একটা গাছের তলায় ছায়াশীতল উপত্যকার সেই পাথরের

উপর শুয়ে জুলিয়ানের দ্বারা আলিঙ্গিত ও পরিচুম্বিত হয়ে যে আনন্দ পেয়েছিল জিয়ান এই গ্রাম্য কুঁড়ের মধ্যেও সেই একই আনন্দ পেল সে।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় ঘরটাকে ছেড়ে যেতে মন উঠছিল না।

যাবার সময় পাওলির স্ত্রীকে কোন উপহার দিল না জিয়ান। সে বলল, আমি বাড়ি ফিরে তোমাকে একটা কিছু উপহার পাঠিয়ে দেব।

প্রথমে কিছু নিতে স্বীকার হচ্ছিল না। অনেক করে ধরাতে পরে বলল, দাও ত আমাকে একটা ছোট্ট পিস্তল পাঠিয়ে দিও।

বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জিয়ান। পাওলির স্ত্রী তখন বলল, সেই পিস্তল দিয়ে আমি আমার স্বামীর ভাই আমার দেওরকে খুন করব। লোকটা আমাকে চায়। দেখতে পাচ্ছ আমার স্বামী অসুস্থ, ওর মনে কোন ঈর্ষা নেই, কারণ ও আমাকে জানে, জানে আমি খুব খাঁটি। কিন্তু ওর ভাই ওর উপর ঈর্ষা করে। এই জন্যেই আমি তাকে খুন করতে চাই।

জিয়ান বেরোবার সময় প্রতিশ্রুতি দিল একটা পিস্তল কিনে ঠিক সে পাঠিয়ে দেবে।

বাস্তিয়া নামে এক জায়গায় এসে গাইডকে টাকা মেটাতে গেল জুলিয়ান। এইখানেই তাদের ভ্রমণের শেষ। এরপর ফেরার পালা। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা খুঁজে পেল না জুলিয়ান। অবশেষে জিয়ানকে বলল, তুমি ত এখন তোমার মার দেওয়া টাকাটা খরচ করছ না। ওটা আমাকে রাখতে দাও। সব সময় ভাঙানি পাওয়া যায় না। খুচরো টাকার দারুণ দরকার।

জিয়ান থলেটা দিয়ে দিল জুলিয়ানের হাতে।

এরপর লেগহর্ণ, ফ্লোরেন্স, জানোয়া হয়ে পরিশেষে তারা এসে পৌঁছল মার্সাই বন্দরে। সেখান থেকে তারা যাবে প্যারিসে। সেখান থেকে কিছু সংসারের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে লে পোপ্লেতে গিয়ে সংসার পাতবে সারা জীবনের মত।

লে পোপ্লে থেকে তারা এসেছে আজ দুমাস হলো। পার্বত্য অঞ্চলের ঠাণ্ডা জলহাওয়ায় জিয়ানের সর্দি হয়, তাতে শরীরটা খারাপ হয়। জুলিয়ানকেও বেশ কিছুটা ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখায়। তবু আরো কয়দিন বেশী থেকে যেতে বলল জিয়ান।

প্যারিসে এসে জিয়ান দেখল, তাদের অনেক কিছু কেনার আছে। সে ভেবেছিল তার মার দেওয়া টাকায় অনেক কিছু কিনবে সাধ মিটিয়ে। বাড়িতে অনেক কিছু কিনে নিয়ে যাবে। বিশেষ করে সবচেয়ে আগে এভিসা গাঁয়ে পাওলির স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিস্তলটা কিনে পাঠিয়ে দিতে হবে।

প্যারিসে আসার পরের দিন জিয়ান বলল, মার টাকাটা দাও ত।

জুলিয়ান ভ্রূকুটি করে বলল, কত টাকা চাও ?

জিয়ান আশ্চর্য হয়ে গেল এ কথায়। আমতা আমতা করে বলল, কত আর, তুমি যা দিতে চাও।

জুলিয়ান উত্তর করল, আমি তোমাকে দেব একশো ফ্রাঁ। তবে দেখো, যেন বাজে খরচ কিছু করো না।

জিয়ান হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কি বলবে তা খুঁজে পেল না। পরে ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কিন্তু তোমাকে টাকাটা…

জিয়ানকে মাঝপথে থামিয়ে দিল জুলিয়ান, হ্যাঁ, সত্যিই তুমি আমাকে টাকাটা রাখতে দিয়েছিলে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমাদের সব খরচ যখন যৌথ, তখন টাকাটা তোমার না আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আর তাছাড়া আমি ত আর অস্বীকার করছি না। আমি ত তোমাকে একশো ফ্রাঁ দিচ্ছি।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে থলেটা থেকে পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিল জিয়ান। এর বেশী টাকা চাইতে সাহস হলো না তার। সে টাকায় শুধু একটা পিস্তল কিনল জিয়ান।

এক সপ্তাহ পরে লে পোপ্লে গাঁয়ের পথে রওনা হলো তারা।

৬

গোটা বাড়িটা ফেটে পড়ল আনন্দে আর উত্তেজনায়। জিয়ানদের গাড়িটা বাড়ির রাস্তার সামনে গিয়ে হাজির হতেই আনন্দে কাঁদতে লাগলেন ব্যারণপত্নী। ব্যারণও বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। রোজালি নীরবে মালপত্র নামিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

শুধুমাত্র ওদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যাই হোক, রোজালি সব গুছিয়ে রাখল। তখন নিজের ঘরের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল জিয়ান। সেই পুরনো পরিচিত দৃশ্য। দেখতে ভাল লাগছিল না জিয়ানের।

ভাবতে লাগল জিয়ান। যখন কনভেন্টে থাকত তখন ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখত। স্বপ্ন দেখত তার মনের মানুষের যাকে সে কোনদিন দেখেনি বা যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার। কনভেন্ট থেকে বাড়ি ফেরার পর মাত্র কয়েক সপ্তার মধ্যেই তার সেই স্বপ্নের ফুল সার্থক হয়ে ফুটে ওঠে। সে তার স্বপ্নে দেখা মনের মানুষকে বাস্তবে খুঁজে পায়। তাকে ভালবাসে। ভালবেসে বিয়ে করে। কিন্তু তখন কোন কিছু ভেবে দেখেনি। ভেবে দেখার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না তার।

মধুচন্দ্রিমার সেই কাব্যিক মায়াময় জগৎ হতে সে নেমে এসেছে গদ্যময় কঠোর বাস্তব জগতে। এখন জিয়ানের হাতে কোন কাজ নেই। দেখার কিছু নেই। কিছু করার বা ভাববার নেই। কেমন যেন মোহমুক্তির এক

গভীর বিষাদে ভারী হয়ে উঠল ওর মন।

জুলিয়ান বাড়িতে ছিল না। একা একাই বাড়ির বাগান দিয়ে বেড়িয়ে এল জিয়ান। বেশ শীত পড়েছে। শিরশিরে বাতাসে শুকনো হলুদ পাতা ঝরছিল গাছ থেকে। দেখে জিয়ানের মনে হচ্ছিল যেন একটার পর একটা করে স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়ছে।

সে রাত্রিতে একা শুল জিয়ান। পাশাপাশি দুখানা শোবার ঘর ছিল। পাশের ঘরটাতে জুলিয়ান রইল। খাওয়ার পর বসার ঘরে আগুনের ধারে বসে সকলে মিলে গল্প করার সময় লক্ষ্য করছিল জিয়ান জুলিয়ান যেন তার স্ত্রীর অস্তিত্বের কথা ভুলেই গেছে। এর মধ্যেই তার স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ আগের থেকে অনেকখানি কমে গেছে ওর।

বিয়ের পর এই প্রথম একা শুল জুলিয়ান। ঘুম আসতে অনেক দেরী হলো। সূর্যের আলো এসে পড়েছে, পরদিন বেশ কিছুটা বেলায় ঘুম ভাঙল তার। বিছানায় উঠে বসে জিয়ান দেখল, বরফে ঢাকা জানালার কাঁচের সার্সিগুলো সকালের লাল আলোয় চক চক করছে।

আগের দিনের মত সে দিনটাও বৈচিত্র্যহীনভাবেই কেটে গেল। সেই একই চেনা জানা পথে এগিয়ে যেতে লাগল তার জীবনের রথ। দিনে দিনে লক্ষ্য করতে লাগল জিয়ান, আগের থেকে একেবারে বদলে গেছে জুলিয়ান, তার দেহ আর মন দুটোই গেছে আশ্চর্যভাবে বদলে।

এখন শুধু খামারবাড়ি আর চাষবাসের কাজ দেখাশোনা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে জুলিয়ান। চাষীদের পীড়ন করে খরচ কমিয়ে সে শুধু টাকা জমানোর কথা ভাবে। জিয়ানের ঘর দিয়ে আসা বা তার সঙ্গে দুটো কথা বলারও কোন প্রয়োজন মনে করে না সে। আজকাল তার চেহারা হয়েছে কোন এক গ্রাম্য ভদ্র চাষীর মত। বিয়ের আগে তার চেহারার মধ্যে যে এক মার্জিত জোলুস দেখেছিল তা এখন আর নেই। তার জায়গায় তার সে চেহারায় এসেছে একটা রূঢ় কর্কশ ভাব। যা দেখতে খুবই খারাপ লাগে। সে আজকাল দাড়ি কামায় না। একটা পুরনো গলাবন্ধ কোট পরে। জিয়ান তার পোশাক সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিতে গেলে সে বিরক্ত হয়ে বলে, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে?

জুলিয়ান কিসে শান্তি পায় আজকাল তা মোটেই বুঝে উঠতে পারে না জিয়ান। যাই হোক, জুলিয়ানের আকস্মিক আশ্চর্য পরিবর্তনের সঙ্গে দিনে দিনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল জিয়ান। জুলিয়ানকে স্বামীর পরিবর্তে কোন বিদেশী অতিথির মত দেখতে লাগল সে। তার দেহমনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই জিয়ানের। কোনদিন কোন সম্পর্ক যেন ছিলও না। তার প্রতি জুলিয়ানের এই ঔদাসীন্য ও অবহেলাটাকে সহজভাবে দেখার চেষ্টা করে যেতে লাগল জিয়ান।

তবু মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে, সারা জীবনই কি এইভাবে কষ্ট করে যেতে হবে তাকে? জুলিয়ানের মনের পরিবর্তন কি আর হবে না? সে কি তবে ভুল করেছে? জুলিয়ানের এই পরিবর্তন দেখে জিয়ানের আজকাল মনে হয় যেন কোন কুশলী অভিনেতা মঞ্চে কোন ভূমিকা অভিনয়ের পর ফিরে এসেছে তার বাস্তব জীবনে। তার মনে হলো এইটাই আসল রূপ, বাস্তব রূপ জুলিয়ানের। আগে যে রূপ দেখে সে ভুলেছিল, যে রূপ দেখে তাকে ভালবেসেছিল তা হচ্ছে ভ্রান্ত, তা হচ্ছে অস্বাভাবিক।

ঠিক হলো জানুয়ারির প্রথমে নববর্ষের পর ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী তাঁদের রুয়েনের বাড়িতে চলে যাবেন। লে পোপ্লের বাড়িতে শুধু ওরা দুজন থাকবে। সারা জীবন ওদের এই বাড়িতেই থাকতে হবে। সুতরাং ওরা এখন থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠুক সংসার চালনার কাজে।

ব্যারণের ঘোড়ার গাড়িটা এবার জুলিয়ানই ব্যবহার করবে। সে গাড়ির দরজায় নূতন নাম লিখতে বাতেইন নামে একজন চিত্রকরকে নিয়ে আসা হলো।

মিতব্যয়িতার নামে জুলিয়ান কিছু সংস্কার করল সংসারে। ঘোড়ার গাড়ি ছিল। কিন্তু ঘোড়াগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল। বাগানের মালীকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় গাড়ির গাড়োয়ানকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গাড়ির দরজার উপর নাম লেখার কাজ হয়ে গেলে চাষীদের কাছ থেকে মাসে একটি করে ঘোড়া নেবার ব্যবস্থা করে জুলিয়ান। ব্যবস্থা করে দেয় চাষীরা মুরগীর পরিবর্তে জমির মালিককে মাসে একটা করে ঘোড়া ব্যবহারের জন্য দেবে। মেরিয়াস নামে একটা ছোট ছেলেকে গাড়ির ফুটম্যান হিসাবে রাখা হলো।

একদিন ঘোড়ার গাড়িটাতে করে সকলে মিলে বেড়াতে যাবার ঠিক হলো। বাড়ির সামনে গাড়িটা আসতে ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী তাতে উঠলেন। কিন্তু জিয়ান তাতে উঠতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ঘোড়া দুটো জোড়া হিসাবে কেনা হয় নি। দু জায়গা হতে নেওয়া; তাই অনেক ছোট বড় হয়েছে। জিয়ান হেসে বলল, বড় ঘোড়াটা ছোটটার ঠাকুরদাদা।

ছোট ছেলে মেরিয়াসকে পরানো হয়েছে বড় মানুষের টুপী আর পোশাক। তাকে দেখেও খুব হাসতে লাগল জিয়ান। তার হাসি দেখে ক্রমে ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী দুজনেই খুব হাসতে লাগলেন।

অথচ জুলিয়ানের মুখটা ম্লান হয়ে গেল তাদের এই হাসি দেখে। সে বলল, আপনারা হাসছেন কেন? আপনারা কি পাগল হয়ে গেলেন সকলে?

তাদের হাসি দেখে গাড়ির পিছনে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মেরিয়াসও খুব হাসছিল। সহসা রাগে আগুন হয়ে উঠল জুলিয়ান। হাত বাড়িয়ে মেরিয়াসের কানটা জোরে মলে দিল। তার টুপীটা পড়ে গেল উঠোনের

মাটিতে। তারপর ব্যারণের মুখপানে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, এভাবে আপনাদের হাসা কখনই উচিত নয়। আপনারা কি চান আপনাদের সব সম্পত্তি টাকাকড়ি সব উড়িয়ে দিই ?

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। জিয়ানের চোখে জল এল। সবাই চুপ করে বসে রইল। জুলিয়ান উপরে গাড়োয়ানের সামনে গিয়ে বসল।

সারা রাস্তা গাড়ির ভিতরে কেউ একটা কথাও বলল না। সকলেই কি যেন ভাবতে লাগল। অবশেষে একটা বিরাট সাদা বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতে মেরিয়াস এসে দরজা খুলে দিল। অভিজাত সমাজের তিনটি বাড়ি আছে এ অঞ্চলে। এ বাড়ি হলো ব্রিসেভিলদের।

খবর পেয়ে ভিসকাউণ্ট ব্রিসেভিল ও তাঁর স্ত্রী ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। দুজনেই বেঁটে এবং রোগা। ছেলে পুলে নেই। জিয়ান জানতে চাইল, এত বড় বাড়িটায় আপনারা দুজন কিভাবে সময় কাটান ? মাদাম ব্রিসেভিল বললেন, সারা ফ্রান্সে আমাদের অনেক আত্মীয় ও আমাদের সমাজের বহু পরিচিত বন্ধুবান্ধব আছে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই আমার সব সময় চলে যায়। এসব কাজ আমাকেই প্রায় একা করতে হয়।

ব্রিসেভিল ওদের থেকে যেতে বললেন। কিন্তু ব্যারণপত্নী ঠাণ্ডায় কাশছিলেন। জিয়ানও অস্বস্তি অনুভব করছিল। জুলিয়ানের থাকার মন ছিল। তবু ব্যারণ আর থাকতে চাইলেন না।

গাড়ি প্রস্তুত হতে দেখা গেল মেরিয়াস কোথায় বেড়াতে গেছে। সে ভেবেছিল এত তাড়াতাড়ি ওরা যাবে না। জুলিয়ান মেরিয়াসের উপর রেগে গাড়ি ছেড়ে দিল, বলল, ওকে এই রাত্রিতে পায়ে হেঁটে বাড়ি যাওয়া করাব।

গাড়িটা কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা শুনতে পেল মেরিয়াস ছুটতে ছুটতে গাড়ির পেছনে পেছনে আসছে আর ওদের ডাকছে। ওর পরনে লম্বা বড় কোটটা থাকার জন্য ও ভাল করে ছুটতে পারছিল না। বারবার পড়ে যাচ্ছিল।

মেরিয়াস যখন অতিকষ্টে গাড়িটাকে ধরল তখন ওর পোশাকটা কাদায় ভরে গেছে। জুলিয়ান তার হাতের ছড়িটা দিয়ে নির্মমভাবে মারতে লাগল মেরিয়াসকে।

জিয়ানের মনটা নরম। তার বাবাকে কাতরভাবে অনুরোধ করল, বাপি ওকে থামাও।

মাদাম এ্যাদিলেদও স্বামীকে বললেন, ওকে থামতে বল।

ব্যারণ তখন হাত বাড়িয়ে জুলিয়ানের জামার আস্তিনটা ধরে রাগের সঙ্গে বললেন, এবার হয়েছে ?

জুলিয়ান বলল, দেখছেন না, সমস্ত পোশাকটা কেমন কাদায় ভরিয়ে তুলেছে ?

ব্যারণ বললেন, তাতে কি হয়েছে? তোমার এতখানি বর্বর না হলেও চলবে।

জুলিয়ান তবুও বলল, আমার কাজ আমাকে করতে দিন। এই বলে আবার মারার জন্য হাতটা তুলতেই ব্যারণ তার হাতটা ধরে জোরে সরিয়ে দিলেন। তারপর গর্জন করে বললেন, যদি তুমি এর পরেও না থাম তাহলে আমি গিয়ে তোমায় থামিয়ে দেব।

এ কথায় একেবারে শান্ত হলো জুলিয়ান। আবার গাড়ি চালাতে লাগল শান্তভাবে।

বাড়ি ফিরে নৈশভোজনের সময় হঠাৎ বেশ সহজ হয়ে উঠল জুলিয়ান। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যা যা ঘটেছে সে সব ভুলে গেছে। এমন কি জিয়ান যখন ব্রিসেভিলদের ঠাট্টা করছিল তখন দু-একটা কথা বলল হাসিমুখে। ব্যারণ ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই ক্ষমা করলেন জুলিয়ানকে। ভাবলেন রাগের মাথায় যা করেছে তা নিয়ে কিছু মনে করা ঠিক নয়।

বড়দিনে যাজক, এ অঞ্চলের মেয়র, তাঁর স্ত্রী এই তিনজন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। নববর্ষের দিন আবার এঁদের নিমন্ত্রণ করা হলো। ব্যারণদের যাবার দিন ঠিক হলো ৯ই জানুয়ারী। ঐদিন ওঁরা রুয়েন চলে যাবেন। জিয়ান বলল, আর দুদিন পরে যাবে। কিন্তু জুলিয়ান নিজে ওঁদের কোন অনুরোধ না করায় আর থাকতে চাইলেন না ব্যারণ।

ব্যারণদের যাবার আগের দিন বিকালে বন্দর দিয়ে বাবার সঙ্গে একবার বেড়িয়ে এল জিয়ান। বন্দরে যাবার আগে বনপথে যেতে যেতে হঠাৎ মনে পড়ল জিয়ানের এইখানে বিয়ের আগে মিলনের এক প্রথম উত্তেজনা অনুভব করে।

ধীরে ধীরে আকাশ থেকে অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রে। ফেরার সময় জিয়ানের হঠাৎ মনে হলো, সমস্ত মানব জীবনের নিভৃতে একটা নিগূঢ় একাকীত্ব রয়ে গেছে। সব মিলন হচ্ছে ক্ষণিকের। আসলে সব মানুষই একা।

বাড়িতে ঢোকার আগে ব্যারণকে বলল জিয়ান, জীবন যে সব সময় আনন্দের হয়েই এমন কোন কথা নেই।

৭

ব্যারণরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল জুলিয়ানের মিতব্যয়িতার বাতিক। দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল তার সঞ্চয়ের পরিমাণ।

রোজ সকালে টোস্টের সঙ্গে একটা করে নরম্যান কেক খেত জিয়ান। কিন্তু জুলিয়ান তা বন্ধ করে দিল। সংসার পরিচালনার সব ভার নিজের উপর চাপিয়ে নিয়ে যথাসম্ভব খরচ কমাতে লাগল জুলিয়ান।

জিয়ান লক্ষ্য করতে লাগল, রোজালি দিনে দিনে আগের থেকে অনেক বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। আগে আগে গুন গুন করে আপন মনে গান করত অনেক সময়। হাসত। কিন্তু এখন তাকে সব সময়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখায়।

গোটা বাড়িটা কেমন শূন্য আর নিরানন্দ। একমাত্র জুলিয়ানই নির্বিকার। সে আপন মনে নিজের কাজ করে যায় আর জলের ধারে ঝোপের আড়ালে বন্দুক নিয়ে বসে থেকে পাখি শিকার করে।

সেদিন সকালবেলায় তার ঘরের ভিতর আগুনের পাশে বসে পা দুটো গরম করছিল জিয়ান। রোজালি বিছানা ঝাড়ছিল। সহসা একটা গভীর ও সোচ্চার দীর্ঘশ্বাস শুনে চমকে উঠল জিয়ান। ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে রোজালি?

কিছু হয়নি দিদিমণি। কিন্তু জিয়ান বেশ বুঝতে পারল তার গলাটা কাঁপছে। জিয়ান আগে হতেই সন্দেহ করেছিল, নিশ্চয় রোজালি একটা গোপন অথচ কঠিন অসুখে ভুগছে। তাই ভয়ে ভয়ে ডাক দিল জিয়ান, রোজালি, কি হয়েছে রোজালি? আমাকে বল।

সহসা ঘরের মেঝের উপর পা দুটো ছড়িয়ে বসে পড়ল। জিয়ান দেখল তার তলপেটটা অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত। রোজালি জিয়ানের দিকে চোখ-দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল জিয়ান। সে তখন ছুটে গিয়ে জুলিয়ানকে ডেকে আনল। জুলিয়ান এসে রোজালির অবস্থা দেখে লভিভির্ন ও বৃদ্ধ সাইমনকে ডাকতে বলল। পরে ধাত্রীকে ডেকে আনা হলো।

জিয়ান আবার রোজালিকে দেখতে যাচ্ছিল। কিন্তু জুলিয়ান তাকে বলল, তোমাকে আর ওখানে যেতে হবে না। তুমি নিজের ঘরে যাও।

জিয়ান তার নিজের ঘরে গেলে জুলিয়ান তার কাছে গিয়ে বলল, এবার মেয়েটাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

জিয়ান বলল, তুমি কি রোজালির কথা বলছ?

জুলিয়ান বলল, আমরা একটা অবৈধ সন্তানসহ ঐ কুলটা মেয়েটাকে আর ঘরে স্থান দিতে পারি না।

জিয়ান বলল, ছেলেটাকে কোন ধাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

জুলিয়ান বলল, টাকাটা কে দেবে? তুমি নিশ্চয়।

জিয়ান বলল, দরকার হলে আমি মানুষ করব ছেলেটাকে।

জুলিয়ান বলল, আমাদের একটা সুনাম আছে, সমাজে সম্মানজনক স্থান আছে। কিন্তু তুমি একাজ করলে তোমাদের সমাজের কোন লোকই এ বাড়িতে পদার্পণ করবে না।

জিয়ান অধৈর্য হয়ে বলল, তাহলে কি করতে চাও বল।

জুলিয়ান সহজভাবে উত্তর করল, কেন, কিছু টাকা দিয়ে ওকে বিদেয় করে দাও। ও জাহান্নামে চলে যাক।

জিয়ান বলল, না, তা হবে না। ও আমার সৎ বোন। ছোট থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। ওকে বাড়ি থেকে কখনই তাড়ানো চলবে না। তবে তোমার আপত্তি থাকলে ও এখানে থাকবে না। আমার মার কাছে চলে যাবে।

জুলিয়ান রেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিকালে রোজালির ঘরে তাকে একবার দেখতে গেল জিয়ান। তাকে দেখে আকুলভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রোজালি। জিয়ান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার ছেলেকে আমরা মানুষ করব।

রোজালির একটা হাত ধরে তাকে চুম্বন করল জিয়ান।

দিনকতকের মধ্যেই পাড়ার এক ধাত্রীর কাছে রোজালির সন্তান রাখার ব্যবস্থা করল জিয়ান।

দিন পনের পরে আবার সুস্থ হয়ে উঠল রোজালি। ঘরসংসারের কাজে মন দিল।

একদিন রোজালির কথাটা আবার তুলল জুলিয়ান। জিয়ান সঙ্গে সঙ্গে তার কোটের পকেট থেকে মার একটা চিঠি বার করে দেখিয়ে বলল, ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। মা ওকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন তাঁর কাছে।

সেদিন বিকালে রোজালিকে কাছে ডেকে বসিয়ে তার ছেলের পিতার নামটা জানার অনেক চেষ্টা করল জিয়ান। বলল, তুই হয়ত লজ্জা পাচ্ছিস, কিন্তু আমি তো মোটেই রাগিনি তোর উপর। তুই নামটা বলে দিলে আমরা তাকে বাধ্য করব তোকে বিয়ে করতে।

জিয়ান ততক্ষণ রোজালির একটা হাত ধরে কথা বলছিল। সহসা তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল রোজালি। কথাটা জুলিয়ানকে গিয়ে বলল জিয়ান। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়ে জুলিয়ান বলল, মেয়েটাকে তোমরা রাখতে চাও রাখবে। কিন্তু আমাকে এ ব্যাপারে আর মোটেই বিরক্ত করো না।

জিয়ান বলল, আমার মনে হয় তুমি চেষ্টা করলে ও লোকটার নাম বলত।

আজকাল জিয়ানের যে কোন কথাতেই রেগে যায় জুলিয়ান। তবু আজকাল আগের থেকে জুলিয়ান মাঝে মাঝে তাকে দু-একটা ভালবাসার কথা বলে।

রোজালি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে তার আগেকার উদ্যম ফিরে পেয়েছে। কিন্তু জিয়ান সেই লোকটার নাম জানতে চাইলেই ছুটে পালায়।

সেদিন সন্ধ্যায় দারুণ শীত পড়ল। জুলিয়ানের ঘরে আগুনের জোর

ছিল না। তার কৃপণতার জন্য কাঠ কম ছিল। জুলিয়ান তাই জিয়ানের ঘরে গিয়ে বলল, আজ আমরা এক জায়গায় দুজনে শোব।

জিয়ানের শরীরটা ভাল ছিল না। আজকাল তার কি হয়েছে ভাল খিদে থাকে না। খাবার ইচ্ছে করে না। রাত্রিতে বিছানায় শুলেই কান্না পায়। শরীরটাও আগের থেকে খারাপ হয়ে গেছে। জুলিয়ানের কথা শুনে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার মুখে মুখ রেখে চুম্বন করল জিয়ান। কিন্তু বলল, আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ। আজ থাক, আমাকে একা থাকতে দাও। আশা করি আগামীকাল ঠিক হয়ে যাবে।

জুলিয়ান বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

জিয়ান তার ঘরে একা শুল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। কিছুতেই শীত ভাঙছিল না। বারবার আগুনে গিয়ে পা হাত গরম করল। কিন্তু বিছানায় যেতে না যেতে আবার সেই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। জিয়ানের মনে হলো দেয়াল ভেদ করে বরফ পড়ছে ঘরে। ঠাণ্ডায় তার গায়ের সব রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। একটু পরেই তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে চিরতরে।

দরজা খুলে রোজালিকে চীৎকার করে ডাকল জিয়ান। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। অতি কষ্টে রোজালির ঘরের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু দেখল ঘর ফাঁকা। সে ঘরে রোজালির কোন বিছানাই পাতা নেই। তখন জিয়ান জুলিয়ানকে উঠোবার জন্য তার ঘরের দিকে গেল। ভাবল মৃত্যুর আগে জুলিয়ানকে একবার অন্ততঃ চোখে দেখবে।

কিন্তু জুলিয়ানের ঘরের সামনে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হলেও ভিতরে দেওয়ালের ভিতর যে আগুন জ্বলছিল তার আভায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক বিছানায় জুলিয়ান আর রোজালি পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে।

হঠাৎ জোরে দুর্বোধ্য ভাষায় একটা আর্তনাদ করে উঠল জিয়ান। সে আর্তনাদে জুলিয়ান উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে। জুলিয়ান ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে পড়লেও বেশ বুঝতে পারল জিয়ান তাকে ডাকছিল।

এদিকে জুলিয়ান 'উঠে ঘর থেকে বেরোবার আগেই জিয়ান দ্রুতবেগে সিঁড়ি থেকে নেমে বাড়ির সীমানা পার হয়ে খালি পায়েই ছুটতে লাগল। সে কোথায় যাবে এই মুহূর্তে তা সে জানে না, তবু জুলিয়ানের মুখ আর দেখবে না।

অন্ধকারে ছুটতে ছুটত গ্রাম পার হয়ে বনপথ ধরল জিয়ান। এর পরই পাহাড় আর সমুদ্র। আকাশে চাঁদ ছিল না। কুয়াশায় তারাগুলোও ভাল দেখা যাচ্ছিল না। রাত্রি যেমন অন্ধকার তেমনি শীতের দুঃসহ তীব্রতায় হিমাক্ত।

সহসা জিয়ান বুঝতে পারল সে এক পাহাড়ের কিনারে এসে পড়েছে।

তার সামনেই অগাধ সমুদ্রের অন্ধকার জলরাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই খাদ। তার হাত পা সমেত গোটা দেহটা অসাড় ও অবশ হয়ে আসছে। অথচ আশ্চর্য। তার চেতনাটা আগেকার মতই আছে তীক্ষ্ণ। হঠাৎ তার কানে গেল কারা তাকে খুঁজছে। জুলিয়ানের গলার স্বর শুনতে পেল। কিন্তু জুলিয়ানের মুখ সে আর দেখতে চায় না।

মাথাটা ঘুরছিল জিয়ানের। আর একটু হলে পড়ে যেত। পড়ে যেত সামনের সমুদ্রে অথবা দুপাশের খাদের গভীরে। হঠাৎ তাকে দুদিক থেকে দুজনে ধরে ফেলল। জিয়ান এবার বুঝতে পারল মেরিয়াস আলো দেখাচ্ছিল আর জুলিয়ান বৃদ্ধ সাইমনকে নিয়ে তাকে খুঁজছিল। বাধা দেবার মত কোন শক্তি ছিল না জিয়ানের। সুতরাং কোন জোর করতে হলো না।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে শুইয়ে দেওয়া হলো জিয়ানকে। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারিয়ে ফেলল জিয়ান।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল তা বলতে পারবে না জিয়ান। তার কোন হুঁস ছিল না। তবে ঘুমের ঘোরে তার কেবলি মনে হচ্ছিল অসংখ্য ছোট ইঁদুর তার গায়ের উপর দিয়ে যেন ছুটে বেড়াচ্ছিল। নিবিড় অস্বস্তি আর আশঙ্কায় চীৎকার করে লোক ডাকার চেষ্টা করছে কত, কিন্তু ডাকতে পারেনি। অবশেষে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় হঠাৎ অর্থাৎ তার হারিয়ে যাওয়া চেতনাটা আবার ফিরে আসে।

জিয়ান বুঝতে পারল ঘরের মধ্যে তার মা বসে রয়েছে। আর একজন কে লোক রয়েছে। কিন্তু জিয়ান তাকে চিনতে পারল না। জিয়ান দেখল তার মা কাঁদছে। সে শুনতে পেল অচেনা লোকটা তার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, ওর জ্ঞান ফিরেছে। আমি আপনাকে সব কথা বলব। শান্ত হোন। আপনি এখন একটা কথাও বলবেন না। ওকে এখন ঘুমোতে দিন।

সত্যিই আবার ঘুমিয়ে পড়ল জিয়ান। হয়ত তাই চাইছিল সে। যে বাস্তব জীবন ও জগৎ অবিচ্ছিন্ন বেদনায় ভরা সে জগতে তার জ্ঞান ফিরে আসুক, তার চেতনার সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে সে জগতে আবার সে বেঁচে উঠুক এটা সে কি চাইছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোল জিয়ান। ঘুম ভাঙলে সে দেখল তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলিয়ান। জুলিয়ানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা চকিতে মনে পড়ে গেল তার। একে একে সব মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের উপর থেকে লেপ, চাদর সব টেনে ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল জিয়ান। কিন্তু বিছানা থেকে নেমে হাঁটতে গিয়েই পড়ে গেল মেঝেতে। জুলিয়ান তাকে ধরতে গেলেই সে চীৎকার করে নিষেধ করল, খবরদার ছুঁয়ো না আমাকে।

চেঁচামিচি শুনে বাড়ির সব লোক ছুটে এল। লিজ মাসি আর ব্যারণ

এসে তাকে ধরে আবার শুইয়ে দিল বিছানায়। জিয়ানের মা এসেও ডাকতে লাগলেন, জিয়ান মা আমার, দেখ আমরা এসেছি। আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ না জিয়ান?

সবই শুনতে পাচ্ছিল জিয়ান। কিন্তু না শোনার ভাণ করছিল। মাঝে মাঝে নার্স কি একটা পানীয় খেতে দিচ্ছিল তাকে। তা খেয়ে যাচ্ছিল নীরবে। কিন্তু কোন কথা বলছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তার কাছে মাকে একা পেয়ে জিয়ান বলল, শোন মা, কথা আছে।

ব্যারণপত্নী কাঁদতে লাগলেন, তাহলে তুই আমাকে চিনতে পেরেছিস?

জিয়ান বলল, কথা আছে, চুপ করে শোন। আচ্ছা কেন আমি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম, সে বিষয়ে জুলিয়ান কি কিছু বলেছে তোমাদের?

মাদাম এ্যাদিলেদ বললেন, ও বলছিল, তোমার খুব জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বরের বিকারের ফলেই রাত্রিতে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যাও।

স্পষ্ট গলায় জিয়ান বলল, কিন্তু কেন জ্বর হয়েছিল? ওটা কোন যুক্তি নয়। সে আসল কথাটা বলেনি। আসল কারণ হলো আমি তার বিছানায় রোজালিকে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

ব্যারণপত্নী মনে ভাবলেন, অসুখের ঘোরটা তখনো কাটেনি জিয়ানের। তাই বললেন, এখন ঘুমোবার চেষ্টা করো মা।

জিয়ান পরিষ্কার গলায় বলল, আমি ঠিক বলছি মা। আমি এখানে থাকব না। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো বাবাকে ডেকে আন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।

ব্যারণ এলে সব কথা বুঝিয়ে বলল জিয়ান। ব্যারণ তা শুনে শান্ত কণ্ঠে বললেন, শান্ত হও মা। আমাদের যা কিছু করতে হবে ভাবনা চিন্তা করেই করতে হবে। আমাকে কথা দাও আমরা এ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে তুমি কিছু করবে না।

জিয়ান বাবাকে কথা দিল। পরে জিজ্ঞাসা করল, রোজালি কোথায়?

ব্যারণ বললেন, তুমি তাকে আর দেখতে পাবে না।

তবু জিয়ান বলল, কোথায় আছে সে এখন?

ব্যারণ বললেন, এই বাড়িতেই আছে বটে, তবে এখনি চলে যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যারণ সোজা জুলিয়ানের ঘরে চলে গেলেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, স্যার, তুমি আমার মেয়ের উপর যে সব অবিচার ও অন্যায় আচরণ করেছ তার কৈফিয়ৎ চাই আমি। তুমি তার ঝির সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়ে স্বামী হিসাবে তার প্রতি অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছ।

নির্দোষিতার ভাণ করল জুলিয়ান। বলল, এসব মিথ্যা, আসলে তখন

জিয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। আমার উপর এই সব মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিলে আমিও ছেড়ে দেব না।

ব্যারণ জিয়ানের ঘরে ফিরে এসে জুলিয়ান যা যা বলেছে সব বললেন। তখন জিয়ান বলল, ও কখনই সত্য কথা বলবে না। পরে ওকে নিজমুখে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করব আমি।

দুদিন রাগ করে রইল জিয়ান। তৃতীয় দিন সকালবেলায় তার বাবাকে বলল, রোজালির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ব্যারণ বললেন, সে এখন এখানে নেই।

জিয়ান বলল, যেখানেই যাক, কোন লোক পাঠিয়ে দাও।

এমন সময় ডাক্তার এল। জিয়ান ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার বোঝালেন এ সময় বেশী উত্তেজিত হলে তার ফল খুবই খারাপ হবে। তাছাড়া তুমি মা হতে চলেছ।

কথাটা শুনে শান্ত হলো জিয়ান। কিন্তু আরও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। ভাবতে লাগল, যে সন্তান গর্ভে ধারণ করে আছে সে সন্তান জুলিয়ানের ঔরস-জাত। বড় হলে সেও হয়ত, ঐরকমই হবে।

কিছুক্ষণ পরে জিয়ান বলল, দেখ বাবা, কি করতে হবে তা আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। প্রথমে যাজক আবেবকে ডাক। তারপর রোজালিকে ডেকে আন। যাজকের সামনে রোজালি নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলবে না। ওর সামনে তুমি আর মা উপস্থিত থাকবে। তবে তার আগে এ বিষয়ে জুলিয়ান যেন কিছু জানতে না পারে।

যাজক আবেব এসে ঘরের মধ্যে বসার পর রোজালিকে জোর করে ধরে নিয়ে এলেন ব্যারণ। রোজালি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ঘরে ঢুকতে চাইছিল না। ব্যারণ তার হাত ধরে জোর করে নিয়ে এলেন যাজকের সামনে।

জিয়ান বিছানার উপর উঠে বসল। তারপর বলল, আমি চাই তুমি সব কথা খুলে বলবে। মনে করো তুমি যাজকের কাছে স্বীকারোক্তি করছ।

হাতে মুখ ঢেকে তখনো কাঁদছিল রোজালি। যাজক বললেন, দেখ মা, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি সত্য কথা বল। আমরা শুধু সত্য ঘটনা জানতে চাই।

জিয়ান এবার বিছানার ধারে সরে গিয়ে বলল, এটা কি সত্যি যে তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছ এবং আমি তোমাকে সেই অবস্থায় দেখেছি।

হ্যাঁ মাদাম। তেমনি হাতে মুখ ঢেকেই বলল রোজালি।

জিয়ান প্রশ্ন করল, কতদিন এ ব্যাপার চলছে ?

রোজালি বলল, এ বাড়িতে উনি আসার পর থেকে।

অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল জিয়ানের মুখে। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন

রোজালিকে করল জিয়ান. কিন্তু কেমন করে এটা ঘটল ?

রোজালিও সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল আগের থেকে। বলল, উনি আমার ঘরে একদিন রাতে আসেন। আমি লোকনিন্দার ভয়ে চীৎকার করিনি। উনি আমার বিছানায় শোন এবং আমাকে ওঁর খুশিমত ব্যবহার করেন। আমি সে কথা কাউকে বলিনি কারণ ওঁকে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগত।

রোজালির কথা হয়ে গেলে জিয়ান আর তার মা দুজনেই কাঁদতে লাগলেন। ব্যারণ রোজালির ঘাড় ধরে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে এলেন।

যাজক আবেব পিকত ব্যারণপত্নীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের রীতিই এটা। এখানে এসব ব্যাপার খুব একটা অপরাধের বলে গণ্য হয় না।

ব্যারণ রাগে আগুন হয়ে বলে উঠলেন, আমি মেয়েটার কথা ভাবছি না। সবচেয়ে রাগ হচ্ছে আমার জুলিয়ানের কথা ভেবে। সে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তার উপর অন্যায় করেছে। আমি তার কান মলে দেব।

যাজক আবেব শান্ত কণ্ঠে ব্যারণকে বলল, থাম থাম ব্যারণ। তুমিও একদিন এই রকম অপরাধ এবং অন্যায় করেছিলে। ব্যারণপত্নী তোমার জন্যও কম কষ্ট পাননি। পেয়েছেন কি না উনি বলুন।

ব্যারণ চুপ করে গেলেন। ব্যারণপত্নীর ঠোঁটের কোণে একটুকরো কাষ্ঠ হাসির ছায়া ফুটে উঠল। তিনি হয়ত স্বামীর অতীত অপরাধের কথা ভাবছিলেন। জিয়ান বিষণ্ণ চিত্তে ভাবতে লাগল, একই লোকের ঔরসজাত দুটি সন্তান জন্ম নিয়েছে তার ও তার ঝির গর্ভে। একথা ভাবতেও গাটা শিউরে ওঠে তার।

অবশেষে যাজক আবেবের মধ্যস্থতায় ঠিক হলো বারভিল খামারটা রোজালিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার দাম কুড়ি হাজার ফ্রাঁ। ওর ছেলের নামে দানপত্র হবে। তার বাবা মার জীবনসত্ব থাকবে শুধু। রোজালি সেখানেই থাকবে। যাজক আবেব তার বিয়ের জন্যে একটি পাত্র দেখে দেবে।

এমন সময় জুলিয়ান এসে ঘরে ঢুকল। সিঁড়ির কাছে রোজালিকে দেখে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল রোজালির কাছ থেকে সব কথা বার করে নেওয়া হয়েছে। তবু সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার ?

কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। ব্যারণের ভয় হলো জুলিয়ান যদি তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা, অতীতের ভুলভ্রান্তির কথা তোলে তিনি লজ্জায় পড়ে যাবেন। জিয়ানকে বোঝাতে লাগলেন যাজক আবেব, তোমার গর্ভস্থ সন্তানের কথা ভেবে তোমার স্বামীকে ক্ষমা করো মা। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। ক্ষমা করাই হলো পরম ধর্ম।

জুলিয়ানের একটা হাত টেনে নিয়ে এসে জিয়ানের হাতের উপর রাখলেন আবেব, ক্ষণিকের জন্য মিলিত হলো দুটি হাত। কিন্তু পরক্ষণেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। যাই হোক, ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী দুজনেই সহজ হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন জুলিয়ানের সঙ্গে। ব্যারণপত্নীর মনটা এমনিতেই নরম। বেশীক্ষণ শক্ত হয়ে থাকতে পারে না সে মন।

৮

বাড়ি থেকে চলে গেছে রোজালি। জিয়ানের প্রসবের মাস এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। নানা রকমের চিন্তার ভারে মনটা তার এমনই ভারাক্রান্ত ছিল যে আসন্ন মাতৃত্বের কোন আনন্দই আস্বাদন করতে পারছিল না সে।

বাতাসে এখনো শীতের আমেজ থাকলেও বসন্তের আগমন চিহ্নিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে মাটি আর গাছপালায়। রোজালির পরিবর্তে একজন বলিষ্ঠ মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই ব্যারণপত্নীকে ধরে ধরে বেড়াতে নিয়ে যায়।

ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী এখনো রয়ে গেছেন। তাদের রুয়েনে ফিরে যাওয়া হয়নি। লিজ মাসিকেও রেখে দিয়েছেন। জিয়ানের প্রসব না হওয়া পর্যন্ত কে যাবে না যাবে কিছুই তার ঠিক হয়নি।

জুলিয়ানের আজকাল ঘোড়ায় চাপার সখ হয়েছে। সে প্রায়ই ঘোড়ায় চেপে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। একদিন ব্যারণ আর ব্যারণপত্নীকে নিয়ে সে কুরভিলদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

সেদিন বিকালে মঁসিয়ে ও মাদাম কুরভিল জিয়ানের অসুখের কথা শুনে দেখতে এলেন। মাদাম কুরভিল যেমন রোগা-রোগা আর সুন্দরী মঁসিয়ে কুরভিল তেমনি খুব মোটাসোটা ; তাঁর মোচটা লাল।

মাদাম কুরভিলের কথা বলার ভঙ্গীটা এত ভাল যে জিয়ানের খুব ভাল লেগে গেল তাঁকে। বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করল তাঁর সঙ্গে। মাদাম কুরভিলের সঙ্গে জিয়ান যখন কথা বলছিল বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে তখন জুলিয়ান ঘরে এল। তা'কে দেখে জিয়ানের মনে হলো যেন সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। একটু আগে তার মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন তার চুলগুলো অতি-প্রসাধনে সুবিন্যস্ত ও এক তৈলাক্ত মেদুরতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। জিয়ানের মনে পড়ল বিয়ের আগে জুলিয়ান যেদিন প্রথম তাদের এ বাড়িতে আসে সেইদিনও ঠিক এইভাবেই আসে।

মঁসিয়ে ও মাদাম কুরভিলের সঙ্গে করমর্দন করল জুলিয়ান। যাবার সময় জুলিয়ানকে আমন্ত্রণ জানালেন মাদাম কুরভিল, আগামী বৃহস্পতিবার আসুন। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব।

বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে জুলিয়ান বলল, নিশ্চয়।

মাদাম কুলভিল জিয়ানের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন, আপনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠলে আমরা আবার তিনজনে বেড়াতে যাব।

দেখতে দেখতে জুলাই এসে গেল। জিয়ানের প্রসব হবে সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু একদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় জিয়ান যখন বাগানে বসেছিল তখন হঠাৎ সকালে প্রসব বেদনা উঠল তার। ব্যারণ ও জুলিয়ান তাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন।

জিয়ানের ভয় হচ্ছিল। কিন্তু নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেল। একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করল জিয়ান। প্রথম মাতৃত্বের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জিয়ান। তার এই সন্তানের মধ্যে জীবনের যেন এক নূতন অর্থ খুঁজে পেল। প্রেমের ব্যাপারে যে প্রতারণার অপমান লাভ করেছে, মাতৃত্বের গৌরবের মধ্যে সে অপমান নিঃশেষে তলিয়ে গেল কোথায়।

শিশুর দোলনাটা টাঙ্গানো হলো জিয়ানের শোবার খাটের পাশে যাতে হাত বাড়িয়েই সে নাগাল পায়। দিনরাত শুধু তার শিশুসন্তানের কথা ভাবতে থাকে জিয়ান।

জিয়ানের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে জুলিয়ানের দিকে কেউ যেন তাকায় না তেমন। তার গুরুত্ব এ বাড়িতে অনেকখানি কমে গেছে যেন। একথা বুঝতে পেরে আপন সন্তানের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল জুলিয়ান। একদিন স্পষ্ট বলল, ছেলেটাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে জিয়ান।

একদিন আবেব এসে ব্যারণ ও ব্যারণপত্নীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে গোপনে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে আবেব চলে যাবার সময় জুলিয়ান তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গেল। ফিরে এসে জুলিয়ান জিয়ানের সামনেই তার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনারা কি ভেবেছেন, কুড়ি হাজার ফ্রাঁ সামান্য একটা অবৈধ সন্তানকে দান করবেন? আপনারা আমাদের কথাটা ভেবে দেখেছেন?

ব্যারণ বললেন, তোমার স্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছে।

জুলিয়ান বলল, আমি তার স্বার্থের খাতিরেই একথা বলছি।

ব্যারণ বললেন, কার ভুলের জন্য এ কাজ আমাদের করতে হচ্ছে তা বলতে পার? কেন আজ রোজালির বিয়ের ব্যবস্থা?

কিছুটা নরম হয়ে জুলিয়ান বলল, পনের হাজার দিন। ঠিক আছে এখনো ত দলিল হয়নি। যার সঙ্গে রোজালির বিয়ে হবে আমি তাকে চিনি। ছেলেটা ভাল। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।

জিয়ান চুপ করে রইল। জুলিয়ান চলে যেতে ব্যারণ বললেন, এটা কি খুব খারাপ হচ্ছে?

জিয়ান হাসতে হাসতে বলল, শুনলে, কেমন জোর দিয়ে বলল কুড়ি হাজার ফ্রাঁ।

কিছুক্ষণ পর জিয়ান গম্ভীরভাবে বলল, যা বলে বলুক। ও যে ভদ্রতা জানে না তা আমি জানি। আজকাল আমি যে ওর স্ত্রী একথা আমি মনেই ভাবি না।

একদিন দুপুরে খাওয়ার পর লেকক নামে এক যুবক চাষী এসে দেখা করল ব্যারণের সঙ্গে। পরিচয় দিয়ে বলল রোজালির সঙ্গে তারই বিয়ের কথা হচ্ছে। জিয়ান উঠে গেল।

ব্যারণ বললেন, তুমি তাহলে রোজালিকে বিয়ে করছ?

লেকক বলল, হ্যাঁও বটে, নাও বটে।

ব্যারণ কড়া গলায় বললেন, তার মানে?

লেকক বলল, যাজক আবেব যা বলেছিলেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি বিয়ে করব আর মঁসিয়ে লামেয়ার যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে করব না।

ব্যারণ বললেন, তার মানে?

লেকক বলল, যাজক আবেব বলেছিলেন কুড়ি হাজার ফ্রাঁর সম্পত্তির কথা আর লামেয়ার বলেছেন মাত্র পনেরশো ফ্রাঁর কথা।

ব্যারণ বললেন, আমি যাজককে কুড়ি হাজার ফ্রাঁ মূল্যের বারভিল খামারবাড়িটা দেবার কথা বলেছিলাম। আমি এক কথার মানুষ। এবার তুমি স্পষ্ট বলত, বিয়ে করবে কি না। তুমি না করলে আমাদের হাতে আরো ছেলে আছে।

লেকক রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

৯

অল্পদিনের মধ্যেই লেককের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রোজালির।

কুরভিলদের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। জিয়ান এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। কুরভিলরা আগেই নিমন্ত্রণ করে রেখেছিল। জিয়ান সুস্থ হয়ে ওঠার পর থেকে জুলিয়ান চাপ দিচ্ছিল তাকে তাদের ওখানে যাবার জন্য।

সম্প্রতি একটা একঘোড়ার গাড়ি কিনেছে জুলিয়ান। সেই গাড়িটা করে একদিন রওনা হলো ওরা। ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন। শীতের তপ্ত উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পথের দুপাশের মাঠে। মাঠ ও কয়েকটা জলাশয় পার হয়ে ওরা একটা ছোট্ট উপত্যকা পেল। দু পার্শে ঘন ঝোপ। তার পরেই লা ভ্রিলেত গাঁ।

একটা বিরাট ত্রয়োদশ লুইএর আমলের ফটক পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল গাড়িটা। হ্রদের গা ঘেঁষে উঠেছে বাড়িটা। এ বাড়ির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোথায় কি সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্য আছে, এ বাড়ির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত যুগ যুগান্তের সামাজিক মান ও মর্যাদা জুলিয়ান তা সব জানে। জিয়ানকে তা সব বোঝাতে লাগল।

জুলিয়ান বোঝাতে লাগল, ঐ দেখ হ্রদের ঘাটে চারটে নৌকো বাঁধা রয়েছে, দুটো কাউন্টের আর দুটো কাউন্টপত্নীর। হ্রদের ওপারে পপলার গাছের বন।

তার ওধারে একটা নদী। এ অঞ্চলে খুব সরাল বা জলপায়রা পাওয়া যায় আর কাউন্ট তা সাধ মিটিয়ে শিকার করে বেড়ায়।

খবর পেয়ে কাউন্টপত্নী দরজা খুলে দিলেন। মুখটা তাঁর এমনিতেই মলিন দেখায়। কিন্তু জিয়ানদের দেখে হাসি ফুটে উঠল সে মুখে। বসার ঘরের আটটা জানালার মধ্যে চারটেই হ্রদের দিকে। হ্রদের চারদিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছের ছায়ায় গম্ভীর দেখাচ্ছে হ্রদটাকে। শান্ত বনমর্মরে হ্রদের গভীর কথা ধ্বনিত হচ্ছিল যেন। পাইনের ওধারে সূর্য অস্ত যেতেই আকাশটা লাল হয়ে উঠল। নৌকোয় করে ওরা বেড়িয়ে এল হ্রদে। কাউন্ট ওদের রাতের খাবার খেয়ে যেতে বললেন। তার শিশু সন্তান পলের কথা ভেবে জিয়ানের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জুলিয়ান থেকে যেতে চাওয়ায় আর জোর করল না জিয়ান। আনন্দের আতিশয্যে কাউন্ট তাঁর স্ত্রীকে দু হাতে করে তুলে মুখের কাছে তাঁর মুখটা এনে চুম্বন করলেন। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে উঠল জুলিয়ান। জিয়ান তার কাছে গিয়ে বলল, তোমার শরীরটা কি খারাপ?

জুলিয়ান বলল, না আমার খুব শীত লাগছে।

কাউন্টের দুটো শিকারী কুকুর ছিল। খাবার সময় কাউন্ট তাদের সঙ্গে নিলেন। খাবার পর কাউন্ট অন্ধকারে নৌকো থেকে টর্চ জেলে মাছ ধরা দেখালেন জিয়ানকে।

জিয়ানের মনে হলো কাউন্টের চেহারাটা দৈত্যের মত আর মোচটা ভয়ঙ্কর হলেও তাঁর মনটা ভাল। ফেরার পথে জিয়ান জুলিয়ানকে এই কথাটা বলতেই জুলিয়ান বলল, হ্যাঁ ভাল, তবে পাঁচজনের সামনে ওঁর ব্যবহারটা আরো শোভন হওয়া উচিত।

পরের সপ্তায় ওরা কুতেলিয়ারদের বাড়ি বেড়াতে গেল। এই অঞ্চলের মধ্যে কুতেলিয়াররা হচ্ছেন অভিজাত সমাজের মুকুটমণি। চতুর্দশ লুইএর আমলে তৈরী এক বিরাট প্রাসাদে থাকতেন কুতেলিয়াররা। স্বামী স্ত্রীর দুজনেরই বয়স হয়েছে। জিয়ানদের দেখে নামমাত্র দু চারটে কথা বললেন কর্তব্যের খাতিরে। কিন্তু তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না। তাঁরা বড় অহঙ্কারী। তাঁদের অস্বস্তিকর সাহচর্য সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল জিয়ান।

পথে জুলিয়ান বলল, আর আসছি না এখানে। আমার কাছে কুরভিল-রাই যথেষ্ট।

নিজের শিশুপুত্রকে কেন যে দেখতে পারে না জুলিয়ান জিয়ান তা কিছুতেই বুঝতে পারে না। ছেলেকে কোলে নিয়ে এক একসময় জুলিয়ানকে বলে জিয়ান, তুমি ওকে চুম্বন করো, তা না হলে লোকে বলবে তুমি ওকে মোটেই ভালবাস না।

জিয়ানের কথায় ছেলেটার কপালে আলতোভাবে একটা চুম্বন করেই সেখান থেকে দ্রুত চলে যায় জুলিয়ান।

মাঝে মাঝে মেয়র, তাঁর স্ত্রী ডাক্তার, যাজক আবেব আসতেন জিয়ানদের বাড়িতে। খেয়ে যেতেন। অতিথিদের সমাগমে কিছুক্ষণের জন্য সরগরম হয়ে উঠত জনবিরল সতত স্তব্ধ বাড়িটা। তবে জিয়ানদের সবচেয়ে ভাল লাগত কুরভিলরা এলে। কাউন্ট জিয়ানের ছেলে পলকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর দৈত্যের মত চেহারা আর ভয়ঙ্কর মোচ নিয়ে পলকে কোলে চাপিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আদর করে যেতেন।

একদিন কাউন্টপত্নী মাদাম গিলবার্তের অনুরোধে ওরা চারজন ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বার হলো। জুলিয়ান ও কাউন্টপত্নী দুজনে পাশাপাশি অনেকখানি আগে আগে যেতে লাগল। জিয়ান ও কাউন্ট পিছনে কথা বলতে বলতে পাশাপাশি যেতে লাগলেন।

জুলিয়ান ও কাউন্টপত্নীর মেলামেশার মধ্যে কেমন যেন একটা গোপনতার ভাব ছিল। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ওরা ফিস ফিস করে কি বলত। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সুচতুর দৃষ্টিতে তাকাত দুজনে দুজনের মুখপানে। মনে হত যে কথা ওরা মুখে বলতে সাহস করছে না সেই লজ্জাজনক ভয়ঙ্কর কথাটা ওদের নিলাজ নীরব দৃষ্টির এক কুটিল ঔদ্ধত্যে ফুটে উঠছে।

অথচ জিয়ান ও কাউন্টের মেলামেশা ছিল যেমন পবিত্র, তাদের কথাবার্তাগুলো ছিল তেমনি সরল আর অকপট। মাঝে মাঝে কাউন্টপত্নীর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতার কণ্ঠ শোনা যেত। একদিন সন্ধ্যার আগে ঘোড়ায় চেপে ঘরে ফেরার সময় মাদাম গিলবার্তে হঠাৎ তাঁর ঘোড়াটাকে অযথা মেরে বিরক্ত করে রাগিয়ে দিতে ঘোড়াটা তীর বেগে পথ ছেড়ে চষা জমির উপর দিয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টও তাঁকে খোঁজার জন্য ঘোড়াটাকে তীর বেগে চালিয়ে চলে গেলেন।

জিয়ানের মনে হলো দুটি মানুষ নয়, যেন দুটি পাখি পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে দুজনেই হারিয়ে গেল প্রাকসন্ধ্যার এক ছায়াধূসর দিগন্তে।

জুলিয়ান আর জিয়ান দুজনে এগিয়ে চলল আর অপেক্ষা না করে। বেশ কিছুক্ষণ পর কাউন্ট তাঁর স্ত্রীর ঘোড়ার লাগামটা এক হাতে ধরে ফিরে এলেন দুজনে।

মাদাম গিলবার্তেকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন।

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কাউন্টপত্নী মাদাম গিলবার্তের সেই খিটখিটে মেজাজ আর নেই। তাঁর মুখের সেই চিরমলিন ভাবটাও কেটে গেছে। তার জায়গায় ফুটে উঠেছে এক উৎফুল্ল উজ্জ্বল ভাব। একদিন কাউন্ট এসে বললেন, আমার স্ত্রী হঠাৎ খুব ভাল হয়েছে। আমরা এখন খুব সুখী। সে আমাকে দারুণ ভালবাসে। আগে তার ভালবাসাটা কেমন

নীরস ও নিষ্প্রাণ ছিল। তাতে সন্দেহ জাগত আমার। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত। আমি সুখী।

জিয়ান লক্ষ্য করল জুলিয়ানের স্বভাবটাও আজকাল বদলে গেছে আশ্চর্যভাবে। আগেকার মত চাষের কাজে আর সে থাটে না। আজকাল সব সময় সে উজ্জ্বল পোশাক পরে থাকে। চুল ও হাত মুখের যত্ন করে। তার সেই কথায় কথায় রাগ ও খিটখিটে মেজাজটা আর নেই।

সেদিন দুপুরের দিকে একা একা বসে থাকতে থাকতে জিয়ানের কি মনে হলো মেরিয়াসের ছোট্ট ঘোড়াটায় করে বেরিয়ে পড়ল এত্রিয়াতের সেই বনপথের উদ্দেশ্যে যেখানে প্রথম প্রেমের সূত্রপাত হয় তার জুলিয়ানের সঙ্গে। নব বসন্তের আগমনে তার সেই মৃত প্রথম প্রেমের শুকনো স্মৃতিটাকে সেখানে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য সজীব করে তুলতে চায় যেন জিয়ান। সে জানে জুলিয়ান তাকে আর ভালবাসে না, তার ভালবাসা আর সে চায়ও না। তবু তার সেই প্রথম প্রেমের স্মৃতিটিকে আজও পবিত্রভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চায় জিয়ান তার মনের মাঝে।

এত্রিয়াতের সেই বনভূমির কাছে গিয়ে জিয়ান দেখতে পেল দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কোন আরোহী নেই। কাছে গিয়ে দেখল ঘোড়াদুটো জুলিয়ান আর মাদাম গিলবার্তের। আরো দেখল দুটো হাতের দস্তানা আর একটা ঘোড়ার চাবুক পড়ে রয়েছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল জিয়ানের। ওদের অনেক ডেকেও যখন কোন সাড়া পেল না তখন তার ভয় আরো বেড়ে গেল। হয়ত ওরা বনের গভীরে কোথাও চলে গেছে।

সহসা সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সরল হয়ে উঠল জিয়ানের কাছে। কাউন্টপত্নী আর জুলিয়ানের মধ্যে অবৈধ প্রেমসম্পর্ক সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না তার মনে। এটা আরো আগেই তার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে জুলিয়ানের থেকে মাদাম গিলবার্তের উপর রাগ হলো বেশী। জুলিয়ানের পক্ষে আর কোন দুর্ব্যবহার বা অন্যায় বিস্মিত করতে পারবে না তাকে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে কোন হীন কাজ পাপের কাজ অবলীলাক্রমে করতে পারে জুলিয়ান। কিন্তু মাদাম গিলবার্তে কি করে একই সঙ্গে তাঁর নির্দোষ স্বামী আর জিয়ানের মত এক অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে ঠকাচ্ছেন। অমার্জনীয় তার এই বিশ্বাসঘাতকতা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে একাই ফিরে এল জিয়ান।

রুয়েন থেকে ব্যারণ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শীগগির আসবেন পোপ্লের বাড়িতে। তাঁদের আসার কথা আছে। জিয়ান সব দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেরে ফেলে ঠিক করল জীবনে যে তিনটি প্রাণীকে ভালবাসে সে তাদের ছাড়া আর কারো কথা ভাববে না কোনদিন। তার সন্তান পল আর তার বাবা মা, এ ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে ভালবাসে না সে। গোটা পৃথিবীটা যেন যত সব শঠ

প্রতারক আর ভণ্ড লোকে ভরা।

মার শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল জিয়ান। মার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তাঁর বয়স এই ক'মাসের মধ্যে যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

ব্যারণের কাজ ছিল, দু চার দিন থেকে আবার রুয়েনে চলে গেলেন। সেদিন ছেলেটাকে কোলে করে মাঠ দিয়ে একা একা বেড়াতে গেল জিয়ান। মাঠে একা একা বেড়াচ্ছিল আর তার ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল জিয়ান।

সহসা ছুটতে ছুটতে মেরিয়াস এসে তাকে খবর দিল তার মার শরীর খুব খারাপ।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে জিয়ান দেখল তার মা বাগানে বেড়াবার সময় পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে একদল লোক এসে ভিড় করেছে। যাজক আবেব পিকতও এসেছেন। মাকে উপরে তাঁর ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল জিয়ান। ডাক্তার এসে বললেন, সব শেষ হয়ে গেছে।

আবেব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম করে চলে গেছে। জুলিয়ান রুয়েনে একটা লোক পাঠিয়ে দিল ব্যারণকে আনার জন্য। সে রাতে মৃতদেহের কাছে জিয়ান একা রইল। জুলিয়ান রইল পাশের ঘরে। তাকে আশ্চর্যভাবে অবিচলিত দেখাচ্ছিল।

স্থানীয় অভিজাত সমাজের সব লোকেরাই এল মৃত্যুর খবর শুনে। শব-যাত্রায় সকলে যোগ দিল। লিজ মাসি আসতে তাকে ধরে কাঁদতে লাগল জিয়ান। কাউণ্টপত্নী এসে জিয়ানকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রইলেন।

১০

বিপদের উপর বিপদ। মার মৃত্যুর পরেই পলের অসুখ করল। বারো দিন একরকম অনাহারে অনিদ্রায় তার পাশে বসে কাটাল জিয়ান। মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠত জিয়ান, পুত্রের যদি মৃত্যু হয় তাহলে কি করবে সে? কাকে নিয়ে জীবন কাটাবে?

সহসা অতীতের একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল জিয়ানের। প্রথম যৌবনে বিয়ের আগেই স্বপ্ন দেখত জিয়ান তার দুটি সন্তান হবে—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

বহুদিন পর সেই স্বপ্নটা আজ এক স্পষ্ট ইচ্ছায় পরিণত হলো। তার কেবলি মনে হতে লাগল, তার একটি কন্যাসন্তান হোক। তার মত দেখতে ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে উঠোনে পলের সঙ্গে খেলা করে বেড়াবে।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই এখন। রোজালির সেই ঘটনার পর থেকে রাত্রিতে রোজ একা শোয় জিয়ান। লোকচক্ষে তাদের মিলন হলেও কোন দেহসংসর্গ হয়নি সেই থেকে। তাছাড়া জুলিয়ান এখন অন্য এক নারীকে ভালবাসে।

তবু সব লজ্জা অপমানের কথা ভুলে অদম্য এক সন্তানকামনার তাড়নায় পর পর দুই রাত জুলিয়ানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল জিয়ান। কিন্তু জুলিয়ানকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। মুখে আটকে গেল কথাটা।

আজ তার মা নেই। ব্যারণ অন্যত্র আছেন। মনের কথা বিশ্বাস করে বলার মত লোক নেই। অনেক ভেবে যাজক আবেবের কাছে গেল জিয়ান। স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে সব কথা খুলে বলে পরামর্শ চাইল তাঁর কাছ থেকে। সবশেষে বলল, আমি আর একটি সন্তান চাই ফাদার। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আমি আর আমার স্বামী পৃথক থাকি।

গ্রাম্য যাজক স্থূল রসিকতার সুরে বললেন, ও, বুঝতে পেরেছি। তুমি এখন বিধবার মত রয়েছ। কিন্তু আর থাকতে পারছ না, কারণ তোমার যৌবন রয়েছে, তুমি স্বাস্থ্যবতী।

আর কথা না বলে লজ্জায় আরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে এল জিয়ান।

সপ্তাখানেক পর একদিন রাত্রিতে খাবার সময় জিয়ানের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল জুলিয়ান। সে দৃষ্টির মধ্যে এক মদির আসক্তি ছিল জিয়ানের তা বুঝতে কষ্ট হলো না। জুলিয়ানের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জিয়ান। তার মাথাটা জুলিয়ানের বুকের মধ্যে রেখে শিশুর মত কাঁদতে লাগল। জিয়ানকে তার ঘরে নিয়ে এসে আগের মত আদর করতে লাগল জুলিয়ান। সুযোগ পেয়ে গেল জিয়ান, সে সুযোগ বহুদিন ধরে খুঁজছিল। সে বেশ বুঝতে পারল জুলিয়ান তাকে ভালবাসে না আর সেও জুলিয়ানের এই কৃত্রিম ভালবাসার রাগরঙ্গ সহ্য করবে না কোনদিন। শুধু আজ, শুধু আজকের মত সে তার সন্তানকামনার খাতিরেই সব সহ্য করবে।

কিন্তু জিয়ান অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝল জুলিয়ান আর সন্তান চায় না। জিয়ান সন্তানের কথা বলতেই চটে গেল জুলিয়ান। বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? একটা ত রয়েছে। আবার কেন?

জিয়ান অনেক করে তাকে বোঝাল, তার সহবাস কামনা করে উত্তপ্ত ইঙ্গিত দান করল! কিন্তু তার কোন কথা শুনতে চাইল না জুলিয়ান। কিছুতেই কোন ফল হলো না।

নিরুপায় হয়ে জিয়ান আবার একবার গেল যাজক আবেবের কাছে। গিয়ে বলল, আমার স্বামী সন্তান চায় না।

আবেব তখন বললেন, তুমি তাকে বলবে তোমার গর্ভে সন্তান এসে গেছে। তাহলে সে আর কিছু মনে করবে না; সে আর সাবধান হবে না।

সুতরাং তখন সত্যি সত্যিই সন্তান আসবে তোমার গর্ভে।

জিয়ান বলল, যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে?

আবের বললেন, বাইরে সবার কাছে বলে বেড়াবে, তা হলে ঠিক বিশ্বাস করবে।

একদিন কথাটা জুলিয়ানকে বলতেই সে রেগে গেল। কি করে সম্ভব হলো? আমি ত সন্তান চাইনি।

প্রথম প্রথম দিনকতক এড়িয়ে যেতে লাগল জিয়ানকে। তারপর আবার রাত্রিকালে তার ঘরে যেতে সুরু করল। এবার সত্যি সত্যিই জিয়ানের আশা পূরণ হলো। তার গর্ভে সন্তান এল।

যাজক আবের একদিন নূতন ছোকরা যাজককে সঙ্গে করে এনে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। আমার জায়গায় এ অঞ্চলে এ কাজ করবে।

কথাটা শুনে মনটা দুঃখে ভরে উঠল জিয়ানের। যাজক আবেবের সঙ্গে তার অতীত জীবনের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সে কথা ভাবতে গিয়ে সত্যিই বেদনা অনুভব করল সে।

আবেব পিকতের জায়গায় যে নূতন যাজক নিযুক্ত হয়েছে তার বয়স বেশী নয়। রোগা আর পাতলা ধরনের চেহারা। নাম আবেব টলবিয়াক। তার কথা বলার ভঙ্গিমাটা কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। সে যা কিছু বলে, জোর দিয়ে বলে।

আবেব পিকতের পদোন্নতি হচ্ছে। তিনি অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। তবে এ অঞ্চলে আঠারো বছর কাটিয়েছেন বলে এ অঞ্চলটা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল পিকতের। এখানকার সমুদ্র, উপত্যকা, মাঠ, বন আর মানুষ সব প্রিয় তাঁর কাছে।

জিয়ানের কাছে পিকত বিদায় নিতে এলে জল এল জিয়ানের চোখে।

দ্বিতীয় সন্তান জিয়ানের গর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিয়ান রোজ রাত্রিতে তার ঘরে তালা দিয়ে শোয়। এবার থেকে সারাজীবন ধরে সে তার সতীত্ব রক্ষা করে চলবে। স্বামীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তার দুটি সন্তানই হবে তার জীবনের অবলম্বন।

এক সপ্তাহ পর আবেব টলবিয়াক জিয়ানের সঙ্গে একবার দেখা করতে এল। সে এসে জিয়ানকে বলল, সে কিছু সংস্কার করতে চায় এ অঞ্চলের। সে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হতে লাগল সে যেন এ অঞ্চলের নূতন রাজা। এ অঞ্চলের লোকদের ভাগ্য নির্ভর করছে তার উপর।

টলবিয়াক বলল, আপনি আর আমি এই দুজনেই এ অঞ্চলের আসল কর্তৃপক্ষ। আমরা এমনভাবে শাসন করব এখানকার লোকদের যে তাতে এক নূতন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে।

ধর্মের প্রতি কোনদিনই কোন গভীর আগ্রহ বা আসক্তি ছিল না

জিয়ানের। কিন্তু এই টলবিয়াকের গভীর ঈশ্বরপ্রীতি এবং ধর্মপ্রবণতা দেখে জিয়ানের মনটা বদলে গেল। সে নিয়মিত চার্চে যেতে শুরু করল। টলবিয়াক জিয়ানকে যীশুর মূর্তির কাছে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল মানুষের ভালবাসা কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর। বুঝিয়ে দিল একমাত্র ঈশ্বরপ্রীতির মধ্যেই পাওয়া যায় পরম সুখ, দিব্য আনন্দ। পার্থিব কোন আনন্দের সঙ্গে তুলনাই হয় না সে আনন্দের। জিয়ান বুঝতে পারল টলবিয়াকের এই ধর্মাতিশয্যের মধ্যে এক বালসুলভ উচ্ছ্বাস আছে। তবু তার শীর্ণ দেহের এক সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না নিজেকে। তার কাছে গেলে নিজেকে ছোট মনে হত। মনে হত টলবিয়াক যেন তার থেকে পনের বছরের বড়।

কিন্তু জিয়ানের মধ্যে ধর্মভাব কিছুটা জাগাতে পারলেও এ অঞ্চলের লোকদের উপর ক্রমশই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল টলবিয়াক। ঈশ্বরকে এত ভালবাসত টলবিয়াক যে মানুষের কোন ভালবাসাকেই সহ্য করতে পারত না। তার নীতি উপদেশ ও ধর্মের বাণী প্রচারের সময় সে প্রায়ই কটাক্ষ করত নর-নারীর প্রেমের উপর। ফলে স্থানীয় জনগণও তাকে দেখতে পারত না। তার নীতি উপদেশ পছন্দ করত না।

প্রতি বৃহস্পতিবার টলবিয়াক জিয়ানদের পোপের বাড়িতে এসে খেত। বাগানে অনেকক্ষণ ধরে জিয়ানের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গভীরভাবে ধর্মালোচনা করত। অতীন্দ্রিয়লোকের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুনতে খুবই ভাল লাগত জিয়ানের। তাছাড়া টলবিয়াক সে কথা আবেগের সুরে কবিতার মত করে বলত। জুলিয়ানও টলবিয়াককে যাজক হিসাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে। বলে, লোকটা বেশ কড়া আর খাড়াখাড়ি।

জুলিয়ান আজকাল ফুরভিলদের বাড়িতে রোজ যায়। কাউন্টের সঙ্গে শিকার করে। জুলিয়ান না হলে কাউন্টের শিকারই হয় না। আবার কাউন্টপত্নী মাদাম গিলবার্তের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যায়। সে না হলে কাউন্টপত্নীর বেড়াতে যাওয়া হয় না। কাউন্ট বলেন, ঘোড়ায় চেপে বেড়ালে আমার স্ত্রীর শরীর ভাল থাকে।

বয়স হয়েছিল তাই রুয়েনে একা একা ভাল লাগছিল না ব্যারণের। তিনি পোপের বাড়িতে চলে এলেন একদিন। তাঁর একমাত্র সন্তান জিয়ানকে দেখে মনে অনেকখানি বল ও শান্তি পেলেন ব্যারণ। কিন্তু যাজক টলবিয়াককে দেখে ও তার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে মোটেই ভাল লাগল না তাঁর। বললেন, লোকটার জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তার উপর স্থানীয় চাষীদের কাছ থেকে যখন শুনলেন যাজক টলবিয়াক ভালবাসাবাসির ব্যাপার মোটেই পছন্দ করে না, এবং তার জন্য মানুষকে অপমান করে তখন তিনি আরও রেগে গেলেন।

একদিন টলবিয়াক নির্জনে দুটি ছেলেমেয়েকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে দেখলে তাদের ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করে।

ব্যারণকে বোঝাবার চেষ্টা করে জিয়ান। কিন্তু ব্যারণ বললেন, এই সব গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকরা ঈশ্বরকে একটা নীরস ফিলিস্টাইন সন্ন্যাসী বানিয়ে তুলেছে। এরা ভুলে যায় ঈশ্বর পরম স্রষ্টা আর প্রেম ছাড়া সৃষ্টি হয় না। যে কোন সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে এক গভীর প্রেমাসক্তি ও সৌন্দর্যপ্রীতি আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে।

ব্যারণ ছিলেন দার্শনিক রুশোর ভাবশিষ্য এবং মনেপ্রাণে প্রকৃতিবাদী। সুতরাং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কাজকর্ম বা আচরণ সহ্য করতেন না তিনি।

একদিন টলবিয়াক এসে জিয়ানকে বলল, আপনাদের বাড়িরই কোন লোকের দ্বারা এক অন্যায় কর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য দয়া করে আমায় সাহায্য করবেন?

সঙ্গে সঙ্গে জিয়ান উত্তর করল, অবশ্যই করব। কিন্তু অন্যায়টা কি এবং লোকটাই বা কে?

উঠে পড়ে টলবিয়াক বলল, আর একদিন বলব। এখনো সময় হয়নি। সময় হলে আসব।

শীত পড়তে আর দেরী নেই। আর একদিন সত্যিই এল টলবিয়াক। এসে জিয়ানকে সরাসরি বলল, আচ্ছা মাদাম দ্য ফুরভিলের সঙ্গে আপনার স্বামীর এক অবৈধ প্রণয়সম্পর্ক আছে আপনি তা জানেন?

নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল জিয়ান।

টলবিয়াক আবার বলল, কি করতে চান আপনি এ ব্যাপারে?

জিয়ান বলল, আমাকে কি করতে বলেন ফাদার?

টলবিয়াক বলল, আপনাকে বাধা দিতে হবে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিয়ান বলল, কিন্তু এর আগেও আমার ঝির সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত ছিল সে। সে আমার কোন কথা শোনে না। সে আমাকে গ্রাহ্য করে না। আমার কোন কথা তার মনোমত না হলেই রেগে যায়। আমি কি করতে পারি এ ক্ষেত্রে?

টলবিয়াক তখন আবেগের সঙ্গে বলল, আপনি তাহলে জেনে শুনে এ কাজে সমর্থন করেন, আপনার বাড়িতে এই পাপকাজের কর্তা বাস করছে আর আপনি তা দেখেও দেখছেন না? আপনি স্ত্রী, আপনি একজন খৃস্টান, আপনি মা।

জিয়ান ভয়ে ভয়ে বলল, আমাকে তাহলে কি করতে বলেন?

টলবিয়াক বলল, এই পাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। আপনার স্বামীকে ত্যাগ করুন।

জিয়ান বলল, কিন্তু আমার হাতে ত কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ না

পেলে আমি ত ত্যাগ করতে পারি না।

টলবিয়াক বলল, আপনি কাপুরুষোচিত কথাবার্তা বলছেন মাদাম জ লামেয়ার। আমি ভেবেছিলাম আপনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ঈশ্বরের করুণা পাবার আপনি যোগ্য নন।

টলবিয়াক উঠে পড়ল। জিয়ান তার সামনে নতজানু হয়ে বসে কাতর কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে এ অবস্থায় ত্যাগ করে যাবেন না। আপনি পরামর্শ দিন।

টলবিয়াক বলল, আপনি তাহলে মঁসিয়ে ফুরভিলের চোখ খুলে দিন।

জিয়ান বলল, উনি তাহলে ওদের খুন করবেন ফাদার এবং আমিই হব তার কারণ।

টলবিয়াক উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে এই লজ্জা আর পাপের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকুন। আমার আর বলার কিছু নাই।

ঘৃণা আর রাগের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল টলবিয়াকের মুখে। সে এগিয়ে চলল। জিয়ানও তার পিছু পিছু কিছুটা গেল। টলবিয়াক বলল, আর আসবেন না আপনি, আমার আর বলার কিছু না।

বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে টলবিয়াক দেখল একটা জায়গায় কতকগুলো চাষীদের ছেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যারণও ছিলেন সেখানে। টলবিয়াককে দেখে অন্যত্র সরে গেছেন। ভিড় ঠেলে টলবিয়াক দেখল একটা কুকুরের বাচ্চা হচ্ছে। পাঁচটা বাচ্চা প্রসব হয়েছে আর একটা হচ্ছে।

গ্রাম্য চাষীদের ছেলেমেয়েদের কাছে এ ঘটনা গাছ থেকে ফল পড়ার মতই সহজ স্বাভাবিক ঘটনা; এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। ব্যারণও তাই মনে করেন। কিন্তু টলবিয়াক দেখে ভীষণ রেগে গেল ছেলেদের উপর। ছাতা নিয়ে তাড়া করল ছেলেদের। ছেলেরা চলে যেতে মাদী কুকুরটাকে ছাতা দিয়ে পায়ের জুতোয় করে নির্মমভাবে মারতে লাগল। দেখেশুনে জিয়ান দূর থেকেই পালিয়ে গেল। কিন্তু ব্যারণ আর থাকতে পারলেন না। তিনি এসে টলবিয়াকের কান দুটো জোরে মলে দিয়ে বাড়ির গেটের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে সজোরে ঠেলে দিলেন। মাদী কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বাচ্চাগুলোও একে একে সব মারা গেল। শুধু একটা বেঁচে রইল। জিয়ান তাকে মানুষ করতে লাগল। ব্যারণ তার নাম দিলেন ম্যাসাকার।

এর পর থেকে পোপ্লের বাড়িতে আর কোনদিন আসেনি টলবিয়াক। কিন্তু পোপ্লের এই বাড়ির নামে নানারকমের নিন্দা রটনা করল সে। বলল ব্যারণ খারাপ লোক। জুলিয়ানের অবৈধ প্রেমসম্পর্কের আভাস দিল। আর বলল ঈশ্বরের অভিশাপ খুব শীগগিরই নেমে আসবে এ বাড়ির উপর।

কথাটা জানতে জুলিয়ান আর্ক বিশপের কাছে টলবিয়াকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চিঠি দিলে কিছুটা শান্ত হয় টলবিয়াক। কিন্তু সে জুলিয়ানের

গতিবিধি লক্ষ্য করল বিশেষভাবে।

শীত গিয়ে বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে গেল জুলিয়ানদের অবৈধ প্রণয়লীলার আতিশয্য। আজকাল রোজ যখন তখন সে মাদাম ফুরভিলকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যায়।

আজকাল জুলিয়ানরা যখন ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যায় তখন টলবিয়াকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায়। টলবিয়াককে দূর হতে দেখে ওরা অন্য দিকে চলে যায়। সহসা ওদের গতি পরিবর্তন করে।

কিন্তু সাধারণতঃ জুলিয়ানরা যে বন দিয়ে বেড়াতে যায় সে বনে শীতে গাছের পাতা সব ঝরে যাওয়ায় সেখানে কোন আড়াল নেই। এজন্য ওরা আজকাল চলে যায় ভকোত্তে পাহাড়ের উপর একটি শূন্য কাঠের কুঁড়েতে। কুঁড়েটা ছোট্ট এবং তার তলায় ঢাকা আছে। কিন্তু ওরা যখন কুঁড়েটার ভিতর ঢুকে যায় তখন ওদের ঘোড়া দুটো বাইরে খোলা জায়গায় বাঁধা থাকে। তাই ওরা ঘোড়া দুটোকে একটা খালের মধ্যে বেঁধে রাখত। যাতে হঠাৎ দূর থেকে কারো নজরে না পড়ে।

একদিন সন্ধ্যের সময় জুলিয়ানরা যখন ফুরভিলদের বাড়িতে ঢুকছিল তখন দেখল টলবিয়াক সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখে ওদের মনে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে সন্দেহ স্থায়ী হয়নি বেশীদিন।

তখন বৈশাখ মাস। সেদিন বিকালে ঝড় বইছিল। আবহাওয়াটা মোটেই ভাল ছিল না। জিয়ান বাড়িতেই ছিল। জুলিয়ান এ সময় কোনদিনই বাড়িতে থাকে না। হঠাৎ জিয়ান দেখল খুব দ্রুত পদক্ষেপে কাউন্ট ফুরভিল তাদের বাড়ির দিকে আসছেন। তাঁর পরনে ছিল শিকারীর পোশাক, মাথায় বড় টুপী। চোখদুটো ঘুরছিল।

কাউন্ট ফুরভিল সোজা জিয়ানের কাছে এসে বললেন, আমার স্ত্রী এখানে আছে?

জিয়ান বলল, আমি ত আজ তাঁকে দেখিনি।

আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কাছের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন কাউন্ট। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন। তারপর প্রলাপের মত বললেন, আপনার স্বামী, আপনিও প্রতারিত...

তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন কাউন্ট ফুরভিল। জিয়ান বুঝতে পারল, উনি তাহলে সব জেনে গেছেন। এত-দিনের চেপে রাখা পাপের কথা সব ফাঁস হয়ে গেছে। জিয়ান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল, হে ঈশ্বর, উনি যেন তাদের খুঁজে না পান।

যতদূর পারল জিয়ান লক্ষ্য করতে লাগল কাউন্টকে। কাউন্ট প্রথমে সামনে কিছুটা গিয়ে ডান দিকে হঠাৎ ঘুরে ছুটতে লাগলেন। দুরন্ত কালো বাদল মেঘ ছেয়ে ফেলেছিল সমস্ত আকাশটাকে। ঝড়ের বেগটা বেড়ে ওঠায়

গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলছিল। একটু পরেই বৃষ্টি নামল। ক্ষণে ক্ষণে ঝড়জলের ঝাপটা লাগছিল কাউন্টের মুখে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। এর থেকেও প্রচণ্ড এক ঝড় বইছিল যেন কাউন্ট ফুরভিলের অন্তরে।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে সেই ভকোত্তে পাহাড়ের উপত্যকায় এসে পড়লেন কাউন্ট। খালের মধ্যে তাঁর ঘোড়াদুটো চিনতে পেরে তাদের বাঁধন কেটে দিলেন। তারপর ওদের খোঁজ করতে লাগলেন। কিছু পরে পাহাড়ের চূড়ার উপরে সেই ছোট্ট অস্থাবর কুঁড়েটার উপর নজর পড়ল তার।

ছাড়া পেয়ে ঝড়জলের মধ্যে ঘোড়াদুটো পালিয়ে গেল ছুটে। কাউন্ট ফুরভিল সেই কুঁড়েটার কাছে গিয়ে ভাবলেন জুলিয়ানরা নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে।

সহসা কি মনে হলো কাউন্টের, তাঁর দানবসুলভ প্রচণ্ড শক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে তিনি সেই কাঠের কুঁড়েটাকে ঠেলে একটা পাহাড়ের চূড়ার কিনারায় নিয়ে গেলেন। জুলিয়ানরা চীৎকার করতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারল না তার ভিতর থেকে।

কিনারায় নিয়ে গিয়ে জোর দিয়ে ঠেলে কুঁড়েটাকে ফেলে দিলেন কাউন্ট। কুঁড়েটা পাহাড়ের গা দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে পাথুরে পথের উপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

কুঁড়েটাকে ঠেলে দিয়েই ছুটে বাড়ি পালালেন কাউন্ট। এদিকে পাহাড়ের পাদদেশে ভাঙা কুঁড়েটার মাঝে জুলিয়ান আর মাদাম ফুরভিলের বিকৃত মৃতদেহদুটো দেখে চিনতে পারল চাষীরা। ভাবল ঝড়ে জলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর ঝড়ে কুঁড়েটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় পাহাড়ের চূড়া থেকে।

চাষীরা দুটো গরুর গাড়িতে করে দুটো মৃতদেহ দুই বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। জুলিয়ানের মৃতদেহটা একটা গাড়ির উপর চাপিয়ে যখন পোপ্লের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল জিয়ান। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত খাওয়ায় সেই রাত্রেই এক মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করল সে।

দুদিন প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল জিয়ান। জুলিয়ানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেনি সে। চৈতন্য ফিরে এলে দেখল লিজ মাসি আবার ফিরে এসেছে।

১১

জুলিয়ান তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তবু সে শুধু তার স্বামী নয়, তার প্রথম প্রেমের ইপ্সিত নায়ক। একদিন তাকেই তার কুমারী জীবনের সমস্ত নিষ্ঠা ও ভালবাসা দিয়ে নিবিড়ভাবে কামনা করেছিল সে। তাই তার শত

অপরাধ ও অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তার মৃত্যুতে রীতিমত আঘাত পেল জিয়ান।

কিন্তু তার ছেলেকে দেখে সব ভুলে গেল জিয়ান। পলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব দুঃখবেদনা মুহূর্তে ভুলে যেতে লাগল।

পল শুধু জিয়ানের নয়, ব্যারণ ও লিজ মাসির চোখের মণি। তিনজনেই তাকে কাছে পেতে চায় সব সময়। তিনজনেই তাকে আদর করে।

আজকাল টলবিয়াকের সঙ্গে কখনো দেখা হলেও কোন কথা বলে না জিয়ান। লিজ মাসি কিন্তু ধর্মভীরু মহিলা। তাই যাজকের অসম্মান পছন্দ করেন না তিনি। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই তিনি পলকে চার্চে নিয়ে যান।

দেখতে দেখতে দুবছর কেটে গেল। পল দশ বছরে পড়ল। কিন্তু পড়াশুনোয় তার একেবারেই মতি নেই। দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিল। ব্যারণ তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে বসেন। কিন্তু জিয়ান এসে বলে, ওকে ছেড়ে দাও বাবা, কষ্ট দিও না। ও খেলা করুক।

বারো বছর বয়সে ছেলেদের আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চে নিয়মিত নিয়ে গিয়ে কিছু নীতিশিক্ষা দিতে হয়। তাকে বলা হয় কমিউনিয়ন। লিজ মাসি এর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে জিয়ান একদিন তাঁর সঙ্গে পলকে পাঠিয়ে দিল চার্চে।

একমাস পর একদিন বিকালে পল বাড়ি এসে মাকে বলল, যাজক টলবিয়াক দুষ্টুমি করার জন্য তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই সে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

ব্যারণ বললেন, ওসব পুরনো প্রথায় আর দরকার নেই।

কিন্তু জিয়ান ব্রিসেভিলদের বাড়ি বেড়াতে গেলে ওরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, তোমার ছেলের কমিউনিয়ন অর্থাৎ প্রথম ধর্মশিক্ষার কাজ হয়ে গেছে?

কাউন্ট কুতেলিয়াররাও তাই বলত। ওরা স্পষ্ট করে জিয়ানকে একদিন বলল, যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী নয় তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা আমাদের বন্ধু নয়।

জিয়ান বলল, চার্চে না গেলে ঈশ্বর বিশ্বাস করা যায় না?

ওরা সবাই বলল, না, কখনই না।

জিয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন। বরং চার্চের যাজকরাই ঈশ্বর আর মানুষের মাঝে বাধা সৃষ্টি করেন।

গাঁয়ের চাষীরাও পলের ধর্মশিক্ষা নিয়ে কথা বলাবলি করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে চার্চে পাঠানো হয় না। ব্যারণই তাকে বাড়িতে পড়াতে থাকেন। পড়াশুনো ভালই হতে থাকে। শুধু জিয়ান এসে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করে।

পলের বয়স পনের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণ তাকে কলেজে পড়তে পাঠা-

-বার জন্য বললেন। কিন্তু জিয়ান বলল, কেন বাবা, ও যদি এখানে থেকে চাষের কাজ দেখাশোনা করে তাহলে ক্ষতি কি ?

ব্যারণ বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার মাতৃস্নেহের যূপকাষ্ঠে ওর ভবিষ্যৎকে তুমি বলি দিচ্ছ। ও যখন বড় হয়ে এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবে তোমার কাছে তখন কি উত্তর দেবে ?

জিয়ান পলকে জিজ্ঞাসা করল, তুই আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবি পল ? তুই কি এখানে থাকতে চাস না ?

পল বলল, না মা, চাইব না। আমি এখানেই থাকতে চাই।

ব্যারণ জিয়ানের কাছে বসে বললেন, ভাল করে বোঝ মা।

জিয়ান বলল, ও চলে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব বাবা ?

ব্যারণ বললেন, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ।

জিয়ান ব্যারণের গলাটা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পারল জিয়ান। ঠিক হলো অল্পকাল পরেই পলকে পাঠানো হবে হাভারের কলেজ স্কুলে।

প্রতি রবিবার বাড়ি আসত পল। কিন্তু পড়াশুনোয় সে ভাল ছিল না। তাই খুব ধীর গতিতে এগোতে লাগল পড়ার কাজ।

পর পর দুই রবিবার বাড়ি এল না পল। মাকে লিখে জানিয়ে দিল, আমি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বাইরে প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি।

পলের বয়স কুড়ি হয়ে গেছে। তবু জিয়ানের মনে হয় সে যেন এখনো তেমনি ছোট আছে। পল ফিরে এলে জিয়ান বলল, এসব কি হচ্ছে পল ?

হাসতে হাসতে পল বলল, কেন মা, আমাদের মত বয়সের ছেলেরা বেড়াতে যাবে না বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ?

জিয়ানের হঠাৎ মনে হলো পল যেন বদলে গেছে একেবারে। ব্যারণ বললেন, ওর বয়স কুড়ি হলো। এ ত খুবই স্বাভাবিক।

একদিন পোপের বাড়িতে এক সুদখোর ইহুদী মহাজন এসে একটা কাগজ দেখাল। বলল, আপনার ছেলে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে।

জিয়ান বলল, টাকার কথা আমাকে বলতে পারত।

ইহুদী বলল, এটা জুয়োখেলার ব্যাপার কি না। খেলতে খেলতে হঠাৎ দরকার হয়। টাকাটা না পেলে তার সম্মান থাকে না। তাই আমি দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম আপনি স্নেহশীলা মা।

ঘণ্টা বাজিয়ে ব্যারণকে ডেকে পাঠাল জিয়ান। ব্যারণ এসে শুনলেন পল লোকটার কাছে ধার করেছে দেড় হাজার ক্রাঁ। ব্যারণ তাকে এক হাজার ক্রাঁ দিয়ে বললেন, আর কোনদিন এদিকে আসবে না।

লোকটা চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণ ও জিয়ান হাভারে রওনা হলো কিন্তু গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে শুনল পল স্কুলে একমাস নেই। আর এজন্য সে তার ডাক্তারের সার্টিফিকেটসহ নিয়মিত মার চিঠি পাঠিয়েছে। জিয়ানরা বুঝল জাল চিঠি পাঠিয়েছে পল। কিন্তু পল কোথায়?

পুলিশের সাহায্যে পলকে খুঁজে বের করলেন ব্যারণ। জিয়ান একটা হোটেলে বিশ্রাম করছিল। পলকে শহরের একটি বেশ্যা মেয়ের কাছে পাওয়া গেল।

যাই হোক, পলকে গাড়িতে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। সারাটা পথ রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল জিয়ান। পলকে একটা কথাও বলল না। ওদিকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল পল সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিতে। যেন কিছুই হয়নি।

পরে হিসাব করে দেখা গেল পল বিভিন্ন জায়গায় যে টাকা ধার করেছে তার পরিমাণ পনের হাজার ফ্রাঁ। সে নাবালক ভেবে এখনো চুপ করে আছে অনেকে। আর একটু বড় হলেই তাকে ধরবে।

একদিন রাত্রিতে আবার পালিয়ে গেল পল। পুলিশ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এর আগে হাভারের যে বেশ্যা মেয়েটির কাছে তাকে পাওয়া গিয়েছিল সে সেখানে আর থাকে না। কোথায় চলে গিয়েছে। পরে একটি পুরনো চিঠির মাধ্যমে জানল মেয়েটি পলকে ভালবাসে এবং তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে চলে যেতে চায়। টাকার জন্যই যেতে পারেনি।

চিন্তা ভাবনায় অকালে মাথার সব চুল পেকে গেল জিয়ানের। ভাগ্যে তার এত দুঃখ ছিল তা সে ভাবতে পারেনি কোনদিন। জীবনে কোন আশাই পূরণ হলো না তার।

একদিন যাজক টলবিয়াকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেল জিয়ান। টলবিয়াক তাতে লিখেছে, মাদাম, আপনি একদিন আপনার পুত্রকে উপযুক্ত ধর্মশিক্ষার জন্য চার্চে পাঠাতে চাননি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার যে পুত্রকে নিজের আঁচলে ভরে রেখেছিলেন তাকে রাখতে পারলেন কি? সে গিয়ে পড়েছে এক বেশ্যার খপ্পরে। যাই হোক, এখনো সময় আছে। আপনি ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর আপনাকে শীঘ্রই ক্ষমা করবেন। ইতি—টলবিয়াক।

তার দুদিন পরেই প্যারিস থেকে লেখা পলের একখানা চিঠি পেল জিয়ান। দুতিন মাস ধরে পলের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে প্রাণে মরে ছিল জিয়ান। চিঠিখানা পেয়ে প্রাণ পেল সে। পল লিখেছে সে এখন তার প্রেমিকাকে নিয়ে প্যারিসেই আছে। তার প্রেমিকা তার নিজস্ব যথাসর্বস্ব বিক্রি করে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ তার জন্য খরচ করেছে। এখন তারা নিঃস্ব। এখন অবিলম্বে জিয়ান যেন পনের শো ফ্রাঁ তাকে পাঠিয়ে দেয়। তার বাবার এস্টেট

থেকে টাকাটার ব্যবস্থা করে দেবে। সে এখন বড় হয়েছে, বাবার এস্টেটের সে-ই এখন উত্তরাধিকারী। টাকাটা পেলেই সে চলে আসবে তার মার সঙ্গে দেখা করতে।

চিঠিটা নিয়ে বাড়ির সকলকে দেখাল জিয়ান। পল তাকে তাহলে ভুলে যায়নি। মার কথা মনে পড়েছে। অনেক দিন পর আবার মাতৃগর্বে ফুলে ফেঁপে খুব হৈচৈ করল জিয়ান। তারপর বাবাকে বলে টাকাটা পাঠিয়ে দিল।

ব্যারণ কিন্তু বিশেষ কোন কথা বললেন না। পলের গতিবিধি দেখে তিনি কিছু ভাল বুঝছিলেন না।

পলকে কিভাবে সেই মেয়েটার হাত থেকে বাঁচানো যায় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলো ব্যারণ, জিয়ান আর লিজঁ মাসির মধ্যে। ব্যারণ বললেন, ও লিখেছে প্যারিসে ষ্টক এক্সচেঞ্জে চাকরি করছে এবং কিছুদিনের মধ্যে এখানে একবার আসবে। ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও। ওর প্রতি আমাদের তরফ থেকে কোন দুর্বলতা দেখানো উচিত না। ও তাহলে ঠিক আসতে বাধ্য হবে।

দিনকয়েক পর একদিন সকালবেলায় আবার একখানা চিঠি এল পলের। ভয়ঙ্কর সেই চিঠির আঘাতে ওরা আঁতকে উঠল সবাই। পল লিখেছে তার মাকে, মা, যদি আমার এই ঘোর বিপদে তুমি এগিয়ে না আস তাহলে আমাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। ব্যবসা করতে গিয়ে এক ফাটকাবাজিতে আমি পঁচাশি হাজার ফ্রাঁর ঋণে পড়ে গেছি। এ অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। আমি নিজের মাথা নিজেই উড়িয়ে দেব। এতদিনে তাই দিতাম। শুধু সেই মমতাময়ী নারীই আমাকে তা করতে দেয়নি। বিদায়। এই হয়ত আমার শেষ চিঠি।

ব্যারণ হাভারে গিয়ে তার জমিজমা বন্ধক রেখে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন পলকে। তারপর প্যারিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। জিয়ানও সঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ খবর পাওয়া গেল সে লণ্ডন চলে গেছে। পল দেলামেয়ার এ্যাণ্ড কোম্পানি নামে নূতন এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে।

কিন্তু সে কোম্পানি মাসকতকের মধ্যে ফেল করল। পল পালিয়ে বেড়াতে লাগল। ব্যারণ খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন পল বর্তমানে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ঋণে ঋণী। তাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতে করতে একদিন প্রাণত্যাগ করলেন ব্যারণ। কিন্তু টলবিয়াক তাঁর মৃতদেহ চার্চের সীমানার মধ্যে ঢুকতে দিল না। বিনা ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সমাহিত হলো তাঁর মৃতদেহ।

জিয়ানের একমাত্র অবলম্বন এখন লিজঁ মাসি। ছেলের উপর আগ্রহ ক্রমশই কমে যাচ্ছিল জিয়ানের। কিন্তু তার আবাল্যের সঙ্গিনী লিজঁ মাসিও একদিন তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

লিজ মাসির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে ঘরে ফেরার সময় চল্লিশ বছর বয়সের মোটাসোটা চেহারার এক চাষী মেয়ে এসে একরকম জোর করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল জিয়ানকে। প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি জিয়ান। তাছাড়া শোকে দুঃখে জিয়ানের তখন মাথার কোন ঠিক ছিল না।

অনেক ভাল করে দেখে জিয়ান চিনতে পারল রোজালিকে। চল্লিশ বছর আগে তাদের দুজনের মধ্যে শেষ দেখা হয়। জিয়ানের মাথার সব চুল পেকে গেছে। তার মুখচোখ একেবারে ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে গেছে। তবু তাকে চিনতে পেরেছিল রোজালি। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদল। জিয়ান বলল, তুই সত্যি সুখে আছিস রোজালি, আর সারা জীবন আমি ভাগ্যের কাছে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়ে আসছি।

রোজালি বলল, মোটামুটি আমি সুখে আছি। আমার স্বামী মারা গেছে ক্ষয় রোগে। আমার আর ছেলেপুলে হয়নি। আমার সেই একটি মাত্র ছেলেই আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। এই খামার ও বিষয় সম্পত্তি সে এবার পাবে। আমি এখন থেকে তোমার কাছে থাকব। তোমাকে আমি ও বাড়িতে একা থাকতে দেব না। আমার কাজের জন্য তোমার কাছ থেকে মাইনে হিসেবে একটা পয়সাও নেব না।

১২

শুধু বাড়ির কাজকর্ম ও জিয়ানের সেবা শুশ্রূষা নয়, তার বিষয় সম্পত্তি, দায় দায়িত্ব ও সব কিছু দেখাশোনার ভার নিজের কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিল রোজালি। তার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো জিয়ান।

একদিন রোজালি তার এক নূতন পরিকল্পনার কথা বলল। বলল, আমার কথা যদি শোন তাহলে সব দেনা মিটিয়ে সব দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বছরে আট হাজার টাকার আয় থাকবে।

জিয়ান বলল, কি তোর ইচ্ছা রোজালি?

রোজালি বলল, তুমি এই পোপ্লের বাড়ি আর এর অন্তর্গত দুটো খামার বিক্রি করে দাও। তাহলে তার টাকায় তোমার চারটে লিওনার্দের খামার বন্ধক মুক্ত হবে। তার আয় হবে বছরে আট হাজার টাকা। তার মধ্যে তেরশো টাকা চাষের খরচ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জন্যে রেখে দেবে। পাঁচ হাজার টাকা সংসারে খরচ করবে। আর দু হাজার জমা থাকবে হঠাৎ কোন বিপদ আপদের জন্যে।

কিন্তু জিয়ান বলল, না কিছুতেই আমি পোপ্লে বিক্রি করব না।

রোজালি বলল, তবে একটা কথা। এই টাকা থেকে পলকে আর একটা পয়সাও দেওয়া হবে না। সব টাকা থাকবে আমার হাতে গচ্ছিত। কিভাবে সর্বস্ব বিকিয়ে গেছে ওর জন্যে আমি তা সব জানি।

জিয়ান বলল, সে যদি কখনো খেতে না পায়?

রোজালি বলল, তাহলে আমাদের কাছে সেচলে আসবে। তার খাওয়ার কখনও অভাব হবে না। তুমি শক্ত না হলে তার কখনই পরিবর্তন হবে না।

যে বাড়ির সঙ্গে তার সারাজীবনের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না জিয়ান। সারারাত ঘুম হলো না তার। কিন্তু কোন উপায় নেই। সে বিক্রি করতে না চাইলে পাওনাদাররা নীলাম করবে। তাতে কোন লাভই হবে না। উপযুক্ত দাম পাবে না।

সুতরাং রোজালির কথামতই সব কাজ করতে হলো। পাওনাদার এলে তার সঙ্গেও সব কথা হয়ে গেল। রোজালি আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল। গোদারভিলে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে সেখানে গিয়ে থাকবে ওরা। একমাসের মধ্যেই ওরা সেখানে চলে যাবে।

হঠাৎ একদিন পলের একটা চিঠি পেল। আবার টাকা পাঠাতে লিখেছে। দশ হাজার ফ্রাঁ। কিন্তু এবার আর টাকা পাঠাল না জিয়ান। তার পরিবর্তে রোজালির কথামত লিখল এক চিঠি। লিখল, প্রিয় পুত্র, আমি তোমার জন্য আর কিছুই করতে পারব না। আমি তোমার জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছি। তুমি তোমার এই বৃদ্ধা মায়ের কাছে শুধু একটুখানি আশ্রয় পেতে পার। ইতি—জিয়ান।

রোজালির ছেলে ডেনিস লেকক বেশ বড় হয়ে উঠেছে। একদিন এসে দেখা করল জিয়ানের সঙ্গে। তার বয়স এখন পঁচিশ। তার চুলটা হয়েছে তার মার মত। চেহারাটা চাষীদের ছেলেদের মত হলেও জুলিয়ানের চেহারার সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। সেটা বেশ বোঝা যায়। সে জুলিয়ানের ঔরসজাত পুত্র। পলের ভাই। তাকে চুম্বন করতে ইচ্ছা করছিল জিয়ানের। কিন্তু পারল না।

পোপ্লে থেকে মালপত্র সব ডেনিসেই নিয়ে গেল গোদারভিলের নূতন বাড়িতে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিল। কিন্তু দামী আসবাবপত্র প্রায় সবই রয়ে গেল। তার জন্য আলাদা দাম পাবে জিয়ান।

গাড়িতে ওঠার আগে অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল জিয়ান। কিছু পরে জ্ঞান ফিরে এলে গাড়িতে গিয়ে চাপল। গাড়িটা এগিয়ে গেলে আবেব টলবিয়াক গাড়ির কাছে এল। জিয়ান কিছু বলল না। রোজালির কথায় ডেনিস গাড়িটা জোরে চালিয়ে দিল আর খানিকটা কাদাজল টলবিয়াকের পোশাকের উপর গিয়ে লাগল। রোজালি তাকে গাড়ির উপর ঘুষি দেখাতে লাগল।

১৩

গোদারভিলের ছোট্ট ইটের বাড়িতে রোজালির বেশ মন টিকলেও

জিয়ানের ভাল লাগছিল না। কারণ সেখানে সমুদ্র নেই। এ বাড়ি থেকে সমুদ্র দেখা যায় না।

আসবাবপত্র বিক্রির টাকা পেল জিয়ান তিন হাজার দুশো ফ্রাঁ। এর সবটাই জিয়ান পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছিল পলকে। কিন্তু রোজালি বাধা দিল। ফলে জিয়ান মাত্র দুশো ফ্রাঁ পাঠাল।

শীত পড়তে জিয়ানের বিষণ্ণতা আরও বেড়ে গেল। সামনে ফাঁকা বড় রাস্তাটা খালি পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে এক-একটা গাড়ি চলে যায়। রাত্রিতে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে জিয়ান। সে যেন পোপের বাড়িতে শুয়ে আছে।

শীতের পর গ্রীষ্ম। তারপর আবার শরৎ। জিয়ান আর থাকতে পারল না। পলকে দেখতে চাইল। চিঠি দিল আসতে। কিন্তু পল তার উত্তরে জানাল, আসবার টাকা নেই। টাকা পাঠালে আসবে। কিন্তু টাকা পাঠালেও আসবে না ও।

অগত্যা প্যারিসে যেতে চাইল ও নিজে। রোজালিকে সঙ্গে নিতে চাইল। কিন্তু রোজালি গেল না। কারণ তাতে খরচ হবে। রোজালি বলল, আমি তোমাকে তিনশো টাকার বেশী দেব না। ওখানে যাবার পর দরকার হলে আমাকে লিখবে। গোদারভিলের মহাজন পাঠিয়ে দেবে। তোমার কাছে টাকা থাকলে পল সব নিয়ে নেবে।

রোজালি স্টেশনে গিয়ে ট্রেণে চাপিয়ে দিল জিয়ানকে। জিয়ান একাই প্যারিসে গেল। একটা হোটেলে গিয়ে প্রথমে উঠল। রাতটা কোনরকমে হোটেলে কাটাল জিয়ান। কিন্তু ঘুমোতে পারল না। পাড়াগাঁয়ে থাকা অভ্যাস। রাত্রিবেলায় যে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে গ্রামে সে নিস্তব্ধতার শহরে সারারাতের মধ্যে একবারও নেমে আসে না। কিছু না কিছু শব্দ থেকে যায়। জিয়ানের প্রায়ই মনে হতে লাগল সে শব্দের একটা চাপা ঢেউ তার হোটেলের দেয়াল ভেদ করে ঘরে এসে ঢুকছে।

পরদিন সকালে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পলের খোঁজ করতে গিয়ে জানল তারা দিনকতক আগে এখান থেকে চলে গেছে। কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

জিয়ান থানায় গিয়ে পলের খোঁজ করল। কিন্তু সেখানেও কোন ফল হলো না।

হোটেলে হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই কয়েকজন পাওনাদার এল। জিয়ান পলের যে ঠিকানায় খোঁজ করতে গিয়েছিল এই সব পাওনাদাররা সেখানে যায়। সেখানেই জিয়ানের আসার খবর পায়।

জিয়ান তাদের কথামত নব্বই ফ্রাঁ বার করে দিল। পরদিন আবার পাওনাদার এল। মাত্র কুড়িটা ফ্রাঁ কাছে রেখে সব দিয়ে দিল জিয়ান। পলের দেখা আর পেল না। অবশেষে রোজালিকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিল।

দিনকতক পর রোজালি তাকে তুশো ফ্রাঁ পাঠিয়ে একটি চিঠিতে জানাল তুমি চলে এস এখানে। আমি প্যারিসে নিজে গিয়ে পলের খোঁজ করব, আর আর টাকা পাঠাব না। তুমি চলে এস।

সত্যিই জিয়ানেরও আর ভাল লাগছিল না প্যারিসে। সেই নির্জন যে গ্রাম্য বাড়িটাকে দিনকতক আগে তার খারাপ লাগত আজ সেখানে ফেরার জন্যই মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

১৪

তার বসার ঘরের আগুনের পাশে একটা চেয়ারে প্রায় সারাদিন একা একা বসে থাকে জিয়ান। কিছুটা তুঃখে বিষাদে কিছুটা বার্ধক্যে ঝিমোতে থাকে। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে দিবাস্বপ্নের ঘোরে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে আপন মনে বলে ওঠে, পল, এলি রে? মাঝে মাঝে একবার করে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বড় ফাঁকা রাস্তাটার পানে তাকায়।

আজকাল প্রায়ই ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জিয়ান রোজালিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, জীবনে আমি কিছুই পেলাম না। আমার ভাগ্যটা এতই খারাপ।

রোজালি তখন তাকে বোঝায়, একবার ভেবে দেখ দেখি সেই সব গরীব মেয়েদের কথা যাদের বড় হওয়ার পর থেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে খেতে হয়। কেউ দেখার না থাকার জন্য যাদের বুড়ো বয়সে ভিক্ষে করতে হয়। তাদের তুলনায় তুমি অনেক পেয়েছ।

জিয়ান বলল, আমার ছেলে যদি আমাকে না দেখে?

রোজালি বলল, মনে ভাববে তোমার ছেলে মরে গেছে।

একদিন সকালে কফি খাবার পর রোজালি জিয়ানকে পোপ্লের বাড়ি দিয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল।

বাড়ির নতুন মালিক ছিল না। রোজালি চাবি খুলে দিল। গোটা বাড়িটা যেন জিয়ানের কাছে অতীত স্মৃতির এক বিশাল কবরখানা। কত ঘটনার কঙ্কাল সমাহিত হয়ে আছে তার এক-একটি ঘরে।

বাড়িটা ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল জিয়ানের। এক তীব্র যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছিল বুকটা।

গোদারভিলের সেই ছোট্ট বাড়িটায় ফিরে এসে দরজার কাছে একটা সাদা খামের চিঠি পেল জিয়ান। চিঠিটা পলের। খুলে দেখল পল লিখেছে সেই মেয়েটি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। সে আর বাঁচবে না। যদি তুমি আমার এই সন্তানটার ভার নিতে পার তাহলে ভাল হয়। কারণ আমার হাতে টাকা নেই। কোন ধাত্রীর কাছে তাকে রাখতে পারব না।

চিঠি পড়ে রোজালি বলল, আমি গিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসব। তার আগে মেয়েটার সঙ্গে পলের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দেওয়া উচিত। তা নাহলে ওর সন্তানের কি পরিচয় হবে?

সহসা এক প্রবল আনন্দের উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল জিয়ানের সারা অঙ্গ। দেহেতে যেন প্রচুর শক্তি ফিরে পেল। তাহলে সেই মেয়েটা যে এতদিন পলকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিল সে মরছে? পল তাহলে এবার তার কাছে ফিরে আসবে?

সেই রাত্রিতেই প্যারিসে চলে গেল রোজালি। জিয়ান রয়ে গেল। দুদিন পরেই ফিরে আসবে রোজালি।

দুটো দিন অধীর আগ্রহে কাটাল জিয়ান। তৃতীয় দিনে রোজালির চিঠি পেল। আগামী কাল বিকালে আসছে।

বিকাল হবার আগেই স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিয়ান। প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে লাগল। ট্রেণটা কিছু দেরীতে এল। জিয়ান দেখল রোজালি ট্রেণ থেকে নামছে। তার হাতে কাপড়ে জড়ানো কি একটা বস্তু রয়েছে।

রোজালি নেমে বলল, মেয়েটা গতকাল রাতে মারা গেছে। ওদের বিয়ে আগেই হয়েছিল। এই তার সন্তান। পল আগামীকাল এই সময় আসছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে।

রোজালির হাত থেকে কাঁথা-জড়ানো ছেলেটাকে নিজের কোলে তুলে নিল জিয়ান। কাপড়গুলো সরিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে। তাকে চুম্বন করল। নবজাত শিশুটার রক্তলাল নরম তুলতুলে দেহটার মধ্যে যে একটু ক্ষীণ উত্তাপ ছিল তা যেন জিয়ানের বার্ধক্যশীতল দেহটা ভেদ করে তার অস্থিমজ্জাগুলোকে উত্তপ্ত করে তুলল। সে উত্তাপের মাঝে জীবনের এক আদিম অকৃত্রিম উত্তেজনা আর অসীম আনন্দের উৎস খুঁজে পেল জিয়ান।

রোজালি কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল, ছেলেটা কাঁদবে, তোমার ও কি আদর হচ্ছে?

জিয়ান আপন মনে বলে উঠল, জীবনকে আমরা যতখানি ভাল বা যত-খানি খারাপ ভাবি ততখানি ভাল বা খারাপ নয়।

এ হৃদয় তোমার আমার
(Our Hearts)
প্রথম পর্ব
১

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মাসিভাল একদিন তার বন্ধু আঁদ্রে মেরিওলকে বলল, তুমি এখনো মাদাম মাইকেল দ্য বার্নের সঙ্গে পরিচয় করনি কেন? আমি বলছি শোন, বর্তমানে প্যারিসের মধ্যে সে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মহিলা।

মেরিওল বলল, সে যে জগতের মানুষ আমার সে জগৎ ভাল লাগে না।

মাসিভাল বলল, তুমি ভুল করছ। মহিলাটি সত্যিই ভাল এবং উন্নত রুচি-সম্পন্না। যে-কোন নূতন রীতিনীতির সঙ্গে সে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে চলে নিজেকে। তুমি গেলে সে খুশি হবে কারণ তোমার কথা সেখানে আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া সে মনে করে তুমি সত্যিই আলাপ করার উপযুক্ত লোক। অথচ তুমি সেখানে যেতে চাও না।

কথাটা শুনে খুশি হলো মেরিওল। ভাবল, এ আমন্ত্রণ নিশ্চয় মাদাম বার্নে জানিয়েছেন মাসিভালের মাধ্যমে। তবু উপরে কিছুটা কঠোরতার ভাণ করে প্রতিরোধদানের ভঙ্গীতে বলল, এসব আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু তার মুখের উপর যে প্রসন্নতা ও সম্মতির ভাব ছিল তার সঙ্গে কণ্ঠ-নিহিত কৃত্রিম ঘৃণার কোন সঙ্গতি ছিল না।

মাসিভাল বলে চলল, আমি কি একদিন তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব? অবশ্য এর আগে আমাদের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছ। সত্যিই সে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী, বছর আটাশ বয়স। একবার বিয়ে করে অসুখী হওয়ার জন্য আর বিয়ে করবে না। তোমাকে নিয়ে গেলে সত্যিই সে খুশি হবে।

অবশেষে রাজী হয়ে গেল মেরিওল। বলল, ঠিক আছে, একদিন চল।

পরের সপ্তার প্রথম দিকে একদিন মাসিভাল মেরিওলের কাছে এসে বলল, আগামীকাল সন্ধ্যায় তোমার সময় হবে?

মেরিওল বলল, হ্যাঁ হবে, আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই।

মেরিওলের হাতে একটা চিঠি দিয়ে মাসিভাল বলল, বার্নে তোমায় একটা চিঠি দিয়েছে।

মেরিওল বলল, তাহলে ওই কথা রইল।

আঁদ্রে মেরিওলের বয়স সাঁইত্রিশ; অবিবাহিত। সে কোন চাকরি ও

কাজ কারবার করে না। হাতে প্রচুর টাকা আছে। স্বভাবের দিক থেকে খামখেয়ালী। ইচ্ছামত ভ্রমণ করে বেড়ায় আর কোন ছবি ভাল থাকলে কিনে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে। তার বুদ্ধি, প্রতিভা ও যোগ্যতা আছে। কিন্তু কোন একটা বিশেষ বিষয়কে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে না। জীবনে কোন অভাব অনটন না থাকায় তার প্রয়োজনও হয়নি। সে ভ্রমণের উপর একখানা বই লিখেছে আর বেহাল বাজনার উপরেও একখানা আলোচনার বই লিখেছে। আর একটা প্রবন্ধের বই লিখেছে ভাস্কর্যের উপরে। সে ভাল ঘোড়ায় চাপতে পারে। তার বন্ধুরা তাকে ভালবাসে। কারণ সে বন্ধু হিসাবে যেমন বিশ্বস্ত তেমনি নির্ভরযোগ্য। তার দেহ সুন্দর ও সুগঠিত, উচ্চতা স্বাভাবিক। মুখে অল্প একফালি কালো দাড়ি আছে।

মেরিওলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আছে কয়েকজন শিল্পী, গ্যাস্তন লামার্থে নামে একজন ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতশিল্পী মাসিভাল, চিত্রকর জোবিন আর বিভোনেল। এরা সবাই মেরিওলের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করত

কিন্তু মেরিওলের পরিচয়ের পরিধিটা খুব ছোট ছিল না তবে পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া কোথাও সে যেতেই চাইত না। বার্নের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হয়েছিল এই কারণে যে তার ঘনিষ্ঠ সব বন্ধুরা চাপ দিচ্ছিল তার জন্য।

মাদাম বার্নে থাকত সেন্ট অগাস্তিনের পিছনে র‍্যু ফয় নামে এক জায়গায় একটা সুন্দর দোতলা ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটায় মোট চারখানা ঘর ছিল। সামনের দিকে রাস্তার দিকে দুখানা—একখানা খাবার আর একখানা শোবার ঘর। পিছনের দিকে একটা বাগান ছিল। বাগানের দিকে দুটো ঘরের বড় ঘরটা বসার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত।

দামী আসবাবপত্র দিয়ে বার্নের ঘরগুলো চমৎকারভাবে সাজানো। সত্যিই রুচি আছে তার। বার্নে মনে করে মানুষের অবয়ব সংস্থানের মত যে কোন গৃহসৌন্দর্যের একটা আবেদন আছে। এমন অনেক ঘর আছে যার আসবাবপত্রের সংস্থানে এমন এক শৃংখলা সংযোজনের ভাব আছে যা যে-কোন আগন্তুককে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে। সে ঘর ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। আবার অনেক ঘর আছে যার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে।

যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, যাকে নিয়ে সে পাঁচ বছর ঘর করতে বাধ্য হয়েছিল সে ছিল আস্ত একটা শয়তান। ভিতরে লোকটা ছিল কত বড় বদমাশ বাইরে থেকে দেখে তা বোঝাই যেত না। সে ছিল বদমেজাজী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে তার সব কথা শুনতে বাধ্য করত বার্নেকে।

তবে যাই হোক, মাত্র পাঁচ বছরের বেশী স্বামীর অত্যাচার সহ্য

করতে হয়নি বার্নেকে। পাঁচ বছর পর হঠাৎ অসুখে একদিন মারা যায় লোকটা আর সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে বার্নে।

তার স্বামীর কিছু শিল্পী বন্ধু ছিল। তার স্বামী বেঁচে থাকাকালে তারা যখন বাড়িতে আসত, স্বামীর ভয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলাপ পরিচয় করতে পারেনি বার্নে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্যই তাদের একদিন নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে। সে নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যারা আসে সেদিন বার্নের বাসায় তারা সেদিন বার্নের শিল্পানুরাগী মন আর রসবোধের পরিচয় পেয়ে তার মিষ্টি আচরণ দেখে অবাক হয়ে যায়।

বার্নের বাবা মঁসিয়ে দ্য প্রাদোঁ থাকতেন তারই নিচের তলার ফ্ল্যাটে। তিনি মেয়েকে সমীহ করে চলতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মাদাম বার্নের ফ্ল্যাটে প্যারিসের শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের যত সব গণ্যমান্য লোকদের যে ভোজসভা হত তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন প্রাদোঁ। চিত্রকর, অভিনেতা কবি, সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী সকলেই ভিড় করত সেই ভোজসভায়। জনপ্রিয়তা বা নামযশ অর্জনের আগে মাদাম বার্নের আশীর্বাদ লাভ ছিল যেন তাদের শিল্পীজীবনের পরম কাম্য ব্যাপার। শুধু কাম্য নয় অতি প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। মাদাম বার্নের আশীর্বাদধন্য না হলে কেউ যেন প্যারিস শহরে নাম করতে পারবে না শিল্প সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে।

বার্নের স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল অপরিসীম। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, অনেকেই তাকে প্রণয়িনী হিসাবে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ সফল হতে পারেনি আজও। সকলের সঙ্গে সমান সদ্ব্যবহার করে চলে বার্নে। কিন্তু কারো প্রতি কোন বিশেষ আসক্তি দেখায় না বার্নে। অনেকে তার এই অনাসক্তির জন্যে ভাবত তার মৃত স্বামীর অসদ্ব্যবহার এর জন্য দায়ী। প্রথম পরিচয়ের সেই শোচনীয় ব্যর্থতা বার্নের মধ্যে এনে দিয়েছে প্রেম পরিণয় সম্বন্ধে এক বিরাট বিতৃষ্ণা।

বার্নের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মাত্র চার পাঁচজন। তাঁরা হলেন, ম্যাসিভাল, লামার্থে, ফ্রোসলেন আর তরুণ দার্শনিক মঁসিয়ে দ্য মালত্রি।

এঁদের মধ্যে মাদাম বার্নেকে নিয়ে প্রায়ই কথা হত। তর্ক বিতর্ক হত। একদিন দার্শনিক মালত্রি বললেন, একদিন সময় আসবেই। এই ধরনের কড়া মেয়েরা একদিন মাথা নত করবেই। এখন যত কঠোরতা দেখাচ্ছে তখন তত দুর্বলতা দেখাবে।

ঔপন্যাসিক লামার্থে কিন্তু অন্য কথা ভাবেন। তিনি বলেন, এক ধরনের মেয়ে আছে যাদের মধ্যে কিছু যুক্তিবোধ থাকলেও যাদের মানসিকতা বিকৃত এবং অস্বাভাবিক। সে বিকৃতি কখনই সারে না ঠিকমত।

আবার বার্নের অন্যান্য বন্ধুদের মত সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল ম্যাসিভাল আর ঔপন্যাসিক লামার্থে। এদের পরিহাসরসিক কথাবার্তায় সবচেয়ে বেশী ভীত

হত বার্নে। তবু বার্নে প্রকাশ্যে এদের উপর কোনদিন কোন বিশেষ প্রীতি বা আসক্তি দেখাত না। ফলে বার্নেকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে চলত এক অঘোষিত ঈর্ষার লড়াই। তারা অন্য কোন নূতন লোককে বার্নের কাছে আসতে দিত না। বার্নের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দিত না।

তবু মাসিভাল একদিন মেরিওলকে বার্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এল তার কাছে।

চাকরে বার্নের কাছে যখন মাসিভাল ও মেরিওলের নাম ঘোষণা করল তখন তার ঘরে ছিল তার তিনজন বন্ধু। তারা একটা ছবির অ্যালবাম দেখছিল আর তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করছিল লামার্থে।

প্রথম দর্শনেই বার্নেকে দেখে মনে হলো মেরিওলের বেশ বুদ্ধিমতী। এক-তাল জলন্ত আগুন। বার্নের গায়ের রঙটা যেমন ফর্সা তেমনি চুলগুলো লালচে আর কোঁকড়ানো। তার নাক আর গালদুটো খুব সুন্দর। চোখদুটো খুব নীল আর তার তারা দুটো খুব কালো। সে তারা প্রায়ই ঘোরে এদিকে ওদিকে। সে চোখের দৃষ্টির মধ্যে আছে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, আছে ক্ষণপ্রণয়ের ছলনাসুলভ এক মাদকতার আভাস।

উঠে এগিয়ে গিয়ে বার্নে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল মেরিওলের দিকে। হাসিমুখে বলল, আমি আমার বন্ধুদের কতদিন বলেছি তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি।

বার্নে প্রথমে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মেরিওলের। মেরি-ওলের সঙ্গে গম্ভীরভাবে করমর্দন করলেন তার বাবা।

মাসিভাল ঘরে ঢুকে বার্নের হাতটা চুম্বন করল আলতোভাবে। বলল, আমাদের আসতে কি দেরী হয়ে গেছে?

বার্নে বলল, না। আমি এখন ব্যারণ দ্য গ্রেভিল আর মার্কুই দ্য ব্রেতেনের জন্যে অপেক্ষা করছি।

মাসিভাল বলল, মার্কুই? তাহলে আজ রাতে নিশ্চয় গানের ব্যবস্থা হবে।

ফ্রেসনেল তখন কথা বলছিল কাউন্ট মারাতি'র সঙ্গে। তার চেহারা খুব মোটা।

ফ্রেসনেল আজকাল বার্নের বাড়িতে প্রায়ই আসে দেখে অন্যান্য বন্ধুরা রাগ করত। চাপা অসন্তোষ আর প্রতিবাদের গুঞ্জন তুলত। তখন একদিন বার্নে জোর গলায় সকলের সামনে বলেছিল, হ্যাঁ আমি তাকে পছন্দ করি লোকে যেমন গোলগাল একটা পুষি বেড়ালকে পছন্দ করে। তাতে হয়েছে কি?

ব্যারণ দ্য গ্রেভিল আর মার্কুই দ্য ব্রেতেন এসে গেল। মার্কুই-এর চেহারা খুব বেঁটে ধরনের আর ব্যারণ গ্রেভিলের শুধু মাথাটা খুব মোটা।

চাকর এসে ঘোষণা করল খাবার ঘরে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

বার্নের নূতন অতিথি মেরিওলের হাত ধরে অন্য সবাইকে তার আগে আগে যেতে বলল। অন্য সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেলে মাদাম বার্নে একবার তার চকিত দৃষ্টি ছড়িয়ে আপাদমস্তক দেখে নিল মেরিওলের। আর সে দৃষ্টি দেখে মেরিওলের মনে হলো, সাধারণত কোন সুন্দরী নারী প্রথম পরিচয়ের দিনে কোন নূতন অতিথি বা আগন্তুকের উপর যে তরল কৌতূহলসিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার থেকে অনেক গভীর দৃষ্টি। অনেক অর্থবহ।

টেবিলে খাবার দেওয়া হলো। কিন্তু আজকের ভোজসভা তেমন জমল না। কারণ যে অন্যদিন ভোজসভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কথাবার্তায় হাসায় সেই লামার্থের শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে মাসিভাল পিয়ানোতে গিয়ে বসল। বিষণ্ণ মুখে এলোমেলোভাবে কিছু সুর বাজাতে লাগল। বার্নে বেশ কিছুটা উৎসাহ প্রকাশ করল। এরপর মার্কুই মাসিভালের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে গান শুরু করল। তার গলাটা বড় মিষ্টি।

পিয়ানোর কাছে এসে তার গা ঘেঁষে বসল বার্নে। মাসিভালের মুখপানে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল। মাসিভালের চুলগুলো লম্বা। সে যখন গাইতে বসে তখন তাকে এমনি গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখায়। লোকে বলে অনেক মেয়েই তাকে ভালবাসে।

বার্নে যখন মেরিওলের পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে এর আগে তাকাচ্ছিল তখন তা লক্ষ্য করে মাসিভাল।

সহসা বার্নে বলল মেরিওলকে, আপনার নিশ্চয় এ সব ভাল লাগছে না। কারণ কখনো এ পরিবেশে অভ্যস্ত নন আপনি।

বিনয়ের সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করল মেরিওল। মেরিওলের কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে তার পাশে বসল বার্নে। দুজনে কথা বলতে লাগল। মনে হলো তাদের দুজনের মতামতের অনেক কথাই জানা আছে দুজনের।

সে সব কথা ভাল লাগছিল মেরিওলের। কৌশলে তার মনকে আয়ত্ত করার জন্য বার্নে যে সব কথা বলছিল সে কথার জালে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছিল মেরিওল। বার্নে একসময় বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে সত্যিই আমার খুব ভাল লাগছে। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ওরা আমাকে আপনার কথা বলে।

মেরিওল বলল, ওরা আমাকেও বলে যে আপনি—

বার্নে মেরিওলের কথাটা শেষ না হতেই বলল, আমি একজন চটুল প্রেমাভিনেত্রী। তাই নয় কি? সত্যিই আমি তাই। যাদের আমার চোখে ভাল লাগে তাদের সঙ্গেও প্রেমের অভিনয় করতে হয়। যেহেতু আমি সকলের বন্ধুত্বই চাই, যারা আমার কাছে বন্ধু হয়ে একবার আসে আমি তাদের বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, সেইহেতু সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করে যেতে

হয় আমায়, আসক্তি অনাসক্তির ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে হয় আমায়।

বার্নের এই কথাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো মেরিওলের কাছে। কারণ তার মনে হলো এ কথার মাধ্যমে বার্নে যেন তাকে শিক্ষা দিতে চাইছে। বলতে চাইছে আমাকে ভুল বুঝো না, ভুল করে বসো না। যা আমি সবাইকে দিই তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকেও; তার বেশী কিছু দিতে পারব না তোমাকে।

মেরিওল একসময় বলল, আমি এই ধরনের খাড়াখাড়ি ব্যবহার ভালবাসি।

মেরিওল আগে একবার বলেছিল বার্নেকে, যে সব মহলে তার যাওয়া-আসা আছে সেখানে তাঁর কথা আগেই অনেক শুনেছে। এ কথায় বার্নের কৌতূহল জেগে ওঠে। সে জানতে চায় সেসব কথা কি। কারাই বা সে সব কথা বলে। মেরিওলের মুখ থেকে আরও অনেক কিছু জানতে চাইল বার্নে।

মেরিওল লোকমুখে শোনা বার্নের এক আশ্চর্য ভাবমূর্তি খাড়া করল। সে বলল, বার্নে হচ্ছে এমনই একজন স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনী বুদ্ধিমতী নারী যে দেশের প্রখ্যাত লোকদের দ্বারা পরিবৃত থেকেও অবিচলিতচিত্ত রয়ে গেছে। তার উপর বার্নের শিল্পানুরাগ অতুলনীয়। নারীদের মধ্যে এ অনুরাগ দেখাই যায় না।

বার্নে একসময় বলল, আমি শিল্প ও শিল্পীদের যথার্থ ভালবাসি কিনা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

মেরিওল বলল, আপনি শিল্প ভাল না বাসলে শিল্পীদের এভাবে শ্রদ্ধা করতে পারতেন না।

বার্নে বলল, কিন্তু এমনও ত হতে পারে তারা বাস্তব জগতের সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী আনন্দদায়ক বলেই তাদের আমি পছন্দ করি।

মেরিওল বলল, তা অবশ্য বটে, কিন্তু তাদের দোষগুলোও বড় বিরক্তিকর।

বার্নে বলল, সেটা ঠিক কথা।

মেরিওল বলল, আপনি গান ভালবাসেন না?

বার্নে গম্ভীরভাবে বলল, আমি গানের পুজো করি। আমি জীবনের সব-কিছু থেকে গানকে ভালবাসি। কিন্তু মাসিভাল বলে আমি নাকি গানের কিছু বুঝি না।

মেরিওল বলল, সে আপনাকে নিজে একথা বলেছে?

বার্নে বলল, না, তবে এটা তার মনের কথা। সে এটা মনে ভাবে। তবু সে এখানে গান করে কারণ সে মনে ভাবে আমি সুন্দর আর সে ত মুখে স্পষ্ট বলে, আমার এই বাসায় যে গান শোনা যায় সে গান প্যারিসের অন্য কোথাও

শোনা যায় না।

মেরিওল বলল, এটা অবশ্য সত্যি কথা। এজন্য তাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনি সাহিত্য ভালবাসেন?

বার্নে বলল, সাহিত্য আমি খুব ভালবাসি এবং আমার ত মনে হয় আমি সাহিত্য ভাল বুঝিও। অবশ্য এটা দুঃসাহস বলতে পারেন। লামার্থে যাই বলুক আমি সাহিত্য কিছু বুঝি।

মেরিওল বলল, উনিও কি মনে ভাবেন যে আপনি সাহিত্য বোঝেন না?

বার্নে বলল, হ্যাঁ, ও ত একদিন আমাকে বলল, আমি হয়ত কোন সাহিত্য-বর্ণিত বিশেষ কোন একটা চরিত্র বা ঘটনা বুঝতে পারি, কিন্তু সব মিলিয়ে সাহিত্যের যে সামগ্রিক আবেদন তা বোঝার সাধ্য আমার নেই।

মেরিওল বলল, আপনি কি ভাবেন বলুন ত? সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কি মাদাম বার্নে?

কিছুক্ষণ ভেবে বার্নে বলল, আমার মনে হয় মেয়েরাও সাহিত্য বুঝতে পারে, কিন্তু সেই উপলব্ধিটা বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না। আমার কথাটা বুঝতে পারলেন?

মেরিওল বলল, না, ঠিক বুঝলাম না।

বার্নে বলল, আমি বলতে চাইছি যে আমরা মেয়েরা বড় ভাবপ্রবণ। যদি কোন বুদ্ধিগত ও ভাবগত বিষয় আমাদের বোঝাতে চান তাহলে প্রথমে আমাদের মৌল নারীসত্তা অর্থাৎ যেখানে আমরা নারী সেইখানে আবেদন জানাতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি আমরা একমাত্র তখনি এক বুদ্ধিগত কৌতূহল অনুভব করি যখন কোন মানুষ আবেগের সঙ্গে সেকথা বলতে থাকেন। অবশ্য আমি বলছি না সে মানুষকে আমাদের ভালবাসার জন হতে হবে। যদি কোন লোক আমাদের ভালবাসতে চায় বা আমাদের মনে নিজেকে ভাল লাগাতে চায় তাহলে তার বুদ্ধির পরিধির মধ্যে যা যা আছে সব আমাদের বোঝাতে হবে তাকে। সব কিছুর গভীরে নিয়ে যেতে হবে আমাদের মনকে। কারণ আমরা বেশীদিন কোন জিনিস মনে রাখতে পারি না। আমরা বড় ভুলে যাই। আমাদের মন বড় ক্ষণচপল, বড় পরিবর্তনশীল।

মেরিওল প্রশ্ন করল, আপনি কি মনে করেন বেশীর ভাগ বুদ্ধিমতী মহিলাই এই ধরনের মানসপ্রকৃতির অধিকারিণী?

হ্যাঁ। বার্নে জোর দিয়ে বলল, তবে হয় তারা তা জানে না, অথবা তা স্বীকার করে না।

মেরিওল বলল, আপনি তাহলে সব থেকে গানই ভালবাসেন অন্তরের সঙ্গে?

বার্নে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু এইখানেও সেই এক কথা। গান আমার

ভাল লাগে এই কারণে যে মাসিভালের মত লোক এই গান কি জিনিস তা আমায় হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। মাসিভালের মাধ্যমে এবং মধ্যস্থতাতেই গানকে এতখানি ভালবাসতে শিখেছি আমি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিবাহিত।

বার্নের শেষের কথাটার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল যাতে করে সে নারীদের শিল্পানুরাগ সম্বন্ধে তার একটু আগে বলা তত্ত্বকথাটাকে আরও প্রকট করে তুলল। আত্মভাবের রং রস দিয়ে সেই নীরস কথাটাকে আরও গ্রহণীয় ও বরণীয় করে তুলল।

গানের জগতে নাম করার আগেই বিয়ে করে মাসিভাল। কিন্তু তার স্ত্রীর কথা বড় একটা বলে না কোথাও। তার তিনটি সন্তান আছে তাও সে বিশেষ কাউকে বলে না।

মেরিওল হাসতে লাগল। বার্নের কথা শুনতে সত্যিই তার খুব ভাল লাগছিল। বার্নে যেমন দেখতে সুন্দরী, তেমনি তার কথাও বড় সুন্দর। সত্যিই একটা যেন অসাধারণত্ব আছে তার দেহে মনে।

বার্নে বলল, এক কাপ চা খাবেন?

মেরিওল বলল, হ্যাঁ খাব।

তখন নিজেই উঠে গেল বার্নে। মেরিওলের চায়ের ব্যবস্থা করে সে উপস্থিত সকল বন্ধু বান্ধবদের কাছে গিয়ে সকলকেই সঙ্গদান করতে লাগল।

লামার্থে একসময় চায়ের কাপ হাতে উঠে এসে মেরিওলকে বলল, চল, যাবে এখন? তাহলে একসঙ্গে যাই।

মেরিওল বলল, ঠিক আছে।

তাহলে এখনই চল। আমার বড় ক্লান্তি লাগছে।

এখনি? চল তাহলে। চলে এস।

লামার্থে ও মেরিওল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। পথে নেমে লামার্থে বলল, তুমি কি এখন বাড়ি যাবে না, ক্লাবে যাবে?

মেরিওল বলল, খেলার ক্লাবে? না আমার মোটেই ভাল লাগে না ওখানে। তার চেয়ে তুমি যেখানে যাবে আমি সেইখানে যাব তোমার সঙ্গে।

হাত ধরাধরি করে সেণ্ট অগাস্তিনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। কিছুদূর গিয়ে মেরিওল বলল, ভদ্রমহিলা কী চমৎকার। অথচ তোমরা ওর সম্বন্ধে কত কীই না ভাব।

লামার্থে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। দমকা হাওয়ার মত ফেটে পড়ল সে হাসিতে। বলল, এই শুরু হলো। সেই এক সমস্যা। তুমিও আমাদের সকলের মতই হয়ে উঠবে। আমি অবশ্য এখন সে রোগটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কিন্তু একদিন আমাকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে সে রোগে। রোগটা কি জান? রোগটা এই যে তার বন্ধুরা কখনো কোথাও দুজনে মিলিত হলেই

তারা শুধু তার কথা বলবে। আর কোন কথাই ভাবতে বা বলতে পারবে না।

মেরিওল বলল, আমার ক্ষেত্রে এই প্রথম। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে এখন একথা বলা খুবই স্বাভাবিক।

লামার্থে বলল, ঠিক আছে। ক্রমে তুমিও ওকে ভালবাসবে। এটা হচ্ছে নিয়তি।

মেরিওল বলল, ভদ্রমহিলার আবেদন কি এতই অপরিহার্য?

লামার্থে বলল, হ্যাঁ। দার্শনিক মালাত্রি পর্যন্ত ওকে ভালবাসে এবং তার প্রতিও বার্নের একটা দুর্বলতা আছে। আমার মনে হয় আমাদের থেকে মালত্রি ফ্রেসনেল ওকে আরো গভীরভাবে ভালবাসে। আর মেয়েরা সেইটাই চায়।

লামার্থে বলল, শুধু একা বার্নে নয়। ওর মত অনেক মেয়ে আছে।

বার্নে সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলল লামার্থে। কথা বলতে বলতে ওরা ভুলে গেল ওদের পথের দূরত্ব। আর্ক দ্য ত্রিওর কাছে এসে লামার্থে তার হাতঘড়িটা দেখে বলল, একি, আমরা বার্নের কথা বলেছি এক ঘণ্টা দশ মিনিট, আজকের মত এই থাক। পরে আবার হবে। আজ শোওগে যাও।

২

ঘরটা ছিল যেমন প্রশস্ত তেমনি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। দামী আসবাবপত্রে ভরা ঘরখানা। সে ঘরের তিনটে টেবিলে সাজানো আছে কোন এক সৌখীন নারীর যত সব প্রসাধনদ্রব্য। ঘরে ঢুকতেই সামনে ড্রেসিং টেবিল সংলগ্ন এক বিরাট আয়না। দেখলেই মনে হয় সামনে একটা লিবার্থ দিগন্ত খোলা পড়ে আছে। একটি টেবিলে কিছু চিঠিপত্র ও লেখার সরঞ্জাম।

স্নান সেরে একটা লম্বা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কি ভাবছিল বার্নে। সহসা দরজায় টোকা দিয়ে তার ঝি ঘরে ঢুকল। তার হাতে একখানি খামের চিঠি দিল। বার্নে বলল, তুমি এখন যাও, ঘণ্টাখানেক পরে তোমায় ডাকব।

বার্নে দেখল চিঠিটা মেরিওলের। এক ছত্র পড়েই নামিয়ে রাখল চিঠিটা। চিঠির প্রথম ছত্রে মাত্র কয়েকটা কথা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল আত্মগর্বের একফালি হাসি। এ চিঠিতে মেরিওল জানিয়েছে তার প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালবাসা আর আত্মসমর্পণের কথা।

তিনটি মাস ধরে এক নীরব দ্বন্দ্ব চলে আসছিল দুজনের মধ্যে। মাদাম বার্নের সুন্দর দেহের অপ্রতিরোধ্য আবেদনের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে মেরিওল। কিন্তু কথাবার্তা হাবভাব ও ইঙ্গিত ইশারার মাধ্যমে ছলনার যে জাল ধীরে ধীরে তার চারদিকে বিস্তার করেছিল বার্নে তাতে শেষ পর্যন্ত ধরা না দিয়ে পারেনি মেরিওল।

বার্নের মনে হলো এ যেন যুদ্ধজয়ের কাহিনী। এ জয়ের মধ্যে গৌরব আছে। আছে গর্বের কারণ। এই গর্ব ও গৌরবেই তৃপ্ত বার্নে। তার বিবাহিত জীবনে তার অভদ্র স্বামীর কাছ থেকে যে অপমান পেয়েছে বার্নে আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ সে নিতে চায় যেন অসংখ্য পুরুষের উপরে। একজন পুরুষের কাছ থেকে অবিচার পাওয়ার জন্য তার প্রতিকারস্বরূপ সে অসংখ্য পুরুষের অন্তর এইভাবে শিকার করে চলেছে যেন একের পর এক করে। এই ধরনের একটা বাসনা তার সেই অসুখী বিবাহিত জীবনে মনে মনে পোষণ করত বার্নে। ভাবত যদি কোনদিন সুযোগ পায় তাহলে এর শোধ সে নেবে।

অথচ কোন পুরুষকে সে অখণ্ড অন্তরে ভালবাসতে চায় না অথবা তার ভালবাসা চায়ও না। সে শুধু তার আত্মাকে বশীভূত করে। তাদের মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেই আনন্দ পায়। এই জন্য তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে যারা তার কাছে নিয়মিত আসে তাদের মধ্যে ফ্রেসনেল তার সবচেয়ে প্রিয়। কারণ ফ্রেসনেল তার সবচেয়ে বশংবদ। তার প্রতি ফ্রেসনেলের আত্মসমর্পণ সবচেয়ে অকুণ্ঠ আর নিঃশেষিত। প্রথম দর্শনেই যাদের ভাল লাগে বার্নের চোখে সে তাদের আত্মার পিছনে অব্যর্থ শিকারীর মত ছোটে। অথচ সে ভালভাবেই জানে তার মত মেয়ের পক্ষে কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসা সম্ভব হবে না।

তবু যখন সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিবিড়ভাবে, অথবা কোন আনন্দোৎসবে যোগ দেয় সকলের সঙ্গে তখন তাকে তৃপ্ত মনে হয়, বেশ খুশি খুশিই মনে হয়। কিন্তু বার্নে জানে এ খুশি এ তৃপ্তি কৃত্রিম এবং মাঝে মাঝে এই কৃত্রিম তৃপ্তি আর আত্মপ্রসাদের অন্তরালে এক সকরুণ ক্লান্তি আর অতৃপ্তির অনুভূতি খোঁচা দেয় তার মনে। বার্নে বেশ বুঝতে পারে সকলের সঙ্গে ভালবাসার ভাণ করে করে সকলের সঙ্গে প্রতারণা করে করে তার নিজের আত্মার উপরেই জমে উঠছে দুর্বিসহ প্রতারণার এক গ্লানি।

তবে মেরিওলের মন জয় করতে গিয়ে যে কষ্ট পেয়েছে বার্নে সে কষ্ট আর কোন ক্ষেত্রে পেতে হয়নি তাকে। এই কষ্ট সহ্য করেছিল বার্নে কারণ আঁদ্রে মেরিওলকে দেখে তার ভাল লাগে প্রথম দর্শনেই।

গত মাসেই বার্নে বুঝতে পারে মনে মনে হেরে গেছে, হার মেনেছে মেরিওল। কিন্তু মুখে স্বীকার না করা পর্যন্ত ছাড়েনি বার্নে। সেই বহু আকাঙ্খিত স্বীকৃতি আজ চিঠির মধ্যে পেয়েছে বার্নে।

মেরিওল বেশ গুরুগম্ভীরভাবে লিখেছে, বার্নে অন্যান্য পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করে তা সে জানে। আর আগেই শিক্ষা হয়েছে তার। তার বিপদের সম্পর্কে আগে হতেই সচেতন ছিল মেরিওল। এ বিপদে সে পড়তে চায় নি। বার্নের জন্য কোন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার কোন ইচ্ছাই ছিল

না তার। তবু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি মেরিওল। মার্জিত অথচ বাস্তবানুগ ভাষায় অল্প কথায় তার মনের কথা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছে মেরিওল। সে যে বার্নেকে ভালবেসে ফেলেছে সে কথা সে বলতে না চাইলেও বার বার পরিব্যক্ত হয়ে পড়েছে তার চিঠিতে।

পরিশেষে জানিয়েছে মেরিওল, যদিও সে ধরা পড়ে গেছে তথাপি তার এই অবাঞ্ছিত দাসত্ব থেকে শীঘ্রই মুক্ত করবে তার আত্মাকে। সে আবার যাযাবর জীবন যাপন করবে। সে শীঘ্রই চলে যাবে প্যারিস থেকে।

চিঠিখানা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল বার্নে। তার মনে হলো মেরিওলের লেখার ভঙ্গিমা লামার্থের থেকে ভাল। কারণ এর মধ্যে কোন হেঁয়ালি কল্পনা বা ব্যঞ্জনার ভাব নেই। মেরিওল যা অনুভব করে তা সে সরলভাবে ব্যক্ত করেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখতে লাগল বার্নে। এইভাবে রোজ একবার করে নিজেকে দেখে। নিজের রূপের নিরুচ্চার প্রশংসায় নিজেই ফেটে পড়ে মনে মনে।

এই আত্মরতির মধ্যে আছে অপরকে বশীভূত করার বা মুগ্ধ করার মূলমন্ত্র।

হঠাৎ তার পড়ালেখার টেবিলে গিয়ে মেরিওলকে একটা চিঠি লিখল বার্নে। লিখল, প্রিয় মঁসিয়ে মেরিওল, আগামী কাল বেলা চারটের সময় আমার বাড়িতে এসে দেখা করুন। আমি তখন একা থাকব। আশা করি আপনার কল্পিত বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পারব আমি। নিজেকে আমি আপনার বন্ধু বলেই জানি এবং চিরকাল ধরে এই বন্ধুই রয়ে যেতে চাই। ইতি—মাইকেল দ্য বার্নে।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে মেরিওলের আসার সময় খুব সরল ও সাদাসিদেভাবে প্রতীক্ষা করছিল বার্নে। তার সাজপোশাকের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জাঁকজমক ছিল না। বরং তার মুখে ছিল ধূসর গোধূলির এক ছায়া-ছায়া বিষণ্ণতা।

গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকল মেরিওল। বার্নে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুহাত বাড়িয়ে দিল। দুটি হাতই চুম্বন করল মেরিওল। তারপর চুপচাপ বসে রইল। বার্নেও প্রথমে কোন কথাই বলল না। মেরিওল যেন চাইছিল বার্নেই প্রথমে কথা বলুক।

অবশেষে বার্নেই প্রথমে বলল, ঠিক আছে, কাজের কথায় আসুন। কিন্তু কথাটা কি ? আপনি আমাকে ত বেশ একটা গুরুগম্ভীর চিঠি লিখেছেন।

মেরিওল বলল, আমি তা জানি এবং এর জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। তবে সকলের সঙ্গেই আমি এমনি খোলাখুলি এবং সরল ব্যবহার করে থাকি।

বার্নে বলল, এসব কি বোকামি করছেন?

মেরিওল বলল, এ বিষয়ে আমি আর কোন কথাই বলতে চাই না।

বার্নে বলল, কিন্তু আমি এ কথা আলোচনার জন্যেই আপনাকে ডেকে এনেছি এখানে। এবং একথা ততক্ষণ আলোচনা করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার কোন বিপদই নেই।

কথাটা বলে বার্নে প্রাণ খুলে শিশুর মত হাসতে লাগল।

আমতা আমতা করে মেরিওল বলতে লাগল, কিন্তু আমি আপনাকে সত্য কথাই লিখেছি। যে কঠোর ও ভয়াবহ সত্য আমি অনুভব করি সেই সত্য কথাই লিখেছিলাম।

বার্নে বলল, আমি তা জানি। এ সত্য আমার অন্যান্য বন্ধুরাও সব অনুভব করে। আপনি জানেন আমি নাকি এক চটুল প্রেমাভিনেত্রী। আমি তা স্বীকার করি। তবে একটা কথা, এই প্রেমাভিনয়ের আঘাতে আজ পর্যন্ত কারো মৃত্যু হয়নি। আমার প্রতি আমার বন্ধুরা যে প্রেম অনুভব করে তা এক পুরনো রোগের মত। তা তাদের কোন ক্ষতি করে না। আর আমিও যথাসম্ভব তাদের সে প্রেমের প্রতিদান দেবার চেষ্টা করি আমার সদ্ব্যবহারের দ্বারা। তাদের সে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তাহলে দেখছেন আমি কত অকপট, কত খোলাখুলিভাবে আমার কথা আমি বললাম। আপনি অন্য কোন মেয়েকে কি এভাবে মনের কথা বলতে শুনেছেন?

মেরিওল বলল, আপনার বন্ধুরা এমন এক আগুনে পুড়ে খাক হয়েছে যে আগুনে আপনি অনেক পরে পুড়েছেন। পরে তারা আবার সামলে নিয়েছে। কিন্তু মাদাম, আমার কথাটা স্বতন্ত্র। আমার মনে হচ্ছে আমি যে অনুভূতিতে ভুগছি তাকে এখন প্রশ্রয় দিলে আমাকে সারাজীবন ভুগতে হবে। আমি আর কোনদিন মুক্তি পাব না তার থেকে।

বার্নে বলল, আমার কথা শুনুন। সত্যি বলছি আমি চাই না, আমার একজন বন্ধু এক মিথ্যা ভয়ের তাড়নাতে পালিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। ঠিক আছে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু আজকালকার কোন মানুষ কোন মেয়েকে ভালবেসে কখনো নিজের ক্ষতি করে না।

মেরিওল চুপ করে কি ভাবতে লাগল।

বার্নে আবার বলতে লাগল, আমি হচ্ছি আধুনিক কালের এক নারী যাকে পাগলের মত কেউ কখনো ভালবাসতে পারে না। আমি সত্যি বলছি, আমার কথা বিশ্বাস করো, কোন বিশেষ লোককে বিশেষভাবে ভালবাসা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি যাদের পছন্দ করি তুমি হবে তাদেরই একজন। কিন্তু তাদের থেকে বেশী প্রিয় তুমি কোনদিনই হতে পারবে না আমার, তা তুমি যত বড়ই হও না কেন। আর একটা কথা রেখ, আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে অনেক অত্যাচার আর ঈর্ষার আঘাত সহ্য করেছি, প্রেমের ব্যাপারে

কারো কাছ থেকে কোন আঘাতই সহ্য করতে আর রাজী নই আমি। আমি তোমার বন্ধু হয়েই থাকতে চাই। আমাদের আচরণ হবে সব সময় খোলাখুলি এবং হৃদ্যতাপূর্ণ।

বার্নের মুখপানে অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেরিওল। তার কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। বরং মেনে নিল সে কথা। বলল, আমি মেনে নিলাম তোমার কথা। সত্যিই তুমি অনন্যা।

বার্নে বলল, এ নিয়ে যেন আর কোন কথা বলো না। এইখানেই এ কথার শেষ।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিষয়ে চলে গেল বার্নে।

আনন্দ ও বেদনার এক মিশ্র অনুভূতি অন্তরে নিয়ে বার্নের কাছ থেকে বিদায় নিল মেরিওল। বার্নেকে সে কোনদিন পাবে না, তার ভালবাসা পাবার কোন আশাই নেই। তবু বার্নে দূরে যেতে নিষেধ করেছে তাকে। অর্থাৎ তার সঙ্গ বার্নে চায়।

৩

অন্য বন্ধুদের কথা বলতে পারবে না তবে মেরিওল সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল বার্নেকে এবং এর জন্য সে মনোকষ্টও পাচ্ছিল প্রচুর।

সেদিন নিজের ঘরে বসে একা ভাবতে ভাবতে বার্নেকে একটা চিঠি লিখে জানাল আগামী কাল বিকালেই সে তার বাড়িতে যাচ্ছে।

পরদিন বিকালে যথাসময়ে মেরিওল বার্নের বাড়িতে গিয়ে দেখল বার্নের ঘরে তার বাবা মঁসিয়ে প্রাদোঁ বসে রয়েছেন। মেরিওল বুঝতে পারেন প্রাদোঁর সেখান থেকে যাবার কোন ইচ্ছাও নেই।

মেরিওল যেতেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাতটা বাড়িয়ে দিল বার্নে।

মেরিওল বসল। কিন্তু বসেই বার্নের বাবার সঙ্গে আলাপ করে কথা বলতে লাগল। সেদিন সারা সন্ধ্যেটা মঁসিয়ে প্রাদোঁর সঙ্গে নানারকমের কথা বলে কাটাল মেরিওল।

সাধারণতঃ বার্নের কাছে যারা আসে তাদের কেউ তার বাবার পানে তাকায় না। তাঁর সঙ্গে কেউ কোন কথা বলার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না। বরং অবাঞ্ছিত বলেই ভাবে। সেই জন্য মঁসিয়ে প্রাদোঁও তাদের কাউকে সহানুভূতির চোখে বা মমতার চোখে দেখে না।

আজ মঁসিয়ে প্রাদোঁ মেরিওলের সঙ্গে কথা বলে ও আলাপ করে প্রচুর আনন্দ পেলেন। তিনি স্বীকার করলেন নিজের মুখে তাঁর মেয়ে এতদিন এই ছেলেটাকে চিনতেই পারেনি।

মেরিওল চলে গেল।

এর পর থেকে প্রায়ই চিঠি লিখত মেরিওল। বার্নে তার চিঠি পড়তে ভালবাসত। তাই বিভিন্ন চিঠিতে বার্নের দোষগুণের প্রতি আবেগহীন ভাষায়

প্রশংসা করত মেরিওল।

বার্নের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করল মেরিওল। সে যখন দেখল বার্নেকে সে সত্যিই ভালবাসে এবং সে ভালবাসার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই। তখন সে বার্নেকে ধীরে ধীরে তিলে তিলে জয় করার আরও চেষ্টা করতে লাগল। ঘন ঘন চিঠি লেখা এ ব্যাপারে তার প্রথম পদক্ষেপ।

তার চিঠি পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হত বার্নে। সে ভাবত এর আগে লামার্থেও প্রথম প্রথম তাকে অনেক চিঠি লিখেছে। যেহেতু সে একজন নামকরা ঔপন্যাসিক তার সে চিঠিগুলি একটি পৃথক ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে বার্নে যত্ন করে।

কিন্তু বার্নে দেখল মেরিওলের চিঠির আস্বাদ স্বতন্ত্র। তার চিঠির মধ্যে কামনা ও প্রেমানুভূতির যে অভিব্যক্তি আছে তার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই। তা যেমন সংযত ও কেন্দ্রীভূত তার বাণীরূপ তেমনি যথাযথ। কোন অস্পষ্টতা বা অহেতুক আবেগ উচ্ছ্বাস নেই। মাদাম বার্নের মনে হত এ ধরনের চিঠি কখনো পড়েনি সে।

মেরিওলকে সত্যি সত্যিই এক বিশেষ আসক্তির চোখে দেখতে লাগল বার্নে। তার সঙ্গে অপেরা বা বহু প্রমোদানুষ্ঠানে যেতে লাগল। তাকে প্রায়ই ডাকত নিজের বাসায়। বেশীদিন না দেখে থাকতে পারত না।

কোন একটি বিশাল দেশকে মানুষ যেমন ধীরে ধীরে জয় করে, তেমনি মেরিওলও অনমনীয় নারীসত্তার এক একটি অংশকে ধীরে ধীরে জয় করে যেতে লাগল। মনে তার আশাটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে তাহলে একদিন না একদিন বার্নের অখণ্ড অন্তরের ভালবাসা পরিপূর্ণভাবে পাবেই।

দ্বিতীয় পর্ব

১

সেদিন সকালে মাদাম বার্নের বাসায় গিয়ে দেখল মেরিওল, বার্নে বাসায় নেই। অথচ টেলিগ্রাম করে তার এখানে আসার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল মেরিওল।

যাই হোক, বার্নের ঘরে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল মেরিওল। তার ঘরে এসে বার্নেকে না পেলে বড় খারাপ লাগে তার।

সহসা বাড়ির বাইরে একটি গাড়ি এসে থামতেই বাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল। বার্নে উপরে এসে মাথার টুপীটা খুলে বলল, একটা কথা আছে।

মেরিওল বলল, কি কথা?

বার্নে হাসিমুখে তার মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমি দিনকতকের জন্যে

এক গাঁয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি।

মেরিওল ক্ষুণ্ণ হলো। বলল, আর এই কথাটা তুমি বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললে? একটু বাঁধল না মুখে?

বার্নে বলল, হ্যাঁ, তা হয়ত বটে। বস। বলছি সব কথা। তুমি হয়ত জান বালসারি নামে আমার এক মামা আছেন। তিনি একজন সরকারি এঞ্জিনীয়ার। তাঁর গ্রাম অঞ্চলে আভ্রাশেঁ নামক একটা জায়গায় একটা বাড়ি আছে। বছরের বেশীর ভাগ সময় তিনি সেখানেই ছেলে পরিবার নিয়ে থাকেন। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সেখানে আমরা যাই। এবার আমি সেখানে যেতে চাইনা, জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্যে আমার বাবাকে অনেক কথা শুনিয়েছেন মামা। সুতরাং না গিয়ে পারছি না। আর একটা কথা আছে শোন। বাবা আজকাল তোমাকে সহ্য করতে পারছেন না। তুমি এখানে কম আসবে। তার কারণ আমার সেই অনমনীয় দৃঢ়তা আর নেই, অর্থাৎ আমি যেন ক্রমশই ধরা দিচ্ছি তোমার কাছে। সে যাই হোক, আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করব। আমার বাবা আমাকে দারুণ তিরস্কার করার পর আমাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছেন আমি যেন অন্তত: দশ দিন আভ্রাশেঁতে কাটিয়ে আসি মামার কাছে। আমরা যাচ্ছি সোমবার সকালে। তোমার কিছু বলার আছে?

মেরিওল সব শুনে বলল, তোমার কথায় আমি শুধু আঘাত পেয়েছি। এছাড়া বলার আর কিছু নেই।

বার্নে বলল, শুধু এই কথা, আর কিছু না?

মেরিওল বলল, আর কি কথা আশা করতে পার আমার কাছ থেকে? আমি ত তোমার যাওয়া বন্ধ করতে পারি না।

বার্নে কি ভেবে হঠাৎ বলল, একটা কাজ করা যেতে পারে। একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। তুমি সেন্ট মাইকেল পাহাড় জান?

মেরিওল বলল, না।

বার্নে বলল, শোন। আগামী শুক্রবার সেখানে যাবার জন্য রওনা হবে তুমি। শনিবার সকালে আভ্রাশেঁতে নেমে উপসাগরের ধারে একটা পার্কে ঘোরাফেরা করবে। আমরা যেন হঠাৎ দেখতে পাব তোমায়; বাবা হয়ত রাগ করবে, কিন্তু তাঁকে গুরুত্ব দেব না। আমি তখন পরের দিন ওখানে যাবার এক পরিকল্পনা করব। তার মধ্যে তুমি আমার মামা-মামীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের মন জয় করার চেষ্টা করবে। আমরা যে হোটেলে থাকব সেখানে ডিনার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করবে সকলকে। রাত্রিতে আমরা সেই এক হোটেলেই থাকব। পরের দিন সেন্ট মাইকেল পর্বতশৃঙ্গ থেকে তুমি চলে আসবে। আমি তার এক সপ্তাহ পরেই প্যারিসে ফিরে আসব।

বার্নের কথা শেষ হলে মেরিওল বলল, জগতে একমাত্র তোমাকেই আমি

ভালবাসি।

বার্নে বলল, খুব হয়েছে, চুপ করো।

তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। মেরিওলের মনে হচ্ছিল সে যেন বার্নের পায়ের উপর গড়াগড়ি যায়। তার দৃষ্টির মধ্যে তখন এমন এক ক্ষুধা ছিল যা দিয়ে গ্রাস করতে চাইছিল বার্নেকে।

বার্নে বলল, তাহলে সব ঠিক ত?

মেরিওল বলল, হ্যাঁ সব ঠিক।

হঠাৎ বার্নে বলে উঠল, আর ত তোমাকে সময় দিতে পারছি না। আমি শুধু তোমাকে এই খবরটা দেবার জন্যে বাড়ি এসেছিলাম। আমরা পরশু দিন রওনা হচ্ছি। আগামীকাল ত সারাদিন নানা কাজে কেটে যাবে। আজও আবার আমাকে চার জায়গায় যেতে হবে, নিমন্ত্রণ আছে।

মেরিওল বার্নের হাতটা নিয়ে চুম্বন করে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে হিসেব করে দেখল মেরিওল এখনো চারদিন তাকে একা কাটাতে হবে। তারপর শুক্রবার। এই ক'দিন সে কোথাও গেল না। কারো সঙ্গে দেখা করল না। শুধু ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বন্দীত্বের এক দুঃসহ নির্জনতার মধ্যে কাটাতে লাগল দিনের পর দিন।

বৃহস্পতিবার রাত্রে উত্তেজনায় ঘুম হলো না মেরিওলের। ভোর হতেই উঠে পড়ে অনেক আগে স্টেশানে গিয়ে সকাল আটটার এক্সপ্রেসটা ধরল।

নর্মাণ্ডির সবুজ বনভূমির উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে এক একটা উপত্যকা, দুপাশে আপেলের বাগান, চাষীদের কুঁড়ে। বড় ভাল লাগছিল মেরিওলের। তখন জুলাই মাসের শেষ। এই সময় ও অঞ্চলে ফল ধরে গাছে গাছে। চারদিকে পপলার আর উইলোর বন।

আভ্রাশেঁতে নেমে সোজা একটা হোটেলে চলে গেল মেরিওল। তারপর বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর পথটা জেনে নিল।

শনিবার সকালে বার্নের কথামত গার্ডেনে চলে গেল মেরিওল। ঘোরা-ফেরা করতে লাগল আপন মনে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না, মঁসিয়ে প্রাদোঁর সঙ্গে দেখা হলে কি কৈফিয়ত দেবে, কিভাবে সন্তুষ্ট করবে তার সন্দিগ্ধ মনকে।

নির্দিষ্ট সময়েই এসে পড়ল ওরা। বার্নে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে চীৎকার করে উঠল, সুপ্রভাত মঁসিয়ে মেরিওল। চমৎকার! হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে।

মেরিওল বলল, আমিও ভাবতে পারিনি এভাবে দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সঙ্গে। আমি বহুদিন ধরে এই চমৎকার জায়গাটা বেড়াবার কথা ভেবে আসছি।

বার্নে বলল, আর বেছে বেছে এই সময়টাই ঠিক করেছেন যখন আমরা

এখানে আছি।

তার মামা-মামীর সঙ্গে মেরিওলের পরিচয় করিয়ে দিল বার্নে। বলল, আমার বন্ধু মঁসিয়ে মেরিওল।

বার্নে আর তার মামীর মাঝখানে পথ হাঁটছিল মেরিওল। একসময় বলল, এত সুন্দর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি এর আগে।

বার্নে বলল, কিন্তু আপনি যদি দিনকতক থেকে যান তাহলে আরো ভাল করে এ দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন।

আর কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না মেরিওলের। সে শুধু বার্নের চলমান দেহটার পানে তাকিয়েছিল এক দৃষ্টিতে। মামী বলল, আজ আমার ভাগনীকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

বার্নে যেতে যেতে একসময় বলল, তোমাকে দেখে সত্যিই আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি ক'দিন এখানে আছ?

মেরিওল বলল, দু দিন।

তারপর মেরিওল বার্নের মামীকে লক্ষ্য করে বলল, দয়া করে মাদাম বালসারি যদি আগামী কাল আমার হোটেলে মঁসিয়েকে নিয়ে যান তাহলে আমি খুব খুশি হব।

মাদাম বালসারি বললেন, হ্যাঁ আমরা যাব কিন্তু একটা সর্তে, মঁসিয়ে মেরিওলকে আজ রাতে আমাদের ওখানে খেতে হবে।

মেঘ না চাইতেই জল পেয়ে গেল যেন মেরিওল। অভাবনীয় সাফল্যের উত্তেজনায় কাঁপছিল তার হৃদয়, আকাঙ্খিত বস্তুর প্রাপ্তিজনিত আনন্দে ভরে গিয়েছিল তার অন্তর।

ওরা যে ভিলাতে ছিল সেখানে যখন ওরা পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মেরিওল খাওয়ার পর বিদায় নিয়ে চলে যেতেই বার্নের মামা-মামী শুতে চলে গেলেন। বার্নে তখন বলল, আমি চাঁদের আলোয় বাগানে একটু বেড়াব।

মঁসিয়ে প্রাদোঁও বার্নের সঙ্গে গেলেন। একসময় হঠাৎ প্রাদোঁ বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাইছিনা। তবে একটা কথা আছে।

বার্নে বলল, কিন্তু তুমি আমায় এর আগে অনেক উপদেশ দিয়েছ।

আমি? প্রাদোঁ বললেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

তা যদি দিয়ে থাকি ত তোমার আচরণ সম্বন্ধেই দিয়েছি।

বার্নে অসহিষ্ণু হয়ে বলল, এবং খুব খারাপ উপদেশ। আমি বলে দিচ্ছি বাবা, এ ধরনের উপদেশ দিলে আমি তা মানতে পারব না।

প্রাদোঁ বললেন, কী খারাপ পরামর্শ আমি দিয়েছি?

বার্নে বলল, তুমিই মঁসিয়ে দ্য বার্নেকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলে আমায়। তোমার মেয়ের জীবনকে তুমি নিজেই নষ্ট করেছ। এর দ্বারা বোঝা

বলে কোন জিনিস নেই। জ্ঞান বুদ্ধি বলে কোন বস্তু নেই তোমার।

প্রাদোঁ বললেন, হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি কোন ভুল করছি না।

বার্নে বলল, এ ক্ষেত্রে আগে তোমার পরামর্শটা শুনব। তারপর আমার গ্রহণযোগ্য হলে তা নেব।

প্রাদোঁ বললেন, তুমি প্রায় নিজেকে ধরা দিতে চলেছ।

বার্নে হাসতে লাগল জোরে। হাসতে হাসতে বলল, মঁসিয়ে মেরিওলের হাতে?

প্রাদোঁ বললেন, হ্যাঁ তাই।

বার্নে বলল, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি এর আগেই মাসিভাল, লামার্থে, মালত্রর হাতে ধরা দিয়েছি। কোন মানুষের সঙ্গে আমি প্রাণ খুলে মেলামেশা করতে না করতে গোটা দলটা ঈর্ষায় ফেটে পড়বে আর তুমি তাদের মধ্যে একজন।

প্রাদোঁ চীৎকার করে উঠল, বাজে কথা যত সব। শোন, এর আগে ওদের কারো হাতে তুমি কখনো ধরা দাওনি। সকলের সঙ্গেই কৌশলে সদ্ব্যবহার করে এসেছ।

কড়া গলায় বার্নে বলল, দেখ বাবা, আমি আর ছোট খুকীটি নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কারো হাতেই ধরা দিচ্ছি না। তবে একটা কথা শুনে রাখ, আমার কথামতই ও এখানে এসেছে। মঁসিয়ে মেরিওলকে আমার ভাল লাগে। ও বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী এবং নিরহঙ্কার। আর সকলের থেকে ও আলাদা। একথা তুমি নিজেও একদিন বলেছিলে। অবশ্য তোমার মনে তখনও এ ঈর্ষা ঢোকেনি। আমিও ওকে বলেছিলাম ও এখানে বেড়াতে এলে আমি খুশি হব। আমার কথামতই ও এখানে এসেছে। তবে ওর কাছে ধরা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে তুমি যখন কাছে রয়েছ।

প্রাদোঁ চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, চল যাই, রাত হয়েছে।

বার্নে বলল, আমি আর একটু বসব। তুমি যাও।

একটা ওক গাছের তলায় একটা পুরনো বেঞ্চের উপর বসল বার্নে। বলল, আমি তোমার ঘরের জানালার নিচে এইখানেই থাকব।

বার্নে ভাবতে লাগল, প্যারিসে তার সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে বড় আয়নাটার সামনে কতবার প্রশ্ন করেছে নিজেকে, আমি কাকে ভালবাসি? আমি কি চাই? আমি কি আশা করি? আমি কে?

কিন্তু এতদিন পর আজ যখন মেরিওলকে আত্রাশেঁর বাগানে প্রথম দেখেছে তখন যেন তার সেই সব পুরনো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে বার্নে। যে অনির্দেশ্য বিরাট শক্তি একজনকে আর একজনের কাছে নিয়ে যায় দুর্বার বেগে সেই শক্তির এক রহস্যময় বেগকে জীবনে আজ প্রথম অনুভব করল সে।

ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে গেল বার্নের। সহসা জানালার উপর থেকে প্রাদো ডাক দিলেন : চলে এস, তা না হলে ঠাণ্ডা লাগবে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল বার্নে। রাতে ঘুম তার ভালই হলো।

পরদিন সকালে সেণ্ট মাইকেল পর্বতশৃঙ্গের দিকে রওনা হলো। একটা গাড়ি এসে ওদের নিয়ে গেল। মেরিওলের বাগানে গাড়িটা ঢুকতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বার্নে মেরিওলের পানে তাকাল। চোখে চোখ পড়ে গেল। বার্নে এবার নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, সে জীবনে একজনকেই ভালবাসে এবং সে হচ্ছে মেরিওল।

মেরিওলকে নিয়ে গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। অনেক অচেনা পাখির গান শুনতে শুনতে অনেক গাঁয়ের পথ পার হয়ে এগিয়ে চলল ওদের গাড়ি। তারপর সমুদ্রের ধারে এসে থেমে গেল গাড়িটা। এখান থেকেই দেখা যায় মাউণ্ট মাইকেলের চূড়া।

মাদাম বালসারি মাউণ্ট মাইকেল সম্বন্ধে অনেক রূপকথা শোনাতে লাগলেন।

বালির বিছানার উপর পা দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাউণ্ট মাইকেল। পাহাড়ের পাদদেশে বালির উপর কখনো বসে কখনো বেড়িয়ে ওরা বেলা একটা পর্যন্ত কাটাল। তারপর ওরা একটা স্থানীয় হোটেলে গেল লাঞ্চ খেতে। খেতে খেতে মেরিওল বলল, আজ রাতটা থেকে গেলে হত না? চাঁদের আলোয় এ দৃশ্য দেখতে বড় ভাল লাগবে।

বার্নে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। মাদাম বালসারি আপত্তি করলেন, কারণ তিনি তাঁর ছোট ছেলেটিকে রেখে এসেছেন।

মঁসিয়ে বালসারি বললেন, এর আগেও একবার ও বাড়িতে ছিল তোমাকে ছেড়ে।

মঁসিয়ে বালসারির কাজের প্রশংসা করার জন্য মেরিওলকে ভাল লেগে গেছে তাঁর। তাঁর মতে মেরিওল একজন চমৎকার লোক।

খাওয়ার পর ওরা শহর দেখতে বার হলো। তারপর সেণ্ট মাইকেল গীর্জা। পাহাড়ের গাঁয়ে এক স্তব্ধবিশাল প্রাসাদ। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রতিটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। মেরিওল একবার বলল, আমি কিন্তু শুধু তোমার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

হাতে একটা মৃদু চাপ অনুভব করল মেরিওল। বার্নেকে আবার বলল, তোমার প্রেমে সত্যিই পাগল হয়ে গেছি আমি।

গোটা গীর্জাটা দেখার জন্য ওরা চিলের ছাদে যেতে চাইল। রেলিং দেওয়া বারান্দা থাকলেও সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। ওটা নিষিদ্ধ জায়গা। কারণ জায়গাটা এত উঁচু যে নিচে সমুদ্রের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যেতে পারে।

বার্নে কুড়িটা ফ্রাঁ গাইডকে দিতেই সে ওদের যেতে দিল। সত্যিই মাথাটা ঘুরছিল বার্নের। তবু মেরিওল ওর কোমরটা শক্ত করে ধরে থাকায় ভাল লাগছিল বার্নের। বার্নে তার সমগ্র দেহের ভারটা এক উদার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ছেড়ে দিল মেরিওলের হাতে। সে চুম্বন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মেরিওল বলল, এই ধর্মস্থানে চুম্বন করা ঠিক হবে না।

ওরা ফিরে এসে যখন সবার সঙ্গে মিলিত হলো প্রাদোঁ খুব রেগে গেলেন।

হোটেলে ওরা যখন ফিরে গেল তখন খাবার সময় হয়ে গেছে। খাওয়ার পর ওরা আবার বেরিয়ে এল। তারপর ক্লান্ত হয়ে মাদাম বালসারি শুতে যাবার কথা বললেন।

সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সারাদিন ঘুরে ঘুরে। সুতরাং সকলেই এ প্রস্তাব মেনে নিল। সকলেই আপন আপন ঘরে চলে গেল।

মেরিওল তার ঘরে দুটো বাতি জেলে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। বিছানায় শোয়নি। ভাবছিল বার্নে তার কত কাছে, কিন্তু আসলে কত দূরে। বার্নে যেন সত্যিই তার নাগালের বাইরে। সে যেন সত্যি সত্যিই এক রহস্যময় ছলনাময়ী নারী যে শুধু তাকে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে তাকে ভুলিয়ে যাবে, তাকে মাতাল করে তুলবে তার প্রেমে, কিন্তু কোনদিন তাকে ধরা দেবে না। কোনদিন তার সে প্রেমানুভূতিকে তৃপ্ত করবে না।

সহসা মেরিওল আশ্চর্য হয়ে দেখল তার দরজা খুলে ঘোমটাপরা এক নারীমূর্তি ঘরে ঢুকল। তারপর কোন কথা না বলে তার বাতি দুটো নিবিয়ে দিল।

২

পরদিন সকালে উঠে বার্নের কথাই ভাবছিল মেরিওল। গতকাল রাত্রিতে তার নির্জন ঘরের সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে এক পরিপূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে নিজের দেহটা সঁপে দিয়েছিল বার্নে, কিন্তু কোন উল্লাস বা উচ্ছ্বাস দেখায়নি তার আদর ও শৃঙ্গারে। ক্ষণিকের জন্য ধরা দিয়েই আবার চলে গিয়েছিল বার্নে। ফিসফিস করে শুধু বলে গিয়েছিল, কাল সকালে আবার দেখা হবে।

আজ সকালে বার্নের সঙ্গে দেখা হলেই ছাড়াছাড়ি হবে দুজনের মধ্যে। ওরা চলে যাবে আভ্রাশেঁর পথে আর মেরিওল চলে যাবে সেন্ট মালোর পথে।

বার্নে যখন এলো মেরিওলের মনে হলো, এইমাত্র ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে বার্নে। রেগে গেলে তার সুন্দর মুখের দুপাশে যে দুটো কুঞ্চন দেখা যায় তা তখনো মিলিয়ে যায়নি।

বার্নে এসে হাসিমুখে হাতটা বাড়িয়ে দিলে সেটা চুম্বন করল মেরিওল। মেরিওল বলল, ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

বার্নে বলল, বেশীদিন এ কষ্ট করতে হবে না।

মঁসিয়ে প্রাদোঁ এসে গেলে বার্নে চুপি চুপি বলল, বাবাকে বল, তুমি পনের

দিনের আগে প্যারিসে ফিরবে না।

হঠাৎ মাদাম বালসারি এসে বার্নেকে বললেন, তোমার বাবা বলছেন তোমরা নাকি আগামী পরশু চলে যাবে? অন্ততঃ আগামী সোমবার পর্যন্ত থাক।

বার্নে বলল, সমুদ্রের বাতাসে একরকম ব্যথা হয় আমার। ব্যথাটা গতকাল রাতে জানিয়েছিল। সেটা আবার হলে আমাকে যেতেই হবে।

মেরিওলের গাড়ি আসতেই সে চলে গেল।

আসলে কোথাও যাবার ছিল না। বার্নের বাবাকে শোনাবার জন্য এমনি বলেছিল। সোজা প্যারিসে ফিরে এল মেরিওল।

সেদিন নিজের বাড়িতে পড়ার ঘরে বইপত্র, পিয়ানো আর বেহালার মধ্যে বসে চঞ্চল মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল মেরিওল। কিন্তু কোন কিছুতেই শান্ত করতে পারল না সে মনকে। বার্নের প্রতি সকাম অনুরাগের এক অতৃপ্ত বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তার দেহমনের সমস্ত চেতনা।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাওয়ার পর টুপীটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মেরিওল। কোথায় যাবে তা সে নিজেই জানে না, রাস্তায় নেমে হঠাৎ তার মাথায় এল, বার্নের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়ার জন্য একটা ফ্ল্যাট চাই। তার বাসায় গিয়ে ভিড়ের মধ্যে তার বাবার সন্ধানী ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি এড়িয়ে কোন কথাই প্রাণ খুলে বলা যাবে না।

কিন্তু সারাদিন ঘুরে অনেক খোঁজ খবর করেও কোথাও একটা ভাল বাসার সন্ধান পেল না মেরিওল। পরদিন সকাল নটায় বেরিয়ে আবার চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে অঁতেনিল অঞ্চলে একটা বাগানের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা বাড়ি ভাড়া পেল।

বাড়ি ফিরে তার লেখার টেবিলে একটা টেলিগ্রাম পেল মেরিওল। খুলে দেখল তাতে লেখা আছে, 'কাল বাড়ি ফিরছি। চিঠি দিয়ে পরে জানাচ্ছি সব কথা।' মাইকেল দ্য বার্নে।

মেরিওল এখনো পর্যন্ত কোন চিঠি লেখেনি বার্নেকে। কারণ সে জানে বার্নে এখনো আভ্রার্শেতে আছে। কিন্তু টেলিগ্রাম পেয়ে সে রাতের খাওয়ার পর একটা চিঠি লিখতে বসল বার্নেকে।

পরদিন সকালে মেরিওল বার্নের চিঠিটা পেয়ে গেল। তাতে লিখেছে সে আজ সন্ধ্যাতেই ফিরছে প্যারিসে। আরো লিখেছে মেরিওল যেন দিনকতক তাদের বাসা দিয়ে না যায়, কারণ তাহলে তার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যাবে তার বাবার কাছে। তবে আগামী কাল সকাল দশটার সময় সেন নদীর ধারে তুলিয়ার বাগানে তার সঙ্গে দেখা হবে। মেরিওল যেন যথাসময়ে সেখানে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগে গিয়ে দাঁড়াল মেরিওল। বাগানটা ঘুরে

দেখল। তারপর টাওয়ারের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দূরে বার্নেকে দেখতে পেল।

কিন্তু বার্নে কাছে আসতে আশ্চর্য হয়ে গেল মেরিওল। বার্নের বেশভূষায় আগেকার মত আর পারিপাট্য নেই। সাদাসিদে একটি কালো পোশাক পরে দ্রুতপায়ে কাছে এল বার্নে। মেরিওল হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বার্নে বলল, তুমি দেখছি সব মাটি করবে। তোমাকে আমি অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। লোকে দেখে ফেলতে পারে। এখন চল নদীর পারে ঐ কুঞ্জবনটার ধারে।

শুধু বারবার আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল মেরিওল, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

বার্নে বলল, এই শান্ত নির্জন জায়গাটা আমি বড় ভালবাসি। অনেকটা পাড়াগাঁর মত। দেখ দেখ দৃশ্যটা কী সুন্দর।

মেরিওল বলল, আমি যখন তোমার পাশে রয়েছি তখন দৃশ্যের দরকার কি। আমাদের কাছে যে কোন দৃশ্যই ভাল।

বার্নে মেরিওলের হাতের উপর একটা মৃদু চাপ দিল। মেরিওল কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাদের এই মিলনের মধ্যে কোন উত্তাপ বা উত্তেজনা না থাকায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। বার্নের হাতের স্পর্শ পেয়ে এবার উৎসাহিত বোধ করল। বলল, আমি আমার সমগ্র জীবন সঁপে দিয়েছি তোমার হাতে। তোমার যা খুশি করতে পার সে জীবন নিয়ে।

আর পাঁচজন থেকে মেরিওলকে বিশ্বাস করলেও বার্নের মনের মধ্যে ছিল সংশয়ের এক ক্ষীণ অবশিষ্টাংশ। সে যেন আধুনিক সংশয়বাদ আর প্রাচীন দুঃখবাদের সন্তান। তাই হাসিমুখে মেরিওলের কথার উত্তরে বলল, বেশীদিন নিজেকে বেঁধে রেখো না আমার সঙ্গে।

বার্নের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার মুখপানে তীক্ষ্ণ অথচ গভীর দৃষ্টিতে তাকাল মেরিওল। এ দৃষ্টি স্পর্শের থেকে তীক্ষ্ণ এবং মর্মস্পর্শী। মেরিওল আবার সেই কথাটা বলল। এবার বার্নেও অকুণ্ঠভাবে আবেগের সঙ্গে স্বীকার করল, আমিও গভীরভাবে ভালবাসি তোমায়।

দুজনে দুজনের হাতদুটো জড়িয়ে ধরল আরো নিবিড়ভাবে। ওদের মনে হলো, সারা প্যারিস শহরের মধ্যে যেন আর কেউ নেই, কোন মানুষ নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বার্নে বলল, কাল এইখানে আসবে ?

মেরিওল বলল, জায়গাটা অবশ্য নির্জন, কিন্তু যে কেউ যে কোন সময়ে আসতে পারে এখানে।

বার্নে চিন্তিত হয়ে বলল, তা অবশ্য বটে, কিন্তু যাবার জায়গা কোথায় ? আমার ফ্ল্যাটে তোমাকে যেতে বলতে পারি না। তাছাড়া দিন পনের এখনো তোমাকে একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

বার্নে বরাবরই বাস্তববাদী। কোন সমস্যার দ্বারাই কখনো প্রতিহত হয় না সে। বলল, জায়গা অবশ্যই আছে, তবে খুঁজে বার করতে সময় নেবে একটু।

মেরিওন বলল, কিন্তু আমি আগেই তা পেয়ে গেছি।

আগেই পেয়ে গেছ ?

হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। অঁতেনিল অঞ্চলে র‍্যু ভিউ শ্যাম্পে নামে রাস্তাটি জান ?

হ্যাঁ, জানি।

সেই রাস্তাটার ধারে একটা বাগানবাড়ি আছে। গেটওয়ালা সেই ছোট্ট বাগানবাড়িটা এবার তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে।

বার্নে বলল, ঠিক আছে। কাল আমি সেখানে যাব।

কখন ?

বেলা তিনটের সময়।

ঠিক আছে, ঐ সময় অপেক্ষা করব আমি।

বার্নে উঠে পড়ল। হাত বাড়িয়ে বিদায় নিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস না। দশ মিনিট এখানে থেকে নদীর ঘাট দিয়ে চলে যাবে।

শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে আর কোন দিকে না তাকিয়ে চলে গেল বার্নে। মনে হলো বার্নে যেন সত্যিই খুব কাজের মেয়ে।

পার্ক থেকে বার হয়ে সোজা সেই অঁতেনিলের বাগানবাড়িটায় চলে গেল। গিয়ে দেখল তার কথামত বাড়িটাকে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলার জন্য লোক লেগেছে সকাল থেকে। বাগানের মালীও ফুলের গাছ বসাতে লেগে গেছে নানারকমের। মেরিওন বলল, আগামী কাল দুপুরের মধ্যেই যেন সব কাজ শেষ হয়।

সেখান থেকে ঘর সাজাবার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনল। মেরিওন ভাবল, দশ বছর ধরে শুধু সঞ্চয় করে গেছি, খরচ করার কোন অবকাশ পাইনি। আজ সে-দিন এসেছে। আজ প্রাণ খুলে উপযুক্ত পাত্রে আমার সব সঞ্চয় ঢেলে দেব।

পরদিন সকাল থেকে সেই বাগানবাড়িতে চলে গেল মেরিওন। কাজ-কর্ম তদারক করতে লাগল। দোকান থেকে আসবাবপত্র এলে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখল। দুটোর সময় সব কাজ শেষ হয়ে গেল।

মেরিওন ঘড়ি হাতে অপেক্ষা করতে লাগল ব্যগ্রভাবে।

বার্নে এল তিনটে বাজার অল্প কিছু পরে। বাগানে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেল। গাছপালা, ফুল আর আলোছায়ার খেলা দেখে সে আনন্দের সঙ্গে বলল, এ যে দেখছি স্বপ্নের জগৎ, এ যে দেখছি পরীদের রাজ্য।

ঘরের ভিতর ঢুকে বার্নে দেখল, নূতন রং করা ঘরের ভিতর, আসবাবপত্র

ও জিনিসপত্র সব নূতন। সব পরিচ্ছন্ন, প্রতি পদে এক মিষ্টি বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করছিল বার্নে।

এবার ওরা প্রথম পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। চুম্বন করল নিবিড়তমভাবে। দীর্ঘস্থায়ী সেই আলিঙ্গন ও চুম্বনের মৃদু রোমাঞ্চিত পুলকে ওদের চোখের পাতা মুদ্রিত হয়ে গেল আপনা থেকে। দুজনেরই দেহ মন আত্মা সব মিলে মিশে এক হয়ে গেল। ওরা যে আসলে দুজন সেকথা ভুলে গেল। সর্ববিস্মরণীগন্ধা এক নিবিড় মিলনানন্দের দ্বৈত চেতনা এমন অভেদ্যভাবে জড়িয়ে গেল যে ওরা বুঝে উঠতে পারল না কার চেতনা কোনটি।

এইভাবে তিনটি ঘণ্টা কাটাল ওরা সেই নির্জন ঘরটায়। তারপর বার্নে বলল, মার্কুই এর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে।

বার্নে চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ একা একাই বাড়িটাতে রয়ে গেল মেরিওল। তারপর কিছুটা রাত বাড়লে বাড়ি চলে গেল। খাবার পর চিঠি লিখতে বসল বার্নেকে।

পরদিনও একা একা কাটাল মেরিওল। আবার কবে আসবে বার্নে তা ও জানাবে বলেছে।

বার্নের চিঠি পেল পরের দিন। ও লিখেছে, তার পরদিন ও আসবে বেলা তিনটের সময়।

আবার সেই অবাধ মিলন। অবাধ আলিঙ্গন আর চুম্বনের আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে রইল ওরা।

এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তিন দিন অন্তর বার্নে আসত সেই বাগানবাড়িতে। প্রতি সপ্তায় দুদিন করে আসত।

একদিন যাবার আগে বার্নে বলল, এবার তুমি আবার ফিরে আসলে তোমার বাস্তব জীবনে। আগামীকাল তুমি আমার ফ্ল্যাটে আসবে। আমি আমার বন্ধুদের বলেছি তুমি বাইরে থেকে ফিরে এসেছ। আর এভাবে লুকিয়ে থাকা চলে না।

মেরিওল আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু—এত তাড়াতাড়ি?

বার্নে বলল, তাছাড়া একটা অনুষ্ঠান আছে। কাল মাসিভালের দিদোর ভূমিকায় আমি অভিনয় করব। আগে এটা মাদাম দ্য ব্রেতিয়ানের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। মাদাম দ্য ব্রেতিয়ানও থাকবেন, উনি গান করবেন।

মেরিওল বলল, বেশী ভিড় হবে না ত? আমি নির্জনতাই বেশী পছন্দ করি।

বার্নে বলল, যারা আসবে তারা আমাদের বাছাই করা বন্ধু, তাদের সবাইকে চেন তুমি। তাছাড়া তুমি এলে সবচেয়ে খুশি হব আমি।

একথা শুনে খুশি হলো মেরিওল। বলল, ধন্যবাদ। আমি যাব।

৩

এস এস, সুপ্রভাত।

মাদাম বার্নের সঙ্গে করমর্দন করল মেরিওল কিন্তু তার হাতের স্পর্শে অঁতিনিলের সেই বাগানবাড়িতে যে আনন্দ যে উত্তাপ পেয়েছিল আজ তা পেলনা। আজ মাদাম বার্নে এমন এক গৃহকর্ত্রী যাঁকে বহু দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ঘরের এক কোণ থেকে চীৎকার করে উঠল লামার্থে, হ্যালো, মেরিওল, কোথায় ছিলে এতদিন? আমরা ত ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।

মেরিওল বলল, দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম বাইরে।

লামার্থে বলল, মাদাম দ্য ফ্রেমিনের সঙ্গে আলাপ আছে?

মেরিওল বলল, না।

লামার্থে তাকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

মাদাম ফ্রেমিনের চেহারাটা খুব রোগা, কিন্তু খুব সুন্দর। মাথায় লম্বা, বয়স কম। সারা প্যারিস শহরের মধ্যে এক চপল চটুল সুখবিলাসিনী হিসাবেই পরিচিত মাদাম ফ্রেমিনে। সে নাকি এমনই এক আশ্চর্য পুতুল যাকে নিয়ে শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট বয়স্ক শিশুরা খেলা করে, মাতামাতি করে।

সম্প্রতি ফ্রেমিনে নাকি লামার্থের অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। মাদাম বার্নের সঙ্গে ফ্রেমিনের চলছে এক অঘোষিত দ্বন্দ্ব। একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণা। তবু বেশী দিন তাকে না দেখে থাকতে পারে না বার্নে।

লামার্থে যখন ফ্রেমিনের সঙ্গে মেরিওলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল তখন দূর থেকে তা দেখছিল বার্নে। লামার্থের মতে ফ্রেমিনের বয়স কম বলে আজকাল নাকি অনেকে বার্নের থেকে ফ্রেমিনেকেই চায়। কারণ ফ্রেমিনে বয়সে নবীনা।

ফ্রেমিনে একসময় বলল, মাদাম বার্নের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে।

এতে রাগ হলো মেরিওলের। সে অন্যত্র সরে গেল। একে একে পুরনো পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা এসে গেল। কিন্তু মেরিওলের কোন দিকে লক্ষ্য নেই। সে শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল বার্নেকে। কিন্তু বার্নের আজ মোটেই অবকাশ নেই। মোটা ফ্রেসনেল এল। মাসিভাল পিয়ানোতে হাত দিল। তার পাশে বসল লামার্থে। তখন অত্যন্ত সুদর্শন এক লম্বা যুবক এসে ঘরে ঢুকতেই সকলের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শোনা গেল, যুবকটি কে?

লামার্থে বলল, ওকে দিয়েই আমাদের যত সব দুরন্ত মেয়েদের শায়েস্তা করতে হয়।

একজন বলল, উনি কাউণ্ট রোডল্ফ দ্য বার্নহাম। যিনি সম্রাটের নিন্দা করার জন্য এক বিখ্যাত যোদ্ধাকে ডুয়েল লড়ে হত্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে

রাতারাতি প্রচুর নামডাক হয় বার্নহামের।

বার্নহাম ঘরে ঢুকে মাদাম বার্নের পাশে হাসিহাসি মুখ নিয়ে বসল। গান শুরু হলো। তার বেশ কিছুক্ষণ পর শুরু হলো গীতিনাট্য। কার্থেজের রাণী দিদো প্রবেশ করল।

কার্থেজের রাণী দিদো প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে চুপ হয়ে গেল। পর্যাপ্ত যৌবন ও পরিণত সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ রাণী সমুদ্রতরঙ্গলাঞ্ছিত বেলাভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ধীর পদক্ষেপে। তার আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশ বাতাসে উড়ছে। দূরে বিক্ষিপ্ত তার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি। প্রেমপরিত্যক্তা এক রমণীর অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন আর গতিভঙ্গির মন্থরতায়।'

তার গীতিকবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে দিদো ব্যক্ত করল নির্জনতার দুঃসহ পীড়ন, অবিচ্ছিন্ন বিরহবেদনার অপরিসীম যন্ত্রণা। মনে হলো মাদাম বার্নে যেন সত্যি সত্যিই দিদো হয়ে গেছে। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে গেছে বার্নে। লামার্থে পর্যন্ত একবার মুগ্ধ হয়ে বলল, সত্যিই অপূর্ব লাগছে। তবে অবশ্য এ হচ্ছে মাসিভালের গানের যাদু। গানই সব শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

লামার্থে একসময় মেরিওলকে বলল, তবে আজকের অনুষ্ঠানের কে নায়ক জান?

মেরিওল বলল, কেন ঐ অষ্ট্রীয়াবাসী বার্নহাম, ওর জন্যেই এই অনুষ্ঠান। মেরিওল আবার বলল, মাদাম বার্নে কি অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিল ওর সঙ্গে?

লামার্থে বলল, না, মাত্র দশদিন হলো পরিচয় হয়েছে। পরিচয় হয়েছে ফ্রেমিনের বাড়িতে। আমি তখন ছিলাম। আর মাত্র দশদিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি অনেক কষ্ট করে করে ফেলল সে।

বুকের মধ্যে সহসা কাঁটাবেঁধার মত একটুকরো যন্ত্রণা অনুভব করল মেরিওল।

লামার্থের সেই কথাটার জের টেনে আবার বলে চলল, যদিও ফ্রেমিনে মানুষের মন ভোলানোর ব্যাপারে দারুণ সিদ্ধহস্ত এবং ছলাকলায় বেশ পটু তবু আমার মনে হয় মাদাম বার্নে ওকে অল্পদিনের মধ্যেই ঘায়েল করে ফেলবে।

মেরিওল প্রতিবাদ করে বলল, না, আমার সঙ্গে উনি খুব সরল এবং খোলাখুলি ব্যবহার করেছেন।

লামার্থে বলল, ও খারাপ তা আমি বলছি না। তবে আমি শুধু বলছি নারী হিসাবে ও সত্যিই স্বতন্ত্র।

এই সময় মাসিভাল পিয়ানোতে একটা নূতন সুর তুলল। গীতিনাট্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সব আলোচনা।

গান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আলোচনা শুরু করল লামার্থে। বলল, এরা সত্যিই আর পাঁচজন সাধারণ নারী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মেরিওল। নারীদের একটা সাধারণ সুকুমার অনুভূতি আছে। সব মেয়েরাই দেখবে দুটো জিনিস চায়—সন্তান আর ভালবাসা, কিন্তু বার্নের মত মেয়েরা ভালবাসার যোগ্য নয়। এরা প্রকৃত ভালবাসা কখনো বুঝবে না। আর এরা সন্তান চায় না। সন্তান এদের গর্ভে আসবে না। কোনরকমে এসে গেলে তাকে একান্ত অবাঞ্ছিত একটা দুর্ঘটনা বলে মনে ভাববে।

লামার্থের কথায় আশ্চর্য হয়ে মেরিওল প্রশ্ন করল, ওরা যদি এতই খারাপ তাহলে ওদের কথা উপন্যাসে লেখ কেন? মেয়েদের পেটিকোট নিয়েই সব উপন্যাস।

শান্ত কণ্ঠে লামার্থে বলল, হ্যাঁ লিখি। ডাক্তার কখনই রোগ ভালবাসে না, তবু তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। তাকে রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় বলেই সে রোগ ভালবাসে না। তেমনি ওদের আমরা না চাইলেও ওদের কথা লিখতে হয়। ডাক্তারদের কাছে হাসপাতাল যে বস্তু, আমাদের কাছে মেয়েদের বৈঠকখানাও ঠিক তাই।

একটু থেমে আবার বলে চলল লামার্থে, ওদের কথা জানতে ভাল লাগে আমার। যখন দেখবে কোন নারীর আকর্ষণে আমি আসক্ত হয়ে পড়েছি, তখন বুঝবে আমি তার সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করে জানতে চাইছি তার কোন দিকটা আমাকে আসক্ত করছে। সেই জানাটা আমার পক্ষে একটা লাভ। বিষক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি জানতে গিয়ে যেমন কোন রসায়নবিদ নিজের উপরেই বিষ প্রয়োগ করে থাকেন। আসলে কিন্তু ওরা বড় বোকা। ওরা বুঝতে পারে না, কিভাবে ওরা নিজেদের প্রাণশক্তির অপচয় করে চলেছে। আমি ওদের সঙ্গে মিশি, কিন্তু ওদের কোন কথা বা কাজের প্রতিবাদ করি না। ওদের কথা জেনে নিই। যা জানি তাই লিখি আমার বইএ।

কথাগুলো শুনতে কষ্ট হচ্ছিল মেরিওলের। অবিরাম বর্ষণের পর যে এক ধরনের কুয়াশাধূসর বিষাদ নেমে আসে পৃথিবীতে ঠিক সেই ধরনের এক বিষাদ নেমে এল তার মনে। অথচ সে জানে লামার্থে যা বলছে তা একদিক দিয়ে ঠিক। মেরিওল বলল, কবিরা মেয়েদের খুব বড় করে তুলে ধরে। কবিতা পড়তে গিয়ে তাই মেয়েরাও অনেক আবেগানুভূতির কথা পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু তুমি তোমার উপন্যাসের মধ্যে নারী ও প্রেমের সমস্ত মোহকে নস্যাৎ করে ফেলতে চাও। ফলে তোমার লেখায় মোহমুক্তির নামে নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে এক কুৎসিত অশ্লীলতা এসে বাসা বেঁধেছে।

লামার্থে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ভালবাসে। মেরিওলের কথার উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাদাম বার্নে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওদের

কাছে এসে পড়ায় চুপ করে গেল।

বার্নে ওদের কাছে এসে বলল, তোমাদের দুজনের মধ্যে যখন কোন আলোচনা হয় তখন তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তোমরা কোন্ বিষয়ে আলোচনা করছিলে বল না। আমিও তাতে যোগদান করব।

লামার্থে তখন সংক্ষেপে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা বলে দিল। বার্নে তখন উৎসাহিত হয়ে সে আলোচনায় যোগদান করতে চাইল। আধুনিক নারীদের উপর লামার্থের আনা সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ পরে বার্নে চলে গেল ফ্রেমিনের কাছে। ফ্রেমিনে তখনো কাউন্ট বার্নহামের সঙ্গে কথা বলছিল। বার্নে তাদের কাছে লামার্থেদের আলোচনার কথা বলতে তারাও উৎসাহ বোধ করল। তখন মেরিওলদের পানে হাত ইশারা করে তাদের ডাকল বার্নে।

লামার্থে ও মেরিওল ফ্রেমিনের কাছে উঠে যেতে আবার শুরু হলো সেই আলোচনা। দেখতে দেখতে গোটা হলঘরটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে আলোচনায়। একে একে সকলেই যোগদান করলো তাতে।

কিন্তু বার্নে যেন একাই একশো। সে একাই সবার সব যুক্তি খণ্ডন করে নারীত্বের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল যেন।

বার্নেকে তখন সত্যিই খুব সজীব আর সুন্দর দেখাচ্ছিল একই সঙ্গে।

৪

মাদাম বার্নের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই বার্নে সম্পর্কিত সব মোহ সব মাদকতা উবে গেল মেরিওলের মন থেকে। অথচ তার কারণ ও নিজেই বুঝতে পারল না।

বাড়িতে গিয়ে ভাবতে লাগল মেরিওল। আজ বিকালে অর্থাৎ বার্নের বাড়ি যাবার আগেও বার্নে ছিল তার আদর্শ প্রণয়িনী, তার অন্তরের রাণী। কিন্তু এখন আর তাকে তা ভাবতে পারছে না কোনমতে।

অথচ কী এমন ঘটেছে। মেরিওল ত সব কিছুই জানত। এই ধরনের মেয়েদের সব ইতিবৃত্তই ত জানা আছে তার। তবু এই কদিনের মধ্যে বার্নে যা করেছে সেকথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল তার গাটা। গত তিন সপ্তাহ ধরে বার্নে যখন গোপনে প্রেম নিবেদন করে এসেছে তাকে, তাকে তার নারীজীবনের একমাত্র নায়ক এবং প্রথম অন্তরঙ্গ প্রণয়ী বলে স্বীকার করে এসেছে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই সে তার অগোচরে অন্য এক পুরুষকে আকর্ষণ করবার জন্য ধীরে ধীরে বিস্তার করে এসেছে তার স্বভাবসিদ্ধ ছলনাজাল। তাকে প্রীত করার জন্য এই ধরনের এক অনুষ্ঠানেরও প্রস্তুতি করে এসেছে।

লামার্থের মুখ থেকে একথা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেছে মেরিওল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলাটাও ভেবে ভেবে কাটাল মেরিওল। তার মনে হলো

জীবন মানেই আপোষ। জীবনে বেঁচে থাকা ক্রমাগত আপোষ করে চলা সত্যের সঙ্গে প্রকৃত সত্য কোথাও নেই জীবনে ও জগতে। বাস্তব এই সব আপাতদৃষ্ট অস্বাভাবিক রূপের অন্তরালে যে আসল সত্যকে খুঁজে চলেছে তা কোথায় পাবে সে?

বিছানায় শুয়ে মেরিওলের মনে হলো বার্নে সম্পর্কে তার এই মোহভঙ্গ ও মনোবেদনার কারণ হলো ঈর্ষা। কোন এক প্রেমান্ধ আবেগপ্রবণ প্রেমিকের প্রতিনায়কের প্রতি ঈর্ষা। করায়ত্ত প্রেমাস্পদ অপরের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে এই ধরনের একটা ভয়।

কিন্তু মেরিওলের এটা বোঝা উচিত, বার্নে তার প্রেমিকা হলেও সে ত তার কেনা কোন জড়পদার্থ নয়। তার একটা জীবন আছে, হৃদয় আছে, নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আছে। সুতরাং সে কাকে কখন ভালবাসবে তা নিয়ে কোন চিন্তা করা উচিত হবে না তার পক্ষে।

রাত্রি শেষ হতেই যাবার জন্যই তৈরী হলো মেরিওল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা জেগে উঠল বুকে, জেগে উঠল নতুন ক্ষুধা।

বার্নে তার ঘরে বসে একখানা চিঠি লিখছিল। মেরিওলকে আসতে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে উঠে গেল সে। বলল, এস এস প্রিয়তম।

বার্নের সে অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিকতার উত্তাপ দেখে অবাক হয়ে গেল মেরিওল। সেই সংশয়ের কুটিল ছায়াটা মন থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। মেরিওল বলল, পৃথিবীতে দুই ধরনের প্রেমিক আছে। এক ধরনের প্রেমিক ভালবাসার বস্তুকে কিছুটা উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গেই সব উদ্যম সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আর এক ধরনের নিষ্ঠাবান প্রেমিক আছে যারা তাদের প্রেমের বস্তুর সঙ্গে নিজেদের চিরদিন বেঁধে রাখে দাসত্বের এক অক্ষয় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। তাদের স্থূল দেহগত কামনার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায় তাদের আত্মার সূক্ষ্মসুন্দর যত সব অনুভূতি আর এষণা।

বার্নে সবকিছু শুনে খুব খুশি হলো। পুলকের রোমাঞ্চ জাগল তার সারা দেহে।

মাদাম ব্রেতিয়ানে দেখা করতে আসায় মেরিওল আর বসল না। উঠে পড়ল। বার্নে তাকে এগিয়ে দিতে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হচ্ছে?

মেরিওল বলল, তুমি এই শুক্রবার আমার ওখানে আসবে?

নিশ্চয় যাব। কিন্তু কখন?

ঠিক সেই সময় অর্থাৎ বেলা তিনটে।

ঠিক আছে। শুক্রবার তাহলে। বিদায়।

বার্নে ফিরে গেল তার ঘরের ভিতর।

বাইরে এসে মেরিওল ভাবল, এখনো দুটো দিন তাকে কাটাতে হবে

একা একা। ভোগ করতে হবে বিরহের সেই তীব্র যন্ত্রণা।

শুক্রবার তার বাগানবাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘণ্টা আগে এল মেরিওল। এসে অপেক্ষা করতে লাগল অনন্যচিত্তে। বার্নে এল নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে। আজ বেশ কিছুটা দেরী হয়েছিল।

বার্নে এসে বলল, আমার খুব দেরী হয়ে গেছে, না?

মেরিওল বলল, এমন কিছু না। ভিতরে যাবে ত?

বার্নে ভিতরে গিয়ে তাদের শোবার ঘরে বসল। বলল, আচ্ছা এ বাড়ির ঠিকানাটা কি তোমার নামে?

মেরিওল বলল, এখানে আমার নাম মঁসিয়ে নিকোল।

বার্নে বলল, ঠিক আছে। মনে থাকবে। যদি আসতে দেরী হয় বা কোন রকমে আসা না হয় তাহলে আমি যথাসময়ে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেব তোমায়।

তারপর আজ এখানে আসতে কেন দেরী হয়েছে সে বিষয়ে একটা গল্প বলল বার্নে। বলল, শোননি ব্যাপারটা? আমি এইমাত্র শুনলাম, এক ঘণ্টাও হয়নি।

মেরিওল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। হাসিমুখে বলতে লাগল বার্নে। ঘটনাটা মনে করতে তখনো হাসি পাচ্ছিল তার, ঘটনাটা ঘটেছে মাদাম ব্রেতিয়ানের বাড়িতে। একটা গানের আসরে। মাসিভালের স্ত্রী সম্প্রতি দারুণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে স্বামীর প্রতি। সেদিন সে উপস্থিত ছিল সেই গানের আসরে। মাসিভাল যেমন গান ধরেছে তার স্ত্রী এসে তাকে কি সব বলতে লাগল ঝগড়ার ভঙ্গিতে। তখন মাসিভাল তাকে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে চাইলে তার স্ত্রী সহসা আঘাত করে বসে তার মুখে। তার চুল দাড়ি ছিঁড়তে থাকে। তাকে কামড়াতে থাকে। লামার্থে সে আসরে ছিল। সবাই ধরাধরি করে তাদের দুজনকে দুদিকে নিয়ে যায়। পরে শান্তি ফিরে আসে ঘরে। একথা এখন রঙচঙিয়ে সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে লামার্থে।

ভিতরে এক ঘণ্টা থাকল বার্নে। তারপর চলে গেল।

বার্নে চলে গেলেও সেই শোবার ঘরের একটা সোফায় বসে ভাবতে লাগল মেরিওল। মনে হলো ওদের মিলনের মধ্যে সে উত্তাপ আর যেন নেই।

৫

শীত না পড়া পর্যন্ত ওদের এই সম্পর্কটাকে কোনরকমে তালি দিয়ে বাঁচিয়ে যেতে লাগল বার্নে। মাঝে মাঝে সে আসত মেরিওলের বাগানবাড়িতে। থাকত কিছুক্ষণ করে। কিন্তু বড় দেরীতে আসত। তাছাড়া আসতও আগের থেকে কম। প্রায়ই টেলিগ্রাম করে তাদের মিলনের সময়টা হয় পাল্টে দিত, না হয় বলত যেতে দেরী হবে।

কিন্তু বার্নে নিয়মিত মেরিওলের কাছে না এলেও তাকে যেতে বলত তার বাড়িতে। আর মেরিওল এটা লক্ষ্য করত সে গেলে তাকে দেখে সত্যিই খুশি হয় বার্নে। মেরিওলের মনে হত, দেবতার যেমন ভক্ত উপাসকের প্রয়োজন হত তেমনি তাকেও প্রয়োজন আছে বার্নের।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করল মেরিওল, আজকাল অন্যান্য বন্ধুদের সামনেই মেরিওলের প্রতি তার আগ্রহ দেখায় বার্নে। তার প্রতি তার বিশেষ আসক্তির অনেক পরিচয় দেয় সে।

একদিন মেরিওল একথাটা তুলল বার্নের কাছে।

বার্নে বলল, যদি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে কোন কিছুই গ্রাহ্য করব না আমি।

মেরিওল বলল, আমিও ঠিক তাই।

বার্নে বলল, আমি কি তোমায় ভালবাসিনা প্রিয়তম ?

মেরিওল বলল, হ্যাঁ এবং না দুটোই বটে। তুমি আমাকে যতখানি অন্তরে ভালবাস ততখানি কিন্তু বাইরে বাসনা। সে ভালবাসা প্রকাশ করো না।

বার্নে হাসল। বলল, দেখ সবাই সব জিনিস পারে না।

মেরিওল বলল, তুমি কিন্তু বুঝতে পারছ না আমি কত গভীরভাবে ভাল-বাসি তোমায় আর তোমার মধ্যেও সেই ভালবাসাই জাগাতে চাই। তুমি বুঝতে পারছ না কী পীড়ন আমি সহ্য করছি। মনে হচ্ছে এমনই এক বরফের টুকরোকে ধরতে যাচ্ছি যা আমাকে জমিয়ে দিয়ে নিজে গলে যাচ্ছে।

বার্নে কোন উত্তর দিল না। সে এসব কথা তুলতে চাইছিল না। মেরিওলও তাই আর আলোচনা করল না একথা।

শীতের শেষের দিকে কাউন্ট বার্নহাম এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত অফিসে। রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মাদাম দ্য মালতেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অনুষ্ঠানে বার্নে সকলের মন জয় করায় কূটনৈতিক জগতে রাতা-রাতি বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠল বার্নে। তার খ্যাতি ও অনুরাগীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেল বিপুলভাবে।

প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত অসংখ্য রং বেরঙের গাড়ি। চাকরেরা হিমসিম খেয়ে যেত অতিথিদের আপ্যায়ন করতে। কাউণ্ট, যুবরাজ, কাউণ্ট পত্নী, লোকসমাজের অনেক উঁচু মহলের কত সব বড় বড় অতিথি।

এদিকে বার্নের কথা ভেবে দুর্বল হয়ে পড়ল মেরিওল দিনে দিনে। সে আগের থেকে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ল। মনে হলো সে যেন রোগী। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বার্নের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলো মেরিওল।

তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বার্নে বলল, কি ব্যাপার, তুমি যে দেখছি খুব রোগা হয়ে গেছ ?

মেরিওন বলল, তুমি দেখছ তোমার প্রতি আমার ভালবাসাই আমাকে এমনি রোগা করেছে। তুমি বুঝতে পারছ না আমি মরতে বসেছি।

বার্নে বলল, কিন্তু ভালবাসার জন্যে কেউ মরে না জেনে রেখো।

বার্নের একটা হাত তুলে নিয়ে মেরিওন বলল, আমি ভালবাসছি। কিন্তু তার কোন উত্তর পাচ্ছি না। এতে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি মনে। বুঝতে পারছ না কত কাতর আবেদন আমি জানাচ্ছি তোমাকে।

সব কথা শুনে বার্নে বলল, তারপর? আর কি বলবে শুনি। তুমি হয়ত বলবে আমাকে, তুমি আমার মত ঠিক আমার মত ভালবাস। কিন্তু তোমাকে আমি আগেই বলেছি সবাই সব কাজ পারে না। ঈশ্বর আমায় যেভাবে গড়েছেন আমি সেইভাবেই চলব। তার বাইরে আমি কিছু করতে পারি না। আমি যে অন্যান্য বন্ধুদের থেকে তোমাকে বেশী পছন্দ করি তার প্রমাণ তুমি আগেই পেয়েছ।

মেরিওন বলল, তবু আমি বলছি তুমি আমাকে ভালবাস না।

বার্নে বলল, হ্যাঁ, আমি তোমাকে অবশ্যই ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসার যে ক্ষমতা আমার আছে সেই ক্ষমতা অনুসারেই আমি ভালবাসি।

মেরিওন বলল, না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেভাবে চাইছি সেইভাবেই তুমি ভালবাসতে পার, কিন্তু তোমার মধ্যে সে ধরনের ভালবাসা জাগাবার ক্ষমতা আমার নেই।

বার্নে বলল, এটা তোমার ভুল ধারণা। ভুল মেরিওন।

মেরিওন বলল, কী আশ্চর্য। ভালবাসার এই উপলব্ধি কত স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে। তুমি আমাকে ভালবাস ঠিক ক্ষণিকের অতিথির মত, যে তোমার পাশে শূন্য চেয়ারটায় ক্ষণকালের জন্য বসে থাকবে, তোমাকে ক্ষণিকের জন্য কিছু আনন্দ দেবে। কিন্তু আমি? আমি তোমাকে চিরদিনের মত কাছে পেতে চাই। আমার হৃদয়ের আসনে বসিয়ে রাখতে চাই।

বার্নে বলল, আমি তা জানি। আমি জানি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবাস এবং আমি চাই এইভাবেই তুমি আমায় চিরদিন ভালবেসে যাবে। কিন্তু একটা কথা, আমার কাছ থেকে এর বেশী কিছু চেও না। আমি তোমার জন্যে আমার আসল স্বরূপকে বিকৃত করতে পারব না।

মেরিওন বলল, আচ্ছা, তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছ আমাকে অন্যভাবে ভালবাসতে পার কিনা।

বার্নে চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, আমারই কিছুটা ভুল হয়েছে। আমি নিজেকে তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে অন্যভাবে ভালবাসবে, তাই আগের মত আমার নিষ্ঠা নেই এই ভালবাসায়।

মেরিওন বলল, কেন নেই?

কারণ তুমি ভালবাসাকে একটামাত্র কথার মধ্যে বন্দী করে রাখতে চাও। সে কথা হলো, হয় সব, না হয় কিছুই না। কিন্তু জেনে রেখো, প্রথমে যারা সব চায় বা সব পায় ভালবাসাবাসির ক্ষেত্রে তারা পরে কিছুই পায় না।

মেরিওল বলল, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না আমি চেয়েছিলাম আমার তোমার ভালবাসার ধারাটা হবে সম্পূর্ণ পৃথক। তুমি আমাকে আজ যেভাবে ভালবাসছ এভাবে ত অন্য যে কোন বন্ধুকেও ভালবাসতে পার।

বার্নে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না, আমি তা মনে করি না। আসল কথা কি জান? আমার কল্পনাই প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। যা ভেবেছিলাম তা হলো না। আমি তোমাকে আমার যথাসাধ্য দিয়ে ভালবেসেছি। আমি সততার সঙ্গে স্বীকার করছি, এর চেয়ে বেশী ভালবাসা দেবার বা অন্য কোনভাবে ভালবাসার ক্ষমতা আমার নেই। তবু তুমি শুনবে না।

বার্নের কথা শেষ হতে না হতে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে তার জামার আঁচলের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিল মেরিওল।

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে মেরিওলকে তুলে ধরল বার্নে। মেরিওল দেখল তার চোখে জল। বলল, তুমি উঠে এসে এইখানে বস। এই ঘরে আমার সামনে নতজানু হয়ে বসা ঠিক উচিত হবে না।

তারপর বার্নে একটা চিত্র প্রদর্শনী দেখতে যাবার জন্য দিন ঠিক করল। একসঙ্গে দুজনে যাবে।

মেরিওল যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে বার্নে বলল, আচ্ছা, আগামীকাল তুমি আঁতেনিলের বাড়িতে থাকবে?

নিশ্চয় থাকব।

মনে এক অপরিসীম তৃপ্তির আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল মেরিওল।

৬

মাদাম বার্নের গাড়িটা দ্রুত বেগে ছুটে চলতে লাগল আঁতেনিলের সেই বাগানবাড়ির দিকে। একটু আগে প্রবল একটা ঝড় বয়ে গেছে। দারুণ শীত পড়েছে। গরম ভারী পোশাকে ঢাকা ছিল বার্নের গোটা দেহটা।

গত দুমাস হলো বার্নে মেরিওলের ইচ্ছামত তাকে ভালবাসার চেষ্টা করেছে। সে তাকে কতবার বলেছে, মনে হচ্ছে আমি তোমাকে সত্যিই দিনে দিনে আরো বেশী করে ভালবাসছি। আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছি তোমার সঙ্গে।

হঠাৎ কি মনে হলো বার্নের। ভাবল আমি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে যাব। এখন যাব না। এখন গেলে সে খুব অভিভূত হয়ে পড়বে।

এই ভেবে সে তার গাড়ির ফুটম্যানকে ডেকে বলল, অস্ট্রীয়ার রাষ্ট্রদূত অফিসে চল।

অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড়ালে একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানল

বার্নে, মাদাম বাড়িতেই আছে।

উপরে উঠে সোজা মাদাম মালতেনের ঘরে চলে গেল বার্নে। গিয়ে দেখল মালতেন চিঠি লিখছে। বার্নেকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর পাশাপাশি দুজনে বসল।

সম্প্রতি এক নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। বার্নে বলল, আজ রাতে তুমি আমার বাড়িতে খাবে। আমি কিন্তু আর বিকালে আসব না।

বার্নে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বাজে। তার মনে পড়ে গেল মেরিওল এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

উঠে পড়ল বার্নে। মালতেন বলল, এরই মধ্যে উঠলে ?

বার্নে বলল, হ্যাঁ, আমার এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। পরে আর একদিন অনেকক্ষণ বসব। আজ চলি।

আঁতেনিলের সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে বার্নে দেখল সেখানে দারুণ শীত।

বার্নে তার মোটা কোটটা খুলে বলল, আজ বড় শীত, গায়ের গরম জামা খুলতে পারব না।

মেরিওল ভাবল, আসলে ওদের প্রেমসম্পর্কের মধ্যে আগেকার মত আর সে উত্তাপ নেই বলেই শীতটা এতখানি তীব্র লাগছে বার্নের। তবু একবার বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, খুলতে পারবে না ?

বার্নে বলল, জান, আমার বাসায় খুব ভাল একটা পার্টি দিচ্ছি।

মেরিওল বলল, কে আসছে ?

বার্নে বলল, ভাস্কর প্রেদোল। লামার্থে নিয়ে আসছে। ওর ভাস্কর্যের কাজ দেখে আজ সারা প্যারিস শহর ত মুগ্ধ। তুমি তাকে চেন ?

মেরিওল বলল, কিছুটা চিনি। উনি এমনই একজন লোক যিনি তাঁর নিজের শিল্পকর্মকে বড়ই ভালবাসেন।

বার্নে বলল, আজকের ভোজসভাটা সত্যিই খুব আনন্দদায়ক হবে।

মেরিওল প্রশ্ন করল, আর কে আছে ?

বার্নে বলল, রাজকুমারী মাদাম দ্য মালতেন।

মালতেনের নাম শুনে বিরক্তি বোধ করল মেরিওল। বলল, আর কে আসছে ?

বার্নে বলল, মাসিভাল, বার্নিহাম আর জর্জ মালত্রি। এই ক'জন মাত্র। বাছাই করা ক'জন বন্ধু।

বার্নে অসহিষ্ণুভাবে বলল, ওঃ আজ কি দারুণ ঠাণ্ডা।

মেরিওল বলল, এত ঠাণ্ডা ?

বার্নে একবার কেশে বলল, আজ আমার এর মধ্যেই ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সর্দিকাশি ধরে গেছে।

মেরিওলের আবার মনে হলো, আসলে বার্নে তার এখানে আর থাকতে

চায় না, তার মন বলছে না বলেই এত বেশী ঠাণ্ডা লাগছে। মেরিওল তবু বলল, তোমার পোশাকটা আজ খুবই মনোরম দেখাচ্ছে।

বার্নে বলল, এখন কি দেখছ, রাত্রিতে ভোজসভায় দেখবে। কিন্তু আমার ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। আমাকে যেতে দাও প্রিয়তম। আমি এখন যাই।

কোন বাধা দেবার চেষ্টা করল না বা থাকতে অনুরোধ করল না মেরিওল।

বার্নে বলল, বিদায় তাহলে। রাত্রিতে আবার দেখা হবে।

মেরিওল বলল, ঠিক আছে।

বার্নে চলে যেতে নিজের মনে ভাবতে লাগল মেরিওল। পরে নিজেকে নিজেই বোঝাল। ভেবে কি হবে? বার্নে ত আগেই বলে দিয়েছে আজকাল কোন পুরুষ কোন মেয়েকে ভালবেসে কখনো আঘাত পায় না। তাছাড়া যে যত বড় লোকই হোক না কেন, প্রেমিক হিসাবে যে যত বড়ই যোগ্য হোক না কেন সে কারো প্রেমে অভিভূত হবে না কখনো একেবারে।

বার্নেকে যে সে একেবারে অভিভূত করতে পারেনি তার প্রেম নিবেদনের দ্বারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলো মেরিওল। চোখে জল এল তার। হাতে মুখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বাড়ি গিয়ে পোশাক পরে বার্নের নৈশ ভোজসভায় যাবার জন্য তৈরী হলো।

৭

মাদাম বার্নের সেই নৈশ ভোজসভায় সবচেয়ে আগে পৌছল মেরিওল। একা একা বসে ঘরের ঝকঝকে আসবাবপত্র দেখতে লাগল।

খুব একটা জমকালো পোশাক পরে বার্নে ঘরে ঢোকার কিছু পরে চাকরে মাদাম মালতেনের নাম ঘোষণা করল। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বার্নের মুখখানা। মাসিভাল ও জর্জ মালত্রি এল। প্রেদোল এখনো আসে নি।

উপস্থিত অতিথিরা সকলেই প্রেদোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। প্রেদোল যে সুদূর নবজাগরণের যুগের প্রাচীনপন্থী শিল্পরীতির উপর আধুনিকতার সমস্ত মহিমা আরোপ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এক নতুন শিল্পরীতির উদ্ভাবন করেছেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত হলো। মালত্রি বলল, বর্তমান মানবজীবনের এক ঈশ্বরপ্রেরিত ভাষ্যকার।

কিন্তু যে যাই বলুক লামার্থের সঙ্গে প্রেদোল এসে ঘরে ঢুকতেই হতাশ হয়ে গেল সকলে। প্রেদোলের চেহারাটা এমনই বিশ্রী, তার হাতগুলো এমনই দৈত্যের মত বলিষ্ঠ আর লম্বা যে তাকে এই ধরনের কোন সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে সুন্দরী মহিলাদের পাশে মোটেই মানায় না। কিন্তু প্রেদোলের চেহারাটা দৈত্য বা কশাই-এর মত মনে হলেও তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম সুন্দর মন আছে তার পরিচয় অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়া গেল। সেই ঘরে ব্রোঞ্জ বা পাথরের তৈরী যে সব ভাস্কর্যের ছোটখাটো মূর্তি ছিল সেগুলি এনে হাতে নিয়ে সাবধানে দেখে তাদের প্রশংসা করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল প্রেদোল।

এরপর মাদাম বার্নের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেদোল বলল, আমি যে কোন শিল্প ভালবাসি।

বার্নে বলল, আপনার শিল্পই সবচেয়ে প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। প্রেদোল বলল, কেন, বাইবেলের যুগের মাঠের রাখাল বালকেরা বাঁশি বাজাত। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অকৃত্রিম সুরসৃষ্টি করত সামান্য বাঁশের বাঁশিতে।

মাদাম বার্নে বলল, আচ্ছা আপনি গান ভালবাসেন?

প্রেদোল বলল, আমি ত আগেই বলেছি আমি যে কোন শিল্প ভালবাসি।

বার্নে বলল, আচ্ছা, প্রথম ভাস্কর্যের উদ্ভাবন করেন যিনি তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে?

প্রেদোল বলল, হেলেনীয় বা গ্রীকরীতি অনুসারে বলা হয় দেদালাস নামে এথেন্সের এক শিল্পী। কিন্তু এ বিষয়ে একটি রূপকথা আছে তাতে বলা হয় দিবুভেদে নামে সাইকোনিয়ার এক পটুয়া এ শিল্প উদ্ভাবন করেন। দিবুভেদের কোরা নামে এক কন্যা ছিল। কোরা একটি ছেলেকে ভালবাসত। একদিন কোরা তার প্রেমিকের এক রেখাচিত্র আঁকে। পরে তার বাবা কাদামাটি নিয়ে সেই রেখাচিত্র দেখে মূর্তিটি গড়ে তোলেন। এইভাবেই হয় ভাস্কর্যের জন্ম।

লামার্থে উৎসাহিত হয়ে বার্নেকে বলল, যে কোন কথা উনি এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন যে তা গভীর রেখাপাত করে মনে।

প্রেদোল কিন্তু নিজেকে জাহির করার কোন ভাণ না করে বা অহেতুক আত্মপ্রচারে মন না দিয়ে একমনে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ করে এক গ্লাস মদ পান করল প্রেদোল। তারপর চেয়ারের উল্টোদিকে একটি আয়নায় প্রতিফলিত আধুনিক শিল্পীর আঁকা একটি ছবি দেখে প্রেদোল বলল, এ ছবি ফলনিয়েরের নয়?

মাদাম বার্নে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি কিকরে তা জানলেন?

প্রেদোল বলল, জানা উচিত। চিত্রশিল্পের সঙ্গে ভাস্কর্যের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে।

প্রেদোল চলে গেলে তার সম্বন্ধে মাদাম বার্নের কাছ থেকে মতামত চাইল লামার্থে। বার্নে বলল, ভাল তবে অমার্জিত হীরের মত।

লামার্থে আর মেরিওল বার্নের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। লামার্থে শান্ত জনবিরল সেই পথে এগিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগল, প্রেদোল একজন সত্যিকারের জাত শিল্পী। দেখে যতদূর মনে হলো মাদাম বার্নের খুব একটা ভাল লাগেনি তাকে। আসল কথা মেয়েরা বড় ভাবপ্রবণ; তারা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোন শিল্পরস আস্বাদন করতেই পারে না। আর প্রেমের ক্ষেত্রেও তারা শুধু চতুর অভিনেত্রীর মত অভিনয় করে যায়।

মেরিওল বলল, দোষটা ত আমাদেরই। আমরা এই ধরনের মেয়েদের

পছন্দ করি কেন?

লামার্থে বলল, আমি দেখেছি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরে এখনো ভাল মেয়ে আছে যারা ভালবাসতে জানে।

মেরিওলের আর ভাল লাগছিল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে আর বার্নের বাড়ি কোনদিন যাবে না। সে লামার্থেকে বলল, আমি যাচ্ছি। গিয়েই শুয়ে পড়ব।

বাড়ি গিয়ে বার্নেকে একটা চিঠি লিখল মেরিওল। সে চিঠিতে লিখল, বিদায়। আমার প্রথম চিঠিটার কথা মনে আছে কি? তখনও আমি বিদায়ের কথা বলেছিলাম। কিন্তু চলে যাইনি। সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল। এর কারণ কি আমাকে খুলে বলতে হবে? এই চিঠি তুমি পাবার আগেই আমি প্যারিস ছেড়ে চলে যাব। তোমাকে ভালবেসে একটা জিনিস বুঝেছি, তোমার মত মেয়েকে আমাদের মত লোকের ভালবাসা উচিত নয়। আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম তখন আমি ভাবতেই পারিনি এতখানি দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হবে তোমার জন্যে। তুমি ছাড়া অন্য এক মেয়ে আমাকে আমার আকাঙ্খিত প্রেম দান করে আমাকে সুখী করতে পারত। আমাকে তুমি ক্ষমা করবে। তোমাকে আমি তিরস্কার করছি না। সে অধিকার আমার নেই। আর তাছাড়া আমার দুঃখটা ঠিক কোথায় তা তুমি বুঝতে পারবে না। তোমার কাছে যে শান্ত নিরুত্তাপ যুক্তিভিত্তিক ভালবাসা এতদিন পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। কিন্তু আমি ত ঠিক এই ধরনের ভালবাসা চাই না। আমি চাই এমনই এক জীবন্ত সরল ভালবাসা যা আমার শুষ্ক মরা জীবন-নদীতে নিয়ে আসবে প্রাণের জোয়ার। কোন ক্ষুধার্ত ভিখারিকে যদি তুমি রুটির বদলে খেলনা দাও তাহলে সে তৃপ্ত হবে কি? হবে না। তেমনি আমিও তোমার ঐ ধরনের প্রেমদানে তৃপ্ত হব না। তাই বিদায় জানাচ্ছি চিরতরে। বিশেষ করে আজকের এই সন্ধ্যায় আমি আমার সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসছি তোমায়। কিন্তু···। বিদায়। আঁদ্রে মেরিওল।

তৃতীয় পর্ব

১

রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিনের সোনালী সুন্দর সকালে একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হলো মেরিওল। সে যাবে এক সুদূর অরণ্য অঞ্চলে। এই নাগরিক সভ্যতার জটিলতা হতে বহুদূরে।

সঙ্গে কোন চাকর পর্যন্ত নেয় নি মেরিওল।

ফতেনব্লো অরণ্য অঞ্চলে পৌঁছে গাড়ি থামাতে বলল মেরিওল। গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় এক উকিলের কাছে গিয়ে থাকার মত কোন বাড়ি বিক্রি আছে কিনা তার খোঁজ করল।

মধ্যবয়সী গম্ভীর প্রকৃতির এক উকিল প্রশ্ন করলেন, আপনি একা? সঙ্গে চাকর বাকরও নেই?

মেরিওল বলল, আমি তাদের প্যারিসে রেখে এসেছি। এখানে নতুন চাকর দেখে নেব।

উকিল ভদ্রলোক মতিগনি অঞ্চলে এক বাড়ির সন্ধান দিলেন। সঙ্গে একজন লোক দিলেন। মেরিওলকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই বাড়িতে।

তখন সবেমাত্র শীত শেষ হয়েছে। গাছে গাছে নতুন কচিপাতা গজিয়ে উঠতে শুরু করেছে। সেই শান্ত বনপথের মুক্ত নির্মল বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিল মেরিওল। গাড়িটা এগিয়ে চলল। ওরা মার্লোতের একটা হোটেল পার হয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল যার বাঁ দিকে একটা বন আর ডান দিকে একটা ফাঁকা মাঠ। আর একটু এগিয়ে গিয়ে ওরা একটা নদী পেল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটা দোতলা বাড়ি।

বাড়িটা ভালকরে ঘুরে দেখল মেরিওল। এই বাড়িটার জন্যেই তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। নিচের তলায় আছে একটা বসার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর আর দুটো ছোট ঘর। উপরতলায় আছে একটা শোবার ঘর আর একটা বড় ঘর। স্থানীয় লোকের সাহায্যে দুজন মেয়েলোক পেল মেরিওল। একজন রান্না করবে আর একজন ঘর ঝাঁট দেবে, জামাকাপড় কাচবে।

মেরিওল ক্রমে জানতে পারল, এ বাড়িতে এর আগে এক নবদম্পতি বাস করত। স্বামী ছিল একজন শিল্পী। পাঁচ বছর এখানে থাকার পর বিরক্ত হয়ে চলে যায় এখান থেকে।

ক্রমে দিন গিয়ে সন্ধ্যা এল। মেরিওল ঘড়ি দেখল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। এ জায়গাটা ভীষণভাবে স্তব্ধ, দারুণ নীরব। সহসা বার্নের কথা মনে পড়ে গেল মেরিওলের। জানতে ইচ্ছা করল, ঠিক এই সময়ে কি করছে বার্নে। তার ঘরে এখন কোন্ কোন্ বন্ধু আছে।

মেরিওলের আরো জানতে ইচ্ছা করল, বার্নে এখন কার করায়ত্ত? সে কি এখন সুদর্শন কাউন্ট বার্নহামকে ভালবাসে।

সামনে শূন্য অন্ধকার প্রান্তরটার পানে একবার তাকাল মেরিওল। ভাবল বার্নের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তা পারল না। যেদিকেই তাকাতে লাগল সেইদিকেই সে শুধু বন্ধু বান্ধব পরিবৃত তার প্রেমিকাকে দেখতে লাগল। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখদুটো বন্ধ করল। কিন্তু তবুও শান্ত করতে পারল না মনকে। শুধু বারবার একটা কথা ভাবতে লাগল, জীবনে এত বড় ভুল সে আর কখনো করেনি।

পরদিন সকালে কিছু বেলার পর গাড়ি আনতে বলল মেরিওল। গাড়িতে করে মার্লোতে গিয়ে সেই হোটেলটায় লাঞ্চ খেয়ে আসবে।

হোটেলে গিয়ে মেরিওল দেখল একটি মেয়ে তার দিকে পিছন ফিরে

কার সঙ্গে কথা বলছে। দেখল, মেয়েটির বয়স বেশী নয় এবং সে সুন্দরী।

তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মেরিওল একবার কাশতেই পিছন ফিরে তাকাল মেয়েটি। মেরিওল বলল, লাঞ্চ চাই।

মেয়েটি বলল, লাঞ্চ আর ডিনার আমাদের এখানে প্রায় একই রকমের।

মেরিওলের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে চলে গেল মেয়েটি। কিছু পরে নিজের হাতে খাবার নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল।

মেরিওলের মনে হলো এই হোটেলটা মধ্যযুগের সেই পান্থশালা।

হোটেল থেকে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুতেই ঘুম এসে গেল মেরিওলের চোখে। কারণ সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ভোর না হতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। মেরিওলের মনে হলো সে এই রাতের মধ্যে দুবার একই দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সে দুঃস্বপ্ন হচ্ছে বার্নেকে কেন্দ্র করে।

সকালের শান্ত বাতাসে মনটা শান্ত হলো মেরিওলের। কিন্তু বেলা বারোটা পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র না পেয়ে মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। অথচ সে তার প্যারিসের বাড়িতে ও ফতেনব্লোর অফিসে জানিয়ে দিয়েছে যদি কোন চিঠি আসে তার নামে তা যেন সরাসরি তার কাছে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরের খাওয়ার সময় আবার মার্লোতের সেই হোটেলে চলে গেল মেরিওল। সেই মেয়েটিকে বলল, আমাকে যে খাবার দেবে আমি তা ঐ গাঁয়ে গিয়ে খাব।

দুপাশে সাদা সাদা টালিওয়ালা বাড়ির মাঝ দিয়ে সোজা চলে গেছে লম্বা রাস্তাটা। পথে যেতে যেতে একটি কুঁড়েতে দুটি চাষী মেয়ে দেখল মেরিওল, শহরের অভিজাত সমাজের ছলবিলাসিনী মেয়েদের সঙ্গে এই সব সরল গ্রাম্য মেয়েদের পার্থক্যের কথা ভাবতে লাগল। তাদের মধ্যে ছোট মেয়েটি ছিল মার্লোতের সেই হোটেলের। মেরিওল বলল, আমি এইখানেই খাব।

মেরিওল জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি প্যারিস থেকে এসেছ?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ স্যার।

মেরিওল আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কতদিন আছ এখানে?

মেয়েটি উত্তর করল, মাত্র একপক্ষকাল।

কেমন লাগছে?

এত তাড়াতাড়ি ঠিক বলা উচিত হবে না। তবে মোটামুটি ভালই লাগছে প্যারিসের থেকে। ওখানে আমার মন বিষিয়ে উঠেছিল।

মেরিওল বলল, আমার খাবারের দিকে রাঁধুনিকে একটু নজর দিতে বলবে।

মেয়েটি বলল, সে আপনি কিছু ভাববেন না স্যার।

বাড়ির উঠোনটার একপাশে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল মেরিওল। রান্নাঘরের দেয়ালের উপর ঝোলানো খাঁচায় একটা খুশ পাখি ডাকছিল। খাওয়ার পর বিকেলটা সেখানেই কাটাল মেরিওল। মেয়েটির কাছে তার অতীত জীবনের কথা জানতে চাইল।

মেয়েটি বলল, তার মা সেলাইএর কাজ করত। তার মাকে সে কাজে সাহায্য করত ছোট থেকে। তার বাবা কিছু করত না। সে খেত স্ত্রী আর মেয়ের রোজগারের পয়সায়। গত বছর তার মা মারা যাবার পর সে হোটেলে পরিচারিকার কাজ নেয়। তার বাবা কোথায় চলে গেছে তা সে জানে না। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে দারুণ খাটুনি। মার্লোতের করোত হোটেলের মালিক একবার প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে সেই হোটেলটায় গিয়ে পড়ে যেখানে সে কাজ করত। তার কাজ দেখে ভাল লাগায় মার্লোতে তার নিজের হোটেলে কাজ করার কথা বলে। তার সঙ্গে চলে আসে সে।

মেয়েটি বলল, তার নাম এলিজাবেথ লেক্রু।

পরদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাছ ধরার চেষ্টা করে কাটাল মেরিওল। স্থানীয় এক মুদির দোকান থেকে সব যোগাড় করল। তারপর দুপুরটা কাটতেই মতিগনি থেকে সোজা চলে গেল সেই মার্লোতের হোটেলে। লেক্রুও দূর থেকে মেরিওলকে দেখে খুশি হলো। এগিয়ে এল কাছে।

মেরিওল তাকে বলল, তোমার অতীতের কথা ত শুনলাম। এবার বল, ভবিষ্যতে কি করবে?

লেক্রু বলল, তা ত জানি না। আগামী কাল কি হবে তাই জানি না।

মেরিওল বলল, তা হলেও ভবিষ্যতের কথাটা প্রত্যেকেরই ভেবে রাখা উচিত।

লেক্রু বলল, অতশত ভাবতে পারি না। তবে ভাগ্যে যাই থাক আমি মেনে নেব। বরণ করে নেব নির্বিবাদে।

মেরিওল চলে গেল।

এরপর দুদিন যায়নি। তারপর একদিন মার্লোতের সেই করোত হোটেলে গিয়ে দেখল দুজন নবাগত যুবক বসে রয়েছে হোটেলের বারান্দায়। মেরিওল যেতেই হোটেলের মালিক এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। কারণ সে এখন হোটেলের বাঁধা খরিদ্দার। প্রায় রোজই যায় একবার করে।

কিন্তু লেক্রু তার কাছে এলে দেখল তার চোখদুটো লাল। মনে হলো একটু আগে কাঁদছিল সে। মেরিওল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হলো তোমার?

লেক্রু বলল, এই যুবকটি আমাকে নোংরা প্রকৃতির খারাপ মেয়ে ভেবে আমার উপর দুর্ব্যবহার করেছে।

মেরিওল বলল, তুমি তোমার মালিককে জানিয়েছিলে?

লেক্রু বলল, কোন লাভ নেই। এর কোন প্রতিকার করবে না। উল্টে তাড়িয়ে দেবে আমাকে। কিন্তু আমি এখন কোথায় যাব? এখানকার কোন কিছুই চিনি না আমি।

মেরিওল হঠাৎ বলে উঠল, তুমি আমার কাছে কাজ করবে? তুমি আমার কাছে খুব ভাল ব্যবহার পাবে। আমি যতদিন এখানে থাকব তুমি থাকবে। আমি প্যারিসে গেলে আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে যা খুশি করবে।

লেক্রু মেরিওলের মুখপানে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। আপনার কাছে আমি কাজ করব।

মেরিওল প্রশ্ন করল, কত বেতন এখানে পাও তুমি?

লেক্রু বলল, মাইনে ও বখশিস নিয়ে পঁচাত্তর ফ্রাঁ।

মেরিওল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তোমাকে একশো ফ্রাঁ করে দেব।

লেক্রু আশ্চর্য হয়ে গেল। খুশি হয়ে বলল, খুব ভাল হবে।

মেরিওল বলল, তোমাকে আমার খাবার তৈরী করতে হবে, কাপড়জামা ধুতে হবে আর ঘর পরিষ্কার করতে হবে।

লেক্রু উৎসাহিত হয়ে বলল, আমি সব করব স্যার।

তাহলে কখন আসছ?

আমি কাল দুপুরের মধ্যেই যাব স্যার।

মেয়েটির হাতে দুটো লুই দিয়ে চলে গেল মেরিওল। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লেক্রুর মুখখানা।

২

পরদিন সকালেই মেরিওলের মন্তিগনির বাড়িতে এসে হাজির হলো লেক্রু। একজন চাষী তার মালপত্র বয়ে নিয়ে এল। মেরিওল লক্ষ্য করল, চালচলন ও কথা-বার্তায় অনেক যেন পরিবর্তন হয়েছে লেক্রুর। সে আর আগেকার সেই মোহপ্রসারিণী হোটেল পরিচারিকা নেই। এখন সে অনেকখানি শান্ত হয়ে উঠেছে। সব দিক দিয়ে ভদ্র পরিবারের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

মেরিওলের কাছ থেকে সব কিছু শুনে নিল। তার দৈনন্দিন কাজকর্মের সমস্ত নির্দেশ সব বুঝে নিল। প্রথম দিন তার দরকার ছাড়া অন্য কোন কথা বলল না লেক্রু মেরিওলের সঙ্গে। দ্বিতীয় দিন হঠাৎ বলল, আপনার কি একা একা বিরক্ত লাগছে?

মেরিওল বলল, অল্পবিস্তর লাগছে।

লেক্রু বলল, তাহলে আপনি কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে পারেন স্যার।

মেরিওল বলল, তুমি জান বেড়াতে আমার বিশেষ ভাল লাগে না।

দিনে দিনে লক্ষ্য করল মেরিওল, তাকে খুশি করার জন্য ঘরগুলোকে সুগন্ধি ভায়োলেট আর প্রিমরোজ ফুল দিয়ে সাজায় লেক্রু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে। একদিন সকালে মেরিওল লক্ষ্য করল লেক্রু খুব সুন্দর একটি

পোশাক পরেছে। মেরিওল জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, সে তাকে ছুটো লুই দিয়েছিল সেদিন ; তাই দিয়ে কাপড় কিনে রাত্রে জামা তৈরী করেছে। মেরিওল খুশি হয়ে বলল, এই জামাটায় তোমাকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লেক্রর মুখখানা।

প্যারিসের যাবতীয় খবরাখবর জানতে চেয়ে লামার্থেকে একটা চিঠি দিয়েছিল মেরিওল। তার উত্তরে লামার্থে জানাল, মাদাম বার্নের জীবন-যাত্রার গতিপ্রকৃতির মোটেই কোন পরিবর্তন হয়নি। কথাটা জানা, তবু লামার্থের চিঠিতে তা পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল মেরিওলের।

সেদিন সকালে মেরিওলের শোবার ঘরে চা নিয়ে গিয়ে চমকে উঠল লেক্র। দেখে মনে হলো মেরিওল খুবই অসুস্থ ; মনে হলো প্রবল জ্বরে ভুগছে। লেক্র ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার ডাকব স্যার ?

মেরিওল শান্তভাবে উত্তর করল, না। আমাকে শুধু ডিম দাও। পরে চা খাব।

মেরিওলের সত্যিই এবার জায়গাটা একঘেঁয়ে লাগছিল। বাড়ির পিছনের দিকটা গভীর বন। এক বিশাল বনচ্ছায়া সব সময় গ্রাস করে থাকে বাড়ির একটা দিক। বাড়ির গা ঘেঁষে একটা ছোট্ট নদী নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। সারা দিন ধরে কিছু অচেনা পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

হঠাৎ মেরিওলের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লেক্রকে বলল, তুমি পড়তে জান ?

লেক্র বলল, হ্যাঁ, আমি ভালই পড়তে পারি। একবার বই পড়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যের দিকে কিছু ভাল বই আনিয়ে লেক্রকে দিয়ে পড়িয়ে শুনল মেরিওল। তাতে মনটা বেশ কিছুটা হালকা হলো।

রাত্রি দশটার পর শুতে গিয়ে হঠাৎ মেরিওলের মনে হলো তার ঘরের আশপাশে কিসের একটা খসখস শব্দ হচ্ছে। চারদিক অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। হঠাৎ কি মনে হলো পিস্তলটা নিয়ে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে মেরিওল স্নান-ঘরে গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। লেক্র তখন খালি গায়ে হাত মুখ ধুচ্ছিল। সে দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিওল। তার মাথাটা ঘুরছিল। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য কামনার এক আবেগ। লেক্র তা বুঝতে পেরেছিল। সে ছুটে এসে সহসা তার ছুটো নগ্নসিক্ত হাত দিয়ে মেরিওলের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

৩

পরদিন সকালে মেরিওলের কাছে চা নিয়ে এসে লজ্জায় চুপসে গেল লেক্র। গতকালের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইল মেরিওলের কাছে। মেরিওল তার একটি হাত শান্তভাবে টেনে নিয়ে বলল, বস।

এর আগে যতবার ভেবেছে মেরিওল তার মনে হয়েছে লেক্স তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। সে যা ভালবাসে লেক্স তাই করার চেষ্টা করে। তাকে সব দিক দিয়ে প্রীত করাই যেন লেক্সর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র কাম্য।

তাছাড়া নিজের কথাটাও ভেবে দেখেছে মেরিওল। লেক্সর প্রতি সে নিজেও কম আসক্ত নয়। লেক্সকে তার প্রয়োজন আছে। লেক্সর বয়স কম। লেক্স সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, তরুণী যুবতী। তার উপর সরল প্রকৃতির, শান্ত নম্র। লেক্স যেন তার তপ্ত যন্ত্রণাভরা মনের মাঝে শান্তির এক শীতল প্রলেপ।

মেরিওল বলল, একবারে নয়। একে একে সহজ করে তুলতে হবে ব্যাপারটাকে। প্রথমে কিছুদিন তুমি আমার সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করবে। তারপর এটা সবাই জেনে গেলে তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারব। তুমি আমার জীবনের অংশীদার হতে পারবে। আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে পারবে।

লেক্স সসঙ্কোচে বলল, না না, তা হয় না। লোকে কি বলবে তাহলে?

মেরিওলের চায়ের কাপটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল লেক্স।

বনের ভিতরে ঢুকে গিয়ে অনেক দূর দিয়ে বেড়িয়ে এল মেরিওল। লেক্সর কথা মনে করে তার ভালবাসার কথা মনে করে সমগ্র স্তব্ধনির্জন বনভূমিটাকে বড় ভাল মনে হচ্ছিল মেরিওলের। বাড়ি ফিরে দেখল তার জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লেক্স।

এরপর পরিপূর্ণভাবে লেক্সকে গ্রহণ করল মেরিওল। যে ধরনের ভালবাসা বার্নের কাছে চেয়ে পায়নি মেরিওল লেক্স তাকে যেন সেই ভালবাসাই দিচ্ছে প্রতি ক্ষণে। তার চুম্বনে ও আলিঙ্গনে আছে অকৃত্রিম নিবিড়তার উত্তাপ। তার প্রতিটি কথায় ও আচরণে আছে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের সুর।

তবু মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা পুরনো যন্ত্রণা অনুভব করে মেরিওল। বার্নের প্রতি তার প্রেম আজ মৃত, শুকনো পাতার মত তা ঝরে গেছে তার জীবনের বৃন্ত থেকে। তার জায়গায় আজ তার জীবনে জন্ম নিয়েছে এক নূতন প্রেম আর সেই নবজাত প্রেমের খাতিরে নববসন্ত সমাগমে উল্লসিত পক্ষীশিশুর মত এক অন্ধনিবিড় উল্লাসে ফেটে পড়ছে তার সমগ্র অন্তরাত্মা।

আজকাল লেক্স তার কাছেই শোয়। তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে মেরিওল, আবার সকালে তার চুম্বনে ঘুম ভাঙ্গে। তবু মাঝে মাঝে মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে যায় মেরিওলের। লেক্স জিজ্ঞাসা করে, কি হলো? কষ্ট হচ্ছে?

মেরিওল বলে, না, তুমি আমায় চুম্বন করো।

তবু লেক্সর সেই আবেগতপ্ত চুম্বনেও সেই ব্যথাটা যায় না মেরিওলের।

সে সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারে না বার্নেকে। একদিন কি মনে হলো হঠাৎ বার্নেকে একটা টেলিগ্রাম করল মেরিওল। লিখল মাত্র কয়েকটি কথা। তুমি আমার সম্বন্ধে এখন কি ভাব তা জানাবে। ইতি আঁদ্রে মেরিওল।

তার একদিন পরে সত্যি সত্যিই মেরিওলের মতিগনির বাড়িতে এসে হাজির হলো বার্নে। মেরিওল একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বার্নের হাতটা চুম্বন করে বলল, এটা তোমার অসীম দয়া। আমি কৃতজ্ঞ।

বার্নে বলল, চারিদিকে বন, একটা নদী। এই নির্জন বাড়ি। তুমি ত বেশই আছ দেখছি।

মেরিওল বলল, না, আমি সুখে নেই। কারণ আমি তোমাকে ভুলতে পারছি না।

মাদাম বার্নে বলল, চল একটু ঘুরে আসি। ওরা বাড়ির বাইরে সেই ছোট্ট নদীটার ধারে দুটো বেতের চেয়ারে বসল। বার্নে বলল, ও মেয়েটি কে ? কোথা থেকে আসে ?

লেক্রু সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলল মেরিওল, শুধু তার প্রতি তার ভালবাসার কথাটা বাদ দিয়ে। সবকিছু শুনে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাল না বার্নে। বার্নে বলল, আমি আমার নিজের মত করে ভালবাসি। আমার ভালবাসাটা তোমার কাছে শীতল বা নীরস মনে হতে পারে। কিন্তু এর কোন ফাঁকি নেই জানবে। মানুষের আবেগ বা উচ্ছ্বাস বেশী দিন স্থায়ী হয় না জীবনে। তুমি আমার স্বামী না হলেও তোমাকে আমি আমার প্রেমিক হিসাবে পেয়ে যেতে চাই চিরদিন।

মেরিওল গলে গেল কথাটা শুনে। কাঁপতে কাঁপতে যেন বসে পড়ল বার্নের গায়ের কাছে। বার্নের মুখে দেখা দিল আত্মপ্রসাদের হাসি। বিজয়িনীর গৌরববোধ। বলল, কবে ফিরছ প্যারিসে ?

মেরিওল বলল, আগামীকাল।

বার্নে বলল, তাহলে কাল আমার ওখানেই থাবে।

মেরিওল বলল, তুমি কখন যাবে ?

বার্নে বলল, আজ কঁতেনব্লোতে পাঁচটার ট্রেনটা ধরব। আজ রাতেই পার্টি আছে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক নতুন অতিথি আসছে। তার নাম শার্লেন, কাম্বোডিয়ার আবিষ্কারক। তার নাম এখন প্যারিসে সকলের মুখে মুখে।

মেরিওল মুষড়ে পড়ল কথাটা শুনে। একটু আগের জলে-ওঠা আশার ক্ষীণ দীপটা নিভে গেল আবার।

গাড়িতে করে স্টেশনে নিয়ে এল বার্নেকে। মেরিওলের পাশে বসে খোলা ঘোড়ার গাড়িতে বসে যেতে যেতে বনের গাছপালার সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেল বার্নে।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে বাড়ির মধ্যে লেক্রুকে কোথাও খুঁজে পেল না মেরিওল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা পুরনো চার্চে গিয়ে দেখা পেল লেক্রুর। সেখানে সে দাঁড়িয়ে কাঁদছে একা একা।

তার কাঁধের উপরে একটা হাত রাখতেই আরো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লেক্রু। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি এবার সব বুঝেছি। ওই মেয়েটি আপনাকে কোন কারণে আঘাত দিয়েছিল বলে আপনি এখানে চলে এসেছিলেন। মেয়েটি তাই আবার খুঁজতে এসেছে আপনাকে।

তাকে আসল কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করল মেরিওল। বলল, তুমি ভুল করছ। আমি আগামীকালই প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি। প্যারিসে তুমি আমার বাড়িতে গৃহিণীরূপেই থাকবে।

লেক্রুর বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা। তাই কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল টেনে টেনে, সত্যি? সত্যি করে বলছ?

মেরিওল বলল, আমি শপথ করে বলছি প্রিয়তমা।

আবেগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে লেক্রুকে জড়িয়ে ধরল মেরিওল। তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে টেনে নিল। বুকে বুক দিয়ে তার হৃদস্পন্দনের ভাষা শোনার চেষ্টা করল। তাকে অনেক ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সান্ত্বনা দিল। তবু মেরিওল অনুভব করল বার্নেকে সে জীবনে কখনো সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পারবে না।

লেক্রু দুহাত দিয়ে মেরিওলের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে তুমিই আমার সব। আমার পৃথিবী, আমার স্বর্গ—আমার সব। তবে একটা কথা তুমি আমায় দাও। তুমি এখানকার মত আমাকে সারা জীবন ভালবেসে যাবে? ঠিক এইভাবে?

মেরিওল মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাগুলো উচ্চারণ করে গেল, আমি চিরকাল তোমায় ঠিক এইভাবে ভালবেসে যাব।

———

মঁত ওরিয়ল

১

এনভাল গাঁয়ে ডাক্তার বনফিলের ডাক্তারখানাটা বড় মনোরম জায়গায়। ছোট্ট একটা নদীর ধারে লম্বা লম্বা গাছে ঘেরা একটা জায়গা। স্থানীয় বড় বড় জোতদারদের ভরসাতেই এই বন্য নির্জন অভারনে উপত্যকায় এত বড় একটা বাড়ি তৈরী করেছেন ডাক্তার বনফিল। নদীর দুধারে কিছুটা জায়গা জুড়ে দুটো পার্ক করা হয়েছে।

ডাক্তারখানার নিচেরতলার ঘরগুলো যত সব ওষুধপত্র আর রোগ চিকিৎসার উপকরণে ভরা। কিন্তু উপরতলায় ডাক্তারি বা চিকিৎসার কোন ব্যাপার নেই। সেখানে আছে শুধু ভোগের উপকরণ, আছে মদ আর গান বাজনার ব্যবস্থা।

ডাক্তারখানার অদূরে ছিল একটা আশ্চর্য ঝর্না যার জল যে কোন রোগের পক্ষে উপকারী। মেরি নামে এক গ্রাম্য মেয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকত সব সময়। যে-কোন আগন্তুক এলেই তার দেখাশোনা করত। কোন রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে তুলে দিত এক গ্লাস ঝর্ণার জল। গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে রোগীটি ধন্যবাদ দিত মেরিকে। শূন্য গ্লাসটা ফিরিয়ে দিত তার হাতে।

রোগীর সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। আজ হতে দুবছর আগে প্রথম যখন স্থাপিত হয় এই ডাক্তারখানা তখন থেকে আজ পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা বাড়েনি কিছুমাত্র। তার মানে আগে যা ছিল ঠিক তাই আছে।

অভারনে গাঁয়ের সেই আশ্চর্য ঝর্ণার জলে কি কি রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে তা পরীক্ষা করে দেখে ঝর্ণার নামের সঙ্গে নিজের নামের একটা অংশ জুড়ে দেন। নাম দেন 'বনফিল স্প্রিং'। এই ঝর্ণাটার সব দায়িত্বভার ছিল ডাক্তার বনফিলের উপর। তিনি একটি প্রচারপুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন ঝর্ণার জলের গুণাগুণের কথা সব জানিয়ে, আর তাতে নাকি খুব বড় বড় জমকালো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

অভারনে উপত্যকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখার জন্য আর তার আশ্চর্য বনফিল ঝর্ণার জল খাবার জন্য বহুদূর থেকে যাত্রী আসত। তাদের থাকা থাওয়ার জন্য তিন তিনটি হোটেলও গজিয়ে ওঠে···একটির নাম হোটেল স্প্লেনডিড, একটির নাম হোটেল দ্য থার্মিস আর একটির নাম হোটেল বিদাইলেত।

আবার আরো দুটি ডাক্তারখানাও গড়ে উঠল অভারনে গাঁয়ে।

ডাক্তার দুজনের মধ্যে একজনের নাম ডাক্তার অনোরত আর একজনের

নাম ডাক্তার লাতোনে। অনোরত স্থানীয় লোক। এই গাঁয়েই বাড়ি। ডাক্তারি পাশ করে গাঁয়েই ডাক্তারখানা খুলল। লাতোনে এসেছেন প্যারিস থেকে।

অল্প দিনের মধ্যে ডাক্তার লাতোনে আর ডাক্তার বনফিলের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ডাক্তার অনোরত সাদাসিদে মানুষ; তিনি নিরপেক্ষ রইলেন। ডাক্তার বনফিল বাইরের লোক হলেও এ অঞ্চলে অনেকদিন আছেন, ঝর্নার দায়িত্বও তাঁর হাতে; এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও বেশী। তাই তিনিই জিতে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

বড় অদ্ভুত ধরনের লোক ছিলেন ডাক্তার বনফিল। তিনি যেমন তাঁর চিকিৎসাধীন রোগীদের উপর কড়া নজর রাখতেন, তেমনি অন্যান্য ডাক্তারদের গতিবিধি ও কথাবার্তার উপরেও তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন। যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেনের মতই তিনি ছিলেন দাম্ভিক এবং কটুভাষী। তাঁর আদেশ ছিল অমোঘ। তাঁর মুখের উপর কেউ কোন কথা বলুক তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আবার কোন লোককে প্রথম দর্শনে ভাল লেগে গেলে তাকে আপ্যায়িত করতেন। প্রীত করার চেষ্টা করতেন। গাঁয়ে কোন বিদেশী অতিথি এলে তাকে ভাল লাগলে তিনি তাকে আনন্দ দান করতেন বিভিন্নভাবে আর তাকে তাড়াবার জন্য ভয় দেখাতেন।

সেদিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি বাঁধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মুখে ছিল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার লম্বা ফ্রক কোটটা ঢলঢল করছিল। হঠাৎ বনফিলের মনে হলো কে যেন তাকে ডাকছে।

মাথায় টুপীটা তুলে এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার বনফিল বলল, সুপ্রভাত মার্কুই। এখন কেমন আছেন?

মার্কুই দ্য রাভেনেল একজন বেঁটেখাটো লোক। করমর্দন করলেন ডাক্তার বনফিলের সঙ্গে। বললেন, ভাল। যদিও কিডনি ও মূত্রথলিটা এখনো কষ্ট দিচ্ছে তথাপি মোটের উপর ভাল। কিন্তু এখন আমি শরীরের কথা নিয়ে কোন আলোচনা করতে আসিনি। আমি একটা কথা বলতে এসেছি। আমার মেয়ে আজ সকালেই এসেছে। আমি তার ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই আপনার সঙ্গে। আমার জামাই মঁসিয়ে আঁদারমত, বা উইলিয়ম আঁদারমতকে চেনেন ত?

ডাক্তার বনফিল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি।

মার্কুই বলল, আমার জামাই কোথা থেকে ডাক্তার লাতোনের কাছে যাবার জন্য এক পরিচয়পত্র এনেছে। কিন্তু যেহেতু আমার বিশ্বাস আপনার উপর, আমি আমার মেয়েকেও আপনাকে দেখাব। আপনার এখন কি সময় হবে?

ডাক্তার বনফিল মাথায় টুপীটা পরে বলল, আমার হাতে এখন অনেক

কাজ।

মার্কুই বললেন, আমার অবশ্য হাতে কোন কাজ নেই। আপনার সঙ্গে যাব কি?

ডাক্তার বনফিলের কি মনে হলো বলল, ঠিক আছে চলুন।

যেখানে যাচ্ছিল সেখানে আর যাওয়া হলো না বনফিলের। মার্কুইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ধারে হোটেল স্প্লেনডিডের দোতলার একটি বসার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। মার্কুই ডাক্তারকে সেইখানে বসিয়ে মেয়েকে ডাকতে গেলেন।

মার্কুই রাভেনেলের মেয়ে মাদাম অঁাদারমত বয়সে তরুণী যুবতী। খুব সুন্দরী। চেহারার গঠন সত্যিই ভাল। দুবছর আগে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সন্তান হয়নি। তার একটি সন্তানের বড় সাধ। সন্তানলাভের জন্যই ভাল ডাক্তারের পরামর্শ চায় সে।

দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তাজনিত কিছু রক্তাল্পতা—এ ছাড়া আসলে কোন রোগ নেই মাদাম অঁাদারমতের। তার মুখ থেকে সব শুনে ডাক্তার বনফিল প্রথমে আভারনে গাঁয়ের সেই আশ্চর্য বনফিল স্প্রিংএর গুণাগুণের কথা বলল, তার জলপানের পরামর্শও দিল। তারপর একটা লম্বা কাগজে অনেকগুলো ওষুধের নাম লিখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বনফিল চলে গেলে তার ব্যবস্থাপত্রটা নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাদাম অঁাদারমত। রাগের সঙ্গে বলল, কোথা থেকে একটা বুড়ো অভদ্র ডাক্তারকে ধরে এনেছ বাবা। ও কিছুই জানে না। ঠিক যেন পুরনো একটা ফসিল, মাটির ভিতর থেকে খুঁড়ে এনেছ।

কথার মাঝখানেই ঘরের দরজা খুলে মঁসিয়ে অঁাদারমত আর একজন ডাক্তারকে নিয়ে এল। সে হচ্ছে ডাক্তার লাতোনে।

প্যারিস থেকে হালে পাশ করে আসা ডাক্তার লাতোনে বনফিলের ঠিক একেবারে উল্টো। বয়সে শুধু নবীন নয়, তার চেহারা ভাল, দাড়ি কামানো চকচকে মুখ। পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল পোশাক।

মাদাম অঁাদারমতের নির্দেশ অনুসারে একটা চেয়ারে বসল লাতোনে। মাথাটা নত করে নমস্কার করল।

মঁসিয়ে অঁাদারমত তার স্ত্রীর যাবতীয় উপসর্গগুলো বলে ফেলল। কোন্ কোন্ ডাক্তারের পরামর্শ এর আগে নিয়েছে তাও বলল। মঁসিয়ে অঁাদারমত জাতিতে ইহুদী। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। কাজকারবার আছে। মার্কুই প্রথমে ইহুদীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি। কিন্তু ছমাস ধরে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে মার্কুই-এর প্রচুর টাকা দেখে তারই হাতে তুলে দেন মেয়েকে। শুধু বলেন, ওদের সন্তানসন্ততিরা ক্যাথলিক রীতি অনুসারে লালিত পালিত হবে।

ম'সিয়ে আঁদারমতের কাছ থেকে সব কথা শুনে ডাক্তার লাতোনে বলল, আচ্ছা মাদাম, আপনার আর কিছু বলার আছে ?

মাদাম আঁদারমত বলল, না। কিছু নেই।

ডাক্তার লাতোনে বলল, আপনাকে সব পোশাক খুলে ফেলে একটা সাদা গাউন পরতে হবে। আমি আপনার সারা দেহটা ভালভাবে পরীক্ষা করব পাশের ঘরে। তার কারণ কি জানেন ? আগে আগে মনে করা হত মানুষের রোগ হয় রক্তের দোষে। কিন্তু এখন বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থা অনুসারে দেখতে হয় দেহের অবয়বসংস্থান ও গ্রন্থিগুলো ঠিক আছে কিনা, দেখতে হবে দেহের কোন গ্রন্থি অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠে অন্য গ্রন্থির কাজে বাধা দিচ্ছে কি না।

ম'সিয়ে আঁদারমত সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করল লাতোনেকে। পাশের ঘরে গিয়ে পোশাক খুলে তৈরী হয়ে এল মাদাম আঁদারমত।

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার লাতোনে বলল, সব ঠিকই আছে। শুধু খাবার আগে রোজ দু তিন গ্লাস করে ঝর্ণার জল খাবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাগুলো বলেই আর অপেক্ষা না করে, কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে চলে গেল লাতোনে। তার মতে এইভাবে কোন ডাক্তারের হঠাৎ চলে যাওয়া ডাক্তারের পক্ষে বাহাদুরের কাজ। রোগীদের চোখে তাতে ডাক্তারের গুরুত্ব বাড়ে।

লাতোনে চলে গেলে আঁদারমত বলল, একমাত্র ডাক্তার লাতোনে ছাড়া আমার স্ত্রীর চিকিৎসা আর কেউ করবে না।

মাদাম আঁদারমত তার বাবাকে তার ভাইএর কথা জিজ্ঞাসা করল। বলল, দাদা এনভালে এসেছে কি ?

মার্কুই বলল, হ্যাঁ এসেছে। সঙ্গে এনেছে ম'সিয়ে পল ব্রেতিগনি নামে এক বন্ধু। ওরা দিনকতক পর আবার চলে যাবে।

সেদিন মাদাম আঁদারমত তার ভাই কঁত্রামের সঙ্গে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। গাঁয়ের ভিতর এক জায়গায় একজন পিয়ানো বাদকের পিয়ানো বাজনা শুনছিল কঁত্রাম এমন সময় একজন লোক এসে নত হয়ে অভিবাদন জানাল তাকে, সুপ্রভাত প্রিয় কাউণ্ট।

কঁত্রাম মুখ ঘুরিয়ে দেখল অভারনে গাঁয়ের ডাক্তার অনোরত। সঙ্গে সঙ্গে সে তার বোনকে বলল, আয় ক্রিশ্চান, ডাক্তার অনোরতের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই।

মাদাম আঁদারমতের ডাক নাম ক্রিশ্চান। এই গাঁয়ের দুজন ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে এখানে আর একজন ডাক্তার আছে এবং তার সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছে একথা মনে করে হাসি সংবরণ করতে পারল না

ক্রিশ্চান। ডাক্তার অনোরত ক্রিশ্চানকে বলল, আশা করি শারীরিক সুস্থ আছেন আপনি।

ক্রিশ্চান বলল, হ্যাঁ, তবে সামান্য একটু অসুস্থ।

প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে ডাক্তার অনোরত বলল, আমি জোর গলায় বলতে পারি কাউন্ট, এই এনভাল অঞ্চলের বাইরে আপনি যদি যান একটা বড় মজার জিনিস দেখতে পাবেন।

কঁত্রাম বলল, কি ডাক্তার? জিনিসটা কি?

ডাক্তার অনোরত বলতে লাগল বৃদ্ধ ওরিয়লের কথা। মঁত ওরিয়ল হচ্ছে এ সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী। তার বছরে আয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। চাষবাসের প্রচুর জমি জায়গা আছে। এনভাল পাহাড়ের ঢালটা গিয়ে যেখানে অভারনে উপত্যকার সমতলে মিশে গেছে সেইখানে গোটা মাঠটার সব আঙুরক্ষেত ওরিয়লদের। সেই ক্ষেতের মাঝে একটা ছোট্ট পাহাড় থাকার জন্য ওর ক্ষেত চাষের কাজে বড় বাধা সৃষ্টি হয়। আজকাল তাই বৃদ্ধ ওরিয়লের নজর পড়েছে সেই পাহাড়টার উপরে। কিছু কিছু করে ফাটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় পাহাড়টাকে। ওদের গাঁয়ের যে সব ছেলে সামরিক বিভাগে চাকরি করে তাদের লুকিয়ে কিছু কিছু করে বারুদের গুঁড়ো পাউডার আনতে বলে। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে কোনরকমে ফুটো করে তার মধ্যে গানপাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিত।

অনোরত আরো হয়ত কিছু বলত। কিন্তু কঁত্রামের বন্ধু এসে গেলে চুপ করে গেল। অনোরত বিদায় নিলে কঁত্রাম তার বোনকে বলল, আমার বন্ধু পল ব্রেতিগনি।

পল ব্রেতিগনির চেহারাটার মধ্যে কোন সূক্ষ্মতা বা লালিত্য নেই। তার পেশীবহুল হাত পা ও সমস্ত চেহারার মধ্যে আছে এক ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠতা। তার মাথাটা বুলেটের মত শক্ত। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল। চোখে মুখে একটা কড়া ভাব। পল ক্রিশ্চানকে গম্ভীর গলায় শুধু বলল, আপনি আজ সকালে এসেছেন না?

ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে ক্রিশ্চান বলল, হ্যাঁ।

এখন ওরা একসঙ্গে হোটেলে খেতে যাবে। কঁত্রাম বলল, মার্কুই আর মঁসিয়ে আঁদারমত আসছে তাদের দিকে। ওরা খাবে একসঙ্গে। তার ভাইএর হাত ধরে হোটেলের দিকে যেতে যেতে ক্রিশ্চান বলল, আমার কিন্তু নেকড়ে বাঘের মত ক্ষিদে পেয়েছে। তোমার বন্ধুর কাছে আমি কত খাব তা ভেবে লজ্জা পাচ্ছে।

২

আসলে একটা ব্রিয়াট পাথর একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত মাথা তুলে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওটা যেন ক্রমশই বাড়ছে। তাই ওর মাথাটাকে

চিরদিনের মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায় ওরিয়ল। তার বিরাট আঙুর ক্ষেতের মাঝে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকা এই বাধার পাহাড়টাকে সে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়।

ডাক্তার অনোরতের কথাটা ভোলেনি ক্রিশ্চান। হোটেলে খাবার পর একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়ল বিস্ফোরণের কাজটা নিজের চোখে দেখার জন্যে।

পাহাড়টার মাথার উপরে উঠে চারদিকের দিগন্তজোড়া মাঠের দিকে তাকিয়েছিল ক্রিশ্চান। হঠাৎ তাকে মাদাম আঁদারমত নামে কে ডাকল। মুখ ফিরিয়ে দেখল ডাক্তার অনোরত।

ডাক্তার অনোরত ওদের চকচকে ঘাসে ঢাকা একটা ঢালু জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাল। কঁত্রাম বলল, অন্যান্য ডাক্তারদের এসব ব্যাপার দেখার ত সময়ই হয় না। আপনি তবু এসেছেন।

ডাক্তার অনোরত বলল, কাজ আমার হাতেও কম নেই। তবে কি জানেন, আমি সে কাজ নিয়ে হৈচৈ করি না।

ওরা দেখল, চারদিকেই মানুষের জটলা। সবাই বিভিন্ন দিক থেকে একই ঘটনা দেখতে আসছে। ক্রিশ্চান আশ্চর্য হয়ে বলল, এত লোক ঐ গাঁয়ে আছে?

অনোরত বলল, সব লোক ও গাঁয়ের না। ওরা আসছে অন্যান্য আশপাশের গাঁ থেকে। ওরিয়লের নাম ওরা জানে। তাই কথাটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই আসতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কঁত্রাম বলল, চল পল, খুব সুন্দর দুটি মেয়ে দেখছি। বছর আঠারো, উনিশ বয়স। চল দেখিগে। ডাক্তার অনোরত নিশ্চয় ওদের চেনেন।

অনোরত বলল, ওরা হলো ওরিয়লের দুই মেয়ে। গাঁয়েই পড়াশুনো করেছে। গাঁয়েই থাকে। আমি ওদের ভালভাবেই চিনি। কারণ আমি ওদের বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক।

ক্রমে বিস্ফোরণের সময় এগিয়ে এল। ওরিয়ল তার লম্বা-চওড়া এক ছেলেকে নিয়ে সব কাজ তদারক করছিল। ছেলেটা মোটা বলে সবাই বলে 'কলোসাল'। দর্শকরা পাহাড় থেকে সকলে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

সহসা দেখা গেল একটা কুকুর ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। সেখানে গিয়ে চীৎকার করছে। ক্রিশ্চানের মনটা নরম। বলল, আহা বিস্ফোরণ হলে ও উড়ে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে।

হঠাৎ কঁত্রামের বন্ধু পল ব্রেতিগনি লম্বা লম্বা পা নিয়ে একছুটে সেখানে গিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কুকুরটা

পলকে দেখে ভয় পেয়ে অন্য দিকে পালিয়ে গেল। পল ফিরে এলে সকলেই ওঁর হঠকারিতার জন্য বকাবকি করতে লাগল। কঁত্রাম বলল, ও এইরকমই হঠকারি, সব কাজে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিরাট বিস্ফোরণে চারদিক কেঁপে উঠল ভীষণভাবে। পাহাড়ের খানিকটা অংশ ধোঁয়ার মধ্যে উড়ে গেল কোথায়। ধোঁয়ার ঘোরটা কেটে গেলে জনতার এক অংশ চীৎকার করে জানাল একটা নূতন ঝর্ণা বেরিয়েছে পাহাড়ের গা থেকে। বিস্ফোরণের ফলে এটা হয়েছে। ওটা একটা উষ্ণ প্রস্রবণ।

সকলেই আবার উৎসুক হয়ে দেখতে গেল। অনেকে জল খেয়ে জলটা কেমন পরীক্ষা করতে লাগল। ক্রিশ্চানও খেল। হঠাৎ সেই কুকুরটার বিকৃত মৃতদেহ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ক্রিশ্চানের। ভাবল, দিনটা তার ভালভাবে শুরু হয়ে এমন বিষাদের মধ্য দিয়ে কাটল কেন। ক্রিশ্চান বলল, সে হোটেলে গিয়ে সোজা তার নিজের ঘরে শুয়ে পড়বে।

৩

সেদিন সন্ধ্যের সময় হোটেল স্প্লেনডিডে রাত পর্যন্ত উপস্থিত আবাসিকদের মধ্যে শুধু ওরিয়লের কথাটাই আলোচিত হতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উপস্থিত আবাসিকদের মধ্যে সেখানে তখন ছিলেন মার্কুই আর তার মেয়েজামাই অর্থাৎ আঁদারমত দম্পতি। কঁত্রাম আর তার বন্ধু পল। এছাড়া ছিল বাঁভেনল দম্পতি, মঁসিয়ে মনেকু আর তার মেয়ে, মঁসিয়ে পাস্তর আর শফোয়ার দম্পতি।

মঁসিয়ে পাস্তর এনভাল গাঁয়ের উষ্ণ প্রস্রবণের জল খাওয়া ও স্নান করার কি গুণ তা অন্যদের বোঝাচ্ছিলেন।

হঠাৎ একসময় কঁত্রাম বলে উঠল, আমি ত দেখছি মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া জীবনে কোন সুখ নেই। জীবনকে উপভোগ করতে হলে এই দুটো জিনিস চাই-ই।

আঁদারমত বল, আচ্ছা ওরিয়লরা এ গাঁয়ের কোথায় থাকে তা জান?

কঁত্রাম বলল, হ্যাঁ আমি জানি।

মঁসিয়ে আঁদারমত বলল, খাওয়ার পর আমাকে সেখানে একবার নিয়ে যাবে?

কঁত্রাম বলল, হ্যাঁ যাব। আমিও সেই মেয়েদুটোকে আর একবার দেখতে চাই।

খাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়ল ওরা। ক্রিশ্চান আর গেল না। সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে তার বাবা আর পল ব্রেতিগনির সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

পথে বেরিয়ে আঁদারমত কঁত্রামকে বলল, যদি লাতোনের কথামত কাজ

হয়, যদি ওরিয়লের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ফলবতী হয় তাহলে এই এনভাল গাঁকে আমি যথেষ্ট উন্নত করে তুলব।

কঁত্রাম বলল, হ্যাঁ তুমি ত ব্যবসা আর কাজ কারবার ছাড়া আর কিছু জান না। এইসব যত কাজ কারবারের পরিকল্পনা গজগজ করে তোমার মাথায়। আর আমিও এই টাকার সাহায্যে জগতের সঙ্গে লড়াই করে অনেক কিছু জয় করে নিতে চাই। টাকাই আমার সৈন্য।

ম'সিয়ে আঁদারমত বলল, হ্যাঁ টাকাই হচ্ছে জীবন।

কথা বলতে বলতে ওরা বাঁ দিকের উঁচু পথটা ধরে এগিয়ে চলল ধীর গতিতে। কিছুদূর যাওয়ার পর ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ির একজন চাকরকে আঁদারমত বলল, ম'সিয়ে ওরিওল আছেন?

চাকর এসে ওদের নিয়ে গেল। রান্নাঘরের পাশেই বসার ঘর। সেখানে আঁদারমত আর কঁত্রাম গিয়ে দেখল বৃদ্ধ ওরিয়ল একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আর একটা চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। তার ছেলে একটা পত্রিকা পড়ছে। আর তার মেয়ে দুটি জানালার ধারে বসে সেলাই এর কাজ করছে।

অতিথিদের অসময়ে দেখে চমকে উঠল সবাই। মেয়েদের ডাকে বৃদ্ধ ওরিওলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওরিয়ল উঠতেই আঁদারমত কঁত্রামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

আঁদারমত বলল, দেখুন ম'সিয়ে ওরিয়ল, আমি যার জন্যে এসেছি সেই কাজের কথাটা বলে ফেলতে চাই। আজ আপনার যে আঙুরক্ষেতের মধ্যে একটা নতুন উষ্ণ প্রস্রবণ বেরিয়েছে তার জল পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় জলটা ভাল নয় তাহলে সেইখানেই শেষ হবে ব্যাপারটা।

ওরিয়ল বলল, ওটার উপর আমার পূর্ণ স্বত্বাধিকার। জলটা ভাল হলে ওখানে বাড়ি তৈরীর কাজও চলবে। জলটা ভাল না হলে কোন কাজকারবারই ওখানে হবে না।

আঁদারমত বলল, আমি এখনই উত্তর চাইছি না। আপনি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন। জল পরীক্ষার কাজ হয়ে গেলে আপনি দর বলবেন। তাতে আমার পোষায় ত নেব। না পোষায় চলে যাব বিনা প্রতিবাদে। জেনে রাখবেন আমি এককথার মানুষ।

ওরিয়ল বলল যে সেও এককথার মানুষ। পরে ওরিয়ল এক গ্লাস করে মদ খেতে দিল অতিথিদের।

হঠাৎ আঁদারমতের কি মনে হলো ওরিয়লকে বলল, আপনার মদ তৈরীর কারখানাটা একবার দেখতে চাই। সবাই বলে আপনি নাকি এ অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল মদ প্রস্তুতকারক।

বৃদ্ধ ওরিয়ল খুশি হয়ে একটা বাতি হাতে করে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কারখানায় গিয়ে ওদের আবার মদ আস্বাদ করতে বলল।

আঁদারমত চুপি চুপি কঁত্রামকে বলল, আমি এই ধরনের টাটকা মদ ভালবাসি।

কঁত্রাম বলল, আমি মদের থেকে মেয়েমানুষ বেশী ভালবাসি।

বৃদ্ধ ওরিয়লের কথামত বিভিন্ন নমুনার কয়েক বোতল মদ খেয়ে দেখতে হলো ওদের। তারপর ওরা বসার ঘরে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল কঁত্রাম, মেয়ে দুটি তেমনি আপন মনে সেলাইএর কাজ করছে। ওরা এমন একটা ঔদাসিন্যের ভাব দেখাচ্ছে যাতে মনে হবে ঘরের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তাদের কথা ওরা কিছু জানে না।

কঁত্রাম দেখল মেয়েদুটির মধ্যে একটি বেঁটে আর মোটা আর একটি লম্বা। কিন্তু দেখতে দুজনই সুন্দরী। তবে লম্বা মেয়েটির চেহারাটা আরো ভাল। ওদের চোখগুলো খুব সুন্দর। ওদের চালচলন দেখে বেশ বুঝতে পারল কঁত্রাম ওরা বাড়িতে না, লেখাপড়া শিখছে কোন কনভেণ্টে।

ওরিয়লের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আঁদারমত বলল, দেখলে ত, বাড়ির ভিতর গেলে বেশই বোঝা যায় ওরা ছোট থেকে বড় হয়েছে।

আগে অবস্থা খারাপ ছিল বলে বেটাছেলেটাকে আস্ত একটা ভূত বানিয়েছে। ও একটা চাষীলোকের মত পুরো কাজ করে। সমানে একটা মজুরের খরচ বাঁচায়। অথচ মেয়েদের আমলে ওরিয়লের অবস্থা ভাল হওয়ায় ওদের কনভেণ্টে রেখে পড়ায় এবং মেয়েরা অভিজাত সমাজের আদব কায়দা সবই শিখেছে ভালভাবে। ভাল জায়গায় বিয়ে হলে ওরা সম্ভ্রান্ত মহিলাতে পরিণত হবে।

আঁদারমত কিছুক্ষণ থেমে বলল, ওদের মধ্যে কোন্ মেয়েটিকে পছন্দ কর বেশী ?

কঁত্রাম বলল, তা ত ভেবে দেখিনি। আমি ওদের দুজনের মধ্যে তুলনা করে দেখিনি। আর তাতে তোমারই বা কি, তুমি ত আর ওদের একজনকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ না।

কঁত্রাম বলল, আমার জীবনে একটা বড় সখ হলো সুন্দরী যুবতী মেয়েদের দেখা। আমার মতে সুন্দরী নারীই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকল শিল্পের সারবস্তু।

একটু চুপ করে থেকে কঁত্রাম হঠাৎ বলে উঠল, আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ ধার দেবে ?

আবার টাকা ? কি করবে ?

আবার এগিয়ে চলতে লাগল ওরা পথে। আঁদারমত বলল, এত টাকা নিয়ে কি কর বলত ?

কি আর করব, খরচ করি।

কিন্তু তুমি ভীষণ অমিতব্যয়ী। খরচের ত সীমা থাকা উচিত।

দেখ বন্ধু, তুমি যেমন টাকা রোজগার করেই আনন্দ পাও আমি তেমনি খরচ করেই আনন্দ পাই। এদিক দিয়ে আমি হচ্ছি তোমার সম্পূরক।

আঁদারমত বলল, শোন, আমি তোমাকে পাঁচ হাজার নয়, মাত্র পনেরশো ফ্রাঁ দেব। তবে তোমাকে একটা আমার কাজ করে দিতে হবে।

কঁত্রাম বলল, ঠিক আছে, তাই দিও।

ওরা যখন এইভাবে কথা বলতে বলতে হোটেল সংলগ্ন পার্কে ফিরে এল তখন দেখল পার্কের গাছে গাছে চীনা লণ্ঠন ঝুলছে। অর্কেস্ট্রা বাজছে।

৪

সেদিন রাত্রে বৃদ্ধ ওরিয়লের ঘুম হলো না মোটেই। তার ছেলে কলো-সালকে ঘুমোতে দিল না। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঁদারমতের প্রস্তাবটা আলোচনা করতে লাগল। আঁদারমতের টাকা পয়সা আছে। এ জায়গার উন্নতি চাই। সুতরাং খুব বেশী একটা দাম চেয়ে ওকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আবার জায়গাটা বিক্রি করে দিয়ে একেবারে তার সব স্বত্ব ছেড়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। মোট কথা ভাবনা চিন্তা করে কাজ করতে হবে। খুব সাবধানে এগোতে হবে।

সকাল হতেই বুড়ো ওরিয়ল তাড়াতাড়ি ঝর্ণাটাকে দেখতে গেল, ওর ভয় হচ্ছিল হঠাৎ যেমন ঝর্ণাটা বেরিয়ে পড়েছে, তেমনি হঠাৎ যদি সেটা বন্ধ হয়ে যায়।

ছেলেকে নিয়ে ঝর্ণার ধারে গিয়ে ওরিয়ল দেখল, বুড়ো ক্লোভিস তার হাতের ক্রাচটা নামিয়ে রেখে ঝর্ণার জলে স্নান করছে।

হঠাৎ ওরিয়লের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ওরিয়ল ক্লোভিসের কাছে গিয়ে বলল, একশো ফ্রাঁ রোজগার করতে চাও?

ক্লোভিস বেতো রোগী। গরীব মানুষ। অনেক ওষুধ খেয়েছে কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি।

ক্লোভিস হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, একশো ফ্রাঁ পেলে কে না নেবে?

তবে শোন।

ওরিয়ল এবার তার আসল মতলবের কথাটা খুলে বলল। বলল, একটা কাজ করতে হবে তোমায়। এই নতুন ঝর্ণাটার ধারে কাছাকাছি একটা জায়গায় তোমার একটা স্নানের জায়গা করে দেব। তুমি রোজ সেখানে স্নান করবে। এইভাবে একমাস স্নান করার পর তুমি সবার কাছে বলে বেড়াবে এই ঝর্ণার জলের গুণে তোমার বাতের রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আমি তাহলে তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেব।

ক্লোভিস কথাটা প্রথমে বুঝতে পারল না। সে বলল, আমি কত ডাক্তার

দেখিয়েছি, ওষুধপত্র খেয়েছি, কিছু হয়নি। আর তোমার ঝর্ণার জলে স্নান করে বলছ ভাল হয়ে যাবে।

ওরিয়ল বলল, ভাল হোক বা না হোক তুমি তা বলবে আর তোমাকে তার জন্য একশো ফ্রাঁ দেওয়া হবে।

ক্লোভিস বলল, আমি তা বলতে পারব না।

এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে সেখানে আঁদারমত আর ডাক্তার লাতোনে এসে পড়ল। ওরিয়ল তার পরিকল্পনার কথাটা বলল খুলে। বলল, ক্লোভিস নামে একটা বুড়ো লোক দশ বছর ধরে দুরারোগ্য বাত রোগে ভুগছে। ও এক পাও হাঁটতে পারে না। আমার কথা হচ্ছে ওর একটা স্নান করার জায়গা করে দিচ্ছি। ওর উপর দিয়ে ঝর্ণার জলের গুণাগুণ পরীক্ষা হবে।

আঁদারমত উৎসাহিত হয়ে বলল, ঠিক আছে। ভাবল, যদি জলটায় ভাল গুণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে তার সব আশা এক অদ্ভুত সাফল্য লাভ করবে।

বুড়ো ক্লোভিস প্রথমে জবাব দিয়েছিল। বলেছিল সে রোজ এখানে স্নান করতে পারবে না। তাকে বলল, সে স্নান করবে যদি আঁদারমত রোজ তাকে দুটো করে ফ্রাঁ দেয়। ওরিয়ল তাতেই রাজী হলো। বলল, তাই হবে।

কথা হয়ে গেলে ডাক্তার লাতোনের সঙ্গে আঁদারমত চলে গেল গাঁয়ের দিকে। ডাক্তার লাতোনে গেল তার ডাক্তারখানায় আর আদারমত গেল তার হোটেলে।

ক্রিশ্চান তখন বেড়াচ্ছিল। এরপর স্নান করবে। আঁদারমত হোটেলে গিয়ে মার্কুই ও অন্যান্যদের তার পরিকল্পনার কথাটা বলল। বলল, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগী ক্লোভিসের কথা। তার উপর দিয়ে নতুন ঝর্ণার গুণাগুণ পরীক্ষা হবে।

কথাটা শুনে সেই মুহূর্তেই সকলে পরীক্ষাটা দেখতে যেতে চাইল। ক্রিশ্চান স্নান সেরে এসে বলল, সে কোথাও যাবে না। সে আর তার ভাই কঁত্রাম রয়ে গেল।

ওরা সবাই চলে গেলে ক্রিশ্চান তার ভাইএর কাছ থেকে তার বন্ধু পলের কথা শুনতে চাইল।

কঁত্রাম বলল, পল ছেলেটা ত ভাল। সে তাকে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখে আসছে। কিন্তু ছেলেটা বড় আবেগপ্রবণ। নিজের আবেগকে কখনো সংযত করতে পারে না। সে সব সময় প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে চলে। যুক্তি-বোধের দ্বারা সে কখনো কোন কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তিকে শান্ত করে চলতে পারে না। ছেলেটার অন্তরটা ভাল। কিন্তু পাগল, আসলে কোন কাজের নয়।

ক্রিশ্চান বলল, ও কি একটা সুগন্ধী আতর ব্যবহার করে। তার মিষ্টি

গন্ধটা আমার খুব ভাল লাগে। ওটা আসলে কি বস্তু?

কঁত্রাম বলল, তা ত জানি না। তবে আমার মনে হয় ওটা রাশিয়া থেকে আসে। এক রুশীয় অভিনেত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ হয়। সেই ওকে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে সে হোটেল থেকে ওরিয়লদের সেই নূতন ঝর্ণাটার দিকে যেতে লাগল। পথে আরো অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হলো।

ক্রিশ্চানরা গিয়ে দেখল একটা ছোট্ট করে কাটা খালে বুড়ো ক্লোভিস স্নান করতে নেমেছে। সে বলছে জলটা খুব গরম। আঁদারমত উৎসাহিত হয়ে বলল, ভালই ত। এতে তোমার দেহের উপকার হবে। আমি তোমাকে আর একটা করে ফ্রাঁ দেব।

খালটা থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে আসতেই পাস্তর আর আঁদারমত ক্লোভিসকে একটা নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে গেল। কারণ তার চারদিকে একটা ভিড় জমে গিয়েছিল।

এদিকে ক্রিশ্চান এসে দেখল পল এসে গেছে। পলকে পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল ক্রিশ্চান। সে এনভাল গা আর অভারনে উপত্যকার সব কিছু ঘুরে বেরিয়ে দেখে যা যা ভাল লেগেছে তার কথা সব ক্রিশ্চানকে বলল। বলল, জায়গাটা মোটের উপর খুবই ভাল লেগেছে তার। তবে অদূরবর্তী একটা পাহাড়ের গায়ে যে একটা গভীর বন রয়েছে তা এখনো দেখা হয়নি তার। সেটা দেখতেই হবে।

ক্রিশ্চানের মনে হলো পলের দুটো উজ্জ্বল চোখের সর্বগ্রাসী দৃষ্টি একই সঙ্গে ঐ বন আর তার দেহটাকে গ্রাস করছে।

পল বলল, কোন বনে গিয়ে কোন বুনো ফুলের গন্ধ, বুনো গাছের গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে। এ্যাকেশিয়া, বাদাম ফুল, আরো কত সব রকমের ফুলের গন্ধ।

মার্কুই এসে তার মেয়ের হাত ধরে হোটেলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কঁত্রাম আর পলও তাদের সঙ্গে চলল। মার্কুই বলল, আঁদারমত ত তার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। আমাকে কোন কথাই বলে না। তবে ওর ইচ্ছা ক্রিশ্চান ওরিয়লদের বাড়ির ঐ দুটি মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলুক। ও এখানে একটা নতুন শহর গড়ে তুলবেই। তার জন্য এখন থেকে সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ও খুব আশাবাদী।

আঁদারমতের কথামত কাজে লেগে গেল ক্রিশ্চান। ওরিয়ল বাড়ির দুই মেয়ে লুই আর চার্লট নামে দুই বোনের সঙ্গে ভাব করল। তাদের সাহায্যে চাঁদা তুলে বেড়াতে লাগল। আঁদারমত আর মার্কুই-এর ইচ্ছা ওরা দিন-কতকের মধ্যে একটা বড় রকমের নাচ গানের জলসা করবে। তাতে সাত শাটশো ফ্রাঁ যা খরচ হবে তা ওরা স্থানীয় লোকদের কাছে চাঁদা হিসাবে কিছু তুলবে আর কিছু ওরা যারা হোটেলে বাস করছে তারা নিজেরাই দেবে।

জলসার দিন সকলে সমবেত হলো। স্থানীয় যাজক ও গণ্যমান্য সব লোক এলেন। চাষীবাসীরাও এল। লুই আর চার্লট দুই বোন গান করবে। ডাক্তার অনোরত স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। সবাই বলাবলি করতে লাগল তার স্ত্রীর বয়স ডাক্তার অনোরতের থেকে নাকি অনেক বেশী।

গান বাজনা শুরু হলে পল ক্রিশ্চানের কাছে এসে বলল, আপনার গান ভাল লাগে?

ক্রিশ্চান ঘাড় নেড়ে বলল, খুব ভাল লাগে।

পল আবেগের সঙ্গে বলল, আমার আবার গান এত ভাল লাগে যে শুনতে শুনতে মনে হয় সেই গানের সুর আমার দেহের চামড়া ভেদ করে হাড় মাংস সব গলিয়ে দিচ্ছে, মনে হয় আমার দেহগত সব চেতনা তলিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত অনুভূতির এক অতলে।

ক্রিশ্চান তখন ভাবছিল অন্য কথা। সে আকাশের পানে একবার তাকাল। আবার দৃষ্টি নামিয়ে দেখল সামনের বনটাকে। তারপর নাকটা খাড়া করে বাতাসে কি একটা জিনিস শুঁকতে লাগল। ভাবতে লাগল, বিভিন্ন রঙের মধ্যে যে যাদু আছে, বাতাসে যে নানারকমের ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায় একথা পলই আমায় শিখিয়ে দেয়।

ক্রিশ্চান একসময় হাসিমুখে বলল, আপনার অনুভূতিশক্তি বড় তীক্ষ্ণ।

পল উৎসাহভরে বলল, তা না হলে ত বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। যাদের অনুভূতিশক্তি নেই তারা হয় কাছিমের মত তাদের শক্ত খোলার মধ্যে অথবা জলহস্তীর মত জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুখ বা দুঃখ যাই হোক—আমাদের অনুভূতি হবে যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সজাগ সচেতন। তবেই জীবন ও জগতের বর্ণ গন্ধ রূপ রস সব কিছু ঐশ্বর্য ও মহিমা উপভোগ করতে পারব আমরা।

ক্রিশ্চান আর পল দুজনেই কিছুক্ষণ ধরে ওদের সামনে দিগন্ত প্রসারিত আপেল আর আঙুরের ক্ষেত দেখতে লাগল মুগ্ধ হয়ে। পল বলতে লাগল, যখনি একটা সুন্দর বস্তু দেখতে থাকি তার থেকে একটা গভীর মোহ বেরিয়ে এসে মাতাল করে দেয় আমাকে। আমার তখন মনে হয় আমি যেন পাখির মত ছুটে চলি দিক হতে দিগন্তের পথে।

পলের কথাগুলো যেন গিলে খেতে লাগল ক্রিশ্চান। এর আগে তার স্বামী তার সঙ্গে শুধু কাজ কারবারের কথা আর প্রয়োজনের কথাই বলে এসেছে। সে সব কথা শুনতে ভাল লাগেনি তার। তার ভাই কঁত্রামের সঙ্গে কথা বলেও কোন আনন্দ পায়নি। আজ ক্রিশ্চানের একান্তভাবে মনে হলো পলই তার জীবনে এমন এক প্রথম পুরুষ যার প্রতিটি কথার মধ্যে পেল এক অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদ। পলের কথার বিষয়বস্তুও যেমন অভিনব তেমনি তার কথা বলার ভঙ্গিটাও সরল। তার প্রতিটি কথা পুলকের বোমাঞ্চ জাগায় তার

দেহে-মনে। তাই তার প্রতিটি কথা তার গিলে খেতে ইচ্ছা করে।

পল বলল, এ প্রসঙ্গে বোদলেয়ারের একটি কবিতার কথা মনে পড়ল :

হে বিশাল সৌন্দর্যমূর্তি, শুচিশুভ্র, তবু ভয়ঙ্কর।
কোথায় তোমার জন্ম স্বর্গ অথবা কোন নরকে, কে তোমার
জন্মদাতা স্বর্গের দেবতা অথবা কোন নরকের শয়তান—
জানতে চাই না আমি ; শুধু জানি সীমাবদ্ধ আমার
মনের সংকীর্ণ কুটিল অন্ধকারে নিয়ে এস অনন্তত্বের শুভ্র জ্যোতি,
তোমার মধুর হাসি নম্র দৃষ্টি আর স্পর্শের অনন্যসুন্দর মাধুরিমা
এ দুঃখের পৃথিবীমাঝে নিয়ে আসে স্বর্গের সুখ ও সুষমা।

কবিতাটি আবৃত্তি করার পর নিজের মনে বলতে লাগল পল, এক সূক্ষ্ম গভীর আবেদনসম্পন্ন এই কবিতাটা আপনাকে বোঝাতে না গেলেই ভাল হত। মেয়েরা বড় অনুকরণপ্রিয়। তাদের নিজস্ব উপলব্ধি খুবই কম। কোন শিল্পকর্মের সূক্ষ্মতা বা সৌন্দর্য বুঝিয়ে না দিলে তারা বুঝতেই পারে না।

কঁত্রাম ও ওরিয়ল বোনেরা এসে হাজির হলো ওদের কাছে। মার্কুই ডাক্তার অনোরতের সঙ্গে কম্মর্দন করে বলল, আপনার বিয়ে হয়েছে তা আমাকে এতদিন বলেননি ত ?

অনোরত বলল, হ্যাঁ, আমার বিয়ে হয়েছে কুড়ি বছর হলো। কিন্তু এটা আমি প্রায়ই ভুলে যাই। অর্থাৎ আমার এই বিবাহিত জীবনের সঙ্গে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি আমি। রোজ রাতে বাড়ি ফিরে কেবলি বলি আপন মনে, হা ভগবান, মেয়েটা এখনো যায়নি বাড়ি থেকে ?

তার বলার ভঙ্গিমা দেখে উপস্থিত সকলে হাসতে লাগল।

জলসা শেষ হয়ে গেলে মার্কুই, অঁাদারমত দম্পতি, কঁত্রাম আর পল লুই আর চার্লটকে সঙ্গে করে তাদের বাড়ি পৌছে দিয়ে এল। ওরিয়লরা বাড়ি চলে গেলে ক্রিশ্চান পলকে জিজ্ঞাসা করল, দুই বোনের মধ্যে কাকে পছন্দ করেন ?

পল বলল, কাউকে না। এই ধরনের মেয়ে আমি পছন্দ করি না।

কঁত্রাম বলল, বাপের টাকা আছে বলেই ওরা অভিজাত সমাজে চলে যাচ্ছে। তা না হলে ওদের কী এমন যোগ্যতা আছে।

৬

অঁাদারমত প্যারিসে যাবার সময় একটা কাজের ভার দিয়ে যায় তার স্ত্রীর উপর। সে আজকাল পনের দিন প্যারিসে আর পনের দিন এনভালে থাকে। এবার প্যারিসে যাবার সময় সে ক্রিশ্চানকে বারবার বলে গেছে সে যেন রোজ বেলা দশটা এগারোটার সময় নতুন ঝর্ণাটার কাছে গিয়ে দেখে বুড়ো ক্লোভিস ঠিকমত রোজ স্নান করছে কিনা।

সেই কথামত রোজ নির্দিষ্ট সময়ে তার ভাই আর পলকে সঙ্গে করে সেখানে

যায় ক্রিশ্চান। ক্লোভিসকে পরীক্ষা করে দেখে তার দেহের কোন উন্নতি হচ্ছে কিনা। বুড়ো ক্লোভিস বড় নৈরাশ্যবাদী। সে কেবলই বলে, তার দেহের উন্নতি হচ্ছে না। তার রোগের কিছু উপশম হয়েছে একথা স্বীকার করে না ক্লোভিস। তবু ক্রিশ্চান রোজ তার কর্তব্য করে চলে।

আজকাল পল বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে মনে মনে। মনটাকে সে স্থির করে রাখতে পারছে না দীর্ঘক্ষণ ধরে। প্রথম প্রথম সে ভেবেছিল তার বন্ধুর বোন ক্রিশ্চান আর পাঁচজন মেয়ের মতই চটুল অগভীর। ভেবেছিল আর পাঁচজন মেয়ের মতই তাকেও কোথাও উড়িয়ে দেবে তার শক্ত কথার চোটে, তার মনে স্থান করে নিতে পারবে না বিন্দুমাত্র। কিন্তু পরে দেখল পল, তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বুঝল আর পাঁচজন মেয়ের থেকে ক্রিশ্চান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ক্রিশ্চানের মধ্যে এমনই এক যাদু আছে, এমনই এক আশ্চর্য মোহ আছে যার আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেনি পল। সে তাকে মনে মনে ভাল না বেসে পারেনি। পলের মত এক বিরাট দৈত্য ক্রিশ্চানের সামনে নতজানু হয়ে তার সারা অন্তরের সঞ্চিত সকল ঐশ্বর্য নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে দিয়েছে ক্রিশ্চা-নের পায়ের উপর।

আজকাল পলের চোখপানে তাকাতে ভয় করে ক্রিশ্চানের। তার মনে হয় যেন এক ক্ষুধিত নেকড়ের দৃষ্টি এক নিরীহ মেষশাবককে কেন্দ্র করে শিকারের স্বপ্ন দেখছে। এক অবাধ ও নিশ্চিত করায়ত্তকরণের পরিকল্পনা করছে।

সেদিন কঁত্রামের সঙ্গে ওরা একটা দূর জায়গা দিয়ে বেড়াতে গেল। এন-ভিল গাঁয়ের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা বয়ে গেছে ওরা তার উৎসটা দেখবে। উৎসদেশ পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা হলেও পল তা শুনবে না।

পল আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। কোন পাহাড় সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকলেও পল তার উপরে চেপে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্রিশ্চানের দিকে। বলছে, চলে এস। পরে কঁত্রামও ওদের অনুসরণ করতে লাগল। এমনি করে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। একসময় একটা পাথরের উপর পল ক্রিশ্চানকে এমনভাবে শক্ত হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলে নিল আর এমনভাবে কঁত্রাম তাকে ঠেলে দিল পলের কোলে যাতে তার মনে হলো গোটা দেহটা পিষে গেল পলের দৈত্যাকার দেহের চাপে।

ওখান থেকে ফিরে এসে দিনকতক সাবধানে থাকল ক্রিশ্চান। পলকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তার দৃষ্টির মধ্যে আছে এমনই এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আবেগ, তার শক্ত হাতের কঠোর স্পর্শের মধ্যে আছে এমনই এক লালসার অভ্রান্ত আবেদন যার কথা ভাবতে গেলেও গাটা শিউরে ওঠে ক্রিশ্চানের। তার ভয় লাগে।

কিন্তু দিনকতকের মধ্যেই এক বনভোজনের পরিকল্পনা হলো। ঠিক হলো

কঁত্রাম আর পল ছাড়াও ওরিয়লদের দুই বোন থাকবে। ক্রিশ্চানরা এই ক'জনে মিলে বনভোজন করতে যাবে পাহাড়ঘেরা এক নির্জন অরণ্য প্রদেশে।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনের সকালবেলায় একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হলো তারা। উঁচু মালভূমির উপরে একটা চমৎকার হ্রদ। তার ধারে গিয়ে ওরা নেমে পড়ল।

মার্কুই আর কঁত্রাম দুজনেই বড় বড় ওক গাছের তলায় পুরু নরম ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পল একা কথা বলতে লাগল মেয়েদের সঙ্গে। গাড়ির গাড়োয়ান খাবারের ঝুড়ি দিয়ে গেল।

হঠাৎ ক্রিশ্চানের মনে হলো আজকের এই মুহূর্তগুলো যেন তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। কিন্তু একথা কেন তার মনে পড়ল তা সে বুঝতে পারল না। কাউকে সে বুঝিয়ে বলতে পারবেও না।

হঠাৎ পল একসময় বলে উঠল ক্রিশ্চানকে, আচ্ছা মনে করুন, যদি এই নির্জন অরণ্যপ্রদেশে একটা কুঁড়ে ঘরে একজন প্রেমিক আর প্রেমিকা থাকতে পেত তাহলে কি এই অনাবিল সুখের জন্য জীবনের সবকিছু ত্যাগ করতে পারত না তারা? কেউ কোথাও নেই, শুধু তারা দুজন একে অন্যের মুখোমুখী। জীবনে কোন উচ্চ আশা আকাঙ্খা থাকবে না। কোন উত্তেজনা বা দ্বন্দ্ব থাকবে না। শুধু কাজ, আহার আর নিদ্রা আর ভালবাসাবাসি। অবাধ অফুরন্ত মিলনের আনন্দ।

অদূরে সত্যি সত্যিই একটা কুঁড়ে ছিল। সেখানে বাস করার কল্পিত আনন্দের কথা ভেবে তার চোখে জল এল।

লুই ও চার্লট ওরিয়ল খাবারের ডিস সাজিয়ে সকলকে ডাকল। মার্কুই ও কঁত্রামকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। খাওয়ার পর এবার যাবার পালা।

ওরা সকলে আগে আগে যাচ্ছিল। কিছুটা হেঁটে গিয়ে গাড়িতে চাপবে। ক্রিশ্চান পিছনে ছিল। তার পিছনে পল। পথ হাঁটতে হাঁটতে সহসা ক্রিশ্চান শুনতে পেল তার কানের কাছে পল মুখটা এনে বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

সে কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল ক্রিশ্চান। যেন সে একথা শুনেও শোনেনি। ঝড় উঠেছিল ক্রিশ্চানের বুকের ভিতরে। তবু উপরে সে আশ্চর্যভাবে শান্ত ও শক্ত ছিল। তার অন্তরটা ফেটে পড়ছিল। হাত দুটো উত্তাল হয়ে উঠেছিল পলকে আলিঙ্গন করার জন্য, তার ঠোঁটদুটো আপন আবেগের তাপে কেঁপে কেঁপে উঠছিল পলকে চুম্বন করার জন্য; তবু পিছন ফিরে একবারও তাকাল না সে। একমনে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছিল চারদিকের গাছে পালায়। সহসা গাছের ফাঁকে চাঁদ দেখা গেল। পথের উপর এসে পড়ল চাঁদের আলো। মনে জোর পেল

ক্রিশ্চান।

তার নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে একা বসে বসে ভাবতে লাগল ক্রিশ্চান।

ক্রিশ্চানের কেবলি মনে হচ্ছিল একটা দৈত্যের মত লোক কোথা থেকে এসে তার লম্বা লম্বা হাত দিয়ে তার আত্মাটাকে এই পুরনো পরিচিত জগৎ থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। তাকে সে কোনরূপ বাধাও দিতে পারছে না। তার বাবার স্নেহ, তার ভাই-এর বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য, তার স্বামীর ঔদাসীন্য আর অনুকম্পা—সব নিরর্থক মনে হলো তার কাছে। সব মিথ্যা। তার মনে হলো সামান্য এক প্রাণহীন চুক্তিপত্রের বলে যে লোকটি তার দেহ-মনের উপর এক অবাধ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে সে তার প্রকৃত স্বামী নয়। তার স্বামী হবার যোগ্যতা তার নেই। যে লোকটি কিছুক্ষণ আগে তার অন্তর উজাড় করা ভালবাসার এক অমৃতমন্ত্র ঢেলে দিয়েছে তার কানে কানে আসলে সেই তার প্রকৃত স্বামী।

৭

গত রাত্রিতে অনেক দেরী করে শুলেও সেদিন সকাল পাঁচটা বাজতেই বিছানা থেকে উঠে পড়ল ক্রিশ্চান। অন্তরটাকে অদ্ভুত রকমের হালকা মনে হচ্ছিল তার। সারা অঙ্গে অনুভব করছিল অনাস্বাদিতপূর্ব এক পুলকের রোমাঞ্চ। পল তাহলে তাকে ভালবাসে।

আর এই ভালবাসার জন্যেই আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে লোকটা। পলকে যেদিন প্রথম দেখে, তার ভাই গঁত্রামের কাছ থেকে যেদিন পলের কথা প্রথম শোনে সেদিন পল ছিল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এমন-ভাবে বদলে গেছে পল যে আজ তাকে চেনাই যায় না।

মুখ হাত ধুয়ে তার ঘরে বসতেই পল এল হোটেলে। এসেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কেমন আছেন মাদাম আঁদারমত?

পলকে দেখে ভয় পেয়েছিল ক্রিশ্চান। ভেবেছিল করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেই পল হয়ত অনেকক্ষণ ধরে তার হাতের মধ্যে চেপে রেখে দেবে তার হাতটা। কিন্তু পরে দেখল তার সে ধারণা ভুল। পল তার হাতে কোন চাপ দিল না। খুব আলতোভাবে ধরে করমর্দন করেই ছেড়ে দিল তার হাতটা। তারপর তার সামনে বসে খুব শান্তভাবে কথা বলতে লাগল। গতকাল সন্ধ্যায় এই মানুষটি যে তাকে আবেগের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেছিল তা পলকে দেখে আজ কোনমতেই বোঝা যায় না। গতকাল সন্ধ্যায় তার অন্তরের মধ্যে যে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে আজ সে ঝড়ের কোন চিহ্নই নেই তার চোখে মুখে।

সেদিন সন্ধ্যায় মার্ক্ই পল আর ক্রিশ্চান তিনজনে ক্যাসিনো অর্থাৎ সেই নতুন ঝর্ণার ধার থেকে হোটেলে ফিরছিল। চাঁদ উঠেছিল আকাশে। চাঁদের পর্যাপ্ত আলোয় ভাসছিল চারদিক। হঠাৎ পল মার্ক্ইকে বলল, অতীতের

তুরনোয়েল দুর্গটা একবার দেখে গেলে হয় না? চাঁদের আলোয় তার ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে বড় চমৎকার লাগছে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিশ্চানের মনে লেগে গেল। সে তার বাবাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল যাবার জন্যে। অবশেষে মার্কুই রাজী হলো একটা সর্তে। রাত্রি এগারোটার মধ্যে তিনি হোটেলে ফিরে গিয়ে যেন শুতে পারেন।

তার বাবাকে ধরে পথ হাঁটছিল ক্রিশ্চান। তার ডানপাশে ছিল পল। সিসিলি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সব দেশ এর আগে ভ্রমণ করেছে পল তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিল সে।

কিছুদূর যেতেই তারা দেখতে পেল লম্বা সরু এক গম্বুজ মাথায় সারা গায়ে সাদা জ্যোৎস্নার আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে তুরনোয়েল দুর্গ। তা দেখে মার্কুই বলল, সত্যিই চমৎকার।

পথের ধারে ঘাসের উপর বসে পড়ল মার্কুই। ক্রিশ্চান আবার অনুরোধ করল তার বাবাকে, চল বাপি, ভিতরটা গিয়ে দেখব। চাঁদের আলোয় দেখতে খুব ভাল লাগবে।

এবার মার্কুই শক্ত হয়ে বসে রইল। বলল, যেতে হয় মঁসিয়ে ব্রেতিগনির সঙ্গে যাও। আমি অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর এক পাও যাব না।

কিন্তু পলের সঙ্গে একা যেতে ভয় করছিল ক্রিশ্চানের। তবু যখন তার বাবা প্রস্তাব দিয়েছে তখন সে যদি না যায় পলের সঙ্গে তাহলে তাকে অবিশ্বাস করা হয় এবং তার অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়। এইভাবে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে কিছুক্ষণ কষ্ট পাওয়ার পর মনস্থির করে ফেলল ক্রিশ্চান। ওদিকে পলও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু যদি মনে না করেন মাদাম অঁদারমত তাহলে যেতে পারেন আমার সঙ্গে।

ওরা দুজনেই দুর্গের ভিতরে চলে গেল। অনেক ঘুরে বেড়াল ওরা। দুর্গের ভিতরে সুদূর অতীতের ধ্বংসাবশেষগুলো চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। কেমন যেন ভয় করছিল ক্রিশ্চানের। তার পাশে দৈত্যাকার পলকে আরো ভয় করছিল তার।

দুর্গ থেকে বাইরে এসে পথের ধারে একটি বাদাম গাছের তলায় ঘাসের উপর বসে পড়ল ক্রিশ্চান। পলও তার পাশে খুব কাছে বসল। ক্রিশ্চান হাঁপাচ্ছিল। সে তার হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

পল বলল, আপনি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন?

ক্রিশ্চান বলল, না, আমি ওসব কিছু বুঝি না।

পল বলল, আমার শুধু মনে হচ্ছে না, আমার একান্ত বিশ্বাস আমি গত জন্মে ঐ দুর্গের মালিক ছিলাম। আর আপনি ছিলেন আমার প্রণয়িণী আর পরিণীতা স্ত্রী। ঐ দুর্গেই আমরা বাস করতাম দুজনে। অবাধ ভালবাসা

আর নিবিড়তম মিলনের আনন্দে সব সময় মশগুল থাকতাম আমরা। ঐ দুর্গের পিছনে যে একটা বন আছে যে বনটা ঢালু হয়ে একটা নিম্ন উপত্যকায় মিশে গেছে সেই নির্জন বনের গভীরে দুজনে বেড়াতাম আমরা।

পলের কথার মধ্যে এমনই একটা যাদু ছিল যাতে তা বিশ্বাস না করে পারছিল না ক্রিশ্চান।

সহসা নতজানু হয়ে বসে ক্রিশ্চানের পা দুটো ধরে উন্মাদের মত পা দুটোকেই চুম্বন করতে লাগল পল। বলল, গত জন্মেও তোমার নাম ছিল ক্রিশ্চান। তোমাকে এ জন্মে কত খুঁজেছি আমি। অবশেষে তোমাকে পেয়ে যাই। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমার সেই পূর্ব জন্মের প্রিয়া রূপে চিনতে পারি। আমাকে তুমি গ্রহণ করো ক্রিশ্চান, আমাকে তুমি মেরে ফেল, যা খুশি করো আমাকে নিয়ে। আমি নিজেকে সঁপে দিলাম তোমার পায়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল ক্রিশ্চান। কিন্তু পল তাকে যেতে দিল না। পলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। ক্রিশ্চান বাধা দিতে পারল না। বাধা দেওয়ার মত কোন শক্তিই ছিল না তার। সারা দেহ অবশ হয়ে আসছিল। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল ক্রিশ্চান। সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যাকার পলের বলিষ্ঠ বিশাল দেহটার চাপে নিষ্পেষিত হতে লাগল তার মৃদু বিকম্পিত ভীরু দেহবল্লরী।

অনেকক্ষণ পর পলের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ক্রিশ্চান। তাকে ভীত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পল উঠে আবার তাকে আলিঙ্গন করে বলল, সাবধান, তোমার বাবা আছে।

নিঃশব্দে চলে গেল ক্রিশ্চান। কোন কথা বলল না। তার বাবার কাছে যেতেই তার বাবা বলল, আমার ঠাণ্ডা লাগছে। চল।

হোটেলে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে অনেক কাঁদল ক্রিশ্চান। অথচ দুঃখটা তার কোথায় তা বুঝতে পারল না ঠিক। অবশেষে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দরজায় কার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্রিশ্চানের। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বলল, ভিতরে এস।

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী অঁাদারমত এসে ঘরে ঢুকল। সে এইমাত্র প্যারিস থেকে এসেছে। অঁাদারমত ঘরে ঢুকে উৎসাহিত হয়ে বলল, ঝর্ণার জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে জলটার মধ্যে তিন তিনটে রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে।

আনন্দের আতিশয্যে বিছানার ধারে বসে শায়িত ক্রিশ্চানকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে যাচ্ছিল অঁাদারমত। কিন্তু ক্রিশ্চানের মুখটা মলিন হয়ে গেল। সে বলল, আমার শরীরটা ভাল নেই।

আঁদারমত বলল, আচ্ছা সেই বেতো রোগী বুড়ো ক্লোভিসের খবর কিছু জান ?

সে কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল ক্রিশ্চান। বলল, হ্যাঁ তার রোগ অনেকটা সেরেছে। তবে আমার শরীর অসুস্থ থাকায় সপ্তাহখানেক তার খবর নিতে পারিনি।

কিন্তু তোমার কি হলো বল ত। ক্রিশ্চানকে আবার জড়িয়ে ধরতে গেল আঁদারমত। হঠাৎ আঁদারমতের এই অবাঞ্ছিত চুম্বন ও আলিঙ্গন হতে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ক্রিশ্চান বলে ফেলল, আমাকে এখন ছুঁয়ো না, আমি মা হতে চলেছি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল আঁদারমত। উঠে ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলতে লাগল, হে ভগবান। এত তাড়াতাড়ি ?

চাকর এসে এমন সময় খবর দিল, ডাক্তার লাতোনি ডাকছে।

আঁদারমত বলল, বসার ঘরে বসাও। যাচ্ছি।

বসার ঘরে আঁদারমত যেতেই লাতোনি বলল, কিছু মনে করবেন না মঁসিয়ে আঁদারমত। আমি আর আপনার স্ত্রীকে দেখতে আসতে পারব না। প্রথমে আপনার শ্বশুর মার্কুইস রাভেনলে ডাক্তার বনফিলকে ডেকে আনেন। তারপর আপনি আমাকে ডাক দেন। এতে বনফিল বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি তার রোগী ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছি। সুতরাং এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে আপনার এখানে আসা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে আসল কথাটা ঘোষণা করা।

আঁদারমত বলল, দোষটা আমার শ্বশুরের। যাই হোক, আমি নিজে ডাক্তার বনফিলকে যদি সব কিছু খুলে বলি ?

লাতোনি বলল, তাতে বিশেষ ফল হবে না।

লাতোনি উঠে পড়ল। আঁদারমত বলল, ঠিক আছে দেখছি কি করা যায়।

লাতোনি চলে গেলে মার্কুইস আঁদারমতকে তার ঘরে ডেকে একটা চিঠি দেখিয়ে বলল, এই দেখ ডাক্তার বনফিল আমাকে কি সব লিখেছে। তুমি লাতোনিকে ডেকে আনায় সে রেগে গেছে। লিখেছে ভবিষ্যতে তার সাহায্য আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

আঁদারমত বলতে যাচ্ছিল, এ দোষ তার। ক্রিশ্চান তার নিজের মেয়ে হলেও তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করে তার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে বনফিলকে ডেকে আনা তার উচিত হয়নি। কিন্তু কোন কথা না বলেই চলে গেল আঁদারমত। ক্রিশ্চান সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে অনেক সময় তার শ্বশুরের কাছে, আমার স্ত্রী আমি যা ভাল বুঝব করব, এই ধরনের কথা বলে আঁদারমত। যেন তার বিবাহিত স্ত্রী আর ক্রীত বস্তুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই ব্যবসা-বুদ্ধিসর্বস্ব আঁদারমতের কাছে।

হঠাৎ কঁত্রাম এসে বলল, তোমাদের ঝগড়াটা শুনেছি। আমি ডাক্তার অনোরতকে ডেকে আনছি। এবার থেকে তার পরামর্শ নেওয়া হবে।

মার্কুই মেনে নিল কথাটা। অনোরতকে ডাকতে গেল কঁত্রাম।

এই সব কথাই ক্রিশ্চানের কানে যাচ্ছিল। কিন্তু ওসব দিকে তার কোন হুঁস ছিল না। সে তখন বিছানা থেকে উঠে পোশাক পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে তার ঘর থেকে তার স্বামীর কথা শুনতে পেল, হ্যালো পল, কেমন আছ?

পল তার উত্তরে বলল, তুমি কি আজ সকালেই প্যারিস থেকে আসছ?

তারপর পল আর তার স্বামীর মধ্যে অনেক কথা হলো। স্পষ্ট না হলেও সেই সব কথার অস্পষ্ট ধ্বনি ক্রিশ্চানের কানে গেল। আর তার মনে হতে লাগল পলের মুখ থেকে বেরোন প্রতিটি কথার আঘাতে তার সারা অঙ্গ থর-থর করে কেঁপে উঠছে। পলের প্রতিটি কথা তার ঘরের মধ্যে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে।

সহসা নিজের মনে মনে চীৎকার করে উঠল ক্রিশ্চান, আমি তাকে ভাল-বাসি। আমি তার জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। আমার যথাসর্বস্ব দান করতে পারি। এবিষয়ে আজ আমি বদ্ধপরিকর। দৃঢ় সংকল্প। আমার মনে একবিন্দু কুণ্ঠাও নেই এবিষয়ে।

অঁাদারমত ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ক্রিশ্চানকে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নাও। আমরা সকলে মিলে বুড়ো ক্লোভিসকে দেখতে যাব।

ক্রিশ্চান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমার হয়ে গেছে। যাচ্ছি।

কঁত্রাম ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে অঁাদারমতকে বলল, ডাক্তার অনোরতও এল না। বলল, না, ডাক্তার বনফিল আর লাতোনি রাগ করবে। এটা আমাদের পেশাগত সম্মানের ব্যাপার। চুলোয় যাক।

ওরা সবাই গিয়ে দেখল ক্লোভিস সেই ঝর্ণার গরম জলে স্নান করছে। ওরা যেতে সে বলল, জলটা খুব ভাল, যেন সোনার খনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফালাফি শুরু করেছিল অঁাদারমত।. বলল, আমি এখনি যাচ্ছি ওরিয়লের কাছে। এ সব ব্যাপারে দেরী করতে নেই। ঝুলিয়ে রাখতে নেই। কাজ সেরে আসতে কত সময় লাগবে তা আমি জানি না।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল অঁাদারমত। মার্কুই আর কঁত্রাম দুজনে অঁাদারমতের দূরদৃষ্টি আর ব্যবসায়ীবুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগল তার। এদিকে পলের পাশে ক্রিশ্চান বসে ছিল।

কেউ কোন কথা বলেনি। শুধু তাদের হাতের আঙুলের ডগাগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করেছিল নিবিড়ভাবে। সেই স্বল্পপরিসর সীমায়িত স্পর্শসুখ-টুকুর মধ্যে যেন এক অব্যক্ত অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করছিল দুজনে।

মার্কুই যখন অঁাদারমতের প্রশংসা করছিল, তখন পল একসময় জোর

গলায় বলল, অঁাদারমত অবশ্য ভাল লোক, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই ধরনের ধনী ব্যবসায়ী লোকগুলো জীবনে একমাত্র টাকা ছাড়া আর কি জানে বলতে পারেন? তারা কি কোন নারীর জন্য জীবন দিতে পারে? তারা কি তার অর্জিত বা সঞ্চিত সব অর্থ তাদের স্ত্রীকে দিতে পারে?

মার্কুই উঠে পড়ল। তার এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। ক্রিশ্চান পলকে বলল, তুমি আমার হাতটা ধরে উঠিয়ে দাও।

পল হাতটা বাড়িয়ে জোর করে টেনে তুলে নিল ক্রিশ্চানকে। ক্রিশ্চান তার প্রায় বুকের উপর গিয়ে পড়ল। ওরা হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। গিয়ে দেখল লাঞ্চ খাবার সময় হয়েছে। অথচ অঁাদারমত তখনো আসেনি ওরিয়লদের বাড়ি থেকে।

ওরিয়লদের বাড়ি থেকে কথা শেষ করে অঁাদারমতের ফিরে আসতে বিকেল হয়ে গেল। সে যখন ফিরে এল তখন তাকে দেখে মনে হতে লাগল, সে যেন একটা বড় ধর্মের যুদ্ধ জয় করে এসেছে। সে এসেই মার্কুইকে বলল, কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। ঝর্ণার চারিদিকের ক্ষেত ও বিক্রি করতে চাইছিল না। অবশেষে ও বলেছে ভবিষ্যতে আমাদের কোম্পানি এখানে স্নানঘর ও হোটেল তৈরী করে তার থেকে যে লাভ করবে তার একের চার ভাগ ওকে দিতে হবে। ও এখন একবারে নগদ দাম নিয়ে জায়গাটা দিতে চাইছে। অথচ ও কোন দায় দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেবে না। পরিকল্পনাটা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সব ক্ষতি আমারি। যাই হোক, আমাকে এখনি প্যারিস যেতে হবে।

মার্কুই বলল, সেকি এখনি?

অঁাদারমত বলল, আমাকে জমির দলিল তৈরী করতে হবে উকিলকে দিয়ে। এখন এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত হবে না।

অঁাদারমত মার্কুইকে বলল, আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডে আপনাকে একজন সদস্য হতে হবে। কারণ সেখানে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা চাই। গঁত্রাম, তোমাকেও দশটা শেয়ার দেব।

পল কাছেই বসে ছিল। হঠাৎ পলকে অঁাদারমত বলল, কিছু যদি মনে না করে-পল, তুমি আমার কাছ থেকে দশটা শেয়ার কিনে আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের একজন সদস্য হলে আমি খুশি হব।

পল বলল, দশটা শেয়ার নয়, আমি তোমার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এক লক্ষ ফ্রাঁ দান করব।

কথাটা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠে পলকে জড়িয়ে ধরল অঁাদারমত। তার কাজ-কারবারে যারাই টাকা লগ্নী করে তারাই তার কাছে খুব ভাল লোক।

ক্রিশ্চানের মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। তার কেবলি মনে হতে লাগল তার স্বামী যেন তাকে এক লক্ষ ফ্রাঁর বিনিময়ে তাকে বিক্রি করছে পলের

কাছে। আজ পল যদি তাকে ভাল না বাসত তাহলে সে কি অঁাদারমতকে এক লক্ষ ফ্রাঁ দিত তার কোম্পানিকে?

অঁাদারমত সবার সঙ্গে ডিনার খাওয়ার পর এঞ্জিনীয়ার আব্র পাস্তরকে বলল, আমি প্যারিস যাচ্ছি। সপ্তাহখানেক পরে ফিরব। এর মধ্যে আপনি মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিন। ঝর্ণার জলটা কত দূর পর্যন্ত আছে তা দেখতে হবে।

হঠাৎ পার্কে সকলের চোখ পড়ল। সকলে অবাক হয়ে দেখল পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগী বুড়ো ক্লোভিস মাত্র একটা ক্রাচ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। অথচ আগে সে এক-পাও চলতে পারত না।

পল বলল, এটা জলের গুণ।

অঁাদারমত যাবার জন্য তৈরী হতেই গাঁয়ের পরপর তিনজন ডাক্তার এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। অথচ এর আগে তিনজনেই একরকম অপমান করে-ছিল তাকে।

কথাটা জানাজানি হয়ে যেতে গাঁয়ের অনেকেই হোটেলের সামনে এসে ভিড় জমিয়েছে অঁাদারমতের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাকে তার পরিকল্পনার ব্যাপারে শুভেচ্ছা ও সম্বর্ধনা জানাবার জন্য।

অঁাদারমত সকলের সঙ্গে দেখা করে অনেকের সঙ্গে করমর্দন করে গাড়িতে গিয়ে চাপল।

সকলে শুতে চলে গেল আপন আপন ঘরে। ক্রিশ্চানের ঘুম আসছিল না। সহসা সে দেখল একটা দীর্ঘ কালো ছায়া তার জানালার কাঁচের সার্সির উপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশ বুঝতে পারল ও ছায়া পলের। পল তার ঘরে আসতে চায়। ক্রিশ্চানও মরিয়া ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা খুলে দিল। পলের প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

৮

প্যারিস থেকে অঁাদারমতের ফিরতে দেরী হতে লাগল। এদিকে পাস্তর মাটি খোঁড়ার কাজ করতে গিয়ে আরো তিনটে ঝর্ণা আবিষ্কার করেছে যা নিঃসন্দেহে নতুন কোম্পানির পক্ষে পরম লাভের কথা।

এখন শুধু মার্কুই আর কঁত্রামের নয়, হোটেলের ও গাঁয়ের সব লোকের সব দৃষ্টি এখন ঝর্ণার দিকে কেন্দ্রীভূত। সকলের মনে এখন এক চিন্তা, মুখে এক কথা। একমাত্র পল আর ক্রিশ্চান অবাধে চালিয়ে যেতে লাগল তাদের প্রণয়চর্চা। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার কেউ কোথাও নেই। রোজ বিকালে মার্কুই আর কঁত্রাম যখন ঝর্ণার কাছে কাজ দেখতে চলে যায় তখন পল এসে ক্রিশ্চানকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাদের স্বর্গরাজ্যে।

ওরা চলে যায় এনভাল নদীর ধার দিয়ে অনেক দূরে একটা পাহাড়ের

ওপারে নির্জন লতাকুঞ্জের মাঝে। ঘাসের উপরে বসে পড়ে ক্রিশ্চান আর পল বসে তার পায়ের কাছে। পল আজকাল ক্রিশ্চানকে আইভি বলে ডাকে। কারণ আইভিলতা যেমন গাছকে জড়িয়ে ধরে তেমনি আলিঙ্গনের সময় ক্রিশ্চান পলের গলাটা জড়িয়ে ধরে।

বসে থাকতে থাকতে পরে উঠে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ক্রিশ্চানকে। দুজনে দুজনের চোখপানে তাকিয়ে থাকে। পল বলে, আমার প্রিয় আইভি, তোমার চোখদুটো যেন ঠিক নীল আকাশ। মনে হচ্ছে তোমার ঐ চোখের আকাশে চিন্তার চাতকগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা তাদের চোখের স্ফটিক-স্বচ্ছ গভীরতাটাকে যেন মাপার চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে ক্রিশ্চানকে দুহাতে করে শূন্যে তুলে নদীর ধারে নিয়ে যেত। নাচাত।

একদিন সন্ধ্যার পর রাতের খাওয়ার সময় হোটেলে মার্কুই ঘোষণা করল তিন চার দিনের মধ্যেই আঁদারমত এসে যাচ্ছে প্যারিসের কাজ সেরে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পল আর ক্রিশ্চান দুজনেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তারা কোন কথা বলতে পারল না।

একদিন সকালে আঁদারমত এসে পড়ল। তার সঙ্গে এল সাতজন লোক। আঁদারমত বলল, ওরা আমার নতুন কোম্পানির অংশীদার। আজই ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং হবে।

আঁদারমতকে ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। সে এসে মুখ হাত ধুয়েই বেরিয়ে পড়ল। বলল, একটা দলিলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম প্যারিস থেকে। দেখি সেটার কাজ হলো না কি।

ক্রিশ্চানকে একটামাত্র চুম্বন করেই চলে গেল আঁদারমত। তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

কঁত্রাম একবার আঁদারমতকে জিজ্ঞাসা করল, ও সাতজন কারা?

আঁদারমত বলল, ওরা পুঁজিপতি। স্টক এক্সচেঞ্জে দেখা হয়েছিল।

বেলা দুটোর সময় দলবল নিয়ে আবার ফিরে এল আঁদারমত। তাঁর সঙ্গে কঁত্রাম, মার্কুই ছাড়া ছিল ওরিয়ল, তার ছেলে আর সেই সাতজন নবাগত। আঁদারমতকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ঠিক সেনাপতি আর ঐ সাতজন লোক যেন তার একান্ত বংশবদ সৈনিক।

নোটারি দলিল তৈরী করতে লাগল। বৃদ্ধ ওরিয়ল আর তার ছেলে কলোসের চোখের মধ্যে অবিশ্বাস আর সন্দেহের স্পষ্ট ছায়া ফুটে উঠেছিল।

আঁদারমত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ওরিয়লকে বলল, আজ আমরা কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করব। আমরা আপনার ঐ ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে এমন এক স্নানাগার নির্মাণ করব যা হবে সারা পৃথিবীর মধ্যে সেরা। আর তার নাম হবে মঁত ওরিয়ল বাথ।

কথাটা শুনে বুড়ো ওরিয়লের বুকটা ফুলে উঠল গর্বে। আঁদারমত বলল,

কারো কোন আপত্তি আছে এ প্রস্তাবে ?

সবাই একবাক্যে বলল, কারো কোন আপত্তি নেই।

তাতে আরো খুশি হলো ওরিয়ল।

দলিল তৈরী হতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। ঝর্ণা আর তার চারদিকের ক্ষেত ওরিয়ল বিক্রি করে দিচ্ছে ছ লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে। তবে নামটা থাকবে ওরিয়লের। ওরিয়ল আর তার ছেলে কলোসকে ডিরেক্টর বোর্ডের মধ্যেও নেওয়া হলো। অংশীদারদের মধ্য থেকে যারা ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হলো তারা হলো অঁাদারমত, মার্কুই, কঁত্রাম, পল, ডাক্তার লাতোনি, ওরিয়ল আর তার ছেলে। আব্রাহাম লেভি আর সাইমন জিদলার।

অঁাদারমত এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রথমে বিজ্ঞাপনের গুণাগুণ এবং বর্তমান জগতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বের কথা বর্ণনা করল। তারপর বলল, তাদের এই উষ্ণ প্রস্রবণটির তিনটি রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে। সে রোগ তিনটি হলো, বাত, লিভার ও পাকস্থলীজাতীয় রোগ আর রক্তসঞ্চালনজাতীয় রোগ।

দলিলে সই হয়ে যাওয়ার পর তখনকার মতো সভা ভঙ্গ হলো। অঁাদারমত ওরিয়লকে বলল আবার সাতটার সময় আমরা হোটেলে বসছি। আমরা এক সঙ্গে সকলে মিলে ডিনার খাব। আপনি আপনার মেয়েদেরও সঙ্গে আনবেন। আমি প্যারিস থেকে তাদের জন্য কিছু উপহার এনেছি।

সে এক বিরাট ভোজসভা। সামনের টেবিলে বসল ক্রিশ্চান। তার একপাশে বসল মেয়র আর একপাশে বসল গ্রাম্য যাজক। পলও উপস্থিত ছিল সেখানে। কিন্তু একটা কথাও বলেনি। কঁত্রাম লুই আর চার্লট ওরিয়লের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ও তাদের মাঝখানে বসেছিল। লুই আর চার্লট দুই বোন দুটো হীরের হার উপহার পেয়েছে অঁাদারমতের কাছ থেকে। তারা আজ খুব খুশি। তাই কঁত্রামের সব ঠাট্টা তারা মেনে নিচ্ছিল হাসিমুখে।

ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে একটু নিরিবিলি দেখে পল ক্রিশ্চানকে বলল, আগামীকালই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। সুতরাং আজ রাতেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। আমি গিয়ে সেই গাঁয়ের শেষ নির্জন বাদাম গাছটার তলায় দাঁড়াব। কিছু পরে তুমি চলে এস। কেউ তা লক্ষ্য করবে না ভীড়ের মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে গিয়ে ওরা মিলিত হলো দুজনে। আজ হতে একমাস আগে যেখানে প্রথম মিলিত হয়েছিল ওরা।

আগামীকালই প্যারিস চলে যাবে ক্রিশ্চান তার স্বামীর সঙ্গে। ক্রিশ্চান বলল, এতে হতাশ হবার কি আছে। প্যারিসে তোমার বাড়ি আছে। তোমার বিয়ে হয়নি। আমার স্বামী ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকবে সব সময়। সুতরাং আমি রোজ তোমার বাড়িতে গিয়ে মিলিত হতে পারব তোমার সঙ্গে। শুধু

সময়টা নির্দিষ্ট থাকবে না। কোনদিন সকালে, কোনদিন দুপুরে বা বিকালে যাব। ফলে তোমার চাকর বাকরে কোন সন্দেহ করার সুযোগ পাবে না।

তবু পল ছেলেমানুষের মত একটা কথা বলতে লাগল বারবার। বলল, আমার খালি মনে হচ্ছে তোমাকে আমি হারাব আইভি। তার চেয়ে চল আজ রাতেই বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যাই, যেখানে দুজনে অবাধে ভালবাসতে পারব দুজনকে।

ক্রিশ্চান কিছুটা রেগে গেল পলের ছেলেমানুষিতে। সে বলল, দেখ, হঠকারিতার সঙ্গে কিছু করা উচিত নয়। তার চেয়ে ভাবনা চিন্তা বোঝাপড়া করে একটা কিছু ঠিক করা উচিত। বলছি ত প্যারিসে তোমার বাসায় আমি দেখা করব। তোমার চাকরদের তুমি বিশ্বাস করো না?

পল চিন্তান্বিত হয়ে বলল, তা না হয় হলো, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য একটা কথা, যতই হোক ও তোমার স্বামী। তুমি ক'দিন বাজে কথা বলে এড়িয়ে যাবে? তোমাকে ত তার শয্যাসঙ্গিনী, তার অঙ্কশায়িনী হতে হবে। আমি একথা ভাবতেও পারি না, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

ক্রিশ্চান বলল, আমি একবার ওকে বলেছিলাম আমি মা হতে চলেছি। ও ওসব গ্রাহ্য করে না। যাই হোক, এসব কথা আর তুলো না। আজ চলি। ওরা আমাদের খুঁজবে।

শুয়ে ছিল। উঠে পড়ল ক্রিশ্চান। হোটেল স্পেনডিডের দিকে এগিয়ে চলল দ্রুত পায়ে।

দ্বিতীয় পর্ব

১

পরের বছরে জুলাই মাসের আগেই এনভাল গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল একেবারে। তিনটি উষ্ণ প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম মঁত ওরিয়ল হাইড্রোপ্যাথিক এসট্যাবলিশমেন্ট।

মোট ছটা বড় বড় বাড়ি উঠেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়িটা হলো মঁত ওরিয়ল হোটেল যেটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। পাহাড়টার নীচে ঝর্ণাটার গায়ে এক সুন্দর স্নানাগার গড়ে উঠেছে।

আজ একটা মিটিং ছিল ডিরেক্টর বোর্ডের। নামকরা তিনজন বড় ডাক্তার এসে এখানকার ভার নিয়েছেন। তাঁরা এসেছেন প্যারিস থেকে। মিটিং ছিল তিনটি উষ্ণ প্রস্রবণের নামকরণ নিয়ে।

সভার শুরুতেই এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিল অঁাদারমত। সে কোন কিছু বলার আগেই ভূমিকা করে। ভূমিকার পর তার বক্তব্য বলল। বলল, আমার মতে তিনটি প্রস্রবণের একটির নাম হবে আমার স্ত্রীর নাম ক্রিশ্চান আর দুটির নাম লুই আর চার্লট অর্থাৎ মঁত ওরিয়লের দুই কন্যা। সকলেই এ প্রস্তাব

সমর্থন করল। ডাক্তার লাতোনি ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এরপর লাতোনি পলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। পল গতকাল এখানে এসেছে এই মিটিংএ যোগদান করার জন্য।

অাঁদারমতের পরিকল্পনা আজ আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। আজ দূর দূরান্ত থেকে লোক আসছে। আসছে অসংখ্য রোগী। ডিরেক্টর বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছে অাঁদারমত। সুতরাং তার স্ত্রী হিসাবে ক্রিশ্চানের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বেশী। কঁত্রাম সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলল ক্রিশ্চানকে। পল তাকে সমর্থন করল।

কিন্তু আজ এত সুখের মধ্যেও ক্রিশ্চানের মুখে হাসি নেই এক ফোঁটা। তার মুখখানা বড় মলিন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার তলপেটটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল। যেন তাকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে অন্ততঃ ছয় মাসের অন্তঃস্বত্বা।

সভাশেষে পলের কাছে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে ক্রিশ্চান বলল, আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার স্বামী উইলিয়ম চলে গেছে। তার আজ অনেক কাজ। আজ আমার দেহটাকে বড় ভারী বোধ হচ্ছে। আমি হাঁটতে পারছি না। মনে হচ্ছে পড়ে যাব।

পলের মুখপানে কাতরভাবে তাকাল ক্রিশ্চান। পল কোন কথা বলল না। তার হাত ধরে তাকে চার্চের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে নামকরণের অনুষ্ঠান ছিল।

চার্চে একজন ডাক্তার ক্রিশ্চানের কাছে নত হয়ে বলল, আপনার স্বামী আপনার কথাই আমাকে বলছিলেন। তিনি বলছিলেন আপনার গর্ভাবস্থার ঠিক শুরু কখন থেকে তা আপনি ঠিক বলতে পারেন না।

ক্রিশ্চান লজ্জা পেল। লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে উঠল তার। বলল, হ্যাঁ, আমি ঠিক ধরতে পারিনি। আমার গর্ভ ঠিক শুরু হওয়ার আগেই আমি ভেবেছিলাম আমি অন্তঃস্বত্বা হয়ে গেছি।

বেশীক্ষণ সেখানে না থেকে ক্রিশ্চান বিশ্রাম করতে গেল তার হোটেলের ঘরে। পল কঁত্রামের সঙ্গে রসিকতা করতে লাগল। একসময় বলল, আজকাল ওরিয়লের দুই বোন বেশ গোলগাল ও খুব সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

কঁত্রাম বলল, তাইত দেখছি।

এমন সময় একজন এসে অাঁদারমতকে খবর দিল বুড়ো ক্লোভিস বড় গোলমাল বাধাচ্ছে। সে পথের ধারে বসে বাইরের অতিথিদের বলছে, এই ঝর্ণার জল মোটেই ভাল না। প্রথমে তোমাদের রোগ সারবে। কিন্তু পরে আবার আরো খারাপ হবে। ক্লোভিসের ব্যাপার দেখে মঁত ওরিয়ল আর তার ছেলে কলোস রেগে গেছে। ক্লোভিসকে ভয় দেখাচ্ছে। গাল দিচ্ছে।

অাঁদারমত শান্তভাবে ক্লোভিসকে গিয়ে বলল, আমাদের অনুষ্ঠান

শেষ হয়ে গেলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি কথা দিচ্ছি আর দিনকতক স্নান করিয়ে তোমাকে একেবারে ভাল করে দেব। তুমি ভাল হয়ে গিয়েছিলে। নিজের দোষেই তোমার রোগ বেড়েছে।

ক্লোভিস চুপ করে রইল। শান্তভাবে বলল, ঠিক আছে, তোমার কথা মতই দেখব।

ওরিয়লদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এল আঁদারমত।

অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় থিয়েটার হবে। থিয়েটারের দল এসে গেছে।

থিয়েটার শুরু হলো এক বড় হলঘরে। ক্রিশ্চানকে বসতে হলো সামনের সারিতে। তার স্বামী আর ভাইএর মাঝখানে। ক্রিশ্চান বলল, আমার বড় গরম করছে। আমি বাইরে যাব।

আঁদারমত রেগে গেল। বলল, তাহলে তোমাকে হলের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে। তাহলে অনুষ্ঠানটা একরকম মাটি হয়ে যাবে।

কঁত্রাম তখন তার কথা শুনে উঠে গিয়ে বাইরে বাজী পোড়াতে লাগল। বাজী পোড়ানো দেখে থিয়েটার দেখতে দেখতে প্রায় অনেকে উঠে গেল। পলের উপর ভর দিয়ে ক্রিশ্চান বাইরে মাঠে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে বাজী পোড়ানো দেখতে লাগল।

আঁদারমত এসে কঁত্রামকে উঠিয়ে নিয়ে গেল একটা গোপন কথা বলার জন্য। যাবার সময় ক্রিশ্চানকে বলে গেল, আমার বন্ধু পলকে দেখাশোনা করার ভার তোমার উপর দিয়ে গেলাম। তবে বেশীক্ষণ বাইরে বসে থেকো না। তাহলে ঠাণ্ডা লাগবে। সর্দি করবে।

কঁত্রামকে বাইরে নির্জন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আঁদারমত বলল, ঋণের পরিমাণটা কত তা একবার ভেবে দেখেছ কঁত্রাম?

কঁত্রাম বলল, সেটা ভেবে দেখার এই কি সময়? তুমি কি একথা বলার আর সময় পেলে না?

আঁদারমত বলল, আমি ত মনে করি এইটাই ভাল সময়। তবু একটু ভেবে দেখ, আমি তোমার কাছে পাব নব্বই হাজার ফ্রাঁ। আর তাছাড়া তুমি সুদখোর ইহুদীদের কাছে ধার করেছ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। তোমার বাবার তরফ থেকে আমাদের কোম্পানিতে যা শেয়ার কেনা আছে তাতে সবসুদ্ধ এক লক্ষ ফ্রাঁ হতে পারে। সুতরাং তোমার ঋণ জীবনে পরিশোধ হবে না।

কঁত্রাম বলল, না তা হবে না।

আঁদারমত বলল, তাই বলছিলাম কি তোমার এখন একমাত্র উপায় হলো কোন এক সুন্দরী ও ধনশালিনী মেয়েকে বিয়ে করা। তাহলে সব দিক বজায় থাকে। আর সেইজন্যেই তোমাকে এখন ডেকে নিয়ে এলাম।

কঁত্রাম বলল, তোমার মত ভগিনীপতি থাকতে আমি কিছুই ভাবি না। তুমি বল কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। আমি রাজি।

আঁদারমত বলল, ওরিয়লদের দুই বোনের মধ্যে তোমার পছন্দমত যে কোন একটিকে বিয়ে করতে পার। তাহলে ওরিয়ল যে আঙুরক্ষেতটা ছাড়তে চাচ্ছে না, ওর মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে সেটা আমরা সহজেই পেয়ে যাব।

এক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কঁত্রাম বলল, ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

সহসা আকাশে একটা জ্বলন্ত বাজীর দিকে আঁদারমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কঁত্রাম। বাজিটা সত্যিই চমৎকার একটা বিরাট আলোর প্রাসাদ যার উপরে লেখা আছে, মঁত ওরিয়ল। আকাশে সেটা ক্রমশই উঠে যাচ্ছে। অনেক উপরে সেই আলোর প্রাসাদটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল শূন্যে। দিগন্তে চাঁদ আর আকাশের তারাগুলো কিরণ দিতে লাগল আবার আগের মত।

আঁদারমত কঁত্রামকে ডাক দিল। চলে এস, এখনি বলনাচ শুরু হবে। আমি নাচব ডাচেস দ্য র্যামাসএর সঙ্গে।

কঁত্রাম বলল, আমি নাচব চার্লট ওরিয়লের সঙ্গে।

আঁদারমত সেই মাঠে যে জায়গায় ক্রিশ্চানকে বসিয়ে রেখে এসেছিল সেখানে গিয়ে দেখল, ক্রিশ্চান বা পল কেউ নেই। সে তখন মনে মনে বলল, ক্রিশ্চান শুতে চলে গেছে। আমি তাকে বেশী ঠাণ্ডা লাগাতে নিষেধ করে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আসলে শুতে যায়নি ক্রিশ্চান। সে জোর করে পলকে নিয়ে যায় সেই পথের ধারের নির্জন বাদামগাছের তলায় যেখানে তাদের প্রথম দেহমিলন হয়।

পল যেতে চাইছিল না। বলল, তুমি ক্লান্ত, এখন যাওয়া ঠিক হবে না। অবস্থার সত্যতা স্বীকার করে নিতে হয় সব সময়।

ক্রিশ্চান তখন আবেগের সঙ্গে বলল, তোমার সন্তান আমার গর্ভে বেড়ে উঠছে দিনে দিনে। আজ আমার কত আনন্দ।

ওরা ধীর গতিতে সেখানে গেল। কিন্তু ক্রিশ্চান বুঝতে পারল না, পল হচ্ছে সত্যিকারের প্রেমিক, সে পিতা হতে চায় না। ক্রিশ্চানের গর্ভে তারই ঔরসজাত সন্তান আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই ক্রিশ্চানের প্রতি তার আগ্রহ অনেকখানি কমে যায়। স্তিমিত হয়ে যায় তার সব উচ্ছ্বাস।

সেই বাদামগাছের তলায় গিয়ে ক্রিশ্চান তাদের সেই অতীতের প্রথম প্রেমের সমস্ত উচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তি আশা করল পলের কাছ থেকে। কিন্তু তার কিছুই পেল না। পল শুধু একবার নামমাত্র ক্রিশ্চানের কপালে ও চোখে চুম্বন করল।

ক্রিশ্চান বলল, তুমি এখন আমায় আর আগের মত ভালবাস না।

পল বলল, তুমি শান্ত হয়ে ব্যাপারটা বোঝ। অবস্থা অনুসারে কাজ করতে হয়।

অনেক করে বুঝিয়ে ক্রিশ্চানকে সেখান থেকে হোটেলে নিয়ে গেল পল। তারপর হোটেল থেকে সোজা চলে গেল ক্যাসিনোর সেই নাচের আসরে।

পল গিয়ে দেখল তখনও পুরোদমে নাচ চলছে। তখন আঁদারমত নাচছে লুই ওরিয়ল আর কঁত্রাম নাচছে চার্লট ওরিয়লের সঙ্গে। নাচের মাঝে মাঝে চার্লটের কানে কানে কি কথা বলছে কঁত্রাম

২

প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে যত উন্নতি হতে লাগল ততই বেড়ে যেতে লাগল ডাক্তারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আগে ডাক্তার বনফিল ছিল এ অঞ্চলের একমাত্র ডাক্তার। আজ সে জায়গায় অনেক বড় বড় ডাক্তার এসেছে। আর প্রত্যেকেই চাইছে আশপাশের গ্রামঅঞ্চলে তাদের আপন আপন পশার বেড়ে যাক।

একদিন সকালে হোটেল স্প্লেনডিডে একজন স্পেনদেশীয় ডিউক সস্ত্রীক এসে উঠলেন। তাঁদের সঙ্গে ডাক্তার ম্যাজেলি নামে ডিউকপত্নীর এক নিজস্ব ডাক্তার ছিল। ডাক্তারটি বয়সে তরুণ যুবক এবং সুদর্শন।

ডিউকপত্নীর বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। কিন্তু তিনি সুন্দরী। তিনি হোটেলের অন্যান্য মেয়েদের বলে বেড়াতে লাগলেন তাঁর দেহসৌন্দর্য যে আজও অক্ষুণ্ণ এবং অম্লান আছে তা শুধু ডাক্তার ম্যাজেলির অমূল্য পরামর্শের জন্যে। ডাক্তার ম্যাজেলিও খুব আলাপী লোক। অল্প কয়দিনের মধ্যেই নিজে যেচে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করল। মেয়েরা তার পরামর্শ নেবার জন্য পাগল। কিন্তু ডিউকপত্নী সেদিকে বড় ঈর্ষাতুরা। তিনি চান না তাঁর নিজস্ব ডাক্তার ম্যাজেলির কাছ থেকে অন্য কোন মেয়ে পরামর্শ লাভ করুক।

বেশ কিছুদিন ধরে সারা এনভাল গাঁয়ে আর হোটেল স্প্লেনডিডে সব সময় সকলের মধ্যে বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের মুখে মুখে শুধু উচ্চারিত হত ডাক্তার ম্যাজেলির কথা। ম্যাজেলি সম্বন্ধে নানা কথা নানা গুজব ছড়াতে লাগল লোকমুখে।

কিন্তু হঠাৎ সাধারণের এই আলোচনার প্রসঙ্গটা পালটে গেল একদিন এবং ডাক্তার ম্যাজেলির পরিবর্তে এল কঁত্রাম চার্লটের ভালবাসাবাসির কথা। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, কঁত্রাম চার্লটকে ভালবাসে। কেউ বলল, ওদের বিয়ে হবে।

একদিন লুই তার বোনকে সাবধান করে দিল, তুই কঁত্রামকে অত আস্কারা

দিবি না। যদি সে তোকে সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে চায় তাহলে বাবা সেটা ভেবে দেখবে এবং তার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যদি সে তোকে নিয়ে দুদিনের জন্যে স্ফূর্তি করে পালিয়ে যেতে চায় তাহলে এখানেই তার অবসান ঘটা উচিত।

চার্লট বলল, আমি ত আর কচি খুকি নই। তুই নিজের চরকায় তেল দে। আমার কথা ভাবতে হবে না।

সেদিন ঘোড়ার গাড়িতে করে দূর পাহাড়ী এলাকা দিয়ে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করেছিল কঁত্রাম।

মার্কুই, ক্রিশ্চান, কঁত্রাম, পল আর চার্লট ওরিয়ল। মাত্র এই ক'জন যাবে। সেদিন সকাল হতেই ওরিয়লদের বাড়িতে এই নিয়ে কথা হলো। লুই-এর ইচ্ছা ছিল না চার্লট যাক। কিন্তু তারপর বুড়ো ওরিয়ল অর্থপূর্ণ এক হাসি হেসে সম্মতি দিল। চার্লট বলল, আমি যাচ্ছি মাদাম আঁদারমতের সঙ্গে বেড়াতে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ঘোড়ার গাড়িটার পিছনের সীটে বসল মার্কুই, পল আর তাদের মাঝখানে ক্রিশ্চান। সামনের সীটে বসল কঁত্রাম আর চার্লট।

পল আর ক্রিশ্চান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের দিকে। ওদের বিয়ে সম্বন্ধে আঁদারমতের পরিকল্পনার কথাটা জানত না পল বা ক্রিশ্চান। তাই ওরা বেড়াতে বেড়াতে একসময় বলল, কঁত্রামের এখনো সাবধান হওয়া উচিত। তা না হলে ও মেয়েটার ফাঁদে পড়ে যাবে।

এ বিষয়ে পল আর ক্রিশ্চান দুজনেই একমত। ক্রিশ্চান বলল, আজই হোটেলে গিয়ে কঁত্রামকে ডেকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিতে হবে তাকে।

হোটেলে ফিরে গিয়ে রাত্রে খাবার পর ক্রিশ্চান তার ঘরে কঁত্রামকে ডেকে এনে তুলল কথাটা। পল আগে হতেই ছিল।

ক্রিশ্চান কঁত্রামকে বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি মেয়েটার মোহে পড়ে গেছ।

মোহ! কঁত্রাম একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, মোহ আবার কি! দরকার বুঝলে আমি বিয়ে করব ওকে।

বিয়ে! আকাশ থেকে পড়ল যেন ক্রিশ্চান। ওই চাষী মেয়েটাকে বিয়ে করবে?

কঁত্রাম হাসিমুখে বলল, চাষী হলেও ও শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। তাছাড়া ও যে কোন শহরে তথাকথিত কেতাদুরস্ত মেয়ের থেকে স্ত্রীহিসাবে যোগ্য। তার উপর ওর বাবার আছে প্রচুর টাকা আর বিষয়সম্পত্তি।

ক্রিশ্চান পলকে বলল, এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন মঁসিয়ে ব্রেতিগণি?

পল বলল, যদি বিয়ে করে কঁত্রাম তাহলে করুক না। আপত্তির কি

থাকতে পারে তাতে

ক্রিশ্চান বলল, তা অবশ্যই বটে। আমি ওর মনটা যাচাই করার জন্য কথাটা তুলেছিলাম।

কিছু পরে ক্রিশ্চান এক সময় কঁত্রামকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সত্যি সত্যিই চার্লটকে বিয়ে করতে যাচ্ছ?

কঁত্রাম বলল, হ্যাঁ, তবে এখনি না। আরো কিছুদিন আমি ওর গতিবিধি লক্ষ্য করে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে চাই। দেখতে চাই আমার সঙ্গে ওর কতটা খাপ খাবে।

আজকাল চার্লট প্রায়ই ক্রিশ্চানকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় বাড়িতে। চার্লট তাকে তাদের বাড়িরই একজন হিসাবে ভাবে।

সেদিন কঁত্রাম সময় বুঝে আঁদারমতকে বলল, এবার সময় হয়ে গেছে। লোহাটা গরম হয়ে গেছে, এবার ঘা মারতে হবে তার উপর। আমি অবশ্য চার্লট ওরিয়লকে কোন কথা দিইনি, তবে সে আমার প্রতীক্ষায় আছে। সে আমাকে চায়। তুমি এবার তার বাবার কাছে গিয়ে কথাটা তুলতে পার। আমি আজ সকালে একবার ঘোড়ায় করে রোয়াত দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। সেখানে আমার দু একজন বন্ধু আছে। আমি এসে রাত্রি বেলায় তোমার ঘরের দরজায় টোকা দেব। আমি তখন খবর চাই। অর্থাৎ তোমার প্রস্তাবের উত্তরে ওরিয়ল কি বলল আমি তা আজই জানতে চাই।

আঁদারমত বলল, ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার এ বিষয়ে।

কঁত্রাম ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় পার হয়ে চলে গেল রোয়াতে। রাত্রে হোটেলে ফিরে এসেই আঁদারমতের ঘরে চলে গেল। কিন্তু আঁদারমত মুখটা গম্ভীর করে বলল, না হলো না, রাজী হলো না বুড়ো শেয়ালটা।

কঁত্রাম আশ্চর্য হলো, সেকি। রাজী হলো না?

আঁদারমত তখন ব্যাপারটা খুলে বলল। সে বলল, আমি অবশ্য তোমার কথাটা সরাসরি বলিনি। বললাম, আমার কোন এক বন্ধু আপনার একটি মেয়েকে গ্রহণ করতে চায়। তখন ও বলল, ছেলেটির বিষয়সম্পত্তি কি রকম আছে। আমি তখন বললাম, তিন লক্ষ ফ্রাঁর মত। আমি তখন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার মেয়েকে বিয়ে করলে আপনি কি যৌতুক দেবেন? ও তখন বলল, কোন্ মেয়েটি? জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে আমি কোন মেয়েকে যৌতুক দেব না। এখন থেকেই ঠিক করে রেখেছি। আমার বড় মেয়ে হচ্ছে লুই আর ছোট মেয়ে হচ্ছে চার্লট। যদি সে লুইকে বিয়ে করে তাহলে আমি তাকে দেব স্নানাগার আর হোটেলের মধ্যবর্তী সব জমি আর ছোট মেয়েকে দেব পাহাড়টার ওপারের কিছু জমি।

এবার থামল আঁদারমত। একটু থেমে বলল, আমি অনেক করে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বললাম তাকে। বললাম আপনি আপনার প্রস্তাবিত

যৌতুকের রদবদল করতে পারেন না? কারণ আমি বুঝলাম তুমি যদি চার্লটকে ভালবাস আর তাকে বিয়ে করো তাহলে যা যৌতুক পাবে সে বিয়েতে তাতে আমার কোন কাজই হবে না আর তার জন্যে আমি এক পয়সাও খরচ করব না। আমার দরকার হচ্ছে হোটেল আর ঝর্ণার ধারে গড়ে ওঠা স্নানাগারের পার্শ্ববর্তী সব জমি। কিন্তু ও জমি ও দেবে লুইকে। আমি অনেক করে ভেবে দেখতে বললাম। কিন্তু ও কোনমতেই রাজী হলো না।

কঁত্রাম বলল, তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে?

আঁদারমত বলল, বুড়ো ধূর্ত শেয়ালটা মহা পাজী। ও ওর বড় মেয়ে লুইটাকেই বেশী ভালবাসে, কারণ লুইটা হয়েছে ঠিক ওর বাপের মত কুটিল সন্দিগ্ধমনা আর শয়তান। তাছাড়া ও যখন বুঝল আমার বন্ধুর দুর্বলতা ওর ছোট মেয়ের প্রতি তখন ও তার সুযোগ নিল। মনে মনে ঠিক ভাবল, সে যখন ওর ছোট মেয়েকে ভালবাসে তখন ত বিনা যৌতুকেই একরকম বিয়ে করতে পারবে। এবার ভেবে দেখ কি করবে।

কঁত্রাম বলল, তুমি বল কি করব।

আঁদারমত বলল, দেখ, আমি কিন্তু একটি পয়সা বাজে খরচ করব না। তুমি যদি চার্লটকে বিয়ে করো তাহলে আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা আমাদের ইহুদী বলে ঘৃণা করো, কিন্তু দেখবে আমরা যার যা প্রাপ্য তাকে ঠিক তাই দেব। কারো কোন শ্রম বিনা বেতন বা পুরস্কারে গ্রহণ করি না। কিন্তু তোমরা খৃস্টানরা যাকে তাকে অর্থ দান করো। আবার অনেক সময় যোগ্য লোককে তার পাওনা দাও না।

সেদিন হোটেলে রাত্রিতে খাবার ঘরে মার্কুই, ক্রিশ্চান আঁদারমত, পল বসে যখন কথা বলছিল তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কঁত্রাম ওরিয়লদের দুই বোনকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এল। বলল, রাস্তা দিয়ে ওরা যাচ্ছিল। আমি একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছি ওদের।

দুই বোনের হাত থেকে টুপীদুটো রেখে দিয়ে বড় বোন লুইর কাছে এক সময় গিয়ে কঁত্রাম বলল, আচ্ছা, ম্যাদমোজেল লুই, আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি বলতে পারেন? কেন আপনি আমার উপর এক অহেতুক বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ পোষণ করে আসছেন?

লুই আশ্চর্য হয়ে বলল, না মঁসিয়ে কঁত্রাম, কোন বিদ্বেষই আমি পোষণ করি না আপনার প্রতি। আচ্ছা কোন কারণে আপনি একথা মনে করলেন বলুন তো?

কঁত্রাম বলল, অনেক, অনেক কারণ আছে ম্যাদমোজেল লুই। আপনি আমাদের এখানে মোটেই আসেন না। আপনি আমাদের গাড়িতে করে কখনো কোথাও বেড়াতে যান না। তাছাড়া আপনি আমার সামনে সব সময় এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন যে আমি দেখা হলে আপনার সঙ্গে কথা বলায়

কোন সাহস পাই না।

লুই বলল, না না, এ আপনার ভুল ধারণা।

না না, ভুল না।

কঁত্রাম বলল, সে যাই হোক, আজ আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবই। আমি এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর। আপনার বোন যখন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছেন, যাঁর দয়ার অন্ত নেই আপনিও তেমনি না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব না আমি। তবে শুনুন ম্যাদমোজেল চার্লট, আপনি কিছু মনে করবেন না। কারণ আপনাকে কিছুদিন অবহেলা করতে পারি।

টেবিলে খাবার দেওয়া হলে কঁত্রাম লুইর একটি হাত ধরে তার পাশে বসাল। একই সঙ্গে দুই বোনের হৃদয়মন জয় করার এক আশ্চর্য কৌশল যেন অবলম্বন করেছিল কঁত্রাম। স্বার্থবোধের সূক্ষ্ম সুতো দিতে শক্ত জটিল এক কৃত্রিম প্রেমের জাল ধীরে ধীরে দুই বোনের দিকে একই সঙ্গে প্রসারিত হয়ে দুই বোনের অন্তরকে গ্রাস করার প্রয়াস পাচ্ছিল যেন।

খাওয়ার পর লুইকে নিয়ে তাস খেলতে বসল ওরা, কঁত্রাম পাগলের মত বলল লুইকে, যাই বলুন, দেখবেন আমি কিন্তু আপনার বোনের মত আপনার মনকেও জয় করে ফেলব।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লুইএর মুখখানা। উপস্থিত সকলে হাসতে লাগল কঁত্রামের কথা বলার রসিকতাপূর্ণ ভঙ্গিমা দেখে।

ক্রিশ্চান পলকে সঙ্গে করে জানালার ধারে নিয়ে গেল। ক্রিশ্চানের প্রসব হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। সে আজকাল সন্ধ্যের দিকে হোটেল ছেড়ে কোথাও যায় না। তাই রোজ সন্ধ্যের দিকে তাকে অনেকেই দেখতে আসে।

ক্রিশ্চান পলকে বলল, আজ হতে এক বছর আগে তুমি আমাকে যতখানি ভালবাসতে আজ আর তা বাস না।

ক্রিশ্চান বেশই জানত পলের মনটা বদলে গেছে। তার দৃষ্টির মধ্যে আর সে কামনার উত্তাপ নেই, তার স্পর্শের মধ্যে আর সে আবেগের উদ্দামতা নেই। তবু পলকে সন্দেহ করে না ক্রিশ্চান। সে যে অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে বা পড়েছে তা কখনো বিশ্বাস করেনি সে।

পল বলল, আমি তোমায় আজও ভালবাসি। কিন্তু রোজ তুমি একই কথা জিজ্ঞাসা করায় আমার বড় খারাপ লাগে।

ক্রিশ্চান বলল, হ্যাঁ একই কথা আমি বারবার শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে। সেই একই পুরাতন কথা, তবু নতুন মনে হয় নিত্য।

পল বলল, তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমার শুধু বক্তব্য এই যে অতটা আবেগপ্রবণ হয়ো না।

ক্রিশ্চান বলল, একটা কথা দেবে পল? ভবিষ্যতে যদি কোনদিন তুমি

আমাকে ভালবাসতে না পার তাহলে সেকথা যেন আমাকে স্পষ্ট করে খুলে বলো। ভালবাসা চলে গেলেও একটা নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব যেন চিরদিন বজায় থাকে আমাদের মধ্যে।

পল বলল, আমি কথা দিচ্ছি।

অঁাদারমত এসে পলের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আহা, তোমার কি হলো বলত পল। প্যারিসে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। আমার স্ত্রী শত অনুরোধ করা সত্ত্বেও একবার এলে না আমাদের বাড়িতে। আর এখানে যদিও বা এসেছ তবু দেখছি তোমার মুখখানা মেঘলা আকাশের মত ভার।

এরপর একের পর এক করে অতিথিরা আসতে লাগল।

ডিউকপত্নী এলেন তার ছোকরা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে গুজব রটে গিয়েছিল এনভাল গাঁয়ে, যে কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত সে গুজব এখন চাপা পড়ে গেছে। এখন শুধু সকলের মুখে এক কথা, কাউন্ট কঁত্রাম আর ওরিয়ল কন্যাদের ভালবাসা।

ডিউকপত্নীর পর একে একে ডাক্তাররা এলেন ক্রিশ্চানের খবর নিতে।

ডাক্তার ম্যাজেলি অধ্যাপক ক্লোচের মেয়ের পাশে বসে কথা বলছিল। কিন্তু ডিউকপত্নী তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। হঠাৎ উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে ডিউকপত্নী ডাক্তার ম্যাজেলির কাছে গিয়ে বলল, চল বাড়ি চল, আমার শরীরটা ভাল নেই।

ডিউকপত্নী চলে গেলে ক্রিশ্চান পলকে বলল, দেখলে? মেয়েটা কেমন ভালবাসার রোগে ভুগছে। ভালবাসা থেকেই ঈর্ষা আসে। যেখানে ভালবাসা সেখানেই ঈর্ষা। পল বলল, যত সব মেয়েলি আবেগ।

ক্রিশ্চান তার উপর রেগে গিয়ে চার্লটের কাছে গিয়ে বসল। ডিউকপত্নীকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে আবার সভায় ফিরে এল ডাক্তার ম্যাজেলি। সে আসতেই কঁত্রাম তাকে বলল, আচ্ছা বলত ভাই ওরিয়লদের দুই বোনের মধ্যে কে ভাল। কাকে তুমি বেশী পছন্দ করো?

ম্যাজেলি বলল, ছোট বোনের সঙ্গে প্রেম করা যায়, আর বড় বোনকে বিয়ে করা যায়।

কঁত্রাম আনন্দে চীৎকার করে উঠল, চমৎকার বলেছ। ঠিক বলেছ। আমিও তাই মনে করি।

ক্রিশ্চান তখনো কথা বলছিল চার্লটের সঙ্গে। কঁত্রাম একবার এসে তার বোনের কানে কানে বলল, আমি পাই দ্য লা লনেয়ার পাহাড়ের উপরে এক বনভোজনের আয়োজন করেছি, মনে রেখো দিনটা বৃহস্পতিবার।

ক্রিশ্চান বলল, যা ভাল বোঝ করো।

অবশেষে বৃহস্পতিবার দিন এসে গেল। বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু

কারো কোন আপত্তি গ্রাহ্য করল না কঁত্রাম। লুই ওরিয়লেরও খুব উৎসাহ ছিল এই বনভোজনে।

তাদের বিরাট বড় ঘোড়ার গাড়িটাকে কঁত্রাম নাম দিয়েছে নোয়ার জাহাজ। যথাসময়ে নোয়ার আর্ক এসে ওদের নিয়ে গেল। যেতে যেতে মালভূমি পার হয়ে ওরা দেখল এক লাভার পাহাড়। এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আশপাশের পাহাড় থেকে খনিজ লাভা গড়িয়ে এসে জমে জমে এক পাহাড় হয়ে গেছে। পাহাড়টার নাম ভলভিক।

পাই ত্ব লা লনেয়ার পাহাড়ের গায়ের কাছে গাড়িটা থেমে গেল। পাহাড় নয়, আসলে যেন মৃত আগ্নেয়গিরির একটা মুখ। কঁত্রাম লুইকে নিয়ে তার হাত ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। চার্লট কিছুদূরে গিয়ে ফিরে এল। পল আর ক্রিশ্চান এক জায়গায় ঘাসের উপর বসে কথা বলছিল। চার্লট এসে ক্রিশ্চানের গাউনের উপর মুখটা গুঁজে কাঁদতে লাগল। ক্রিশ্চান তার মনের কথা বুঝতে পারল। পল তাকে সান্ত্বনা দিল। ক্রিশ্চানের চোখেও জল এল চার্লটের কান্না দেখে।

ওদিকে লুইএর হাতটা চুম্বন করে প্রেম নিবেদন করল কঁত্রাম। বিয়ে করার কথাও বলল। ভিতরে ভিতরে গর্ব অনুভব করছিল লুই। জয়ের গর্ব। তার বোন চার্লটের কাছ থেকে কঁত্রামকে ছিনিয়ে এনেছে সে, অথচ তার জন্য তাকে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি। আসলে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আকর্ষণীয় বস্তু আছে যা টেনেছে কঁত্রামকে। তবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, না, আমার বোনকে তুমি ভালবাস।

কঁ ত্রাম বলল, ভালবাসার ভান করছিলাম। সেটা আসল ভালবাসা ছিল না, তোমার মনকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাকে রাগাবার জন্যই এ কাজ করেছিলাম আমি। আসলে আমার লক্ষ্য ছিল তোমার প্রতি।

লুই এবার চুপ করল। পল কাছে আসতেই ওরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ওরা একসঙ্গে গাড়িতে এসে উঠল।

হোটেলে ফিরে এসে পল কঁত্রামকে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে বলল, দেখ কঁত্রাম, কাজটা কিন্তু খুব খারাপ করছ। আমি বলছি চার্লট ওরিয়লের কথা। তার সঙ্গে তুমি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলে। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে আর একজনকে ধরেছ। এর মানে কি? অথচ একদিন আমার ও তোমার বোনের সামনে তার সম্বন্ধে কত উচ্ছ্বসিত কথাই না বলেছিলে।

কঁত্রাম বলল, আমি কাউকে কোন কথা বা প্রতিশ্রুতি দিইনি। শুধু বলেছিলাম তার মত মেয়েকে বিয়ে করা চলতে পারে। সেটা অন্যায় হবে না।

পল বলল, তোমার প্রতিশ্রুতির দ্বারা না হলেও তোমার দুর্ব্যবহারে চার্লট আজ দুঃখিত।

কঁত্রাম বলল, আমি যদি তোমার নিজের কথা বলি? কোন মেয়ের সঙ্গে অনেকদূর পথ চলে পরে ক্লান্ত হয়ে যদি পিছিয়ে যাও তাহলে কি উত্তর দেবে? সুতরাং যাও নিজের চরকায় তেল দাওগে। আমি যা ভাল বুঝি করব। তাছাড়া চার্লতের জন্যে তোমার যদি এত সহানুভূতি জেগে থাকে তাহলে তুমি ত তাকে নিজেই বিয়ে করতে পার।

এরপর আর কোন কথা খুঁজে পেল না। সে ক্রিশ্চানের কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা বলতে ক্রিশ্চানও মুষড়ে পড়ল। চেয়ারে হেলান দিয়ে 'হা ভগবান' বলে চীৎকার করে উঠল হতাশার ভঙ্গিতে।

৪

সেদিন সন্ধ্যের পর আঁদারমতকে একা পেয়ে ডাক্তার লাতোনে গম্ভীরভাবে বলল, ডাক্তার বনফিলের মতিগতি তেমন কিছু ভাল বুঝছি না। ওর আগেকার সেই ঝর্ণার ধারের স্নানাগার আর হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে। ও আজকাল আমাদের দারুণ হিংসা করে। আমার মনে হয় ও দু তিন দিনের মধ্যেই আমাদের এই উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বিষ মিশিয়ে দেবে।

আঁদারমত বলল, আমাদের এই ক্যাসিনোতেও ত তেমন লোক আসছে না। আরো আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে হোটেলে আর ভাল রাস্তা নির্মাণ করতে হবে।

কঁত্রাম পাশের ঘরে চেয়ারে বসে সিগার খাচ্ছিল। হঠাৎ পলকে ডেকে বলল, চল সাঁ সুসি দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

আজকাল পলের সঙ্গে কঁত্রামের খুব ভাব হয়ে গেছে। আজকাল পলও কঁত্রামের কোন কাজের প্রতিবাদ করে না। তারা দুজনেই আজকাল মাদাম অনোরতের বাড়িতে গিয়ে প্রায়ই ওরিয়লদের দুই বোনের সঙ্গে মিলিত হয়।

মাদাম অনোরত একদিন পলকে বললেন, এইসব ছেলেরা এসে আমার এই ঘরে মিলিত হয় পরস্পরের সঙ্গে। তারা সত্যিই বড় নির্দোষ।

একদিন কঁত্রাম তাঁকে বলল, আচ্ছা মাদাম চলুন না সবাই মিলে একদিন সাঁ সুসি রোড দিয়ে বেরিয়ে আসি। কাল বেলা তিনটের সময় অবসর হবে আপনার?

মাদাম অনোরত সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগে কঁত্রাম পলকে নিয়ে চলে গেলেন। রাস্তাটা ধরে কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট্ট নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে বসল দুজনে। কিছুক্ষণ পর দেখল দূরে মাদাম অনোরত লুই আর চার্লতকে নিয়ে আসছেন।

ওরা আসতেই লুইকে নিয়ে দূরে চলে গেল কঁত্রাম। ওরা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে কেউ ওদের সঙ্গ নিতে পারল না। চার্লত হতাশ হয়ে বসে রইল মাদাম অনোরতের কাছে। পলও বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর পল চার্লতকে বলল, মাদাম অনোরত এখানে বিশ্রাম করুন, চলুন আমরা ওদের খুঁজতে যাই।

মাদাম অনোরত বললেন, ওরা যাক না। ওদের বিরক্ত করে লাভ কি। তোমরাও যাও না, বেড়িয়ে এসগে। আমি এইখানে বসে থাকব। তবে হ্যাঁ খুব বেশী দেরী করো না।

পল চার্লতকে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ওদের কোথাও দেখতে পেল না। চার্লত হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ওর কথা ভাবি না, আমার সঙ্গে ও খেলা করেছে। ও আমাকে ভালবাসেনি। কিন্তু আমি ভাবছি আমার বোনের কথা। আমার বোন আজকাল আমায় ঘৃণা করে। আজ আমার কেউ নেই। আমার দুঃখ বোঝার মত কেউ নেই।

চার্লতকে দেখে সত্যিই দুঃখ হলো পলের। এর আগেও হয়েছে অনেক বার। কিন্তু কোন উপায় নেই। এ নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ করে কোন লাভ হবে না। পল চার্লতকে সান্ত্বনার সুরে বলল, চল আমরা ফিরে যাই। তুমি ওর কথা একেবারে ভুলে যাও।

চার্লত তার একটা হাত পলের দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনার নিষ্ঠা আছে।

চার্লতকে দুহাত দিয়ে তুলে ছোট্ট নদীটা পার করে দিল পল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ক্রিশ্চানের কথা। আজ হতে বছরখানেক আগে সে এমনি করে এখানে বেড়াতে এসে কতদিন ক্রিশ্চানকে পার করে দিয়েছিল। নিজেরই ক্ষণভঙ্গুর প্রেমাবেগের অকারণ গতি পরিবর্তনে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল পল। ক্রিশ্চান তাকে আজও তেমনি ভালবাসে। কিন্তু তার নিজের সে মন আর নেই। তার মনে হলো সে যেন অন্ধ প্রেমদেবতার মন্ত্রপুতঃবাহন এক পলাতক অশ্ব একজনকে পিঠ থেকে নামাতে না নামাতে আর একজন সে পিঠে উঠে বসে।

মাদাম অনোরত তখন একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। পল আর চার্লত গিয়ে নীরবে বসল তাঁর কাছে। অনেকক্ষণ পর কঁত্রাম এল। লুইএর হাত ধরে তাকে টেনে আনছিল। কঁত্রাম আসতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল মাদাম অনোরতের। কঁত্রাম বলল, কাণ্ড দেখেছ ডাক্তার ম্যাজেলির। আমরা ধরে ফেলেছি ডাক্তার ম্যাজেলি অধ্যাপক ক্লোচের মেয়ের সঙ্গে নির্জনে বসে প্রেম করছিল। অথচ সবাই বলে ডিউকপত্নী নাকি ওর প্রেমে হাবুডুবু—

কথাটা শেষ করতে দিলেন না বর্ষীয়সী নীতিপরায়ণা মহিলা মাদাম অনোরত। বললেন, না কাউণ্ট এখানে মেয়েরা রয়েছে। এখানে ওসব কথা আলোচনা করবেন না।

কঁত্রাম সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করে তার ভুল স্বীকার করল।

যাবার সময় হতে ওরা সকলে উঠে পড়ল। মেয়েদের পিছনে ফেলে পল আর কঁত্রাম দুই বন্ধুতে আগে আগে চলল। পল বলল, কি হলো, কিছু ফসল হলো ?

কঁত্রাম বলল, হ্যাঁ, আজ আমি সরাসরি কথাটা তুলেছিলাম, তাতে ও বলল, বাবা যা করার করবে। ওর বাবার মাধ্যমেই ও উত্তর দেবে আমার কথার। তবে আমিও বলে দিচ্ছি ওর বাবা এ বিয়েতে মত না দিলে আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাব। হোটেলে গিয়ে আমি আজই আঁদারমতকে পাঠাব ওর বাবার কাছে। সরাসরিভাবে প্রস্তাবটা সে তুলবে। তাতে কি বলে দেখি।

কঁত্রাম গিয়ে দেখল আঁদারমত ওরিয়লদের সঙ্গে ঝর্ণার ধারে হোটেলের কাছাকাছি জমিগুলো মাপছে আর ব্যস্তভাবে কথাবার্তা বলছে।

কিছুক্ষণ পর হোটেলে খাবার ঘরে সকলে সমবেত হলে সহসা আঁদারমত এসে মার্কুইকে বলল, আমি ঘোষণা করছি মহাশয় মার্কুই আজ হতে দুই মাসের মধ্যে আপনার পুত্র কঁত্রামের সঙ্গে লুই ওরিয়লের বিবাহকার্য সম্পন্ন হবেই।

মার্কুই অবাক হলো তার কথায়। সে এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। তবু সে বলল, ঠিক আছে। কঁত্রামের যদি এ বিয়েতে আগ্রহ থাকে তাহলে আমি আপত্তি করব না।

আঁদারমত সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা লেখাপড়া করা কাগজ বার করে দেখাল সকলকে। সে ওরিয়লদের মুখের কথাতে বিশ্বাস করে না। তাই কঁত্রামের বিয়ের যৌতুকস্বরূপ সে কি দেবে তা লিখে সই করিয়ে দিয়েছে। আঁদারমত বলল, আমি ওকে বললাম এ বিয়েতে আমরা নগদ টাকা চাই না, চাই জমি। হোটেল আর নতুন ঝর্ণার আশেপাশে যে জমিগুলোর অভাবে আমাদের কাজ আটকে আছে সেই জমি চাই আমরা। তাছাড়া সপ্তাহ তিনেক আগে আপনি তা নিজের মুখে স্বীকার করেছেন। আপনি বলেছেন আপনার বড় মেয়ে লুইকে যে বিয়ে করবে তাকে আপনি ঐ সব জমি দেবেন।

আঁদারমত গর্বের সঙ্গে বলল, আমি কাঁচা কাজ করি না। এ কথা বলার আগে ওরিয়লদের সামনে লুইকে ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করেছি এ বিয়েতে তার মত আছে কি না। লুই সকলের কাছে স্বীকার করেছে সে কঁত্রামকে ভালবাসে।

সব কিছু শুনে ছেলের বাপ হিসাবে গর্ব অনুভব করল মার্কুই। বলল, যতই হোক আমি একবার যাব। যা কথা তাত সব হয়ে গেছে। তবু আমি একবার যাব। তাতে আমার জামাই যা বলেছে তার গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে।

৫

প্রেমিক হিসাবে বেশই সার্থকতা অর্জন করেছে কঁত্রাম। আঁদারমতের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে দিন-দিন নানা রকমের উপহার নিয়ে মাদাম অনোরতের বাড়ি গিয়ে মিলিত হয় লুসির সঙ্গে। সঙ্গে পলকেও নিয়ে যায়। কঁত্রাম যখন লুইকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে পল তখন চার্লতের সঙ্গে কথা বলে। তাকে সান্ত্বনা দেয়।

আজকাল ক্রিশ্চান একা একা তার ঘরের সোফায় বসে থাকে। বিশেষ নড়তে চড়তে পারে না। পল তার ঘরে ঢুকতেই সে বড় রেগে গেল তাকে দেখে। তার সন্দেহ হয় পল নিশ্চয় আজকাল অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মেলা-মেশা করে। সে পলকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে এ বিষয়ে। কিন্তু পল এড়িয়ে যায়। সত্যি কথা বলে না। অথচ পল বেশ জানে সে চার্লতের প্রতি ক্রমশই আসক্ত হয়ে পড়ছে। ক্রিশ্চান জানে পলকে দেহগত বা মনোগত কোন তৃপ্তিদানের ক্ষমতা তার এখন নেই। সুতরাং পলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদটাকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হবে।

এদিকে চার্লতের সঙ্গে ভালবাসাবাসির ক্ষেত্রে পলের এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে। সে হল ইতালির ডাক্তার ম্যাজেলি। ম্যাজেলি একদিন কঁত্রামের কাছে নিজের মুখে স্বীকার করল ডিউকপত্নীর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। অধ্যাপক ক্লোচের মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। এখন সে চার্লতের দিকে ঝুঁকেছে। প্রেম নিবেদনের মাধ্যমে কোন নারীমন জয় করার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল ম্যাজেলির। তার কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে সব সময়ে ফুটে উঠত একজন সার্থক অভিনেতা, সুদক্ষ নাচিয়ে আর যাদুকরের অব্যর্থ কৌশল যার অমোঘ প্রভাব সোজা চলে যেত নারী-মনের গভীরে!

ব্যাপারটা পলেরও নজরে পড়েছে। একদিন ওরিয়লদের বাড়িতে পল যখন কঁত্রাম আর লুইএর সঙ্গে কথা বলছিল তখন সে দেখল ম্যাজেলি চার্লতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কথায় কথায় তাকে হাসাচ্ছে। পল আরো দেখল ম্যাজেলির কি একটা কথা শুনে একবার গালদুটো লাল হয়ে উঠল চার্লতের। পল স্পষ্ট বুঝতে পারল নিশ্চয় প্রেম নিবেদন করছে ম্যাজেলি। তাই লজ্জা পেয়েছে চার্লত।

পল কঁত্রামকে ডেকে বলল, দেখ চার্লতের বোনকে তুমি বিয়ে করতে চলেছ, তার প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে। তুমি ম্যাজেলিকে সাবধান করে দাও, সে যেন চার্লতের মত এক নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ না করে। তুমি জান ম্যাজেলির কাজই হলো মেয়েদের ঠকিয়ে তাদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানো।

কঁত্রাম বলল, একথাটা তুমি গিয়ে চার্লতকে বল। আমি বরং ম্যাজেলিকে-

ডেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। তুমি চার্লতকে একা পেয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে। বলে দেবে তার ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা কত স্বার্থপ্রণোদিত। ডিউকপত্নী ও ক্লোচের মেয়েকে স্বার্থের জন্যেই ভালবাসতে গিয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে স্বার্থের খাতিরে সম্পত্তির লোভে এসেছে তোমার কাছে।

পল বলল, ঠিক আছে।

একা পেয়ে চার্লতকে প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলল, এক ধরনের পুরুষ আছে যাদের মেয়ে ঠকিয়ে বেড়ানোই হলো একমাত্র কাজ। তারপর সে ম্যাজেলির নাম করল। জিজ্ঞাসা করল ম্যাজেলিকে সে ভালবাসে কি না। চার্লত তখন বলল, সে সব কিছু শুনেছে। তবু তার কথা হচ্ছে এই যে, তাকে সহজভাবে ভালবাসতে আসবে যে তার ভালবাসা গ্রহণ করবে। তবে আমি ঘরপোড়া গরু, প্রতারণার ভয় আমার আছে।

সহসা আবেগের সঙ্গে বলে উঠল পল, আমি তোমাকে ভালবাসি চার্লত।

চার্লত কেমন যেন বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হয়ে উঠল। পলের এই আকস্মিক ভাবাবেগের কোন কারণ সে বুঝতে পারল না। সে উঠে দাঁড়াতেই পল তাকে জড়িয়ে ধরে জোর করে চুম্বন করতে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা কি শব্দ হতে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

পল দেখল অকস্মাৎ কোথা হতে বুড়ো ওরিয়ল এসে হাজির হয়েছে। তাদের এই ব্যাপারটার কিছুটা দেখেছে সে। বাবাকে দেখে ছুটে পালাল চার্লত। ওরিয়ল তখন গর্জন করতে করতে ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে এসে পলের জামার কলারটা ধরে ফেলল। পল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের একদিকের দেয়ালে গা হেলান দিয়ে বলল, দেখুন ওরিয়ল, এটা ঝগড়া মারামারি ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে শান্তভাবে বোঝাপড়ার কাজ। আমি স্বীকার করছি আপনার মেয়েকে আমি চুম্বন করেছি। কিন্তু আমি পালিয়ে যাবার লোক নই, আমি দায়িত্বহীন নই। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব।

কিন্তু এ কথাতে রাগ কমল না বুড়ো ওরিয়লের। সে বলল, আঁদারমতের যত সব শালা সম্বন্ধী বন্ধু বান্ধব তার সর্বনাশ করতে আসে। তার সম্পত্তির লোভে তার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে আসে। প্রেমের অভিনয় করে বিয়ে করতে আসে।

এবার পলও চীৎকার করে বলল, মুখ সামলে কথা বলো ওরিয়ল, আমি গরীব ভিখিরি ঘরের ছেলে নই। আমার যা টাকা আছে তাতে তোমাকে আমি কিনতে পারি। আমি তোমার সম্পত্তির লোভে আসিনি। আমার যা টাকা আছে বর্তমানে তার পরিমাণ হবে তিরিশ লক্ষ ফ্রাঁ।

এবার শান্ত হলো ওরিয়ল। বলল, তুমি এটা লিখে দিতে পার? একটা কাগজে লিখে সই করে দিতে পার?

পল বলল, নিশ্চয় পারি।

বুড়ো ওরিয়ল সত্যি সত্যিই চুক্তিপত্র লেখার কাগজ নিয়ে এল। পলের কাছ থেকে লিখিয়ে নিল ওরিয়ল, পল তার মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দান করছে আর তার টাকার পরিমাণ হলো তিরিশ লক্ষ ফ্রাঁ।

ওরিয়লের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগল পল, এ কাজে তার নিজের বা চার্লতের কারোরই সায় ছিল না। তবে ভাগ্যচক্রে বাধ্য হয়ে সে এই প্রতিশ্রুতি দান করেছে। তবু অন্তরে একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আর তৃপ্তি অনুভব করছিল পল।

৬

পরের দিন একই সঙ্গে দুটো দুঃসংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল আঁদারমতের। এঞ্জিনীয়ার মঁসিয়ে অব্রে পাস্তর হঠাৎ গতকাল রাত্রে মারা গেছেন। আর ডাক্তার ম্যাজেলি অধ্যাপক ক্লোচের সেই বিধবা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

তার অফিসঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আঁদারমত এই ঘটনা দুটোর সম্ভাব্য কুফলগুলোর কথা ভাবতে লাগল। প্রথম কথা, পাস্তরের সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক ক্লোচ চলে যাবেন এখান থেকে মনের দুঃখে। সেটাও ক্ষতিকারক হবে তার পক্ষে। তৃতীয়তঃ ডিউক ও ডিউকপত্নী চলে যাবেন এখান থেকে।

ডাক্তার লাতোনি ঘরের মধ্যেই ছিল। লাতোনিকে আঁদারমত বলল, পাস্তরের মৃত্যু সম্বন্ধে এমনভাবে একটা রিপোর্ট খাড়া করুন, যাতে আমাদের কোন দায়দায়িত্ব না থাকে।

লাতোনি যাবার আগে আর একটা খবর দিয়ে গেল। বলল, আপনার বন্ধু পল ব্রেতিগনি চার্লতকে বিয়ে করছে। একথা বুড়ো ওরিয়ল নিজে ঘোষণা করেছে।

আঁদারমত খুব খুশি হলো এ সংবাদে। এত খুশি হলো যে সে বিশ্বাস করতেই পারল না। কঁত্রাম যদি ওরিয়লের বড় মেয়ে লুইকে বিয়ে করে আর পল যদি ছোট মেয়ে চার্লতকে বিয়ে করে তাহলে পাহাড় আর প্রস্রবণের চারপাশের সমস্ত এলাকা তার অধীনে চলে আসবে। তাহলে আর কোন অসুবিধাই হবে না কোন ব্যাপারে। তাহলে আর ওরিয়লদের খোশামোদ করতে হবে না।

কথাটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করার জন্য হোটেলে গিয়ে পলের সঙ্গে দেখা করল আঁদারমত। জিজ্ঞাসা করতেই পলও স্বীকার করল। তবে তাকে সাবধান করে দিল একথাটা যেন ক্রিশ্চানকে সে না বলে। কারণ ক্রিশ্চানের সঙ্গে সে নিজে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং সে নিজে গিয়ে বলবে তাকে। সেই-টাই শোভন হবে।

এদিকে ক্রিশ্চানের প্রসব ব্যথা উঠল। ডাক্তার ব্ল্যাকের কাছ থেকে পলের

বিয়ের ব্যাপারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় তার বিছানায় ছটফট করতে লাগল ক্রিশ্চান। দেহগত ব্যথা ছাড়াও অন্য একটা ব্যথা তার সমগ্র অন্তরাত্মাটাকে মোচড় দিতে লাগল।

পনের মিনিট এইভাবে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করার পর একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল ক্রিশ্চান। প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের যন্ত্রণাটা কমল, কিন্তু মনের যন্ত্রণা কমল না। পলের বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে পড়তে লাগল তার। পল এখন অন্য এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চলেছে। আজ পল যদি তাকে ভালবাসত আগের মত তাহলে তার এই সন্তানকে দেখে কত খুশি হত পল। সেটা কত সুখের বিষয় হত তার নিজের পক্ষে।

আঁদারমত এসে মেয়েকে দেখে খুব খুশি হলো। বলল, দেখ দেখ কেমন সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু ক্রিশ্চান তাকে জিজ্ঞাসা করল পলের বিয়ের কথা। আঁদারমত বলল, হাঁ কথাটা সত্যি কিন্তু যাক তুমি তোমার মেয়েকে দেখ।

এই বলে আঁদারমত লাল টুকটুকে কাপড়ে জড়ানো শিশুটাকে দোলনা থেকে ক্রিশ্চানের কাছে এনে দিল। শিশুটার স্পর্শে তার তপ্ত মন কিছুটা শান্ত হলো।

সন্ধ্যের সময় মার্কুই আর কঁত্রাম ক্রিশ্চানকে তার ঘরে দেখতে এসে এই সব কথাই আলোচনা করতে লাগল। বলল, অধ্যাপক ক্লোচ গেছে তার মেয়ের খোঁজ করতে আর ডিউকপত্নী গেছে ডাক্তার ম্যাজেলির খোঁজে।

শেষকালে কঁত্রাম বলল, পল যা করছে ঠিক করছে। আর মাদাম অনোরতই ওদের এই বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তারই ঘরে ওরা মিলিত হত মাঝে মাঝে।

অথচ মাদাম অনোরত বর্তমানে তারই দেখাশোনা করছে। শিশুকে দেখার জন্য একজন ধাত্রীকে আনা হলেও অভিজ্ঞ মহিলা মাদাম অনোরতকে ডেকে এনেছে আঁদারমত।

মাদাম অনোরতের কথাটা শোনার পর থেকে কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারছিল না ক্রিশ্চান। তবু তার মুখ থেকে কথাটা নূতন করে জানার ইচ্ছাটাকেও দমন করতে পারছিল না কোনমতে।

তার বাবা আর ভাইএর মুখ থেকে প্রতিটি কথা আগ্রহ সহকারে শোনবার পর ক্রিশ্চান চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল তার বিছানায়। তারপর একসময় বলল, আমাকে এবার বিশ্রাম করতে দাও।

মার্কুই ও কঁত্রাম চলে গেল। কিন্তু ঘুমোতে পারল না ক্রিশ্চান। আবার সেই চিন্তার পীড়ন। আবার সেই যন্ত্রণার ঢেউটা ছুটে বেড়াতে লাগল তার

রক্তে।

ঘরের খোলা জানালা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করেছিল ঘরের মেঝের উপর। সেই স্বল্প পরিসর আলোর বৃত্তটুকুর মধ্যে ক্রিশ্চান যেন তার অতীতের এক স্মৃতিকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত দেখল সহসা। চন্দ্রালোকিত যে সব পাহাড়, বন, নদী, উপত্যকার মাঝে পলের সঙ্গে তার প্রথম প্রেমের জন্ম হয়, তাদের কথা একে একে সব মনে পড়ল তার। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে 'পল' 'পল' বলে চীৎকার করে উঠল ক্রিশ্চান। তার চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল মাদাম অনোরত। বলল, কি হলো? আপনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন?

ক্রিশ্চান বলল, হ্যাঁ স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম।

মাদাম অনোরতকে কাছে বসতে বলল ক্রিশ্চান। কিন্তু কিভাবে পলের কথাটা তার কাছে তুলবে ভেবে পেল না।

মাদাম অনোরত আপন মনে এনভাল গাঁয়ের যত সব কুৎসার কথা শোনাতে লাগল ক্রিশ্চানকে। ওরিয়লদের কথাটা তুলতেই ক্রিশ্চানকে বলল, তুমি দুটি মেয়ের মধ্যে কাকে বেশী পছন্দ করো?

মাদাম অনোরত বলল, আমি বড় বোন লুইকেই বেশী পছন্দ করি। তবে আমার স্বামী পছন্দ করে চার্লতকে।

ক্রিশ্চান এবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমার ভাই তোমার ঘরেই লুই-এর সঙ্গে দেখা করত। তাই না?

মাদাম অনোরত বলল, হ্যাঁ, তবে আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগত মঁসিয়ে পল আর চার্লতের ভালবাসাবাসি।

কিছু না জানার ভান করে ক্রিশ্চান বলল, আচ্ছা পল কি খুব বেশী ভালবাসত চার্লতকে?

বেশী মানে? কি বলব মাদাম আঁদারমত, ও রকম ভালবাসা দেখাই যায় না। যখন সেই ম্যাজেলি নামে ইতালীয় ছোকরাটা চার্লতের সঙ্গে একবার ভাব করেছিল তখন পল ত ক্ষেপে উঠেছিল তা দেখে।

ক্রিশ্চান আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা পল ওকে কবিতা শোনাত?

মাদাম অনোরত বলল, হ্যাঁ, শোনাত বৈকি?

পল তাকে ঠিক যেভাবে আদর করত, যেভাবে ভালবাসা জানাত ঠিক সেইভাবে চার্লতকে আদর করেছে কি না, তাকেও সেইভাবে ভালবাসা জানিয়েছে কি না তা সব একে একে মাদাম অনোরতের কাছ থেকে জানতে চাইল ক্রিশ্চান। তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির প্রতি তার আগ্রহ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল মাদাম অনোরত।

ঘরের দরজা ঠেলে আঁদারমত এসে ক্রিশ্চানকে জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার ব্ল্যাক এসেছে তাকে দেখতে।

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল ক্রিশ্চান, না, না, ওকে কিছুতেই আসতে দেবে না এখানে।

তারপর বিছানার অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মাদাম অনোরতের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আর ঐ মেয়েটাকে বার করে দাও ঘর থেকে। আমি ওকে দেখতে পারছি না।

আঁদারমত মাদাম অনোরতকে অনেক কাজ বুঝিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

ক্রিশ্চান তার স্বামীকে বলল, শুধু তুমি থাকবে ঘরে, আর কেউ না।

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তা দেখে আঁদারমতের চোখেও জল এল। সে ভাবল ক্রিশ্চানের জ্বর হয়েছে এবং জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে ক্রিশ্চান।

পরের দিন সকালে কিছুটা সুস্থ ও শান্ত হলো ক্রিশ্চান।

ক্রিশ্চান তার মেয়েকে দেখতে চাইল। বলল, ওর গায়ের কাপড় খুলে দাও।

শিশুটার নগ্ন গায়ের সর্বত্র খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ক্রিশ্চান। আর ভাবতে লাগল তার নিজের আর পলের মিলিত চেষ্টায় গড়ে তোলা হয়েছে এ শিশুর দেহ। এর ছোট্ট প্রাণটুকুর মধ্যে আছে তাদের দুজনের এক প্রাণবন্ত দ্বৈত ভালবাসার স্বাক্ষর। সে ভালবাসা আজ বেঁচে না থাকলেও কেউ মুছে দিতে পারবে না এ স্বাক্ষর। সহসা আপন মনে বলে উঠল ক্রিশ্চান, শুধু আমাকে ছাড়া জীবনে আর কোন মানুষকে ভালবাসবি না, বুঝলি মা।

শিশুর সারা দেহে পাগলের মত চুম্বন করতে লাগল ক্রিশ্চান, আঁদারমত এসে তাকে তুলে নিল। ক্রিশ্চানের কেবলি ভয় হচ্ছিল, এই শিশুকন্যাই একদিন বড় হয়ে কোন না কোন মানুষকে ভালবাসবে। কারো না কারো ভালবাসার ফাঁদে ধরা পড়ে যাবে। কথাটা ভাবতেও ভয়ে শিউরে উঠছিল ক্রিশ্চান।

একটু বেলা হতেই বড় ডাক্তার অধ্যাপক মাস রুসেল এলেন ক্রিশ্চানকে দেখতে। পরীক্ষা করে বললেন, আপনি ভাল আছেন।

আঁদারমত ঘরে এসে খবর দিল, বুড়ো ক্লোভিস একেবারে সেরে গেছে জলের গুণে। আগে হাঁটতে পারত না। এখন হাঁটতে পারছে, আজ এক প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করা হবে এ কথা। উষ্ণ প্রস্রবণের গুণ বর্ণনা করা হবে।

ক্রিশ্চান বলল, কখন তোমাদের সভা হবে?

আঁদারমত বলল, বেলা তিনটের সময়।

ক্রিশ্চান বলল, পল থাকবে?

আঁদারমত বলল, ডিরেক্টর বোর্ডের সব সদস্য ও ডাক্তারেরা থাকবে।

ক্রিশ্চান বলল, আমি তখন জেগে থাকব। পলকে তখন আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দেবে। একা থাকি, ওর সঙ্গে সময়টা তাহলে কথা বলতে বলতে কেটে যাবে।

আঁদারমত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দেব।

আঁদারমত চলে গেল।

বেলা তিনটের সময় এক প্রকাণ্ড জনসভায় বুড়ো ক্লোভিস লাঠি না ধরে হেঁটে উপস্থিত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। আঁদারমত একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল উষ্ণ প্রস্রবণের গুণ বর্ণনা করে। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল পলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি ক্রিশ্চানের কাছে।

পলকে বলতেই পল চলে গেল হোটেলে। যেতে মন উঠছিল না। ভয় করছিল। ক্রিশ্চান কি বলবে? সে কি ক্ষমা করবে তাকে? সত্যিই সে অন্যায় করে ফেলেছে। নানারকম চিন্তা আর দ্বিধায় পা জড়িয়ে ধরছিল।

যাই হোক, কোনরকমে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ঝি এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল বাইরে থেকে। তারা দুজনে একা ঘরের মধ্যে।

আবেগের সঙ্গে ক্রিশ্চানের পা ধরে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল পল। কিন্তু তার একটা হাত বাড়িয়ে পলের হাতটা ধরে ফেলল। বলল, বস।

পল কি কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। অতি কষ্টে বলল, কেমন আছ?

ক্রিশ্চান বলল, ভাল। ধন্যবাদ।

সহসা শিশুটা ঘুম থেকে জেগে উঠতেই ক্রিশ্চান হাত দিয়ে দোলনাটা দোলাতে লাগল। বলল, দেখছ ত আমার এখন মোটেই সময় নেই। ছেলের কাছে সব সময় ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারব না।

ক্রিশ্চানকে খুঁটিয়ে দেখে পলের মনে হল, আগের থেকে ক্রিশ্চান যেন আরো সুন্দর হয়েছে। তার চোখগুলো আগের থেকে অনেক স্থির আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার সে নীল চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছে আরও আয়ত আর গভীর। তার হাতগুলো হয়ে উঠেছে আরও সাদা।

পল উঠে দাঁড়াল।

এক মনে দোলনা দোলাতে লাগল ক্রিশ্চান। শিশুটার দিকে একবার তাকিয়ে পল বলল, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব, তিনি যেন তোমায় সুখী করেন।

———

পীয়ের ও জঁ্যা

Pierre and Jeuk

১

প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল বৃদ্ধ রোলাঁদ। তার পাশেই ছিল মাদাম রোলাঁদ আর মাদাম রোজমিলি। রোজমিলিকে মাছ ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি অতিথি।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে অনুযোগ করল রোলাঁদ, সেই দুপুর থেকে আমি একটা মাছও ধরতে পারিনি। আর ধরব কি, মাছ ধরার ব্যাপারটা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। মেয়েরা থাকলে সব পণ্ড হয়ে যায়।

রোলাঁদের দুই ছেলে পীয়ের আর জঁ্যা নৌকোর দুধারে বসে ছিল। তারা তাদের বাবার কথা শুনে হেসে উঠল জোরে। জঁ্যা বলল, আমাদের আজকের অতিথি হলো একজন মহিলা, সুতরাং কথাটা বলা ঠিক হলো না।

ক্ষমা চাইল রোলাঁদ। বলল, নারীদের সাহচর্য আমি ভালবাসি ঠিক, কিন্তু জলের উপর মাছ ধরতে এসে একমাত্র মাছের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না।

মাদাম রোলাঁদ বলল, তাহলেও খুব একটা খারাপ হয়নি। রোলাঁদ ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারা তিনজনে আজ যে সব মাছ ধরেছে, সেই সব মাছগুলো তখনো হাঁপাচ্ছিল। তাদের ডানাগুলো কাঁপছিল।

লোকে যেভাবে গোলাপ ফুলের গন্ধ শোঁকে ঠিক সেইভাবে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ধরা মাছগুলোর আঁশটে ঘ্রাণ নিতে লাগল রোলাঁদ। তারপর বলল, তুমি ক'টা মাছ ধরেছ পীয়ের ?

পীয়ের হচ্ছে রোলাঁদের বড় ছেলে। বয়স তিরিশ। দাড়ি কামানো মুখ, গালে কালো জুলপি। পীয়ের উত্তর করল, বেশী না বাবা, তিন চারটে।

রোলাঁদ এবার জঁ্যাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ক'টা মাছ ধরেছ জঁ্যা ?

জঁ্যা রোলাঁদের ছোট ছেলে। বয়সে পীয়েরের থেকে পাঁচ বছরের ছোট। তার দাদার থেকে মাথায় লম্বা আর দেখতে ভাল। জঁ্যা বলল, বেশী না চার পাঁচটা।

রোলাঁদ মাছ ধরার সুতোটা গুটিয়ে নিয়ে বলল, আজ মাছরা ধরা দেবে না। শালারা রোদে আরাম করে ঘুমোচ্ছে।

আগে রোলাঁদের সোনা-রূপোর একটা দোকান ছিল প্যারিসে। কিন্তু বরাবরই সমুদ্রে নৌকোয় করে বেড়ানো একটা নেশা ছিল রোলাঁদের। সোনা-রূপোর কারবার করে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে নিয়ে সে কারবার ছেড়ে দিয়ে

তার পৈতৃক গাঁ হাভারেতে বসবাস করতে যায় স্থায়ীভাবে। মাছ ধরার একটা জেলে ডিঙি কিনে মাছ ধরার কাজে পুরোপুরি লেগে যায়। তার দুই ছেলে এখনো প্যারিসে থেকে পড়ে। ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। বাবাকে মাছ ধরার কাজে সাহায্য করে।

পীয়ের পড়ে ডাক্তারি আর জাঁ পরে ওকালতি। কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে দুই ভাই একেবারে উল্টো। পীয়ের বড় বদমেজাজী আর চঞ্চলমনা; তার মতের কিছু স্থির থাকে না। তাছাড়া সে সন্দিগ্ধমনা আর ঈর্ষাপরায়ণ। ছোট থেকেই সে তার ভাইকে ঈর্ষা করে।

অন্যদিকে জাঁ বড় শান্ত এবং একাগ্রচিত্ত। সে সরল এবং উদার প্রকৃতির। তার শান্ত স্বভাবকে পীয়ের বলে দুর্বলতা। কোন ব্যাপারে তার বা মা যখন জাঁর উদাহরণ দিয়ে বলত, জাঁর কাছ থেকে শেখ, তার মত হবার চেষ্টা কর। তখন রেগে যেত পীয়ের। জাঁর প্রতি তার ঈর্ষার ভাবটা বেড়ে যেত।

তাদের দুজনের মধ্যে ঈর্ষাটা বেড়ে গিয়েছিল আর একটা কারণে আর সে কারণ হলো মাদাল রোজমিলি। মাদাম রোজমিলি ছিল তাদের প্রতিবেশী আর তাদের মার বান্ধবী। মাদাম রোজমিলি বিধবা, নিঃসন্তান এবং সম্পত্তি-শালিনী। বয়স মাত্র বাইশ। দেখতে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। তার স্বামী ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন। রোজই সন্ধ্যের দিকে সেলাইএর সুতো কাঁটা নিয়ে মাদাম রোলাঁদের সঙ্গে গল্প করতে আসত মাদাম রোজমিলি। এসে এই বাড়িতেই চা খেত।

মাদাম রোলাঁদ চাইত তার এক ছেলে মাদাম রোজমিলিকে বিয়ে করে তার বিষয় সম্পত্তি লাভ করুক। তবে স্বভাবের দিক থেকে মিল থাকার জন্য জাঁকে বেশী পছন্দ করত রোজমিলি। আর তা দেখে মনে মনে জ্বলে যেত পীয়ের।

বৃদ্ধ রোলাঁদ মাঝে মাঝে মাদাম রোজমিলিকে নিয়ে মাছ ধরতে যেত সমুদ্রে। অনেক সময় তার ছেলেদের বা স্ত্রীকেও সঙ্গে নিত না। একদিন সন্ধ্যের সময় রোলাঁদ যখন মাদাম রোজমিলির বাড়িতেই ছিল তখন এক বান্ধবীর কাছে রোজমিলি বলল, মাছ ধরার মধ্যে সত্যিই মজা আছে।

কথাটা কানে যেতেই বৃদ্ধ রোলাঁদ বলে উঠল, যাবে মাছ ধরতে? আগামী মঙ্গলবার?

মাদাম রোজমিলি বলল, নিশ্চয় যাব।

রোলাঁদ বলল, তোমার সকালে ওঠার অভ্যাস আছে?

রোজমিলি বলল, না।

রোলাঁদ তখন আবার প্রশ্ন করল, তাহলে সকালে ক'টা নাগাদ বার হতে পার?

রোজমিলি বলল, ন'টা। তার এক মুহূর্ত আগে না।

রোলঁাদ প্রথমে কিছুটা ইতস্ততঃ করল। তারপর পরের মঙ্গলবার রোজমিলিকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল।

সেদিন যথাসময়ে রোজমিলি আর দুই ছেলেকে সঙ্গে করে নৌকোয় করে মাছ ধরতে গেল রোলঁাদ। সঙ্গে তার বন্ধু বোসায়ারও গেল। বোসায়ার একজন অবসরপ্রাপ্ত নাবিক। তারও মাছ ধরতে যাওয়ার বাতিক ছিল।

কিন্তু সেদিন বেশীক্ষণ থাকা গেল না সমুদ্রের বুকে। কিছু মাছ ধরার পরই আকাশের পানে তাকিয়ে রোলঁাদ বলল, চল ফেরা যাক।

তারপর ছেলেদের বলল, এক ফোঁটাও বাতাস নেই, তোমরা দুজনে দাঁড় টান।

অস্তগতপ্রায় সূর্যের শেষ আলো নিবে যাবার ঠিক একটু আগে গোলাপী আভায় রঞ্জিত নীল আকাশের কোলে একটা ধূসর রঙের মেঘ মাথা তুলে উঠছিল ধীরে ধীরে। আর তার ঠিক নীচে একটা জাহাজ দিগন্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। রোলঁাদ বলল, জাহাজটা আসছে সাদামটন থেকে।

দূরবীণটা নিয়ে ভাল করে দেখল রোলঁাদ। বলল, ঠিক তাই। নর্মাণ্ডি থেকে আসছে।

রোলঁাদ রোজমিলির হাতে দূরবীণটা দিল। মাদাম রোজমিলি দূরবীণটা নিয়ে দূরে জাহাজটাকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শুধু তার মনে হলো একতাল নীল কি একটা বস্তু দিগন্তের নিচে জমে রয়েছে। মাদাম রোজমিলি বলল, আমি দূরবীণে কিছু দেখতে পাই না। আমার স্বামী এজন্য রাগ করতেন।

রোলঁাদ তার ছেলেদের বলল, নাও জোরে জোরে দাঁড় টান।

পীয়ের বলল, আমি পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে।

জঁা খুব জোরে দাঁড় টানতে লাগল।

ওরা ভেবেছিল ঝড় উঠবে সমুদ্রে। কিন্তু তা আর উঠল না। সমুদ্রের বুকটা শান্ত রয়ে গেল আগের মত। মাদাম রোজমিলি আশ্বস্ত হলো। বলল, এই সমুদ্রই মাঝে মাঝে কী ভয়ঙ্করই না হয়ে ওঠে।

'নর্মাণ্ডি' নামে জাহাজটা হাভারের ঘাটের' দিকেই এগিয়ে আসছিল। তার আগে আলবার্ট নামে একটা ষ্টীমার ওদের নৌকোটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওদের নৌকোর নাম পার্ল।

অবশেষে পার্ল যথাসময়ে বন্দরে এসে পৌছল। ওরা নেমে শহরের মধ্যে ওদের বাড়ির পথে রওনা হলো। মাদাম রোলঁাদ মাদাম রোজমিলিকে বললেন, এসো না, আমাদের বাড়িতে। সন্ধ্যেটা গল্প করে কাটাব।

মাদাম রোজমিলি রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, আমারও সন্ধ্যের সময় একা একা বাড়িতে থাকতে কষ্ট হয়।

পীয়ের কথাটা শুনে বলল, এই বিধবা মহিলাটি কিন্তু একা একা থাকতেই

ভালবাসেন।

মাদাম রোজমিলি চলে গেল মাদাম রোলাঁদের সঙ্গে। বৃদ্ধ রোলাঁদ তাঁর ছেলেদের সঙ্গে অন্য ঘরে চলে গেল।

আজকাল পীয়ের মাদাম রোজমিলিকে বিধবা মহিলা বলে। কথাটা শুনতে জাঁর খুব খারাপ লাগে। আসলে কথাটার থেকে বলার ভঙ্গিটা আর পীয়ের কণ্ঠস্বরটা খুবই খারাপ লাগে তার।

রোলাঁদদের বাড়িটা হলো বেল নর্মান্দে অঞ্চলে। বাড়িটা প্রথমে এক-তলাই হয়েছিল। পরে উপরে দুটো তলা খাড়া করা হয়েছে। রোলাঁদরা গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই জোসেফিন নামে এক ঝি দরজা খুলে দিল।

জোসেফিন দরজা খুলেই রোলাঁদকে বলল, মঁসিয়ে লেকান্যু নামে উকিল-বাবুর কাছ থেকে এক ভদ্রলোক খুঁজতে এসেছিল আপনাকে। উকিলবাবু আজ সন্ধ্যের সময় নিজেই দেখা করবেন।

কথাটা শুনে রোলাঁদ তার ছেলেদের মুখপানে তাকাতে লাগল। সে কিছু চিন্তান্বিত হয়ে উঠল। উকিলবাবু মঁসিয়ে লেকান্যু তার বন্ধুস্থানীয় হলেও তিনি কাজের লোক। কাজ ছাড়া কখনো তিনি আসেন না। সুতরাং নিশ্চয় কিছু জরুরী দরকার আছে। তা নাহলে তিনি দুবার আসতেন না তাকে খুঁজতে।

রোলাঁদ বলল, কী ব্যাপার মনে হয়?

মাদাম রোলাঁদ আশান্বিত হয়ে বলল, হয়ত তোমার ভাগ্য ফিরেছে। হয়ত কারো কোন সম্পত্তি তুমি পেয়েছ। কিন্তু তারা খুঁজে পেল না তাদের এমন কোন আত্মীয় থাকতে পারে যার মৃত্যুতে তার সম্পত্তি লাভ করতে পারে। মাদাম রোলাঁদের স্মৃতিশক্তিটা তীক্ষ্ণ। তিনি খোঁজ করতে লাগলেন মনে মনে।

একসময় মাদাম রোলাঁদ তার স্বামীকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আচ্ছা জোসেফ লেক্রু দ্বিতীয়বার যে মেয়েটিকে বিয়ে করে তাকে চেন?

পীয়ের বাধা দিয়ে বলল, ওসব দিন চলে গেছে মা। সে সব দান খয়-রাতের দিন আর নেই। আমার মনে হয় উকিলবাবু এসেছিল জাঁর বিয়ের ব্যাপারে।

জাঁ তখন বলল, আমার বিয়ে কেন? তুমি আমার বড় ভাই। আগে তোমার বিয়ে না হলে আমার বিয়ে হবে কি করে? তাছাড়া আমি এখন বিয়ে করব না।

মাদাম রোজমিলির উপস্থিতিতে তার বিয়ের কথা এভাবে আলোচিত হোক এটা চাইছিল না জাঁ।

ডিনার খেতে খেতে ওরা আরও অনেক জল্পনা কল্পনা করল মঁসিয়ে লেকান্যুর আসার কারণ সম্বন্ধে। অবশেষে ওরা স্তব্ধ আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল তাঁর জন্য।

মঁসিয়ে লেকাম্ব আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল মঁসিয়ে রোলাঁদ। মাদাম রোলাঁদও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কফি ও চা খাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

মঁসিয়ে লেকাম্ব বললেন, এক কাপ চা অবশ্য খেতে পারি। কিন্তু পরে, আগে কাজের কথাটা হয়ে যাক।

মঁসিয়ে রোলাঁদকে লক্ষ্য করে এবার মঁসিয়ে লেকাম্ব বললেন, আচ্ছা প্যারিস নিবাসী মঁসিয়ে লিয় মারেশলের কথা আপনার মনে আছে?

উৎসাহভরে রোলাঁদ বলল, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল মারেশল। প্যারিসে আমি যখন থাকতাম ও আমার কর্মজীবনে তখনও ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি এখানে আসার সময় ওকেও আনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ও প্যারিসে থাকতে বড় ভালবাসত। তাই ওখানেই রয়ে গেল। তার মত বন্ধুকে ছেড়ে থাকতে সত্যিই আমার কষ্ট হয়।

মঁসিয়ে লেকাম্ব গম্ভীরভাবে বললেন, তিনি আর জীবিত নেই।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। মর্মাহত হলো। তবে মাদাম রোলাঁদকেই বেশী কাতর দেখাল। তিনি মুখে রুমাল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

মঁসিয়ে লেকাম্ব বললেন, আমার এক সহকর্মী প্যারিস থেকে জানিয়েছে, মঁসিয়ে মারেশল তাঁর মৃত্যুকালে এক উইল করে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আপনাদের কনিষ্ঠ পুত্র জঁাকে দান করে গেছেন। এই সম্পত্তির আয় হলো বছরে কুড়ি হাজার ফ্রাঁ। জঁা এ দান গ্রহণ করতে রাজী না হলে এ সম্পত্তি চলে যাবে কোন অনাথ আশ্রমের হাতে। মঁসিয়ে মারেশলের কোন বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি এই ব্যবস্থা করে গেছেন।

রোলাঁদ বলল, তার মত উদারহৃদয় বন্ধু পাওয়া যায় না।

পীয়ের বলল, সত্যিই তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি আমাদের দুই ভাইকে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ জানাতেন প্রায়ই।

আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল জঁার কণ্ঠ। কোন কথা বলতে পারছিল না। অবশেষে কোন রকমে বলল, তিনি আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসতেন। আমি তাঁর বাড়িতে গেলেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

রোলাঁদ এবার বলল, আচ্ছা এ সম্পত্তির উপর আর কারো দাবি নেই ত? কোন দায়-দায়িত্ব?

মঁসিয়ে লেকাম্ব বললেন, না, সব দিক থেকে এ সম্পত্তি মুক্ত—নির্ঝঞ্ঝাট। এখন জঁা সম্মতি দিলেই হয়।

মাদাম রোলাঁদ স্বামীকে বলল, আমি ত তোমাকে এর আগেও বলতে শুনেছি, মঁসিয়ে মারেশল তার বিষয়সম্পত্তি আমাদের ছোট ছেলে জঁাকে দিয়ে যাবে।

রোলাঁদ বলল, জাঁকে কি আজই সই করতে হবে ?

লেকান্থ বললেন, না, আগামী কাল বেলা ছুটোর সময় আমার অফিসে।

· মাদাম রোলাঁদ চা নিয়ে এল মঁসিয়ে লেকান্থর জন্ত। চা খেয়ে লেকান্থ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে সব ঠিক। কাল দুপুরে তোমরা এস আমার অফিসে।

লেকান্থ চলে গেলে রোলাঁদ জাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমাকে চুম্বন করনি এখনো।

জাঁ জড়িয়ে ধরল তার বাবাকে। সে কিন্তু একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ। জাঁ হঠাৎ বলল, আমি একটু ঘুরে আসি।

এ বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনার ছিল। কিন্তু সে সব আলোচনা না করেই চলে গেল জাঁ। পীয়েরও চলে গেল। ওরা দুজন চলে যেতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে দু গালে বারবার চুম্বন করতে লাগলো রোলাঁদ।

মাদাম রোলাঁদ গম্ভীরভাবে বলল, পীয়েরকে উনি কিছুই দিয়ে যাননি। এ ব্যাপারে পীয়েরের মনোকষ্ট হবে। সে বেচারা লজ্জায় পড়বে।

রোলাঁদ বলল, আমরা না হয় একটা অংশ ওকে দেবার ব্যবস্থা করব। তাছাড়া পীয়ের ডাক্তার। অনেক টাকা রোজগার করবে। মাদাম রোলাঁদ বলল, না, ও তা নেবে কেন ?

রোলাঁদ বলল, সে যা হয় দেখা যাবে। তুমি সব সময় যে কোন ঘটনার খারাপ দিকটাই দেখ। তুমি আমার আনন্দটা মাটি করে দাও।

রোলাঁদ শুতে চলে গেলে মাদাম রোলাঁদ একা বসে বসে যত সব পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগল।

২

বড় চঞ্চল আর অশান্ত মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তা খুঁজে পেল না পীয়ের। প্রথমে সে হাভারে শহরের কেন্দ্রস্থল সবচেয়ে কর্মব্যস্ত অঞ্চলে গেল। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের দেখা হওয়ার ভয়ে সেখানে না গিয়ে বন্দরের ঘাটের দিকে গেল।

ঘাটের কাছে বসে সমুদ্রের পানে তাকাতেই ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগল পীয়ের মনে। কত দূর বিদেশে জাহাজ যায়। তার ইচ্ছা যায় সেও কোন একটা দূরগামী জাহাজে বসে পড়ে।

হঠাৎ পীয়ের দেখল তার ভাই জাঁও ঘুরতে ঘুরতে তার কাছেই চলে এসেছে। পীয়ের ভাবল, জাঁ এবার নিশ্চয় মাদাম রোজমিলিকে বিয়ে করবে। তার এখন অনেক টাকা। সে এখন স্বাধীন।

জাঁকে ডেকে তার পাশে বসাল পীয়ের। তারপর বলল, কি রকম আশ্চর্যজনক ব্যাপারটা ঘটে গেল দেখ দেখি।

জাঁ বলল, সত্যিই তাই।

পীয়ের উঠে দাঁড়াল। বলল, তুমি এখন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ। আমি একবার একা একা বেড়াব। এখন তুমি সত্যিই ধনী। তোমার এই সৌভাগ্যে সত্যি আমি আনন্দিত।

জাঁ বলল, ধন্যবাদ।

জাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার এখানে সেখানে ঘুরতে লাগল পীয়ের। কিছুক্ষণ পর সে বুড়ো ম্যারোস্কোর কাছে গিয়ে এক পাত্র মদ পান করল। তার পরিচিত ম্যারোস্কোর সঙ্গে কিছু কথা বলল। তারপর সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

পরের দিন সকালে উঠে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল পীয়ের, সে সাধনার দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করবেই। এর আগেও সে বহুবার এ সংকল্প করেছে। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির এক কল্পিত আনন্দে বহুবার মনটা দুলে উঠেছে তার। কিন্তু উপযুক্ত শ্রম বা সাধনার দ্বারা কোনদিনই সে সৌভাগ্যলাভের কোন চেষ্টা করেনি। শুধু অনায়াসলব্ধ সৌভাগ্যলাভের এক অলস স্বপ্নে অর্বাচীন বালকের মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

পীয়ের ঠিক করল, এবার থেকে সে রোজ সকালে রোগী দেখতে বার হবে। সে রোজ দশটা করে রোগী দেখবে আর প্রত্যেক রোগীর কাছ থেকে কুড়ি ফ্রাঁ করে নেবে। তাহলেই তার বাৎসরিক আয় হবে বাহাত্তর হাজার ফ্রাঁ। অবশ্য তার বন্ধু বান্ধব ও পুরনো রোগীদের জন্য তার ফী কিছু কম করবে। এইভাবে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবল পীয়ের।

হঠাৎ কি মনে হলো পথে বেরিয়ে পড়ল। শহর দিয়ে কিছুটা ঘুরে এল। পীয়ের যখন বাড়ি ফিরে এল তখন লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।

পীয়ের শুনতে পেল খাবার ঘরে কাপ ডিশের শব্দ হচ্ছে। সে খাবার ঘরে গিয়ে বসতেই দেখল সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। তার জন্য ঠাণ্ডা সামান্য কিছু খাবার পড়ে আছে। তাকে দেখে তার বাবা বলল, আজ দেরী করার সময় নয়, আজ লাঞ্চ খেয়ে দুটোর মধ্যেই উকিলবাবুর কাছে যেতে হবে।

পীয়ের কোন কথা বলল না। সে বেশ বুঝতে পারল, আজ এই প্রথম তার বাবা মা খাবার সময় তার কথা ভুলে গেছে। মানুষ কিভাবে হঠাৎ নিজের ছেলের প্রতি উদাসীন হয়ে উঠতে পারে তা ভেবে পেল না পীয়ের।

পীয়ের যাবার আগে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। সে যেতে সে আলোচনা থেমে গিয়েছিল মাঝপথে। সেটা আবার শুরু হলো।

মা বলল, শোন জাঁ, আমি যদি তোমার মত এইভাবে সম্পত্তি লাভ করতাম তাহলে আমি একজন ভাল ব্যারিস্টার হবার চেষ্টা করতাম। মানুষের যত সম্পত্তিই থাক, যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

বাবা বলল, শোন জঁা, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি একটা মাছ ধরার জেলে ডিঙ্গি কিনে মনের সুখে মাছ ধরে বেড়াতাম।

পীয়ের বলল, সাধারণতঃ দেখা যায় টাকার অভাবে মানুষ অনেক সময় হীন হয়ে যায়, বড় হবার চেষ্টা করতে পারে না। জঁা আজ সমস্ত রকমের আর্থিক অভাব অনটন হতে মুক্ত হওয়ায় আজ সে স্বাধীনভাবে জীবনে বড় হওয়ার জন্য সাধনা করে যেতে পারবে। অর্থই মানুষের বুদ্ধিগত ও নীতিগত যোগ্যতা বাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং আজ জঁার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আজ হাতে বিষয় সম্পত্তি পেয়ে তাকে আরো অনেক বেশী করে খাটতে হবে। তাকে জীবনে বড় হওয়ার জন্য মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করে যেতে হবে।

রোলাঁদ বলল, মানুষ পশু নয়, হাতে টাকা না থাকলে বাধ্য হয়ে তাকে খাটতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু টাকা থাকলে সঙ্গতি থাকলে কেন সে পশুর মত খেটে যাবে?

বাপ ও বড় ছেলের মধ্যে যখনি যে কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি বা তর্কাতর্কি হয় মাদাম রোলাঁদ তথন অন্য কথা বলে হঠাৎ প্রসঙ্গটা পাল্টে দেয়। সহসা এক খুনের সংবাদের কথা তুলল সে।

রোলাঁদ হাতের ঘড়ি দেখে বলল, চল, এবার যাওয়া যাক।

পীয়ের বলল, এখন বেলা একটাও বাজেনি।

রোলাঁদ পীয়েরকে বলল, তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে?

পীয়ের বলল, না, আমার যাওয়ার কোন দরকার নেই।

ওরা সবাই চলে গেলে পীয়ের ভাবতে লাগল। তার নূতন ডাক্তারখানা খোলার জন্য শহরের মধ্যে একটা ভাল জায়গায় একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখতে হবে। জায়গার গুণের উপর কাজ কারবারের অনেক কিছু নির্ভর করে।

এই ভেবে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বুলভার্ড ফ্রাঁসোয়া অঞ্চলে সমুদ্রের কাছে একটা মনোরম ফ্ল্যাট আছে। দুদিকে দুটো বসার ঘর। একটা খাবার ঘর। এক ফালি বাগান। সব দিক দিয়ে এক আদর্শ ডাক্তারখানা। কিন্তু পীয়ের খোঁজ করে জানল ভাড়া বড় বেশী। প্রতি কোয়ার্টার পনের শো ফ্রাঁ।

পীয়ের একবার মনে মনে ভাবল তার ভাই জঁা সম্পত্তি হাতে পেয়ে গেলে পর সে এক কোয়ার্টার বাড়ি ভাড়ার টাকাটা ধার চাইবে তার কাছে। সে ছয় মাসের মধ্যেই শোধ দিয়ে দেবে টাকাটা। টাকার অভাবেই সে এতদিন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি নিজেকে। একেবারে বিনা টাকায় ডাক্তারি ব্যবসা শুরু করা চলে না।

মনের মধ্যে নিদারুণ একটা শূন্যতা অনুভব করছিল পীয়ের। আর সেই শূন্যতাটা ক্রমশই বড় যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিল। সহসা তার মনে হলো এই

সময় যদি কোন মেয়ে তাকে কিছুটা সহানুভূতি জানাত, তাকে কিছুটা সঙ্গদান করত তাহলে বড় ভাল লাগত তার।

পীয়েরের মনে পড়ে গেল, একটি মদের দোকানে একটি পরিচারিকা তাকে পছন্দ করে। মেয়েটি ভাল, বড় শান্ত প্রকৃতির। এই ভেবে সেই মদের দোকানে চলে গেল পীয়ের।

গিয়ে দেখল দোকানে মাত্র তিনজন খরিদ্দার রয়েছে। কোন কাজ নেই। ক্যাশিয়ার গল্পের বই পড়ছে আর সেই মেয়েটি একটি চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

পীয়ের যেতেই মেয়েটি চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার, কেমন আছেন ?

পীয়ের বলল, ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছ ?

মেয়েটি বলল, ভাল। কিন্তু আপনি আমাদের এদিকে মোটেই আসেন না।

পীয়ের বলল, জান ত আমি একজন ডাক্তার। সময় পাই না মোটেই।

মেয়েটি বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় করে বলল, আপনি ডাক্তার! কই বলেননি ত ? আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আমি তাহলে আপনাকে দেখাতাম। যাই হোক, কি খাবেন বলুন ?

পীয়ের বলল, শুধু এক গ্লাস বীয়ার, আর কিছু না।

মেয়েটি পীয়েরের কাছে বসে তার হাতটা ধরে অনুযোগের সুরে বলল, আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। আপনি কেন ঘন ঘন আসেন না ?

কিন্তু পীয়েরের এত ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগছিল না। মেয়েটি অশিক্ষিত, অমার্জিত। কুৎসিত গ্রাম্যতাদোষে ভরা। তার মনে হলো নারীদের রূপ সৌন্দর্য স্বপ্নেই ভাল দেখায়। নারীদের দেহের মধ্যে যে একটা কুৎসিত মাদকতার ভাব আছে সেটা ঢাকার জন্যই সুন্দর অলঙ্কার ও বেশভূষার দরকার আছে।

মেয়েটি বলল, আচ্ছা, সেদিন আপনি এই পথ দিয়ে একটি সুদর্শন ছোকরার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। উনি কি আপনার ভাই ?

পীয়ের বলল, হ্যাঁ।

মেয়েটি বলল, উনি দেখতে খুব সুন্দর আর ওঁকে দেখে মনে হয় উনি জীবনকে উপভোগ করতে জানেন।

পীয়ের গম্ভীরভাবে বলল, তুমি কি তাই মনে করো নাকি ?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

হঠাৎ পীয়েরের মুখে এসে গেল কথাটা। অর্থাৎ জাঁর সম্পত্তি প্রাপ্তির কথাটা হঠাৎ তার মুখে এসে গেল আর সে বলে ফেলল তা মেয়েটির কাছে। বলল, আমার ভাই সত্যিই খুব ভাগ্যবান। সে হঠাৎ মোটা রকমের এক

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে যার বাৎসরিক আয় হলো কুড়ি হাজার ফ্রাঁ।

মেয়েটির নীল চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল, তাই নাকি। কার সম্পত্তি? কে দিয়ে গেছে?

পীয়ের বলল, আমার বাবা-মার এক অকৃতদার বন্ধু।

মেয়েটি বলল, কিন্তু তোমাকে দিল না কেন? শুধু তোমার ভাইকে?

পীয়ের বলল, না, আমার সঙ্গে তার বেশী ভাব ছিল না।

মেয়েটি তখন বলল, তোমার ভাই কিন্তু তোমার মত বেঁটে নয়।

পীয়ের জিজ্ঞাসা করল, এ কথার মানে?

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, এমনি বললাম।

মদের দামটা টেবিলের উপর রেখে পথে বেরিয়ে পড়ল পীয়ের। হঠাৎ তার মনে হলো, তবে কি মেয়েটি সন্দেহ করে যে তার ভাইএর প্রকৃত পিতা হচ্ছে সেই লোকটি যে তাকে তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছে?

সন্দেহটা ক্রমে পীয়েরের মনেও দানা বেঁধে উঠল। ভাবল, এ সন্দেহ যে কোন লোকের মনের মধ্যে জাগা খুবই স্বাভাবিক। অথচ তার বাবা-মার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। তারা শুধু নির্বিকার নয়; তারা সম্পত্তি-প্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত। তার বাবা-মার উদার অকৃতদার বন্ধু অবশ্যই তার যথাসর্বস্ব বন্ধুর ছেলেকে দান করে যেতে পারে। কিন্তু তা দুই ছেলেকে না দিয়ে কেবলমাত্র একটি ছেলেকে দিয়ে গেল কেন?

এ ঘটনায় স্বভাবতই লোকের মনে সন্দেহ জাগবে বুঝি বা জাঁ তার ঔরসজাত সন্তান বলেই তার সেই অবৈধ গোপন অপত্যস্নেহের বশবর্তী হয়ে একাজ করে গেছে মারেশল।

পীয়ের ঠিক করল এ বিষয়ে জাঁকে সাবধান করে দেবে সে। বলবে এ সম্পত্তি গ্রহণ করার আগে সে যেন ভেবে দেখে এর সঙ্গে তার মার সম্মান জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে তার জন্মের শুচিতা আর বৈধতা।

বাড়ি গিয়ে পীয়ের দেখল বাড়িতে এক ভোজসভা বসে গেছে। সেখানে ক্যাপ্টেন বোসায়ার আর মাদাম রোজমিলি নিমন্ত্রিত হয়েছে। জাঁর সম্পত্তিপ্রাপ্তির দিনটাকে এক উৎসব হিসাবে পালন করতে চায় তার বাবা মা।

পীয়ের গিয়ে তার মধ্যে বসল। বোসায়ার ভাল ভারমাউথ মদ খাবার জন্য অনুরোধ করছিল মাদাম রোজমিলিকে। রোলাঁদ রোজমিলির হাত ধরবার চেষ্টা করতেই মাদাম রোলাঁদ বলল, আজ জাঁর দিন। তুমি ওর হাত ধরবে না। মাদাম রোলাঁদ, রোজমিলি আর জাঁ সেণ্ট জুইন পাহাড় দিয়ে বেড়াতে যাবার এক পরিকল্পনা করছিল।

পীয়েরের ইচ্ছা হচ্ছিল সে এখনি এই উৎসবের অর্থহীন সব আনন্দকে

ম্লান করে দেয়, এই মুহূর্তে তার ভাইকে তার সংশয়ের কথাটা বলে তাকে এই ঘৃণ্য সম্পত্তি গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বলতে গিয়ে কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে।

কিন্তু রোলাঁদ মদের গ্লাসটা হাতে ধরে তুলতে যেতেই বাধা দিল পীয়ের। বলল, তুমি বলছিলে তোমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু এই মদ যদি তুমি খাও তাহলে তোমার পাকস্থলীর প্রচুর ক্ষতি হবে।

ক্যাপ্টেন বোসায়ার বলল, ওসব ডাক্তারদের কথা রেখে দাও রোলাঁদ। ওদের কথা শুনলে আর আনন্দ উৎসব করা চলে না।

মাদাম রোলাঁদ বলল, আজকের দিনের মত থাক পীয়ের।

পীয়ের বলল, যা সত্যি কথা তাই বলেছি তাতে ওঁর যা খুশি করতে পারেন।

রোলাঁদ কিন্তু সত্যিই আর ছুঁল না মদের গ্লাসটা। তার সত্যিই ভয় হচ্ছিল।

পীয়ের এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল। ভাবল তার মনের বিষ দিয়ে অপরের আনন্দকে মাটি করার কোন অর্থ হয় না। সে দেখল মাদাম রোজমিলি তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। যেন বলতে চাইছে, তুমি জঁার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করছ। তুমি ঘৃণ্য।

হঠাৎ পীয়ের তার বাবাকে বলল, আজ খাও। তবে বেশী খেও না। আর রোজ খেও না।

ক্যাপ্টেন বোসায়ার ভোজসভায় কিছু বললেন। বললেন, ভাগ্যদেবীকে লোকে বলে অন্ধ। কিন্তু ভাগ্যদেবীর সত্যিই চোখ আছে বলেই হাভারের সুযোগ্য সন্তান জঁাকে তিনি এই সম্পত্তি দান করেছেন।

জঁা সকলকে ধন্যবাদ জানাল। খুশিতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তার মুখখানা।

পরে মদের ঘোরে বৃদ্ধ রোলাঁদ কাঁদতে লাগল মঁসিয়ে মারেশলের কথা মনে করে। বলল, আচ্ছা বলত লুই, সে আমার কম বড় বন্ধু ছিল? সে আমাদের সঙ্গে রোজ রাত্রিতে খেত। আমাকে কত থিয়েটার দেখাত।

মাদাম রোলাঁদ বলল, তাঁর মত বন্ধু আর হয় না।

পীয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবা-মার মুখপানে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে মদ খেতে লাগল সাধ মিটিয়ে। ও যখন শুতে গেল রাত্রি তখন প্রায় দুপুর। পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত ঘুমোল।

পরের দিন সকাল নটায় ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে পোশাক পরতে পরতে পীয়ের ভাবল, হয়ত মদের দোকানের সেই মেয়েটাই ভুল করেছে। হয়ত তার মা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই সব নিম্নস্তরের নোংরা মেয়েরা নিজেরা

খারাপ বলে সমাজের উঁচুস্তরের মেয়েদেরও খারাপ ভাবে।

তবু মন থেকে তার ভাইএর প্রতি ঈর্ষার ভাবটাকে কাটিয়ে উঠতে পারল না পীয়ের। তবে দুপুরের লাঞ্চ খেতে গিয়ে হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাল। হাসিঠাট্টা করে সবাইকে হাসাতে লাগল। মাদাম রোলাঁদ খুব খুশি হলেন।

লাঞ্চ খাবার পর তার বাবার কাছ থেকে ডিঙিটা চেয়ে নিল পীয়ের। বলল, সমুদ্র দিয়ে একবার ঘুরে আসব। একজন নাবিককে সঙ্গে করে নৌকোয় করে সমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে তিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে এল পীয়ের। আসার সময় হঠাৎ ঘন কুয়াশা নেমে এল সমুদ্রে। সেই সামুদ্রিক ধূসর কুয়াসায় হাভারে শহরটাও ঢেকে গেল।

রাত্রিতে ডিনার খাওয়ার সময় খাবার ঘরে ঢুকতেই পীয়ের শুনতে পেল কথাটা। তার মা বলল, জাঁর জন্য বুলভার্ড ফ্রাঁসোয়ো অঞ্চলে একটা সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

ফ্ল্যাটটার বর্ণনা শুনে পীয়ের বুঝতে পারল, এই ফ্ল্যাটটাই সে পছন্দ করে-ছিল এর আগে। তার মনে হলো, তার শেষ আশাটাও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মাদাম রোলাঁদ বলল, তোমার জন্যও ঐ ধরনের একটা ফ্ল্যাট চাই। তবে ভাড়াটা যেন কম হয়।

পীয়ের গম্ভীরভাবে বলল, আমি আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিদ্যা আর শ্রম দ্বারা আমার উন্নতির পথ করে নেব।

তার মা বলল, তাহলেও ভাল ঘরের একটা দাম আছে। সেটা অস্বীকার করতে পার না।

হঠাৎ পীয়ের তার বাবাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা মঁসিয়ে মারেশলের সঙ্গে কখন তোমাদের বন্ধুত্ব হয় মনে আছে?

রোলাঁদ অনেক ভেবে মনে করতে না পারায় তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল। মাদাম রোলাঁদ বলল, তখন আমাদের প্যারিসে দোকান ছিল। তোমার বয়স আটাস্ন। পীয়ের তিন বছরের ছেলে।

রোলাঁদ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। প্রথমে দোকানে তোমার মার সঙ্গে আলাপ হয়। উনি আমাদের দোকানের খরিদ্দার ছিলেন। জিনিস কিনতে আসতেন। তারপর বন্ধু হয়ে যান। তোমার একবার কালাজ্বর হয়। তোমার মা ভয় পেয়ে যান। আমি দোকান নিয়ে ব্যস্ত। তখন মারেশলই দোকান থেকে ওষুধ কিনে এনে দিয়ে ও নানাভাবে তোমার মাকে সাহায্য করে তোমাকে বাঁচিয়ে তোলে। তারপর থেকে ও তোমাকে খুব ভালবাসত। এইভাবেই গাঢ় হয়ে ওঠে আমাদের বন্ধুত্বটা।

আর কোন কথা না বলে উঠে পড়ল পীয়ের। আর সে কিছুই শুনতে চায় না। তার মনের মধ্যে আলতোভাবে ভেসে বেড়ানো সেই কুটিল সংশয়টা

এবার বুলেটের মত অন্তরের মধ্যে ঢুকে গেল। পীয়ের ভাবতে লাগল, তাহলে সে-ই প্রথম প্রিয় ছিল মারেশলের। মারেশল তাকে রোগ থেকে বাঁচিয়ে তোলার পর থেকে তাকেই ভালবাসত। তখন জঁার জন্ম হয়নি। কিন্তু আজ তাহলে কেন মারেশল তার সব সম্পত্তি শুধু একমাত্র তার ভাই জঁাকে দিয়ে গেল? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই রহস্যময়।

আবার শহরের পথে ঘুরতে লাগল পীয়ের। একটা মদের দোকানে গিয়ে কিছু মদ খেল। তারপর বুড়ো ম্যারেসকোর কাছে গেল। ম্যারেসকোও তাকে তাই বলল। পীয়েরকে বলল, তোমার ভাইকে বোঝান উচিত ছিল। তাকে এই সম্পত্তি নিতে দেওয়া উচিত হয়নি তোমাদের। এতে তোমাদের মার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।

পীয়ের ভাবল ম্যারেসকো মনে করে জঁা মারেশলেরই ঔরসজাত সন্তান। সে নিজে অবশ্য অতখানি ভাবতে সাহস পায় না। সে এখনো নিঃসন্দেহ হতে পারেনি এ বিষয়ে।

সেখান থেকে বেরিয়ে বন্দরের জেটিতে গিয়ে বসল পীয়ের। পথ চলতে চলতে কোন চিন্তা হয় না। পীয়ের মনে মনে মারেশলের গোটা ছবিটা আঁকল। বছর ষাট বয়স। ছুঁচলো দাড়িওয়ালা মুখ। লম্বা চেহারা। মঁসিয়ে মারেশল তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কাকে বেশী ভালবাসতেন তা বোঝাই যেত না। পীয়ের তা কোনদিন বুঝতে পারেনি। তাদের বাবা-মা যখন এখানে এসে বাস করতেন তখনও প্রায়ই তাদের বাড়িতে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করতেন। প্রায়ই শুধাতেন, তোমাদের বাবা-মার খবর পেয়েছ? কিন্তু সেই মানুষটি যে তার সব সম্পত্তি শুধু জঁাকে দিয়ে যাবেন সে ধরনের মানসিকতার কোন আভাস কোনদিন ঘুণাক্ষরেও পায়নি পীয়ের।

আর একটা জিনিস ভেবে পেল না পীয়ের, মঁসিয়ে মারেশলের মত শিক্ষিত সুন্দর ও সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন লোক কি করে তার বাবার মত এক স্বল্পশিক্ষিত ও স্থূল রুচিসম্পন্ন এক ছোট দোকানদারের বন্ধু হলেন। পীয়ের বড় হয়ে মারেশলের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছে তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তিনি কবিতা ভালবাসতেন। অথচ তার বাবা রোলাঁদ একমাত্র ব্যবসা আর মাছ ধরার কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না। তবে কি তার মার জন্যই ওদের পরিবারের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন মারেশল? তার মাও তখন বয়সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল। তার মা তখন রোজ দোকানে বসত। জিনিস বিক্রি করত। এমনও হতে পারে তার মার রূপে মুগ্ধ হয়েই হয়ত দোকানে বারবার জিনিস কিনতে আসত মারেশল। তারপর ক্রমে তার মার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায় আর সেই বন্ধুত্ব প্রসারিত হয়ে তার বাবাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আর তার মার জন্যই অর্থাৎ তার মাকে মারেশলের ভাল লাগত বলেই হয়ত উনি তার শিশুপুত্র পীয়েরকে ভালবাসতেন। তারপর ধীরে ধীরে……হা

ভগবান..... আর ভাবতে পারে না পীয়ের।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল পীয়েরের। তাদের প্যারিসের বাসায় মারেশলের কোন ছবি আছে কি? আগে ত ছিল একটা। এখন হয়ত ওর মা সেটা লুকিয়ে ফেলেছে কোন গোপন জায়গায়। সে ছবি থাকলে সে বুঝতে পারত, সকলে বুঝতে পারত মারেশলের চেহারার সঙ্গে জাঁর চেহারার কত-খানি মিল আছে। জাঁর মত মারেশলও লম্বা আর সুন্দর ছিল যৌবনে।

তবু ওর মার কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল পীয়েরের। তার মাকে দেখে সত্যিই নির্দোষ এবং সরল প্রকৃতির বলে মনে হয়। মনে হয় তার মত মেয়ে স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না। তার বাবা দোকানের কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকত। কারণ তার মাকে বিশ্বাস করত। আর তার মা সুন্দরী হলেও তার বাবাকে কাজের লোক বলে পছন্দ করে বিয়ে করে। দোকান চালাবার বেশীর ভাগ দায়িত্ব নিজের মাথার উপর চাপিয়ে নেয়।

পীয়েরের মনে হচ্ছিল সে এইভাবে ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাবে।

৫

সেদিন রাত্রিতে কোনমতেই ঘুমাতে পারল না পীয়ের। মাত্র ঘণ্টা-খানেক ঘুমিয়েই উঠে পড়ল। আর বিছানায় শুয়ে থাকতেও পারল না। হঠাৎ কি মনে হলো, চোরের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জাঁর ঘরে গেল। দেখল জাঁ চিৎ হয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে।

জাঁর চেহারাটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে পীয়ের এই সিদ্ধান্তে এল যে জাঁর এই চেহারার সঙ্গে তার বাবা রোলাঁদের চেহারার কোন মিল নেই।

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। ভোর হতেই মার ঘরের দরজায় টোকা দিতেই মাদাম রোলাঁদ ভিতর থেকে প্রশ্ন করল, কে?

পীয়ের বলল, আমি পীয়ের।

কি দরকার?

পীয়ের বলল, আমি তুরভিল যাচ্ছি। রাত্রিতে ফিরব। তাই বলে যাচ্ছি।

পীয়ের চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মা ভিতর থেকে ডাকল। বলল, দাঁড়াও দরজা খুলে দিচ্ছি।

পীয়ের ঘরে ঢুকল। দেখল তার মার বিছানায় বাবা তখনো ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ পীয়ের তার মাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা মঁসিয়ে মারেশলের যে ছবিটা আমাদের প্যারিসের বাড়িতে ছিল সেটা কোথায় জান?

মাদাম রোলাঁদ বলল, আমার ড্রয়ারে আছে বোধ হয়। কিন্তু তুমি তা নিয়ে কি করবে?

পীয়ের বলল, দরকারটা আমার না। ওটা জাঁকে দেব। ও বাঁধিয়ে রাখবে।

মাদাম রোলাঁদ বলল, তা অবশ্য বটে। ওটা ওকেই দেওয়া উচিত।

পীয়ের বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে সোজা গিয়ে তুরভিলের স্টীমারে গিয়ে বসল। কিন্তু মন থেকে সেই অস্বস্তিকর চিন্তাটা গেল না। সে ভাবতে লাগল, একদিন মারেশলের সেই ছবিটা ত তাদের প্যারিসের বসার ঘরেই টাঙ্গান ছিল। কিন্তু সেই ছবিটা কেনই বা তার মা সেখান থেকে নামিয়ে এনে নিজের ড্রয়ারে বা কোন গোপন জায়গায় ভরে রাখল? তার কারণ এই যে জঁা বড় হয়েছে। সে মুখে দাড়ি রাখার পর তাকে মঁসিয়ে মারেশলের মত অবিকল দেখাচ্ছে। লোকে এবার এই দুটো চেহারার মধ্যে মিল খুঁজে পাবে বলে ভয় পেয়ে একদিন তার মা সে ছবি নামিয়ে আনে দেওয়াল থেকে। লুকিয়ে ফেলে সবার অলক্ষ্যে।

স্টীমারটা সহসা ছেড়ে দিতে গাটা দুলে উঠল। আর তাতে চিন্তাটা বাধা পেল তার। তুরভিলে গিয়েও শান্তি পেল না মনে। এক কুটিল ঈর্ষার সেই ভয়ঙ্কর কালো শিকারী পাখিটা তার মনের আকাশে অনবরত উড়ে বেড়াচ্ছে এমনভাবে যে সে অন্য কোন দিকে মনটা ফেরাতে যেতেই তার মনের উপর জোর করে চেপে বসছে পাখিটা। বাড়ি ফিরে এসে পীয়ের দেখল তার বাবা-মা আর জঁা নূতন ফ্ল্যাটের জন্য আসবাবপত্র কেনার কথা বলছে। আজ সারাদিন তার মা আর জঁা অনেক দোকান ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছে।

পীয়ের আবার ছবির কথাটা তুলল। মাকে বলল, মারেশলের ছবিটা খুঁজে পেয়েছ?

মাদাম রোলাঁদ বলল, সে জায়গায় নেই, তবে হ্যাঁ কোথায় আছে জানি। এখনি এনে দিচ্ছি।

রোলাঁদ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ত দিনকতক আগে দেখলাম ছবিটা। তখন কি জানি ওটার প্রয়োজন হবে।

পীয়েরের মনে হলো তার মা মিথ্যা কথা বলছে। আসলে আবার লুকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর মাদাম রোলাঁদ একটি বাতি হাতে উঠে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছবিটা নিয়ে এল। পীয়ের সেটা প্রথমে হাতে করে নিয়ে আলোয় ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বলল, হা ভগবান! অনেকটা জঁার মত দেখতে।

কথাটা অন্য কেউ গ্রাহ্য করল না। কিন্তু মাদাম রোলাঁদ পীয়েরের মুখপানে তীক্ষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। পীয়ের বেশ বুঝতে পারল তার মনের সংশয়ের কথাটা তার মা এবার ধরে ফেলেছে।

মঁসিয়ে রোলাঁদ ছবিটা নিয়ে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। বলল, যৌবনে ও সত্যিই সুন্দর ছিল। আর ওর মনটা ছিল বড় সুন্দর, বড় উদার। নয় লুই?

মাদাম রোলাঁদ কোন কথা বলল না। কি একটা অজুহাতে চলে গেল ঘর থেকে।

বসার ঘরে সামনের দেওয়ালে বড় ঘড়িটার পাশে ছবিটা টাঙিয়ে রাখা হলো। হঠাৎ বাইরের দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। মাদাম রোলাঁদ বলল, নিশ্চয় মাদাম রোজমিলি।

পীয়েরের হঠাৎ কি মনে হলো। রোজমিলি এর আগে কখনো এ ছবি দেখেনি। আজ এ ছবি দেখেই বুঝতে পারবে জাঁর চেহারার সঙ্গে এ ছবির কোথায় মিল। তখন সব ব্যাপারটা বুঝতে পারবে সে। পীয়ের হঠাৎ উঠে ছবিটা দেওয়াল-ঘড়ির তলায় সরিয়ে রাখল।

রোজমিলি এসে এক কাপ চা চাইল। হঠাৎ পীয়ের দরজাটা জোরে টেনে চলে গেল ঘর থেকে। জাঁ আর রোলাঁদ দুজনেই রেগে গেল। বলল, এটা অসভ্যতা।

মাদাম রোলাঁদ বলল, ওর শরীরটা আজ ভাল নেই। তার উপর তুরভিল থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

রোলাঁদ বলল, আজ ক'দিন ধরেই ও এই ধরনের ব্যবহার করছে।

৬

পরের সপ্তার সব দিন ক'টা মাছ ধরে কাটাল রোলাঁদ। মাদাম রোলাঁদ আর জাঁ নূতন ফ্ল্যাটে বাসা বাঁধার কাজে ব্যস্ত রইল। শুধু আগের মতই ভেবে ভেবে আর পথে পথে ঘুরে বেড়াল পীয়ের।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় রোলাঁদ পীয়েরকে বলল, তোর কি চেহারাই না হয়েছে! কী ব্যাপার তোর?

পীয়ের বলল, একটা বড় রকমের দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে অন্তরটা।

রোলাঁদ বলল, কোন নারীর জন্য হয়ত?

পীয়ের বলল, হ্যাঁ।

রোলাঁদ বলল, সে নারী জীবিত না মৃত?

পীয়ের বলল, জীবিত। কিন্তু মৃতের সমান।

সেদিন মাদাম রোলাঁদকে খুব অবসন্ন ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। রোলাঁদ বলল, নূতন বাসাটার জন্য এত খেটে কি হবে? বিশ্রাম নাও। তোমার চেহারাটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে।

তারপর পীয়েরকে লক্ষ্য করে রোলাঁদ বলল, তুমি নাকি ডাক্তার? তোমার নাকের ডগায় তোমার নিজের মার শরীর এত খারাপ। কিন্তু তা একবারও দেখনি।

পীয়ের বলল, মার এমন কিছুই হয়নি।

কিন্তু মাদাম রোলাঁদ সত্যিই হাঁপাচ্ছিলেন। পীয়ের তার কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে প্রথমে তার হাতটা জোরে ঠেলে দিল। পরে

তাকে পরীক্ষা করতে চাইলে প্রথমে তার হাতটা জোরে ঠেলে দিল। পরে শান্ত হয়ে বাঁ হাতটা পীয়েরের দিকে বাড়িয়ে দিল। পীয়ের নাড়ী পরীক্ষা করে বলল, সত্যিই শরীরের অবস্থা খারাপ। আমি ওষুধ দিচ্ছি।

হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল মাদাম রোলাঁদ। রোলাঁদ বলল, কি হলো লুই? এমন ত কখনো হয় না? কী হলো তোমার?

কিন্তু পীয়ের ওষুধের ব্যবস্থাপত্রটা লেখা শেষ না করতেই মাদাম রোলাঁদ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে দিল।

রোলাঁদ আশ্চর্য হয়ে বলল, এর অর্থ কি?

পীয়ের বলল, মাদের বয়সে মেয়েদের এই ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনার রোগ হয়। ভয়ের কোন কারণ নেই। এখন দিনকতক এমনি হবে মাঝে মাঝে।

সত্যিই প্রায় রোজ একবার করে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে মাদাম রোলাঁদ। হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

জাঁর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে একদিন সেণ্ট জুইন দিয়ে বেড়াতে যাবার ঠিক হলো। রোলাঁদ পরিবার ছাড়া মাদাম রোজমিলি আর ক্যাপ্টেন বোসায়ারও গেল।

সমুদ্রের একটা খাড়ি পার হয়ে ওরা গিয়ে পৌছল জুইনের পাহাড়ী অঞ্চলে। মাদাম রোজমিলিকে নিয়ে অনেক ঘুরে বেড়াল জাঁ। রোজমিলির প্রতি তার এতদিনের পুঞ্জীভূত প্রেম যেন ফেটে পড়তে চাইছে প্রকাশ্যে।

একসময় রোজমিলিকে এক জায়গায় ডেকে বসিয়ে জাঁ বলল, আমি তোমায় ভালবাসি রোজমিলি। এতদিন একথা বলার সাহস পাইনি আমি।

রোজমিলি বলল, থাম। ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা আলোচনা করা দরকার। আমরা এখন বড় হয়েছি। ছোট নেই কেউ। সব কথা এখন ভেবে দেখতে হবে আমাদের। আচ্ছা, তুমি যখন আমায় ভালবাস আমাকে বিয়ে করতে চাও নিশ্চয়?

জাঁ বলল, নিশ্চয়।

রোজমিলি বলল, তোমার বাবা-মাকে বলেছ একথা? তোমার বাবা মার অমতে আমি এ কাজ করতে পারব না।

জাঁ বলল, হ্যাঁ বলব। আগে তোমার মত আছে কি না তা জেনে নিলাম। আমার বাবা মা কেউ আপত্তি করবে না এ বিয়েতে।

রোজমিলি বলল, হ্যাঁ আমার মত আছে। তুমি সত্যিই ভাল ছেলে। আমি তোমায় বিয়ে করব।

জাঁ কিন্তু একথাটা এমনভাবে শুনতে চায়নি। বিয়ের আগে সব প্রেমিকদের মধ্যে লুকোচুরি খেলার মত যেমন কখনো সোচ্চার ও কখনো নিরুচ্চার এক প্রণয়লীলা অনুষ্ঠিত হয় জাঁ তাই চেয়েছিল। তার ধারণা

ছিল প্রেমিকরা কখনো ঠাণ্ডা মাথায় এভাবে বসে বিয়ের কথা আলোচনা করে না। তার মনে হলো কোন রঙীন ভূমিকা ছাড়াই তাদের বিয়ের কাজটা হয়ে গেল।

হঠাৎ রোলাঁদের গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়ল ওরা।

পীয়ের আর ওর মা দুজনে সমুদ্রের বেলাভূমির উপর বসে ছিল। রোলাঁদ বোসায়ারের সঙ্গে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ পীয়ের বলল, আমি এই সব বিয়ে আর ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা পছন্দ করি না।

মাদাম রোলাঁদ বলল, কার কথা বলছ? জাঁর কথা?

পীয়ের বলল, হ্যাঁ।

মাদাম রোলাঁদ বলল, ওকথা বলো না। রোজমিলির মত সৎ মেয়ে হয় না।

পীয়ের উপহাসের ভঙ্গিতে হাসল। সব মেয়েই সৎ, আবার তারা গোপনে স্বামীদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলে।

মাদাম রোলাঁদ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, ওঃ পীয়ের, তুমি কি নিষ্ঠুর।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল মাদাম রোলাঁদ। জাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, আমাকে বাঁচাও জাঁ। আমায় রক্ষা করো।

জাঁ তার মাকে শান্ত করে বলল, আমি মাদাম রোজমিলিকে আজ বিয়ের কথা বললাম। তার মত নিলাম। এ বিয়েতে তোমার মত আছে ত?

মাদাম রোলাঁদ বলল, আছে মানে? তুই জানিস না কত চেষ্টা করেছি আমি এ বিয়ের জন্যে?

মাদাম রোলাঁদ সমুদ্র সৈকতের পানে একবার তাকিয়ে দেখল, তার বড় ছেলে পীয়ের বালির চরে শুয়ে রয়েছে মরার মত। যাবার সময় পীয়েরকে ডেকে ওঠাতে হলো। ঘুমের ভান করে কি যেন ভাবছিল ও।

ওরা সবাই ফিরে এল জাঁর নূতন ফ্ল্যাটে। বসার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর সব দেখে খুশি হলো ওরা। সব চেয়ে খুশি হলো আলো দিয়ে সাজানো ছোট ফুলবাগানটা দেখে। জাঁ রোজমিলিকে বলল, তুমি খুশি ত?

রোজমিলি হাসিমুখে বলল, খুব খুশি।

রোজমিলি আর রোলাঁদ চলে গেল। মাদাম রোলাঁদ বলল, আমার যেতে একটু দেরী হবে। আমাকে পীয়ের নিয়ে যাবে ও বাড়িতে।

রোলাঁদের ঘুম পাচ্ছিল। সে শুতে চলে গেল।

রোলাঁদ চলে গেলে মাদাম রোলাঁদ জাঁর শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পীয়ের আর জাঁ বসার ঘরে দুজনে বসেছিল।

হঠাৎ পীয়েরের মধ্যে এতদিনের ঈর্ষা আর আক্রোশ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আর সে চেপে রাখতে পারছিল না। যে কোন অজুহাতে ফেটে পড়তে চাইছিল। হঠাৎ পীয়ের বলল, আজ দেখলাম বিধবা ভদ্রমহিলার মুখখানা ভার ভার। এই প্রমোদ ভ্রমণ ওর কি পছন্দ হয়নি?

জঁা রেগে গেল। সে বেশ বুঝতে পেরেছে পীয়ের তার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে। তাই সে যে মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চলেছে তার উপর এমন বিদ্বেষপ্রসূত মন্তব্য করছে।

জঁা বলল, দেখ, মাদাম রোজমিলি আমাকে কথা দিয়েছে সে আমাকে বিয়ে করবে। সুতরাং তার সম্বন্ধে কোন কটু কথা আমার কাছে আর কোনদিন বলবে না। মাদাম রোজমিলি আমাকে বেশী পছন্দ করে বলে তুমি এর আগেও আমায় হিংসা করতে।

পীয়ের বলল, আমি করব তোমায় হিংসে? কেন, কী তোমার এমন বিদ্যা বুদ্ধি আছে?

জঁাও উঠে দাঁড়িয়ে রাগে আগুন হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আমার এই সম্পত্তিপ্রাপ্তিতে হিংসা করো আমায়।

পীয়ের বলল, দেখ জঁা, অন্য কোন লোক হলে এ সম্পত্তি গ্রহণ করত না। আমি হলেও করতাম না।

জঁা বলল, কেন, কি বলতে চাও তুমি?

পীয়ের বলল, এ বিষয় গ্রহণ করা মানে আমাদের মার উপর কলঙ্ক আরোপ করা।

জঁা বলল, তার মানে?

পীয়ের বলল, মানে আর কি, সবাই বলাবলি করছে তুমি মঁসিয়ে মারেশলের ঔরসজাত সন্তান বলেই মারেশল সব সম্পত্তি শুধু তোমাকেই দিয়ে গেছে।

পীয়ের......পীয়ের.......আর কোন কথা বেরোল না জঁার মুখ থেকে। হতবুদ্ধি হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল জঁা। পীয়ের কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বুঝতেই পারল না। জঁার মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে ঘুরছে। তার পাগুলো ঘরের মেঝের মধ্যে বসে গেছে।

সহসা মার কথা মনে পড়ায় শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল জঁা। গিয়ে দেখল তার বিছানায় শুয়ে বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদছে তার মা। জঁা তার মার গায়ে হাত দিয়ে 'মা' বলে ডাকতে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল মাদাম রোলাঁদ।

জঁা বলল, তুমি কেঁদো না মা। আমি জানি এ কথা সত্য নয়। তুমি কিছু মনে করো না। এ হচ্ছে পীয়েরের হিংসার কথা।

মাদাম রোলাঁদ জলভরা চোখে বলল, না, একথা সত্য। আজ আমি

গোপন করব না একথা। একটা মাস এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি আমি।

জঁার চোখেও জল এল। বলল, তা হোক, তবু তুমি আমার মা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

মাদাম রোলঁাদ উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। তবু কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাচ্ছি।

মাদাম রোলঁাদ একাই বাড়ি ফিরে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল নিঃশব্দে। রোলঁাদের তখন নাক ডাকছিল। সহসা বহুদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল মাদাম রোলঁাদের। প্যারিসে থাকাকালে মঁসিয়ে মারেশলের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে এমনি করে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে এসে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ত।

পীয়ের তখনও ঘুমোয়নি। সে বুঝতে পারল তার মা এসে ঘরে ঢুকল।

৭

মাদাম রোলঁাদ বেরিয়ে গেলে জঁা তার নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। সে তার মাকে কথা দিয়েছে আগামীকাল বেলা নটার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে। মাদাম রোলঁাদ বার বার বলছিল তার পক্ষে এ সংসারে থাকা আর সম্ভব নয়। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। তখন জঁা আত্মহত্যার ভয় দেখায়। মাদাম রোলঁাদ থাকতে রাজী হয়। জঁা বলে সে যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু কি সে ব্যবস্থা। জঁা তা নিজেই জানে না।

জঁা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতেই কাটিয়ে দিল রাতটা। অবশেষে সে অনেক ভেবে ঠিক করল, সে যখন জানতে পেরে গেছে সে মঁসিয়ে মারেশলের ঔরসজাত সন্তান তখন তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবে আর একটা কথা, সে যখন মঁসিয়ে রোলঁাদের সন্তান নয়, তখন তাঁর সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করা উচিত হবে না তার পক্ষে। সে সম্পত্তি যা কিছু থাকবে সব পীয়ের নেবে।

পরদিন সকাল নটা বাজতেই নিজের ফ্ল্যাট থেকে তাদের পুরনো বাড়ির দিকে গেল জঁা। গিয়ে দেখল মাদাম রোলঁাদ তখনো ওঠেনি। যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। পীয়ের তখনো তার ঘর থেকে বেরোয়নি।

মঁসিয়ে রোলঁাদ প্রাতরাশ খাওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছিল জোসেফিনকে। জঁাকে দেখেই রোলঁাদ বলল, কি বাছা, ফ্ল্যাটে একা একা ভাল লাগছে না?

জঁা সোজা উপরে চলে গেল মার কাছে। মাকে সঙ্গে নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে দেখল পীয়ের তখনো আসেনি। মাদাম রোলঁাদ বলল, পীয়েরকে ডাক। ওকে না ডেকে খেতে বসলে ও রাগ করে।

জঁা নিজে চলে গেল পীয়েরকে ডাকতে। পীয়ের তখন বিছানা থেকে উঠে চিঠি লিখছিল। জঁা গিয়ে তার করমর্দন করল সহজভাবে। যেন কিছুই হয়নি। পীয়ের বলল, দেখছ ত আমি এখন ব্যস্ত আছি।

জঁা বলল, মা আমাকে পাঠিয়ে দিল তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্ত।

পীয়ের তখন বলল, তাহলে যেতেই হবে।

পীয়ের আর জঁা খাবার ঘরে গিয়ে যথাস্থানে বসল। পীয়ের অন্ত দিনকার মত তার মার দিকে তার কপালটা বাড়িয়ে দিল। মাদাম রোলাঁদ সে কপালে এমন অন্তমনস্কভাবে চুম্বন করলেন যাতে পীয়ের বুঝতেই পারল না।

জঁা মঁসিয়ে রোলাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। পীয়ের কান খাড়া করে শুনতে লাগল। জঁা যেন পীয়েরকে শুনিয়ে শুনিয়ে লোরেঁ জাহাজের কথা বলছিল রোলাঁদকে। বলছিল, এ বন্দরে যত জাহাজ আছে তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল জাহাজ।

রোলাঁদ বলল, তা অবশ্য বটে, কিন্তু এখন ওটা বন্দর ছাড়বে কি ?

জঁা বলল, হ্যাঁ, আমি কোম্পানির অফিসে গিয়ে দেখা করেছি, শীঘ্রই ছাড়বে। সত্যিই জাহাজের জীবনটা খুবই সুখের। জলে জলে বেড়ানো। ভাল খাওয়া দাওয়া। ভাল লোকের সঙ্গে দিন কাটানো। মাঝে মাঝে বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে বিভিন্ন শহরে বেড়িয়ে বেড়ানো। ওর ক্যাপ্টেনের মাইনে বছরে পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ। জাহাজের ডাক্তার পায় মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

রোলাঁদ সমর্থনের সুরে বলল, সত্যিই জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা।

পীয়ের হঠাৎ বলল, আচ্ছা, চেষ্টা করলে লোরেঁ জাহাজের সার্জেনের পদটা পাওয়া যাবে না ?

জঁা বলল, তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। জাহাজ কোম্পানির একজন ডিরেক্টারের এক বন্ধুর সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। তার নাম মঁসিয়ে মারশাঁদ।

রোলাঁদ বলল, আমারও দুজন বন্ধু আছে যারা কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। পীয়ের বলল, তার আগে এক কাজ করলে হয়। আমি যদি আমার দুজন অধ্যাপকের কাছ থেকে ভাল করে দুটো সুপারিশপত্র লিখিয়ে নিতে পারি তাহলে তোমাদের জানাশোনা লোকের মাধ্যমে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করলে খুব ভাল হয়।

জঁা আর রোলাঁদ দুজনেই সমর্থন করল কথাটা। রোলাঁদ তার অভ্যাস-মত স্ত্রীর মত চাইল, তুমি কি বল লুই ?

মাদাম রোলাঁদ বলল, পীয়ের ঠিকই বলছে।

কফি না খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল পীয়ের ঘর থেকে। এ কাজটা আমাকে এখনি করতে হবে।

রোলাঁদকে কি একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারল না জঁা। অব-শেষে মাকে বলল, চল মা, মাদাম রোজমিলির বাড়ি দিয়ে একবার ঘুরে

আসি। আমার ফ্ল্যাটে ওকে যেতে বলব।

রোলাঁদ বলল, কেন?

জাঁ বলল, এমনি যাবার জন্য অনুরোধ করব।

মাদাম রোলাঁদ জাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে পথ হাঁটতে লাগল। মাদাম রোজমিলি বাড়িতেই ছিল। একটি বড় বাড়ির দোতলায় থাকত রোজমিলি। গোটা বাড়িটাই তার নিজস্ব সম্পত্তি।

দরজা খুলে মাদাম রোলাঁদ আর জাঁকে দেখে মাদাম রোলাঁদকে জড়িয়ে ধরল রোজমিলি।

জাঁ হাসিমুখে বলল, আমি আমার মাকে নিয়ে আমার বউ খুঁজতে এসেছি।

রোজমিলি হাসতে লাগল। জাঁ বলল, দেখতে এলাম তোমার আবার মনের কোন পরিবর্তন ঘটল কিনা।

রোজমিলি বলল, না, আমি যা একবার স্থির করি তার নড়চড় বা কোন পরিবর্তন হয় না।

জাঁ বলল, তাহলে আজ হতে ছয় সপ্তার মধ্যে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। রাজী ত?

রোজমিলি বলল, আমার ভাবী শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করি।

মাদাম রোলাঁদ বলল, আমি খুশি মনে মত দিচ্ছি।

রোজমিলি বলল, মঁসিয়ে রোলাঁদকে ব্যাপারটা জানাতে হবে ত?

মাদাম রোলাঁদ বলল, তার কোন প্রয়োজন হবে না। কাজটা হয়ে গেলে উনি জানতে পারবেন।

রোজমিলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাদাম রোলাঁদ জাঁকে বলল, আমি তোর ফ্ল্যাটে যাব। নতুন ঝি কি রকম কাজকর্ম করছে একবার দেখে আসি।

আসলে রোলাঁদের কাছে তার বাড়িতে ফিরে যেতে আর মোটেই ভাল লাগছিল না মাদাম রোলাঁদের। আজ তার হঠাৎ মনে হলো আজ তার যত কিছু দুঃখ তার জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে মঁসিয়ে রোলাঁদ। তার মত একজন সুন্দরী সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মেয়েকে রোলাঁদের মত কুৎসিত চেহারার স্থূল রুচিসম্পন্ন লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি। রোলাঁদের পুরুষোচিত প্রাণশক্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মকুশলতার অভাব, তার কুৎসিত চেহারা, তার রুচিবোধের স্থূলতা তাকে দুর্বারবেগে ঠেলে দিয়েছে পরপুরুষের দিকে। তার এই অবাঞ্ছিত স্বামীকে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি বলেই মঁসিয়ে মারেশলের মত সুন্দর শিক্ষিত ও সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন যুবককে হাতের কাছে পেয়ে তাকে ভাল না বেসে পারেনি। অর্থাৎ তার বিবাহিত স্বামীই তাকে তার স্বামীর সঙ্গে প্রতারণা করতে বাধ্য করেছে।

তার নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে তার বসার ঘরে একটা আর্মচেয়ারে বসে রইল

জাঁ। মাদাম রোলাঁদ এ ঘর ও ঘর ঘুরে সব কিছু গোছাতে লাগল। হঠাৎ একসময় জাঁর পিছন দিক থেকে এসে তাকে চুম্বন করে একটা জিনিস তার কোলে ফেলে দিল। জাঁ সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল, সেটা মঁসিয়ে মারেশলের একটা ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি।

জাঁ সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিমূর্তিটা তুলে নিয়ে তার ড্রয়ারে ভরে রেখে তালা দিয়ে দিল।

৯

তার দুজন অধ্যাপকের কাছ থেকে দুটো সুপারিশপত্র লিখিয়ে নিয়ে জাহাজ কোম্পানির অফিসে জমা দিল পীয়ের। বাড়ি ছেড়ে জাহাজে কাজ নিয়ে দূর সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে চায় সে। এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে পীয়ের।

সে তার বাবার বাড়িতে আছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন এক অপরিচিত বিদেশীর মত। তাছাড়া এখানে সে মনটাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না। এ পরিবেশ ছেড়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি দিলেই সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর হয়ে যাবে তার।

তবে পীয়ের একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এখনো। সে তার ভাইকে তার যে জন্মবৃত্তান্তের কথা বলেছিল তা সে বিশ্বাস করে কিনা। অথবা সে এখনো তার মাকে নির্দোষ ভাবে এবং রোলাঁদকেই তার যথার্থ জনক বলে ভাবে কিনা।

একদিন নিয়োগপত্রটা পেয়ে গেল পীয়ের। আগামী মাসের প্রথম দিকেই জাহাজ ছাড়বে। জাহাজটা আপাততঃ যাবে আমেরিকা। নিয়োগ-পত্রটা প্রথমে বাড়ির সবাইকে দেখাল। বৃদ্ধ রোলাঁদ আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। মাদাম রোলাঁদ গম্ভীরমুখে তাকে আশীর্বাদ করল। ভিতরে আনন্দ হলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না জাঁ। জাঁ শুধু বলল, এই কাজের জন্য প্রচুর দরখাস্ত পড়েছিল। তোমার অধ্যাপকদের সুপারিশপত্র দুটো খুব কাজে লেগেছে। আসলে ঐ দুটোর জোরেই চাকরিটা পেয়ে গেলে তুমি।

পীয়ের এবার পথে বেরিয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল, এবার তাকে একে একে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

প্রথমে সে বৃদ্ধ ম্যারোসকোর কাছে গেল। বলল, আমি আগামী মাসে হাভার ছেড়ে যাচ্ছি।

ম্যারোসকো মর্মাহত হলো কথাটা শুনে। বলল, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। তুমি না বলেছিলে আমার বুড়ো বয়সে আমাকে সাহায্য করবে তুমি? আজ তুমি আমাকে এমনি অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছ?

পীয়ের বলল, কি করব বল? এখানে ব্যবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রচুর টাকার দরকার। আগে চাকরি করে কিছু টাকা জমানো

দরকার। তারপর ব্যবসার চেষ্টা করব।

ম্যারোসকোর কাছ থেকে সেই মদের দোকানের মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে গেল পীয়ের। মেয়েটার উপর রাগ হচ্ছিল তার। তবু মেয়েটা যা বলেছিল তা সত্যি। অবশ্য তার মা তাঁকে আসল কথাটা প্রকাশ করেছে কি না তা সে এখনো জানে না, তবে এবিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

মদের দোকানটায় গিয়ে পীয়ের দেখল, আজ দোকানে খুব ভিড়। কারণ ছুটির দিন। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতে মেয়েটি তেমন গ্রাহ্য করল না তাকে। বলল, কি খাবে?

পীয়ের বলল, এক গ্লাস বীয়ার।

বীয়ার এনে দিলে পীয়ের বলল, আমি আগামী মাসে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মেয়েটি অনেকটা উদাসীনভাবে বলল, কোথায়?

পীয়ের বলল, আমেরিকা।

মেয়েটি বলল, খুব ভাল দেশ।

সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল পীয়ের। মাদাম রোলাঁদ বাড়িতেই ছিল। তাকে দেখে বলল, তোমার পোশাক কি লাগবে বল, দর্জিকে মাপ দিতে হবে ত।

পীয়ের প্রথমে বলল, ঠিক আছে। অফিসে বলে যা করে হোক যোগাড় করব।

তারপর বাইরে যেতে হলে যা যা তার দরকার তার একটা তালিকা দিল মার হাতে।

তালিকাটা তার হাত থেকে নেবার সময় আজ বেশ কয়েকদিন পর প্রথম তার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাল মাদাম রোলাঁদ। যেন মনে হলো তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইছে তার মা।

আর বেশী দিন দেরী নেই। ৭ই অক্টোবর জাহাজ ছাড়বে। জাহাজটা বন্দরে এসে গেছে। পীয়ের একবার তার কেবিনটা দেখে এল। আজ ক'দিন ধরে পীয়েরের মেজাজটা বড় রুক্ষ হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় সকলকেই সে আঘাত দেয়।

সেদিন মাদাম রোলাঁদ পীয়েরকে বলল, আমি তোমার কেবিনে গিয়ে সব দেখেশুনে ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিয়ে আসব।

পীয়ের বলল, থাক, তার আর দরকার হবে না। আমার কেবিনটা ছোট আর দেখতেও ভাল নয়।

কথাটা শুনে তার মার মুখটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে অসহায়ভাবে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল মাদাম রোলাঁদ।

যাবার আগের দিন হঠাৎ মনটা পাল্টে গেল পীয়েরের। মনটা আগের

থেকে নরম হলো অনেকখানি। তার বাবা-মাকে বলল, আগামীকাল এগারোটায় রওনা হচ্ছে আমাদের জাহাজ। তোমরা যাও ত যাবে ঠিক সাড়ে নটায়।

রোলাঁদ উৎসাহিত হয়ে বলল, আমরা যাব আমাদের পার্ল নৌকোটায় করে, তাহলে তুমি আমাদের সহজেই দূর থেকে দেখতে পাবে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পাবে।

পীয়ের বলল, ঠিক আছে, তাই যেও।

সব ব্যবস্থা করে তার কেবিনে চলে গেল পীয়ের। রাতটা সেখানেই থাকতে হবে।

পরদিন সকালে উঠে জাহাজটা ভাল করে ঘুরে দেখে নিল পীয়ের। ডেকের পাটাতনের উপর শুয়ে বসে থাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর গরীব যাত্রীদের দেখে বড় দয়া হলো তার। জীবন সংগ্রামে শোচনীয়ভাবে এক জায়গায় হেরে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে জীবিকার সন্ধানে ওরা যাচ্ছে আর এক জায়গায়। সে সকরুণ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

পীয়ের তার কেবিনে ফিরে গিয়ে দেখল তার মা, বাবা, জঁ আর রোজমিলি দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

পীয়ের বলল, এত সকাল করে এলে তোমরা ?

মাদাম রোলাঁদ বলল, হ্যাঁ, আমরা তোমার সঙ্গে কিছুটা সময় থাকতে চাই।

পীয়ের আশ্চর্য হয়ে দেখল আজ তার মা কালো পোশাক পরেছে।

পীয়ের সকলকে নিয়ে তার কেবিনে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। রোলাঁদ বলল, ওষুধপত্র তোমার এই ঘরেই আছে ?

পীয়ের একটা বাক্স থেকে ওষুধগুলো দেখাতে লাগল। মাদাম রোজমিলি বলল, জায়গাটা বড় ছোট।

পীয়ের বলল, হ্যাঁ, একটা গর্তের মত।

দরজায় টোকা দিয়ে ক্যাপ্টেন বোসায়ার এসে ঘরে ঢুকল। বলল, চল আমরা সবাই পার্লে গিয়ে বসিগে। সেখান থেকেই আমরা ওকে বিদায় দেব।

জঁ আর রোজমিলির সঙ্গে করমর্দন করল পীয়ের। জঁাকে জিজ্ঞাসা করল, কখন তোমাদের বিয়ে হচ্ছে ?

জঁ বলল, এখনো দিন ঠিক হয়নি। তুমি যখন দু একদিনের জন্য ছুটি পাবে তখনই হবে।

সবাই একে একে বেরিয়ে গেল পীয়েরের কেবিন থেকে। কিন্তু মাদাম রোলাঁদের পা উঠছিল না। পীয়েরের দিকে গালটা বাড়িয়ে দিতে পীয়ের তাকে চুম্বন করল। তবু তার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাদাম রোলাঁদ।

জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে ওরা সবাই পানসে চাপল। জাঁ দাঁড় টানতে লাগল। মাদাম রোজমিলি আর মাদাম রোলাঁদের মাঝখানে বসল ক্যাপ্টেন বোসায়ার। মঁসিয়ে রোলাঁদ দূরবীণ দিয়ে লোরে জাহাজটাকে দেখতে লাগল।

হাভারে শহরের সব লোক যেন ঘাটে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের দেশের এই সুন্দর জাহাজটাকে বিদেশে পাঠাবার আগে বিদায় দিতে এসেছে যেন ওরা।

মঁসিয়ে রোলাঁদ দূরবীণ হাতে শিশুর মত বকতে লাগল, এই জাহাজটা ছেড়েছে। এই থামল, এই এদিকেই আসছে।

সত্যিই ওদের নৌকোটার পাশ দিয়ে চলে গেল জাহাজটা। জাঁ বলল, আমি পীয়েরকে দেখতে পেলাম।

মাদাম রোলাঁদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল অবিরল ধারায়। রোলাঁদ বলল, কাঁদছ কেন, ও ত এক মাসের মধ্যেই আসবে।

কিন্তু মাদাম রোলাঁদের মনে হতে লাগল আর যেন কখনো কোনদিন দেখা হবে না পীয়েরের সঙ্গে। পীয়ের কেন তাদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেল সে রহস্য একমাত্র সেই যেন জানে।

ক্রমে জাহাজটা সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে বুকে হেঁটে যেতে যেতে দূর দিগন্তের মধ্যে ঢুকে গেল। পিছনে রেখে গেল শুধু একতাল রহস্যময় ধোঁয়া।

সেদিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাদাম রোলাঁদ। জাঁ তখন তার বিয়ের কথাটা জানাচ্ছিল রোলাঁদকে।

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥